সীরাতুন্ নবী

[সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম]

[নতুন সম্পাদিত পূর্ণাঙ্গ জীবনী অংশ]

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

প্রথম ভারতীয় সংস্করণ :
জানুয়ারি, ১৯৬০

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত
মানসী প্রেস, ৭৩ শিশির ভাদুড়ী সরণি হইতে মুদ্রিত

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۵

ইসলাম-পূর্ব যুগের আরব

আরবের নাম 'আরব' হল কেন এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। ভাষাতত্ত্ববিদগণ বলেন ঃ 'আরব ও আ'রাব (عَرَبٌ-اَعْرَابٌ) অর্থ সুমার্জিত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সুন্দর ভাষায় কথা বলা। আরবের অধিবাসীরা যেহেতু নিজেদের ভাষার পাণ্ডিত্যের মোকাবেলায় অবশিষ্ট দুনিয়াকে কিছুই মনে করত না, কাজেই তারা নিজেদেরকে 'আরব' এবং দুনিয়ার অন্যসব জাতিকে 'আজম' তথা মূক অর্থাৎ কথা বলতে অক্ষম বলে অভিহিত করত।

কারও কারও মতে 'আরব' শব্দটি আসলে 'আরাবাত' عَرَبَةٌ ছিল। প্রাচীন কবিগণের কবিতায় عَرَبَةٌ এর স্থলে عَرَبٌ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

আরাবাত عَرَبَةٌ শব্দের অর্থ বৃক্ষলতাহীন। মরুভূমি হওয়ার কারণে সারা দেশটিই আরব নামে অভিহিত হয়েছে।

ভৌগোলিক বর্ণনা

আরবের সীমারেখা নিম্নরূপ ঃ

পশ্চিমে লোহিত সাগর, পূর্বে পারস্য উপসাগর ও ওমান উপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। উত্তরের সীমারেখা সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। কেউ কেউ আলেপ্পা রাজ্য এবং ফোরাতকে উত্তর সীমারূপে উল্লেখ করেছেন। আত্‌তীহ্ নামক সিনাই উপদ্বীপটিকে অধিকাংশ আরব এবং ইউরোপীয় গ্রন্থকারই মিসরের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ভূতত্ত্বের আলোকে এ এলাকাটিও আরবেরই অন্তর্ভুক্ত। আরব দেশে আজ পর্যন্ত কোন জরিপকার্য চালানো হয়নি। তথাপি সুনিশ্চিত যে এ দেশটি আয়তনে জার্মানী এবং ফ্রান্সের চার গুণ বড়। দৈর্ঘ্য ১৫ শ' মাইল, প্রস্থ ৬ শ' মাইল এবং আয়তনে সর্বমোট ৯ লক্ষ বর্গমাইল।

দেশের বিরাট অংশই বালুকাময় মরুভূমি। প্রায় সারা দেশেই পাহাড়-পর্বত বিরাজমান। সবচেয়ে দীর্ঘ পর্বতমালা জাবালুস্‌সারাত। এটি দক্ষিণে ইয়ামন থেকে উত্তরে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ৮ হাজার ফুট উঁচু। দেশের কোন কোন অংশ অবশ্য বেশ উর্বর এবং শস্যশ্যামল।

আরব দেশের প্রায় সর্বত্রই স্বর্ণ-রৌপ্যাদি নানা রকম মূল্যবান ধাতুর খনি রয়েছে। আল্লামা হামদানী তাঁর গ্রন্থ 'সিফাতুল আরব'-এ একেকটি খনিকে চিহ্নিত করে দেখিয়েছেন। ঐতিহাসিকগণের বর্ণনামতে কোরাইশ বণিকদের অধিকাংশই স্বর্ণ-রৌপ্যের ব্যবসা করত। বার্টেন সাহেব নামক জনৈক ইউরোপীয় লেখক মাদ্ইয়ানের স্বর্ণ খনির আলোচনায় একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। (ইদানীং আরবের সর্বপ্রধান খনিজদ্রব্য হল স্বর্ণ, তেল ও পেট্রোলজাত দ্রব্যাদি।[১]

প্রাচীন ইতিহাসের গোড়ার কথা

ইসলাম-পূর্ব আরবের ঐতিহাসিক উৎস ঃ

১। জাহেলীয় যুগের গ্রন্থরাজি, যা হীরার শাহী গ্রন্থাগারে সুরক্ষিত ছিল এবং পরে আল্লামা ইবনে হিশামের হস্তগত হয়েছিল, তিনি তাঁর গ্রন্থ কিতাবুত্তিজানে সেসবের উল্লেখ করেছেন।

২। প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত মৌখিক বর্ণনা ও লোককাহিনী। আরবদের স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। জাহেলীয় যুগের আরবী কবিতার যে বিপুল সম্ভার আজ পর্যন্ত বর্তমান রয়েছে, সেগুলো ইসলামী যুগ পর্যন্ত মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে চলে আসছিল। এভাবে আরবের প্রাচীন ইতিহাসের যথেষ্ট সম্পদ সুরক্ষিত থাকে। প্রাচীন আরবের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহ, যেমন 'তুস্‌ম' 'জুদাইস', 'আ'দ', 'সামুদ' সম্পর্কেও এমন ঐতিহাসিক বর্ণনা সুরক্ষিত ছিল, যার ভিত্তিতে ইসলামী যুগের ইতিহাসবিদগণ প্রাচীন আরবের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যেমন ইতিহাসবিদ হিশাম কাল্‌বী 'তুস্‌ম', 'জুদাইস', ইয়ামনের 'তুব্বা' এবং আরবের প্রাচীন রাজা-বাদশাহদের সম্পর্কে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ইবনে নাদীম ফেহ্‌রেস্ত নামক গ্রন্থের ৯৬ পৃষ্ঠায় সেসবের উল্লেখ করেছেন।

৩। রাজা-বাদশাহদের কাহিনী ছাড়াও জাতি-সম্প্রদায় এবং আরব স্থাপত্য-শিল্পের বর্ণনাযুক্ত জাহেলী যুগের কবিতাসমষ্টি। 'সেফাতুয্‌-যীরাতিল আরব' এবং 'মো'জামুল্‌-বুল্‌দান' গ্রন্থে সেসব কবিতার বিরাট ভাণ্ডার মওজুদ রয়েছে। এ সমস্ত পুরাতন বর্ণনার ভিত্তিতেই আল্লামা হামদানী 'ইকলীল'[২] নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। উক্ত গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে কেবল হিমইয়ার বংশীয় বাদশাহদের অতীত স্মৃতি এবং স্মৃতিফলকের বর্ণনা রয়েছে।

---

১. Gold mines of medion.

২. বৈরুতে প্রকাশিত "তাবাকাতুল-উমাম" নামক পুস্তকে উক্ত গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

৪। ইউরোপের পুরাতন গ্রন্থরাজি। যেমন— গ্রীক গ্রন্থকারগণ খৃষ্টপূর্ব চার শতকের 'থিয়েফ্রেস্ট' থেকে 'বাৎলামিয়োস' পর্যন্ত বহু আরব গোত্রের আবাসস্থল এবং অধিবাসীদের নামও বর্ণনা করেছেন। অতি সংক্ষিপ্ত হলেও রোমান ঐতিহাসিক প্লিনিও আরবদের সম্পর্কে যথেষ্ট উপাদান লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

৫। প্রাচীন আরবের ধ্বংসপ্রাপ্ত দালান-কোঠার স্মৃতিফলক, যা প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ খুঁজে বের করেছিলেন। অধুনা ইউরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বিপুলসংখ্যক অনুরূপ স্মৃতিফলক সংগ্রহ করেছেন।

আরবের বিভিন্ন জাতি এবং গোত্র

ঐতিহাসিকগণ আরবের বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায়কে তিনি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যথা ঃ

আরবে বায়েদা ঃ আরবের প্রাচীনতম গোত্রসূমহ, যারা ইসলাম-পূর্ব যুগেই ধ্বংস হয়ে যায়।

আরবে আরেবা ঃ আরবে বায়েদার ধ্বংসপ্রাপ্তির পর বনী-কাহ্তান ছিল আরবের আসল বাসিন্দা। তাদের আদি বাসস্থান ছিল ইয়ামন।

আরবে মুস্তা'রেবা ঃ বনী-ইসমাঈল, অর্থাৎ, হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর, যারা বাইরে থেকে এসে হেজাযে বসতি স্থাপন করেছিলেন। ইসলামের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত আদনানী বলে কথিত বনী-কাহ্তান এবং বনী ইসমাঈলই আরব দেশের প্রকৃত অধিবাসী ছিল। এতদ্ব্যতীত স্বল্পসংখ্যক ইহুদী অধিবাসীও ছিল। সুতরাং দেখা যায়, তৎকালীন আরবের অধিবাসীরা বিভিন্ন তিন জাতিরই সমষ্টি। প্রত্যেকটি জাতি অসংখ্য শাখা-গোত্রের সমন্বয়ে গঠিত। এসব গোত্র ইয়ামন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের আবার আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা ছিল। এ পুস্তকের স্থানে স্থানে যেহেতু তাদের নামের উল্লেখ থাকবে, কাজেই এখানে তাদের সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নক্শা তুলে ধরা হল।

বনী-কাহ্তান ঃ এ খান্দানের তিনটি বড় শাখা আছে। (১) ফাজায়া, (২) কাহ্লান, (৩) ইজ্দ। এতদ্ব্যতীত ইয়ামনের শাহী খান্দান হিমইয়ারও এরই একটি শাখা ছিল। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।

(১) ফাজায়ার শাখা-গোত্রসমূহ ঃ সাধারণ বংশপরম্পরাবিদগণ ফাজায়া গোত্রকে বনী-কাহ্তানের অন্তর্ভুক্ত মনে করে থাকেন। আমরাও এখানে তাদেরই অনুসরণ করব। অবশ্যই প্রকৃতপক্ষে তারা বনী-ইসমাঈলেরই অন্তর্ভুক্ত। নিম্নলিখিত গোত্রসমূহ তাদের শাখা-গোত্র।

বনী-কলব, বনী-তুনখ, বনী-জুরহাম, বনী-জুহাইনা, বনী-আজ্‌রা, বনী-আসলাম, বনী-বিলা, বনী-বলীহ্‌, বনী-জাজ্‌আম, বনী-তাগ্‌লেব, বনী-নামীর, বনী-আসাদ, বনী-তাইমিল্লাত, বনী-কালব।

(২) কাহ্‌লানের শাখা-গোত্রসমূহ ঃ বুজাইলা, খাসআম, হামদান, কিন্দা, জ্জ, তায়ী, নজ্‌ম, জুযাম, আমেলা।

(৩) ইজদের শাখা-গোত্রসমূহ ঃ (আনসারগণ এ গোত্রেরই শাখা ছিলেন।) আওস, খাযরাজ, খোযাআ, গাস্‌সান, দাওয়াস।

সুপ্রসিদ্ধ আদনানী গোত্রসমূহের সর্বশেষ শাখাটি, যা 'বনী-খান্দাফ' ও 'বনী-কায়স' নামক দু'শাখাগোত্রে বিভক্ত ছিল, তা হচ্ছে বনী-মুজার।

(১) খান্দাফ

খান্দাফ গোত্রটি নিম্নের শাখা-গোত্রসমূহে বিভক্ত হয়েছিলঃ হুযাইল, কেনানা, আসাদ, সানাবা, মুযাইনা, রুবাব, তামীম ও হাওয়ান। তাদের প্রত্যেকটিরও আবার শাখা-প্রশাখা রয়েছে। যেমন—

মূল	শাখা
কেনানা	কোরাইশ, দুওয়াল।
হাওয়ান	ক্বারা
রুবাব	আদী, তাইম, উকুল ও সাওর।
তামীম	মাকাইস, কুরাই, বাহ্‌দালহ্‌, ইয়ারবু', রিয়াহ্‌, সা'লাবা, ও কল্‌ব।

(২) কায়স

কায়েস গোত্রে এ কয়টি শাখা রয়েছে। যথা ঃ আদওয়ান, গাত্‌ফান, আ'সর, সুলাইম ও হাওয়াযিন। এদের কোন কোনটির আবার একাধিক শাখা রয়েছে। যথা—

মূল	শাখা
গাত্‌ফান	আবাস, যুবিয়ান, ফাযারা, মুর্‌রা।
আসর	গনী, বাহেলা
হাওয়াযিন	সা'দ, নসর, হুসাইম, সাকীফ, সালুল, বনী-আমের। আমের গোত্রের আরও কয়েকটি শাখা রয়েছে। যথা—বনী-হেলাল, বনী-মিয়ার বনী-কা'ব।

ইহুদী

আরবের ইহুদিগণ নিম্নের কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত ছিল—

বনী-কায়নুকা, বনী-নযীর, বনী-কোরাইযা। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বনী-কাহ্তান, বনী-ইসমাঈলরা এমন কয়েকটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, যার সামান্য কিছু বর্ণনাই পাওয়া যায়।

আরবের প্রাচীন রাজ্যসমূহ ঃ পুরাতন স্মৃতিফলক এবং ইতিহাসবিদগণের বর্ণনায় প্রমাণিত হয় যে প্রাক-ইসলামী যুগের আরব দেশে পাঁচটি সুসভ্য রাষ্ট্র-শক্তির উত্থান-পতন ঘটেছে।

(১) মায়ীনী রাজ্য—মায়ীন ইয়ামনের একটি জায়গার নাম। এককালে এটি এ রাজ্যের রাজধানী ছিল।

(২) সাবায়ী রাজ্য—অর্থাৎ, সাবা জাতির প্রতিষ্ঠিত রাজ্য।

(৩) হাযারা-মাওতী রাজ্য—হাযারা-মাওত ইয়ামনের একটি বিখ্যাত স্থান।

(৪) কাতবানী রাজ্য—কাতবান এডেনের একটি নগরীর নাম। অধুনা এই নগরীটি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত।

(৫) নাবেত্তী রাজ্য—হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর এক পুত্রের নাম ছিল নাবেত। তাঁর নাম অনুসারেই এ রাজ্যের নামকরণ করা হয়েছিল।

মায়ীনী রাজ্য ঃ এ রাজ্যটি দক্ষিণ আরবে অবস্থিত ছিল। এর প্রধান নগরী ছিল কার্ণ এবং মায়ীন। প্রাচীন স্মৃতিফলকের মাধ্যমে এ রাজ্যের অন্যূন পঁচিশ জন শাসনকর্তা সম্পর্কে জানা যায়। মায়ীনী এবং সাবায়ী রাজ্য দুটি সমসাময়িক ছিল কিনা সে ব্যাপারে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কারও মতে মায়ীনী রাজ্যটি বহু প্রাচীন। এটি খৃষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু কারও বর্ণনাতেই খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে মায়ীনী রাজ্যের কোন স্মৃতিফলক পাওয়া যায় না। সুতরাং মায়ীনী এবং সাবায়ী রাজ্য দুটি একান্তই সমসময়িক ছিল বলে মনে হয়।

সাবায়ী যুগ ঃ পুরাতন স্মৃতিফলকের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে এ রাজ্যটি বিদ্যমান ছিল। এর রাজধানী ছিল 'মাআবির'। এ সময়ের তৈরি যে বিপুলসংখ্যক স্মৃতিফলক বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলোর সাহায্যে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে এ রাজ্যটির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। এ যুগের পরেই শুরু হয় হিমইয়ারী যুগ। হিমইয়ারিগণ রাজ্যটি দখল করেই মাআরিব শহরকে রাজধানীতে পরিণত করেছিল।

খৃষ্টপূর্ব প্রায় ১১৫ বছর পূর্বে হিমইয়ারিগণ সাবায়ী রাজ্যটি দখল করে নিয়েছিল। পুরাতন স্মৃতিফলকের মাধ্যমে ছাব্বিশ জন হিমইয়ারী শাসনকর্তার সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের কোন কোন স্মৃতিফলকে সন-তারিখ পর্যন্ত উৎকীর্ণ ছিল। তাদের শাসনকালে রোমান রাজশক্তি আরব দেশে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এটাই ছিল তাদের প্রথম এবং শেষ চেষ্টা। এ. লিস্গল্স নামক একজন রোমান অভিযানকারী হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের ১৮ বছর পূর্বে আরবদেশ আক্রমণ করেছিল। কিন্তু এ আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। পথপ্রদর্শক প্রতারণাপূর্বক তাকে ঊষর মরুভূমিতে নিয়ে যায়। বালুকাময় স্থানে পৌঁছে আক্রমণকারীর সমস্ত সৈন্য ধ্বংস হয়ে যায়।[১]

হিমইয়ারিগণ ইহুদীধর্ম গ্রহণ করেছিল। প্রায় এ সময়ই আবিসিনিয়ার অধিবাশীগণ দক্ষিণ আরবে রাজ্য স্থাপন করতে শুরু করেছিল। তারা এককালে হিমইয়ারীদেরকে পরাজিত করে নিজেদের স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। অধুনা সে যুগের একটি স্মৃতিফলক পাওয়া গেছে। তাতে লেখা আছে ঃ

"রহমান, মসীহ্ এবং রূহুলকুদ্স (পবিত্র আত্মা)-এর শক্তি, দয়া ও অনুগ্রহে আবিসিনিয়ার রাজপ্রতিনিধি আব্রাহা এ স্মৃতিফলক উৎকীর্ণ করেছেন।

সাবায়ী ও হিমইয়ারীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং বিজয়-কাহিনী আরব দেশে এত ব্যাপক আকারে প্রচারিত রয়েছে যে কারও পক্ষে মূল বিষয়টি অস্বীকার করার উপায় নেই। আরবী গ্রন্থসমূহেও সেসব অনেক ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। হিমইয়ারী বাদশাহগণ ইরান সীমান্তবর্তী সমস্ত এলাকা অধিকার করে নিয়েছিল বলে আরবদের ধারণা।

যুল্কারনাইন ঃ সাধারণত যাকে সেকান্দর বলা হয়, আরবদের ধারণা অনুযায়ী তিনি হিমইয়ারী বংশেরই একজন প্রতিপত্তিশালী নরপতি ছিলেন। ফেরদৌসীর শাহ্নামায় বর্ণিত আছে, ইরানের বাদশা কায়কাউসকে হামাওয়ারান বাদশাহ্ গ্রেফতার করেছিলেন। অধুনা ইউরোপ থেকে প্রকাশিত আল্লামা সা'লাবীর লেখা ইরানের ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে যে হামাওয়ারান ছিলেন হিমইয়ারী বাদশাহ্। প্রকৃতপক্ষে "হামাওয়ারান" শব্দটি আরবী "হিমইয়ার" শব্দেরই রূপান্তর। আল্লামা সা'লাবী লিখেছেন যে ফেরদৌসীর বর্ণনানুযায়ী

১. এ আলোচনার সবটুকু এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকায় জি. ডবলিও থিওসার সাহেবের লেখা প্রবন্ধ থেকে নেয়া হয়েছে। এতদ্ব্যতীত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রিনল্ড নিকল্সন সাহেবের লেখা 'লিটারারী হিস্টরী অব দি এরাব্স"-এর ৪-৬ পৃঃ দৃষ্টব্য।

সিয়াউসের প্রেমে পড়া কায়কাউসের পত্নী সৌদায়া (سودابة) ছিল হিমইয়ারের রাজকুমারী। তার প্রকৃত নাম ছিল সু'দা (سعدى)। ইরানীরা সু'দা শব্দটিকেই সৌদায়া উচ্চারণ করত। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অনুসন্ধানের মাধ্যমেও উন্নতমানের সাবায়ী এবং হিমইয়ারী সভ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। জার্মানীর বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ প্রফেসর নোলডেকী (Noldeky) লিখেছেন ঃ

"ঈসা (আঃ)-এর জন্মের হাজার বছর পূর্বে দক্ষিণপশ্চিম আরবে অর্থাৎ, ইয়ামনে যে হিমইয়ারী এবং সাবায়ী রাজ্য দুটির অস্তিত্ব ছিল, সেটি গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাতের দরুন কৃষি উৎপাদনের খুবই উপযোগী ছিল। এই রাজ্যটি সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নত স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল। এর বিপুলসংখ্যক স্মৃতিফলক এবং প্রাসাদসমূহের ধ্বংসাবশেষ দেখে প্রাণ খুলে তাদের প্রশংসা করতে ইচ্ছে হয়। তাই গ্রীক এবং সুসভ্য রোমানগণ তাদেরকে 'ধনী আরব' বলে আখ্যায়িত করে ভুল করেনি।"

তওরাতে অনেক স্থানেই এমন সব বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে, যা সাবা জাতির প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং শান-শওকতের সাক্ষ্যদান করে। এ প্রসংগে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর সাথে সাবার রানী বিলকীসের সাক্ষাতের কাহিনী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। (১ সালাতীন পুস্তক, ১০ আয়াত, ১ হতে ১০ আয়াত) প্রাচ্যবিদ ডাউটি এবং ইউটিং সাহেবের গবেষণার ফলে আমরা 'সামূদ' জাতির দালান-কোঠার পরিচয়ও পেয়েছি। "সামূদ জাতির সাথে নানা দিক দিয়ে যে নাবেত জাতির মিল রয়েছে, তারাও সম্ভবত নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাথমিক শিক্ষা সামূদ জনগোষ্ঠীর নিকট থেকেই পেয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। সাবায়িগণ প্রাথমিক যুগেই উত্তরাঞ্চল যে লেখনপদ্ধতি শিখেছিল, পরে তাই তারা আরব দেশের সর্বত্র সর্বস্তরের কাজকর্মে চালু করেছিল এবং দামেশক থেকে আবিসিনিয়া পর্যন্ত প্রচার করেছিল।"[১]

নাবেতী রাজ্য ঃ নাবেতী রাজ্যের সীমা সিরিয়ার সাথে মিলিত ছিল। নাবেতীরা সামূদ জাতির স্থলবর্তী ছিল। তাদের সম্পর্ক ফ্রস্টার সাহেব তাঁর ভৌগোলিক বিবরণ সংবলিত পুস্তকে লিখেছেন ঃ

"এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনার দ্বারা জানা গেল যে প্রাচীনকালে নাবেতের নাম-ডাক ও প্রভাব-প্রতিপত্তি শুধু মরুভূমির উপরই ছিল না, বরং হেজায এবং নজদের মত

১. বিশ্ব ইতিহাস ৮ম খণ্ড অর্থাৎ "হিস্টোরিয়ান হিস্টরী অব দি ওয়ার্ল্ড"-এর ভূমিকায় লেখা প্রফেসর নোলডেকীর প্রবন্ধের ৫ম পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বিরাট প্রদেশসমূহও তাদের করতলগত ছিল। নাবেতীরা একদিকে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যে পারদর্শী ছিল, তেমনি অন্যদিকে সত্যিকারের বনী-ঈসমাইল হওয়ার কারণে সর্বদা যুদ্ধের ঝুঁকি নেয়ার জন্যও প্রস্তুত থাকত। প্যালেস্টাইন এবং সিরিয়ার উপর তাদের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ এবং আরব উপসাগরে মিসরীয় নৌযানসমূহে লুটতরাজ তাদের বিরুদ্ধে মাকদুনিয়ার বাদশাহকে বারবার উত্তেজিত করে তুলত। কিন্তু রোমান সম্রাটের সামগ্রিক শক্তি অপেক্ষা দুর্বল কোন শক্তি তাদের প্রতিরোধ করতে সক্ষম ছিল না। আর সম্রাট স্টাবুরের আমলে তারা একান্ত অক্ষমতাবশত রোমানদের আনুগত্য স্বীকার করলেও তারা ছিল সন্দিগ্ধ।"[১]

এ ছিল প্রাচীন আরব রাজ্যসমূহের অবস্থা। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই এ সমস্ত রাজ্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। রাজা-বাদশাহর স্থলে ইয়ামনে বড় বড় সরদার রয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে কাইল অথবা মিকওয়াল বলা হত। ইরাকে আলে-মুনযের বংশীয়রা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তারা ছিল পারস্যের প্রভাবাধীন। আরব দেশের বিখ্যাত খুরনাক এবং সাদীর প্রাসাদসমূহ সে আমলেরই স্মৃতিচিহ্ন। সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকার শাসনকর্তা ছিল গাসস্‌সান বংশীয় বাদশাহগণ। তারা ছিল রোমান সম্রাটের প্রভাবাধীন। এ বংশের সর্বশেষ শাসনকর্তা ছিল জাবালা ইবনে আইহাম গাস্‌সানী।

আরবের তাহযীব-তমদ্দুন

এলাকা এবং গোত্রের বিভিন্নতার ভিত্তিতে আরবের তাহযীব-তমদ্দুন ছিল বিভিন্ন ধরনের। "তামাদ্দুনে-আরব" গ্রন্থের লেখক ফরাসী পণ্ডিত মঁসিও লিবন মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে "ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে কোন এক সময়ে আরবের তাহযীব-তমদ্দুন উন্নতির চরমে পৌঁছেছিল। কেননা, সভ্যতার ক্রমবিকাশের নীতি অনুযায়ী কোন জাতিই হঠাৎ করে একান্ত অসভ্য অবস্থা থেকে চরম উন্নত সভ্য অবস্থায় উপনীত হতে পারে না।"

এটা একটা আনুমানিক যুক্তি। ইতিহাস থেকে এতটুকু অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে আরব দেশের কোন কোন এলাকা যথা— ইয়ামন এক সময়ে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছিল। যে সমস্ত ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ ইয়ামনের প্রাচীন যুগের ভগ্নাবশেষ, শিলালিপি, মুদ্রা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করেছেন, তাঁরা একদা ইয়ামনের সভ্যতা ও সংস্কৃতির চরম বিকাশের কথা অবশ্যই স্বীকার করেন।

১. রেভারেণ্ড ফ্রস্টারের আরবের ঐতিহাসিক ভূগোল ১ম খণ্ড পৃঃ ২২০-২২৮।

'ইয়াকুত হামাভী' মো'জাম নামক গ্রন্থে সানআ' এবং 'কলিস' শহরের আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্ময়কর ধরনের অতি পুরাতন বহু ভগ্নাবশেষের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনায় অতিরঞ্জন থাকলেও তাতে বাস্তবতার অংশও নিতান্ত কম নয়।

অনুরূপভাবে ইরান ও সিরিয়ার সীমান্তবর্তী আরবীয় অঞ্চল, যথা— নো'মান বংশীয়দের রাজধানী 'হাইরা' এবং গাস্‌সান বংশীয়দের রাজধানী "হাওরান" তাহ্‌যীব-তমদ্দুনশূন্য ছিল না।

আরব ইতিহাসবিদগণ দাবি করেন যে এক সময়ে ইয়ামন এমনি উন্নতি করেছিল যে সেখানকার শাসক সম্প্রদায় সমগ্র ইরানেও আধিপত্য বিস্তার করেছিল। সমরকন্দের নাম "সমরকন্দ" হল কেন তার কারণ প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন যে ইয়ামনের এক বাদশার নাম ছিল "সমর"। তিনি মাটি খুঁড়ে সমরকন্দ নগরীকে ধ্বংস করেছিলেন। এ কারণে ইরানীরা এ স্থানটিকে شمركند (সমরকন্দ) বলত। পরবর্তীকালে আরবী ভাষায় এ শব্দটিই سمرقند এ রূপান্তরিত হয়। এখন পর্যন্তও আরব ভূখণ্ডের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত বিরাট বিরাট কেল্লা এবং দালানকোঠার ভগ্নাবশেষ প্রমাণ করে যে অতীতে কোন এক সময়ে এ দেশে অতি উন্নতমানের এক সভ্যতা বিরাজমান ছিল। আল্লামা হামদানী "ইক্‌লীল" গ্রন্থে এ সময় প্রাচীন ভগ্নাবশেষের উল্লেখ করেছেন। তিনি 'সিফাতুয-যীরাতিল আরব' অধ্যায়ে লিখেছেন ঃ

"আরব কবি ও সাহিত্যিকগণ তাঁদের কবিতা ও সাহিত্যে ইয়ামনের যে সমস্ত বিখ্যাত প্রাসাদের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো সংখ্যায় অনেক। সেসবের বর্ণনাসংবলিত একটি কবিতা অধ্যায় রয়েছে। ইক্‌লীল গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে তা সন্নিবেশিত হয়েছে।"

অতঃপর উক্ত গ্রন্থকার লিখেছেন ঃ আমি এখানে শুধু কতকগুলো প্রাসাদের নাম বর্ণনা করছি। যথা—গুমদান, বুল্‌গাম, নায়েত, সিরওয়াহ, সাল্‌হীন, জাফার, হাকার, জাহার, শেবাম, গায়মান, বাবনুন, রিয়াম, বারাকেশ, মায়ীন, রাওসান, আরবাব, হিন্দ, হানীদাহ, ইমরান, বোখাইর।" এ কয়টির মধ্যে 'গুমদান' এবং 'নায়েতের' বিস্তারিত বিবরণ "মোজামুল-বুলদান গ্রন্থে" বর্ণিত আছে এবং এর বিরাটত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এমন সব বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে যে সেগুলো এশীয়দের স্বভাবসুলভ অতিরঞ্জন বলেই মনে হয়। "সালহীন" সম্পর্কে লেখা আছে যে সতের বছরে এর নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। 'শেবাম' সম্পর্কে লেখা হয়েছে لهم فيه حصون عجيبة لها ثلة তাতে তাদের বহুসংখ্যক অত্যাশ্চর্য এবং সুদৃঢ় দুর্গ রয়েছে।

'নায়েত' দুর্গটি মোহাদ্দেস ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহের কাল পর্যন্ত বর্তমান ছিল। তিনি এর একটি প্রাচীন শিলালিপি পাঠ করে জানতে পেরেছিলেন যে সেটি ষোল শত বছর পূর্বে নির্মিত হয়েছিল। অধুনা ইউরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সরেজমিনে অনুসন্ধানকার্য চালানোর ফলে এমন সব উন্নত সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, যা ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়। থিউচার সাহেব এক প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

"দক্ষিণ আরবে যেখানে হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে একটি উন্নতমানের সভ্যতা বিরাজমান ছিল, সেখানে আজও বহুসংখ্যক দুর্গ এবং প্রাচীরবেষ্টিত নগরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। বহু পর্যটক সে সমস্ত বর্ণনা দিয়েছেন। ইয়ামন এবং হাযরা-মাওতেও অনেক প্রাচীন ভগ্নাবশেষ দেখা যায় এবং অধিকাংশগুলোর উপরই এখন পর্যন্তও প্রাচীন লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে।"

ইয়ামনের রাজধানী সানআর সন্নিকটে একটি সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। আল্লামা কাজভেনী স্বীয় গ্রন্থ "আসারুল-বুলদানে" সেটিকে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের এক আশ্চর্যরূপে উল্লেখ করেছেন। (অন্যান্য দুর্গ সম্পর্কে জানতে চাইলে জার্মান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি জার্নাল নামক পুস্তকের দশম খণ্ডের পৃঃ ২০ দেখুন।) প্রাচীন সাবায়ী রাজ্যের রাজধানী 'মাআরিবের' ভগ্নাবশেষ পাশ্চাত্য পণ্ডিত আরনিভ হালিওয়ে এবং গ্লোজার সাহেব প্রত্যক্ষ করার পর লিখেছেন যে "মাআরিবের বিখ্যাত ভগ্নাবশেষগুলোর মধ্যে একটি বিরাট পরিখার ভগ্নাবশেষ এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। সেসব দেখলে এডেন বন্দরে দ্বিতীয়বারে তৈরি হাউজটির কথাই মনে পড়ে। এসবের গুরুত্ব সে সময় প্রকাশ হল, যখন গ্লোজার সাহেব দুটি সুদীর্ঘ স্মৃতিফলকের বিবরণ প্রকাশ করলেন, যে দুটিতে লেখা ছিল, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় দফায় এর নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে।

ইয়ামনের 'হাররান' নামক স্থানে প্রায় ৪৫০ ফুট দীর্ঘ একটি পরিখা রয়েছে। কিন্তু আরবের মূল এবং অভ্যন্তরীণ এলাকার তাহযীব-তমদ্দুনের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। আরবী ভাষা শব্দসম্ভারে পরিপূর্ণ এবং অত্যন্ত ব্যাপকতর হওয়া সত্ত্বেও তামদ্দুনিক এবং সমাজব্যবস্থার উপায়-উপকরণ সম্পর্কীয় বিষয়াদির জন্য খাস আরবী শব্দ পাওয়া যায় না, বরং যা কিছু আছে তা ইরান এবং রোম থেকে ধার করা, মুদ্রা বুঝাবার জন্য কোন শব্দই নেই। দেরহাম এবং দীনার দু-ই বিদেশী ভাষার শব্দ। 'দেরহাম' গ্রীক ভাষার 'দেরখাম' শব্দের রূপান্তর। আর এ শব্দটিই ইংরেজি ভাষায় ড্রাম (Dram)-এ রূপান্তরিত হয়েছে। চেরাগ একটি সার্বজনীন প্রয়োজনীয় বস্তু হওয়া সত্ত্বেও আরবী ভাষায় এর জন্য কোন স্বতন্ত্র শব্দ ছিল না। তাই ফার্সী চেরাগকেই সেরাজে রূপান্তরিত করে আরবী ভাষায় ঢুকানো

হয়েছে। অনুরূপ একই বুঝাবার জন্য (مصباح) মেসবাহ-এর ন্যায় একটি কৃত্রিম শব্দ গঠন করতে হয়েছে। মেসবাহ (مصباح) শব্দের অর্থ হচ্ছে— প্রাতঃকাল করার যন্ত্র। কুঁজা বা জগ বুঝাবার জন্য কোন শব্দ না থাকায় ফার্সী كوزه হতে كوز বানানো হয় বদনাকে ইবরীক (ابريق) বলা হয়। এটি ফার্সী আবরীয় (ابريز) শব্দেরই রূপান্তর। অনুরূপভাবে তশ্‌ত (تشت) একটি ফার্সী শব্দ (অর্থ চিলমচি)। আরবীতে একে طشت বানানো হয়েছে। পেয়ালাকে আরবীতে كاس বলা হয়। এটিও আসলে ফার্সী كاسه থেকে নেয়া। ফার্সী কোর্তাকে আরবীতে কোর্তাক (قرطق) বলা হয়। পায়জামাকে 'সেরওয়াল' বলা হয়। তাও প্রকৃতপক্ষে ফার্সী শেলওয়ারেরই বিকৃত রূপ।

যে ক্ষেত্রে অনুরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুসমূহের জন্যই 'শব্দ' ছিল না সে ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী তামদ্দুনিক বিষয়াদি এবং বস্তুসম্ভার বুঝাবার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দের উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন আসা খুবই স্বাভাবিক। এতে প্রমাণিত হয় যে আরবগণ কোনকালে যে উন্নতি করেছিল তা প্রতিবেশী দেশসমূহের তাহ্‌যীব-তমদ্দুনের প্রভাব ছিল বিস্তর ও সুদূরপ্রসারী। একই কারণে সে সমস্ত দেশ থেকে দূরবর্তী এলাকাসমূহ আসলে প্রাকৃতিক অবস্থায়ই রয়ে গেছে। অনেক বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময় পর্যন্ত তার পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে আরাম-আয়েশের উপায়-উপকরণ অতি অল্পই ছিল। পর্দার হুকুম নাযিল হওয়া প্রসঙ্গে বোখারী শরীফ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের বর্ণনায় জানা যায় যে তখন পর্যন্ত বাড়ি সংলগ্ন পায়খানার ব্যবস্থা ছিল না। ফলে, স্ত্রীলোকদেরকেও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য বাড়ির বাইরে যেতে হত। তিরমিযী শরীফের 'বাবুল ফাক্‌র' বা দারিদ্র্যের বর্ণনা অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে তখন পর্যন্ত চালনির প্রচলন ছিল না। ফুঁক দিয়ে ভুসি উড়িয়ে দেয়ার পর যা থাকত তাই আটা রূপে ব্যবহৃত হত। বোখারী শরীফের এক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তখন রাত্রিতে ঘরে প্রদীপ জ্বলত না। আবু দাউদ শরীফে জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহচর্যে বেশ কিছুদিন ছিলাম। কিন্তু আমি তাঁকে মাটির নিচে বসবাসকারী ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোন জীব-জন্তুকেই হারাম বলে ঘোষণা করতে শুনিনি। যদিও হাদীসবেত্তাগণ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে "বিশেষ একজন বর্ণনাকারী শুনেননি বলে একথা প্রমাণিত হয়নি যে, প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মৃত্তিকাগর্ভের জীবজন্তুকে হারাম বলে ঘোষণা করেননি। তবে এ হাদীস দ্বারা এতটুকু অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবগণ মৃত্তিকাগর্ভে বসবাসকারী সব ধরনের জীবজন্তুই ভক্ষণ করত। ইতিহাস এবং

সাহিত্যে স্পষ্টই বর্ণিত আছে যে আরবগণ বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ ও গোসাপ, গিরগিটি, রক্তচোষা ইত্যাদি সরিসৃপ এবং জানোয়ারের চামড়াও ভক্ষণ করত।

আরবদের ধর্মমত ঃ ইসলামপূর্ব আরব দেশে বিভিন্ন ধর্মের প্রচলন ছিল। কিছু লোকের ধারণা ছিল যে যা কিছু হয় তৎসমুদয়ই কালের আবর্তনে অথবা প্রাকৃতিক নিয়মে হয় ; আল্লাহ্ বলতে কোন কিছু নেই। এ প্রকৃতিপূজারী লোকদের সম্পর্কেই কোরআন বলেছে ঃ

"তারা বলে, যা কিছু হয় সবই হল আমাদের দুনিয়ার এ জীবন। আমরা মৃত্যুবরণ করি, জীবনধারণ করি। আমাদিগকে মারলে এ মহাকালই মারে।" (সূরা জাসিয়া ৩য় রুকু)

কিছু লোক আল্লাহ্র অস্তিত্ব বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু তারা কেয়ামত-পরকালের পুরস্কার ও শাস্তি ইত্যাদি অস্বীকার করত। তাদের এরূপ বিশ্বাসের মোকাবেলায় কেয়ামত প্রমাণ করতে কোরআন এরূপ যুক্তি পেশ করেছে —

"(হে নবী!) তাদেরকে বলে দিন, পুরাতন অস্থিসমূহকে তিনিই পুনঃসৃষ্টি করবেন, যিনি প্রথমবারে সৃষ্টি করেছিলেন।" (সূরা ইয়াসীন-৫ রুকু)

কিছু লোক আল্লাহ্ এবং পরকালের পুরস্কার এবং শাস্তিতে বিশ্বাস করত। কিন্তু তারা নবুওত অস্বীকার করত। নিম্নের আয়াতে তাদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে—

"তারা বলে যে এ আবার কেমন রসূল, যিনি পানাহারও করেন এবং বাজারেও চলাফেরা করেন!"

"তারা বলে যে আল্লাহ্ কি মানুষকেই শেষ পর্যন্ত নবীরূপে প্রেরণ করলেন?"

তাদের ধারণা ছিল যে অগত্যা কেউ নবী হলে তিনি মানুষ না হয়ে বরং ফেরেশতা হতে পারেন, যিনি মানবীয় প্রয়োজনমুক্ত থাকবেন। সাধারণত এসব লোক প্রতিমাপূজক ছিল। তারা প্রতিমাকে আল্লাহ্ মনে করত না, বরং আল্লাহ্র সান্নিধ্যলাভের মাধ্যম মনে করত।[১]

(তারা বলে) "আমরা এ সমস্ত দেব-দেবীর উপাসনা এ জন্যই করি যে তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে পৌছে দেবে।" (সূরা যুমার, ১ম রুকু)

---

১. শহরস্তানীর "মিলাল ও নহল"-এর "মাযাহেবে আরবা" অধ্যায়ে এসব বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

ইয়ামন দেশের হিমইয়ার গোত্রীয়গণ সূর্যপূজক ছিল। কেনানা গোত্রের লোকেরা চন্দ্রের পূজা করত। বনী তামীম গোত্রীয়গণ 'দুরবান' নামক দেবতার উপাসনা করত। অনুরূপভাবে কায়েস গোত্র, উতারুদ (বুধ) তারকার এবং নজম ও জুযাম গোত্রের লোকেরা "মুশ্‌তরী" তারকার উপাসনা করত।[১]

প্রসিদ্ধ দেব-দেবী এবং তাদের পূজারীদের নামের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেয়া হল।[২] ঃ

দেব-দেবীর নাম	স্থানের নাম	দেব-দেবীর উপাসক-গোত্রের নাম
লাত	তায়েফ	সাকীফ
ওয্যা	মক্কা	কোরাইশ ও কেনানা
মানাত	মদীনা	আওস, খায্‌রাজ ও গাসসান
ওয়াদ্দ	দুমাতুল জন্দল	কল্‌ব
সুওয়া		হুযাইল
ইয়াগুস		মযহজ ও ইয়ামনের কোন কোন গোত্র
ইয়াউক		হামদান

সর্ববৃহৎ প্রতিমাটির নাম ছিল হুবল। এটি কাবার ছাদের উপর স্থাপিত ছিল। কোরাইশরা যুদ্ধের সময় এর নামে জয়ধ্বনি করত।

আরব দেশে সর্বপ্রথম প্রতিমা পূজার ভিত্তিস্থাপন করে আমর ইবনে লুহাই নামক এক ব্যক্তি। তার আসল নাম ছিল 'রাবেয়া' ইবনে হারেসা। আরবের প্রসিদ্ধ গোত্র 'বনী-খোজাআ" তারই অধস্তন বংশধর। আমরের পূর্বে জুরহুম নামক এক ব্যক্তি কাবাগৃহের তত্ত্বাবধায়ক ছিল। আমর জুরহুমকে যুদ্ধে পরাজিত করে মক্কা হতে বিতাড়িত করে নিজেই তত্ত্বাবধায়কের সম্মানিত পদটি দখল করে নেয়। সে একদা সিরিয়ার কোন এক শহরে গিয়ে দেখল, সেখানকার লোকেরা প্রতিমাপূজা করছে। তখন সে তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কেন এদের পূজা কর?" উত্তরে তারা বলল, "এরাই তো আমাদের প্রয়োজন পূরণকারী। যুদ্ধবিগ্রহে এরাই আমাদেরকে বিজয় দান করে থাকে। দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি দেখা

১. ইবনে সায়েদ আন্দুলসী লিখিত তাবাকাতুল উমাম। ১৯১২ সনে বৈরুত থেকে প্রকাশিত।
২. প্রতিমার এসব তফসিলী বর্ণনা "মিলাল ও নিহল" এ বর্ণিত হয়েছে।

দিলে এরাই বৃষ্টিবর্ষণ করে থাকে।" এসব শুনে আমর তাদের কাছ থেকে কয়েকটি প্রতিমা চেয়ে আনল এবং সেগুলোকে কা'বাগৃহের চারপাশে স্থাপন করল। যেহেতু কাবাগৃহ ছিল সারা আরব দেশের কেন্দ্রস্থল, তাই সমস্ত আরব গোত্রে অনায়াসেই প্রতিমাপূজার প্রচলন হয়ে গেল।

এসব প্রতিমার মধ্যে সর্বাধিক পুরানো ছিল "মানাত"। একে সাগর পাড়ে কাদীদ নামক স্থানের সন্নিকটে স্থাপন করে রাখা হয়েছিল। মদীনার আওস ও খায্‌রাজ গোত্রীয় লোকেরা এর নামে বলিদান করত। তারা কাবা হতে হজ্ব করে ফেরার পথে এখানে এসে 'এহ্‌রাম' খুলত। হোযাইল এবং খোজাআ' গোত্রের লোকেরাও এরই পূজা করত।[১]

ইয়াকুত হামাভী "মো'জামুল-বুলদান" গ্রন্থে মক্কার আলোচনা প্রসঙ্গে লিখছেন, আরব দেশে প্রতিমাপূজা প্রসার লাভ করার কারণ ছিল এই যে চারদিক থেকে আরব গোত্রের লোকেরা হজ উপলক্ষে মক্কায় আসত। তারা প্রত্যাবর্তনকালে হরম শরীফের কিছু পাথর তুলে নিয়ে যেত এবং কাবাগৃহে রক্ষিত প্রতিমার আকৃতিতে নিজ হাতে প্রতিমা গড়ে সেগুলোর পূজা করত।

আরবদের আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস ঃ সামগ্রিকভাবে আরব জাতি যদিও প্রতিমাপূজক ছিল, তবুও তাদের অন্তর হতে এ বিশ্বাস কোন সময়েই মুছে যায়নি যে প্রকৃতপক্ষে আসল উপাস্য একজন আছেন যিনি অতি মহান এবং তিনিই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। এ মহান সৃষ্টিকর্তাকে তারা "আল্লাহ্‌" বলত। পবিত্র কোরআনে আছে ঃ

—"আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে এ আসমান-যমীন কে সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকেইবা কে নিয়মের অধীন করে দিয়েছেন ? তবে অবশ্যই তারা বলবে যে আল্লাহ্‌ই তো সৃষ্টি করেছেন। (যদি তাই হয়) তবে তারা উল্টো পথে কোথায় যাচ্ছে" (সূরা আন্‌কাবুত, ৬ষ্ঠ রুকু)

—"আবার যখন তারা নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা আল্লাহ্‌র প্রতি পরিপূর্ণরূপে আনুগত্য প্রকাশ করে, একান্ত নিষ্ঠাসহকারেই তাঁকে ডাকতে থাকে। অতঃপর যখন আল্লাহ্‌ পাক বিপন্মুক্ত করে তাদেরকে স্থলভাগে পৌঁছে দেন, তখন তারা আবার শেরেকী করা শুরু করে।" (সূরা আন্‌কাবুত, ৭ম রুকু)

পবিত্র কোরআন চৌদ্দ শ' বছর পূর্বে যে তত্ত্বটি উদ্‌ঘাটন করেছিল, আজ প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধানের ফলে তার সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

---

১. মো'জামুল বুলদান গ্রন্থে মানাতের আলোচনা প্রসঙ্গে এ সমস্ত কথার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

এন্‌সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার প্রথম খণ্ড ৬৬৪ পৃষ্ঠায় ধর্মতত্ত্ব ও নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনায় বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ "নোলডেকি" (Noldeky) লিখেছেন ঃ

"সাফা পাহাড়ে প্রাচীন লিপির স্মৃতিফলকে যে "আল্লাহ্" শব্দটিকে "আল্লাহ্" রূপে লেখা হয়েছে সে "আল্লাহ্" শব্দটিকে নাবেতী ও প্রাচীন উত্তর আরবের অধিবাসীদের নামের একাংশরূপে ব্যবহার করার বহুল প্রচলন ছিল। যেমন, "জায়েদুল্লাহ্" زيـد । اللّه নাবেতী স্মৃতিফলকে "আল্লাহ্" নামটি একজন পৃথক মাবুদরূপে পাওয়া যায় না, কিন্তু 'সাফা' পাহাড়ের স্মৃতিফলকে বেশ সুস্পষ্টরূপেই পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগের মুশরেকদের মধ্যে আল্লাহ্ নামটি ব্যাপক আকারে প্রচলিত ছিল। বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ওয়েল হাউসেন প্রাচীন আরবী সাহিত্যের এমন অনেক উদ্ধৃতি পেশ করেছেন, সেগুলোর মধ্যে এক মহান উপাস্যরূপে "আল্লাহ" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। নাবেতীয় প্রাচীন লিপিতে আমরা বার বার এমন একজন উপাস্যের নাম পাই, যার সাথে "আল্লাহ্" পদবীটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এতে ওয়েল হাউসেন (Well Hausen) সাহেব এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে যে আল্লাহ্ পদবীটি পূর্বে বিভিন্ন উপাস্যকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হত, তাই পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে এক মহান মাবুদের নামরূপে নির্ধারিত হয়ে যায়।

ইহুদী, খৃষ্ট ও পারসিক ধর্ম

কখন থেকে কিভাবে আরব দেশে এসব ধর্মমত প্রসার লাভ করেছিল তা সঠিক বলা মুশকিল হলেও এ কথা সত্য যে এ তিনটি ধর্মমতই দীর্ঘকাল থেকে আরব দেশে প্রসার লাভ করেছিল। আল্লামা ইবনে কোতাইবা "মা-আরেফ" নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে 'রবীয়া' এবং 'গাস্‌সান' গোত্রদ্বয় খৃষ্টধর্মাবলম্বী ছিল। ফাযা'আ গোত্রেও এ ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। খৃষ্টধর্মমতের এত অধিক উন্নতি হয়েছিল যে খাস মক্কায় এমন সব লোক বর্তমান ছিলেন, যাঁরা হিব্রু ভাষায় ইঞ্জিল পড়তে পারতেন। ওরাকা ইবনে নওফেল তাঁদেরই একজন ছিলেন। এমনও কিছু লোক ছিলেন, যাঁরা শামের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে ইঞ্জিলের বাণী শিক্ষালাভ করে এসেছিলেন।

হিমইয়ার, বনী কেনানা, বনী হারেস ইবনে ক্বাআ'ব ও কেন্দা গোত্রসমূহ ইহুদী ধর্মাবলম্বী ছিল। মদীনার উপর ইহুদীরা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। তওরাত শিক্ষা দেয়ার জন্যে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছিল। এসব প্রতিষ্ঠানকে বলা হত "বায়তুল-মাদারেস"। হাদীস গ্রন্থসমূহেও এ নামেই সেগুলোর প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। খয়বর দুর্গের সকল অধিবাসীই ছিল ইহুদী ধর্মাবলম্বী।

কবি ইমরাউল কাইসের সমসাময়িক বিখ্যাত কবি সামাভিল ইবনে আদিয়াও ইহুদী ছিলেন। তাঁর গুণাগুণের কথা আজও আরব দেশে প্রবাদের ন্যায় প্রচলিত আছে। প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থধারী ইহুদী ও খৃষ্টানদের কাহিনী মক্কায় এত অধিক প্রচলিত ছিল যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপর যখন কোরআন অবতীর্ণ হচ্ছিল এবং তাতে বনী-ইসরায়ীলদের ঘটনাসমূহের আলোচনা করা হত, তখন মক্কার বিরুদ্ধবাদীরা ধারণা করত যে সম্ভবত কোন ইহুদী অথবা খৃষ্টান তাঁকে এসব শিখিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন করীমে বলেছেন ঃ "আমি অবশ্যই জানি, তারা বলে থাকে যে তাঁকে (রসূলুল্লাহ্‌কে) কোন মানুষ এসব শিখিয়ে যায়।" পবিত্র কোরআন আবশ্যিকভাবেই অনুরূপ ধারণার অসারতা প্রমাণ করেছে। যথাস্থানে এসবের বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে।

তামীম গোত্র ছিল পারসিক তথা অগ্নি উপাসক। গোত্রপ্রধান জারারা তামিমী পারসিক ধর্মমত অনুযায়ীই নিজ কন্যাকে বিয়ে করেছিল। অবশ্য পরে এ ব্যাপারে সে অনুতপ্ত হয়েছিল। আকরা ইবনে হাবেসও অগ্নি উপাসক ছিল।[১]

হানীফী ধর্মমত

"হানীফ" শব্দের অর্থ বাতেল ও অসার ধর্মমতের প্রতি বিরূপ এবং সত্য ধর্মমতের প্রতি ধাবিত ব্যক্তি। হযরত ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক প্রচারিত ধর্মমতের প্রধান মূলনীতি ছিল নির্ভেজাল তওহীদ। দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হওয়া এবং জাহেলী মতবাদ প্রসার লাভ করার ফলে যদিও এই মূলনীতিতে শেরকের পংকিলতা মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল, এমন কি কাবাগৃহেই প্রতিমাপূজা চলছিল তবুও তওহীদের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায়নি। আরবের কোন কোন স্থানে এর ক্ষীণ রেখাপাত দেখা যেত। অচেতন জড় পদার্থের সামনে বিবেকবুদ্ধির অধিকারী মানুষের মস্তক অবনত করার দৃশ্যটি দিব্য চক্ষুবিশিষ্ট বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের অন্তরে অত্যন্ত ঘৃণার উদ্রেক করত। এ কারণেই প্রতিমাপূজা দূষণীয় হওয়ার ধারণা অনেকের অন্তরেই সৃষ্টি হয়েছিল। অবশ্য অনুরূপ চিন্তাধারার ঐতিহাসিক যুগ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওতপ্রাপ্তির অল্পকাল পূর্বেই শুরু হয়েছিল। ইবনে ইসহাক লিখেছেন—একদিন কোন একটি প্রতিমার বার্ষিক মেলায় ওয়ারাকা ইবনে নওফেল, আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ, ওস্‌মান ইবনে হুয়াইরিস এবং যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ মেলাতেই প্রতিমাপূজার

১. মাআ'রেফে ইবনে কোতাইবা।

আনুষঙ্গিক বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ড দেখে তাঁদের অন্তরে এরূপ কল্পনার উদয় হল যে আমরা একটি পাথরের সামনে মাথা নত করে যা কিছু করি বা বলি, তা কি দেখার বা শোনার ক্ষমতা এই প্রস্তর মূর্তিটার রয়েছে। উপরন্তু কারও কোন ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতাও তো তার নেই? উক্ত চারজনের সকলেই কোরাইশদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ওয়ারাকা ছিলেন হযরত খাদিজার (রাঃ) চাচাত ভাই। যায়েদ হযরত উমরের (রাঃ) চাচা ছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ হযরত হামজার ভাগিনেয় ছিলেন। আর ওসমান ছিলেন আবদুল উজ্জার পৌত্র।

যায়েদ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রচারিত ধর্মের সন্ধানে সিরিয়ায় গিয়ে সেখানকার ইহুদী এবং খৃষ্টান পাদ্রীদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন. কিন্তু কারও কথায় তৃপ্তি লাভ করতে পারলেন না। তাই তিনি মোটামুটি এরূপ ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করে তৃপ্ত হলেন যে "আমি ইবরাহীমের ধর্মমত গ্রহণ করলাম।" বোখারী শরীফে হযরত আস্‌মা বিনতে আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন — আমি যায়েদকে কাবাগৃহে হেলান দিয়ে কোরাইশদেরকে সম্বোধন করে বলতে শুনেছি, "তোমাদের মধ্যে আমি ব্যতীত কেউ ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত নেই। আরবের কুসংস্কার অনুযায়ী মেয়েদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করা হত। যায়েদই প্রথম ব্যক্তি, যিনি এ কুসংস্কারের বিরোধিতা করেছিলেন। যখন কেউ কোন মেয়েকে প্রোথিত করতে উদ্যত হত, তখন তিনি তার কাছ থেকে মেয়েটিকে চেয়ে নিতেন এবং তিনি নিজেই তার লালনপালন করতেন।

বোখারী শরীফের বর্ণনা মতে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নবুওতের পূর্বে যায়েদকে দেখেছিলেন, এরূপে যায়েদের পক্ষে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাহচার্য লাভের সুযোগ ঘটেছিল। ওয়ারাকা, আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ ও ওসমান ইবনে হুয়াইরেস প্রতিমাপূজা ত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আরবের খ্যাতনামা কবি এবং তায়েফের গোত্রপ্রধান উমাইয়া ইবনে আবিস সল্‌ত প্রতিমাপূজার কঠোর বিরোধিতা করেছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার আস্‌কালানী তাঁর গ্রন্থ "ইসবায়"ও যুবায়ের ইবনে বাকারের বরাত দিয়ে লিখেছেন, উমাইয়া জাহেলী যুগে আসমানী কিতাবসমূহ পড়েছিলেন এবং প্রতিমাপূজা ত্যাগ করে ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন।

উমাইয়্যার কাব্যগ্রন্থ 'দেওয়ান-ই উমাইয়্যা' আজও বর্তমান রয়েছে। যদিও সেটি সংমিশ্রণের শিকার হয়েছে তথাপি তাতে মূল কবির কবিতা যথেষ্ট পরিমাণেই পাওয়া যায়।

উমাইয়্যা বদর যুদ্ধ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। মক্কার বিশিষ্ট গোত্রপ্রধান এবং আমীর মুয়াবিয়ার নানা উৎবা ইবনে রবীয়া ছিলেন উমাইয়্যার মামাত ভাই। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে তার নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে উমাইয়্যা দারুণভাবে মর্মাহত হয়ে এক শোকগাথা রচনা করেছিল। সম্ভবত এ ঘটনায় প্রভাবান্বিত হয়েই শেষ পর্যন্ত সে ইসলাম গ্রহণে বঞ্চিত থাকে। শামায়েলে তিরমিযীতে বর্ণিত আছে, জনৈক সাহাবী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পশ্চাদ আরোহী ছিলেন। এক সময়ে তিনি উমাইয়্যার কবিতা থেকে এক লাইন আবৃত্তি করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আরও শুনাও। এভাবে তিনি একশ' কবিতা পংক্তি আবৃত্তি করেন। প্রতি লাইন শেষ হতেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন—"আরও শুনাও"। অবশেষে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে উমাইয়্যা প্রায় মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

ইবনে হিশাম প্রতিমাপূজা বিরোধীদের মধ্যে শুধু এ চারজনের নামই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য ইতিহাসবিদগণের বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আরব দেশে আরও কিছু দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্ম হয়েছিল, যাঁরা প্রতিমাপূজা থেকে "তওবা" করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন আরবের নামকরা বক্তা "কায়েস ইবনে সা'য়েদাতুল আয়েদী।" তাঁর প্রসঙ্গ পরে আলোচিত হবে। আর একজন ছিলেন কায়েস ইবনে নাশাবা, তাঁর সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী "ইসাবা" গ্রন্থে লিখেছেন—জাহেলী যুগেই তিনি এক আল্লাহর উপাসক হয়ে গিয়েছিলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওতপ্রাপ্তির পর ইসলাম গ্রহণ করে তিনি ধন্য হন।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রচারিত ধর্মমতকে কেন "হানীফী ধর্ম" বলা হয় সে সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। পবিত্র কোরআনে এ শব্দটি রয়েছে, কিন্তু এর অর্থ সম্পর্কে কোরআনের ভাষ্যকারগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ লিখেছেন যে যেহেতু এ ধর্মে প্রতিমাপূজাবিমুখতার শিক্ষা আছে, এ জন্য একে হানীফী মত বলা হয়। কেননা হানীফ حنيف শব্দের অর্থই হল বিমুখ হওয়া। হিব্রু এবং সুরইয়ানী পরিভাষায় 'হানীফী' অর্থ মোনাফেক এবং কাফের। সম্ভবত প্রতিমাপূজারীরা একত্ববাদীদিগকে অনুরূপ আখ্যায় আখ্যায়িত করেছিল। আর একত্ববাদীরা সগৌরবে তাই বরণ করে নিয়েছিলেন।

অধিকাংশ বর্ণনা মতে প্রমাণিত হয় যে আরবে বিশেষত মক্কা-মদীনায় কিছুসংখ্যক লোক প্রতিমাপূজার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে "মিল্লাতে-ইবরাহীমীর" অনুসন্ধান করেছিলেন। মিল্লাতে ইবরাহীমীর পুনরুজ্জীবন প্রদানকারীর আবির্ভাবকাল অতি নিকটবর্তী হয়েছিল বলে বোধ হয় পূর্বাহ্নেই কিছু

সংখ্যক সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোকের মনে এ আলোর রওশনী প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল।

অনুরূপ কয়েকজন সত্যসন্ধানী ব্যক্তির অস্তিত্ব লক্ষ্য করেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কল্পনা করেন যে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই আরব দেশে সত্যধর্ম এবং নির্ভেজাল 'তওহীদের' ব্যাপক প্রচলন ছিল। কিন্তু তাদের এ অনুমান সত্য নয়। যদি তাই হয়, তবে ইসলামের আবির্ভাবকালে এত প্রাণান্তকর দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি হবে কেন? এ সব ধর্ম আরব দেশে সংস্কারমূলক কিছু করে থাকলে অবশ্যই এত ব্যাপক সংঘাত-সংঘর্ষের সৃষ্টি হত না।

উপরের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে আরব দেশে প্রায় সকল বিখ্যাত ধর্মেরই অস্তিত্ব ছিল। ইহুদী ধর্ম, খৃষ্টধর্ম, পারসিক ধর্ম, হানীফী ধর্ম ইত্যাদি সবই ছিল। আরও ছিল মানবীয় উর্বর মস্তিষ্কের বিকারপ্রসূত নাস্তিকতা। কিন্তু এত সবের ফলাফল কি ছিল? আকিদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে ছিল বহু-ঈশ্বরবাদ। প্রচলিত খৃষ্টধর্ম অবশ্য খোদার সংখ্যা অনেকটা হ্রাস করলেও তিন থেকে আর কমাতে পারেনি। এতদসঙ্গে তারা আবার এ বিশ্বাসও পোষণ করত যে হযরত ঈসা (আঃ) নিজে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে সমস্ত অনুসারীদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন। ইহুদীরা তওহীদে বিশ্বাসী ছিল বটে, কিন্তু খোদা সম্পর্কে নানারূপ বাজে ধারণা পোষণ করত। যেমন, "খোদা মানুষের সাথে কুস্তি লড়তেন।[১]

দেব-দেবীর নামে নরবলি দেয়া হত। পিতার বিবাহিতা স্ত্রীকে পুত্রেরা ওয়ারিসসূত্রে লাভ করত। দুই সহোদরা ভগ্নীকে এক ব্যক্তি একই সঙ্গে বিয়ে করতে পারত। স্ত্রীদের কোন সংখ্যা নিরূপিত ছিল না। জুয়া, মদ্যপান, ব্যভিচার প্রভৃতি পাপানুষ্ঠানের ব্যাপক প্রসার ছিল। লজ্জাহীনতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, আরবের কবিগুরু রাজপুত্র ইমরাউল কাইস স্বীয় কবিতায় আপন ফুফাত ভগ্নীর সাথে তার কেলেংকারির কাহিনী অত্যন্ত রসঘনরূপে বর্ণনা করেছিল। তার এই শালীনতাবর্জিত কবিতা কাবাগৃহের দেয়ালে পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিল।

যুদ্ধবিগ্রহে মানুষকে জীবন্ত দগ্ধকরা, মেয়েলোকের পেট কেটে ফেলা, নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করা সাধারণতঃ সিদ্ধ ছিল। খৃষ্টান লেখকদের বর্ণনা মোতাবেক ইসলামপূর্ব আরব দেশ সমস্ত ধর্মের মধ্যে খৃষ্টধর্মের প্রভাবেই সর্বাধিক প্রভাবান্বিত ছিল। কিন্তু এর ফলাফল কি ছিল তা খৃষ্টান ইতিহাসবিদদের মুখেই শোনা ভাল। জনৈক খৃষ্টান ইতিহাসবেত্তা লিখেছেন ঃ

১. (হভইব) মূইর সাহেবের "Life of Muhammad' ১ম খণ্ডের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

"খৃষ্টানগণ সুদীর্ঘ পাঁচ শ' বছর আরবদিগকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েছিল। এতদসত্ত্বেও নগণ্য সংখ্যক খৃষ্টানই দৃষ্টিগোচর হয়। নাজরানের বনী-হারেস, ইয়ামামার বনী-হানীফ আর বনী-তাঈ এর স্বল্পসংখ্যক লোক, এ ছিল সমগ্র আরব দেশে খৃষ্টধর্মাবলম্বী লোকের আংগুলে গোনার মত সংখ্যা। বাদবা'কির কথা না বলাই ভাল। যাহোক, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে গেলে আরব দেশে খৃষ্টানদের সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার অতি সামান্য ফলাফলই দেখা যায়। আর ইহুদী শক্তি কোন কালে প্রবল গতি সৃষ্টি করতে দেখা গেলেও প্রতিমাপূজা এবং বনী-ইসমাঈলদের নানা ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস চতুর্দিকে থেকে মরু সাইমুমের ন্যায় প্রবাহিত হয়ে কা'বা প্রাচীরে ধাক্কা খাচ্ছিল।"[১]

অনুরূপ দূরবস্থা শুধু যে আরব দেশেই বিরাজ করছিল তাই নয়, বরং অন্ধকারের কালমেঘ সমগ্র দুনিয়াকেই গ্রাস করে রেখেছিল (পরে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা আসবে)। এ বিশ্বগ্রাসী ঘন অন্ধকার দূরীভূত করে বিশ্বকে আলোকিত করার জন্য কি একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের প্রয়োজন ছিল না ?

ইসমাঈলী বংশ

পূর্ব অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে যে ইতিহাসবিদগণ আরব জাতিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। (১) প্রাচীন আরবের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহ, যথা— "তুসম ও জুদাইস্।" (২) কাহ্তান বংশীয় খাঁটি আরবগণ, যথা— ইয়ামনের অধিবাসী ও মদীনার আনসারগণ। (৩) ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধরগণ।

হযরত ইসমাঈল (আঃ) যখন মক্কায় বসতি স্থাপন করেন, তখন মক্কার আশপাশে বনী জুরহুমের বসতি ছিল। হযরত ইসমাঈল (আঃ) সে খান্দানেই বিয়ে করেছিলেন। তাঁর সে স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদের অধস্তন বংশধররা "আরবে মুস্তা'রাবা" বলে অভিহিত হয়ে থাকে। বর্তমান আরবজাতির বিরাট অংশই এ বংশোদ্ভূত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং ইসলামের সমস্ত ইতিহাস শেষোক্ত বংশের সাথেই জড়িত এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ও এ খান্দানেরই অধস্তন বংশধর ছিলেন। যে শরীয়ত হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে দান করা হয়েছিল, তাঁকেও সে শরীয়তই প্রদান করা হয়েছিল। পবিত্র কোরআনে আছে ঃ

১. কোন কোন মুফাসসিরের মতে, 'তিনি' বলতে ইবরাহীম (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। কারও কারও মতে, আল্লাহকেই বুঝানো হয়েছে। আর এটিই বিশুদ্ধ বলে মনে হয়। কোরআনের আয়াত দ্বারাও তাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

"তোমরা পিতা ইবরাহীমের ধর্মমত। ইতিপূর্বে তিনিই[১] তোমাদেরও মুসলিম নামে অভিহিত করেছিলেন এবং এ কোরআন শরীফেও তোমাদেরকে মুসলিম আখ্যা দেয়া হয়েছে।" (সূরা হজ ১০ম রুকু) কিন্তু কোন কোন ইউরোপীয় সংকীর্ণমনা ইতিহাসবিদ মূলতঃই এসব বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করেছেন। অর্থাৎ তাদের মতে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ) আরবে আসেননি। তাঁরা কাবাগৃহের ভিত্তিও স্থাপন করেননি এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ও ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর নন।

যেহেতু, এ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা ধর্মীয় সংকীর্ণতা এবং বিদ্বেষপূর্ণ আগ্রাসনের রূপ পরিগ্রহ করেছে, কাজেই আমাদের নিকট কেউ আশা করতে পারেন না যে ইউরোপীয়দের নিকট স্থিরীকৃত নীতির ভিত্তিতে আমরা এসব বিষয়ের অবতারণা করব।

মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়াদি অনেক। কিন্তু মূল প্রতিপাদ্য মাত্র দুটি এমন বিষয় যে দু'টির মধ্যে উভয় পক্ষের মানার মত কোন কিছু দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। এ দুটি মূল বিষয়ের মীমাংসা যাদের অনুকূলে হবে, অন্যান্য খুঁটিনাটি কিংবদন্তী এবং প্রাসংগিক বিষয়গুলোকেও তাদের পক্ষে আছে বলে মানতে হবে। আলোচ্য মূলনীতি দুটি নিম্নরূপ ঃ

(১) হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) আরবে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন কিনা ?

(২) হযরত ইবরাহীম (আঃ) হযরত ইস্হাক (আঃ) না হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে কোরবানী দিতে চেয়েছিলেন ?

হযরত ইসমাঈল (আঃ) কোথায় বসতি স্থাপন করেন?

ইহুদীদের দাবী এই যে হযরত ইসহাক (আঃ) ছিলেন 'যবীহুল্লাহ্' (আল্লাহর নামে কোরবান)। এ জন্যই তারা শাম দেশকে কোরবানীর স্থান বলে থাকে। কিন্তু পক্ষান্তরে যদি এ কথা প্রমাণিত হয় যে হযরত ইসহাক নন এবং হযরত ইসমাঈলই (আঃ) ছিলেন যবীহুল্লাহ, তবে অবশ্যই মানতে হবে যে, কোরবানীর স্থান ছিল আরবভূমি এবং এ সম্পর্কিত সমস্ত বর্ণনাই সম্পূর্ণ সত্য। আর এভাবেই সমস্ত ঐতিহাসিক সূত্র সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপে মিলে যাবে।

---

১. কোন কোন মুফাস্সিরের মতে, 'তিনি' বলতে ইবরাহীম (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। কারও কারও মতে, আল্লাহকেই বুঝানো হয়েছে। আর এটাই বিশুদ্ধ বলে মনে হয়। কোরআনের আয়াত দ্বারাও তাই স্পষ্ট প্রতিয়মান হয়।

তওরাতের বর্ণনা মতে, হ্যরত হাজেরার গর্ভজাত সন্তান ছিলেন হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রথম সন্তান, যাঁর নাম রাখা হয়েছিল ইসমাঈল। হ্যরত ইসমাঈল (আঃ)-এর পরে হ্যরত সারার গর্ভে হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বিতীয় সন্তান হ্যরত ইসহাক (আঃ)-এর জন্ম হয়। হ্যরত ইসমাঈল (আঃ) কিছু বড় হওয়ার পর হ্যরত সারা দেখলেন যে ইসমাঈল ইস্হাকের সাথে শিশুসুলভ দুর্ব্যবহার করছে। এ দেখে তিনি হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-কে বললেন যে "হাজেরা এবং তার ছেলেকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিন।" এর পরবর্তী ঘটনা তওরাতের ভাষায় নিম্নরূপ ঃ "তখন হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) অতি প্রত্যূষে কিছু রুটি এবং পানির একটি মশক নিলেন এবং হ্যরত হাজেরার কাঁধে তুলে দিলেন। শিশু পুত্রটিকে তার মায়ের কাঁধে উঠিয়ে বিদায় দিয়ে দিলেন। তিনি রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং বীর-ই-সাবআর মরু এলাকায় ঘুরাফেরা করতে লাগলেন। যখন মশকের পানি শেষ হয়ে গেল, তখন তিনি শিশুটিকে একটি ঝোঁপের নিচে রেখে কিছুদূরে বসে রইলেন। কেননা, তিনিই বললেন যে স্বচক্ষে শিশু-পুত্রের মৃত্যুর ঘটনা দেখতে পারব না। তিনি সামনে বসে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে থাকলেন। তখন আল্লাহ্ শিশুটির ডাক শুনলেন এবং আল্লাহ্র ফেরেশতা ঊর্ধ্বলোক থেকে হাজেরাকে ডেকে বললেন ঃ ওগো, তোমার কি হয়েছে? তুমি ভয় পেয়ো না। আল্লাহ তোমার শিশু-পুত্রের ডাক শুনেছেন। তুমি উঠে গিয়ে তোমার শিশু-পুত্রটিকে নিয়ে এসো। তাকে সামলে রাখ। আমি তাঁর দ্বারা এক বিরাট জাতির পত্তন করব। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর চক্ষু খুলে দিলেন। তখন তিনি একটি কূপ দেখতে পেয়ে সেদিকে অগ্রসর হলেন এবং মশকে পানি ভরে এনে শিশু পুত্রকে পান করালেন। আল্লাহ্ সে শিশুটির সঙ্গে ছিলেন, সে বড় হলো এবং মরু এলাকায় বসবাস করতে থাকল। সে শর নিক্ষেপে পারদর্শী হয়েছিল। সে ফারানের মরু এলাকায় থেকে গেল। তার মা একটি মিসরীয় মেয়ের সাথে তার বিয়ে দিলেন।—(তওরাত—সফরে পয়দায়েশ, ২১ অধ্যায়)

এ বর্ণনার দ্বারা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে হ্যরত ইসমাঈল (আঃ) বাড়ি থেকে বের হওয়ার কালে ছোট শিশু ছিলেন। এ জন্যই হ্যরত হাজেরা তাঁকে পানির মশকের সাথে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তওরাতের আরবী সংস্করণে পরিষ্কার শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ঃ

وَاضِعًا اِيَّاهَا عَلٰى كَتِفِهَا وَالْوَلَدَ -

"হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) পানির মশক এবং ছেলে উভয়কেই হাজেরার কাঁধে তুলে দিয়েছিলেন।"

তওরাতে বর্ণিত আছে যে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর জন্মকালে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বয়স ছিল ৮৬ বছর। আর যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর খৎনা করিয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ১৩ বছর এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ছিল ৯৯ বছর। (তওরাত ঃ পয়দায়েশ অধ্যায় ১৭, ২৪, ২৫।)

হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বাড়ি হতে বহিস্কৃত হওয়ার ঘটনাটি যে খৎনার পরে ঘটেছিল তা পরিষ্কার কথা। কাজেই তখন তাঁর বয়স অবশ্যই ১৩ বছরের ঊর্ধ্বে ছিল। এ বয়সের কোন ছেলেই মায়ের কাঁধে চড়ে বেড়ানোর মত ছোট থাকে না। এ ঘটনাটি এখানে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এই যে হযরত ইসমাঈল (আঃ) তখন পর্যন্ত বয়সের এমন সীমায় উপনীত হয়েছিলেন যে হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁকে তাঁর মাতাসহ স্বীয় বাসস্থান থেকে অন্যত্র কোথাও বসতিস্থাপন করানোর মত বয়স তাঁর হয়েছিল।

তওরাতের উপরোক্ত বর্ণনায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে যে হযরত ইসমাঈল (আঃ) ফারান উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং শর নিক্ষেপে পারদর্শী হয়েছিলেন। কোন কোন খৃষ্টান লেখক বলতে চান যে ফিলিস্তিনের দক্ষিণে অবস্থিত মরু এলাকার নাম "ফারান"। কাজেই হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর আরবে গমনের ঘটনার পেছনে কোন বাস্তবতা নেই।

আরবের সমস্ত ভূগোলবিদদের সর্বসম্মত মতে, "ফারান" হেজাযের একটি পাহাড়ের নাম। (এ জন্যই মক্কাভূমিকে 'ওয়াদীয়ে-ফারান' বা ফারান উপত্যকা বলা হয়)। মো'জামুল-বুল্‌দানে স্পষ্টরূপে তাই উক্ত হয়েছে। খৃষ্টান লেখকগণই এ সম্পর্কে নানা প্রকার পরস্পরবিরোধী মন্তব্য করে বিষয়টিকে এত জটিল করে ফেলেছেন যে তাঁদের লেখাই প্রমাণ করে যে নিছক বিদ্বেষের বশবর্তী হয়েই তারা হযরত ইসমাঈলের (আঃ) আরবে বসতি স্থাপনের বিষয়কে একটি অর্থহীন বিতর্কে পরিণত করেছে। প্রসঙ্গত হযরত ইবরাহীমের (আঃ) যুগে আরবের সীমান্ত কি ছিল, সে সম্পর্কে আলোকপাত করা একান্ত জরুরী।

ফরাসী পণ্ডিত মঁসিয়ে লিবঁন তাঁর "তামাদ্দুনে-আরব" গ্রন্থে লিখেছেন—"এ আরব উপদ্বীপের উত্তর সীমারেখা পরিষ্কার এবং সহজ নয়। এ সীমারেখাটি এভাবে টানা যেতে পারে যে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী গাজা শহর থেকে একটি রেখা টেনে দক্ষিণ দিকে লূত সাগর বা মৃত সাগর (Dead Sea) পর্যন্ত যেতে হবে। সেখান থেকে দামেশক, দামেশক থেকে ফুরাত নদী পর্যন্ত এবং ফুরাত নদীর উপকূল হয়ে পারস্যোপসাগরের সাথে মিলিয়ে দিতে হবে। অনুরূপ সীমারেখাটিকে আরব দেশের উত্তর সীমারেখা বলা যেতে পারে।

এ বর্ণনা মতে দেখা যায় যে আরবের হেজায এলাকাকে ফারানের অন্তর্ভুক্ত মনে করা অযৌক্তিক নয়। তওরাতে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর আবাসস্থলের বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ

"আর হুয়াইলা থেকে শূর (সিরিয়া) যাওয়ার পথে মিসরের সম্মুখস্থ ভূখণ্ডে তিনি বসত করতেন।" এ সীমা নির্ধারণীতে মিসরের সম্মুখস্থ ভূখণ্ড আরবদেশই হতে পারে। খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থসমূহে বনী-ইসরাঈলদের আলোচনা বিশেষ গুরুত্বসহকারেই করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, বনী-ইসমাঈলদের আলোচনা করা হয়েছে নেহায়েত প্রাসঙ্গিক আলোচনা হিসাবে। এ জন্যই তাদের লেখায় আরব দেশে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বসতি স্থাপন প্রসঙ্গে স্পষ্টত কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু বিভিন্ন আকার-ইঙ্গিতে বুঝা যায় যে হযরত হাজেরার আরব অঞ্চলে গমন এবং সেখানে তাঁর বসতি স্থাপন করার ব্যাপারটি তাদের নিকটও একটি সর্বজনস্বীকৃত সত্য। আধুনিক খৃষ্টান জগৎ যাকে 'ওহী' বা প্রত্যাদেশের সমান মর্যাদা দিয়ে থাকে, তা হচ্ছে গ্লিটোনের বরাবরে লেখা পল্‌স-এর একটি পত্র। তাতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'পুত্র ছিল। একটি দাসীর গর্ভজাত, অপরটি স্ত্রীর গর্ভজাত। দাসীর গর্ভজাত সন্তানটি স্বাভাবিক নিয়মেই জন্মগ্রহণ করেছিল। আর স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানটি ঐশী ওয়াদা অনুযায়ী জন্মলাভ করেছিল। বিষয়টিকে রূপক হিসেবে ধরে নিলে বলতে হয়, দুজন স্ত্রীলোক যেন দুটি যুগের প্রতিমূর্তি, প্রথমত সিনাই পর্বত হতে যিনি এসেছেন, তিনি সাধারণ সন্তানই জন্ম দেন। তিনি হচ্ছেন হাজেরা। কেননা, হাজেরাই হচ্ছেন, আরবের সিনাই পর্বতসদৃশ এবং বর্তমানে পবিত্র এরোশালেম নগরীর প্রতিদ্বন্দ্বী।"

মূল লেখকের লেখার ভাষা কি ছিল, তা জানা না গেলেও এবং অনুবাদ প্রাঞ্জল না হলেও এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রধান খলীফা পল্‌স্ হযরত হাজেরাকে আরবের সিনাই পর্বত বলেছেন। যদি হযরত হাজেরা আরবদেশে বসতি স্থাপন না করতেন, তবে তাকে আরবের সিনাই পর্বত বলার অর্থ কি? যাহোক, পরে 'বাক্কা' (بكة) শব্দের আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়টির আরও জোর সমর্থন পাওয়া যাবে।

'যবীহ' কে ছিলেন? ইহুদীদের অবহেলা, অসতর্কতা, ব্যক্তিগত কুমতলব এবং যুগের উলট-পালটের দরুন তওরাত কিতাবটি সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হয়ে গেছে। বিশেষত শেষ নবী (সাঃ)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে যেসব স্পষ্ট উক্তি এবং ইশারা-ইঙ্গিত বিদ্যমান ছিল, ইহুদীদের অন্যায় হস্তক্ষেপে সে সবই সমূলে নষ্ট হয়ে

গেছে। তবুও তার সর্বত্র প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনের মত মূল বস্তু এখন পর্যন্তও মওজুদ আছে। যদিও তওরাতে স্পষ্ট লেখা হয়েছে যে হযরত ইসহাকই যবীহুল্লাহ্ ছিলেন। তবুও তাদের কথার মারপ্যাঁচে এমন সব অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ বিদ্যমান রয়ে গেছে, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনি কখনই যবীহুল্লাহ্ ছিলেন না এবং তিনি তা হতেও পারেন না। এ বিষয়টির আলোচনা করতে হলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ

(১) প্রাচীন ধর্মীয় বিধান মতে, কেবল মাতা-পিতার প্রথম সন্তান অথবা অনুরূপ জীবজন্তুই কোরবানী করা যেত। এ জন্যই আদমতনয় "হাবীল" যতগুলো দুম্বা কোরবানী করেছিলেন, সেসবই ছিল মায়ের প্রথম বাচ্চা।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট আল্লাহ্র নামে উৎসর্গীকৃতদের সম্পর্কে বিধি-বিধান প্রদান করার সময় বলেছিলেন ঃ

"কেননা, বনী-ইসরাঈলের প্রত্যেকটি পিতা-মাতার প্রথম সন্তান এবং জীবজন্তুর প্রথম বাচ্চা সবই আমার জন্য।"

(২) আল্লাহ্র নামে উৎসর্গীকৃত পিতা-মাতার প্রথম সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব কোন অবস্থাতেই নষ্ট হতে পারে না। তওরাতে বর্ণিত আছে যে কারও দু' স্ত্রী থাকলে যদি একজন অধিক আদরণীয়া হয়, তবে যার সন্তান প্রথমে হবে তারই শ্রেষ্ঠত্ব পেতে হবে, যদিও সে কম আদরণীয়া হয়।

"কেননা, সে-ই তো আল্লাহ্র শক্তির প্রথম প্রকাশ এবং প্রথম সন্তান আখ্যায় আখ্যায়িত হওয়ার অধিকার তারই।

(৩) যে সন্তানটি আল্লাহ্র নামে উৎসর্গ করা হত, সে তার পিতার পরিত্যক্ত সম্পদেরও উত্তরাধিকারী হতে পারত না। 'তওরাতে' বর্ণিত আছে ঃ তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার নামের 'তাবুত' বহন করার জন্য আল্লাহ্র নামে উৎসর্গীকৃত লোকদেরকে নির্দিষ্ট করে নিলেন। আর তাদেরকে এ জন্য নির্দিষ্ট করে নিলেন, যেন তাঁরা প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করে শেষ পর্যন্ত তাঁর নামের বরকত এবং কল্যাণ লাভে ধন্য হতে পারে। এ কারণেই আল্লাহ্র নামে উৎসর্গীকৃত লোকদেরকে তাদের ভাইদের সাথে পিতার সম্পত্তির কোন অংশ দেয়া হত না। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই তাদের অংশ। (তওরাত—আছিহ্হা ৮ম ৯ম আয়াত)।

(৪) যাকে আল্লাহ্র নামে উৎসর্গ করা হত, সে মাথার চুলকাটা ছেড়ে দিত এবং এবাদতখানার নিকট গিয়ে মস্তক মুণ্ডন করত। যেমন, আজকাল মুসলমানগণ হজের সময় এহ্রাম খুলবার জন্য মস্তক মুণ্ডন করে থাকেন। তওরাতে বর্ণিত আছে ঃ এখন তুমি গর্ভবতী হতে চলেছ, তুমি একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করবে। তার মাথায় ক্ষুর লাগাবে না। কারণ, এ ছেলেটি আল্লাহ্র নামে উৎসর্গীকৃত হবে। (তওরাত—কুজাতে আছিহ্হা ৪–১৩)

(৫) যাকে আল্লাহ্র নামে উৎসর্গ করা হত তাকে বুঝাবার জন্য 'আল্লাহ্র সম্মুখে' শব্দটি ব্যবহার করা হত। (তওরাত-ছফরে অফদ ৬-১৬-২০-ছফরে তাকভীন-১৭ তছনিয়া-৮-১০)।

(৬) হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে দুটি শর্তসহ পুত্রসন্তান কোরবানী করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। (ক) পুত্রটি পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান হতে হবে। (খ) অতি প্রিয় হতে হবে। (তওরাত-তাকভীন-আছিহ্হা ২২-আয়াত ২)।

এখন মূল বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা করা যাক। কিন্তু প্রথমেই একথা বলে রাখা প্রয়োজন যে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর শরীয়তের বিধান মতে কোরবানী করা এবং আল্লাহ্র নামে উৎসর্গ করা ছিল একই কথা, অর্থাৎ, এ দুটির জন্য একই শব্দ ব্যবহার হত।

যদি বলা হত যে পুত্রটিকে অমুক এবাদতখানায় কোরবান করে দাও তবে অর্থ এ হত যে সর্বদা এবাদতখানায় থেকে সেবা করার জন্য তাকে বাড়ি হতে সরিয়ে দাও। কিন্তু এ শব্দটি কোন জীবজন্তুকে উপলক্ষ করে বললে, তা প্রকৃত কোরবানীর অর্থেই ব্যবহৃত হত।

তওরাতে আল্লাহ্র ভাষায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

"কেননা, বনী-ইসরাঈলের প্রত্যেকটি পিতা-মাতার প্রথম সন্তান এবং প্রতিটি জীবজন্তুর প্রথম বাচ্চা সবই আমার জন্য।"

তওরাতের এ সমস্ত বিশুদ্ধ নির্দেশাবলীতে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে বলছিলেন ঃ তুমি বনী-ইসরাঈলদের মধ্য থেকে পিতা-মাতার প্রথম সন্তানগুলোকে এনে আল্লাহ্র কাছে হাজির কর, যাতে তাদেরকে আল্লাহ্র কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া যায়, আর তারা যেন কোরবানী করার জন্য নির্ধারিত দুটি গাভীর গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। (সংক্ষেপিত)

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে স্বপ্নযোগে যে পুত্র কোরবানী করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তার অর্থও তাই ছিল যে এবাদতখানার সেবা করার জন্য ছেলেটি উৎসর্গ করে দিন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রথমত স্বপ্নটিকে কোরবানী করার প্রকৃত অর্থেই বুঝেছিলেন। এ জন্যই তিনি কোরবানী করার নির্দেশ পালন করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু পরে তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে তাঁর স্বপ্নটি ছিল একটি রূপক স্বপ্ন। এ জন্যই হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পুত্রকে কাবার সেবা করার জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন এবং কোরবানীর শর্ত-শরায়েত কায়েম রেখেছিলেন।

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ উদ্ধৃত করার পর নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি যুক্তি বিশেষভাবে অনুধাবন করা উচিত।

(১) হযরত ইসাক (আঃ)-এর জন্ম হয়েছিল হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর জন্মের পর। কাজেই তিনি পিতার একক পুত্র এবং প্রথম সন্তান ছিলেন না। আর যেহেতু কোরবানীর জন্য পিতার একমাত্র পুত্র হওয়ার শর্ত ছিল, কাজেই সঙ্গত ভাবেই হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) ইসহাককে কোরবানীর জন্য আদিষ্ট হতে পারেন না।

(২) হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর যা ছিল তার সবই হযরত ইসহাক (আঃ)-কে দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে, হযরত ইসমাঈল (আঃ) এবং তাঁর মাতাকে শুধু পানির একটি মশক দিয়ে বিদায় দিয়েছিলেন। এটি একথার একটি অকাট্য প্রমাণ যে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) হযরত ইসহাক (আঃ)-কে কোরবানী বা এবাদতখানার সেবা করার জন্য উৎসর্গ করেননি।

(৩) হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে বহুকাল পর্যন্ত মস্তক মুণ্ডন না করার প্রথা চালু ছিল। আজও যে হজের ইহ্‌রাম বাঁধার পর মস্তক মুণ্ডন করা হয়, তা হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর সে প্রথারই স্মৃতি বহন করে।

হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর শরীয়তে কোরবানী ও মানতের জন্য যে সমস্ত শব্দ ব্যবহৃত হত, সেগুলো তিনি হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর জন্য ব্যবহার করেছেন। কিন্তু হযরত ইসহাক (আঃ)-এর জন্য তা করেননি। তওরাতে বর্ণিত আছে যে যখন হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে হযরত ইসহাক (আঃ)-এর জন্মের সুসংবাদ দেয়া হল; তখন তিনি বলেছিলেন ঃ

" আহা! ইসমাঈল যদি তোমার সামনে জীবিত থাকত।" তওরাতে যেখানে 'জীবিত থাকা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, এটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(৫) হযরত ইসমাঈল (আঃ) ছিলেন হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সর্বাধিক প্রিয় সন্তান। একতরফা হযরত ইসহাক (আঃ)-এর কাহিনীতে পূর্ণ তওরাতে হযরত- ইসহাক (আঃ) এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর পারস্পরিক পার্থক্যমূলক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে হযরত ইসহাক (আঃ) আল্লাহ্‌র ওয়াদার বহিঃপ্রকাশ। আর হযরত ইসমাঈল (আঃ) হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার বঃিপ্রকাশ। অর্থাৎ, তিনি তাঁর পিতা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর দোয়া ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী জন্মলাভ করেছিলেন। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নাম রেখেছিলেন ইসমাঈল। কেননা, ইসমাইল শব্দটি আসলে দুটি শব্দের সমষ্টি। 'সামা' এবং (سمع) ঈল (ايل) 'সামা' অর্থ শ্রবণ করা আর ঈল্ অর্থ আল্লাহ্। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর দোয়া শুনেছিলেন। "তওরাতে বর্ণিত আছে আল্লাহ্ হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে বললেনঃ

ইসমাঈল সম্পর্কে আমি তোমার প্রার্থনা শ্রবণ করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে হ্যরত ইসহাক (আঃ)-এর জন্মের শুভসংবাদ দান করেন, তখন হ্যরত ইব্‌রাহীম (আঃ) হ্যরত ইসমাঈল (আঃ)-কে স্মরণ করেছিলেন। যাহোক, যেহেতু হ্যরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর প্রতি পুত্র কোরবানীর আদেশটির সাথে এ শর্তটিও ছিল যে সে পুত্রটি সর্বাধিক প্রিয় হতে হবে। কাজেই হ্যরত ইসমাঈল যবীহুল্লাহ্ হতে পারেন ; হ্যরত ইসহাক যবীহুল্লাহ্ হতে পারেন না।

(৬) যখন আল্লাহ্ তা'আলা হ্যরত ইসহাক (আঃ)-এর জন্মের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তখন সংগে সংগে এ মর্মেও সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে আমি তার অধস্তন বংশধরের সাথে চিরস্থায়ী অঙ্গীকারে আবদ্ধ থাকব। এ প্রসঙ্গে তওরাতে নিম্নরূপ বর্ণনা দেয়া হয়েছে ঃ

"অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ "বরং তোমার স্ত্রী 'সারা' তোমার একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে। তার নাম হবে ইসহাক। আমি তার অধস্তন বংশধরের সাথে চিরস্থায়ী অঙ্গীকার বজায় রাখব।" (তওরাত—তাকভীন—আছেহ্হা—১৭—১৮ আয়াত)।

এ সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বাক্যের বিস্তারিত বর্ণনা তওরাতে এরূপ দেয়া হয়েছে যে যখন ইব্‌রাহীম (আঃ) পুত্র কোরবানী করতে চাইলেন এবং ফেরেশতাগণ ডেকে বললেন যে বিরত হউন, তখন ফেরেশতারা নিম্নস্বরে বলেছিলেন ঃ

"আল্লাহ্ বলছেন যে যেহেতু তুমি এমন দুঃসাহসিকতাপূর্ণ কাজ করেছ এবং নিজের একমাত্র পুত্রটিকেও বাঁচিয়ে রাখার কথা চিন্তা করনি, তাই আমি তোমাকে বরকত ও কল্যাণ দান করব এবং তোমার অধস্তন বংশধরকে আকাশের তারকারাজির ন্যায় উজ্জ্বল করব, সমুদ্র সৈকতের বালুকারাশির ন্যায় বিস্তারিত করে দেব।" (তওরাত—তাকভীন—আছেহ্হা—১৫—২২ আয়াত)।

এখন ভেবে দেখুন, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই যখন হ্যরত ইসহাক (আঃ)-এর জন্মের সুসংবাদ দান করার সময় বলে দিয়েছিলেন যে আমি তার অধস্তন বংশধরকে সর্বদা কায়েম রাখব, এমতাবস্থায় কি করে হ্যরত ইসহাক (আঃ)-এর কোন সন্তান-সন্ততি না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে কোরবানী করার আদেশ দেয়া সম্ভব হতে পারে?[১]

পক্ষান্তরে, হ্যরত ইসমাঈল (আঃ)-কে "যবীহুল্লাহ্ মেনে নিলে সমস্ত দলীল এবং যুক্তিপ্রমাণে সামঞ্জস্য হয়ে যায়। হ্যরত ইসমাঈল (আঃ) পিতার সর্বপ্রথম

১. এটা সর্বসম্মত কথা যে হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মৃত্যুর পর হ্যরত ইসহাক (আঃ)-এর সন্তানাদি হয়েছিল। (তাকভীন আসিহহা ২৫—আয়াত ১১)।

সন্তান এবং পিতার সর্বাধিক প্রিয় ছিলেন। কোরবানীর সময় বালেগ অথবা বালেগ হওয়ার কাছাকাছি ছিলেন। কোরবানীর পূর্বে তাঁর বংশ বিস্তারের কোন শুভসংবাদ প্রদান করা হয়নি। তওরাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে যেহেতু হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁর একমাত্র সন্তানকে কোরবানী করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন, কাজেই বিপুল হারে সে সন্তানের বংশ বিস্তারের অঙ্গীকার করা হয়েছিল। অর্থাৎ, বিপুল হারে বংশবৃদ্ধি করা ছিল কোরবানীর পুরস্কার স্বরূপ। অতএব, হযরত ইসমাঈল (আঃ) যবীহুল্লাহ্ হতে পারেন। কেননা, হযরত ইসহাক (আঃ)-এর বংশ বিস্তারের ওয়াদা তো তাঁর জন্মলগ্নেই করা হয়েছিল, তা কোন কিছুর পুরস্কার স্বরূপ ছিল না।

কোরবানীর স্থান ঃ তওরাতে কোরবানীর স্থানরূপে যে স্থানটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার নাম "মুরিয়া"। ইহুদীরা বলছে যে এটি ঐ স্থান যেখানে হাইকলে-সোলায়মানীর ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। খৃষ্টানরা বলছে যে এটি ঐ স্থানের নাম যেখানে হযরত ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ দুটি দাবিকেই ভুল প্রমাণিত করেছেন। স্যার স্টেনলী লিখেছেন ঃ

"হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) প্রাতঃকালেই স্বীয় তাঁবু থেকে বের হয়ে যে স্থানে গেলেন, যেখানে তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা কোরবানী করার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তা ইহুদীদের দাবি মোতাবেক মুরিয়ার পাহাড় ছিল না, আর খৃষ্টানদের ধারণা অনুযায়ী তা পবিত্র সমাধি গির্জার নিকটস্থ স্থানও নয়। খৃষ্টানদের এ অনুমান তুলনামূলকভাবে ইহুদীদের অনুমান অপেক্ষাও অবাস্তব। আর আরাফাতের পাহাড় সম্পর্কিত মুসলমানদের দাবি আরও বেশি অবাস্তব।[১] খুব সম্ভব এ স্থানটি জারিজিমের পাহাড়ে অবস্থিত। কোরবানীর স্থানের বৈশিষ্ট্যাবলীর সাথে এ স্থানটির বিশেষ সামঞ্জস্য রয়েছে।"

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা এতটুকু তো অবশ্যই প্রমাণিত হল যে 'মুরিয়া'-কে নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে ইহুদী ও খৃষ্টান উভয়ের দাবিই ভ্রান্ত। বাকি মুসলমানদের দাবি ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত, পরবর্তী আলোচনায় সে সত্য উদ্‌ঘাটন করা হবে। মুরিয়াকে সে মহাকোরবানীর স্থান হিসাবে চিহ্নিত করার ব্যাপারে যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে, তা আরও একটি নতুন মতানৈক্যের জন্ম দিয়েছে। অর্থাৎ 'মুরিয়া' কি কোন স্থানের নাম না শুধু একটি গুণবাচক বিশেষ্য? বহুসংখ্যক অনুবাদকের মতে, এটি অন্য শব্দ থেকে উৎপন্ন একটি শব্দ।

১. মুসলমানগণ আরাফাতকে নয়, বরং "মিনা"-কেই কোরবানীর স্থান মনে করেন।

তওরাতের কোন কোন সংস্করণে এর অনুবাদ করা হয়েছে " উচ্চ টিলাযুক্ত স্থান" আবার অন্য সংস্করণে "উচ্চভূমি"। কোন কোন সংস্করণে আছে "স্বপ্নে নির্দেশিত স্থান"। কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এটিকে একটি স্থানের নামরূপেই বুঝেছেন। সেটি কোন শব্দের অনুবাদ নয়, বরং তা-ই মূল শব্দ। অবশ্য দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় এবং কিছু লোকের অবহেলায় শব্দের আসল রূপটি বিকৃত হয়ে গেছে। অর্থাৎ, "মুরিয়া" হতে রূপান্তরিত হয়ে "মাওরা" হয়েছে। এরূপ হওয়ার বিশেষ কারণ এই যে হিব্রু ভাষায় দুটি শব্দের বানান প্রায় একই রকম।

"মাওরা" (مور) যে আরবের অন্তর্গত একটি স্থান এ সম্পর্কে তওরাতেই স্পষ্ট উক্তি বিদ্যমান রয়েছে। যেমন ঃ

اَوْكَانَ جَيْشُ الْمَدْيَانِيِّيْنَ شَمَالِيْهِمْ عِنْدَ تَلِّ مُوْرَةَ فِي الْوَادِيْ

"মাদইয়ানীদের[১] সেনাবাহিনী উত্তরাঞ্চলের মাওরার পার্বত্য অঞ্চলে উপত্যকায় অবস্থান করছিল।"

সমস্ত ঘটনা এবং যুক্তিপ্রমাণাদির প্রতি লক্ষ্য করলে অবশ্যই প্রমাণিত হবে যে এ শব্দটি "মাওরা" নয় বরং "মারওয়া" মক্কায় অবস্থিত একটি পাহাড়। এর এবং "সাফা" পাহাড়ের মাঝখানেই এখন পর্যন্ত হজ ও ওমরা উপলক্ষে দৌড়ানোর প্রথা আদায় করা হয়।

আরবের প্রাচীন রেওয়ায়েত, পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট উক্তি এবং স্থান নিরূপক হাদীসসমূহের বর্ণনা প্রভৃতির সবকিছুই উপরোক্ত অনুমানের সাথে এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ যে ঘটনার মূলে বাস্তবতা না থাকলে অনুরূপ সামঞ্জস্য সম্ভবত হত না। মক্কার মারওয়াই যে কোরবানীর স্থান এ দাবির সপক্ষে যেসব কথা বলা হয়, তার বিবরণ নিম্নরূপ। হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মারওয়ার প্রতি ইংগিত করে বলেছিলেন ঃ এটিই কোরবানীর স্থান। এছাড়া মক্কার সমস্ত পাহাড়-পর্বত এবং গিরিপথই কোরবানীর স্থান। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর যুগে মারওয়ায় কোরবানী করা হত না, বরং মিনায় কোরবানী হত। যার দূরত্ব মক্কা থেকে তিন মাইল। তা সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মারওয়াকে কোরবানীর স্থান বলেছেন। হয়ত এ জন্যই যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এখানেই হযরত ইসমাঈলকে কোরবানী করতে চেয়েছিলেন। পবিত্র কোরআনে আছে ঃ

---

১. মাদইয়ান আরবদেশের অন্তর্ভুক্ত একটি এলাকা। আরবদিগকে অনেকেই মাদইয়ানী বলে। সিরিয়ার দক্ষিণ সীমান্ত হতে উত্তর ইয়ামন পর্যন্ত সবটুকু মাদইয়ান। এ এলাকার বাশিন্দাগণ ছিল ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর। বাইবেল-১১৪.

"অতঃপর কোরবানীর পশুদের স্থান হচ্ছে কাবাগৃহ।"—(সূরা হজ)।

"কোরবানী যা কাবা পর্যন্ত পৌছবে।"—(সূরা মায়েদা)

মারওয়া কাবাগৃহের কাছাকাছিতে অবস্থিত। কোরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে কোরবানীর আসল স্থান ছিল কাবা—মিনা নয়। কিন্তু যখন হাজীদের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেল, তখন কাবা প্রাঙ্গণস্থ কোরবানী দেয়ার স্থান সীমাকেই মিনা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হল মাত্র।

কোরবানীর স্মৃতি ঃ ইহুদীরা হযরত ইসহাক (আঃ)-এর অধস্তন বংশধর, কাজেই যদি হযরত ইসহাক (আঃ)-ই "যবীহুল্লাহ" হতেন, তবে তাদের কাছে তার কোন স্মৃতি অবশ্যই বিদ্যমান থাকত। পক্ষান্তরে, হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর খান্দান এবং তাঁর মানস-সন্তান সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে অদ্যাবধি কোরবানীর প্রথা প্রচলিত রয়েছে।

ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধরগণের মধ্যে কোরবানীর সমস্ত স্মৃতি মওজুদ রয়েছে এবং ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে এক স্তম্ভ হজের সমগ্র কার্যকলাপই এ কোরবানীর স্মৃতি বহন করছে। এ তথ্যটিই একটু ব্যাখ্যা করে বলতে গেলে বলতে হয় যে

(১) আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে পুত্র কোরবানীর নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁকে "হে ইব্রাহীম" বলে সম্বোধন করেছিলেন এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-ও "আমি হাজির" বলে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। হজের সময় মুসলমানগণ যে পদে পদেই লাব্বাইকা বলে থাকেন, তাও ইব্রাহীম (আঃ)-এর মুখে উচ্চারিত শব্দ। এর শাব্দিক অনুবাদ হল " আমি হাজির"।

(২) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর শরীয়তের বিধান ছিল যে যাকে কোরবানীর স্থানে নিয়ে যাওয়া হত কিংবা আল্লাহ্র নামে উৎসর্গ করা হত, তাকে বার বার "এবাদতখানা" প্রদক্ষিণ করতে হত।

হজের সময় মুসলমানগণ কাবা প্রদক্ষিণ এবং সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে সাত বার দৌড়ে থাকেন। এটিও ইব্রাহীমী শরিয়তের স্মৃতিই বহন করে।

(৩) আল্লাহ্র নামে উৎসর্গীকৃত ব্যক্তির অবশ্য পালনীয় বিধান ছিল এই যে কয়েকদিন পর্যন্ত সে মাথার চুল কাটতে পারত না। হজের মধ্যে এখনও এ নিয়ম বহাল আছে। এহরাম অবস্থায় চুল কাটা যায় না। এহরাম খোলার সময়ই মস্তক মুণ্ডন করা হয়। পবিত্র কোরআনে এ বিধানটির উল্লেখ আছে ঃ "তোমরা মস্তক মুণ্ডনের মাধ্যমে হজের কার্যকলাপ সমাপ্ত করবে।—(সূরা ফাত্হ—৪র্থ রুকূ)

(৪) হজের একটি অপরিহার্য কাজ হল কোরবানী করা। এটিও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মহাকোরবানীরই স্মৃতি বহন করছে।

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন ঃ "আমি ইসমাঈলের কোরবানীর পরিবর্তে এক বিরাট কোরবানীর বিধান দিয়েছি।" (সূরা সাফফাত—৩য় রুকূ)

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সে মহাকোরবানী সম্পর্কিত তওরাতের সুস্পষ্ট উক্তি এবং আনুষঙ্গিক যুক্তিপ্রমাণাদি সংক্ষেপে পেশ করার পর কোরআনের ভাষ্যসমূহের প্রতি লক্ষ্য করা যাক। পবিত্র কোরআনের মতে অকাট্যভাবে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-ই 'যবীহুল্লাহ্'—(আল্লাহ্র নামে কোরবান) যদিও পশ্চাত্য প্রভাবিত কোন কোন ভাষ্যকার ভুলবশত ইহুদীদের বর্ণিত মতের সমর্থন করেছিল। পবিত্র কোরআনে কোরবানীর ঘটনাটি নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"আর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন ঃ আমি আমার প্রভুর নির্দেশিত পথে অগ্রসর হব। তিনি অবশ্যই আমাকে পথের সন্ধান দেবেন। 'হে প্রভু! তুমি আমাকে যোগ্যতা ও সততার অধিকারী সন্তান দান কর।' অতঃপর আমি তাঁকে একটি বুদ্ধিমান, সহনশীল পুত্রসন্তান দানের শুভ সংবাদ দিলাম। যখন সে পুত্রটি তাঁর সাথে চলাফেরা করতে শিখল, তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, প্রিয় বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি, যেন আমি তোমাকে জবেহ্ করছি। এখন বল এ সম্পর্কে তোমার মতামত কি?"

এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সন্তান কামনা করে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করে যে পুত্র সন্তান দান করেছিলেন, সে পুত্রটিকেই তিনি কোরবানীর জন্য উপস্থাপিত করেছিলেন।

তওরাতের বর্ণনা মতে, একথা প্রমাণ হয়ে গেছে যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রার্থনার কারণে যে পুত্রের জন্ম হয়েছিল, তিনিই ইসমাঈল (আঃ)। আল্লাহ্ তা'আলা ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রার্থনা শুনেছিলেন বলেই তাঁর নাম "ইসমাঈল" রাখা হয়েছিল। কাজেই এ আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যে পুত্রের কথা বলা হয়েছে, তিনি হলেন হযরত ইসমাঈল— হযরত ইসহাক নয়। মুসলমানদের "মুসলিম" নামটিও হযরত ইব্রাহীম(আঃ)-এরই দেয়া নাম। তিনিই এর উদ্ভাবন করেছিলেন। পবিত্র কোরআনে আছে ঃ

"এটি তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মমত। তিনিই প্রথম তোমাদের নাম রেখেছেন "মুসলিম"। —(সূরা হজ—১০ রুকূ)

অনুরূপ নামকরণের ইতিহাস কোরবানীর ঘটনা থেকে শুরু হয়। অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে কোরবানী করতে মনস্থ করেন। এ সম্পর্কে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মনোভাব জানার জন্য বললেন,

আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমাকে এমন আদেশ করা হয়েছে। এখন বল, এ সম্পর্কে তোমার মনোভাব কি? তখন হযরত ইসমাঈল (আঃ) অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে মস্তক অবনত করে বললেন, "এ নিন আমার মাথা হাজির।" এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা اسلما শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর এ শব্দটি اسلام (ইসলাম) শব্দ থেকে উৎপন্ন। ইসলাম অর্থ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ করে দেয়া। فلما اسلما "যখন তারা দুজনই নিজেদেরকে আমার কাছে সমর্পণ করে দিল"।—(সূরা সাফ্ফাত—৩য় রুকূ)

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এবং শ্রেষ্ঠ কর্ম হল আল্লাহ্র কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করে তাঁর সবকিছু মেনে নেয়া এবং সর্বাবস্থায়ই তাঁর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা। অর্থাৎ, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোরবানীর আদেশ হওয়া মাত্রই পিতা-পুত্র উভয়েই বিনা-দ্বিধায় মস্তক অবনত করে দিয়েছিলেন। তাঁদের এ গুণটি আল্লাহ্র নিকট খুব পছন্দ হল। অতঃপর তা-ই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বিশেষ ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যরূপে স্থিরীকৃত হল। এ জন্যই হযরত ইব্রাহীম(আঃ) তাঁর অনুগামীদেরকে 'মুসলিম' নামে আখ্যায়িত করেছিলেন।

'কোরবানী' ইসার, (ত্যাগ) এবং 'ইসলাম' প্রকৃতপক্ষে সব কটিই সমার্থক শব্দ। এটি এ কথারই একটি অকাট্য প্রমাণ যে হযরত ইসমাঈল (আঃ) নিজেকে কোরবানীর জন্য এগিয়ে দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে, যদি হযরত ইসহাক (আঃ) কোরবানী হতেন, তাহলে "মুসলিম" পদবীটি তাঁর বংশধর অথবা তাঁর উম্মতকেই দেয়া হত।

কোরবানীর তাৎপর্য

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে কি উদ্দেশ্যে পুত্র কোরবানী করার আদেশ করা হয়েছিল[১] সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে এর প্রকৃত তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রাচীনকালে প্রতিমা পূজারী জাতিসমূহ দেব-দেবীর নামে নিজেদের সন্তানদেরকে উৎসর্গ করত। ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষেও এ প্রথা

১. ইতিপূর্বে এ মর্মে একটি টীকা লেখা হয়েছে যে এ আয়াতে هو শব্দ দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। তাবেয়ীগণের মধ্যে হাসান বসরী (রাহঃ) এ মত পোষণ করতেন। আবু হাইয়্যান (রাহঃ) এ মতই সমর্থন করেছেন। পক্ষান্তরে, সাহাবিগণের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আর তাবেয়ীনগণের মধ্যে হযরত মুজাহিদ, জাহ্হাক, কাতাদা এবং সুফিয়ান (রাহঃ) এ মত পোষণ করতেন যে এখানে هو দ্বারা আল্লাহকেই বুঝানো হয়েছে। তাহলে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে যে কোরআন নাযিল হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নাম "মুসলিম" রেখেছেন।

প্রচলিত ছিল। ইসলামবিদ্বেষী লোকদের ধারণানুযায়ী হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর কোরবানীর ব্যাপারটি এমনি একটা কিছু ছিল। কিন্তু এটা তাদের মারাত্মক ধরনের একটি ভুল অনুমান বই আর কিছুই নয়।

সুফিগণ লিখেছেন[১] যে নবিগণ যে সব স্বপ্ন দেখতেন, সাধারণত তা দু'প্রকার। "আইনী" বা বাস্তব এবং "তামসিলী" বা রূপক। 'আইনী' বা বাস্তব

---

১. সীরাতুন নবীর গ্রন্থকার হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কোরবানী সম্পর্কে যে মত পোষণ করেছেন তা একটু বিতর্ক সাপেক্ষ। তাঁর ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে স্বপ্ন দু'প্রকার। (এক) আইনী — যাতে ঘটনার বাস্তব রূপটি হুবহু দেয়া হয়। (দুই) তামসিলী—যাতে বাস্তব ঘটনাটি রূপকভাবে দেখানো হয়। গ্রন্থকারের এ মতটি বহুসংখ্যক আলেম মেনে নিয়েছেন। তাঁরা বর্ণনা করেছেন যে দ্বিতীয় প্রকারের স্বপ্নে রূপক বস্তুটিই মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে।
সীরাতুন নবী লেখক এসব উলামার অনুকরণেই হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর স্বপ্নকে রূপক স্বপ্ন বলেছেন। এর ভিত্তিতেই তাঁর পক্ষে একথা বলার প্রয়োজন হয়েছে যে "হযরত ইবরাহীম (আঃ) চিন্তার ভ্রান্তি বশত তাঁর রূপক স্বপ্নটিকে 'আইনী' তথা বাস্তব মনে করে হুবহু উহাকে বাস্তব রূপ দানের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু যথাসময়ে আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁর এ ভ্রান্তি সম্পর্কে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে কোরবানী করা হতে বিরত রেখে পশুর কোরবানী হাজির করে দিয়েছিলেন।
আমরা মূল লেখকের মতানুসারে এ ঘটনাকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর 'চিন্তার ভ্রান্তি' বলে মেনে নিতে পারছি না। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে মনে হয় যে আল্লাহ্র ইচ্ছায় আত্ম-সমর্পিত হযরত ইবরাহীম (আঃ) চিন্তার ভ্রান্তিবশত নয়, বরং আনুগত্য এবং ভালোবাসার আগ্রহাতিশয্যে হুবহু আল্লাহ্র হুকুম পালন করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন, যাতে তিনি এ কঠিন পরীক্ষায় আল্লাহ্র কাছে পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হতে পারেন। তাছাড়া পুত্রকে কোরবানী করার পরিবর্তে তাঁর দ্বারা তওহীদ প্রচার এবং কাবাগৃহের সেবা করার কাজ লওয়ার জন্য তাঁকে উৎসর্গ করে দেয়াকে রূপকভাবে কোরবানী বলা হয়েছে।"
আমাদের মতে এরূপ একটা মনগড়া ব্যাখ্যা উপস্থিত করাও পাশ্চাত্য লেখকদের সম্মুখে হীনমন্যতা প্রকাশের নামান্তর মাত্র। কোনরূপ আত্মপ্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ না করে কোরআনের বর্ণনার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই সকল বিতর্কের অবসান হয়ে যায়। কোরআনের কথায় দেখা যায় যে আল্লাহ্র কাছে হযরত ইবরাহীমের এ প্রেমিকসুলভ কার্যটি খুবই পছন্দ হয়েছিল। তাই তিনি তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন ঃ
"হে ইবরাহীম তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ। আমি সৎ-কর্মশীলদিগকে এমনি ভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। আরও বললেন ঃ
"আমি তার পরির্তে এক মহা কুরবানী প্রবর্তন করেছি।" উম্মতের উপর রূপকভাবেই কোরবানী ওয়াজেব করা হয়েছে। অর্থাৎ, শারীরিক ও মানসিকভাবে আল্লাহ্র পূর্ণ আনুগত্য ও ত্যাগের আদর্শের প্রতীক স্বরূপ কোরবানী ওয়াজেব হয়েছে।

কোররবানী সম্পর্কে গ্রন্থকারের এ ব্যাখ্যা সে সব পণ্ডিতগণের অনুকরণেই করা হয়েছে, যারা বিশেষ কোন ধর্মীয় কারণে হযরত ইবরাহীমের স্বপ্নটিকে একটি রূপক স্বপ্ন মনে করে থাকেন। অন্যথায় সাধারণত সকল আলেমই সেটিকে একটি 'আইনী' তথা বাস্তব স্বপ্ন মনে করেন। কিন্তু চরম মুহূর্তে হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন পুত্র কোরবানী করার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করত তাকে বাস্তবরূপে কার্যকরী করতে উদ্যত হয়ে নিজের করণীয় কাজটি করলেন এবং হুকুম তামিল করতে আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করলেন না, তখনই আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে তাঁকে বললেন, "হে ইবরাহীম! তুমি তোমার কাজ শেষ করেছ এবং নিজের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ। এখন আর পুত্রের গলায় ছুরি দেয়ার প্রয়োজন নেই। এখন থেকে মিল্লাতে ইবরাহীমের এই মহান সুন্নত পশু-কোরবানীর আকারে প্রবর্তিত হল। তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে পশু কুরবানী নিজের নফ্সকে কোরবানী করার প্রতীকস্বরূপ। এই কোরবানীর গোশ্ত কোরবানী দাতার জন্য ঈদের দিনে কল্যাণ বহন করে আনে। —আহ্কামুল কোরআন ২য় খণ্ড পৃঃ ১৯৬।

স্বপ্নে যে বস্তুটি যেভাবে দেখানো হয়, ঠিক সেটিই এং সেভাবেই পাওয়া উদ্দেশ্য হয়। পক্ষান্তরে, 'তামসিলী' বা রূপক স্বপ্নে রূপকভাবেই ভাবগ্রহণের জন্য ইংগিত করা হয়।

হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে যে স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল তদ্দ্বারা আল্লাহ্ পাক তাঁর সন্তানকে কাবার সেবার জন্য উৎসর্গ করার কথাই হয়ত বুঝিয়েছিলেন। তওরাতের স্থানে স্থানে কোরবানী শব্দটি এ অর্থেই প্রধানত ব্যবহৃত হয়েছে।

হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁর এ স্বপ্নটিকে 'আইনী' ভেবেছিলেন এবং হুবহু বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। এরূপ মনে করাটা ছিল তাঁর একটি ইজতেহাদী ভুল তথা চিন্তার ভ্রান্তি। অনুরূপ ভ্রান্তি নবীদেরও হতে পারে। তবে আল্লাহ্ তাঁদেরকে ভ্রান্তির উপর থাকতে দেননি বরং ওহীর মাধ্যমে সংগে সংগে সতর্ক করে দেন। এ নীতির ভিত্তিতেই হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে সন্তান যবেহ্ করতে বিরত রাখা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিয়তের সততার মর্যাদা দিয়ে বলেছেন ঃ

"নিশ্চয়ই তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদিগকে পুরস্কৃত করে থাকি।"

যাহোক, এখানে এসব বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করার উদ্দেশ্য এই যে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) কর্তৃক স্বীয় সন্তান কোরবানী করার অর্থ ছিল কাবাগৃহের সেবার জন্য তাঁকে উৎসর্গ করে দেয়া। উৎসর্গ করার জন্য পূর্ববর্তী শরীয়তে "আল্লাহ্‌র সামনে" শব্দটি ব্যবহৃত হত। এ পরিভাষাটি তওরাতের বহু স্থানে এসেছে। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর জন্য যে দোয়া করেছিলেন, তার ভাষা ছিল এরূপ ঃ

"আহা ! ইসমাঈল যদি তোমার সামনে জীবন যাপন করত।" (তওরাত-তাকভীন-আছিহ্‌হা—১৭-১৮ আয়াত)

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এ আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ীই তাঁকে স্বপ্নযোগে রূপকভাবেই পুত্র কোরবানীর আদেশ করা হয়েছিল। তওরাতের এ কথা কটিই এ বিষয়ের একটি অকাট্য যুক্তি যে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে স্বপ্নযোগে তাঁর পুত্র হযরত ইসহাককে কোরবানী করার আদেশ দেয়া হয়নি, বরং হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে কোরবানী করার আদেশ দেয়া হয়েছিল।

মক্কা মোয়াযৃযামা

পূর্বেই বলা হয়েছে, হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বাসস্থান ছিল ারবদেশ। কোরবানীর স্থান নির্ধারণ করার আলোচনায় প্রমাণ করা হয়েছে যে মক্কা উপত্যকাই ছিল কোরবানীর স্থান। কাজেই মক্কা প্রসঙ্গে আলোচনাটি অতি প্রাচীনকালের সাথে সম্পৃক্ত।

কোন কোন বিদ্বেষপরায়ণ খৃষ্টান ইতিহাসবিদ লিখেছেন যে মক্কা নগরীর প্রাচীনত্বের দাবিটি মুসলমানদের একটি মনগড়া দাবি মাত্র। প্রাচীন ইতিহাসে এর কোন নাম-নিশানা খুঁজে পাওয়া যায় না।[১] কাজেই আমরা এ প্রসঙ্গে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই।

মক্কার প্রাচীনতম ও আসল নাম 'বাক্কা"। পবিত্র কোরআনে এ নামের উল্লেখ দেখা যায়। যথা ঃ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

"মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে পবিত্র ঘরটি নির্মিত হয়, তা হচ্ছে বাক্কায় প্রতিষ্ঠিত ঘর।"

যবুর কিতাবে ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৮৪ পৃষ্ঠায় আছে ঃ

"বাক্কার উপত্যকা অতিক্রম করার সময় একটি কূপের কথা বলা হয় যা বরকত এবং কল্যাণের দ্বারা মাওরাকে (মারওয়া) বেষ্টন করে রেখেছে, শক্তি ও উন্নতির পথে তা দ্রুত ধাবমান।"

উপরের উদ্ধৃতাংশে উল্লিখিত 'বাক্কা' নামক স্থানটিই হল "মক্কা মোয়ায্যামা"। কিন্তু যদি এ শব্দটিকে একটি বিশেষ্য পদ তথা স্থানের নাম না ধরে অন্য শব্দ থেকে উদ্ভূত একটি শব্দ ধরা হয়, তবে এর অর্থ হবে ক্রন্দন করা। যবুরের এ 'বাক্কা' শব্দটিই আরবী ভাষায় بكاء যার অর্থ ক্রন্দন করা। যেহেতু ইহুদী এবং খৃষ্টান জাতি সর্বদাই মক্কার মর্যাদা বিনষ্ট করার জন্য লেগেই আছে, সেহেতু তওরাতের অনেক অনুবাদকই উল্লিখিত 'বাক্কা' শব্দের অনুবাদ করেছেন

১. মারগোলিয়থ সাহেব লিখেছেন যে "যদিও ধর্মীয় চিন্তাধারার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়ার কারণে মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে তাঁদের ধর্মীয় কেন্দ্র অতি প্রাচীনকালে নির্মিত। কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায় যে মক্কার সর্বাধিক প্রাচীন গৃহটি মুহম্মদ (সাঃ)-এর মাত্র কয়েক পুরুষ পূর্বে নির্মিত হয়েছিল।" মারগোলিয়থ সাহেব তাঁর দাবির সমর্থনে 'ইসাবা' গ্রন্থের হাওয়ালা দিয়েছেন। আমরাও তার সত্যতা অস্বীকার করছি না। কিন্তু তার বর্ণনাটির উদ্ধৃতি ভ্রান্তিপূর্ণ। আমরা মূল কিতাবে এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

بكاء বা ক্রন্দন। এমতাবস্থায় وادئ بكاء বা ক্রন্দনের উপত্যকা বলতে কি বুঝাবে তা প্রত্যেকেই বুঝতে পারবেন। যবুরের উদ্ধৃতাংশের উপরের আয়াত দ্বারা জানা যায় যে এ শ্লোকে হযরত দাউদ (আঃ) পবিত্র মক্কাভূমি, মারওয়া যাওয়া এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর কোরবান হওয়ার স্থান সম্পর্কে আগ্রহ এবং আবেগ প্রকাশ করেছেন। পূর্ববর্তী বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

"হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহ্র নিকট নিবেদন করলেন ঃ "ওগো সমস্ত বাহিনীর মহান প্রভু, তোমার ঘর কত মধুর, কত আনন্দময়! আমার হৃদয়মন আল্লাহ্র ঘর দেখতে উদগ্রীব। আমার মন আল্লাহ্র ঘরের প্রেমিক! হে প্রভু, তোমার নামে তোমার দাস যে স্থানে জান কোরবান করতে প্রস্তুত হয়েছিল, সে স্থানটি কত মহান। ওগো প্রভু, ওগো আল্লাহ্, ধন্য হোক তারা, যারা সর্বদা তোমার ঘরে অবস্থান করছে। তোমার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করছে।"

হযরত দাউদ (আঃ)-এর অনুরূপ প্রার্থনার পর পরই "বাক্কা" সংবলিত আয়াতটি বিদ্যমান রয়েছে। এখন গভীরভাবেব চিন্তা করলে বুঝা যায় যে হযরত দাউদ (আঃ) সে স্থানেই যাবার আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন, যে স্থানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঃ

(ক) যা ছিল কোরবানীর স্থান।

(খ) যা ছিল হযরত দাউদের বাসস্থান থেকে এমন দূরত্বে যে সে পর্যন্ত যেতে হলে দীর্ঘ ভ্রমণ করতে হয়।

(গ) সে স্থানটি ' ওয়াদীয়ে-বাক্কা" বা বাক্কা উপত্যকারূপে অভিহিত।

(ঘ) সেখানে মারওয়া নামক স্থানটিও ছিল।

উপরোক্ত তথ্যসমূহের প্রেক্ষিতে সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায় যে যবুরে উল্লিখিত "বাক্কা"ই সে মক্কা, যেখানে মাওরা তথা 'মারওয়া নামক' স্থানটিও অবস্থিত। সংগে সংগে এ বিষয়েও একটি অনুমান করা যাবে যে ইহুদীরা বিদ্বেষবশত কেমন করে এসব শব্দ পরির্তন করে ফেলেছে। পবিত্র কোরআনে তাদের অনুরূপ কুকীর্তির সমালোচনা করে। বলা হয়েছে ঃ

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ

"তারা যথাস্থান হতে শব্দ পরির্তন করে ফেলেছে।" ডাঃ হেস্টিং "ডিক্শেনারী অব দি বাইবেল" গ্রন্থে ওয়াদীয়ে বাক্কার উপর যে গবেষণামূলক প্রবন্ধটি লিখেছেন, তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ ঃ

এ শব্দটির দ্বারা বাস্তবিকই কোন উপত্যকা বুঝালে নিম্নের যে কোন একটি উপত্যকাই বুঝাবে ঃ

(১) এটি সে উপত্যকা যেটি অতিক্রম করে তীর্থ যাত্রীরা বায়তুল মোকাদ্দাসে পৌছায়।

(২) বাইবেলে উল্লিখিত ওয়াদীয়ে আখুয়ার।

(৩) বাইবেলে উল্লিখিত ওয়াদীয়ে রিফাইউন্।

(৪) সিনাই পাহাড়ের নিকটস্থ উপত্যকা।

(৫) উত্তর দিক থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত কাফেলাসমূহ গমনাগমন করার রাস্তার সর্বশেষ মঞ্জিল।

কিন্তু কি আশ্চর্য! ডাঃ হেস্টিংস সাহেব এতসব স্থানের সম্ভাবনার কথা বিবৃত করলেও তাঁর এ ফিরিস্তিতে মক্কার কোন উল্লেখ নেই।

ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়। কারণ, লেখক যে কয়েকটি উপত্যকার নাম উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর কোন একটির সাথেও بكاء অথবা بكّة শব্দের কোন সম্পর্ক নেই। এমনকি কোন একটি অক্ষরের পর্যন্ত মিল নেই। পক্ষান্তরে "বাকা" এবং "বাক্কা" একই শব্দ, শুধু উচ্চারণ ভংগির পার্থক্য ব্যতীত অন্য কোন পার্থক্য নেই।

নিউ এন্সাইক্লোপেডিয়ায়[১] "মুহাম্মদ" শীর্ষক যে নিবন্ধটি রয়েছে তার লেখক মারগোলিয়থ সাহেব। তাতে তিনি পবিত্র মক্কাভূমি সম্পর্কে লিখেছেন ঃ প্রাচীন ইতিহাসে এ শহরের কোন নাম-নিশানা পাওয়া যায় না। শুধু যবূরের একস্থানে وادى بكّة ওয়াদীয়ে বাক্কা শব্দটির উল্লেখ আছে মাত্র।"

কিন্তু মারগোলিয়থ সাহেব এ ঐতিহাসিক সাক্ষ্যটিকেও দুর্বল মনে করেন। ফ্রান্সের প্রখ্যাত পণ্ডিত এবং আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত প্রফেসর ডোজী (Dozy) লিখেছেন ঃ[২] 'বাক্কা' হচ্ছে সে স্থান যাকে গ্রীক ভূগোলবিদগণ 'মক্রুবা' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রফেসর ডোজীর বর্ণনার উপরও মারগোলিয়থ সাহেবেরা আস্থা স্থাপন করতে পারেননি।

কারলাইল সাহেব (Carlyle) তাঁর 'হিরোজ এণ্ড হিরো ওয়ার্শিপ, (Heores and hero worship) গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের ৫০ বছর পূর্বে জনৈক রোমান ঐতিহাসিক কাবাগৃহের আলোচনা প্রসংগে লিখেছেন যে এ উপাসনালয়টি দুনিয়ার সমস্ত উপাসনালয় অপেক্ষা প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ। কাবাগৃহটি যদি হযরত ঈসা (আঃ)-এর বহুকাল পূর্বে অবস্থিত থেকে থাকে, তবে মক্কাও সম্ভবত তদানীন্তন একটি নগরী হবে। কেননা, কোথাও কোন বিখ্যাত উপাসনালয় থাকলে সেটিকে কেন্দ্র করে কোন না কোন নগরী অথবা জনবসতি গড়ে উঠবেই।"

---

১. — ২. — ইনসাইক্লোপিডিয়া সর্বশেষ এবং সুলভ সংস্করণ, ১৭শ খণ্ড ৩৯৯ পৃঃ।

ইয়াকূত হামাভী 'মো'জামুল-বুল্‌দানে' লিখেছেন যে প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত বাৎলামিয়োসের ভৌগোলিক বর্ণনা মতে, মক্কার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ছিল নিম্নরূপ ঃ

দৈর্ঘ্য ঃ ৮৭ ডিগ্রী, প্রস্থ ঃ ৩ ডিগ্রী।

বাৎলামিয়োস অতি প্রাচীন যুগের একজন গ্রন্থকার। কাজেই যদি তিনি তাঁর ভৌগোলিক পুস্তকে মক্কার বর্ণনা করে থাকেন ; তবে তার চেয়েও অধিক প্রাচীন সনদের প্রয়োজন কি থাকতে পারে ?

মারগোলিয়থ সাহেব কর্তৃক কাবার প্রাচীনত্বকে অস্বীকার করার ভিত্তি হচ্ছে এই যে 'ইসাবা' নামক গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে মক্কায় সর্বপ্রথম পাকা গৃহ নির্মাণ করেন সাঈদ ইবনে ওমর অথবা সা'আদ ইবনে ওমর। কিন্তু মারগোলিয়থ সাহেব জানেন না যে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন স্থানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে যেহেতু আরবগণ কাবাগৃহের সামনাসামনি অথবা তার আশপাশে পাকা ঘরবাড়ি নির্মাণ করাকে কাবার মর্যাদার পক্ষে হানিকর মনে করত, সেহেতু তারা বহুকাল পর্যন্ত মক্কায় অন্য কোন পাকা ঘরবাড়ি নির্মাণ করেননি। তারা তাঁবু এবং শামিয়ানা টাঙিয়ে তাতে বসবাস করত। এ কারণে দীর্ঘকাল পর্যন্ত মক্কা একটি বিপুল আয়তনের তাঁবু আচ্ছাদিত শহর ছিল।

কাবার নির্মাণ

সমগ্র বিশ্বই তখন তমসাচ্ছন্ন ছিল। ইরান, ভারত, মিসর ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছিল বিশ্বগ্রাসী অন্ধকার। সত্য গ্রহণ করা তো দূরের কথা, এ বিশাল পৃথিবীতে এক গজ পরিমাণ স্থানও এমন ছিল না, যেখানে কোন মানুষ এক আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করতে পারত। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) যখন "কাল্‌দান"-এ তওহীদের বাণী প্রচার করেন, তখন তাঁকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সেখান থেকে তিনি মিসর চলে গেলে সেখানেও তাঁর ইজ্জত-আব্রু বিপন্ন হয়। অতঃপর তিনি ফিলিস্তিনে পৌছান। কিন্তু সেখানকার অধিবাসীরাও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত করেননি। যেখানেই তিনি আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করতেন, সেখানেই শেরেকি এবং মূর্তিপূজার হট্টগোলে তাঁর সে আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যেত। ধরাপৃষ্ঠ অসত্যের আবরণে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় একটি স্বচ্ছ, পরিষ্কার এবং সর্বপ্রকার জঞ্জালমুক্ত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন ছিল, যেখানে সত্যের নক্‌শা অংকন করা যেতে পারে। আর তা ছিল হেজাযের জনমানবশূন্য মরু এলাকা, যেখানে অন্য কোন তাহযীব-তমদ্দুনের বা সমাজব্যবস্থার কোন ছাপ পড়েনি এবং কোন কিছুর চিহ্নে চিহ্নিত হয়নি।

হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) হযরত হাজেরা এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে আরবে নিয়ে এসে এখানেই তাদের আবাসন ব্যবস্থা করে দেন। তওরাতের বর্ণনা মতে, এর কিছুদিন পরই হযরত 'সারা' ইন্তেকাল করেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) মক্কা চলে আসেন। ততদিনে হযরত ইসমাঈল (আঃ) যৌবনে পদার্পণ করেন। কাজেই এবারে সত্যের বাণী প্রচারের কাজে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) একজন সঙ্গী পেয়ে গেলেন। দুজনে মিলে চার খুঁটির একখানা ছোট ঘরের ভিত্তি স্থাপন করলেন।[১] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

"স্মরণ কর সে সময়কার কথা, যখন ইব্‌রাহীম আর ইসমাঈল আল্লাহ্‌র ঘরের প্রাচীর তুলছিলেন।" (সূরা বাকারা—১৫ রুকূ।)

ঘরের নির্মাণ সমাপ্ত হলে আবার হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি ওহী নাযিল হল ঃ

"আমার এ ঘরটিকে প্রদক্ষিণকারী, নামাযে দণ্ডায়মান, রুকূকারী এবং সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে হজের ঘোষণা দিয়ে দাও, তারা চারদিক থেকে পদব্রজে এবং ক্ষীণকায় উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসবে।"—(সূরা হজ—৪র্থ রুকূ।)

তৎকালে ঘোষণা এবং প্রচারের কোন মাধ্যম ছিল না। স্থানটিও ছিল জনমানবশূন্য। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত মানুষের কোন সাড়া-শব্দ ছিল না। এমতাবস্থায় হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর আওয়াজ হরমের সীমার বাইরে যেতে পারত না। কিন্তু সে সাধারণ আওয়াজটি কোথায় না পৌঁছে ছিল। ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে গিয়েছিল পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে এবং যমীন থেকে আসমানে।

আল্লামা আয্‌রাকী 'তারীখে মক্কা' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর নির্মিত কাবাগৃহের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ নিম্নরূপ ছিল।

উচ্চতা—যমীন থেকে ছাদ পর্যন্ত ৯ গজ।

দৈর্ঘ্য—হাজরে আসওয়াদ বা কৃষ্ণ প্রস্তর থেকে রুক্‌নে শামী পর্যন্ত ৩২ গজ।

প্রস্থ—রুকনে শামী থেকে পশ্চিম দিকে ২২ গজ।

কাবাগৃহের নির্মাণকার্য শেষ হলে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে বললেন ঃ "একটি পাথর নিয়ে এস। আমি সেটি এমন স্থানে স্থাপন করব যেখান থেকে মানুষ তওয়াফ শুরু করবে।" (তারীখে মক্কা)

আল্লাহ্‌র এ ঘরটি অত্যন্ত সাদাসিধেরূপে তৈরী করা হয়েছিল। ছাদ, কপাট এবং চৌকাঠ বলতে তেমন কিছুই ছিল না। পরবর্তীকালে কুসাই ইবনে কেলাব

১. তত্ত্বানুসন্ধানীদের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক নির্মিত ভিত্তির উপর কাবার পুনঃ নির্মাণ করেছিলেন মাত্র।

কাবাগৃহের নিযুক্ত হয়ে পুরাতন ঘর ভেঙে নতুন করে তা নির্মাণ করেছিলেন এবং তাতে খেজুর গাছের ছাদ তৈরি করালেন।[১]

কাবাগৃহের কল্যাণে এবং তাঁর আকর্ষণে চারদিক থেকে লোকজন তার আশপাশে বসতি স্থাপন করতে লাগল। এভাবে সর্বপ্রথম জুরহুম গোত্রটি বসতি স্থাপন করেছিল। এ গোত্রে মুযায ইবনে আমর জুরহুমী একজন বিচক্ষণ ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। হযরত ইসমাঈল (আঃ) তাঁরই কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন, যাঁর গর্ভে তাঁর বারটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। তওরাতে তাঁদের নাম বর্ণিত হয়েছে। আরবের অধিকাংশ অধিবাসীই কাইদার ইবনে ইসমাঈলের বংশধর। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নাবেত কাবাগৃহের মুতাওয়াল্লী (পরিচালক) নিযুক্ত হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মাতামহ এ পদলাভ করেন। এভাবেই কবাগৃহের কর্তৃত্বভার ইসমাঈলী খান্দানের হাত থেকে চলে যায়। অতঃপর খোজাআ গোত্রীয়গণ কাবা অধিকার করে নিলে দীর্ঘকাল এ পদটি তাদেরই দখলে ছিল। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর খান্দান বিদ্যমান থাকলেও তাঁরা কোন প্রতিরোধের সৃষ্টি করেননি। পরবর্তীকালে কুসাই ইবনে কেলাবের যুগ এলে তিনি পূর্বপুরুষের ন্যায়সংগত অধিকার পুনরুদ্ধার করেন। কাবা শরীফকে সর্বপ্রথম যিনি পর্দা দ্বারা আবৃত করেছিলেন তিনি ছিলেন, ইয়ামন দেশের হিমিয়ারী বাদশা "আসআদ" তুব্বা। সে যুগের ইয়ামনে বিশেষ নকশার সুন্দর চাদর প্রস্তুত করা হত, যাকে বুর্দে ইয়ামনী বলা হত। কাবার পর্দা সে চাদর দ্বারাই প্রস্তুত করা হত। কুসাই ইবনে কেলাবের আমলে এ পর্দা তৈরির জন্য সমস্ত গোত্রের উপর এক বিশেষ ট্যাক্স্ বসানো হয়েছিল। আল্লামা আযরাকী লিখেছেন যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ও এ ইয়ামনী চাদর দ্বারা কাবাগৃহকে আবৃত করেছিলেন।

আল্লাহর ঘর কোন কালেই স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত কারুকার্যের প্রত্যাশী ছিল না। কিন্তু এরূপ হওয়াটা সম্পদ এবং দেশের সার্বিক উন্নতির অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ। কাজেই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে কাবাগৃহের স্তম্ভগুলোতে স্বর্ণ খচিত কারুকার্য করেছিলেন। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান স্বীয় খেলাফতকালে এ কাজের জন্য ৩৬ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়েছিলেন। আব্বাসীয় খলীফা হারুনুর রশীদতনয় আমীনুর রশীদ কাবাগৃহের চৌকাঠে স্বর্ণ খচিত কারুকার্যের জন্য ১৮ হাজার স্বর্ণমুদ্রা খরচ করেছিলেন। "তারীখে মক্কা" গ্রন্থে যুগে যুগে কাবাগৃহে স্বর্ণখচিত কারুকার্যের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ সবকিছুই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরবর্তী সময়ের ব্যাপার।

---

১. ইলান কিতাবুন্নছব-ইবনে বাক্কার ও ইবনে মাওয়ার্দী।

হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর কোরবানী

আল্লাহ্র ঘরের নির্মাণ কার্য শেষ হওয়ার পর তার পরিচালনা ও সেবার জন্য এমন একজন পুণ্যাত্মার প্রয়োজন ছিল যিনি সমস্ত ঝামেলামুক্ত থেকে নিজের জীবনকে এ কাজের জন্য উৎসর্গ করতে পারেন। অনুরূপভাবে জীবন উৎসর্গ করাকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর শরীয়তে কোরবানী বলা হত। অনুরূপ পরিভাষা তওরাতের বহুস্থানে উক্ত হয়েছে।

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে নবিগণের কাছে যে ওহী আসত, তা বিভিন্ন রকম ছিল। তার এক প্রকার ছিল নবীর স্বপ্ন। সহীহ্ বোখারীর 'ওহীর প্রারম্ভ' অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে স্বপ্নের মাধ্যমেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর ওহী নাযিল হওয়া সূচনা হয়। এ স্বপ্নগুলো কোন কোন সময় রূপক হত। যেমন, হযরত ইউসুফ (আঃ) স্বপ্নে দেখেছিলেন যে চন্দ্র-সূর্য এবং এগারটি তারকা তাঁকে সিজদাহ্ করছে। অনুরূপ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কেও স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল, তিনি স্বহস্তে পুত্রকে যবেহ্ করছেন। তিনি এর অর্থ বুঝলেন যে তাঁকে পুত্র কোরবানী দিতে বলা হয়েছে। তাই তিনি হুবহু আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নিজের দৃঢ় এবং আল্লাহ্র পথে যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করে দেয়ার সংকল্পের উপর পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন। কিন্তু তাঁর এ তত্ত্বটি জেনে নেয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল যে পঞ্চদশ বর্ষীয় তরুণ পুত্রটি বিনা বাক্যব্যয়ে নিজের গলায় ছুরি চালনার ব্যাপারটি মেনে নিতে প্রস্তুত কিনা। তাই তিনি পুত্রকে ডেকে বললেন ঃ

"হে বৎস্য, আমি স্বপ্নে দেখেছি, যেন আমি তোমাকে যবেহ্ করছি। এখন তুমি বল, এ ব্যাপারে তোমার মতামত কি ?—(সাফ্ফাত, ৩য় রুকূ) পিতার কথার উত্তরে পুত্র ধীরস্থিরভাবে বললেন ঃ

'পিতঃ'! আপনাকে যা করতে আদেশ করা হয়েছে, আপনি তাই করে ফেলুন, ইন্শাল্লাহ্ আমাকে চরম ধৈর্যশীলদের মধ্যে একজন পাবেন।"

—(সাফ্ফাত, ৩য় রুকূ।)

এখন একদিকে নব্বই বছর বয়স্ক এক বৃদ্ধ, যাঁকে তাঁর শেষ জীবনের প্রার্থনার ফলস্বরূপ নবী বংশের নয়নমণি এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে একটি পুত্র দান করা হয়েছিল, আর যে পুত্রকে তিনি দুনিয়ার সব চেয়ে অধিক ভালবাসতেন, আজ সে প্রিয়জনকে স্বহস্তে কোরবানী করার জন্য তীক্ষ্ণ ছুরি হাতে নিয়ে আস্তিন গুটাচ্ছেন। অন্যদিকে তরুণ পুত্র, যে শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত পিতার মায়া-মমতা ভরা ক্রোড়ে লালিতপালিত হয়ে আসছেন, আজ মায়ামমতার আধার

পিতৃহস্তই তার হন্তার রূপ ধারণ করেছে। উর্ধ্বজগতে ফেরেশতাগণ, এ মহাশূন্য আর বিশ্বপ্রকৃতির সব কিছুই স্তম্ভিত হয়ে এ অপরূপ দৃশ্য অবলোকন করছে। তখন সহসা আল্লাহ্র তরফ থেকে আওয়াজ এল ঃ

يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

("হে ইব্রাহীম,! তুমি তোমার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করে দেখিয়েছ। আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে এভাবেই পুরস্কার দান করে থাকি।)" (সূরা সাফ্ফাত, ৩য় রুকূ)

শুন অভিমানী,

দেখহে কেমনে খলীল নন্দন,

তীক্ষ্ণ তরবারি তলে ধরে দিল জীবন,

তবু যে কাটেনি তাহারে!

পুত্র যত দৃঢ়তা সহকারে অচল, অটল এবং অবিচল থেকে বিস্ময়কর ত্যাগসহকারে কোরবানী হওয়ার জন্য নিজেকে উপস্থিত করেছিলেন, কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর সে অপূর্ব আত্মত্যাগের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য কোরবানীর প্রথা প্রবর্তন করাই হতে পারতো দুনিয়ায় তার উপযুক্ত পুরস্কার।

বংশ পরিচয়

রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর বংশপরম্পরা এরূপ ঃ

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আব্দে মানাফ ইবনে কুসায়ী ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কাআ'ব ইবনে লুওয়াই ইবনে গালেব ইবনে ফেহ্‌রে ইবনে মালেক ইবনে নযর ইবনে কিনানা ইবনে খুযাইমা ইবনে মুদরিকা ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুযার ইবনে নেযার ইবনে মাআ'দ ইবনে আদনান।

সহীহ্ বোখারীর আবির্ভাব অধ্যায়ে এ পর্যন্তই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইমাম বোখারী রচিত ইতিহাসে 'আদনান' থেকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পর্যন্ত নাম গণনা করেছেন। অর্থাৎ, এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

আদনান ইবনে আদু ইবনে মুকাব্বিম ইবনে তারেব ইবনে ইয়াশজাব ইবনে ইয়ারিব ইবনে নাবেত ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (আঃ)।[১]

বংশপরম্পরা ঃ হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বারজন পুত্র ছিলেন। তওরাতে তাঁদের বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে কায়দারের বংশধরেরা হেজায এলাকায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। এ বংশটি অতিমাত্রায় বিস্তার লাভ করেছিল। আদনান তাদের অধস্তন বংশধর ছিলেন। আর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ আদনানী খান্দানেরই অন্তর্ভুক্ত।

আরব দেশের বংশপরম্পরাবিদগণ সকল উর্ধ্বতন পুরুষের নাম স্মরণ রাখেননি। কাজেই অধিকাংশ নসবনামায় আদনান থেকে হযরত ইসমাঈল (আঃ) পর্যন্ত মাত্র আট-নয় পুরুষ বর্ণনা হয়েছে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কারণ, যদি আদনান থেকে হযরত ইসমাঈল (আঃ) পর্যন্ত মাত্র আট-নয় পুরুষের ব্যবধান হয়, তবে মাঝখানে সময়ের ব্যবধান তিন শ' বছরকালের বেশি হবে না, অথচ তা ইতিহাস প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আল্লামা সুহাইলী "রওযুল আন্‌ফ" নামক কিতাবের অষ্টম পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

"—আদনান এবং হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর মধ্যে চার কিংবা সাত পুরুষের দূরত্ব যাঁরা বর্ণনা করেছেন, তাঁদের তথ্য ঠিক নয়। এমন কি, যাঁরা দশ-বিশ পুরুষের কথা বলেন, তাঁদের তথ্যও সঠিক নয়। কেননা, দুয়ের মধ্যে আরও অনেক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে।"

আল্লামা সুহাইলী বহু ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে আদনান থেকে হযরত ইসমাঈল (আঃ) পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান ছিল চল্লিশ পুরুষের। আমাদের ইতিহাসবিদগণের এ ভুলের কারণেই কোন কোন খৃষ্টান ঐতিহাসিক মূলত এটা অস্বীকার করার সুযোগ পেয়েছেন যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আদৌ হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন না।[২]

১. স্যার উইলিয়াম ম্যুর স্পষ্টত প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইসমাঈলী খান্দানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি এভাবে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন ঃ "ইসমাইল (আঃ)-এর বংশধর মনে করার আগ্রহ এবং সাধারণত তাঁর জীবদ্দশায়ই শুরু হয়েছিল।" আর এভাবেই মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ইবরাহীমী "নসবনামার" প্রাথমিক সূত্র গড়া হয়েছিল এবং ইসমাঈল (আঃ) ও বনী ইসরাঈলের অসংখ্য কাহিনী অর্ধেক ইহুদী আর অর্ধেক আরবী সাঁচে ঢালাই করা হয়েছিল।" উইলিয়াম ম্যুর সাহেবের এ অমূলক সন্দেহের পাশাপাশিই অসংখ্য ইউরোপীয় এবং ইহুদী ঐতিহাসিকগণ শুধু কোরাইশ বংশকে নয়, বরং সমগ্র উত্তর আরব এবং হেজাযের অধিবাসীগণকেই ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর হিসাবে মেনে থাকেন। —ফ্রস্টার সাহেবের " আরবের ঐতিহাসিক ভূগোল" পুস্তক দ্রষ্টব্য।

২. তারিখে তাবারী ঃ ইউরোপে প্রকাশিত, ৩য় খণ্ড, ১১১৮ পৃঃ।

এ ভুলের প্রধান কারণ এই যে আরববাসীরা নসবনামায় শুধু বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করত ; মাঝখানে অনুল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের নাম সাধারণত বাদ দিয়ে দিত। তদুপরি, আরবগণের নিকট যেহেতু আদনানের হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর হওয়ার সপক্ষে অকাট্য এবং সর্বজনস্বীকৃত সত্য ছিল, কাজেই তারা কেবল সঠিকরূপে আদনান পর্যন্তই বংশীয় সূত্র পৌঁছানোর চেষ্টা করত এবং তার উপরের ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করা অপ্রয়োজনীয় মনে করত। কাজেই কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে অন্যদেরকে পরিত্যাগ করত।

অবশ্য সমকালীন আরব দেশে এমন তত্ত্বজ্ঞানী লোকও ছিলেন, যাঁরা এ ত্রুটির কুফল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। আল্লামা ইবনে জরীর তাবারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন যে আমার নিকট কোন কোন বংশপরম্পরাবিদ বলেছেন যে আমি এমন বিজ্ঞ লোকও দেখেছি যিনি 'মাআদ' থেকে শুরু করে হযরত ইসমাঈল (আঃ) পর্যন্ত চল্লিশ পুরুষের নাম উল্লেখ করতেন এবং এর পক্ষে সাক্ষ্য হিসাবে প্রাচীন আরবী কবিতাদি আবৃত্তি করতেন। তিনি আরও বলেছেন যে আমি এ বংশপরম্পরার সূত্রটি ইহুদী-খৃষ্টানের আবিষ্কৃত সূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখেছি। আমার বর্ণিত সংখ্যাও তাদের সংখ্যা সমানই দাঁড়ায়। তবে অবশ্য নামের কিছুটা পার্থক্য ছিল[১] 'তাবারী লিখেছেন যে তাদমির শহরে জনৈক ইহুদী ছিলেন। তাঁর নাম ছিল আবু ইয়াকুব। পরবর্তীকালে তিনি মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী আর্মিয়া নবীর জনৈক লেখক কর্তৃক লিখিত আদনানের নসবনামা তাঁর নিকট ছিল।[২] ঐ শাজারায়ও আদনান থেকে হযরত ইসমাঈল (আঃ) পর্যন্ত চল্লিশ জনের নাম বর্ণিত হয়েছে। মোটকথা এটি একটি ধ্রুব সত্য ঘটনা যে আদনান হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর অধস্তন বংশধর ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছিলেন আদনানী খান্দানের অন্তর্ভুক্ত।

কোরাইশ বংশের গোড়াপত্তন

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খান্দান গোড়া থেকেই সম্ভ্রান্ত এবং সবদিক দিয়ে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী ছিল[২]। যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম এ খান্দানকে কোরাইশ পদবী ও

---

১. তারিখে, তাবারী ইউরোপে ছাপা ১১১৫—পৃঃ।

২. আরবের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতিটি অক্ষর সাক্ষ্য বহন করছে, কিন্তু মারগোলিয়থ সাহেব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খান্দানকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য চেষ্টার একশেষ করেছেন। তিনি এ ভাষায় মন্তব্য করেছেন ঃ এটা পরিষ্কার কথা যে মুহাম্মদ একটি সাধারণ দরিদ্র পরিবারের লোক ছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর কথার সমর্থনে এ কয়েকটি যুক্তি দিয়েছেন ঃ (১) পবিত্র কোরআনে আছে, কোরাইশগণ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলত, তাদের নিকট ভদ্র ঘরের কোন লোককে নবীরূপে পাঠন হয়নি কেন ? (২) নবীর চরম উত্থানের যুগে কোরাইশগণ তাঁকে সে বৃক্ষের সাথে তুলনা করেছিল যা ঘোড়ার পিঠে

(অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য)

উপাধিতে ভূষিত করেন, তিনি ছিলেন 'নযর ইবনে কেনানা।' কোন কোন গবেষকের মতে সর্বপ্রথম কোরাইশ পদবীটি "ফেহের ইবনে মালেক" লাভ করছিলেন আর তাঁর অধস্তন বংশধরেরাই কোরাইশী। হাফেজ ইরাকী কাব্যে সীরাতুন নবী পুস্তকে লিখেছেন ঃ

اماقريش فالاصح فهو - جماعها والاكثرن النضر

ফেহের ইবনে মালেকই প্রথম কোরাইশ, এটাই বিশুদ্ধ কথা। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, নযর ইবনে কেনানাই ছিলেন প্রথম কোরাইশ।

কুসায়ী—নযরের পর ফেহের এবং ফেহেরের পর কুসাই ইবন কেলাব অতিশয় সম্মান এবং প্রভাবপ্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। তৎকালে খলীল খাজায়ী ছিলেন কাবা শরীফের মুতাওয়াল্লী তথা প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। কুসাই তাঁরই কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। এ সম্পর্ক স্থাপনের কারণেই কাবার খেদমত করার দায়িত্ব কুসাইর উপর ন্যস্ত করার জন্য খলীল অন্তিম উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। এভাবেই তিনি এ সম্মানজনক পদ অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

জমিয়ে বসে। (৩) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে যখন জনৈক ব্যক্তি " মাওলা" বলে সম্বোধন করেছিল, তখন তিনি এ পদবী গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন। (৪) মক্কা বিজয়ের সময় তিনি বলেছিলেন আজ থেকে মক্কার অভিজাত কাফের শ্রেণী শেষ হয় গেল।
কোরআনে উল্লিখিত শব্দ এরূপ—

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ٥

অর্থাৎ, কাফেররা বলছে এ কোরআন মক্কা কিংবা তায়েফ নগরীর কোন প্রধান ব্যক্তির উপর নাযিল করা হয়নি কেন ? আজিম এবং শরীফ দুটি পৃথক শব্দ। এখানে কোরআনে "আজিম" শব্দ রয়েছে। আরবগণ সম্পদশালী এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিশালীকে আজিম বলত। মক্কাবাসিগণ রসূলুল্লাহ্(সাঃ)-এর শরীফ তথা ভদ্র হওয়ার কথা অস্বীকার করেনি বরং তাঁর দ্বিতীয় যুক্তিটি ঠিক হলে শত্রুপক্ষের প্রতিটি কথাকেই ঠিক বলতে হয়। কাফেররা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে পাগল, যাদুকর, কবি ইত্যাদি অনেক কিছুই বলেছিল। জিজ্ঞেস করি, এসবের কোন্ কথাটি ঠিক ছিল? তৃতীয় যুক্তিটি সম্পর্কে বলা যায় যে নিঃসন্দেহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) 'মাওলা' 'সাইয়েদ' ইত্যাকার পদবী গ্রহণে করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন। কিন্তু বহু হাদীসে উক্ত রয়েছে যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন—তোমরা আমাকে মাওলা অথবা সাইয়্যেদ বলো না। কার প্রকৃত 'মাওলা' এবং সাইয়্যেদ হলেন আল্লাহ্। কোরআনের সর্বত্র আল্লাহ্কেই 'মাওলা" বলা হয়েছে। সুতরাং অনুরূপ যুক্তি দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বংশীয় আভিজাত্য কি করে নষ্ট করা যেতে পারে? চতুর্থ যুক্তিটিও কম আশ্চর্যজনক নয়। এর দ্বারা কি করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বংশগত মর্যাদা কম প্রমাণ করা যায়? এখানে মক্কার অভিজাত শ্রেণী দ্বারা মক্কার দাম্ভিক শ্রেণীকে বুঝানো হয়েছে। মারগোলিয়থ সাহেব এ সমস্ত যুক্তি জার্মানীর প্রাচ্যপন্থী পণ্ডিত নোলডেকির (Noldcky) কাছ থেকেই লাভ করছেন।

কুসাই মক্কাতে 'দারুন্নাদুয়া' নামক একটি পরামর্শ পরিষদ স্থাপন করেছিলেন। কোরাইশরা কোন সভা করলে কিংবা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলে এ পরিষদেই করত। বাণিজ্য কাফেলা এখান থেকেই যাত্রা করত। বিয়েশাদী এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি এখানেই অনুষ্ঠিত হত।

কুসাই অনেক বড় বড় উল্লেখযোগ্য এমন সব জনকল্যাণমূলক কাজ করেছিলেন, দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেগুলো তাঁর স্মৃতি বহন করেছে। হজযাত্রীদের যমযমের পানি পান করানো এবং তাদের সাধারণ পানাহারের ব্যবস্থা করা ছিল হরম শরীফের তত্ত্বাবধায়কগণের বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজ। এ দায়িত্ব পালনের প্রথা সর্বপ্রথম তিনিই প্রবর্তন করেন। তিনি কোরাইশদেরকে সমবেত করে এ মর্মে বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে "শত-সহস্র ক্রোশ অতিক্রম করে পবিত্র হরম শরীফ যিয়ারত করার জন্য এসে মানুষ এখানে সমবেত হয়। তাদের আতিথেয়তা করা কোরাইশদের পবিত্র দায়িত্ব"। কুসাইয়ের এ আহ্বান ব্যর্থ হয়নি। এরপর থেকে দূরবর্তী যাত্রীদের সেবার জন্য কোরাইশরা বার্ষিক অর্থ বরাদ্দ করত। সে অর্থের দ্বারাই 'মক্কা' এবং 'মিনার' হজযাত্রীদের পানাহারের ব্যবস্থা কর হত। এতদ্ব্যতীত তারা হজের সময়ে পানি রাখার জন্য চর্মবেষ্টিত হাউজ নির্মাণ করেছিলেন। 'মাশআরে হারম' তাঁরই আবিষ্কার। হজের মৌসুমে সেখানে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হত। "ইক্‌দুল ফরীদ" নামক পুস্তকে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে কারো কারো বর্ণনা মতে, সর্বপ্রথম তাঁকেই 'কোরাইশ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল।[১] আল্লামা ইবনে আব্দি রাব্বিহী 'ইকদুল ফরীদে' আরও সুস্পষ্টরূপে লিখেছেন যে কুসাই যেহেতু সকল খান্দানকে একত্রিত করে কাবার

(১) কুসাই ইবনে কেলাবের বিস্তারিত বর্ণনা ১৯০২ ইং ১৩২২ হিঃ সনে 'লিডন' থেকে প্রকা[illegible] তবকাতে ইবনে সা'আদের ১ম খণ্ডের ৩৬-৪২ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে। 'কোরাইশ' নামকরণের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করা হয়। কেউ বলেন, 'কোরাইশ' অর্থ সমবেত করা। যেহেতু কুসাই সকলকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিলেন কাজেই তাকে কোরাইশ বলা হত। কেউ বলে, কোরাইশ হল মাছের রাজা, যে অন্যান্য মাছ খেয়ে ফেলতে পারে। কুসাই যেহেতু গোত্রসর্দার ছিলেন সেজন্য তাঁকে উক্ত মাছের সাথে তুলনা করে কুরাইশ বলা হত। সাধারণত এরূপ ধারণা কর হয় যে কোরাইশ আসলে কুসাই কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির নাম ছিল, যার নাম অনুসারে কোরাইশ বংশের উৎপত্তি হয়। ইমাম সুহাইলি অত্যানুসন্ধান করে বলেছেন যে এটা আরব দেশের প্রথানুসারে একটা গোত্রের নাম। যেমন, বিভিন্ন জীবজন্তুর নামে আরব গোত্রসমূহের নামকরণ করা হত। যথা—বনী আসাদ নামের উৎপত্তি। কোন কোন ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের ধারণা যে বিভিন্ন গোত্র যে সমস্ত জীবজন্তুর পূজা করত সেসব জীবজন্তুর নাম অনুসারেই নামকরণ করা হত। কিন্তু আরবের ইতিহাসে অনুরূপ কোন ধ্যান-ধারণা খুঁজে পাওয়া যায় না।

আশপাশে পুনর্বাসিত করেছিলেন, তাই তাঁকে কোরাইশ বলা হয়। কেননা, আরবী, 'তাক্‌রীশ' অর্থ, সমবেতকরণ। যেমন কবি বলেন ঃ

قُصَيٌّ اَبُوْكُمْ مَنْ يُسَمّٰى مُجَمِّعًا - بِهٖ جَمَعَ اللّٰهُ الْقَبَائِلَ مِنْ فِهْرٍ

অর্থাৎ "কুসাই" যাকে মুজাম্মে সমবেতকারী বলা হয় সেইত তোমাদের পিতা। আল্লাহ্ ফেহের বংশীয় সকল গোত্রকে তাঁর মাধ্যমেই একসূত্রে গ্রথিত করেছেন।

কুসাইর ছয় পুত্র ছিল। যথা— আব্দুদ্দার, আব্দে মন্নাফ, আব্দুল ওযযা, আব্দ ইবনে কুসাই, তাখমীর, বাররা। কুসাই মৃত্যুকালে পবিত্র হরম শরীফের তত্ত্বাবধায়কের পদে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্দুদ্দারকে সমাসীন করে গিয়েছিলেন। অবশ্য ভাইদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে অযোগ্য। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই কুসাইর পরে আব্দে মন্নাফই কোরাইশ গোত্রের নেতৃত্ব লাভ করেন। তাঁরই খান্দান ছিল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খান্দান। আব্দে মন্নাফের ছয় পুত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে হাশেম সর্বাধিক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। তিনিই আব্দুদ্দারের কাছ থেকে হরমে কাবার তত্ত্বাবধায়কের পদটি ছিনিয়ে নিতে তার ভাইদিগকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু আব্দুদ্দারের খান্দান এ পদ ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানাল এবং যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হতে লাগল। অবশেষে এ মর্মে সন্ধি স্থাপন করা হয়েছিল যে আব্দুদ্দারের নিকট থেকে হজযাত্রীদের যমযমের পানি পান করান এবং সাধারণ পানাহার করানোর দায়িত্ব ফেরত নিয়ে হাশেমকে দেয়া হবে। অতঃপর শর্ত অনুযায়ী তা বাস্তবায়িত হল।

হাশেম অতি উত্তমরূপে এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি হজযাত্রীদেরকে তৃপ্তি সহকারে পানাহার করাতেন, চর্মনির্মিত হাউজে পানি ভর্তি করে যম্‌যম্ কূপ এবং 'মিনার' পথিপার্শ্বে রেখে দিতেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে তিনি চরম উন্নতি সাধন করছিলেন। তিনি রোমান সম্রাটের কাছ থেকে পত্রালাপের মাধ্যমে এ মর্মে ফরমান লিখিয়ে নিলেন যে কোরাইশরা ব্যবসায়ের পণ্যসহ্ তাঁর দেশে গেলে তাদেরকে ট্যাক্‌স্ দিতে হবে না। আবিসিনিয়ার শাসনকর্তা নাজ্জাশীর নিকট হতেও তিনি অনুরূপ ফরমান লিখিয়ে নেন। এভাবে আরবগণ শীতকালে ইয়ামন এবং গ্রীষ্মকালে সিরিয়া ও এশিয়া মাইনর পর্যন্ত ব্যবসায়ের পণ্য নিয়ে যেতেন। এশিয়া মাইনরের বিখ্যাত নগরী আঙ্গুরা বা আন্‌কারা তৎকালে রোমান সম্রাট কায়সারের রাজধানী ছিল। 'কোরাইশ' বণিকদল আঙ্গুরা গমন করলে সম্রাট কায়সার তাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতেন।

আরবের বাণিজ্যপথ নিরাপদ ছিল না। তাই হাশেম সমগ্র দেশ ভ্রমণ করে সকল গোত্রের সাথে এ মর্মে চুক্তি করলেন যে কেউ কোরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার কোন ক্ষতি করবে না। এর পুরস্কারস্বরূপ স্বয়ং কোরাইশ বণিক দল প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীসহ সকল গোত্রের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করবে। এ কারণেই আরব দেশে সাধারণভাবে লুণ্ঠন, অপহরণ চলতে থাকলেও কোরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা সর্বদা নিরাপদ থাকত।[১]

একবার মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। সে দুর্ভিক্ষকালে হাশেম রুটির টুকরো করে শুরুয়া বা তরকারির ঝোলে মিশ্রিত করে জনসাধারণকে পরিবেশন করতেন। তখন থেকে তার হাশেম নামের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। আরবী ভাষায় هشم (হশ্‌ম) শব্দের অর্থ কোন কিছু ভেঙে টুকরো করে ফেলা। এ শব্দ থেকে উৎপন্ন গুণবাচক বিশেষ্য হল হাশেম (هاشم)।

হাশেম একবার বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া গিয়েছিলেন। পথে মদীনায় কিছুকাল অবস্থান করেন। সেখানে সারা বছরই বাজার বসত। ব্যবসা ব্যপদেশেই মদীনার অতি সম্ভ্রান্ত ঘরের এক মহিলার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তার চাল-চলন, ভদ্রতা এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পান। মেয়েটি রূপে-গুণেও অসামান্য ছিল। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে সে বনী নাজ্জার খান্দানের মেয়ে। তার নাম সাল্‌মা। সবকিছু জেনে-শুনে হাশেম তার বিয়ে প্রার্থী হন। তাঁর সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয় এবং যথারীতি বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। এর কিছুদিন পর তিনি সিরিয়া চলে যান। গাজায় পৌঁছে তিনি পরলোকগমন করেন। এদিকে সালমার গর্ভে তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করে। তার নাম রাখা হয় শাইবা। সবাই প্রায় আট বছর পর্যন্ত মদীনাতেই লালন-পালন হল। হাশেমের ভাই মোত্তালিব সব ঘটনা জানতে পেরে অবিলম্বে মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের অনুসন্ধান করলেন। সালমা তার আগমনবার্তা পেয়ে তাকে ডেকে পাঠালেন। সেখানে তিনি অতিথিরূপে তিনদিন অবস্থান করার পর চতুর্থ দিনে শাইবাকে সংগে নিয়ে মক্কা রওয়ানা হয়ে গেলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র আট বছর। মক্কা আসার পর তার নাম রাখা হল "আবদুল মোত্তালিব"।

আব্দুল মোত্তালিব শব্দের অর্থ মোত্তালিবের গোলাম বা দাস। জীবনচরিত প্রণেতাগণ অনুরূপ নামকরণ করার বহু কারণ উল্লেখ করেছেন। সবচেয়ে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য কারণ হল এই যে যেহেতু তার পিতৃব্য মোত্তালিব তাঁর লালন-

১. আবু আলী কালীব আমানী দ্রষ্টব্য।
২. তাবারী, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১০৮৬-১০৮৭

পালন করেছিলেন আর তিনি পিতৃহীন ছিলেন, এ কারণে আরব দেশের পরিভাষা অনুযায়ী তাঁকে মোত্তালিবের গোলাম বলা হত। পরবর্তীকালে তিনি এ নামেই খ্যাত হয়েছিলেন।[১]

আবদুল মোত্তালিবের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল যমযম কূপের সংস্কার সাধন। দীর্ঘকাল মাটি ভর্তি হতে হতে সেটি প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল। তিনি অনুসন্ধান চালিয়ে সঠিক স্থান উদ্ধার করেন এবং নতুন করে খনন করতঃ তার সংস্কার সাধন করেন।

তিনি মানত করেছিলেন যে দশটি ছেলেকেই যৌবনে পদার্পণ করতে দেখলে তিনি তাদের একজনকে আল্লাহ্‌র নামে কোরবানী করবেন।

আব্দুল্লাহ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আবদুল মোত্তালিবের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। তাঁর দশটি পুত্রই যৌবনে পদার্পণ করলেন। তিনি তাদেরকে সাথে নিয়ে কাবাগৃহে আগমন করলেন এবং কাবার পুরোহিতকে বললেন, এদের নামে লটারী দিয়ে দেখুন, কোরবানীর জন্য কার নাম আসে। ঘটনাক্রমে আবদুল্লার নাম এল। তিনি তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেলেন। আব্দুল্লাহ্‌র বোনেরা সংগেই ছিলেন। তাঁরা সবাই কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে আবেদন করলেন যে তার পরিবর্তে দশটি উট কোরবানী করুন এবং তাকে রেহাই দিন। তখন আবদুল মোত্তালিব পুরোহিতকে বললেন, আবদুল্লাহ্ এবং দশটি উটের মধ্যে লটারী দিয়ে দেখুন ফলাফল কি দাঁড়ায় ? ঘটনাক্রমে এবারও আবদুল্লাহ্‌র নামই লটারীতে এল। তখন আবদুল মোতালিব উটের সংখ্যা বাড়িয়ে দশের স্থলে বিশ করে দিলেন। এভাকে উটের সংখ্যা বেড়ে একশ'তে গেয়ে পৌছলে পুত্রের স্থলে উটের নাম এল। তখন আবদুল মোত্তালিব একশ' উট কোরবানী করলেন। এভাবে আবদুল্লাহ্‌র প্রাণ রক্ষা পেল। এটা ওয়াকেদীর বর্ণনা। ইবনে ইস্‌হাকের বর্ণনামতে, পুত্রের পরিবর্তে উট কোরবানী করার প্রস্তাব কোরাইশ বংশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ দিয়েছিলেন।

আবদুল মোত্তালিবের দশ-বারজন পুত্রের পাঁচজন ইসলামের ইতিহাসে সুখ্যাত অথবা কুখ্যাত ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন, আবু লাহাব, আবু তালেব, হযরত আবদুল্লাহ, হযরত হামযা (রাঃ) এবং হযরত আব্বাস (রাঃ)। সাধারণত বলা হয় যে আবু লাহাবের প্রকৃত নাম অন্য কিছু ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অথবা সাহাবাগণ তাঁকে আবু লাহাব নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু মূলত এ কথাটি ভুল। তবকাতে ইবনে সা'আদে স্পষ্টত বলা হয়েছে যে স্বয়ং আবদুল মোত্তালিবই তাকে এ আখ্যা দান করেছিলেন। কারণ, আবু লাহাব ছিল খুব সুশ্রী,

১. যারকানী, ১ম খণ্ড, ৮৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

লাল টুকটুকে চেহারাবিশিষ্ট। আরবী ভাষায় অনুরূপ ব্যক্তিকে লাহাব বা অগ্নিস্ফুলিংগ বলা হয়। যেমন—ফার্সীতে বলা হয় আতেশী রুখসার।

আবদুল্লাহ্ কোরবানী থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর আব্দুল মোত্তালিব তাঁর বিয়ের কথা ভাবতে লাগলেন। যুহ্‌রা গোত্রে ওয়াহাব ইবনে আব্দ মন্নাফের এক কন্যা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল আমেনা। সমগ্র কোরাইশ গোত্রে আমেনা ছিলেন অনন্যা। তখন আমেনা তাঁর চাচা 'ওহাবের' তত্ত্বাবধানে থাকতেন। আবদুল মোত্তালিব তাঁর নিকট আবদুল্লার বিয়ের পয়গাম দিলেন। কন্যাপক্ষ তা মঞ্জুর করলে যথাসময়ে বিয়ে হয়ে গেল। এ সময়ে স্বয়ং আব্দুল মোত্তালিব ওহাইবের কন্যা হালাকে বিয়ে করেছিলেন। এ 'হালা'র গর্ভেই হযরত হামযাহ্ জন্ম হয়। আত্মীয়তার দিক দিয়ে 'হালা' রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খালা ছিলেন। এ দৃষ্টে হযরত হামযা রসূলুল্লাহ(সাঃ)-এর খালাতো ভাই ছিলেন।

তৎকালে আরব দেশে নিয়ম ছিল বিয়ের পর নতুন বর তিনদিন শ্বশুর বাড়িতে থাকত। সে নিয়মানুসারেই জনাব আবদুল্লাহ্ তিনদিন শ্বশুরালয়ে রইলেন এবং পরে স্বগৃহে ফিরে এলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল কিঞ্চিতাধিক সতের বছর[১]।

জনাব আবদুল্লাহ্ একবার বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া গিয়েছিলেন। প্রত্যাবর্তন-কালে কিছু সময়ের জন্য মদীনা অবস্থান করলেন। কিন্তু আল্লাহ্র কি মহিমা, তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে সেখানেই পরলোকগমন করলেন। জনাব আব্দুল মোত্তালিব এ দুঃসংবাদ শোনার বিস্তারিত জানার জন্য তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হারেসকে পাঠিয়ে দিলেন। হারেস মদীনা পৌছার পূর্বেই জনাব আবদুল্লাহ্ মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সারা খান্দানে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি। তাই তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এল।

জনাব আব্দুল্লাহ্র পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে কয়েকটি উট ও ছাগল ভেড়া আর একটি দাসী ছিল। দাসীটির নাম ছিল উম্মে আয়মন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উত্তরাধিকারী সূত্রে এসব সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। উম্মে আয়মনের প্রকৃত নাম ছিল বারাকা।[২]

১. যারকানী, ১ম খণ্ড, ১২২ পৃষ্ঠা, ৭ম লাইন।
২. তবকাতে ইবনে সা'আদ, ১ম খণ্ড, ১ম অধ্যায়, ৬২ পৃষ্ঠা।

আবির্ভাব

মহাকালের সাজানো এ উদ্যানে বার বার ঋতুরাজ বসন্তের আগমন ঘটেছে। সময়ের সুনিপুণ নিয়ন্তা কোন কোন সময় এ বিশ্বসভাকে এমন সব মনোরম ও চিত্তাকর্ষক সাজে সজ্জিত করেছেন, যার অপরূপ সৌন্দর্য দর্শক মাত্রেরই নয়ন-মনকে বিমুগ্ধ করেছে।

আজকের এ মহান দিনটি এমনই এক মহামহিমান্বিত দিন, যার আগমন আশায়ই বুঝি কোটি কোটি বর্ষব্যাপী মহাকালের এ অবিরাম যাত্রা শুরু হয়েছিল। নভোমণ্ডলের তারকারাজি এবং নীহারিকাপুঞ্জ বুঝি সৃষ্টিকাল থেকেই অপলক দুটি চোখ মেলে তাকিয়ে আছে এ ধূলিমাখা পৃথিবীর দিকে। সে আদিকাল থেকেই চাঁদ-সুরুজ বুঝি রাত-দিনের পরিক্রমায় এ শুভক্ষণটির জন্যই পথ চেয়ে বসেছিল।

এ মহাকালের অনন্ত রহস্যরাজ্য রবি-শশীর উদয়-অস্ত, স্নিগ্ধ বায়ুর প্রবাহ, আকাশে উড়ন্ত মেঘমালার বিচরণ সবকিছুই যুগের পর যুগ ধরে যাঁর অপেক্ষায় সময় অতিবাহিত করছে।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর তওহীদ, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর অপরূপ লাবণ্য, হযরত মূসা (আঃ)-এর অলৌকিক ক্ষমতা, হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি বুঝি তিলে তিলে সঞ্চয় করে অতি সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, সে মহামানবের আগমন পথের ধারে ধারে। আজকের এ মহা প্রতীক্ষিত স্নিগ্ধ প্রভাত, জগৎসভার সে মহাপ্রভাত, যে প্রভাতে বিশ্বের সৌভাগ্যের দ্বার সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হয়েছে। সে প্রতীক্ষিত মহামানবের আগমনে সবই ধন্য হয়েছে। ধন্য হয়েছে জগৎ, ধন্য হয়েছে মহাকালের সে অবিরাম কালপরিক্রমা। ধন্য হয়েছে পৃথিবীর মানুষ, ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা এ পৃথিবীর মাটি, পাহাড়, নদ-নদী, সাগর, মরুভূমি।

সে মহামানবের আগমন মুহূর্তটির অপরূপ মহিমা লিপিবদ্ধ করার মত কলম কি কারও আছে ? সীরাত লেখকগণ সর্বশক্তি প্রয়োগ করে যা প্রকাশ করেছেন, তাতে দেখা যায়, সে মহিমামণ্ডিত শুভ প্রভাত আগমনের পূর্বমুহূর্তে পারস্য সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী রাজপ্রাসাদের চৌদ্দটি মিনার ধূলায় লুটিয়ে পড়েছিল। মুহূর্তে নিভে গিয়েছিল অগ্নি উপাসকদের সহস্র বছর ধরে প্রজ্বলিত সেই ঐতিহ্যবাহী অগ্নিকুণ্ড। শুকিয়ে গিয়েছিল শ্বেত সাগরের অথৈ বারিরাশি!

রোমের সেই সুপ্রাচীন মানবতাবিরোধী সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিটি উদ্ধত প্রাসাদ শীর্ষে থেকে সত্যি সত্যিই শোষিত-নির্যাতিত মানুষের মহান বন্ধু সে মহামানবের আবির্ভাব মুহূর্তটিতেই মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠেছিল।

সে মহামানবের আগমন বার্তাই বয়ে এনেছিল ক্ষমতামত্ত পারস্য সাম্রাজ্যের শোষণ-নির্যাতনের সব অগ্নিশিখার মরু সাইমুমের প্রলয় মাতন। সহস্র বছরের শোষণ-ত্রাসনের নরককুণ্ড থেকে নির্যাতিত মানবাত্মার চিরমুক্তির মহান আশ্বাস ঘোষিত হয়েছিল!

সে মহামানবের আগমনবার্তা বয়ে প্রভাতী মলয় যেদিকে ছুটেছে, সেদিকেই মূর্তিপূজার পাষাণ বেদীতে ফাটল সৃষ্টি করে মানব-মনের আকাশে যুগের পর যুগ সঞ্চিত ঘোর কালো অন্ধকারের ভূলুণ্ঠিত করেছে এক-একটি প্রাচীর। অগ্নি উপাসকদের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ল, খৃষ্টবাদের পত্র-পুষ্পরাজি যেন একটি একটি করে ঝরে পড়ল।

চারদিকে ঘোষিত হল তওহীদ, মানবতা আর ইনসাফের জয়ধ্বনি। সত্য-ন্যায়, কল্যাণ ও সমৃদ্ধির নতুন সূর্যের উদয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বিশ্বমানবতা। সে আলোর জ্যোতি পতিত হল মানুষের হৃদয়কুঞ্জে।

আব্দুল্লাহ্র নয়নমণি, আমেনার হৃদয়ের ধন, মক্কা-মদীনার আলো, শাহানশাহে আরব ও আজম, সারওয়ারে কাওনাইন, বিশ্বত্রাতা মোহাম্মদ মোস্তাফা, আহমদ মোজতাবা (সাঃ)-এর রূহানী দুনিয়া থেকে এ বস্তুজগতে আগমন করলেন! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন।

জন্মতারিখ

রসূলে পাক (সাঃ)-এর জন্মতারিখ সম্পর্কে মিসরের বিখ্যাত জ্যোতিষ-শাস্ত্রবিদ মাহমুদ পাশা ফালাকী একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। তাতে তিনি গাণিতিক যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে রসূলে পাক (সাঃ)-এর জন্মতারিখ রবিউল আউয়াল মাসের ৯ম তারিখ সোমবার মোতাবেক ২০শে এপ্রিল ৫৭১ খৃষ্টাব্দে। তাঁর নাম রাখা হয় 'মোহাম্মদ' এবং সাধারণভাবে একথা প্রচলিত রয়েছে যে তাঁর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবই এ নাম রেখেছিলেন।[১]

---

১. মাহমুদ পাশা যে সমস্ত যুক্তি পেশ করেছেন তা কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃত। নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা উদ্ধৃত হল।

১। সহীহ্ বোখারী শরীফে লিখিত রয়েছে যে রসূলে পাক (সাঃ)-এর শিশু-পুত্র হযরত ইবরাহীমের মৃত্যুর সময় সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। এ ঘটনা হিজরী ১০ সনে সংঘটিত হয় এবং রসূলে পাকের বয়স তখন ৬৩ বছর।

২। গাণিতিক নিয়মে হিসাব করলে দেখা যায়, ১০ম হিজরীতে সংঘটিত সূর্যগ্রহণ ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারি সকাল ৮ টা ৩০ মিনিটের সময় শুরু হয়েছিল।

৩। উক্ত হিসাব মতে প্রমাণিত হয় যে যদি এ ঘটনার সময় থেকে ৬৩টি চান্দ্র বর্ষ বিয়োগ করা হয়, তবে রসূলে পাকের (সাঃ) জন্মতারিখ গাণিতিক যুক্তিতে ৫৭১ খৃঃ ১২ই এপ্রিল মোতাবেক ১লা রবিউল আওয়াল।

৪। তাঁর জন্মতারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিক এবং সীরাতকারকগণের মধ্যে যদিও মতভেদ রয়েছে, তথাপি তাঁরা এ বিষয়ে একমত যে তিনি রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম পক্ষে সোমবার জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তা ৮ থেকে ১২ তারিখের মধ্যকার কোন একদিন ছিল।

৫। রবিউল আউয়াল মাসের উক্ত তারিখগুলোর মধ্যে ৯ তারিখেই সোমবার দিন পড়ে। উপরোক্ত হিসাবের পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ৫৭১ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিলেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

দুগ্ধপান

জন্মলাভের পর তিনি সর্বপ্রথম তাঁর মাতা হযরত আমেনার স্তন্যপান করেন। দু-তিনদিন পর তাঁর পিতৃব্য আবু লাহাবের সোওয়াইবিয়া নাম্নী জনৈকা দাসী তাকে স্তন্য দান করেন।[১]

ভাগ্যবতী হালীমা

সোওয়াইবিয়ার পর ভাগ্যবতী হালীমা (রাঃ) তাঁকে দুগ্ধপান করান। তৎকালে আরবের সম্ভ্রান্ত শহরবাসিগণ শুদ্ধ আরবী ভাষা আয়ত্তকরণ এবং মরুভূমির উন্মুক্ত পরিবেশে লালিতপালিত হয়ে প্রকৃত আরবীয় বৈশিষ্ট্যাবলী আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে নিজেদের সন্তানদেরকে শহরের কলুষিত, মিশ্র পরিবেশ থেকে দূরে বেদুঈন পরিবারগুলোর হাতে প্রতিপালনের জন্য দিয়ে দিতেন।[২]

সম্ভ্রান্ত আরবগণ বহু কাল যাবৎ এ প্রথাটি সযত্নে রক্ষা করে আসছিলেন। এমন কি বনী উমাইয়্যারা যখন দামেশকে রাজধানী স্থাপন করে রোম ও পারস্য সম্রাটদের ন্যায় জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন করতেন, তখনও তাদের শিশু-সন্তানগণ মরুভূমির বেদুঈন পরিবারে প্রতিপালিত হয়েছে। ওলীদ ইবনে আবদুল মালেককে কোন কারণে লালনপালনের জন্য বেদুঈনের নিকট পাঠানো সম্ভব হয়নি। এর ফলে উমাইয়্যা বংশের মধ্যে একমাত্র ওলীদই বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলতে পারতেন না।[৩]

সুতরাং উপরোক্ত প্রথানুযায়ী বছরে দু'বার গ্রাম্য মহিলাগণ শহরে আসত। সম্ভ্রান্ত ও ধনী শহরবাসীরা তদের দুগ্ধপোষ্য শিশু প্রতিপালনের জন্য তাদের হাতে অর্পণ করতেন। উপরোক্ত প্রথানুসারে রসূলে পাক (সাঃ)-এর জন্মের কয়েকদিন অন্তর হাওয়াযিন গোত্রের কতিপয় মহিলা পোষ্যগ্রহণের আশায় মক্কায়

১. বোখারী "ইয়াহরুমু মিনার রাজা'য়াতে মা ইয়াহরুমু মিনান্নাসাবে" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২. ইমাম সুহাইলী অতি বিস্তৃতভাবে এ ঘটনাগুলোর বিবরণ দিয়েছেন। হাদীসেও উল্লেখিত হয়েছে যে রসূলে পাক (সাঃ) বলতেন ঃ বনী-সা'দিয়া গোত্রে প্রতিপালিত হওয়ার ফলেই আমি বিশুদ্ধ ভাষায় আরবী বলতে পারি। (রওযুল আনুফ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৯)। স্যার উইলিয়াম নামক জনৈক ইউরোপীয় গ্রন্থকার তাঁর লাইফ অব মোহাম্মদ (Life of Mohammad) গ্রন্থে লিখেছেন, "মোহাম্মদ (সাঃ)-এর স্বাস্থ্য খুবই ভাল ছিল। তিনি অমুখাপেক্ষী ও মুক্ত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর শৈশবের পাঁচ বছরকাল সময় বনী সা'দিয়া গোত্রে অতিবাহিত করার ফলেই তিনি উপরোক্ত গুণ ও স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। একমাত্র এ কারণেই তাঁর বক্তৃতায় বিশুদ্ধ আরবীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল।"

৩. ইবনে আসীর, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৬ লিডনে মুদ্রিত।

এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত হালীমা (রাঃ)-ও ছিলেন, কিন্তু সঙ্গের অন্যান্য মহিলাগণ পোষ্য পেলেও ঘটনাক্রমে তিনি তখনও কোন পোষ্য পাননি।[১]

রসূলে করীম (সাঃ)-এর মাতা হযরত হালীমা (রাঃ)-কে ধাত্রী হিসাবে নিযুক্ত করতে প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু হালীমা (রাঃ)-এর মনে আশংকা হল যে পিতৃহীন শিশুকে প্রতিপালন করলে হয়তো উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাওয়া যাবে না। কিন্তু রিক্তহস্তে ফিরে যাওয়ার চাইতে অগত্যা তিনি হযরত আমেনার প্রস্তাবেই সম্মত হলেন এবং রসূলে পাক (সাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হলেন। শাইমা নামে হযরত হালীমা (রাঃ)-এর একটি মেয়ে ছিল। তিনি শিশু মোহাম্মদ(সাঃ)-কে গভীরভাবে স্নেহ করতেন এবং তাঁর খাওয়া-দাওয়া ও সেবা-যত্নের অধিকাংশ কাজ এ শাইমার দ্বারাই সম্পাদিত হত। দু'বছর প্রতিপালনের পর হযরত হালীমা (রাঃ) মক্কায় গিয়ে শিশু মোহাম্মদ (সাঃ)-কে তাঁর মাতা আমেনার হাতে প্রত্যর্পণ করলেন। কিন্তু তখন মক্কায় ব্যাপক আকারে মহামারী দেখা দেয়ায় মা আমেনা পুত্র মোহাম্মদকে পুনরায় হালীমার হাতেই আরো কিছু দিনের জন্য তুলে দিলেন। এভাবে দ্বিতীয়বার হযরত হালীমা তাঁকে ঘরে নিয়ে এলেন।

রসূলে পাক (সাঃ) কত বছর হযরত হালীমার (রাঃ) ঘরে ছিলেন সে বিষয়ে সীরাত লেখকগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। সুবিখ্যাত সীরাত লেখক ইবনে ইস্হাক অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ৬ বছরের কথা লিখেছেন।

বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলা ও তার চর্চার জন্য আরবে "হাওয়াযিন" গোত্রের প্রচুর খ্যাতি ছিল। সুপ্রসিদ্ধ সীরাত লেখক ইবনে সা'আদ তাঁর রচিত গ্রন্থ 'তবকাতে' রসূলে পাক (সাঃ)-এর একখানি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ "আমি তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী। কেননা, আমি কোরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছি এবং সা'আদ গোত্রে প্রতিপালিত হয়ে তাদের বিশুদ্ধ ভাষা রপ্ত করেছি।" উল্লেখযোগ্য যে বনী সা'আদ হাওয়াযিন গোত্রেরই একটি শাখা।— (তবকাতে ইবনে সা'আদ, ১ম খঃ পৃঃ-৭১)

১. বিখ্যাত জীবনীকার সুহাইলী একস্থানে লিখেছেন যে আরবে শিশু সন্তানগণকে স্তন্যপান করিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাকে ভদ্রোচিত পেশা হিসাবে গণ্য করা হত না। আরবে প্রবাদ ছিল যে ঃ الحرة لاتأكل بثديها। অর্থাৎ "সম্মানীয়া মহিলাগণ স্তন্যপান করিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন না।" সুহাইলী তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লিখেছেন, ঐ সময় আরবে ভীষণ দুর্ভিক্ষের শিকারে পতিত হয়ে হযরত হালীমা ও তাঁর গোত্রের লোকজন এ পেশাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু সুহাইলী ব্যতীত অন্যান্য সকল ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে প্রত্যেক বছর আরবের গ্রাম্য এলাকার মহিলাগণই এ কার্যের আশায় মক্কায় আগমন করতেন। আমার মনে হয়, সাধারণভাবে আরববাসীগণ এ ব্যবসাকে দূষণীয় মনে করতেন না। এক শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত এবং শহরবাসী আরবগণের মধ্যেই হয়ত এ ধারণা সীমাবদ্ধ ছিল।

রসূলে পাক (সাঃ) ধাত্রীমাতা হযরত হালীমা (রাঃ)-কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। পরিণত বয়সে হযরত নবী করিম (সাঃ) যখন নবুওতের মর্যাদায় সমাসীন, তখন একদিন হযরত হালীমা (রাঃ) তাঁর নিকট আসলে তিনি মা মা বলে হযরত হালীমা (রাঃ)-কে জড়িয়ে ধরেছিলেন। এ প্রাণস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী ঘটনার বিবরণ আমরা অন্যত্র আলোচনা করব।

হযরত হালীমা (রাঃ) রসূলে পাক (সাঃ)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বেই পরলোক গমন করেছিলেন বলে সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে কাসীর মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। কেননা, বহু বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও সীরাত লেখক তাঁদের রচিত গ্রন্থসমূহে যেমন— ইবনে আবি খাসিমা তারীখে, আল্লামা ইবনে জওযী 'হাদা'তে মুনযেরী "মুখতাসারে সুনানে আবি দাউদে", ইবনে হাজার 'ইসাবা'তে, উল্লেখ করেছেন যে হযরত হালীমা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হাফেয মুগলতাঈ হযরত হালীমার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে "আত্তোহ্ফাতুল জিস্মিয়াহ্ ফী ইসবাতে ইসলামে হালীমা" নামে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তিকার রচনা করেছেন।—(যারকানী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ-১৬৬)।

হারেস

হযরত হালীমার (রাঃ) স্বামী অর্থাৎ, রসূলে পাক (সাঃ)-এর দুধ-পিতার নাম ছিল হারেস ইবনে আবদুল উয্যা। রসূলে পাক (সাঃ)-এর নবুওতপ্রাপ্তির পর তিনি মক্কায় আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (ইসাবা ফী আহ্ওয়ালিস্ সাহাবা, মিসরে সা'আদত প্রেস হতে প্রকাশিত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৩)।

কথিত আছে যে হারেস রসূলে পাকের (সাঃ) দরবারে এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে "আপনি এ সমস্ত কি বলেন?" রসূলে করীম (সাঃ) উত্তরে বললেন যে হ্যাঁ, অচিরেই সেদিন আসছে, যেদিন আপনাকে আমার কথার সত্যতা সম্পর্কে প্রমাণ দান করব। পরিশেষে হারেস ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

দুধ ভাই-বোন

রসূলে পাক (সাঃ)-এর চারজন দুধ ভাই-বোন ছিলেন। তাঁদের নাম ছিল যথাক্রমে, আব্দুল্লাহ, আনীসা, হুযায়ফা ও হাযাফাহ্। হাযাফাহ্ শাইমা নামেই অধিক পরিচিতা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আবদুল্লাহ এবং শাইমা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, বাকি দুজনের বিষয় পরিষ্কারভাবে জানা যায়নি।

মদীনা ভ্রমণ

রসূলে পাক (সাঃ)-এর বয়স যখন ছয় বছর, তখন মাতা হযরত আমেনা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে পবিত্র মদীনায় গমন করেন এবং সেখানে হযরতের পিতামহ আবদুল মোত্তালিবের মাতামহের বংশ বনী নাজ্জার গোত্রে অবস্থান করেন। হযরতের অন্যতমা ধাত্রী মা, উম্মে আয়মন এ সফরে তাঁদের সাথে ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে হযরত আমেনা উক্ত আত্মীয়তার জন্যই মদীনায় গিয়েছিলেন। কিন্তু তারা অত্যন্ত দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিল। শুধুমাত্র এতটুকু আত্মীয়তার বন্ধন উপলক্ষে তিনি এত দূরদেশ ভ্রমণ করবেন, তা আমার মনে হয় না। কোন কোন ঐতিহাসিকের সে মন্তব্যই আমার নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয় যে হযরত আমেনা মদীনায় সমাহিত তাঁর স্বামী আবদুল্লাহর কবর জেয়ারত করার উদ্দেশ্যেই সেখানে যান। যাহোক, এক মাস মদীনায় অবস্থানের পর প্রত্যাবর্তনকালে "আবওয়া" নামক স্থানে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন (আবওয়া "জুহ্ফা" নামক স্থান থেকে ২৩ মাইল দূরে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম।) এবং এখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। অতঃপর হযরত উম্মে আয়মন (রাঃ) পিতৃ-মাতৃহীন শিশু মোহাম্মদ (সাঃ)-কে সঙ্গে করে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন।

মদীনায় অবস্থানের বহু কথাই রসূলে পাক (সাঃ)-এর কৈশোরের স্মৃতির পাতায় জমা ছিল। পরবর্তীকালে, মদীনায় হিজরতের পর, একদিন তিনি বনী আদীর কয়েকটি কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বললেন, এ গৃহেই আমার স্নেহময়ী জননী কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। এ পুষ্করিণীতে আমি সাঁতার শিখেছি এবং এ মাঠে আমি আনীসা নাম্নী জনৈকা বালিকার সাথে খেলা করেছি। (তাবাকাতে ইবনে সা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ-১৭৩)

আবদুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে

স্নেহময়ী জননীর মৃত্যুর পর পিতামহ আব্দুল মুত্তালিব তাঁর প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি সর্বক্ষণ প্রিয় পৌত্রকে সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন।

রসূলে পাক (সাঃ)-এর বয়স যখন ৮ বছর, তখন তাঁর পিতামহ আব্দুল মুত্তালিব, ৮২ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। জিহুন নামক স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। আব্দুল মুত্তালিবের লাশ সমাধিস্থলে নিয়ে যাওয়ার সময় রসূলে পাক (সাঃ)-ও সঙ্গে ছিলেন এবং প্রিয় পিতামহের বিচ্ছেদ-ব্যথায় কাঁদছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে আবদুল মুত্তালিব তাঁর প্রিয় পৌত্রের প্রতিপালনের দায়িত্ব স্বীয় পুত্র আবু তালেবের উপর সমর্পণ করে যান। আবু তালেব যেরূপ

সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে এ দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন, তা পরে বর্ণনা করা হবে। বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুতে সমাজে বনী হাশেমের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও বিশেষ সম্মান ছিল, তা দ্রুত হ্রাস পেল এবং বনী উমাইয়াদের পার্থিব প্রভাবপ্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেল। বনী উমাইয়ার নামযাদা সন্তান হারব আব্দুল মুত্তালিবের পরিত্যক্ত সামাজিক মর্যাদার আসনটি দখল করে নিল। তখন থেকে হাজিগণকে পানি পান করাবার দায়িত্ব ছাড়া অন্য কোন সামাজিক দায়িত্বই আব্বাসীয়দের হাতে রইল না। আব্বাস ছিলেন আব্দুল মোত্তালিবের কনিষ্ঠ পুত্র।[১]

আবু তালেবের তত্ত্বাবধানে

বিভিন্ন স্ত্রীর গর্ভে আবদুল মুত্তালিবের দশটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করেছিল। তন্মধ্যে রসূলে পাক (সাঃ)-এর পিতা আব্দুল্লাহ্ ও হযরত আবু তালেব ছিলেন একই মায়ের গর্ভজাত। এ কারণেই আব্দুল মুত্তালিব প্রিয় পৌত্র মোহাম্মদ (সাঃ)-এর লালনপালনের ভার আবু তালেবের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। আবু তালেব নিজের ঔরসজাত সন্তানগণের চাইতেও মোহাম্মদ (সাঃ)-কে অধিক স্নেহ করতেন। যেখানে যেতেন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এমন কি, রাত্রে শোবার সময়ও তাঁকে সঙ্গে নিয়ে শুতেন।

সম্ভবত দশ-বার বছর বয়সের সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ছাগল চরানোর কাজ করেছেন। ফ্রান্সের জনৈক খ্যাতনামা ঐতিহাসিক লিখেছেন, হযরত আবু তালেব ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদ(সাঃ)-কে তেমন স্নেহ-যত্ন করতেন না, বরং তাঁকে হীনভাবে রাখতেন। এ কারণেই তাঁকে শিশুকালেই ছাগল চরানোর মত কাজে নিয়োজিত করা হয়েছিল। কিন্তু এ ঐতিহাসিকপ্রবর হয়তো জানেন না যে পশু চরানোর

রসূলে করীম (সাঃ)-কে আবদুল মোত্তালিব যে অত্যন্ত স্নেহ করতেন সেকথা সর্বজন স্বীকৃত হলেও ইউরোপীয় লেখক মারগুলিয়থের নিকট তা গ্রহণযোগ্য হয়নি। তিনি লিখেছেন, "পিতৃ-মাতৃহীন এ শিশুর অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। শেষ বয়সে তাঁর পিতৃব্য হামযাহ্ একদিন মাতাল অবস্থায় মোহাম্মদ (সাঃ)-কে তার পিতার কৃতদাস বলে তিরস্কার করেছিলেন। (লাইফ অব মোহাম্মদ, পৃঃ-৪৫ হতে ৪৯) মারগুলিয়থ তার দাবির প্রমাণস্বরূপ হযরত হামযার (রাঃ)-যে উক্তিটির উল্লেখ করেছেন, তা যে তিনি (হামযাহ্) মাতাল অবস্থায় বলেছিলেন তা স্বীকার করেছেন। বোখারী শরীফের "গযওয়ায়ে বদর ও খুমুস" অধ্যায়ে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। ঘটনা হল এই যে বদর যুদ্ধে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (মালে-গণীমত) থেকে হযরত আলী(রাঃ) দুটি উট পান। তখন পর্যন্ত মদ্যপান নিষিদ্ধ হয়নি। হযরত হামযাহ্ মদ্যপান করে মাতাল অবস্থায় হযরত আলীর প্রাপ্ত উটের পেট চিরে তার হৃৎপিণ্ডের কাবাব তৈরি করেন। এ ঘটনা শুনে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত হামযার নিকট যান এবং তাকে তিরস্কার করেন। হযরত হামযাহ্ তখন মাতাল অবস্থায় ছিলেন এবং এ অবস্থায়ই তাঁর মুখ দিয়ে সে উক্তিটি বের হয়ে পড়ে। এখন জিজ্ঞাস্য যে সে অবস্থার কথা সাক্ষ্য হিসাবে পেশ করা যেতে পারে কি ?

কাজকে তদানীন্তন আরবে হীনকর্ম বলে মনে করা হত না। এ জন্যই আরবের সম্ভ্রান্ত এবং আমীর উমারাদের সন্তানরাও ছাগল পোষা এবং চরানোর কাজ করতেন। আল্লাহ্ পাক স্বয়ং কোরআনে ঘোষণা করছেন ঃ "আর সেগুলোতে তোমাদের জন্য সৌন্দর্য বিদ্যমান, যখন সন্ধ্যায় সেগুলোকে ঘরে তোল এবং যখন চারণভূমিতে ছেড়ে দাও।—(সূরা আননাহ্ল, ৬ আয়াত)

প্রকৃতপক্ষে রসূলে পাক (সাঃ)-এর বকরী রাখালির কর্মটি সমস্ত বিশ্বজগতের রাখালিরই ভূমিকা ছিল।

নবুওতপ্রাপ্তির পর তিনি সময় সময় তাঁর শৈশবকালের সহজ-সরল ও আনন্দময় কাজকর্মের স্মৃতিচারণ করতেন। একদিন রসূলে পাক (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে কোন একটি জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। এ জঙ্গলে প্রচুর বন্য কুলগাছ ছিল এবং সেগুলোতে তখন প্রচুর কুল ধরেছিল। সাহাবায়ে কেরাম উক্ত বৃক্ষের কুল খেতে লাগলেন। তা দেখে রসূলে পাক (সাঃ) বললেন—দেখ, যে কুলগুলো পেকে কাল হয়েছে সেগুলো খাও। কেননা, এগুলো অন্যগুলোর চাইতে বেশি মিষ্টি। বাল্যকালে আমি যখন এখানে বকরী চরাতে আসতাম, তখন আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। (তবকাতে ইবনে সা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ-৮০। বোখারী কিতাবুল হিজারাহ্)।

দামেশক ভ্রমণে বালক মোহাম্মদ (সাঃ)

হযরত আবু তালেব ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কোরাইশদের মধ্যে এ প্রথা বহু পূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল যে তারা বছরে একবার বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ার দিকে যেতেন। রসূলে পাক (সাঃ) যখন বার বছর বয়সে পদার্পণ করলেন, তখন আবু তালেব নিয়মানুযায়ী বাণিজ্য উপলক্ষে দামেশক যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। রাস্তার কষ্ট এবং অন্যান্য নানাবিধ কারণে তিনি বালক ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে নিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু রসূলে পাক (সাঃ) হযরত আবু তালেবকে অত্যন্ত ভালবাসতেন বিধায় যখন তিনি বাড়ি থেকে যাত্রা করলেন, তখন বালক মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। হযরত আবু তালেব প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্তরে কষ্ট দিতে পছন্দ করলেন না। সুতরাং ভ্রাতুষ্পুত্রকেও সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলেন। সাধারণ ঐতিহাসিকদের মতে বুহাইরা নামক সন্ন্যাসীর সাথে সাক্ষাতের বিখ্যাত ঘটনাটি এ সফরেই ঘটেছিল। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে সীরাত লেখকগণ লিখেছেন—হযরত আবু তালেব বসরা শহরে বুহাইরা নামক জনৈক খৃষ্টান পাদ্রীর আস্তানায় উপস্থিত হলেন। বুহাইরা রসূলে পাক (সাঃ)-কে দেখে বললেন, ইনিই প্রতিশ্রুত সেই সর্বশ্রেষ্ঠ নবী (সাইয়্যেদুল মুরসালীন)। সমবেত লোকজন প্রশ্ন করল যে আপনি

কিভাবে জানলেন? তিনি বললেন, যখন তোমরা পাহাড় থেকে নামছিলে তখন সমুদয় প্রস্তর বৃক্ষ তাঁর প্রতি সম্মানার্থে মাথা অবনত করেছিল।

এ ঘটনার বিবরণটি বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্নভাবে দেয়া হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় যে এ বিবরণটি সাধারণ মুসলমানের কাছে যেমন প্রিয়, খৃষ্টানদের কাছে ততোধিক প্রিয়। স্যার উইলিয়াম ম্যুর, ড্রেপার, মারগোলিয়থ প্রমুখ খৃষ্টান লেখকগণ এ ঘটনাকে খৃষ্টবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের এক প্রকৃষ্ট উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন।[১] এরা দাবি করেছেন যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব ও গুপ্ত-রহস্য এ পাদ্রীর কাছ থেকেই শিখেছিলেন। শুধু তাই নয়, উপরন্তু যে সূক্ষ্মতত্ত্ব তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে শিক্ষা দান করেন তার উপরই ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও বিশ্বাসের মূল ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে এবং ইসলামের যাবতীয় উত্তম রীতিনীতিই উক্ত তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও টীকা মাত্র।

খৃষ্টান গ্রন্থকারগণ যদি এ ঘটনাকে সঠিক বলে স্বীকার করতে চান, তবে যেভাবে প্রকৃত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবেই স্বীকার করা উচিত। এ ঘটনায় বুহাইরা কর্তৃক বালক মোহাম্মদ (সাঃ)-কে কোন কিছু শিক্ষা দেয়ার কথা মোটেই উল্লিখিত হয়নি। মাত্র দশ-বার বছরের বালককে ধর্মের যাবতীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব শিক্ষাদানের কথা সাধারণ বিবেকবুদ্ধিতেও সম্ভব বলে মনে হয় না। অবশ্য একে যদি বুহাইরার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বলে ধরে নেয়া হয়, তবুও প্রশ্ন থেকে যায় যে বুহাইরা একজন অপরিচিত ও অসহায় আরব বালকের জন্য এতটুকু আগ্রহ প্রকাশ করতে গেলেন কেন?

অধিকন্তু বুহাইরার সংগে বালক মোহাম্মদের এ সাক্ষাৎকারের সময়টুকু কত দীর্ঘ ছিল ?

প্রকৃতপক্ষে, এ ঘটনাটিরই কোন মূলভিত্তি নেই। কেননা, যেসব সূত্রে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তার সমস্ত সূত্রই 'মুরসাল'। অর্থাৎ ঘটনার প্রথম বর্ণনাকারী উক্ত ঘটনা সংঘটিত হবার সময় স্বশরীরে উপস্থিত ছিলেন না, কিংবা যে বর্ণনাকারী ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন কখনও তাঁর নাম বলা হয় না।

---

১. ড্রেপার সাহেব "বিদ্যা ও ধর্ম" অধ্যায়ে লিখেছেন ঃ বুহাইরা দামেশকের জনৈক খৃষ্টান পাদ্রী রসূলে পাক (সাঃ)-কে ফুসতুরীয় (খৃষ্টানদের অন্যতম ধর্মীয় শাখা) ধর্ম বিশ্বাসের মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর প্রশিক্ষণাধীন, কিন্তু অত্যন্ত গ্রহণক্ষমতা সম্পন্ন মেধা শুধু গুরুর ধর্মীয় শিক্ষাই গ্রহণ করেননি, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দার্শনিকসুলভ ধ্যান-ধারণার গভীর প্রভাবও গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর গৃহীত কর্মপদ্ধতির মধ্যে একথার পরিষ্কার নিদর্শন পাওয়া যায় যে বুহাইরা কর্তৃক শিক্ষা দেয়া ধর্মীয় বিশ্বাস তাঁর জীবনে কত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্যার উইলিয়াম মুওর সাহেবও অত্যন্ত উৎসাহভরে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে মূর্তিপূজা সম্পর্কে রসূল (সাঃ)-এর আন্তরিক ঘৃণা এবং নতুন একটি ধর্ম প্রচারের প্রেরণা এবং মূলনীতিগুলো তাঁর সে ভ্রমণের এবং এটির বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ফলশ্রুতি। তবে একথা যদি স্বীকার করেও নেয়া হয় যে রসূলে পাক (সাঃ) খৃষ্টান পাদ্রীদের দীক্ষায় দীক্ষিত ও তাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন, তবে একত্ববাদ সম্পর্কে তাঁর মনে দৃঢ়তা ও ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হতে পারত না। পবিত্র কোরআনের প্রতিটি পৃষ্ঠা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে।

যতগুলো সূত্রে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত সূত্রটিই সর্বাধিক প্রামাণ্য বলে মনে হয়। এ বর্ণনাটিতে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

১। ইমাম তিরমিযী (রাঃ)-এ বর্ণনাটিকে 'হাসান' এবং 'গরীব' বলে উল্লেখ করেছেন এবং এটিও উল্লেখ করেছেন যে এ সূত্রটি ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এ হাদীসটি আমি দেখিনি। হাসান হাদীসের মর্যাদা "সহীহ্ হাদীসের" চাইতে এমনিতেই কম, তা যদি আবার "গরীব" বা একটি মাত্র সূত্রে বর্ণিত হয়, তখন তার মর্যাদা আরও হ্রাস পায়।

২। এ হাদীসের বণনাকারীদের মধ্যে আবদুর রহমান ইবনে গাযওয়ান নামক জনৈক ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। মোহাদ্দেসগণের মধ্যে যদিও বহু মোহাদ্দেস তাঁকে নির্ভরযোগ্য হিসাবে গণ্য করেন, কিন্তু অধিকাংশ মোহাদ্দেসই তাঁর প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। আল্লামা যাহাবী তাঁর রচিত "মীযানুল ই'তেদাল" গ্রন্থে আবদুর রহমানকে অযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে বুহাইরা সম্পর্কিত হাদীসটি হল তাঁর বর্ণিত সর্বাপেক্ষা বড় মুনকার হাদীস।

৩। বিখ্যাত হাদীসবিদ হাকেম "মুস্তাদরাক" গ্রন্থে এ হাদীসটিকে ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে বলে লিখেছেন। "তালখীসুল-মুস্তাদরাকে" আল্লামা যাহাবী, হাকেমের এ মত উল্লেখ করে লিখেছেন যে "আমি এ হাদীসের কোন কোন ঘটনাকে স্বরচিত মিথ্যা ও বানোয়াট বলে মনে করি।" (নাব্‌রাস ফী শরহে উয়োনুস সিয়ার লি ইবনে সাইয়্যেদিন নাস, যারকানী, মীযানুল ই'তেদাল এবং ইসাবা ইত্যাদি গ্রন্থে "আবদুর রহমান ইবনে গাযওয়ান" সম্পর্কিত বর্ণনা দ্রষ্টব্য। মুস্তাদরাকে হাকেম মা'আ তালখীস, ২য় খণ্ড, পৃঃ-৬১৫)।

৪। এ হাদীসে হযরত বেলাল (রাঃ) ও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) রসূলে পাক (সাঃ)-এর ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন বলে উল্লিখিত হয়েছে। অথচ তখন হযরত বেলালের (রাঃ) কোন অস্তিত্বই ছিল না এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)-ও শিশু ছিলেন মাত্র।

৫। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হলেন এ হাদীসের সর্বশেষ বর্ণনাকারী। অথচ তিনি এ ঘটনার সাথে সংযুক্ত ছিলেন না। অপর পক্ষে তিনি কার নিকট থেকে শুনেছেন তাও হাদীসটিতে উল্লিখিত হয়নি। তিরমিযী ব্যতীত তাবাকাতে ইবনে সা'আদ (১ম খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃঃ-৭৫) নামক গ্রন্থে এ হাদীসটি 'মুরসাল' অথবা "মু'দাল" হাদীস হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। মুরসাল হাদীসে কোন তাবেয়ী হলেন শেষ বর্ণনাকারী এবং এটা স্বতঃসিদ্ধ যে কোন তাবেয়ী এ ঘটনার সাথে জড়িত হতে পারে না। মু'দাল হাদীসের বিশেষত্ব হল এই যে তাকে শেষের দুজন বর্ণনাকারী নাম (যাঁরা যথাক্রমে তাবেয়ী ও সাহাবী) উল্লিখিত হয় না।

৬। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বর্ণনাকারিগণের সম্মান রক্ষার্থে এ হাদীসটি শুদ্ধ বলে স্বীকার করেছেন, কিন্তু যেহেতু এ ঘটনার সাথে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত বেলালের (রাঃ) পক্ষে সংশ্লিষ্টতা কোন মতেই সম্ভব নয়, তাই হাদীসের এ অংশটুকু ভুলক্রমে এর সাথে যুক্ত হয়ে গেছে বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানীর এ দাবিও সঠিক নয় যে এ হাদীসের সমস্ত বর্ণনাকারী অনির্ভরযোগ্য। কেননা, তিনি নিজেই তাহ্যীবুত্তাহ্যীব গ্রন্থে আবদুর রহমান ইবনে গাযওয়ান সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে "তিনি ভুল করতেন।" ইবনে গাযওয়ানের প্রতি সন্দেহ করার কারণ হল এই যে তিনি মামালীকের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। অথচ মামালীকের বর্ণিত একটি হাদীসকে মোহাদ্দেসগণ স্বরচিত ও মিথ্যা বলে মনে করেছেন।

ফুজ্জার যুদ্ধে অংশগ্রহণ

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত আরবে যেসমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ একাধারে চলে আসছিল তন্মধ্যে ফুজ্জারের যুদ্ধই ছিল সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ। কোরাইশ এবং কায়েশ গোত্রের মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কোরাইশ বংশীয় প্রত্যেকটি গোত্রই এ যুদ্ধে পৃথক পৃথক সেনাবাহিনী গঠন করে অংশগ্রহণ করেছিল। হাশেমী গোত্রের সদস্য সমন্বয়ে যে সৈন্যদলটি গঠিত হয়েছিল, যুবাইর ইবনে আবদুল মুত্তালিব ছিলেন তাদের পতাকাবাহী ও সেনাপতি। তিনি যে ব্যূহে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিলেন, রসূলে পাক (সাঃ)-ও সে ব্যূহের একজন অন্যতম যোদ্ধা ছিলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর প্রথমে বনী কায়েসের পক্ষে জয়ের সূচনা দেখা গেলেও পরিশেষে কোরাইশরাই বিজয় লাভ করে এবং সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে কোরাইশ পক্ষের প্রধান সেনাপতি ছিলেন হারব ইবনে উমাইয়্যা। তিনি হযরত আবু সুফিয়ানের পিতা এবং আমীর মুয়াবিয়ার (রাঃ) পিতামহ ছিলেন।

যেহেতু কোরাইশ বংশীয় লোকজন ন্যায়সঙ্গত কারণে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন এবং এর সঙ্গে বংশের মান-মর্যাদার প্রশ্নও জড়িত ছিল, সেজন্য রসূলে পাক (সাঃ) নিজেও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে একথা সত্য যে (ইবনে হিশামের মতে) তিনি কাকেও আক্রমণ করেননি। ইমাম সুহাইলি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে তিনি নিজে যুদ্ধ করেননি। নিম্নে ইমাম সুহাইলির বক্তব্য উদ্ধৃত করা হল।

" তিনি নিজে এ যুদ্ধে (সক্রিয়ভাবে) যুদ্ধ করেননি যদিও যুদ্ধ করার মত বয়স তখন তাঁর ছিল। এর কারণ হল এই যে প্রথমত, এটি আইয়্যামে হারামের সময় সংঘটিত হচ্ছিল। দ্বিতীয়ত, উভয় পক্ষই ছিল কাফের। তৃতীয়ত, কেবল আল্লাহ্ পাকের দেয়া জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

আইয়্যামুল হারাম অর্থাৎ, যেসব মাসে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হওয়া আরবে নিষিদ্ধ ছিল, সে সময় যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল বিধায় এটি হরবুল-ফুজ্জার (পাপীদের যুদ্ধ) নামে অভিহিত হয়।

হালফুল ফুযুল

অনবরত যুদ্ধবিগ্রহের পরিণামে আরবের বহু পরিবারই পুরোপুরি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। হত্যা ও লুটতরাজ ইত্যাদির ন্যায় জঘন্য কার্যাবলী মানুষের দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এ অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য জনমনে আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং ফুজ্জারের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রসূল পাক (সাঃ)-এর পিতৃব্য ও বংশের নেতা, যুবাইর ইবনে আবদুল মুত্তালিবের প্রস্তাবক্রমে বনী হাশেম বংশের, বনী-যুহরা ও বনী তাঈম ইত্যাদি গোত্রের লোকজন আবদুল্লাহ ইবনে জা'দআনের ঘরে সমবেত হয়ে এ মর্মে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করলেন যে "আমরা সবাই অত্যাচারিত ও মযলুমের সহায়তা করব, কোন অত্যাচারী মক্কায় বাস করতে পারবে না।" (তবকাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ-৮২)

রসূলে পাক (সাঃ) নিজেও চুক্তিতে অংশগ্রহণ করলেন। নবুওতপ্রাপ্তির পর তিনি প্রায়শই বলতেন, "এ চুক্তির বিপক্ষে আমাকে যদি রক্তবর্ণের উটও কেউ পুরস্কার প্রদান করত তথাপি আমি এর বিরুদ্ধাচরণ করতাম না এবং আজও যদি কেউ এ ধরনের চুক্তির জন্য আমাকে আহ্বান করে, তাহলে আমি আমার যাবতীয় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য এগিয়ে যাব। (মুস্তাদরাক, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২০)

এ চুক্তিপত্রটি হালফুল ফুযুল নামে অভিহিত হওয়ার কারণ হল এই যে সর্বপ্রথম যে কতিপয় লোকের মনে এ ধরনের একটি চুক্তিপত্র সম্পাদনের ইচ্ছা জাগে তাঁদের প্রত্যেকের নামের সাথেই ফজিলত শব্দটির মূল শব্দ বিদ্যমান ছিল।[১] অর্থাৎ, ফুজাইল ইবনে হারেস, ফুজাইল ইবনে দাকাহ এবং মোফাজ্জল নামক জুরহাম এবং কাতুর বংশের তিনজন লোকের মধ্যে সর্বপ্রথম এ ধরনের চুক্তি সম্পাদনের ইচ্ছা জেগেছিল। পরবর্তীকালে এ ধরনের চুক্তি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং বিস্মৃতির অতল গহ্বরে ডুবে গিয়েছিল বিধায় কোরাইশগণ সেটিকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সম্পাদন করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মূল ভিত্তি স্থাপনকারীদেরকে অবহেলা করা হয়নি। তাদের সদিচ্ছার স্বীকৃতিস্বরূপ পরবর্তী চুক্তির নামকরণ তাঁদের নামানুসারেই করা হয়।

---

১. ইমাম সুহাইলী এ মতের বিরোধিতা করে হারেস ইবনে উসামা রচিত 'মুসনাদ' হতে একখানি হাদীস বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীস মতে মূল চুক্তিপত্রে ــــ শব্দটি বিদ্যমান থাকায় চুক্তিটি "হলফুল ফুযুল" নামে অভিহিত হয়েছে। ترد الفضول على اهلها

পবিত্র কাবাগৃহ নির্মাণ

পবিত্র কাবাগৃহের প্রাচীর এক পুরুষ সমান উচ্চ ছিল এবং আমাদের দেশের ঈদগাহের অনুরূপ তার উপর কোন ছাদ ছিল না। যেহেতু গৃহটি নিম্ন ভূমিতে (উপত্যকায়) নির্মিত হয়েছিল, তাই বৃষ্টি-বাদল হলে শহরের যাবতীয় বৃষ্টির পানি পবিত্র কাবা ঘরে ও তার অঙ্গনে জমা হয়ে তা ডুবিয়ে ফেলত। বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হয়ে যাতে কাবাঙ্গন ডুবিয়ে ফেলতে না পারে তজ্জন্য উপরের বাঁধ নির্মাণ করা হলেও অনেক সময় বাঁধ ভেঙে গিয়ে পবিত্র কাবাগৃহের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করত। পরিশেষে বর্তমান গৃহটি ভেঙে একটি সুদৃঢ় গৃহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সৌভাগ্যবশত সে সময় জেদ্দা বন্দরে একটি বাণিজ্য জাহাজ উপকূলে ধাক্কা খেয়ে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। কোরাইশরা এ ঘটনার সংবাদ পেয়ে ওলীদ ইবনে মুগীরাকে পাঠিয়ে বিধ্বস্ত জাহাজের যাবতীয় কাঠ ক্রয় করে নিয়ে আসে। উক্ত বিধ্বস্ত জাহাজে বাকু নামক জনৈক রোমীয় মিস্ত্রী (সূত্রধর) ছিল। ওলীদ গৃহ নির্মাণে সহায়তা করার জন্য তাকেও সঙ্গে নিয়ে আসে। কোরাইশ বংশীয় সমুদয় লোকজন কাবাগৃহ নির্মাণে অংশ গ্রহণ করেন। কোরাইশ বংশের প্রত্যেক শাখা পবিত্র কাবাগৃহের এক-একটি অংশ নির্মাণের দায়িত্ব নিয়েছিল। যাতে কোন গোত্রই এ সম্মানজনক কাজে অংশগ্রহণের সম্মান থেকে বঞ্চিত না হয়, তজ্জন্যই উপরোক্ত নিয়ম ও নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু গৃহ নির্মাণান্তে হাজরে আসওয়াদ সংস্থাপন নিয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। প্রত্যেক গোত্রের প্রত্যেক নেতাই স্বহস্তে এ পাথর সংস্থাপন করতে ইচ্ছুক ছিল। এ বিষয়ে বাক-বিতণ্ডা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটাবার উপক্রম হল।

বহুকাল পূর্ব থেকেই আরবে এ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে যখন কোন ব্যক্তি কোন উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য নিজের জীবন বাজি রেখে শপথ গ্রহণ করত, তখন কোন পেয়ালাতে রক্ত ভরে তাতে নিজের আঙ্গুলসমূহ ডুবিয়ে নিত। এ ঘটনার সময়ও কোন কোন দাবিদার এ পর্বটি পর্যন্ত উদযাপন করে ফেলল। চারদিন বিবাদ চলবার পর পঞ্চম দিনে কোরাইশদের মধ্যকার সর্বাধিক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি উমাইয়্যাহ ইবনে মুগীরাহ ঘোষণা করলেন যে আগামীকাল ভোরে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি পবিত্র কাবাগৃহে আগমন করবে তাঁকেই আমাদের এ বিষয় মীমাংসা করার দায়িত্ব দেয়া হবে। উপস্থিত সবাই বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সুতরাং পরদিন সমস্ত গোত্রের সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ পবিত্র কাবাগৃহে সমবেত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বিশ্বনিয়ন্তার অপূর্ব মহিমা বোঝা দায়। সমবেত জনমণ্ডলী অত্যন্ত বিস্ময়ভরে দেখতে পেলেন, মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁদের একান্ত কাঙ্ক্ষিত জন সর্বপ্রথম পবিত্র কাবাঙ্গনে প্রবেশ করলেন। সবাই সমস্বরে আনন্দে তাঁকে মধ্যস্থ নিযুক্ত করলেন। রসূলে পাক (সাঃ) ইচ্ছা

করলে নিজে একা একাজ সম্পাদন করে গৌরব লাভ করতে পারতেন। বিশ্বের করুণার আধার দয়ার প্রতীক তা করা পছন্দ করলেন না। তিনি প্রত্যেক গোত্রের একজন করে লোক এ কাজের জন্য নির্বাচনের প্রস্তাব দিলেন। অতঃপর রসূলে পাক (সাঃ) একখানা চাদর বিছিয়ে প্রস্তরটি নিজ হাতে চাদরে রাখলেন। পরে নির্বাচিত নেতাগণকে চাদরের কোণ ধরে নির্দিষ্ট স্থানে উঠিয়ে নিতে বললেন। নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হলে তিনি নিজ হাতে পাথরটি কাবা প্রাচীরে রেখে দিলেন। (মুসনাদে তাইয়ালিসী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৮, "স"।) সম্ভবত এ ঘটনার মধ্যে বিশ্বনিয়ন্তার সে ইঙ্গিতই নিহিত ছিল যে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার পূর্ণতা তাঁর মাধ্যমেই সাধিত হবে।[১]

এভাবে রসূলে পাক (সাঃ)-এর অভাবনীয় উদ্ভাবনী শক্তি ও কর্মপন্থার দরুন একটি মারাত্মক যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে অব্যাহতি লাভ হল। অতঃপর সবার সমবেত প্রচেষ্টায় ছাদবিশিষ্ট গৃহরূপে পবিত্র কাবার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হল। কিন্তু গৃহনির্মাণ সামগ্রীর স্বল্পতার দরুন পবিত্র কাবাঘরের পূর্বতন ভিটির একাংশ বাদ দিয়ে নতুন গৃহের ভিত্তিস্থাপন করা হয় এবং বাকি শূন্য স্থানটুকু প্রাচীর বেষ্টিত করে রাখা হয়। তাদের মনে আশা ছিল যে ভবিষ্যতে সুযোগ মত শূন্য জায়গাটুকুও কাবাগৃহের সাথে সংযুক্ত করা হবে। উপরোক্ত অংশটুকুই আজ 'হাতিম' নামে পরিচিত। নবুওতপ্রাপ্তির পর নবী করীম (সাঃ) গৃহের বর্তমান প্রাচীর ভেঙে শূন্য স্থানটুকু মূল ঘরের সাথে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পবিত্র কাবাগৃহের প্রাচীর ভাঙলে নব্য মুসলমানদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে মনে করে সে সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে বিরত থাকেন।[২]

ব্যবসা গ্রহণ[৩]

আরববাসীরা বিশেষ করে কোরাইশরা ইসলাম প্রচারের বহু পূর্ব থেকেই ব্যবসার উপর ভিত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করত।[৪] রসূলে পাক (সাঃ)-এর

১. এ উক্তির দ্বারা একটি হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে, যাতে রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন, "আমি হলাম নবুওত নামক গৃহের সর্বশেষ প্রস্তর।" অর্থাৎ আমি সর্বশেষ নবী ও ইসলাম ধর্মের রূপদানকারী । "স"।

২. এ সমস্ত ঘটনাবলী ইবনে হিশাম, তবকাত ও তাবারী নামক গ্রন্থে পৃথক পৃথকভাবে একটি একটি করে বর্ণনা করা হয়েছে এবং যারকানী ১ম খণ্ডের ২৩৬ হতে ২৪০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শেষ ঘটনাটি বোখারী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। বোখারী শরীফে এ কথারও উল্লেখ রয়েছে যে কোরাইশ কর্তৃক পবিত্র কা'বা পুনঃনির্মাণের সময় রসূলে পাক (সাঃ)-ও তাদেরর সঙ্গে নির্মাণকার্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বিভিন্ন স্থান হতে পাথর সংগ্রহপূর্বক কাঁধে করে আনতে আনতে তাঁর কাঁধের চামড়া ছিঁড়ে গিয়েছিল।

৩. ইজাফাহ্ ওয়া যিয়াদাহ্।

৪. তওরাত, তাকভীনে কেস্সায়ে ইউসুফ।

প্রপিতামহ 'হাশেম' আরবের অন্যান্য গোত্রের সাথে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে কোরাইশদের জীবিকার্জনের এ পথকে অধিকতর শক্তিশালী ও নিয়মিত করছিলেন। রসূলে পাক (সাঃ)-এর মাননীয় পিতৃব্য আবু তালিবও ব্যবসায়ী ছিলেন।

যৌবনের পদার্পণের পর মহানবী (সাঃ) জীবিকার্জনে মনোনিবেশ করলেন, তখন উপরোক্ত কারণে ব্যবসা ছাড়া অন্য কোন উত্তম পন্থা তাঁর দৃষ্টিগোচর হল না।

আবু তালেবের সঙ্গে শৈশবকালেও তিনি বাণিজ্য উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন করেছিলেন বলে বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছিলেন। উপরন্তু তাঁর সদয় ও ভদ্রোচিত আচরণের খ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। সাধারণত জনগণ তাদের সঞ্চিত পুঁজি কোন অভিজ্ঞ ও সৎ ব্যবসায়ীর নিকট রেখে তাকে লাভের অংশ প্রদান করে থাকে। রসূলে পাক (সাঃ)-ও অতীব আনন্দ সহকারে এ ধরনের অংশীদার গ্রহণ করতেন।

রসূলে পাক (সাঃ)-এর ব্যবসায়ে যারা অংশীদার ছিলেন তাদের সে সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ হাদীস ও ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত রয়েছে। তাতে অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে তিনি কত বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতার সাথে এ কর্ম সম্পাদন করেছেন।

ব্যবসায়িগণের উত্তম গুণাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্লভ গুণটি হল প্রতিশ্রুতি পূরণ ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা। সৌভাগ্যের বিষয়, নবুওতের মহান দায়িত্ব অর্পিত হবার পূর্বে মক্কার অতি বিশ্বাসী ব্যবসায়ী হিসাবেও রসূলে পাক (সাঃ) উপরোক্ত নৈতিক গুণের সর্বোত্তম নিদর্শন ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই আল হামসা (রাঃ) নামক জনৈক সাহাবী নবুওতের পূর্বে সংঘটিত একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন, আমি রসূলে পাক (সাঃ)-এর সাথে ব্যবসা সংক্রান্ত একটি লেনদেন করেছিলাম। মূল্যের কিছু অংশ পরিশোধ করা হয়েছিল এবং কিছু বাকি ছিল। আমি তাঁকে বললাম, আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি পরে আসছি। ঘটনাচক্রে তিন দিন পর্যন্ত আমি একথা ভুলে থাকি। তৃতীয় দিন প্রতিশ্রুত স্থানে উপস্থিত হয়ে রসূলে পাক (সাঃ)-কে সেখানে অপেক্ষারত দেখতে পাই। কিন্তু আমার এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য তাঁর ললাটে কোন বিরক্তিরেখা দেখিনি। শুধু এতটুকু কথাই তিনি বললেন ঃ তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ। আজ তিন দিন যাবৎ আমি এখানেই তোমার অপেক্ষায় বসে আছি।

(সুনানে আবী-দাউদ, ২য় খণ্ড, ৩২৬ পৃঃ)

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তিনি সর্বদাই লেনদেন অত্যন্ত পরিষ্কার রাখতেন। নবুওত প্রাপ্তির পূর্বেও ব্যবসা ক্ষেত্রে যাদের সাথে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তারাও রসূলে পাক (সাঃ)-এর এ গুণের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। সায়েব নামক এক ব্যক্তি পবিত্র ইসলামধর্ম গ্রহণের পর যখন রসূলে পাক (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হলেন, তখন অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম তাঁর খুব প্রশংসা করলেন। রসূলে পাক (সাঃ) বললেন, "আমি তাকে তোমাদের চাইতে বেশি চিনি।" সায়েব (রাঃ) বললেন, আপনার পদতলে আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হউক। আপনি আমার ব্যবসায়ে অংশীদার ছিলেন এবং লেনদেনের ব্যাপারে আপনি অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিলেন। কখনও কোন বিষয়ে টালবাহানা করেননি। (আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৭) কায়স ইবনে সায়েব মাখযুমী নামক অন্য আরেকজন সাহাবী রসূলে করীম (সাঃ)-এর ব্যবসায় অংশীদার ছিলেন। তিনিও সায়েবের (রাঃ) মতই রসূলের (সাঃ) পরিষ্কার লেনদেনের জন্য প্রশংসা করেছেন। (ইসাবা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৩)

হযরত খাদিজার (রাঃ) সাথে পরিণয়

হযরত খাদিজা (রাঃ) একজন অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ও সম্মানিতা মহিলা হিসাবে সমগ্র আরবে পরিচিতা ছিলেন। তাঁর উর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ এবং রসূলে পাক (সাঃ)-এর উর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ একই ব্যক্তি ছিলেন। তাই আত্মীয়তার দিক দিয়ে তিনি রসূলে পাক (সাঃ)-এর চাচাতো ভগ্নী হতেন। পূর্বে তাঁর দুবার বিয়ে হয়েছিল। তখন তিনি বিধবা ছিলেন। অত্যন্ত ভদ্র ও পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী ছিলেন বলে তিনি সমস্ত আরবে "তাহেরা" (পবিত্রা) নামে অভিহিতা ছিলেন। তিনি প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারিণী ছিলেন। তাবকাতে ইবনে সা'দ গ্রন্থে উল্লিখিত রয়েছে যে যখন মক্কার বাণিজ্যবহর কোথাও যাত্রা করত, তখন দেখা যেত, একা তাঁর পণ্য-সামগ্রীই সমস্ত কোরাইশদের পণ্য-সামগ্রীর সমান।

রসূলে করীম (সাঃ)-এর পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল। তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দয়ার প্রতীক ও আর্তের সেবক হিসাবে সমগ্র আরবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অধিকন্তু ব্যবসার মাধ্যমে স্বদেশের ও বিদেশের অসংখ্য মানুষের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল এবং লেনদেন ঘটেছিল। এভাবে গোটা আরবে ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশে তাঁর উত্তম আচরণ, সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা ও পবিত্র চরিত্রের কথা ব্যাপক-ভাবে প্রচারিত হয়েছিল। সমস্ত আরববাসী তাঁর অকৃত্রিম চরিত্রের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে "আল আমীন" (বিশ্বাসী) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। হযরত খাদিজা (রাঃ) রসূলে করীম (সাঃ)-এর এ সুখ্যাতির কথা শুনে তাঁকে তাঁর ব্যবসায়ে

পরিচালক নিযুক্ত করতে মনস্থ করলেন। তিনি হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ডেকে তাঁর পণ্য-সামগ্রী দামেশকে নিয়ে গিয়ে বিক্রয় করার প্রস্তাব করলেন। তিনি বললেন যে অন্যান্য লোককে এ কাজের জন্য যে পারিশ্রমিক দেয়া হয় আপনাকে তার দ্বিগুণ দেয়া হবে। রসূলে পাক (সাঃ) বিবি খাদিজার (রাঃ) এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং তাঁর পণ্য-সামগ্রী নিয়ে বসরাভিমুখে যাত্রা করলেন।

বসরা থেকে বাণিজ্য শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের তিন মাস পর হযরত খাদিজা (রাঃ) তাঁর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। হযরত খাদিজার (রাঃ) পিতা বহু পূর্বেই পরলোক গমন করেছিলেন, কিন্তু আমর ইবনে আসাদ নামক তাঁর এক পিতৃব্য তখনও জীবিত ছিলেন। নিজেদের বিয়ে-শাদী সম্পর্কে কথাবার্তা বলার অধিকার আরব নারীগণের ছিল। এ অধিকার প্রাপ্তবয়স্কা ও অপ্রাপ্তবয়স্কা নির্বিশেষে সবাই ভোগ করত। হযরত খাদিজা (রাঃ) স্বীয় পিতৃব্য থাকা সত্ত্বেও নিজেই নিজের বিয়ের যাবতীয় কথাবার্তা পাকা করলেন। বিয়ের নির্দিষ্ট দিনে হযরত আবু তালেব, হযরত হামযাসহ বংশের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে সঙ্গে নিয়ে হযরত খাদিজার (রাঃ) গৃহে গমন করলেন। পাঁচ শ' রৌপ্য মুদ্রা মহরানা সাব্যস্তে হযরত আবু তালেব প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বিয়ে হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর সাথে সম্পাদন করে দিলেন।

হযরত খাদিজা (রাঃ) যে বাড়িতে বসবাস করতেন, বিখ্যাত ঐতিহাসিক তাবারীর মতে, সে বাড়িটি আজও তাঁর নামেই পরিচিত হয়। আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) সেটি কিনে নিয়ে মসজিদে রূপান্তরিত করেন।

রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাথে বিয়ের সময় খাদিজা (রাঃ)-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। প্রথম দু'স্বামীর ঔরসে তাঁর দুটি পুত্রসন্তান এবং একটি কন্যাসন্তান ছিল। তাঁদের নাম ও বিস্তারিত বিবরণ পরে দেয়া হবে।[১]

রসূলে পাক (সাঃ)-এর সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে একমাত্র হযরত ইবরাহীম ছাড়া সবাই হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

১. হযরত খাদিজার (রাঃ) বিবাহের ঘটনাবলীর বিবরণ ইবনে হিশাম, ইবনে সা'দ এবং তাবারী নামক গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনটিতে সংক্ষিপ্তভাবে আবার কোনটিতে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে, আবার কোনটিতে ইতিবাচক এবং কোনটি নেতিবাচকরূপে এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন যুক্তিতর্ক ও দলীলপ্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে যে বর্ণনাটি আমার নিকট অধিক নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছে তা আমি এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসগুলো যদি এক স্থানে দেখতে ইচ্ছা করেন, তবে যারকানী, ১ম খণ্ড, ২৩২ পৃঃ হতে ২৩৬ পর্যন্ত পাঠ করতে পারেন। হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর বাড়ির বিবরণ শুধুমাত্র তারীখে তাবারীতে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহাম্মদ ইবনে হাম্বল রচিত "মুসনাদে আব্বাসী"তেও এ ঘটনাগুলোর বিবরণ রয়েছে।

কতিপয় বিক্ষিপ্ত ঘটনা

যেসব ঘটনাবলী পূর্বে বর্ণনা করা হল সেগুলোর প্রকৃত ইতিহাস জানা ছিল বিধায় পর্যায়ক্রমে লিখিত হয়েছে। এছাড়াও এমন অনেক ঘটনার কথা জানা যায়, যার সন-তারিখ কিছুই স্থির করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং উক্ত ঘটনাবলীকে সাধারণ ঘটনাবলী থেকে পৃথক করে ভিন্নস্থানে সন্নিবেশ করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ভ্রমণসীমা

মক্কাবাসিগণ সাধারণত বাণিজ্যিক কারণে দেশভ্রমণে অভ্যস্ত ছিল। রসূলে পাক (সাঃ) নিজেও এ উপলক্ষে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর দামেশক ও বসরা ভ্রমণের কথা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। উপরোক্ত স্থান ও দেশসমূহ ছাড়া অন্যান্য বাণিজ্য কেন্দ্রে তাঁর গমনের কথাও প্রমাণিত রয়েছে। আরবের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্র ও বাজার প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে সাইয়েদুননাস সেগুলোর মধ্যে "জা'মা আস্তাহ" নামক একটি ব্যবসাকেন্দ্রের (বাজারের) নাম উল্লেখ করেছেন।

হযরত খাদিজা (রাঃ) রসূলে পাক (সাঃ)-কে ব্যবসা উপলক্ষে যে সমস্ত স্থানে পাঠিয়েছিলেন তন্মধ্যে ইয়ামনে অবস্থিত 'জারস' নামক বাণিজ্য কেন্দ্রটিও অন্তর্ভুক্ত। মুস্তাদরাকে হাকেম নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে রসূলে পাক (সাঃ) দু'বার জারাসে গমন করেন এবং হযরত খাদিজা (রাঃ) তাঁকে প্রত্যেকবারের পারিশ্রমিক হিসাবে একটি করে উট প্রদান করেছিলেন। আল্লামা জাহাবী মুস্তাদরাক হাকেমের এ বর্ণনাটির সত্যতা স্বীকার করেছেন। (নূরুন নাবরাস ফী শরহে ইবনে সাইয়েদুন্নাস)

নবুওতপ্রাপ্তির পর আরবের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে বিভিন্ন প্রতিনিধি দল রসূলে পাক (সাঃ)-এর দরবারে আগমন করছিলেন। বাহরাইনের আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলটি যখন তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি বাহরাইনের প্রত্যেকটি এলাকার নাম নিয়ে সেগুলোর খবরাখবর জিজ্ঞেস করেন। প্রতিনিধি দলের লোকজন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে "আপনি আমাদের দেশের সংবাদ আমাদের চাইতে বেশি জানেন?" রসূলে পাক (সাঃ) বললেন, "আমি বহুবার তোমাদের দেশ ভ্রমণ করেছি।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ-২৬০ 'স'।)

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের মধ্যে যারা দিব্যজ্ঞানে (এলমে গায়েবে) বিশ্বাসী নয়, তারা একথা প্রমাণ করতে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত যে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের মাধ্যমেই রসূলে পাক (সাঃ) এ ধরনের জ্ঞান-গরিমা অর্জন করছিলেন। এলমে

গায়েবের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। অনুমানের মাধ্যমে তারা এ সীমারেখাকে আরো প্রসারিত করেছে। জনৈক ঐতিহাসিক তাঁর সমুদ্র ভ্রমণের কথাও উল্লেখ করেছেন। প্রমাণ হিসাবে তিনি পবিত্র কোরআনের সে সমস্ত আয়াত পেশ করেছেন, সমুদ্রে জাহাজের গতি ও সামুদ্রিক ঝড়ের এমন বাস্তব চিত্র অংকিত হয়েছে যাতে বাস্তব ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গন্ধ পাওয়া যায়। (মারগোলিয়াথ, পৃঃ ৫৭) উক্ত ইতিহাসবিদ রসূলে পাক (সাঃ) কর্তৃক মিসর গমন এবং মৃত সাগর (মরু সাগর) ভ্রমণের কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস এর সাক্ষ্য দেয় না।[১]

একত্ববাদের (তওহীদের) পরিপন্থী প্রথাসমূহ বর্জন

সন্দেহাতীতভাবে একথা প্রমাণিত যে মহানবী (সাঃ) নবুওত লাভ করার আগে বাল্যাবস্থায় অথবা যৌবনে কোন সময়েই তওহীদের পরিপন্থী কোন প্রথা কিংবা আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেননি।

একদিন কোরাইশ সম্প্রদায় কোন দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত ও দেবতার নামে যবেহকৃত খাদ্য ও মাংস ভক্ষণ করার জন্য রসূলে পাক (সাঃ)-কে অনুরোধ করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[২]

খৃষ্টান পণ্ডিতগণ দাবি করেছেন যে নবুওতপ্রাপ্তির ফলেই তাঁর বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। কারণ, নবুওতপ্রাপ্তির পূর্বে তাঁর ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও শহরবাসীর মতই ছিল। নতুবা তিনি তাঁর প্রথম পুত্রসন্তানের নাম আবদুল ওযযা (ইহা একটি দেবতার নাম) রাখতেন না।

---

১. ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ অনুমান এবং ধারণার উপর ভিত্তি করে ইতিহাস রচনা করে থাকেন। তারা যদি রসূলে পাক (সাঃ) সম্বন্ধে এ ধরনের উদ্ভট ও মিথ্যা কাহিনী লিখেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু রসূলুল্লাহর (সাঃ) মিসরে গমনের কথা তাদের অন্ধকার যুগের হাস্যকর বর্ণনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। তিনি যে কোন সমুদ্র ভ্রমণ করেননি তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে তাঁর বাহরাইন গমনের কথা যদি সত্য হয়, তাহলে পারস্য উপসাগর ও মৃত সাগর দর্শন করা সম্ভব হতে পারে। কেননা, ঐ দুটি আরব ও দামেশকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এবং তিনিও হয়ত এ স্থান দিয়ে কয়েকবার গমনাগমন করেছেন।

২. এ হাদীসটির সহীহ বোখারীর মানাকিব অধ্যায়ে যায়েদ ইবনে আমর, ইবনে নুফাইল সম্পর্কিত বর্ণনায় বর্তমান রয়েছে। ইমাম বোখারী (রাঃ) বোখারীর অন্যান্য অধ্যায়েও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কেননা, প্রথমোক্ত বর্ণনায় হাদীসটি সংক্ষিপ্ত ছিল বিধায় পরবর্তী বর্ণনাটি ব্যাখ্যা হিসাবে আনয়ন করা হয়েছে। মুসনাদে আহামদ ইবনে হাম্বলের ১ম খণ্ডে ১৮৯ পৃষ্ঠায় একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসের বিবরণ অনুযায়ী দেখা যায় যে নবী করীম (সাঃ) উক্ত খাদ্য ভক্ষণ করার জন্যে হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে আহ্বান করেছিলেন এবং হযরত যায়েদ তা খেতে অস্বীকার করেছিলেন। এ দিনের পর নবী করীম (সাঃ) আর কখনও দেবতার উদ্দেশে যবেহকৃত কোন জন্তুর গোশ্‌ত ভক্ষণ করেননি। কিন্তু এ হাদীস বর্ণনাকারিগণের অবস্থাও অজ্ঞাত এবং সহীহ বোখারীর বর্ণনার প্রতিপক্ষ হিসাবে এটির মূল্যইবা কত?

এ ঘটনাটি স্বয়ং ইমাম বোখারী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ তারীখে সগীরে উল্লেখ করেছেন। তবে এ ঘটনাটি যদি সত্যও হয় তথাপি এতে নবী করীম (সাঃ)-এর আকীদা ও বিশ্বাস সম্পর্কে প্রমাণ দাঁড় করানো যায় না। কারণ, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত খাদিজা (রাঃ) মূর্তিপূজা করতেন এবং সম্ভবত তিনিই এ নাম রেখে থাকবেন। রসূলে পাক (সাঃ)-ও সে সময়ে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে নবুওতের আসনে সমাসীন হননি, তাই এ ব্যাপারে তিনিও হয়ত কোন আপত্তি উত্থাপন করেননি। প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনারই কোন প্রমাণ নেই। কেননা, যে সমস্ত সূত্রে এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ সূত্র হল ইমাম বোখারী রচিত তারীখে। এ সূত্রটির প্রথম বর্ণনাকারীর নাম হল ইসমাঈল ইবনে আবি আয়েস। কোন কোন মোহাদ্দেসের মতে যদিও তিনি নির্ভরযোগ্য কিন্তু অধিকাংশ মোহাদ্দেসীন তার সম্পর্কে নিম্নোক্ত মত প্রকাশ করেছেন ঃ মুয়াবিয়া ইবনে সালেহের মতে ইসমাঈল এবং তার পিতা উভয়েই বর্ণনাকারী হিসাবে দুর্বল। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাখলাতের মতে তিনি মিথ্যুক এবং অত্যন্ত নিম্নপর্যায়ের লোক। ইমাম নাসায়ী তাকে দুর্বল ও অবিশ্বস্ত হিসাবে অভিহিত করেছেন। নজর ইবনে সালমার মতে তিনি মিথ্যুক এবং অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনাকারী। ইমাম দারকুতনী বলেন, বর্ণনার বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে আমি তাকে মোটেও নির্ভরযোগ্য মনে করি না। সাইফ ইবনে মোহাম্মদ বলেন যে তিনি মিথ্যা হাদীস প্রস্তুত করেন। সালমা ইবনে শোয়েব তার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে "তিনি নিজেই আমার কাছে স্বীকার করেছেন যে কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে আমি সে বিষয়ে একটি হাদীস তৈরি করে ফেলতাম।"

সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হল যে রসূলে পাক (সাঃ) নবুওতপ্রাপ্তির পূর্বেই মূর্তিপূজার বিরোধিতা আরম্ভ করেছিলেন এবং যাদের উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল, তাদেরকেই মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করতেন। (মুস্তাদরাকে হাকেম, ৩য় খণ্ড, যায়েদ ইবনে হারেসার বর্ণনা দ্রষ্টব্য)।[১]

---

১. ইউরোপীয় লেখক মিস্টার মারগোলিয়াথ এর পরিপন্থী একটি অত্যন্ত বিচিত্র ও আশ্চর্যজনক দাবি উত্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি তার দাবির সমর্থনে ততোধিক আশ্চর্যজনক একটি অপকৌশল গ্রহণ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে "রাত্রিতে শয্যাগ্রহণের পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও বিবি খাদিজা (রাঃ) উভয়ে "উযযা" নামক মূর্তির পূজা করতেন।" উক্ত গ্রন্থকার তার দাবির সমর্থনে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২২) একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যে
"খাদিজা বিনতে খুয়াইলাদের জনৈক প্রতিবেশী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্তৃক হযরত খাদিজা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, হে খাদিজা। আল্লাহ্র শপথ, আমি আর কখনও লাত ও উযযার উপাসনা করব না। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত খাদিজা (রাঃ) উত্তরে বললেন, লাত ও ওযযাকে যেতে দিন। (অর্থাৎ তাদের কথা কখনও মনেও করবেন না।) রাবী বলেন, লাত ও ওযযা আরববাসিগণের দেবতা ছিল। রাত্রিতে শয্যাগ্রহণের পূর্বে তাদের উপাসনা করা হত।"

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তওহীদপন্থীদের সাথে সাক্ষাৎ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে রসূলে পাক (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের করুণারাশির সূক্ষ্ম জ্যোতিতে আরব দেশ আলোকিত হয়ে উঠেছিল। সুতরাং কায়েস ইবনে সা'য়েদহ, ওয়ারাকা ইবনে নওফেল, ওবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশ, ওসমান ইবনে আল হুয়াইরেস এবং যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ দেব-দেবীর মূর্তিপূজা করতে অস্বীকার করেছিলেন।[১] এসব বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে হযরত যায়েদের সাথে রসূলে পাক (সাঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়েছিল। এ সাক্ষাৎকারের ঘটনা বোখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। ওয়ারাকা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু তিনি হযরত খাদিজার (রাঃ) চাচাত ভাই ছিলেন এবং মক্কাতেই বসবাস করতেন, তাই তাঁর সাথেও রসূলে পাক (সাঃ)-এর সাক্ষাৎ হওয়াটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। কোন কোন হাদীসে তাঁর সাথে রসূলে পাক (সাঃ)-এর বন্ধুত্ব ছিল বলেও উল্লেখ আছে।

সাহিত্য ও বক্তৃতামালার গ্রন্থসমূহে এবং সাধারণভাবে কোন কোন ইতিহাসেও উল্লেখ রয়েছে যে কায়েস ইবনে সা'য়েদাহ্ আরবের ওকাজ নামক বাজারে যে বিখ্যাত বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা রসূলে পাক (সাঃ) শুনেছিলেন। অধিকাংশ সাহিত্যিকগণ তাদের রচিত পুস্তকে উক্ত বক্তৃতার একটি বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করেছেন। যেহেতু সেটির এবারতসমূহ বাহ্যিকভাবে কোরআন পাকের প্রাথমিক সূরাগুলোর ন্যায় ছোট ছোট ও কবিতার ন্যায় একটি বাক্যের সাথে অপরটি চমৎকারভাবে গ্রথিত, সেহেতু খৃষ্টান ইতিহাসিকগণ দাবি করেন যে রসূলে পাক

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

আরবী ভাষা সম্পর্কে যাদের একটু সামান্য জ্ঞানও আছে তারাও অতি সহজে বুঝতে পারবেন যে হাদীসে বর্ণিত শব্দটির অর্থ হল, আরববাসিগণ লাত ও ওযযার উপাসনা করত। যদি উপাসনার ইঙ্গিতটি রসূলে পাক (সাঃ)-এর প্রতি করা হত, তবে শব্দটি বহুবচনরূপে ব্যবহৃত না হয়ে দ্বিবচনরূপে ব্যবহৃত হত। অধিকন্তু এ হাদীসেই লাত ও উযযার উপাসনা সম্পর্কে তাঁর তীব্র অস্বীকৃতির কথা বর্ণিত হয়েছে। মিঃ মারগোলিয়থ এ হাদীসটিও বর্ণনা করতে ভোলেননি যে "রসূলে পাক (সাঃ) একদা লাত ও ওযযার নামে একটি খাকী বর্ণের ভেড়া জবাই করেছিলেন।" কিন্তু লেখক এ হাদীসটি সম্পর্কে কোন আরবী গ্রন্থের উদ্ধৃতি পেশ করেননি, বরং ওলহুসান নামক জনৈক পাশ্চাত্য লেখকের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। (লাইফ অব মোহাম্মদ, পৃঃ ৬৮ হতে ৭০) "মু'জামুল বুলদান" নামক একটি ভূগোল গ্রন্থে এ ধরনের একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু প্রথমত, বিষয়বস্তুর দিক হতে গ্রন্থটি প্রমাণযোগ্য নয়, দ্বিতীয়ত, কালবীর ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ মিথ্যুকের নিকট হতে এ ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং প্রমাণ হিসাবে এ হাদীসটির মূল্য ও গুরুত্ব নেই।

১. সীরাতে ইবনে হিশামের ৭৬ পৃষ্ঠায় কায়েস ইবনে সা'য়েদাহ্ ব্যতীত অন্যান্যদের নাম ও জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। যায়েদার কথা বোখারী শরীফেও বর্ণনা করা হয়েছে। সাহিত্য ও ইতিহাসের যাবতীয় পুস্তকে তাদের কথা ব্যাপকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

(সাঃ) কোরআন পাকের বাচনভঙ্গি তাঁর (কায়েসের) নিকট থেকেই গ্রহণ করে থাকবেন। নিম্নে তাঁর বক্তৃতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল ঃ

ايها الناس اسمعوا ودعوا واذا دعيتم فانتفعوا انه من عاش مات
ومن مات فات وكل ماهو ات ات - مطر ونبات، وارزاق واقوات، واباء
وامهات، واحياء واموات، وجميع واشتات، ان فى السماء لخبرا وان فى
الارض لعبرا ليل داج، وسماء ذات ابراج وبحار ذات امواج، مالى ارى الناس
يذهبون فلا يرجعون ارضوا بالمقام فاقاموا، ام تركوا هناك فناموا، اين من
بنى وشيد - وزخرف ونجد، وغره المال والولد، اين من بغى وطغى-

কায়েস ইবনে সা'য়েদাহ্র বর্ণনা ও তাঁর বক্তৃতা, বগভী, আযদী, বায়হাকী এবং হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী প্রমুখ মনীষীবৃন্দের সবাই সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ ঘটনার আপাদমস্তক সমস্তটাই কল্পনাপ্রসূত ও মিথ্যা। এর বর্ণনাকারী সাধারণভাবে অবিশ্বস্ত ও মিথ্যাশ্রয়ী। অতএব, আল্লামা সুয়ূতী তাঁর রচিত "মওজুয়াত" নামক গ্রন্থে এ হাদীস বর্ণিত হওয়ার যাবতীয় সূত্রগুলো উল্লেখপূর্বক এর বর্ণনাকারিগণের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং আল্লামা যাহাবী ও হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী প্রমুখ সামলোচকগণের মতই একথা ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এ হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক সূত্রেই এমন ধরনের কোন-না-কোন বর্ণনাকারী রয়েছে, যে নাকি মিথ্যা হাদীস রচনা করে বর্ণনা করত। মোহাম্মদ ইবনে হাজ্জাজ নামে এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। ইবনে মঈন তাকে একান্ত মিথ্যাবাদী ও দুষ্ট (খবিস) বলে অভিহিত করেছেন। ইবনে আদী বলেছেন যে হারীসা সম্পর্কিত মিথ্যা হাদীসটি এ ব্যক্তির মাধ্যমেই তৈরি হয়েছে। এর অন্য একটি সূত্রে সাঈদ ইবনে হুরাইরা নামে একজন বর্ণনাকারী আছেন। তাঁর সম্পর্কে বিখ্যাত হাদীস সমালোচক, ইবনে হাব্বান উল্লেখ করেন যে "এ ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য লোকদের জবানীতে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করত অথবা নিজেই মিথ্যা হাদীস তৈরি করত কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি তার জন্য মিথ্যা হাদীস তৈরি করত।" এ হাদীসের অন্য একটি সূত্রে কাসেম ইবনে আবদুল্লাহ্ এবং আহমদ ইবনে সাঈদ নামক দুজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। মিথ্যা হাদীস রচনার ব্যাপারে তাদের উভয়েরই কুখ্যাতি রয়েছে। ইমাম বায়হাকী (রাঃ) এ হাদীস সম্পর্কে

একটি বিরাট গল্পের অবতারণা করেছেন। উক্ত গল্পে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কায়েস ইবনে সা'য়েদাহ্র বক্তৃতাটি মুখস্থ বর্ণনা করেছেন। এ গল্পটির সম্পূর্ণ অংশটিই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।[১] হাফেজ ইবনে হাজার আস্কালানী এ হাদীসের অন্যান্য সূত্রগুলো আলোচনা করে তাদেরকে দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন।[২]

বিভিন্ন উদ্দেশ্য সামনে রেখে তারা এ ধরনের জালিয়াতি করত। তবে অধিকাংশ সময় সে সমস্ত সভাতে অথবা কবিতাবলীতে রসূলে পাক (সাঃ)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা কিংবা কোন সুন্দর কথাকে ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করাই উদ্দেশ্য ছিল।

উদাহরণস্বরূপ, কায়েস ইবনে সা'য়েদাহ্র বক্তৃতার নিম্নোক্ত অংশটি উল্লেখ করা হল ঃ

نبيا قد حان حينه واظلم اوانه فطوبى لمن امن به
فهداه وويل لمن خالفه وعصاه –

অর্থাৎ "একজন নবীর আবির্ভাবের সময় প্রায় আগত। অতএব, যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে সে ধন্য ও সৌভাগ্যমণ্ডিত হবে এবং যে ব্যক্তি তাঁর বিরোধিতা করবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।"

১. আল্লালীল মাসনুয়া নামক গ্রন্থের (যা মিসরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে) ৯৫ হতে ১০০ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।
২. এ স্থানে একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে বনু উমাইয়া এবং আব্বাসীয় যুগে এ নীতির উদ্ভব হয়ে গিয়েছিল যে সমসাময়িক কবি এবং বাগ্মীদের দ্বারা কবিতা ও বক্তৃতা রচনা করিয়ে অন্ধকার যুগের অথবা ইসলামের প্রথম যুগের কবি ও বাগ্মীদের নামে প্রচার করা হত। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক এমন পর্যায়ের লোক ছিলেন যে ইমাম বোখারী (রাঃ) জুযউল কেরাত সম্পর্কে তার নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছিলেন। তথাপি তাঁর এ সাধারণ অভ্যাস ছিল যে তিনি সমসাময়িক কবিদের নিকট মাগাযীর ঘটনাবলী প্রদানপূর্বক তাকে কাব্যে রূপান্তরিত করিয়ে স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করতেন। আল্লামা যাহাবী তাঁর রচিত "মীযানুল এতেদাল" নামক গ্রন্থে (পৃঃ ৯২ মিসরে মুদ্রিত) (খতীব বাগদাদীর নিকট হতে বর্ণনাটি গ্রহণ করে) এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। সীরাতে ইবনে হিশামে হযরত খাদিজা (রাঃ), হযরত আবু বকর, হযরত উমাইয়া ইবনে আবিসালাত এবং হযরত আবু তালেবের রচিত বলে কথিত শত শত কবিতা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ সমস্ত কবিতাবলীর ভাষা এবং বর্ণনাভঙ্গির দ্বারা অতি সহজেই বুঝা যায় যে এগুলো ঐ সময়ে রচিত হয়নি।
একটি মজার বিষয় হল এই যে ইবনে হিশাম এ সমস্ত কবিতা স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করার পর অধিকাংশ স্থানেই একথা লিখে দিয়েছেন যে কাব্য সম্পর্কে যারা বিশেষজ্ঞ তারা এসব কবিতার কথিত রচয়িতাদের সহিত এসবের সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেছেন। উদাহরণ হিসাবে ওবায়দা ইবনে হারেস নামক একজন কবি (ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩ মিসরে মুদ্রিত) হযরত আবু বকরের (রাঃ) রচিত রণসঙ্গীতরূপে কথিত একটি বৃহৎ কবিতা উদ্ধৃত করে এ সম্পর্কে লিখেছেন যে "অধিকাংশ বিদ্বান ও কবিতা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি কবিতাটি হযরত আবু বকরের (রাঃ) রচনা বলে অস্বীকার করেছেন।

হযরত আবু তালেবের রচিত বলে কথিত যে বৃহৎ কবিতাটি ইবনে হিশাম ও অন্যান্য সীরাত রচয়িতাগণ তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন সেটির আপাদমস্তক সবটাই পরবর্তীকালে রচিত (ইবনে হিশাম পৃঃ ৯৩/৯৪)। উক্ত কবিতার শেষের কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ ঃ

فاصبح فينا احمد فى ارومة ـ تقصر عنه سورة المتطاول

فايده رب العباد بنصره ـ واظهر دينا حقه غير باطل

এ কবিতাটির সম্পূর্ণ অংশটিকেই গ্রন্থাকার পরবর্তীকালে রচিত বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ কবিতাটিকে "মওজু" (জাল) না বলে এর বেশির ভাগকে জাল বলাই বোধহয় সমীচীন। কেননা, এ কবিতার দুটি পংক্তি সহীহ্ বোখারী ও সহীহ্ মুসলিমের ন্যায় বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থেও স্থানলাভ করেছে। এ কবিতাটি উল্লেখপূর্বক ইবনে ইসহাক নিজেই মন্তব্য করেছেন যে কোন কোন কাব্যবিশারদ এ কবিতার বৃহদংশের বিশুদ্ধতা অস্বীকার করেছেন। অধিকাংশ লোকই ইসলামের সহায়ক হবে মনে করে কোরআন পাকে তওহীদ ও আখেরাত সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বর্ণিত হয়েছে তার অনুরূপ বিষয়ে কবিতা রচনা করাতেন। উমাইয়া ইবনে আবিসসালতের নামে যে সমস্ত কবিতা প্রচলিত রয়েছে তা পাঠ করলে অন্তরে এ ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে যায় যে কোন কবি পবিত্র কোরআন পাককে সামনে রেখে এগুলো রচনা করে থাকবে। যেমন ঃ

فقلت له اذهب بهرون فادعوا ـ الى الله فرعون الذى كان طاغيا

وقولا له انت رفعت هذه ـ بلا عمد ارفق اذا بك بانيا

وقولا له انت سويت وسطها ـ منيرا اذا ما جنه الليل هاديا

আশ্চর্যের বিষয়, মিস্টার মারগুলিয়থ সাহেবও এক জায়গায় এসবের প্রতি বিশ্বাস ব্যক্ত করে বলেছেন যে "প্রাচীন কাব্যের এক বৃহদংশ পবিত্র কোরআন পাকের বর্ণনাভঙ্গি অনুসারে লিখিত হয়েছে।" (লাইফ অব মোহাম্মদ পৃঃ ২৭ হতে ৬৩ পর্যন্ত) এসব কবি সম্ভবত সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানেই ইসলামের কল্যাণের লক্ষ্যে এ ধরনের কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আজ তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে এ ধরনের মন্তব্য প্রকাশে সাহসী হয়েছেন যে রসূলে পাক (সাঃ) নবী ছিলেন না, বরং অন্ধকার যুগের বাগ্মী ও কবিগণের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস এমন কি বক্তৃতা দেবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন। সুখের বিষয়, সাহিত্য সমালোচক কিংবা হাদীস শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি মাত্রেই অনায়াসে বুঝতে পারেন যে এসব কবিতা ও বক্তৃতাগুলো আসল নয় বরং কৃত্রিম। ইউরোপীয়

পণ্ডিতগণের পক্ষে সাহিত্য ও হাদীস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য আরও বহু সময়ের প্রয়োজন। যখন তারা উক্ত শাস্ত্র সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সমর্থ হবেন, তখন বর্তমানের অজ্ঞতাপূর্ণ মন্তব্যের জন্য নিজেরাই লজ্জা পাবেন।

বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধব

নবুওতপ্রাপ্তির পূর্বে যাঁরা রসূলে পাক (সাঃ)-এর বিশিষ্ট বন্ধুরূপে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেই নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী, সম্মানিত ও অত্যন্ত মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি বহুকাল যাবৎ রসূলে পাক (সাঃ)-এর সংসর্গে ছিলেন।[১] কোরাইশ বংশের সম্মানিত নেতা হযরত খাদিজার (রাঃ) চাচাত ভাই হাকিম ইবনে হাযামও তাঁর বিশিষ্ট ও অন্যতম বন্ধু ছিলেন। তিনি মক্কার দারুননাদওয়ার (পরামর্শ সভা) স্বত্বাধিকারী ছিলেন এবং হাজিগণের সেবা-শুশ্রূষার ভার তাঁর উপরই অর্পিত ছিল। ইসলাম গ্রহণের পরে তিনি উক্ত গৃহটি হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) কাছে এক লক্ষ মুদ্রায় বিক্রি করে এর সমুদয় অর্থ দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করে দেন। তিনি বয়সে রসূলে পাক (সাঃ)-এর অপেক্ষা পাঁচ বছরের বড় ছিলেন।[২]

হযরত হাকিম ইবনে হাযাম যদিও অষ্টম হিজরী পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি তথাপি রসূলে পাক (সাঃ)-এর প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা ছিল। একদিন পবিত্র কাবাগৃহ প্রাঙ্গণে কিছু জিনিসপত্র নিলামে বিক্রি হল। সেগুলোর মধ্যে অত্যন্ত উত্তম এক জোড়া কাপড় ছিল। তিনি ৫০টি স্বর্ণ মুদ্রায় সে কাপড়টি ক্রয় করে রসূলে পাক (সাঃ)-কে উপহার দেবার জন্য মদীনায় গমন করেন। রসূলে পাক (সাঃ) বললেন, আমি মোশরেকদের উপহার গ্রহণ করি না। তবে তুমি যদি এটি আমাকে দিতেই চাও তবে এর মূল্য নিতে হবে। অগত্যা মূল্য গ্রহণ করেই তিনি তা রসূলে পাক (সাঃ)-কে দিয়ে এসেছিলেন।[৩]

আযদ গোত্রের হযরত জামাদ ইবনে সা'লাবা ছিলেন তাঁর আর একজন বিশিষ্ট বন্ধু। অন্ধকার যুগে তিনি চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের ব্যবসা করতেন। রসূলে পাক (সাঃ)-এর নবুওতপ্রাপ্তির পর তিনি একদিন মক্কায় এসে দেখলেন যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কোথাও যাচ্ছেন এবং তাঁর পেছনে একদল ছেলে-ছোকরা হৈ চৈ করছে। মক্কার অধিবাসী কাফেররা তাঁকে পাগল (উন্মাদ) বলে প্রচার

---

১. ইসাবা, যিকরে আবু বকর। (হযরত আবু বকরের নাম ছিল আবদুল্লাহ। ইসাবায় ২য় খণ্ডের ৩১৪ পৃষ্ঠায় উক্ত নামের শিরোনামায় হযরত আবু বকরের (রাঃ) জীবনী লেখা হয়েছে।)

২. ইসাবা যিকরে হাকিম ইবনে হাযাম, (১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৯)

৩. মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, (৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৩।

করত। হযরত জামাদ রসূলে পাক (সাঃ)-এর পেছনে বাচাল কিশোরদের হৈ চৈ করতে দেখে তিনিও তাঁকে উন্মাদ মনে করলেন এবং কাছে এসে বললেন, মোহাম্মদ! আমি তোমার চিকিৎসা করতে পারবো। একথা শুনে রসূলে পাক (সাঃ) আল্লাহ্ পাকের গুণকীর্তনের পর অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ভাষায় কিছু বলার পরে তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন। ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসায়ী সংক্ষিপ্তভাবে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বলের ১ম খণ্ডের ৩০৩ পৃষ্ঠায় ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

যারা রসূলে পাক (সাঃ)-এর সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশীদার ছিলেন। তন্মেধ্যে কায়েস ইবনে সায়েব (রাঃ) ছিলেন অন্যতম। বিখ্যাত তফসীরকার মুজাহিদ ইবনে জাবুর তাঁরই দাস ছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে ব্যবসায়ের অংশীদারগণের সাথে রসূলে পাক (সাঃ)-এর ব্যবহার ছিল অতি উত্তম ও উদার। কখনও তাঁদের সাথে কোন বিরোধ কিংবা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়নি।[১]

নবুওতের সূর্যোদয়

রসূলে পাক (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সময় পবিত্র মক্কা ভূমি ছিল মূর্তিপূজার প্রধান প্রাণকেন্দ্র। পবিত্র কাবাগৃহেও ৩৬০টি মূর্তি স্থাপিত ছিল। রসূলে পাক (সাঃ)-এর বংশের শুধু এতটুকু বৈশিষ্ট্য ছিল যে তারা এ দেব মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক ও চাবি বহনকারী ছিলেন। তথাপি রসূলে পাক (সাঃ) কখনও মূর্তির সামনে মাথা নত করেননি। শুধু তাই নয়, অন্ধকার যুগের অন্যান্য পূজা-পাট বা আচার-অনুষ্ঠানে তিনি কখনও অংশগ্রহণ করেননি।

কোরাইশ সম্প্রদায়ে আরবের অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে একটা রীতি প্রচলিত করেছিল যে তাঁদের জন্য হজের সময় আরাফাতের ময়দানে যাওয়া অপরিহার্য হবে না এবং মক্কার বাইরে থেকে যে সমস্ত লোক হজ পালন করতে মক্কায় আসবে তারা হয় কোরাইশদের পোশাক পরবে, নাহয় উলঙ্গ হয়ে কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ করবে। (ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৭, ১২৯৫ হিজরীতে মিসরে মুদ্রিত), সুতরাং এভাবেই উলঙ্গ হয়ে কাবা প্রদক্ষিণের প্রথা প্রচলিত হয়ে যায়। কিন্তু রসূলে পাক (সাঃ) তাঁর বংশের এ ধরনের কার্যকলাপ কখনও সমর্থন করেননি। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ২৯)।

"আরবে গল্প-কাহিনী বলার প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। যাবতীয় বৈষয়িক কার্যাদি সম্পাদন শেষে জনগণ রাত্রিকালে বিশেষ কারও বাড়িতে সমবেত হত এবং গল্প বলার পারদর্শী কোন ব্যক্তি গল্প বলা আরম্ভ করত শ্রোতারা

---

১. ইস্তীয়াব (২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৩৭ (স) এবং ইসাবা)

অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তা শুনত। বাল্যকালে রসূলে পাক (সাঃ)-ও এ ধরনের গল্পের আসরে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে রাস্তায় একটি বিবাহোৎসব ছিল এবং তিনি সেখানেই কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে থাকলেন। অল্পক্ষণ পরে তিনি সেখানে ঘুমিয়ে পড়েন এবং ভোর না হওয়া পর্যন্ত আর জাগ্রত হননি।"

অন্য আরেক দিন তিনি গল্পের আসরে যোগদানের ইচ্ছায় রওয়ানা হলেন, কিন্তু সেদিনও ঘটনাচক্রে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি। সুদীর্ঘ ৩০ বছরে মাত্র দুবার তিনি এ ধরনের ইচ্ছা করেন, কিন্তু দুবারই তিনি আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় তা থেকে রক্ষা পান। বলা হয়েছে ঃ

"এ ধরনের কার্যে রত হওয়ার চাইতে তোমার মর্যাদা আরও ঊর্ধ্বে।"[১]

এ ধরনের নিরর্থক ও বাজে কাজে অংশগ্রহণ না করাই হল সুস্থ বিবেকবুদ্ধির পরিচায়ক। কিন্তু একটি বিশিষ্ট আইনশাস্ত্রের উদ্ভাবন ও একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের কাঠামো শক্তিশালী করা এবং ইহকাল ও পরকালের পথপ্রদর্শকের মহান দায়িত্ব সম্পাদন করার জন্য আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন ছিল। রসূলে পাক (সাঃ)-এর আবির্ভাবের প্রাক্কালে সত্যানুসন্ধিৎসু কতিপয় ব্যক্তির (ওয়ারাকা, যায়েদ, ওসমান প্রমুখের) মনে ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে নিষ্প্রাণ ও বোধশক্তিহীন পাথরের সামনে মাথা নত করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ অনুভূতিতে তাড়িত হয়েই তাঁরা প্রকৃত সত্যের অন্বেষণে বের হয়ে পড়েন, কিন্তু কেউই কৃতকার্য হতে পারেনি। ওয়ারাকা এবং ওসমান খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করলেন এবং শেষ পর্যন্ত একথা বলতে বলতে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন যে "হে আল্লাহ্! যে পদ্ধতিতে তোমার আরাধনা করা উচিত, যদি তা জানতাম, তবে আমি সেভাবেই তোমার অর্চনা করতাম।"

রসূলে পাক (সাঃ) বহুবিধ বৈষয়িক সমস্যায় জড়িত ছিলেন। তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন এবং কতিপয় সন্তানের পিতাও ছিলেন। ব্যবসা উপলক্ষে অধিকাংশ সময় তাঁকে বিদেশে থাকতে হত। কিন্তু আল্লাহ্ পাক যে কাজের জন্য তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন তা তাঁর বৈষয়িক কার্যকলাপ অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ ছিল। এ নশ্বর জগৎ ও এর সমুদয় কার্যাবলী তার তুলনায় একান্তই সাধারণ ও গুরুত্বহীন;তথাপি এ পর্যন্ত প্রকৃত উদ্দেশের কোন হদিস ছিল না।

পবিত্র মক্কা নগরীর তিন মাইল দূরে 'হেরা' নামে একটি পাহাড়ের গুহা ছিল। সে গুহায় তিনি মাসের পর মাস অবস্থান করে ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। সঙ্গে আনা খাদ্যসামগ্রী নিঃশেষ হয়ে গেলে তিনি বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করতেন এবং খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে পুনরায় সেখানে গিয়েই ধ্যানমগ্ন হতেন।

---

১. স্যার উইলিয়াম ম্যুর তাঁর "লাইফ অব মোহাম্মদ" গ্রন্থে লিখেছেন, আমাদের যাবতীয় রচনাবলী, সর্বসম্মতভাবে সাক্ষ্য বহন করে যে রসূলে পাক (সাঃ)-এর চালচলন, রীতিনীতি ও পবিত্র স্বভাব-চরিত্র মক্কাবাসিগণের মধ্যে দুর্লভ ছিল।

সহীহ্ বোখারীতে বর্ণিত আছে যে রসূলে পাক (সাঃ) হেরা নামক গুহায় অবস্থানকালে আল্লাহ্ পাকের উপাসনা করতেন। তাঁর উপাসনার প্রকৃতি কি ছিল? এ প্রশ্নের উত্তরে বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা 'আইনী' নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যেঃ

"প্রশ্ন করা হল যে তাঁর এবাদত (উপাসনা) কি প্রকৃতির ছিল? উত্তরে বলা হল, চিন্তা-ভাবনা ও পরিণাম সম্পর্কে গভীর ধ্যানে নিমগ্নতা।"

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আঃ) নবুওতপ্রাপ্তির পূর্বে যে ধরনের উপাসনা করতেন, তাঁর উপাসনাও সে ধরনেরই ছিল। হযরত ইবরাহীম (আঃ) আকাশের উজ্জ্বল তারকারাজি দেখে মনে করেছিলেন সেগুলোই হয়তো উপাসনার যোগ্য, তারকারাজির পর পূর্ণ শশীর উদয় দেখে ভাবতেন, এটাই হয়তো আমার রব। কিন্তু চাঁদ ডুবে গেলে বিরাট আলোকরশ্মি নিয়ে সূর্যোদয় দেখে ভাবতেন এটা সব চাইতে বড়, অতএব এটাই সম্ভবত আমার খোদা। কিন্তু যখন সূর্যও অস্তমিত হয়ে যায়, তখন এই স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তিটি বের হয়ে এসেছিল যে

"এসব স্থায়িত্বহীন বস্তু আমার কাম্য নয়।" لَا أُحِبُّ الْآفِلِيْنَ

"যিনি নভোমণ্ডলের ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা তাঁর প্রতিই আমি মনোনিবেশ করছি।' (সূরা আনআম, রুকু-৯)

একজন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক রসূলে পাক (সাঃ)-এর উপাসনার কথা নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"স্বদেশে ও বিদেশে প্রত্যেক স্থানেই মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মনে অসংখ্য প্রশ্নের উদয় হত, —আমি কে? এ অসীম ভূমণ্ডলইবা কি? কে আমার সৃষ্টিকর্তা? তাঁকে পাওয়ার কোন পথ, কোন সূত্র কি তিনি মানুষকে দান করেন ? হেরা পাহাড়ের কঠিন পাথর, তূর পর্বতের আকাশ স্পর্শী শৃংগ, জনমানবহীন জংগল এবং উষর মরুপ্রান্তর ইত্যাদির মধ্যে কোনটি কি এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে? না! নিশ্চয়ই নয়! বরং চলমান সূর্য, দিবারাত্রির আবর্তন, উজ্জ্বল তারকারাজি ও বর্ষণরত মেঘমালা কোনটিই এ প্রশ্নের সমাধান দিতে পারবে না।"[১]

নবুওতের ভূমিকা হিসাবে স্বপ্নে তাঁর নিকট বহু রহস্য উদ্‌ঘাটিত হতে লাগল। তিনি রাত্রে যা স্বপ্নে দেখতেন, পরদিন অবিকল তাই প্রতিফলিত হতে

১. কারলাইল হীরোজ রচিত, তাজকেরায়ে রসূল (সাঃ)।

দেখতেন।[১] একদিন যখন তিনি অভ্যাস মত হেরার গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তখন অদৃশ্য ফেরেশতা তাঁর কাছে এসে বলতে লাগলেন ঃ

"আপনি সেই প্রভুর নামে পাঠ করুন, যিনি সমস্ত বিশ্ব চরাচর সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানবজাতিকে একটি মাংসপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন। আপনি পড়ুন এবং আপনার প্রভু অত্যন্ত করুণাময়। যিনি মানুষকে কলমের দ্বারা শিখিয়েছেন, যিনি মানুষকে সে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দান করেছেন যা তারা জানত না।"

এ ঘটনার পর তিনি আল্লাহ্ পাকের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘরে ফিরে যান।[২]

তিনি হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর নিকট সমুদয় বিষয় ব্যক্ত করেন। হযরত খাদিজা (রাঃ) তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে গেলেন।

ওরাকা হিব্রু ভাষা জানতেন এবং তওরাত ও ইঞ্জিল বিষয়ে বিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি রসূলে পাক (সাঃ)-এর নিকট আনুপূর্বিক ঘটনা শুনে বললেন, "যিনি আপনার কাছে এসেছিলেন তিনিই সে দূত (ফেরেশতা) যিনি হযরত মূসার (আঃ) নিকট এসেছিলেন।

হাদীসে আছে, এ ঘটনার পর নবী করীম (সাঃ) অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। হযরত খাদিজা (রাঃ) তাঁকে অভয়দানের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনি চিন্তিত হবেন না, আল্লাহ্ পাক নিশ্চয়ই আপনাকে পরিত্যাগ করবেন না। অতঃপর তিনি তাঁকে ওয়ারাকার কাছে নিয়ে যান। ওয়ারাকা তাঁর নবুওতের স্বীকৃতি প্রদান করেন।

নবী করীম (সাঃ) নিঃসন্দেহে একথা বলেছিলেন যে "আমার ভয় হয়" কিন্তু এ দ্বিধা, এ ভীতি, এ অস্থিরতা, মহাপরাক্রমশালী বিশ্ব বিধাতার পক্ষ থেকে আগত বাণীর প্রভাব এবং নবুওতের মহান দায়িত্ব ও গুরুত্বের চিন্তা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিনি কি দেখেছিলেন? প্রধান দূত (ফেরেশতা) তাঁকে কি বলেছিলেন? তিনি কি কি অনুভব করলেন? ইত্যাদি এমন ধরনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা যা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

সহীহ্ বোখারী শরীফের "বাবুত্তা'বীর" অধ্যায়ে লিখিত আছে, কয়েক দিন পর্যন্ত প্রত্যাদেশ আসা বন্ধ হয়ে গেলে দুশ্চিন্তায় তিনি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ

---

১. বিভিন্ন প্রকার প্রত্যাদেশের মধ্যে খাব (স্বপ্ন)-ও এক প্রকার প্রত্যাদেশ। সহীহ্ বোখারী শরীফের প্রথম খণ্ডে উক্ত হয়েছে ঃ
"প্রথম প্রথম সঠিক খাবের মাধ্যমে রসূলে পাক (সাঃ)-এর নিকট প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হত।"
সহীহ্ বোখারী কিতাবুত্তা'বীর অধ্যায়ে পরিষ্কারভাবে এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে।

২. সহীহ্ বোখারী "বাবু বাদ'উল ওহী" ও "কিতাবুত্তা'বীরে" হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) ঐ সময় জন্মগ্রহণ করেননি। মোহাদ্দেসগণের পরিভাষায় এ ধরনের হাদীসকে "মুরসাল" হাদীস বলা হয়। তবে সাহাবায়ে কেরামগণের মুরসাল হাদীস প্রমাণযোগ্য। কেননা, এ ধরনের মুরসাল হাদীসে পরিত্যক্ত বর্ণনাকারী কোন সাহাবী-ই হবে এবং প্রত্যেক সাহাবী যেহেতু "আদেল" সেহেতু তাদের বর্ণিত হাদীসও প্রমাণযোগ্য।

করতেন এবং সেখান থেকে লাফিয়ে নিচে পড়তে ইচ্ছে করতেন। এমতাবস্থায় অকস্মাৎ হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) এসে বলতেন, "হে মোহাম্মদ! আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার নবী।" এতে করে সাময়িকভাবে তাঁর মানসিক প্রশান্তি ফিরে আসত, কিন্তু আবার কিছুদিনের জন্য ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেলেই তিনি পুনরায় পাহাড়ে উঠে লাফিয়ে পড়তে চাইতেন এবং হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) পুনরায় এসে তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন যে তিনি সত্যি সত্যিই আল্লাহ্ তা'আলার নবী।

হাফেজ ইবনে হাজার আস্‌কালানী এ হাদীসটির প্রথমাংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমালোচকগণের কতিপয় প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এ হাদীসের সমালোচনা করতে গিয়ে সমালোচনাকারী প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে একজন নবীর পক্ষে তাঁর নবুওত সম্পর্কে কি করে সন্দেহ হতে পারে এবং সন্দেহ হলেও একজন খৃষ্টানের সান্ত্বনা বাক্যে কেমন করে শান্তি আসতে পারে? এ প্রশ্নগুলোর উত্তরণ দিতে গিয়ে আল্লামা ইবনে হাজার আস্‌কালানী জনৈক বিখ্যাত হাদীসবিশারদের (মোহাদ্দেসের) উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, নবুওত একটি অত্যন্ত বিরাট ও মহান দায়িত্বপূর্ণ পদ। আকস্মিকভাবে তার গুরুদায়িত্ব বহন করা সম্ভব নয়। এ কারণেই প্রথম দিকে স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁকে এর সাথে পরিচিত করানো হয়। অতঃপর হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) যখন তাঁর পরিপূর্ণ আলোকময় আকৃতিতে রসূলে পাক (সাঃ)-এর সামনে হঠাৎ করে আবির্ভূত হলেন, তখন কেবল মানবিক কারণেই তিনি ভীত হয়ে পড়েছিলেন। হযরত খাদিজা (রাঃ) তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করলেন এবং ওয়ারাকা যখন তাঁর নবুওতের সত্যতা স্বীকার করলেন, তখন পরিপূর্ণভাবে তিনি আশ্বস্ত হলেন। এ মোহাদ্দেসের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় ঃ

فَلَمَّا سَمِعَ كَلَامَهُ اَيْقَنَ بِالْحَقِّ وَاعْتَرَفَ بِهِ -

"যখন তিনি ওয়ারাকার কথা শুনলেন, তখন সত্য (নবুওত) সম্পর্কে তাঁর পরিপূর্ণ বিশ্বাস উৎপন্ন হল এবং তিনি তার স্বীকৃতি প্রদান করলেন।"

উক্ত মোহাদ্দেস আরো লিখেছেন যে "ওহীর (প্রত্যাদেশ) আগমন বার বার বন্ধ হওয়ার মাধ্যমে নবী করীম (সাঃ)-এর সহন ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করাই উদ্দেশ্য ছিল।" (ফতহুলবারী শরহে সহীহ বোখারী, কিতাবুত্তা'বীর, ১২শ' খণ্ড, পৃঃ ৩১৭, মিসরে মুদ্রিত)।

তিরমিযী শরীফে উল্লিখিত হয়েছে যে নবুওতপ্রাপ্তির পূর্বে রসূলে করীম (সাঃ) দামেশক ভ্রমণকালে বুসরা নগরে উপনীত হয়ে যখন একটি বৃক্ষের নিচে বিশ্রাম করছিলেন, তখন বৃক্ষটির সমুদয় শাখা-প্রশাখা তাঁর প্রতি অবনত হয়ে সম্মান প্রদর্শন করেছিল। এ বিস্ময়কর ঘটনা দৃষ্টেই বুহাইরা নামক পাদ্রীর দৃঢ় বিশ্বাস

জন্মেছিল যে তিনি আল্লাহ্ পাকের নবী। সহীহ্ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে নবী করীম (সাঃ) বলতেন, "যে প্রস্তরটি নবুওতের পূর্বে আমাকে সালাম করত আমি সেটি চিনি।" সহীহ্ হাদীস গ্রন্থসমূহের বিবরণীতে জানা যায় যে "নবুওতপ্রাপ্তির পূর্বে ফেরেশতাগণ রসূলে পাক (সাঃ)-এর বক্ষচ্ছেদন করে দৈহিক কলুষ-কালিমা অপসারণ করেছিলেন। উপরোক্ত হাদীসসমূহ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এ হাদীসগুলোর বর্ণনাকারিগণ আবার কি করে বলতে পারেন যে হঠাৎ তাঁর সম্মুখে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি যা দেখে ভীত হয়ে পড়েছিলেন যে একবার সান্ত্বনা দেয়া সত্ত্বেও তিনি পুনঃ পুনঃ অস্থির হয়ে পড়তেন এবং পাহাড়ের চূড়া থেকে লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছা করতেন! শুধু তাই নয়, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) কর্তৃক বার বার সান্ত্বনা দেয়ারও প্রয়োজন হত। প্রত্যাদেশের প্রাথমিক অবস্থায় অন্যান্য নবীগণেরও কি এমন সন্দেহ হয়েছিল? হযরত মূসা (আঃ) যখন বৃক্ষের উপর থেকে শব্দ শুনতে পেলেন যে "আমি আল্লাহ্" তখন কি তাঁর সন্দেহ হয়েছিল?

আমি এ বিষয়ে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী ও অন্যান্য গ্রন্থকারগণের অনুসরণ করতে চাই না। আমি শুধু দেখাতে চাই, মূল হাদীসটির সূত্র মরফু-মুত্তাসিল, না অন্য কিছু। এ হাদীসটির সূত্র ইমাম যুহ্রী পর্যন্তই শেষ হয়ে যায় তার পরে কোন সাহাবী পর্যন্ত এ সূত্রটি এগোয়নি। সুতরাং বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারিগণ নিজেরাই উল্লেখ করেছেন যে এ ধরনের বিশিষ্ট ঘটনার জন্য কর্তিত সূত্র (সনদে মাকতু) যথেষ্ট নয় বরং অবিচ্ছেদ্য ও পূর্ণ সূত্রের (সনদে মুত্তাসিল) প্রয়োজন।

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) নবুওতের দায়িত্ব সম্পাদন করতে গিয়ে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলেন। যদি তাঁর দায়িত্ব হযরত ঈসার (আঃ) মত শুধু তাবলীগ করাই হত কিংবা হযরত মূসার (আঃ) মত স্বীয় সম্প্রদায়কে মিসর থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হত, তবে কোন অসুবিধাই ছিল না। কিন্তু সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর কর্তব্য ছিল নিজে অক্ষত থেকে সমগ্র আরব তথা সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি এলাকাকে ইসলামের সুনির্মল আলোতে আলোকিত করা। এ জন্য অত্যন্ত সুকৌশলে ধীরস্থিরভাবে এগুতে হয়েছে। সর্বপ্রথম কার নিকট এ বিপজ্জনক রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করা যায়, এটাই ছিল প্রধান সমস্যা। এ কাজের জন্য শুধু সে সমস্ত লোককেই নির্বাচন করা যেতে পারে যারা বহুকাল যাবৎ তাঁর সাহচর্য ও বন্ধুত্ব ভোগ করেছেন এবং যাঁরা তাঁর চালচলন ও স্বভাব-চরিত্রের প্রত্যেকটি স্তর সম্পর্কে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। এ অভিজ্ঞতার আলোকে অতি সহজেই তাঁর দাবির সত্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এ ধরনের লোকদের মধ্যে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত খাদিজা (রাঃ) তাঁর স্নেহে লালিত-পালিত হযরত আলী (রাঃ), তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ও খাস সেবক হযরত

যায়েদ এবং বহুকালের পুরাতন বন্ধু হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন অন্যতম। (ইসবা ফী আহ্ওয়ালিস্ সাহাবা দ্রষ্টব্য)। তিনি সর্বপ্রথম হযরত খাদিজা (রাঃ)-কে এ সংবাদ দান করলেন। হযরত খাদিজা এ আহ্বান প্রাপ্তির পূর্ব থেকে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন। তৎপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য তিনজনের প্রতিও ইসলামের আহ্বান জানান হলে সকলেই তাঁর আহ্বানে সাড়া প্রদান করেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) ধনী, আরবের বংশবিশারদ, বুদ্ধিমান ও অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। বিখ্যাত সীরাতকার ইবনে সা'দ উল্লেখ করেছেন যে ইসলাম গ্রহণ করার সময় তাঁর নিকট চল্লিশ হাজার দেরহাম ছিল।

উপরোক্ত গুণাবলীর দরুন মক্কা নগরীতে তাঁর ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান ছিল এবং শহরের সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। বিভিন্ন হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে বিশিষ্ট সাহাবিগণের মধ্যে হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত যুবাইর (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে 'আওফ', ইরান বিজয়ী হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও হযরত তালহা (রাঃ) তাঁরই পরামর্শ ও উৎসাহে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (রিয়াজুন নাজরাহ লিমুহি-ব্বিত্তাবারী, পৃঃ ৫৭)। তাঁদের সাহায্যে গোপনে গোপনে ইসলামের আন্দোলন অন্যান্য নাগরিকদের নিকটও প্রচারিত হতে থাকে এবং মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ প্রথম পর্যায়ের মুসলমানগণের মধ্যে হযরত আম্মার (রাঃ), হযরত খাব্বাব (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ), হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত আরকাম (রাঃ), হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত ওসমান ইবনে মাজউন (রাঃ), হযরত উবাইদা (রাঃ) এবং হযরত সুহাইব রুমী (রাঃ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

কিন্তু এ পর্যন্ত যা হয়েছিল তা অত্যন্ত সংগোপনেই হয়েছিল। অত্যন্ত সতর্কভাবে এ বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা হত, যাতে মুসলমান ব্যতীত অন্য কেউ এ সংবাদ জানতে না পারে। নামাযের সময় হলে রসূলে পাক (সাঃ) কোন পাহাড়ের উপত্যকায় গিয়ে অত্যন্ত গোপনে নামায আদায় করতেন।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল আসীরের মতে চাশতের নামায তিনি পবিত্র কাবা প্রাঙ্গণেই আদায় করতেন। কেননা, কোরাইশদের ধর্মে এ নামায পড়া বৈধ বলে পরিগণিত ছিল। একদিন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের কোন উপত্যকায় নামায পড়ছিলেন। ঘটনাক্রমে তাঁর পিতৃব্য হযরত আবু তালেব সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। নতুন নিয়মে উপাসনা করতে দেখে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট মনে দেখতে লাগলেন। নামাযান্তে তিনি রসূলে পাক (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন্ ধর্ম। তিনি উত্তর দিলেন যে এটি আমাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-

এর ধর্ম। হযরত আবু তালেব বললেন, যদিও আমি এ ধর্ম গ্রহণ করতে পারি না, কিন্তু তোমাকে এর অনুমতি দিলাম এবং কেউ তোমাকে এতে বাধা দিতে পারবে না।

ইসলামের ইতিহাসে, ইসলাম কিভাবে প্রচারিত হল, এটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমাদের বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন যে ইসলাম তরবারির জোরে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সম্পর্কে এ পুস্তকের দ্বিতীয় অংশে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। কিন্তু একটি বিশেষ লক্ষ্যের প্রতি এখানেই দৃষ্টি দেয়া উচিত। অর্থাৎ, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমান হবার অপরাধে যখন জান ও মাল উভয়ই নষ্ট হবার ষোল আনা আশংকা ছিল, তখন কোন্ ধরনের লোকজন পবিত্র ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

সে সময় যে সমস্ত লোক পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে কতিপয় বিষয়ে প্রবল ঐক্য বিরাজমান ছিল। আর যারা প্রবলভাবে ইসলামের বিরাধিতা করেছিল তাদের মধ্যেও কয়েকটি বিষয়ে প্রবল ঐক্য বিদ্যমান ছিল। পরে এদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে সমস্ত লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যারা পূর্ব থেকে সত্যধর্মের অন্বেষণে রত ছিলেন এবং স্বাভাবিকভাবে সৎস্বভাব ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর কথাই বলা যেতে পারে। তিনি অন্ধকার যুগেই সত্যবাদী, বিশ্বস্ত এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। হযরত ওসমান ইবনে মাজউন সাধু চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই মদ্যপান পরিত্যাগ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রসূলে পাক (সাঃ) তাঁকে অনুমতি দেননি। হযরত সুহাইব (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাদ'আন (রাঃ) কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন, যিনি ইসলামধর্ম প্রচারিত হবার পূর্বেই মদ্যপান পরিত্যাগপূর্বক পরলোকগমন করেছিলেন। হযরত আবু যর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে ৬ষ্ঠ কিংবা ৭ম স্থানের অধিকারী ছিলেন। নিম্নে তাঁর ইসলামধর্ম গ্রহণের ঘটনাবলী বর্ণনা করা হল ঃ

হযরত আবু যর (রাঃ) পূর্বেই মূর্তিপূজা বর্জন করে অনির্দিষ্ট নিয়মে যখন যেভাবে ইচ্ছা আল্লাহ্ পাকের যিকির করতেন এবং নামায পড়তেন। তিনি যখন নবী করীম (সাঃ)-এর কথা শুনলেন, তখন প্রকৃত বিষয় অবগত হবার জন্য তাঁর ভাইকে মক্কায় প্রেরণ করেন। তিনি মক্কায় এসে রসূলে পাক (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে কোরআন পাকের কয়েকটি সূরা শ্রবণ করলেন। তিনি বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে হযরত আবু যরের নিকট বললেন, "আমি এমন একজন লোককে দেখেছি যাকে মক্কাবাসীরা ধর্মচ্যুত বলে থাকে। তিনি মানুষকে উত্তম ও

চরিত্রবান হতে শিক্ষা দেন এবং তিনি যে কালাম আবৃত্তি করেন তা কবিতা নয় বরং অন্য কোন কিছু। তুমি যে রীতিপদ্ধতি গ্রহণ করেছ সেটি এর সাথে যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ।"

এ সংবাদে তিনি আশ্বস্ত হতে না পেরে নিজেই মক্কায় এসে রসূলে পাক (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং কথাবার্তা শুনে পবিত্র ইসলামধর্মে দীক্ষিত হলেন। তিনি আজীবন যাবতীয় পার্থিব সম্পর্ক পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসীর মত কালাতিপাত করেছেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে মুসলমানদের পক্ষে ধন-সম্পদ জমা করে রাখা বৈধ নয়। সুতরাং এ বিষয়ে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সাথে তাঁর মতভেদ হওয়ায় তিনি তাঁকে মদীনা থেকে দূরে "রবযা" নামক স্থানে পাঠিয়ে দেন।[১]

(২) কোন কোন সাহাবী আহনাফদের দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন। যে সমস্ত লোক ইসলামধর্ম প্রচারিত হবার পূর্বে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করেন এবং নিজেদেরকে হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) অনুসারী বলে দাবি করতেন, তারাই "আহনাফ" নামে অভিহিত হতেন। তাঁরা ধর্ম সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা পোষণ ভিন্ন আর কিছুই জানতেন না। তাই তাঁরা প্রকৃত সত্যধর্মের অন্বেষণে সচেষ্ট ছিলেন। উপরে বর্ণিত যায়েদ তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি রসূলে পাকের নবুওতপ্রাপ্তির ৫ বছর পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।

কিন্তু সাঈদ নামক তাঁর এক পুত্র জীবিত ছিলেন। তিনি পিতার কথাবার্তা শুনেছিলেন। সুতরাং তিনি রসূলে পাক (সাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বুঝতে পারলেন যে যে-মহাপুরুষের অন্বেষণ করতে করতে তাঁর পিতা জীবনপাত করেছেন এবং তিনি আজ পর্যন্ত নিজেও অন্বেষণ করছেন ইনিই সে ব্যক্তি।

(৩) একটি বিষয়ে তাঁরা সবাই সংযুক্ত ছিলেন যে তাঁদের মধ্যে কেউই কোরাইশদের কোন উচ্চপদে আসীন ছিলেন না, বরং তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ যেমন, হযরত আম্মার (রাঃ), হযরত খাববাব (রাঃ), হযরত আবু ফকীহ্ (রাঃ) ও হযরত সুহাইব (রাঃ) প্রমুখ এমন পর্যায়ের ছিলেন যাঁরা কোনদিন ধনবানদের সাথে একত্রে বসারও সুযোগ পাননি। সুতরাং রসূলে পাক (সাঃ) যখন তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে পবিত্র কাবা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হতেন, তখন কোরাইশদের নেতৃবর্গ বিদ্রূপ করে বলতেন ঃ أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا

"এরা কি সে সমস্ত লোক যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের পরিবর্তে দয়া করেছেন।" (সূরা আন'আম, ১ম রুকু)

১. হযরত আবু যর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা "সহীহ্ বোখারী" ও "সহীহ্ মুসলিম" উভয় গ্রন্থেই বর্ণনা করা হয়েছে। তবে উভয়ের বর্ণনাতে বিস্তর পার্থক্য। আমি এখানে উভয় গ্রন্থ থেকেই কিছু কিছু বর্ণনা করেছি। সংক্ষেপ করতে গিয়ে অনেক কথা পরিত্যাগ করেছি।

বিধর্মীদের নিকট তাঁদের দারিদ্র্য তাঁদের প্রতি ঘৃণা ও অবমাননার উপাদান ছিল। কিন্তু এ দারিদ্র্যের জন্যই সর্বপ্রথম ঈমান নামক মহাসম্পদ তাঁদের হস্তগত হয়েছিল। ধন-সম্পদ তাঁদের অন্তঃকরণকে মোহান্ধ করতে পারেনি এবং গর্ব ও অহংকার তাঁদেরকে সত্যের নিকট মাথা অবনত করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তাঁদের এ ভয় ছিল না যে যদি মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করি, তবে পবিত্র কাবার উচ্চপদ হস্তচ্যুত হয়ে যাবে। মোটকথা, তাদের অন্তর যাবতীয় লোভ-লালসা এবং পিছুটান থেকে মুক্ত ছিল। সুতরাং সত্যের আলো তাঁদের অন্তরে পড়া মাত্রই তা গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সহজতর হয়েছিল।

এ কারণেই দেখা গেছে, নবিগণের প্রথম অনুসারিগণ সাধারণত দরিদ্র ও সহায়সম্বলহীন জনগোষ্ঠী থেকে বের হয়ে এসেছেন। খৃষ্টধর্মের প্রথম অনুসারিগণ ছিলেন জেলে সম্প্রদায়ের খেটে খাওয়া দরিদ্র লোক। হযরত নূহ (আঃ)-এর বিশেষ নিকটতম শিষ্যগণ সম্পর্কে অবিশ্বাসীরা প্রকাশ্য মন্তব্য করেছিল যে "আমরা কেবল নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণকেই তোমার অনুসারী দেখছি এবং আমরা তোমাদের মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠত্বও দেখি না বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি।"—(সূরা হুদ)

ইসলামের প্রথম অনুসারিগণের বিশ্বাস যে কত গভীর ছিল তার বিশদ বিবরণ পরে দেয়া হবে। সে বিবরণীর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যাবে যে কোরাইশদের ক্রোধের ভীষণতা, অন্যায় অত্যাচারের কষ্ট এবং ধন-সম্পদের লোভ ইত্যাদি কোন কিছুই তাঁদের বিশ্বাস টলাতে পারেনি আর শেষ পর্যন্ত এ দুর্বল জনগোষ্ঠীই বিশাল রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য অধিকার করতে সক্ষম হয়।

তিন বছর পর্যন্ত রসূলে পাক (সাঃ) অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে দ্বীনের প্রচারকার্য পরিচালনা করেন। তিন বছর অন্তর রসূলে পাক (সাঃ)-এর অভিজ্ঞতা ও সহনক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে আল্লাহ্ পাক তাঁকে প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচারের আদেশ প্রদান করেন। বলা হয় ঃ

"আপনার প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দেশ প্রকাশ্যভাবে প্রচার করুন।"

— (সূরা হাজার, ৬ রুকু)

অধিকন্তু যখন সে আয়াত অবতীর্ণ হল যাতে বলা হয়েছে ঃ

"আপনি আপনার পরিবার-পরিজন ও নিকটাত্মীয়গণকে (আল্লাহ্ পাকের) ভয়প্রদর্শন করুন।"—(সূরা শু'আরা, ১১ রুকু)

এ দুটি আয়াত অবতীর্ণ হবার পর রসূলে পাক (সাঃ) মক্কায় সাফা পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে সুউচ্চকণ্ঠে কোরাইশদেরকে আহ্বান করলেন। তাঁর আহ্বানে কোরাইশ সম্প্রদায়ের লোকজন পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হলে তিনি বললেন, "আমি যদি বলি যে এ পাহাড়ের পেছন দিক থেকে তোমাদেরকে

আক্রমণ করার উদ্দেশে একদল সৈন্য আসছে, তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?" সবাই সমস্বরে বলে উঠল, "হ্যাঁ, আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করব।" কেননা, আমরা তোমাকে কখনও সত্য ছাড়া মিথ্যা বলতে শুনিনি।" তিনি বললেন, "আমি বলি, তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ না কর, তবে তোমাদের উপর কঠিন শাস্তি আপতিত হবে।" একথা শুনে তাঁর পিতৃব্য আবু লাহাবসহ সবাই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ফিরে গেল।—(সহীহ্ বোখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭০২)

এ ঘটনার পর কিছুদিন অতিবাহিত হলে রসূলে পাক (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে একটি বিশেষ ভোজের আয়োজন করতে বললেন। প্রকৃতপক্ষে এ ভোজসভাই ইসলাম প্রচারের প্রথম সুযোগ ছিল। হযরত আবদুল মুত্তালিবের বংশের সমুদয় লোককে দাওয়াত করা হল। হযরত হামযা (রাঃ), হযরত আবু তালেব ও হযরত আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ সবাই এতে উপস্থিত হয়েছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর রসূলে পাক (সাঃ) দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, "আমি এমন একটি বিষয়সহ এসেছি যা ইহকাল ও পরকাল উভয়কালের জন্য জামিনস্বরূপ। এ মহান দায়িত্ব সম্পাদন করতে কে আমাকে সাহায্য করবে?" সমগ্র ভোজসভা একেবারে নীরব ও নিস্তব্ধ ছিল। অকস্মাৎ হযরত আলী (রাঃ) দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, "যদিও আমার চোখে রোগ রয়েছে এবং পদযুগল ক্ষীণ ও বয়সে আমি সবার চাইতে ছোট, তথাপি এ কর্তব্য সমাপনে আমি আপনাকে সাহায্য করব।"[১]

কোরাইশদের জন্য এটি অত্যন্ত অপূর্ব ও বিচিত্র দৃশ্য ছিল যে মাত্র দুটি প্রাণী (যাদের একটির বয়স মাত্র দশ বছর) এ বিশ্বের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন। হযরত আলীর (রাঃ) কথা শুনে উপস্থিত সবাই হেসে উঠল। কিন্তু ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর দ্বারা তাঁদের কথার সত্যতা নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত হয়েছে।

অল্প কিছু সময়ের ব্যবধানেই মুসলমানদের চল্লিশ সদস্যবিশিষ্ট একটি দল গঠিত হয়। হযরত নবী করীম (সাঃ) মুসলমানদের এ দলটিকে সঙ্গে নিয়ে পবিত্র কাবা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের কথা ঘোষণা করেন। এ ঘটনাকে কাফেররা পবিত্র কাবার মারাত্মক অবমাননা মনে করল। ফলে, অত্যন্ত আকস্মিকভাবে ভীষণ গোলযোগ সৃষ্টি হল এবং চারদিক থেকে রসূলে পাক (সাঃ)-কে আক্রমণ করা হল। হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত সন্তান হযরত হারেস ইবনে আবি হালা ঘরেই ছিলেন। তিনি সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে দৌড়ে এলেন এবং রসূলে পাক (সাঃ)-কে রক্ষা

১. তারীখে তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ-১১৭১ তফসীরে তাবারী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৮, তে, আবদুল গফফার ইবনে কাসেম এবং মিনহাল ইবনে আমরের মাধ্যমে বর্ণিত। তন্মধ্যে ১ম জন শিয়া এবং পরিত্যাজ্য আর ২য় জন বদ মজহাব। শুধু তাই নয়, অধিকন্তু এই হাদীসে 'দুর্বলতা' ও "কল্পিত" হাদীসের বহু দোষ উপস্থিত রয়েছে।

করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু চারদিক থেকে তাঁর উপর তলোয়ারের আঘাত পড়ায় তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। ইসলামের পথ সর্বপ্রথম তাঁর রক্তেই রঞ্জিত হল।[১]

কোরাইশদের বিরোধিতা ও এর কারণ

লোকের চোখে মক্কা ও মক্কাবাসীদের যে সম্মান ও মর্যাদা ছিল, তা একমাত্র কাবার কারণেই বিদ্যমান ছিল। সমস্ত আরবে কোরাইশদের ধর্মীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। একমাত্র কাবাগৃহের কারণেই তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিবেশী বরং আল্লাহ্ পাকের পরিজন বলা হত। তাঁরা পবিত্র কাবাগৃহের প্রতিবেশী এবং তার চাবির বাহক ছিলেন বলেই এহেন সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। পবিত্র কাবার সাথে তাঁদের সম্পর্কের দরুন আরব ও অন্যান্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় তাঁদের ব্যবসার প্রসার ঘটেছিল। শেষ পর্যন্ত কোরাইশরা পবিত্র কাবাগৃহের রক্ষণাবেক্ষণ ও পৌরোহিত্য করার জন্য বিভিন্ন বিভাগ ও বড় বড় পদ সৃষ্টি করেছিল। নিম্নে তার বিরবণ দেয়া হল।

পদের নাম	কাজের বিবরণ	কোন্ বংশ কোন্ পদের অধিকারী ছিল	রসূলে পাক (সাঃ)-এর সময়ে এ সমস্ত পদাধিকারীদের নাম
হিজাবাহ্	কাবাগৃহের চাবি বহন ও পৌরোহিত্যকরণ		ওসমান ইবনে তালহা
রিফাদাহ	দরিদ্র হাজীদের দেখাশোনা	নৌফেল পরিবার	হারেস ইবনে আমের
সিকায়াহ্	হাজিগণকে পানি পান করাবার বন্দোবস্ত করা	হাশেম পরিবার	হযরত আব্বাস (রাঃ)
মুশাবরা	পরামর্শ সভার আয়োজন করা	আসাদ পরিবার	ইয়াযিদ ইবনে রবিয়াতুল আসওয়াদ
দিয়াত ও মাগারিম	নরহত্যার ক্ষতিপূরণ	তায়ম পরিবার	হযরত আবু বকর (রাঃ)
ওকাব	পতাকা বহন	উমাইয়া পরিবার	আবু সুফিয়ান (রাঃ)
কুব্বাহ্	তাঁবুর বন্দোবস্ত এবং অশ্বারোহীদের নেতৃত্ব	মাখযুম পরিবার	ওলীদ ইবনে মুগীরাহ
সাফারাত মুনাফাবাত	দূতস্বরূপ গমন করা এবং যে সমস্ত গোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিবাদ তা মীমাংসা করা	আদী পরিবার	হযরত ওমর (রাঃ)
আযলাম ওয়া আয়সার	জুয়া ও খেলাধুলার বিভাগ পরিচালনা	জামহ্য পরিবার	সাফওয়ান ইবনে উমাইয়াহ
আমওয়াল	কোষাধ্যক্ষের কার্য পরিচালনা	সাহ্ম পরিবার	হারেজ ইবনে কায়স

১. ইসাবা ফী আহ্ওয়ালিস্সাহাবা, যিকরে হারেস ইবনে আবী হালাহ্।

ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় যাঁরা কোরাইশদের প্রধান প্রধান নেতৃত্বপদে আসীন ছিলেন এবং যাঁদের সম্মান ও প্রতিপত্তিতে সমস্ত মক্কানগরী প্রভাবান্বিত ছিল, নিম্নে তাঁদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল।

১। আবু সুফিয়ান ইবনে হারব। তিনি হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর পিতা ছিলেন। তাঁর পিতা হারব ফুজ্জার যুদ্ধে কোরাইশদের প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

২। আবু লাহাব। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পিতৃব্য ছিলেন।

৩। আবু জাহল। সে ওলীদ ইবনে মুগীরার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং স্বগোত্রের নেতা ছিলেন।

৪। ওলীদ ইবনে মুগীরা। ইসলামের বিখ্যাত মুজাহিদ হযরত খালিদ (রাঃ)-এর পিতা এবং কোরাইশ বংশের প্রধান নেতা ছিলেন।

৫। 'আস' ইবনে ওয়ায়েল সাহমী। মিসর বিজয়ী হযরত আমর (রাঃ)-এর পিতা, অত্যন্ত সম্পদশালী, প্রভাবশালী এবং বহু সন্তান-সন্ততির জনক ছিলেন।

৬। ওতবাহ ইবনে রবিয়া। হযরত আমীর মুয়াবিয়ার (রাঃ) মাতামহ, সম্ভ্রান্ত এবং প্রচুর ধনসম্পদের মালিক ছিলেন।

এছাড়া আসওয়াদ ইবনে মাতলাব, আসওয়াদ ইবনে 'আবদে ইয়াগুস, নাজর ইবনে হারেস ইবনে কালদ্, আখনাস ইবনে শুরাইক সাকাফী, উবাই ইবনে খালফ এবং ওকবাহ ইবনে আবি মু'ঈত নামক কতিপয় ব্যক্তিকেও প্রভাবশালী বলে স্বীকার করা হত।

এখানে এ কথাটিও বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে হাশেমী পরিবার ও উমাইয়া পরিবারের মধ্যে সর্বদাই শত্রুতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব বর্তমান ছিল। বহুকাল যাবত তাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের ভাব চলে আসছিল।

বিরোধিতার প্রথম কারণ

অশিক্ষিত ও বর্বর জাতিসমূহের বিশেষত্বই হল এই যে তাদের পূর্বপুরুষের বিশ্বাস ও প্রথার পরিপন্থী কোন আন্দোলন সৃষ্টি হলে তারা সাংঘাতিকভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং তার বিরোধিতা করা শুধুমাত্র তর্ক-বিতর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, ববং রক্তাক্ত যুদ্ধ ছাড়া তাদের প্রতিশোধ স্পৃহাও স্তিমিত হয় না। আমাদের এই উপমহাদেশের অধিবাসীরা আজ অনেকটা সভ্য জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আজও যদি কোন সাধারণ ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী কোন কাজ কোথাও সংঘটিত হয়, তবে পরিস্থিতি অত্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করে।

বহুকাল যাবৎ আরববাসীরা মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। মূর্তিভঙ্গকারী হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র কাবাগৃহে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে 'হোবল' নামক মূর্তিটির পূজা করা হত, সর্বাপেক্ষা বড় ও প্রধান উপাস্য হিসাবে। এ মূর্তিটিকেই যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক বলে মনে করা হত। মনে করা হত বৃষ্টি বর্ষণ, সন্তান দান এবং যুদ্ধবিগ্রহে জয়-পরাজয় তারই হাতে ন্যস্ত। তাদের ধারণায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলতে কেউই ছিল না, আর যদিওবা ছিল, তবে তিনি ছিলেন নিষ্ক্রিয় এবং উপাস্য দেব-দেবীগুলোর উপর অনেকটা নির্ভরশীল এক সত্তা।

দ্বিতীয় কারণ

উপরোক্ত অবস্থার আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করাই ছিল ইসলামের সর্বপ্রধান কর্তব্য। কিন্তু এ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোরাইশ সম্প্রদায়ের মান-সম্মান ও বিশ্বব্যাপী প্রভাবপ্রতিপত্তির বিলুপ্তির আশংকা ছিল অবশ্যম্ভাবী। তাই কোরাইশ সম্প্রদায় অত্যন্ত কঠোরভাবে ইসলামের বিরোধিতা করছিল এবং যার স্বার্থ যত বেশি নষ্ট হওয়ার আশংকা ছিল, তার বিরোধিতাও ততই কঠোরতর ছিল।

হারব ইবনে উমাইয়া ছিল কোরাইশদের প্রধান নেতা। সুতরাং ফুজ্জার যুদ্ধে সে-ই কোরাইশদের প্রধান সেনাপতি ছিল। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তারই পুত্র আবু সুফিয়ান এ পদের উপযুক্ত ছিল না বিধায় ওলীদ ইবনে মুগীরা স্বীয় যোগ্যতা ও প্রভাবপ্রতিপত্তি দ্বারা এ পদে বরিত হয়েছিল। আবু জাহ্ল তারই ভ্রাতুষ্পুত্র এবং কোরাইশদের মধ্যে বিশিষ্ট পদের অধিকারী ছিল।

আবু সুফিয়ান যদিও পিতৃপদে বরিত হতে পারেননি, কিন্তু তিনিই বনী উমাইয়া বংশের নেতা ছিলেন। রসূলে পাক (সাঃ)-এর পিতৃব্য আবু লাহাব ছিলেন সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও বনী হাশেম গোত্রের নেতা।

সাহাম গোত্রের মধ্যে 'আস-ইবনে ওয়ায়েল সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ছিল। সে অত্যন্ত ধনী ও বহু সন্তান-সন্ততির জনক ছিল।

কোরাইশদের শাসনক্ষমতা মূলত উল্লিখিত নেতাগণের হাতেই ন্যস্ত ছিল। তারাই অত্যন্ত কঠোরভাবে ইসলাম ও রসূল (সাঃ)-এর বিরোধিতা করেছিল। কোরাইশদের অন্যান্য নেতৃবর্গ—আসওয়াদ ইবনে মাতলাব, আসওয়াদ ইবনে ইয়াগুস, নাজর ইবনুল হারেস, উমাইয়া ইবনে খালফ, ওকবা ইবনে আবি মুঈত প্রমুখ সবাই তাদেরই প্রভাবাধীন ছিল। এ জন্য ইসলামের সাথে শত্রুতা করার ব্যাপারেও তাদের নাম সর্বত্রই সর্বাগ্রে পরিদৃষ্ট হয়।

কোরাইশদের মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে নবুওতের মহান পদে যদি কাউকে বরণ করা হয়, তবে মক্কা অথবা তায়েফের কোন প্রধান নেতাকেই এ পদে বরণ করতে হবে। কোরআন পাকে তাদের বিষয়ে বলা হয়েছে—

"তারা বলত, এই দুই শহরের (মক্কা ও তায়েফের) কোন প্রধান নেতা (ওলীদ ইবনে রবিয়া অথবা আবু মসউদ সাকাফী)-এর উপর কেন কোরআন শরীফ অবতীর্ণ করা হল না? (সূরা যুখরুফ, ৩য় রুকু)

আরবে নেতৃত্ব লাভের জন্য সম্পদ এবং সন্তান থাকাই ছিল সর্বপ্রধান ও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় শর্ত। সন্তানাদি সম্পর্কে অধিকাংশ অসভ্য জাতিসমূহের মধ্যে কুসংস্কার রয়েছে যে যার সন্তানাদি নেই সে ব্যক্তি পরকালের যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে।

ভারতেও এ ধারণা বিদ্যমান রয়েছে যে সন্তানাদি ব্যতীত কেউ পরকালে পরিপূর্ণভাবে মুক্তিলাভ করতে পারবে না।

উপরোক্ত গুণাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ কোরাইশদের মধ্যে নেতৃত্বলাভের উপযুক্ত ছিলেন। ওলীদ ইবনে মুগীরা, উমাইয়া ইবনে খালফ, আস্ ইবনে ওয়ায়েল সাহমী এবং আবু মসউদ সাকাফী।

রসূলে পাক (সাঃ)-এর মধ্যে মক্কাবাসীদের উপরোক্ত শর্তাবলীর অভাব ছিল। প্রথমত ধন-সম্পদ তাঁর ছিল না এবং তাঁর কোন পুত্রসন্তানও দু'এক বছরের বেশি জীবিত থাকেনি।

তৃতীয় কারণ

খৃষ্টানদের প্রতি কোরাইশদের স্বভাবজাত ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল। কেননা, হাবশার "আবরাহা" নামক জনৈক খৃষ্টান অধিপতি পবিত্র কাবাগৃহ ধ্বংস করার জন্য অভিযান চালিয়েছিল। এ কারণেই কোরাইশরা খৃষ্টানদের পরিবর্তে অগ্নিপূজক পারসিকদের অধিক পছন্দ করত। সুতরাং রোম ও পারস্যের যুদ্ধে যখন রোমানরা পরাজয়বরণ করে ও পারস্যবাসীরা বিজয়ী হয়, তখন কোরাইশরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং মুসলমানগণ দুঃখিত হয়েছিল। আল্লাহ্ পাক মুসলমানগণকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে সূরা "আররোমে" নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله -

"(আরবের) নিকটবর্তী দেশে রোম পরাস্ত হয়েছে। কিন্তু তারা পরাস্ত হবার পর কয়েক বছরের মধ্যে আবার বিজয়ী হবে। অগ্রে ও পশ্চাতে আল্লাহ্ পাকের

ইচ্ছাই কার্যকরী হয়ে থাকে এবং সেদিন মুসলমানগণ আনন্দিত হবে।"—(সূরা আররোম)

ইসলামধর্ম ও খৃষ্টানধর্মের মধ্যে বহু বিষয়ে মতৈক্য ও সামঞ্জস্য ছিল। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে তখনকার সময়ে খৃষ্টানদের মত মুসলমানদেরও কেবলা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস এবং হিজরতের পরেও বেশ কিছুকাল সেটিই মুসলমানদের কেবলা ছিল। উপরোক্ত কারণে কোরাইশদের মধ্যে এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)ও প্রকারান্তরে খৃষ্টধর্মই প্রচার করতে চাইছেন।

চতুর্থ কারণ

গোত্রগত শত্রুতা ও রেষারেষিই ছিল ইসলামের বিরোধিতার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ। কোরাইশ বংশের মধ্যে বনী হাশেম ও বনী উমাইয়া গোত্রই ছিল প্রধান ও মর্যাদাবান। এরা একে অপরের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। আবদুল মুত্তালিব তাঁর সমগ্র শক্তি ও প্রভাবপ্রতিপত্তির মাধ্যমে বনী হাশেমের শক্তি বৃদ্ধি করছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশের মধ্যে কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেনি। আবদুল মুত্তালিবের সন্তান সন্ততিদের মধ্যে হযরত আবু তালেবই সম্পদশালী ছিলেন না। হযরত আব্বাস (রাঃ) সম্পদশালী থাকলেও উদার ও মুক্তহস্ত ছিলেন না। আবু লাহাব ছিল দুশ্চরিত্র, লম্পট। এ সুযোগে বনী উমাইয়াদের প্রভাবপ্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। রসূলে পাক (সাঃ)-এর নবুওতপ্রাপ্তিকে বনী উমাইয়াগণ তাদের গোত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী বনী হাশেম গোত্রের বিজয় মনে করে নিয়েছিল বলে তীব্রভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিরোধিতা করছিল। বদর যুদ্ধ ব্যতীত মক্কা বিজয়ের পূর্বে যে সমস্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সেগুলোর উদ্যোক্তা ও সেনাপতি ছিলেন হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ)।

ওকবা ইবনে আবী মুঈত ছিল রসূলে পাক (সাঃ)-এর সর্বাপেক্ষা বড় দুশমন। একদিন রসূলে পাক (সাঃ) যখন পবিত্র হরম শরীফে নামায পড়ছিলেন, তখন সে তাঁর উপর উটের পচা নাড়ীভুঁড়ি নিক্ষেপ করেছিল। এ ঘৃণ্য ও হতভাগ্য ব্যক্তিটিও উমাইয়া বংশেরই ছিল। বনী উমাইয়ার পর বনী মাখযুম গোত্র বনী হাশেম গোত্রের সমকক্ষতা দাবি করত। ওলীদ ইবনে মুগীরা ছিল এ গোত্রের নেতা। সুতরাং তারাও নবী করীম (সাঃ)-এর তীব্র বিরোধিতা করে। আবু জাহলের একটি বক্তৃতা থেকে উপরোক্ত মতের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। একদিন আখনাস ইবনে শুরাইক আবু জাহলের নিকট গিয়ে মোহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে তার মতামত জিজ্ঞেস করলে সে বলল, "আমরা এবং বনী হাশেম সর্বদাই একে অপরের প্রতিযোগিতা করে আসছি। তারা অতিথি সেবা করলে আমরাও অতিথি সেবা

করি, তারা নরহত্যার ক্ষতিপূরণ আদায় করলে আমরাও আদায় করি, তারা দয়া-দাক্ষিণ্য করলে আমরা তাদের চাইতে বেশি দান-দক্ষিণা করি। অবশেষে আমরা তাদের সমকক্ষতা অর্জন করেছি। বর্তমানে বনী হাশেমের এক যুবক পয়গম্বরী দাবি করছে। খোদার কসম, এ পয়গম্বরীকে আমরা কখনও স্বীকৃতি দেব না।"—(ইবনে হেশাম, পৃঃ—১০৮, মিসরে মুদ্রিত)

পঞ্চম কারণ

ইসলামের বিরোধিতা করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল এই যে কোরাইশদের মধ্যে মারাত্মক চরিত্রহীনতা দেখা দিয়েছিল। তাদের মধ্যকার বড় বড় নেতারা পর্যন্ত অত্যন্ত ঘৃণ্য দুষ্কর্মে লিপ্ত ছিল। আবু লাহাবের মত বনী হাশেমের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট নেতাও পবিত্র হরম শরীফের কোষাগার থেকে স্বর্ণ নির্মিত হরিণ চুরি করে বিক্রি করে দিয়েছিল।[১]

আখনাস ইবনে শুরাইক বনী জোহরা গোত্রের মিত্র এবং আরবের বিশিষ্ট নেতৃবর্গের মধ্যে পরিগণিত হত। সেও ছিল পরনিন্দুক এবং মিথ্যাবাদী। নজর ইবনে হারেস মিথ্যা কথা বলতে সাংঘাতিকভাবে অভ্যস্ত ছিল। এভাবে অধিকাংশ নেতা-উপনেতাই নানাবিধ নিকৃষ্ট ও দূষণীয় কর্মে লিপ্ত ছিল। রসূলে পাক (সাঃ) একদিকে যেমন মূর্তিপূজার নিন্দা করতেন, অপরদিকে তেমনি এ সমস্ত দুষ্কর্মের জন্য তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করতেন। যার ফলে, উপরোক্ত নেতৃবর্গের মান-সম্মান ও প্রভাবপ্রতিপত্তির ভিত্তিমূল দুর্বল হয়ে পড়ছিল। পবিত্র কোরআন করীমে সে সময় এসব অপকর্মের বিরুদ্ধে সর্বদাই আয়াত অবতীর্ণ হচ্ছিল। সে আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি নিরপেক্ষ থাকলেও জনগণ সহজেই বুঝে নিতে পারত যে কাদেরকে উদ্দেশ্য করে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন—

"আপনি সে ব্যক্তির কথা মানবেন না যে কথায় কথায় কসম খায়, (মানুষকে) তিরস্কার করে; পরনিন্দা করে, মানুষকে সৎকাজ করতে বাধা দান করে, সীমা অতিক্রমকারী, পাপী, কঠিন হৃদয় এবং অধিকন্তু সে জারজ, সম্পদ ও সন্তানের গর্বে গর্বিত।"—(সূরা কলম, রুকু ১)

"কখনও নয়, যদি সে বিরত না হয়, তাহলে সে মিথ্যাবাদী ও পাপী ব্যক্তির ললাটের চুল ধরে টানব।"—(সূরায়ে আলাক)

---

১. বহুকাল হতে একটি স্বর্ণের হরিণ পবিত্র হরম শরীফের কোষাগারে রক্ষিত ছিল। আবু লাহাব উক্ত হরিণ চুরি করে বিক্রয় করে দিয়েছিল। এ ঘটনাটি অধিকাংশ ইতিহাসেই বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কুতাইবাও "মা'আরেফ" গ্রন্থে ৫৫ পৃষ্ঠায় (মিসরে মুদ্রিত) এ ঘটনার বর্ণনা প্রদান করেছেন।

পবিত্র ইসলামধর্ম প্রচারের জন্য ওয়াজ-নসীহতের ন্যায় নরম পন্থাও গ্রহণ করা যেত, কিন্তু বহুকালের আরবীয় গর্বাহংকার, ধন-সম্পদ ও নেতৃত্বের দম্ভ প্রভৃতি একত্রে মিশে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল যে কঠিনভাবে আঘাত না করলে কোন ফলোদয় হত না। তাই অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিগণকেও নিম্নোক্তভাবে সম্বোধন করা হত—

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا

وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ـ

"আমাকে এবং তাকে একা ছেড়ে দাও, যাকে আমি নিঃসঙ্গভাবে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর প্রচুর ধন-সম্পদ, সন্তানাদি এবং (জীবিকা নির্বাহের) উপকরণ দান করেছি। তারপরও সে আরও অধিক পেতে চায়। নিশ্চয়ই (দেয়া হবে) না। কেননা, সে আমার নিদর্শনাবলীর সাথে শত্রুতা করেছে।"

এ আয়াতগুলোতে ওলীদ ইবনে মুগীরাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। সে ছিল কোরাইশ বংশের একজন প্রধান নেতা। উপরোক্ত কথাগুলো এমন একজন লোকের মুখ দিয়ে বের হত, যাঁর (বাহ্যিকভাবে) কোন ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না। কিন্তু বিরোধিতার সর্বাপেক্ষা বড় ও প্রধান কারণ ছিল এই যে ইসলাম মূর্তিপূজার ঘোর শত্রু। সমস্ত কোরাইশ তথা সমগ্র আরব জগতে এর প্রতিক্রিয়া সমানভাবে দেখা দিয়েছিল। কেননা, শত শত বছর যাবৎ তারা যে মূর্তি ও দেব-দেবীদেরকে তাদের অভাব-অভিযোগ নিরসনকারী হিসাবে মান্য করত এবং যাদের সামনে আভূমি নত হয়ে ভক্তিশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করত, ইসলাম তাদেরকে সমূলে উচ্ছেদ করে দিতে চায়। ঘোষণা করে—

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ (ط)

"নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে পরিত্যাগ করে তোমরা যাদের উপাসনা কর, তারা সবাই দোযখের (নরকের) জ্বালানি।"—(সূরা আম্বিয়া; ৭ম রুকু)

কোরাইশদের ধৈর্য অবলম্বনের কারণ

উপরোক্ত কারণগুলোর যে কোন একটির অজুহাতে কোরাইশরা ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে ধ্বংসাত্মক সমরাগ্নি জ্বালিয়ে দিতে পারত। কিন্তু তারা অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে অগ্রসর হল এবং ধৈর্যধারণের পক্ষে কতকগুলো অলঙ্ঘনীয় যুক্তি

ছিল। প্রথমত তারা গৃহযুদ্ধের দরুন একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল এবং বিশেষত দীর্ঘস্থায়ী ফুজ্জার যুদ্ধের পর এতই হীনবল হয়ে পড়েছিল যে যুদ্ধের নামে ভয়ে তাদের বুক কেঁপে উঠত। স্বগোত্রের প্রতি অতিমাত্রায় দরদের জন্য অতি সহজে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এমন কি, কোন গোত্রের একটি লোককে হত্যা করা হলে নিহত গোত্রের লোকেরা হত্যার কারণ অনুসন্ধান ব্যতিরেকেই প্রতিশোধ গ্রহণার্থে প্রস্তুত হয়ে যেত এবং প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত এ অগ্নি আর নির্বাপিত হত না। কোরাইশদের পক্ষে রসূলে পাক (সাঃ)-কে মেরে ফেলা কোন কঠিন কাজ ছিল না; অত্যন্ত সহজ ছিল। কিন্তু তারা জানত, এমতাবস্থায় বনী হাশেম তাঁর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ছাড়বে না। ফলে, সমস্ত মক্কায় যুদ্ধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে। ইতিমধ্যে বহুলোক পবিত্র ইসলামধর্ম গ্রহণও করেছিলেন। মক্কার প্রায় প্রত্যেক গোত্রেরই দু'একজন করে মুসলমান হয়েছিলেন। পরিণাম ফল এই দাঁড়িয়েছিল যে ইসলাম গ্রহণ করা যদিও অপরাধ ছিল, কিন্তু অপরাধী একজন ছিল না, বরং সংখ্যায় মোটামুটিভাবে তারাও ছিল অনেক। তাই সবাইকে ধ্বংস করে ফেলা সম্ভব ছিল না।

কোরাইশদের নেতৃবর্গের মধ্যে কয়েকজন সত্যিকারের সম্ভ্রান্ত নেতা ছিল। তারা কোন স্বার্থের বশীভূত না হয়ে বরং নিঃস্বার্থভাবেই রসূলে করীম (সাঃ)-এর বিরোধিতা করত। তারা স্বার্থান্ধ ছিল না বলে বিষয়টি শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করার পক্ষপাতী ছিল।[১]

নবী করীম (সাঃ) যখন প্রকাশ্যভাবে ইসলামের প্রতি আমন্ত্রণ জানাতে আরম্ভ করলেন এবং মূর্তিপূজার নিন্দাবাদ শুরু করলেন, তখন কোরাইশদের কতিপয় সম্মানিত ব্যক্তি হযরত আবু তালেবের নিকট অভিযোগ করল। হযরত আবু তালেব অত্যন্ত নম্রভাবে তাদেরকে বুঝিয়ে বিদায় করলেন। কিন্তু যেহেতু বিবাদের মূল কারণটি বর্তমান রয়েই গিয়েছিল। অর্থাৎ, রসূলে পাক (সাঃ) নিজের কর্ম হতে বিরত হতে পারেননি, তাই তারা দ্বিতীয়বার হযরত আবু তালেবের নিকট আগমন করল। এবার এ দলে কোরাইশদের সমুদয় নেতৃবর্গ— ওতবা ইবনে রবিয়া, সায়বাহ, আবু সুফিয়ান, আস ইবনে হেশাম, আবু জাহল, ওলীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়ায়েল প্রমুখ সকলেই ছিল। তারা হযরত আবু তালেবের নিকট রসূলে পাক (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে এ বলে অভিযোগ করল যে তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের দেব-দেবীর অপমান করে, আমাদের পিতা-

---

১. সম্ভবত তাদের সম্পর্কেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْئَوْنَ عَنْهُ
অর্থাৎ—"তাঁরা অন্যান্য লোককে রসূলে পাক (সাঃ)-কে কষ্ট দিতে বাধা দেয় কিন্তু নিজেরা ইসলামের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে না।" (ইসাবা, যিকরে আবি তালিব বাহাওয়ালা আব্দুর রাজ্জাক। "স")

মাতা, দাদা-দাদী ও পূর্বপুরুষকে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট বলে এবং আমাদেরকে নির্বোধ বলে প্রচার করে। অতএব, এখন থেকে তুমি তাঁকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাক অথবা তুমিও কার্যক্ষেত্রে নেমে আস, যাতে আমাদের মধ্যে একটা ফয়সালা হয়ে যেতে পারে।

হযরত আবু তালেব দেখলেন, অবস্থা সঙ্গীন হয়ে গেছে। কোরাইশরা এখন আর বরদাশ্‌ত করবে না এবং আমি একা সমস্ত কোরাইশদের বিরুদ্ধাচরণ করে টিকতেও পারব না। তখন তিনি হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-কে সংক্ষেপে বললেন, "প্রিয় বৎস! আমার উপর এমন কঠিন দায়িত্ব চাপিয়ে দিও না যা আমি বহন করতে পারব না।" রসূলে পাক (সাঃ)-এর প্রকাশ্য আশ্রয়দাতা ও রক্ষাকর্তা বলতে হযরত আবু তালেব ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। তিনি যখন দেখলেন, তাঁর এ আশ্রয়টিও টলটলায়মান, তখন অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে ও অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন, "আল্লাহ্‌র কসম!" যদি তারা আমার এক হাতে চাঁদ এবং অপর হাতে সূর্যও এনে দেয় তথাপি আমি আমার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হব না। আল্লাহ্ হয় এ কর্তব্য সমাধা করাবেন অথবা আমি স্বয়ং এর জন্য প্রাণ বিসর্জন করব।"

হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর এহেন প্রত্যয়দীপ্ত বক্তব্যে হযরত আবু তালেবের অন্তরে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। তিনি রসূলে পাক (সাঃ)-কে বললেন, "যাও, তোমার কর্তব্য পালন কর। আমি জীবিত থাকতে কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"—(ইবনে হেশাম, পৃঃ ৮৯। ইমাম বোখারী (রঃ) তাঁর রচিত ইতিহাসে সংক্ষেপে এ ঘটনা আলোচনা করেছেন)।

রসূলে পাক (সাঃ) পূর্বের মতই ইসলাম প্রচারে ব্যাপৃত হলেন। কোরাইশরা যদিও তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি; কিন্তু নানাভাবে তাঁকে কষ্ট দিতে কমও করছিল না। তাঁর পথে তারা কাঁটা বিছিয়ে রাখত এবং নামায পড়ার সময় তাঁর পবিত্র দেহে ময়লা নিক্ষেপ করত ও অকথ্য ভাষায় গালাগালি করত। এক সময় তিনি পবিত্র হরম শরীফে নামায পড়ছিলেন, এমতাবস্থায় ওকবা ইবনে আবী মু'ঈত তাঁর গলায় চাদর জড়িয়ে এমন জোরে টান দিয়েছিল যে তিনি উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। কোরাইশরা ভেবে বিস্মিত হয়ে যেত যে তিনি কেন এত কষ্ট সহ্য করেন। এরূপ দৈহিক ও মানসিক কষ্টের উদ্দেশ্য একমাত্র পার্থিব জাঁকজমক ও খ্যাতি অর্জন ছাড়া মানব মস্তিষ্ক আর কিছুই কল্পনা করতে পারে না। কোরাইশরাও এমনি ধারণা করল এবং ওতবা ইবনে রবিয়াকে কোরাইশদের পক্ষ থেকে দূত নিযুক্ত করে রসূলে করীম (সাঃ)-এর দরবারে পাঠানো হল। সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে দেখা করে জিজ্ঞেস করল—"মোহাম্মদ! আপনি কি চান? আপনি কি মক্কা নগরীর নেতৃত্ব চান? না কোন উচ্চপরিবারে বিয়ে করতে আকাঙ্ক্ষা করেন? না প্রচুর ধন-সম্পদ লাভের আশা করেন? যদি এ সমস্ত বিষয়

আপনি চান, তবে বলুন, আমরা যাবতীয় বস্তু আপনার জন্য সংগ্রহ করব। শুধু তাই নয়, আমরা এতেও রাজী যে আগামীকাল থেকে সমস্ত মক্কা নগরীর একচ্ছত্র অধিপতি হবেন আপনি, কিন্তু এ সমস্ত কাজ থেকে বিরত হোন।" ওতবার পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে সে এভাবে সফলতা অর্জন করতে পারবে। কিন্তু রসূলে পাক (সাঃ) এ সমস্ত লোভনীয় প্রস্তাব শোনার পর উত্তরে পবিত্র কোরআন করীমের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

"হে মোহাম্মদ (সাঃ)! আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার কাছে ওহী (প্রত্যাদেশ) আসে যে তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন। অতএব, সোজা তাঁর প্রতি ধাবিত হও এবং তাঁর নিকটই ক্ষমা প্রার্থনা কর।'—(সূরা হা-মীম-আস্‌সেজদাহ্)

"হে মোহাম্মদ (সাঃ)! আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করছ। যিনি দু'দিনে এ ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁর অংশীদার স্থির করছ, তিনি তো বিশ্ব পালনকর্তা।"—(সূরা হা-মীম আস্‌সেজদাহ্, ২য় রুকু)

ওতবা ব্যর্থ হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। সে কোরাইশদের নিকট গিয়ে বলল, "মোহাম্মদ (সাঃ) যে কালাম পাঠ করেন, তা কাব্য নয়, বরং অন্য কোন কিছু। আমার কথা হল এই যে তোমরা তাঁকে তাঁর বর্তমান অবস্থায় থাকতে দাও। যদি তিনি সফলতা অর্জন করে সমস্ত আরবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, তবে তোমাদেরই লাভ, অন্যথায় তিনি নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবেন।" কিন্তু কোরাইশরা ওতবার সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল।

হযরত হামযা ও হযরত ওমরের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ

রসূলে পাক (সাঃ)-এর পিতৃব্যগণের মধ্যে হযরত হামযাই (রাঃ) তাঁকে অত্যধিক ভালবাসতেন। তিনি রসূলে করীম (সাঃ)-এর চাইতে মাত্র দু'তিন বছরের বড় ছিলেন এবং এক সঙ্গেই খেলাধুলা করতেন। তাঁরা উভয়েই সাওবিয়া নাম্নী এক দাসীর দুধপান করেছিলেন এবং এ সম্পর্কে তাঁরা একে অপরে দুধ ভাইও ছিলেন। হযরত হামযা যদিও তখন পর্যন্তও ইসলাম গ্রহণ করেননি, কিন্তু রসূলে পাক (সাঃ)-এর প্রত্যেকটি রীতিনীতি অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। যুদ্ধবিদ্যা এবং শিকার ছিল তাঁর প্রিয় অভ্যাস। তিনি অভ্যাসমত ভোর রাত্রে অন্ধকার থাকতেই তীর-ধনুক নিয়ে বের হয়ে যেতেন এবং সারাদিন শিকারে কাটিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে প্রথমেই পবিত্র হরম শরীফে গিয়ে পবিত্র কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ করতেন। ঐ সময় পবিত্র কাবাগৃহের প্রাঙ্গণে কোরাইশ নেতৃবর্গের প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন দরবার বসিয়ে কথাবার্তা বলত। হযরত হামযা (রাঃ) তাদের সাথে কুশল বিনিময় করতেন এবং কোন কোন সময় একটু বসতেন।

এভাবে তিনি সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতেন এবং প্রত্যেকেই তাঁকে সম্মান করত।

ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাথে এমন নির্দয় ব্যবহার করত যে অনাত্মীয়রাও তা দেখে সহ্য করতে পারত না। একদিন আবু জাহল রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাথে অত্যন্ত অমানুষিক আচরণ করছিল। দূরে দাঁড়িয়ে এক দাসী এ ঘটনা দেখছিল। হযরত হামযা (রাঃ) শিকার থেকে প্রত্যাবর্তন করলে উক্ত দাসী সমস্ত ঘটনা তাঁর কাছে বর্ণনা করল। হযরত হামযা এ ঘটনা শুনে ক্রোধে কাঁপতে লাগলেন এবং তীর-ধনুক সঙ্গে নিয়েই হরম শরীফে গিয়ে আবু জাহলকে বললেন যে "আমি মুসলমান হয়ে গেছি।"

হযরত হামযা রসূলে পাক (সাঃ)-কে সহায়তা করার আবেগে তখন তো সবার সামনে ইসলাম গ্রহণের কথা বলে ফেলেছিলেন বটে, কিন্তু ঘরে ফিরেই তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং ভাবতে লাগলেন, পিতৃ-পিতামহের ধর্ম হঠাৎ কেমন করে পরিত্যাগ করি? সারাদিন ঘরে বসে চিন্তা করলেন। অবশেষে বহু চিন্তা-ভাবনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে এ ধর্মই সত্য ধর্ম।[১] এ ঘটনার দু'চার দিন পরই হযরত ওমর (রাঃ) মুসলমান হন।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর সাতাশ বছর বয়সে রসূলে পাক (সাঃ) নবুওতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। হযরত যায়েদের মাধ্যমে হযরত ওমর (রাঃ)-এর পরিবারেও ইসলামের ডাক পৌঁছেছিল। সুতরাং সর্বপ্রথম যায়েদের পুত্র হযরত সাঈদ ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি হযরত ওমরের (রাঃ) ভগ্নী ফাতেমার স্বামী ছিলেন। স্বামীর সাথে ফাতেমা নিজেও মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। এ বংশেরই নঈম ইবনে আবদুল্লাহ নামক আরও একজন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) তখনও ইসলামের সাথে পরিচিত হননি। তিনি ইসলামধর্মের কথা শুনে ভীষণভাবে ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন। এমন কি, তাঁর বংশের যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি তাদেরও দুশমন হয়ে যান।[২]

লুবাইনা নামক হযরত ওমর (রাঃ)-এর পরিবারের ক্রীতদাসী ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি তাঁকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে মারধর করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, তখন বলতেন, "একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার মারব।" লুবাইনা ছাড়া অন্যান্য যাদের উপর তাঁর ক্ষমতা ছিল, তাঁদেরকেও নির্মমভাবে অত্যাচার করতেও

---

১. হযরত হামযা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা প্রত্যেক ঐতিহাসিকই লিখেছেন, কিন্তু সর্বশেষ ঘটনাটি আমি শুধু "রাওজুল আনুফ" নামক গ্রন্থে পেয়েছি।

২. আমি "আল ফারুক" নামক গ্রন্থে হযরত ওমরের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। এ স্থানে উহা অবিকলভাবেই নকল করে দিচ্ছি কিন্তু মধ্যে মধ্যে কোন শব্দ অথবা বাক্য পরিবর্তন করেছি। এ গ্রন্থের সম্পাদক হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের অন্যান্য ঘটনাবলী এ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে "রসূলে পাকের প্রার্থনা মঞ্জুর" অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রয়োজন হলে তা পাঠ করতে পারেন।

দ্বিধা-সংকোচ করতেন না। কিন্তু ইসলামধর্মের এমনই আকর্ষণ, যে-ই একবার এ ধর্মগ্রহণ করত, শত অত্যাচার-নির্যাতনের পরেও তা পরিত্যাগ করত না। এমনিভাবে অমানুষিক নির্যাতন করেও ওমর কাকেও ইসলামধর্ম পরিত্যাগ করাতে সমর্থ হননি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে রসূলে পাক (সাঃ)-কেই হত্যা করার সংকল্প নিলেন এবং তরবারি হাতে রসূলে পাক (সাঃ)-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। অন্যদিকে বিশ্বনিয়ন্তা বুঝি তখন ভ্রূকুটি করে বললেন, "যাও, তুমি তোমার সে প্রতীক্ষিত জনের পদতলে গিয়ে পতিত হবে, যা আমি চাই।"

রাস্তায় ঘটনাক্রমে নঈম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে নঈম জিজ্ঞেস করলেন, "খবর ভাল তো?" ওমর উত্তরে বললেন, "মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন প্রদীপ নির্বাপিত করতে যাচ্ছি।" তিনি বললেন, "প্রথমে নিজের ঘর ঠিক কর। তোমার ভগ্নী এবং ভগ্নীপতিও মুসলমান হয়ে গেছে।" একথা শুনে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি ভগ্নীপতির বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভগ্নী ফাতেমা তখন পবিত্র কোরআন করীম পাঠ করছিলেন। ওমরের আগমন টের পেয়ে ফাতেমা চুপ করে রইলেন এবং কোরআন শরীফের অংশখানি লুকিয়ে ফেললেন। কিন্তু কোরআন পাঠের ধ্বনি হযরত ওমর (রাঃ)-এর কানে পৌঁছেছিল। তিনি ভগ্নীকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি পাঠ করছিলে?" ভগ্নী উত্তরে বললেন, "কিছুই না।" তিনি বললেন, আমি শুনেছি তোমরা উভয়েই নাকি আমাদের পিতা-মাতার ধর্ম পরিত্যাগ করেছ।" একথা বলেই ওমর ভগ্নীপতিকে আক্রমণ করলেন। তাঁর ভগ্নী স্বামীকে রক্ষা করতে এগিয়ে গেলে তাঁকেও রেহাই দিলেন না, বরং মারতে মারতে তাঁর সমস্ত দেহ রক্তাক্ত করে ফেললেন। কিন্তু পবিত্র ইসলাম প্রাণের চাইতেও প্রিয়। পুণ্যবতী ফাতেমা মার খেতে খেতেও বললেন, "ওমর! তোমার মনে যা চায় তাই করতে পার, কিন্তু পবিত্র ইসলাম আমাদের অন্তর থেকে বের করতে পারবে না।" ভগ্নীর কথায় ওমরের মনে ভাবান্তর সৃষ্টি হল। তিনি ভগ্নীর প্রতি তাকিয়ে দেখলেন, তার সর্বাঙ্গে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে তাঁর অন্তর আরও নরম হয়ে গেল। তিনি শান্তকণ্ঠে বললেন, "তোমরা যা পাঠ করছিলে তা আমাকেও একবার শুনাও।" হযরত ফাতেমা (রাঃ) কোরআন পাকের সে অংশখানি তাঁর সামনে রাখলেন। তিনি সেটি তুলে নিয়ে নিম্নোক্ত আয়াত দেখতে পেলেন ঃ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

অর্থাৎ, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ্ পাকের গুণকীর্তন করে এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ও সর্বজ্ঞ।—(সূরা হাদীদ, ১ম রুকু)।

পবিত্র কালামের প্রত্যেকটি শব্দই তাঁর অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করছিল এবং যখন তিনি اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ আয়াতটি পড়লেন

অর্থাৎ, "আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।"—(সূরা হাদীদ, ১ম রুকু)

তখন মনের অজান্তেই বলে উঠলেন ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থাৎ, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত পুরুষ।"

এ সময় রসূলে পাক (সাঃ) সাফা পর্বতের পাদদেশে হযরত আরকাম (রাঃ)-এর ঘরে অবস্থান করছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অবস্থানস্থলে পৌঁছে দরজায় করাঘাত করলেন। যেহেতু হযরত ওমরের (রাঃ) হাতে তখনও কোষমুক্ত অসি ছিল, তাই সাহাবায়ে কেরাম দরজা খুলতে ইতস্তত করছিলেন, কিন্তু হযরত আমীর হামযা (রাঃ) বললেন, "তাঁকে আসতে দাও, যদি সে সদুদ্দেশে এসে থাকে, তবে তো ভালই, আর যদি কোন অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার নিমিত্তে এসে থাকে, তবে তার তরবারি দ্বারাই তার মুণ্ডুচ্ছেদ করে দেব।" হযরত ওমর (রাঃ) যখন গৃহাভ্যন্তরে পদার্পণ করলেন, তখন রসূলে করীম (সাঃ) এগিয়ে এসে তাঁর হাত ধরে বললেন, "কি হে ওমর! কি জন্য এসেছ ?" নবুওতের গুরুগম্ভীর স্বরে হযরত ওমরের (রাঃ) অন্তর কম্পিত হয়ে গেল, তিনি অত্যন্ত নম্রতার সাথে নিবেদন করলেন, "পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণের উদ্দেশে উপস্থিত হয়েছি।" হযরত ওমরের (রাঃ) উত্তর শুনে রসূলে করীম (সাঃ) হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে "আল্লাহ্ আকবার" শব্দ উচ্চারণ করলেন যে তার ধ্বনিতে সমস্ত পর্বত-প্রান্তর ধ্বনিতপ্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।[১]

হযরত ওমরের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলামের ইতিহাসে নব যুগের সূচনা হল। তখন পর্যন্ত যদিও হযরত হামযাসহ ৪০/৫০ জন ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তথাপি মুসলমানগণ প্রকাশ্যভাবে তাঁদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতে পারতেন না এবং পবিত্র কাবাগৃহে নামায পড়া তো একেবারেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু হযরত ওমরের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের ফলে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে এ অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হল এবং মুসলমানগণ প্রকাশ্যভাবে তাঁদের ধর্মের কথা প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। বিধর্মী কাফেররা প্রথম প্রথম কঠিনভাবে বাধা প্রদান করল, কিন্তু মুসলমানগণও অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তার মোকাবেলা করতে লাগলেন। অবশেষে মুসলমানগণ জামাতের সাথে পবিত্র কাবাগৃহে নামায আদায় করলেন।

---

১. আল্লামা বালাজুরীর "আনসাবুল আশরাফ, তবকাতে ইবনে সা'দ, উসদুল গাবাহ, ইবনে আসাকির এবং কামেলে ইবনুল আসীর ইত্যাদি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে হেশাম এ ঘটনাটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের যবানীতে নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ

"হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করে কোরাইশদের সাথে প্রকাশ্য সংগ্রামের সূচনা করলেন এবং শেষ পর্যন্ত পবিত্র কাবাগৃহে নামায পড়লেন এবং তাঁর সাথে আমরাও নামায পড়লাম।"

সহীহ্ বোখারী শরীফে উল্লিখিত হয়েছে যে হযরত ওমর (রাঃ) যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, তখন সমস্ত মক্কা নগরীতে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঘটনাক্রমে আস ইবনে ওয়ায়েল সেখানে উপস্থিত হলেন এবং উত্তেজনার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সমবেত লোকজন উত্তর দিল যে ওমর আমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেছে। আস ইবনে ওয়ায়েল বললেন, "তাতে কি হয়েছে? আমি তাকে আশ্রয় দিলাম।"

মুসলমানদের উপর নির্যাতন

গভীর আত্মবিশ্বাস, সংকল্পের দৃঢ়তা ও কর্তব্যপরায়ণতা হল মানুষের প্রকৃত গুণ এবং প্রশংসার যোগ্য আচরণ। কিন্তু এ গুণাবলীর ক্ষেত্র যখন পরিবর্তিত হয়ে যায়, তখন এ গুণাবলীই নির্দয়তা, পাশবিকতার ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে।

পবিত্র ইসলামধর্ম যখন ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করছিল এবং রসূলে পাক (সাঃ) ও অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম স্বস্ব গোত্রের নিকট নিরাপত্তা লাভ করলেন, তখন কোরাইশদের ঘৃণা ও ক্রোধ সমবেতভাবে ঐ সমস্ত দরিদ্র ও অসহায় মুসলমানদের উপর আপতিত হল, যাদের কোন সাহায্যকারী ও আশ্রয়দাতা ছিল না। এ অসহায়দের মধ্যে কিছু দাস-দাসী আর কিছু বিদেশী ছিল, যারা দু'এক পুরুষ পূর্বে মক্কায় এসে বসবাস করছিলেন এবং কিছুসংখ্যক দুর্বল গোত্রের লোক ছিল, মক্কায় যাদের কোন প্রভাবপ্রতিপত্তি ছিল না। এ অসহায় মুসলমানদের উপর কোরাইশরা এমনি নির্মম অত্যাচার আরম্ভ করে দিল যে বিশ্বে অত্যাচারীদের ইতিহাসে তার দ্বিতীয় কোন নজির খুঁজে পাওয়া সত্যই দুষ্কর।

কোরাইশদের পক্ষে আরবভূমি থেকে মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে ফেলা সহজ ছিল। কিন্তু কোরাইশরা তা করেনি। কেননা, তারা মনে করত, যদি মুসলমানদেরকে স্বীয় ধর্মে অটল থাকা অবস্থায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়, তাহলে তাদের যে পরিমাণ প্রশংসাকীর্তন করা হবে, তার চেয়ে অসহায় মুসলমানদের ধৈর্য, সহনশীলতা ও দৃঢ়তার প্রশংসা আরও অধিক করা হবে। কোরাইশদের মানমর্যাদা ঠিক তখনই সঠিকভাবে বজায় থাকবে, যখন মুসলমানরা স্বস্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে পুনরায় কোরাইশদের ধর্মগ্রহণ করবে। কিংবা মুসলমানগণের চিত্তের দৃঢ়তা ও নির্যাতন সহ্য করার ক্ষমতা পরীক্ষা করাও হয়ত তাদের উদ্দেশ্য ছিল।

কোরাইশদের মধ্যে এমন কিছু লোকও ছিল যারা তাদের যুগ যুগ ধরে প্রচলিত সভ্যতা ও সংস্কার ধ্বংস হয়ে যেতে দেখে পিতৃ-পিতামহের অপমান করা হয় বলে এবং পূজনীয় দেব-দেবীদের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়ে যেতে দেখে সত্যই মর্মপীড়া অনুভব করত। তারা শুধু দুঃখ-পরিতাপ করেই ক্ষান্ত থাকত এবং বলত, কতিপয় অর্বাচীনের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। ওতবা এবং আস ইবনে ওয়ায়েল প্রভৃতি ব্যক্তি এ পর্যায়ভুক্ত ছিল। কিন্তু আবু জাহল, উমাইয়া ইবনে খালফ প্রমুখ অত্যন্ত কঠোর ও অনমনীয় ছিল।

কোরাইশরা নব্য মুসলমানদের উপর ইতিহাস সৃষ্টিকারী অকল্পনীয় অত্যাচার আরম্ভ করল। তারা মধ্যাহ্ন তপন তাপে মরুভূমির বালুকারাশি যখন আগুন ঝরাত, তখন এ হতভাগা মুসলমানদেরকে ধরে এনে তার উপর শুইয়ে দিত এবং যাতে পাশ ফিরতেও না পারে, তাদের বুকের উপর ভারী প্রস্তর খণ্ড স্থাপন করত। শুধু তাই নয়, অধিকন্তু দেহের উপর উত্তপ্ত বালু বিছিয়ে দিত; লৌহদণ্ড গরম করে দেহের বিভিন্ন স্থানে দাগ দিত এবং উত্তপ্ত পানিতে ডুবিয়ে রাখত। (এ সমস্ত লোমহর্ষ অত্যাচারের কাহিনী বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনে সা'দ তাঁর রচিত গ্রন্থে হযরত বেলাল (রাঃ) ও হযরত সুহাইব (রাঃ)-এর কাহিনীতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে তাজকেরায়ে সাহাবা অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)।

যদিও সমস্ত অসহায় মুসলমানই এ অকথ্য নির্যাতনের শিকার ছিলেন, তথাপি যাঁদের উপর কোরাইশদের বিশেষ কোপদৃষ্টি ছিল, নিম্নে তাদের সংক্ষিপ্ত ঘটনা বর্ণনা করা হল।

হযরত খাব্বাব ইবনুল আরত (রাঃ) ঃ হযরত খাঁব্বাব (রাঃ) তামীম গোত্রের লোক ছিলেন। অন্ধকার যুগে তাঁকে দাস হিসাবে বিক্রি করে দেয়া হয় এবং উম্মে আম্মার নাম্নী জনৈকা তাঁকে ক্রয় করেন। রসূলে পাক (সাঃ) যে সময় হযরত আরকাম (রাঃ)-এর গৃহে অবস্থান করছিলেন, তখন খাব্বাব মুসলমান হন। তখন মাত্র ছয়-সাতজনই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কোরাইশরা তাঁকে নানাভাবে নির্যাতন করত। একদিন তারা জ্বলন্ত কয়লার উপর তাঁকে শুইয়ে দেয় এবং যাতে পাশ ফিরতে না পারে সেজন্য একজন তাঁর বুকে পা চেপে রাখে। তাঁর পৃষ্ঠদেশ পুড়ে কয়লা খণ্ডগুলো নিভে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁকে এভাবেই রাখা হয়। বহুকাল পর হযরত ওমরের (রাঃ) নিকট এ ঘটনা বর্ণনাকালে হযরত খাব্বাব (রাঃ) তাঁর পৃষ্ঠদেশের কাপড় খুলে দেখিয়েছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠদেশ শ্বেত রোগের ন্যায় একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছিল। (তবকাতে ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, তাজকেরায়ে খাব্বাব)।

হযরত খাব্বাব (রাঃ) অন্ধকার যুগে কর্মকারের কাজ করতেন এবং বহু লোকের কাছে তাঁর টাকা-পয়সা পাওনা ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর যখন তিনি তাদের নিকট টাকার জন্য তাগাদা করতেন তখন তারা বলত, ইসলামধর্ম ত্যাগ না করলে একটি কানাকড়িও দেয়া হবে না। তিনি বলতেন, "কখনও না, তুমি মরে যদি আবার জীবিতও হও, তথাপি আমি ইসলামধর্ম ত্যাগ করব না।" (সহীহ্ বোখারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৯২)

হযরত বেলাল (রাঃ) ঃ রসূলে পাক (সাঃ)-এর মুয়ায্যিন হিসাবে যাঁর নাম ইসলামী বিশ্বে সুপ্রসিদ্ধ তিনি বেলাল (রাঃ)। তিনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রো ছিলেন এবং উমাইয়া ইবনে খালফের দাস ছিলেন। ঠিক দুপুরে উমাইয়া তাঁকে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর শুইয়ে দিত এবং যাতে নড়া-চড়া করতে না পারেন সেজন্য একটি ভারী পাথর তাঁর বুকের উপর চাপিয়ে দিয়ে বলত, যদি ইসলামধর্ম ত্যাগ না কর, তবে এভাবেই কষ্ট করতে করতে মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু এরূপ কঠিন সময়েও তাঁর মুখ দিয়ে শুধু 'আহাদ' 'আহাদ' (এক আল্লাহ্, এক আল্লাহ্) শব্দ বের হত। যখন কোনভাবেই তাঁকে ইসলাম হতে বিচ্যুত করা গেল না, তখন তাঁর গলায় রশি বেঁধে দুষ্ট ছেলে-ছোকরাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হত। তারা তাঁকে রাস্তার উপর দিয়ে শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যেত। কিন্তু তাঁর মুখ হতে সেই 'আহাদ' 'আহাদ' শব্দই বের হত।

হযরত আম্মার (রাঃ) ঃ হযরত আম্মারের পিতা ইয়াসির ইয়ামনের অধিবাসী ছিলেন। তিনি মক্কায় আগমন করে আবু হুযাইফা মাখযুমীর সুমাইয়া নাম্নী জনৈকা দাসীকে বিয়ে করেন। হযরত আম্মার তারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে চতুর্থ স্থানের অধিকারী ছিলেন। অর্থাৎ, তাঁর পূর্বে মাত্র তিনজন মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁকেও কোরাইশরা মরুভূমির উত্তপ্ত বালুতে শুইয়ে নির্দয়ভাবে প্রহার করতে করতে একেবারে অচেতন করে ফেলত। তাঁর জনক-জননীকেও একইভাবে নির্যাতন করা হত।

হযরত সুমাইয়াহ (রাঃ) ঃ হযরত আম্মার (রাঃ)-এর মাতা এবং হযরত ইয়াসির (রাঃ)-এর পত্নী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে আবু জাহ্ল তাঁকে বর্শার আঘাতে শহীদ করেছিল।

হযরত ইয়াসির (রাঃ) ঃ তিনি হযরত আম্মার (রাঃ)-এর পিতা ছিলেন। তিনি কাফেরদের নির্যাতনে শাহাদাতবরণ করেন।

হযরত সুহাইব (রাঃ) ঃ হযরত সুহাইব (রাঃ) রোমের অধিবাসী বলে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি রোমীয় ছিলেন না। তাঁর পিতা সিনান পারস্য সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত ওবালা নামক স্থানের শাসনকর্তা ছিলেন এবং তাঁর বংশধরগণ মুসেলে বসবাস করতেন। একবার রোমান সৈন্যরা উক্ত এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে বহু লোককে বন্দী করে নিয়ে যায়। উক্ত বন্দিগণের মধ্যে হযরত সুহাইব (রাঃ)ও ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি রোমেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন বলে বিশুদ্ধভাবে আরবী বলতে পারতেন না। জনৈক আরব ব্যবসায়ী তাঁকে খরিদ করে মক্কায় নিয়ে আসেন এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে জাদ'আনের নিকট বিক্রি করেন। পরে আবদুল্লাহ্ তাঁকে মুক্ত ও স্বাধীন করে দেন।

রসূলে পাক (সাঃ) যখন ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন, তখন তিনি হযরত আম্মারের (রাঃ) সাথে প্রিয় নবীর (সাঃ) নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[১]

কোরাইশদের মাত্রাতিরিক্ত নির্যাতনে তিনি মাঝে মাঝে অচেতন হয়ে পড়তেন। যখন তিনি মদীনায় হিজরতের ইচ্ছা করলেন, তখন কোরাইশরা তাঁকে বাধা দেয় এবং বলে যে যদি তুমি তোমার সমস্ত ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করে যাও, তবে হিজরত করতে পারবে। তিনি সানন্দে তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করে সমস্ত ধন-সম্পদ ত্যাগ করে রসূলে পাক (সাঃ)-এর খেদমতে মদীনায় চলে যান।

হযরত আবু ফকীহা (রাঃ) ঃ হযরত আবু ফকীহা (রাঃ) সাফওয়ান ইবনে ওমাইয়ার ক্রীতদাস ছিলেন এবং হযরত বেলাল (রাঃ)-এর সাথেই মুসলমান হয়েছিলেন। উমাইয়া যখন জানতে পারল, তখন সে তাঁর পায়ে রশি বেঁধে টেনে নেবার জন্য কিছুসংখ্যক লোককে আদেশ করল। তারা তাঁকে এভাবে টেনে নিয়ে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর চিৎ করে শুইয়ে রাখে। সে সময় একটি পোকা উড়ে যেতে দেখে, উমাইয়া তাঁকে সেটি দেখিয়ে বলল, "এটা কি তোমার খোদা"? তিনি বললেন, "তোমার এবং আমার খোদা এক আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন আর কেউ নয়।" একথা শুনে উমাইয়া তাঁর গলা এমন জোরে চেপে ধরে যে লোকেরা মনে করল তিনি ইহধাম ত্যাগ করেছেন। একদিন তাঁর বুকের উপর এমন ভারী পাথর চাপা দেয়া হয় যে তাঁর জিভ বেরিয়ে আসে।

১. ইবনুল আসির যিকরে তা'যীবুল মুস্তাদআফীন। ইবনুল আসির লিখেছেন যে রসূলে পাক (সাঃ) যখন হযরত আরকামের (রাঃ) গৃহে অবস্থানরত তখন হযরত আম্মার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ঐ সময় মুসলমানদের সংখ্যা ত্রিশের উর্ধ্বে ছিল।

হযরত লুবাইনা (রাঃ) ঃ[১] এ হতভাগিনী দাসীকে হযরত ওমর (রাঃ) এমন নির্দয়ভাবে মারধর করতেন যে একে সময় ক্লান্ত হয়ে তাঁকে বলতেন, "আমি তোমাকে এখন দয়া করে ছেড়ে দিচ্ছি না, বরং আমি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি বলে ছাড়ছি।" হযরত লুবাইনা (রাঃ) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিতেন, "যদি তুমি মুসলমান না হও, তবে আল্লাহ্ পাক এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।"

হযরত যুনাইরা (রাঃ) ঃ হযরত যুনাইরা (রাঃ)ও হযরত ওমরের পরিবারের দাসী ছিলেন। হযরত ওমর (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) তাঁকে যথেচ্ছভাবে নির্যাতন করতেন। আবু জাহ্ল তাঁকে এমন নির্মমভাবে মারধর করেছিল যে প্রহারের ফলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

হযরত নাহ্দিয়া (রাঃ) এবং হযরত উম্মে আবেস (রাঃ) ঃ তাঁরাই উভয়েই দাসী ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের দরুন কঠিন নির্যাতন ভোগ করেছিলেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) এ নিরুপায় ও হতভাগ্য মুসলমানদের অধিকাংশকে তাদের মালিকদের নিকট থেকে কিনে নিয়ে মুক্তি প্রদানপূর্বক তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রথম অধ্যায় সূচনা করেন। তিনি হযরত বেলাল (রাঃ), হযরত আমের ইবনে ফাহীরা (রাঃ), হযরত লুবাইনা (রাঃ), হযরত নাহ্দিয়া (রাঃ) এবং হযরত উম্মে আবেস (রাঃ) প্রত্যেককে অত্যধিক মূল্যে ক্রয় করে মুক্তি প্রদান করেন।

এ সমস্ত দুস্থ মুসলমানদেরকে কোরাইশরা অসহনীয় দৈহিক নির্যাতন করত। এতদ্ব্যতীত আরও কিছুসংখ্যক মুসলমান ছিলেন, যাদেরকে নানাভাবে উত্যক্ত করা হত।

হযরত ওসমান (রাঃ) যথেষ্ট বয়স্ক ও প্রভাবপ্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি যখন পবিত্র ইসলামধর্ম গ্রহণ করলেন, তখন অন্য কেউ নয়, বরং তাঁর পিতৃব্যই তাঁকে রশি দিয়ে বেঁধে প্রহার করেছিলেন। (তবকাত, তরজমা উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ)) হযরত আবুযর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণকারিগণের মধ্যে ৭ম স্থানের অধিকারী ছিলেন। তিনি মুসলমান হয়ে যখন পবিত্র কাবাগৃহে গিয়ে তা প্রকাশ করলেন, তখন কোরাইশরা তাঁকে মারতে মারতে মাটিতে ফেলে দেয়। (বোখারী, ১ম খণ্ড, বাবু ইসলামে আবিযর, পৃঃ ৫৪৪-৪৫)। হযরত যুবাইর ইবনুল আ'ওয়াম (রাঃ) ইসলাম গ্রহণকারিগণের মধ্যে ৫ম স্থানের অধিকারী ছিলেন। তিনি যখন মুসলমান হলেন তখন তাঁর পিতৃব্য তাঁকে চাটাইতে জড়িয়ে নাকে-মুখে ধোঁয়া প্রদান করতেন। (রিয়াজুন্নাহর লি-মুহিব্বিত্তাবারী)। হযরত

---

১. হযরত ওমর (রাঃ) তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি।

ওমরের (রাঃ) চাচাতো ভাই হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে বেঁধে রাখেন। (বোখারী, পৃঃ ১০২৭ ঐ সময় হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেননি)। কিন্তু এ নির্যাতন, এ জল্লাদ সদৃশ নির্মমতা এবং এ বীভৎস রক্তপাতের পরও একজন মুসলমান সত্যপথ থেকে বিচ্যুতি হননি। জনৈক খৃষ্টান ইতিহাসবিদ সত্যই লিখেছেন ঃ

"খৃষ্টানদেরকে একথাটি স্মরণ রাখতে হবে যে,হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁর অনুসারিগণের মধ্যে যেরূপ উচ্চাঙ্গের ধর্মপ্রীতি সৃষ্টি করেছিলেন, তা হযরত ঈসার (আঃ) প্রথম পর্যায়ের অনুসারিগণের মধ্যে খোঁজ করা বৃথা। কেননা, হযরত ঈসা (আঃ)-কে যখন শূলে চড়ানো হল, তখন তাঁর শিষ্যগণ প্রাণভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তাদের ধর্মপ্রীতির নিদর্শন হিসাবে তাঁরা স্বীয় ধর্মগুরুকে শত্রুর হাতে বন্দী অবস্থায় পরিত্যাগ করেছিল। অপরদিকে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারিগণ তাঁদের নির্যাতিত নেতাকে রক্ষা করার জন্য দৃঢ়ভাবে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং তাঁর মস্তকে বিজয় মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন।" (এপোলজি গড ফর মিগাস্স, উর্দু অনুবাদ, বেরেলীতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত)।

হাবশায় হিজরত

কোরাইশদের অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি লক্ষ্য করে করুণার আধার হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁর প্রিয় অনুসারিগণকে বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করে হাবশাতে হিজরত করার নির্দেশ প্রদান করলেন। হাবশা নগরী কোরাইশদের প্রাচীন বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল বিধায় তার অবস্থা তাঁদের জানা ছিল। আরববাসিগণ হাবশার অধিপতিকে নাজ্জাশী নামে অভিহিত করত। নাজ্জাশীর ন্যায়পরায়ণতার কথা সর্বত্র প্রচারিত ছিল। (নাজ্জাশী "নুজুস" শব্দের আরবীরূপ। হাবশী "নুজুস" শব্দের অর্থ বাদশাহ। তখনকার বাদশার নাম ছিল আস্‌মাহা— বোখারী বাবু যিক্‌রিন নাজ্জাশী)।

ইসলামের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ মুসলমানগণ যাবতীয় নির্যাতন সহ্য করতে পারতেন এবং তাঁদের ধৈর্য্যের বাঁধ কখনও ভাঙত না, কিন্তু মক্কায় থেকে ইসলামের অবশ্য করণীয় বিধি-বিধানগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করা সম্ভব ছিল না। তখন পর্যন্ত কোন মুসলমান পবিত্র কাবাগৃহে উচ্চৈঃস্বরে কোরআন পাঠ করতে পারতেন না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর ঘোষণা করলেন যে, আমি অবশ্যই এ কর্মটি সমাধা করব। শুভাকাঙ্ক্ষিগণের নিষেধবাক্য অগ্রাহ্য করে পবিত্র কাবাগৃহে গমনপূর্বক তিনি "মাকামে ইবরাহীম" নামক স্থানে দাঁড়িয়ে "সূরা আর রাহ্মান" পাঠ করতে আরম্ভ করলেন। কোরআন পাঠের আওয়াজ শুনে চারদিক থেকে কাফেররা ছুটে আসল এবং তাঁর মুখে

চপেটাঘাত করতে লাগল। যদিও তিনি যতটুকু পাঠ করার ইচ্ছা করেছিলেন ততটুকু পাঠ করলেন, কিন্তু প্রত্যাবর্তনের সময় ক্ষতবিক্ষত মুখমণ্ডল নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন।[১] হযরত আবু বকর (রাঃ) অন্যান্য কোরাইশ নেতৃবর্গের অপেক্ষা প্রভাবপ্রতিপত্তিতে কম ছিলেন না। তথাপি তিনি উচ্চৈঃস্বরে পবিত্র কোরআন শরীফ পাঠ করতে পারতেন না। এ কারণে তিনি একবার হিজরত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। (বোখারী, বাবু হিজরতে মদীনা)।

অধিকন্তু হিজরতের আরও একটি অত্যন্ত কল্যাণকর সুফল এই ছিল যে, ইসলাম গ্রহণকারিগণ বিশ্বের যে স্থানেই গমন করতেন সেখানেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের সুনির্মল আলো বিচ্ছুরিত হত।

সুতরাং রসূলে পাক (সাঃ)-এর ইঙ্গিতে সর্বপ্রথম নিম্নলিখিত ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা হিজরত করেছিলেন।

১। হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁর স্ত্রী হযরত রুকাইয়াসহ হিজরত করেন। হযরত রুকাইয়া রসূলে পাক (সাঃ)-এর কন্যা ছিলেন।

২। হযরত আবু হুযাইফাহ্ ইবনে ওতবা (রাঃ) ও তাঁর স্ত্রী সালমা বিন্তে সুহাইল।

আবু হুযাইফার পিতা ওতবা কোরাইশদের প্রসিদ্ধ নেতা ছিল। কিন্তু অত্যন্ত কঠিন প্রকৃতির কাফের ছিল বলে আবু হুযাইফাহ্ দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

৩। হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ)। তিনি রসূলে পাক (সাঃ)-এর ফুফাত ভাই এবং বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন।

৪। হযরত মাসআব ইবনে ওমাইর (রাঃ)। তিনি হাশেমের দৌহিত্র ছিলেন।

৫। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ। তিনি যুহরা গোত্রের লোক ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নানার (মতামহ) সম্পর্কে আত্মীয় ছিলেন। তিনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ সাহাবী এবং রসূলে পাক (সাঃ) যে দশজন ভাগ্যবান সাহাবীকে বেহেশ্তী বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৬। হযরত আবু সালমা ইবনে আসাদ মাখযুমী ও তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে সালমা বিনতে আবি ওমাইয়্যাহ (রাঃ)।

ইনি সেই উম্মে সালমা (রাঃ) যিনি হযরত আবু সালমার (রাঃ) মৃত্যুর পর রসূলে পাক (সাঃ)-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

৭। হযরত ওসমান ইবনে মাজউন জুমুহী (রাঃ)। তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন।

---

১. তাবারী, ৩য়, পৃঃ ১১৮ ("স")

৮। আমের ইবনে রাবিয়াহ্ ও তাঁর স্ত্রী হযরত লায়লা বিন্‌তে আবি হাশমাহ্ (রাঃ)। তাঁরা প্রথম পর্যায়ের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফতের সময় তিনি তাঁকে মদীনায় শাসনকর্তা নিয়োগ করে হজ্জ করতে গিয়েছিলেন। (ইসাবা)

৯। হযরত আবু সাবরা (রাঃ) ইবনে আবি রুহ্‌ম। তাঁর মা "বাররা" রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ফুফু ছিলেন। তিনি প্রথম পর্যায়ের মুসলমানগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী স্বীয় গ্রন্থ "ইসাবা"-তে লিখেছেন যে তিনি ২য় বার হিজরত করেছিলেন। অথবা[১]

হযরত আবু হাতেম ইবনে আমর (রাঃ)। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইমাম যুহরীর মতে সর্বপ্রথম তিনিই হিজরত করেন। (ইসাবা)

১০। হযরত সুহাইল ইবনে বায়দা (রাঃ)।

১১। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ)। তিনি একজন বিশিষ্ট ফেকাহ্‌বিদ মুজতাহেদ সাহাবী ছিলেন। সাহাবিগণের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক যে কয়জনকে মুজতাহেদ বলে গণ্য করা হত, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

---

১. হাবশাতে যারা প্রথমে হিজরত করেন তাঁদের প্রকৃত সংখ্যা ও পরিচয়ের মধ্যে সামান্য মতভেদ রয়েছে। বিখ্যাত সীরাতকার ইবনে ইসহাক (রাঃ) পুরুষগণের মধ্যে উপরোক্ত দশজনের নাম লিখেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ সম্পর্কে তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন যে তিনি হাবশার প্রথম হিজরতের সময় হিজরত করেননি বরং দ্বিতীয়বার হিজরতের সময় তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। (ফতহুলবারী, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৩)

ওয়াকেদী পুরুষদের মধ্যে ১১ জনের হিজরতের কথা উল্লেখ করেছেন। তার কারণ এই যে তিনি হযরত আবু সাবরা ও হযরত আবু হাতেম উভয়কে হিজরতকারিগণের মধ্যে গণ্য করেছেন। আর ইবনে ইসহাক এ দুজনের মধ্যে মাত্র একজনকে হিজরতকারী বলে স্বীকার করেছেন। এ ব্যাপারে ওয়াকেদীর পক্ষ হতে একটি বিরাট ভুল হয়ে গেছে। তিনি ১১ জন পুরুষকে হাবশায় প্রথম হিজরতকারী হিসেবে লিখেছেন কিন্তু তালিকা দিতে গিয়ে ১২ জনের নাম লিখেছেন। অর্থাৎ, তিনি এ তালিকায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের নাম বাড়িয়ে দিয়েছেন। (যারকানী আলাল মাওয়াহিব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৪) হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী ওয়াকেদীর এ ভুলের জন্য সমালোচনা করেছেন। (ফতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৩) ইবনে সা'দ এ উপলক্ষে সে সমস্ত হিজরতকারীর নামই লিপিবদ্ধ করেছেন যাদের কথা ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন। (ইবনে সা'দ ১ম, খণ্ড, পৃঃ ১৩৬) ইবনে সাইয়েদুননাস ও ইমাম যুহরীর বর্ণনা মতে ১২ জনের কথা লেখা হয়েছে। কিন্তু তিনি হযরত যুবাইরের (রাঃ) পরিবর্তে হযরত সালীত ইবনে আমরের (রাঃ) নাম লিখেছেন। (উয়োনুল আসর ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৫) অন্যান্য কতিপয় সীরাতকার ১২ জন হিজরতকারীর কথা লিখেছেন। কিন্তু তাঁরা হাতেব ইবনে আমর (রাঃ) ও হযরত সুহাইল ইবনে বায়দার (রাঃ) পরিবর্তে হাতেব ইবনে হারেস ও হযরত হাশেম ইবনে আমরের (রাঃ) নাম উল্লেখ করেছেন। (যারকানী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৪) এভাবে হিজরতকারিণী মহিলাগণের মধ্যেও অনেকে হযরত আবু সাবরার (রাঃ) স্ত্রী উম্মে কুলসুম বিনতে সুহাইল (রাঃ) এবং রসূলে পাক (সাঃ)-এর ধাত্রী-মা হযরত উম্মে আয়মানের নাম বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এঁরা নববী ৫ম সনের রজব মাসে আবসিনিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। তাঁরা বন্দরে উপস্থিত হয়ে সৌভাগ্যক্রমে দুটি মালবাহী জাহাজ পেয়ে গেলেন, আবিসিনিয়ার দিকে যাওয়ার জন্য বন্দরে নোঙ্গর করা ছিল। জাহাজিগণ অত্যন্ত অল্প ভাড়ায় অর্থাৎ, মাথাপিছু মাত্র ৫ দেরহামে তাঁদেরকে আবসিনিয়ায় পৌছে দিল। কোরাইশরা এ সংবাদ পেয়ে বন্দর পর্যন্ত তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করলেও তাঁদের নাগাল পেল না। (তাবারী)।

সাধারণ ঐতিহাসিকগণের এ ধারণা ছিল যে,যারা মক্কায় অত্যন্ত অসহায় ও নিরুপায় ছিলেন, কেবলমাত্র তাঁরাই আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। কিন্তু হিজরতকারিগণের তালিকায় সর্বস্তরের লোকই দেখা যায়। হযরত ওসমান (রাঃ) মক্কায় সর্বাধিক প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী গোত্র বনু উমাইয়ার লোক ছিলেন। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন ঃ হযরত যুবাইর (রাঃ) এবং হযরত মাস'আব (রাঃ) স্বয়ং নবী করীম (সাঃ)-এর বংশের লোক ছিলেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে 'আউফ এবং হযরত আবু সাবরা (রাঃ)ও সাধারণ পর্যায়ের লোক ছিলেন না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলাই অধিক যুক্তিসঙ্গত যে,কোরাইশদের অত্যাচার শুধু অসহায় ও দরিদ্র মুসলমানদের উপরই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং বড় বড় ও প্রভাবশালী বংশের লোকজনও তাদের নির্যাতন থেকে নিরাপদ ছিল না।

অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে,যে-সমস্ত মুসলমান সর্বাধিক অত্যাচারিত ও নির্যাতিত ছিলেন, যাদেরকে জ্বলন্ত অঙ্গারে শুইয়ে দেয়া হয়েছিল, (অর্থাৎ হযরত বেলাল (রাঃ), হযরত আম্মার এবং হযরত ইয়াসির (রাঃ) প্রমুখ হাবশায় হিজরতকারিগণের তালিকায় দেখা যায় না। তাই স্বভাবতই মনে হয়, তাঁদের দরিদ্রতা এমন প্রকট আকার ধারণ করেছিল যে ভ্রমণ করার মত পাথেয় পর্যন্ত তাঁরা যোগাড় করতে পারেনি অথবা দুঃখ-কষ্টের যে প্রকৃত স্বাদ তারা ভোগ করেছিলেন তা ত্যাগ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

মুসলমানগণ আবিসিনিয়ায় নাজ্জাশীর আশ্রয় লাভ করে অত্যন্ত শান্তিময় জীবনযাপন করেছিলেন। এ সুযোগ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও অনেকেই হাবশায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কোরাইশরা এ সংবাদ শুনে হিংসায় জ্বলতে লাগল। অবশেষে তারা নাজ্জাশীর নিকট দূত পাঠিয়ে মুসলমানদেরকে সেখান থেকে বের করে আনতে মনস্থ করল। এ উদ্দেশ্যে তারা আবদুল্লাহ্ ইবনে কবিরাহ্ এবং আমর ইবনুল আসকে নির্বাচন করল। (মুসনাদে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০২ "স") তারা নাজ্জাশী এবং তাঁর দরবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য বহু মূল্যের উপঢৌকন সংগ্রহ করে অত্যন্ত

জাঁক-জমকের সাথে আবিসিনিয়া যাত্রা করল।[১] এ প্রতিনিধি দলটি প্রথমে নাজ্জাশীর সাথে সাক্ষাৎ না করে বরং দরবারের পাদ্রী ও অন্যান্য সদস্যের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে উপঢৌকন প্রদানপূর্বক বলল যে,আমাদের দেশের কতিপয় অর্বাচীন একটি নতুন ধর্মগ্রহণ করার অপরাধে আমরা তাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দিয়েছি এবং তারা আপনাদের দেশে আশ্রয়গ্রহণ করেছে। আগামীকাল আমরা বাদশার নিকট তাদের সম্পর্কে যে আরজি পেশ করব অনুগ্রহপূর্বক আপনারা তা সমর্থন করবেন। পরদিন তারা বাদশাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হয়ে অপরাধীদেরকে তাদের হস্তে সমর্পণ করার আবেদন জানালে দরবারের পাদ্রিগণও তাতে সমর্থন দান করল। নাজ্জাশী মুসলমানদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা এমন কি ধর্মগ্রহণ করেছ যা মূর্তিপূজা ও খৃষ্টধর্ম উভয়েরই বিরোধী?"

মুসলমানগণ তাঁদের পক্ষে কথা বলার জন্য হযরত জাফর (রাঃ)-কে (হযরত আলীর (রাঃ) ভাই) প্রতিনিধি নির্বাচন করলেন। তিনি বাদশাহ্‌র নিকট নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করলেন।

"রাজন!

"আমরা একটি মূর্খ ও বর্বর জাতি ছিলাম। আমরা মূর্তিপূজা করতাম এবং মৃত পশু ভক্ষণ করতাম। পাড়া-প্রতিবেশীকে নির্যাতন করতাম। এক ভাই অপর ভাইয়ের উপর অত্যাচার করতাম। আমাদের মধ্যে শক্তিশালী মানুষ দুর্বলের সম্পদ গ্রাস করত। এমতাবস্থায় আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আবির্ভূত হলেন, যাঁর সততা, সত্যবাদিতা এবং বংশমর্যাদা সম্পর্কে আমরা পূর্ব থেকেই অবহিত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে পবিত্র ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন এবং এমন শিক্ষা দান করলেন, যাতে আমরা মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করি, সত্য কথা বলি, কলহ-বিবাদ থেকে বিরত থাকি, পিতৃহীন অসহায় শিশুদের সম্পদ আত্মসাৎ না করি। প্রতিবেশীদেরকে শান্তিতে বসবাসের সুযোগ দেই, সতী-সাধ্বী মহিলাদের উপর অপবাদ না দেই, নামায পড়ি, রোযা রাখি এবং যাকাত প্রদান করি। আমরা তাঁর উপর ঈমান (বিশ্বাস) এনে মূর্তিপূজা বর্জন করেছি এবং সমুদয় পাপ ও নৈতিকতাবিরোধী কর্ম পরিত্যাগ করেছি। এ অপরাধে আমাদের কওম আমাদের শত্রুতে পরিণত হয়ে গেছে এবং তারা আমাদেরকে পূর্বের ভ্রান্ত পথে পুনরায় ফিরে যাবার জন্য অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন চালাচ্ছে।"

১. ইবনে হিশাম লিখেছেন, মক্কার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপহার ছিল চামড়া। অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্যেও তাই প্রমাণিত হয় যে মক্কাবাসীগণ দামেস্ক ও অন্যান্য দেশে যে বাণিজ্যসামগ্রী নিয়ে যেত তাও চামড়া ছিল। (মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত রয়েছে যে তারা যে উপহারসামগ্রী নিয়ে গিয়েছিল তাও চামড়াই ছিল।) (মুসনাদে আহলিলবাইত)।

নাজ্জাশী হযরত জাফর (রাঃ)-কে বললেন "তোমাদের নবীর উপর আল্লাহ্ পাকের যে বাণী অবতীর্ণ হয়েছে তার কিঞ্চিৎ পাঠ করে শুনাও।" হযরত জাফর (রাঃ) সূরায়ে "মরিয়মের" কয়েকখানি আয়াত পাঠ করলেন। নাজ্জাশীর অন্তঃকরণ ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং আবেগে তাঁর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, "খোদার কসম, এ বাণী এবং ইঞ্জিল কিতাব একই প্রদীপের আলো।" একথা বলে তিনি মক্কার প্রতিনিধি দলকে বললেন, "তোমরা ফিরে যাও, আমি কখনও এ নির্যাতিত ও অসহায় লোকজনকে তোমাদের হাতে প্রত্যর্পণ করব না।"

পরদিন আমর ইবনুল আস দ্বিতীয়বার নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, হুযুর! হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে ওদের কি ধারণা সে সম্পর্কে অবগত আছেন কি? নাজ্জাশী এ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য মুসলমানদেরকে পুনরায় ডেকে পাঠালেন। মুসলমানগণ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেলেন যে,এখন যদি হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্ পাকের সন্তান বলে অস্বীকার করা হয়, তবে নাজ্জাশী হয়ত আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হতে পারে। হযরত জাফর (রাঃ) বললেন, পরিণাম ফল যাই হোক, আমরা সত্যকথাই বলব।

মুসলমানগণ দরবারে উপস্থিত হলে নাজ্জাশী জিজ্ঞেস করলেন, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা? হযরত জাফর (রাঃ) বললেন, "আমাদের রসূল (সাঃ) বলেছেন, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্ পাকের বিশিষ্ট বান্দা, রসূল এবং কালিমাতুল্লাহ্ (আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নির্দেশজাত) ছিলেন।" একথা শুনে বাদশাহ্ মাটি থেকে একটি শুকনো খড় তুলে নিয়ে বললেন, "খোদার কসম! তোমরা যা বলেছ হযরত ঈসা তা অপেক্ষা এ তৃণটিরও অধিক কিছু নন।"[১] নাজ্জাশীর দরবারে যে খৃষ্টান পাদ্রী (ধর্মগুরু বিশপ) ছিলেন তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন এবং ক্রোধে গর্জন করতে লাগলেন। নাজ্জাশী তাঁর ক্রোধের প্রতি দৃকপাতও করলেন না। ফলে, কোরাইশদের প্রতিনিধিবৃন্দ অত্যন্ত ব্যর্থ মনোরথ হয়ে প্রত্যাবর্তন করল।[২]

---

১. মুস্তাদরাকে হাকিম, ২য় খণ্ড, কিতাবুত্তাফসীর পৃঃ-৩১০।

২. ইউরোপীয় ঐতিহাসিক মারগুলিয়থ সাহেব হাবশাতে হিজরত করার একটি অত্যন্ত দুষ্ট কল্পনাপ্রসূত রাজনৈতিক কারণ খুঁজে বের করেছেন। তিনি লিখেছেন, মোহাম্মদ (সাঃ) যখন দেখলেন, কোরাইশদের সঙ্গে বিবাদ করে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা যাবে না, তখন কোরাইশদের বিরুদ্ধে তিনি একটি ষড়যন্ত্র করলেন। তিনি আগেই শুনেছিলেন যে হাবশার অধিপতি আবরাহা নামক জনৈক রাজা পবিত্র কাবাগৃহ ধ্বংস করার উদ্দেশে একবার মক্কা অভিযান পরিচালনা করেছিল। এ জন্য বর্তমান অধিপতিকে মক্কা আক্রমণ করে কোরাইশদের শক্তি বিনষ্ট করে দেয়ার জন্য হিজরতের অজুহাতে হাবশাতে লোক পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি চিন্তা করে দেখলেন নাজ্জাশী যদি মক্কা দখল করে বসে, তবে তাঁর কোন লাভ হবে না। একথা ভেবে তিনি ষড়যন্ত্র থেকে বিরত হলেন।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এ সময় কোন শত্রু কর্তৃক নাজ্জাশীর দেশ আক্রান্ত হয়েছিল। ফলে, বাদশাহ স্বয়ং আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রওয়ানা হলেন।

সাহাবায়ে কেরাম পরামর্শ করলেন, আমাদের মধ্য থেকে একজন যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া দরকার। যাতে সে সংবাদ প্রেরণ করতে পারে এবং প্রয়োজন দেখা দিলে আমরাও যুদ্ধে যোগদান করে নাজ্জাশীর সাহায্য করতে পারি। হযরত যুবাইর (রাঃ) যদিও অল্পবয়স্ক ছিলেন, তথাপি তিনিই এ কার্যের ভারগ্রহণ করলেন এবং পানির মশকের সাহায্যে নীলনদ পার হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। অপর দিকে সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ্ পাকের দরবারে নাজ্জাশীর বিজয় প্রার্থনা করতে লাগলেন। কয়েকদিন পর হযরত যুবাইর (রাঃ) নাজ্জাশীর বিজয়ের সুসংবাদ বয়ে আনলেন।[১]

প্রথম দল পৌঁছার পর পর্যায়ক্রমে অনধিক ৮৩ জন মুসলমান আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। তাঁরা কিছুদিন শান্তিতে অবস্থানের পর মক্কার কাফেররা মুসলমান হয়ে গেছে বলে সংবাদ পেলেন। এ সংবাদ প্রচারিত হবার পর অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম মক্কায় আগমনের জন্য যাত্রা করলেন। কিন্তু তাঁরা মক্কার নিকটবর্তী এলে বুঝতে পারলেন যে, সংবাদ ভুল। তাই বাধ্য হয়ে কিছু লোক আবার হাবশায় প্রত্যাবর্তন করলেন, আর কিছু লোক গোপনে মক্কায় প্রবেশ করলেন।

উপরোক্ত ঘটনাটি তাবারীসহ অধিকাংশ ইতিহাসেই বর্ণিত হয়েছে এবং সম্ভবত ঘটনাটি সত্য। কিন্তু উক্ত গ্রন্থসমূহে এ গুজবটির কারণ হিসাবে লিখিত হয়েছে যে, একদা রসূলে পাক (সাঃ) পবিত্র হরম শরীফে নামায পড়ছিলেন এবং কাফেররাও সেখানে উপস্থিত ছিল। নবী করীম (সাঃ) যখন وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

মারগুলিয়থের এ বক্তব্য অত্যন্ত বিদ্বেষপ্রসূত, প্রমাণহীন ও নিতান্ত অযৌক্তিক। নাজ্জাশী আরবী ভাষা জানতেন না। এ অজুহাতে হযরত জাফর ও নাজ্জাশীর মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল তার সম্বন্ধেও মারগুলিয়থ সাহেব সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অথচ তখন হাবশাতে আরবী ভাষা সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। কেননা, হাবশী ভাষা ও আরবী ভাষার মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। হয়ত প্রত্যেক রাজদরবারেই দোভাষী থাকটাও ছিল খুবই স্বাভাবিক। রোমের বাদশাহ এবং হযরত আবু সুফিয়ানের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল তাও দোভাষীর মাধ্যমেই হয়েছিল। (বোখারী বাবু বাদউল ওহী)।

১. ইত্যাকার যাবতীয় ঘটনা মুসনাদে ইমাম আহামদ ইবনে হাম্বলের ১ম খণ্ডে, ২০২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হয়েছে। ইবনে হিশামও এ ঘটাটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

ইমাম আহামদ ইবনে হাম্বল ও ইবনে হিশাম নিম্নোক্ত সূত্রে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। মোহাম্মদ ইবনে ইস্হাক, যুহরী, আবু বকর, ইবনে আবদুর রহমান, ইবনুল হারেস, ইবনে হিশাম মাখযুমী ও উম্মে সালমা প্রমুখ বর্ণনাকারিগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য এবং সর্বশেষ বর্ণনাকারী হলেন হযরত উম্মে সালমা যিনি রসূলে পাক (সাঃ)-এর স্ত্রী এবং এ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এ ঘটনার সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়নি বরং তিনি পূর্ব স্বামী হযরত আবু সালমা ইবনে আবদুল আসাদের সাথেই হাবশায় হিজরত করেছিলেন।

আয়াতখানা পাঠ করলেন, তখন শয়তান তার (মানাত দেবতার) মুখ থেকে এ শব্দগুলো বের করল ঃ

تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى

অর্থাৎ, "এ মূর্তিগুলো অত্যন্ত সম্মানিত এবং এদের সুপারিশও আল্লাহ্ পাকের নিকট গ্রহণযোগ্য।"

এ আয়াত পাঠের পর রসূলে করীম (সাঃ) সেজদায় গমন করলেন এবং সমবেত সমস্ত কাফেরাও তাঁর সাথে সেজদা করল। এ বর্ণনার শেষাংশ (কতিপয় কাফের ব্যতীত সমুদয় জিন ও মানব রসূলে পাক (সাঃ)-এর সাথে সেজদা করেছিল।)

কেননা, সহীহ্ বোখারীতে قَوْلُهُ فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا[১] শিরোনামে এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। ঘটনার অবশিষ্টাংশ অবান্তর এবং বর্ণনার অযোগ্য। বিশিষ্ট মোহাদ্দেসীনের মধ্যে অধিকাংশ মোহাদ্দেসই যেমন—ইমাম বায়হাকী, কাযী 'আয়ায, আল্লামা আইনী, হাফেয মুনজেরী এবং আল্লামা নববী[২] এ হাদীসটিকে কল্পনাপ্রসূত এবং বাতিল বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে বহু মেহাদ্দেস এ ঘটনাটিকে সূত্রসহ বর্ণনা করছেন। তাঁদের মধ্যে তাবারী, ইবনে আবী হাতেম, ইবনুল মুন্‌জার, ইবনে মারদুবিয়্যাহ্, ইবনে ইস্‌হাক, মূসা ইবনে ওক্‌বা এবং আবু মা'শার প্রমুখ মোহাদ্দেসগণ সাধারণত খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে,হাফেয ইবনে হাজার আসকালানীর মত হাদীস শাস্ত্রবিশারদও এ হাদীসের বিশুদ্ধতার পক্ষে জোর সমর্থন জ্ঞাপন করে লিখেছেন ঃ

"আমরা উপরে বর্ণনা করছি যে,এ হাদীসের তিনটি সূত্র বিশুদ্ধ হাদীসের শর্তের অনুরূপ এবং এ সমস্ত হাদীস মুরসাল এবং মুরসাল হাদীসকে যারা দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন তাঁরা এ হাদীস দ্বারা যুক্তি দিতে পারেন।"

প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, রসূলে করীম (সাঃ) যখন পবিত্র কোরআন শরীফ পাঠ করতেন, তখন কাফেররা উদ্দেশ্যমূলকভাবে হৈ-চৈ করত এবং কালামে পাকের আয়াতের সাথে নিজেদের মনগড়া বাক্য যোগ করতে চেষ্টা করত। কোরআন পাকের নিম্ন আয়াতটি উপরোল্লিখিত ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে—

لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ـ

---

১. কিতাবুত্তাফসীর সূরা আন্‌নাজ্‌ম।

২. যারকানী, মাওয়াহিবে লুদুন্নিয়াহ্, শেফা কাযী আয়ায এবং বোখারীর শরাহ্ আইনীতে সূরায়ে নাজমের তফসীর এবং নূরুন নাবরাস গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

"তোমরা কোরআন পাঠ শ্রবণ করো না বরং তাতে গণ্ডগোল সৃষ্টি কর। হয়ত তোমরা বিজয়ী হবে।" (সূরা হা-মীম সেজদা)

পবিত্র কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ করার সময় কোরাইশরা নিম্নোক্ত বাক্যগুলো পাঠ করতে অভ্যস্থ ছিল। (মু'জামুল-বুলদান)

وَاللَّاتِ وَالْعُزّٰى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى فَاِنَّهُنَّ الْغَرَانِيْقُ الْعُلٰى وَاِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجٰى -

অর্থাৎ, "লাত, উযযা ও তৃতীয় মূর্তি মানাতের কসম। এরা অত্যন্ত সম্মানিত ও মর্যাদাবান দেবতা এবং তাদের সুপারিশের আশাই আমরা করি।"

রসূলে পাক (সাঃ) যখন কোরআনে করীমের উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন, তখন হয়ত কোন শয়তান (কাফের) উক্ত বাক্যটি আয়াতের সাথে মিলিয়ে দেয়। দূরে উপবিষ্ট কাফেররা মনে করল যে রসূলে পাকই পাঠ করছেন। মুসলমানদের মধ্যে পরে যখন এ ঘটনা আলোচিত হয়, তখন হয়তো কোন মুসলমান বলেছিলেন যে হয়তো শয়তান রসূলে পাক (সাঃ)-এর যবান মোবারক দিয়ে একথাটি বের করে দিয়েছে। পরবর্তীকালে হাদীস সংগ্রহের সময় এ কথোপকথনটি রূপ পাল্টে হাদীসের রূপ ধারণ করেছে যে রসূলে করীম (সাঃ)-এর যবান মোবারক দিয়ে শয়তান একথা কয়টি বের করে দিয়েছে। যেহেতু সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে এ বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে যে, শয়তান অন্য লোকের জিহ্বা দিয়েও কথা বলতে পারে, সেহেতু হাদীস বর্ণনাকারিগণও এ বর্ণনাটি মেনে নেন।

এটা শুধু অনুমান নয়, বরং প্রাচীন হাদীস বিশেষজ্ঞগণও এমনি লিখেছেন। মাওয়াহিবে লুদুন্নিয়াতে উল্লিখিত হয়েছে যে, "কোন কোন হাদীসবেত্তা বলেছেন, রসূলে পাক (সাঃ) যখন নামাযে وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى আয়াতটি পাঠ করলেন, তখন কাফেরদের ভয় হল যে এর পরেই তাদের দেব-দেবীদের নিন্দাসূচক আয়াত পাঠ করা হবে। এ জন্য তারা তাড়াতাড়ি এ আয়াতের সঙ্গে তাদের সে কথাটি যোগ করে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করে দিল আর এটা ছিল তাদের অভ্যাস। তারা বলত, "তোমরা কোরআন পাঠ শ্রবণ করো না, বরং কোরআন পাঠের সময় হৈ-চৈ শুরু করো। এভাবেই তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারবে।"

যাঁরা ভুল সংবাদ শুনে আবিসিনিয়া থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, মক্কাবাসীরা তাঁদের উপর নির্যাতনের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল। নির্যাতনের মাত্রা এত অধিক হল যে তাঁরা আবার হিজরত করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু এ হিজরতের মত পূর্বের হিজরত এত সহজ ছিল না। কাফেররা পদে পদে কঠিন বাধার সৃষ্টি

করল। তথাপি নানা উপায়ে, আনুমানিক একশ' মুসলমান মক্কা ত্যাগ করে আবিসিনিয়ায় অবস্থান গ্রহণ করলেন। রসূলে পাক (সাঃ) যখন পবিত্র মদীনায় হিজরত করেন, তখন কিছুসংখ্যক লোক সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে মদীনায় ফিরে এলেন। যাঁরা অবশিষ্ট ছিলেন ৭ম হিজরীতে নবী করীম (সাঃ) তাদেরকে মদীনায় ডেকে পাঠালেন।[১]

অবিশ্বাসী কাফেরদের অত্যাচার ও নির্যাতন এখন আর দুর্বল এবং অসহায় মুসলমানদের ওপর সীমাবদ্ধ ছিল না। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর গোত্র অত্যন্ত সম্মানিত ও শক্তিশালী গোত্র ছিল। তাঁর বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কাফেরদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার ইচ্ছা করেছিলেন এবং মক্কা থেকে ইয়ামনের দিকে ৫ দিনের পথ "বারকুল গামাদ" নামক স্থান পর্যন্ত গিয়েছিলেন।[২] উক্ত স্থানে ফারাহ্ গোত্রের নেতা ইবনুদ-দাগ্‌নার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ইবনুদ-দাগনা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? হযরত আবু বকর (রাঃ) উত্তরে বললেন, আমার কওম আমাকে থাকতে দিল না। তাই আমি অন্য কোথাও গিয়ে নীরবে আল্লাহ্ পাকের উপাসনা করতে চাই। ইবনুদ্-দাগনা বললেন, "তা হতে পারে না, আপনার মত লোক মক্কা থেকে চলে যাবেন! আমি আপনাকে আশ্রয়দান করছি।" অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর সঙ্গে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। ইবনুদ্ দাগনা মক্কায় আগমন করে কোরাইশদের সমুদয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি এমন একজন লোককে মক্কা থেকে বের করে দিতে চাও, যিনি অতিথিপরায়ণ, গরীবের সহায়, আত্মীয়বৎসল এবং বিপদে-আপদে কাজে লাগে? কোরাইশরা উত্তরে বলল, হ্যাঁ, একটি শর্তে আমরা তাঁকে মক্কায় স্থান দিতে রাজী। তিনি নামাযে যা ইচ্ছে চুপে চুপে পাঠ করবেন, তিনি যদি উচ্চৈঃস্বরে কোরআন পাঠ করেন, তবে আমাদের পরিবার-পরিজনের ওপর তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। হযরত আবু বকর (রাঃ) কিছুদিন এ শর্ত পালন করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বাড়ির পার্শ্ববর্তী একটি মসজিদ নির্মাণ করে তাতে বসে অত্যন্ত বিনীত ও অশ্রুবিগলিতচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে পবিত্র কোরআন পাঠ করতেন। তিনি অত্যন্ত নম্রচিত্তের লোক ছিলেন। কোরআন পাঠ করার সময় অনিচ্ছাকৃতভাবেই কাঁদতে থাকতেন। মহিলা এবং শিশুরা তাঁকে দেখে প্রভাবান্বিত হত। কোরাইশ নেতৃবর্গ আবার ইবনে দাগনার কাছে অভিযোগ করল।

---

১. এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তবকাতে ইবনে সা'দ নামক গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিক এ দ্বিতীয়বারের হিজরতের কথা উল্লেখ করেননি। আবার অনেকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন।

২. যারকানী, মাওয়াহীবে লুদুন্নিয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৪, যিকরে হিজরতে সানিয়া হাবশ।

তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে বললেন, এখন আর আমি আপনার নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করতে পারি না। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, "আল্লাহ্ পাকের নিরাপত্তাই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি আপনার আশ্রয় ত্যাগ করলাম।"—(সহীহ বোখারী "হিজরতে মদীনা" অধ্যায়)।

শিআবে আবু তালেবে অন্তরীণ জীবন

কোরাইশ নেতৃবর্গ লক্ষ্য করছিল যে,অন্যায়-অত্যাচার এবং নানাবিধ বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ইসলামের শক্তি দিন দিন বেড়েই চলছে। হযরত ওমর (রাঃ) এবং আমীর হামযার (রাঃ) মত বীরপুরুষও ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছেন। তাদের অন্যতম প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হাবশার অধিপতি নাজ্জাশী মুসলমানদেরকে সসম্মানে আশ্রয়দান করছেন এবং মক্কার প্রতিনিধিদেরকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং তারা নবী করীম (সাঃ) এবং তাঁর গোত্রকে কোথাও বন্দী করে সবাইকে এক সঙ্গে ধ্বংস করে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মক্কার সমুদয় গোত্রের সমন্বয়ে এ মর্মে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করল যে মক্কার কোন ব্যক্তি বনী হাশেম গোত্রের সাথে আত্মীয়তা করবে না, তাদের কাছে কোনকিছু ক্রয়-বিক্রয় করবে না এবং তাদের নিকট কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য পাঠাবে না। যত দিন পর্যন্ত তাঁরা (বনী হাশেম) মোহাম্মদ (সাঃ)-কে হত্যা করার জন্য আমাদের হাতে সমর্পণ না করবে, ততদিন পর্যন্ত এ চুক্তি বলবৎ থাকবে।[১] এ চুক্তিপত্রটি মনসুর ইবনে ইকরিমা নামক জনৈক ব্যক্তি লিখেছিলেন এবং পবিত্র কাবাগৃহে সংরক্ষিত করা হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত হযরত আবু তালিব অপারগ হয়ে হাশিম গোত্রের সমস্ত লোকজনসহ শিআবে আবু তালেবে আশ্রয়গ্রহণ করলেন। (এটি পাহাড়ের একটি উপত্যকা, যা উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁরা পেয়েছিলেন।) তাঁরা সুদীর্ঘ তিন বছর এ উপত্যকায় অবরুদ্ধ অবস্থায় অতিবাহিত করেন। এ সময়টি এত কঠিন ছিল যে জঠরজ্বালা নিবারণের জন্য অনেক সময় তাঁদেরকে গাছের পাতা পর্যন্ত খেতে হয়েছে। যে সমস্ত হাদীসে সাহাবাগণের 'তালাহ' নামক গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো এ সময়কারই ঘটনা। এ প্রসঙ্গে "রাওজুল আনফ" গ্রন্থে ইমাম সুহাইলী হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের একটি ঘটনা বর্ণনা করছেন যে একদা রাত্রিতে তিনি একটি শুকনো চামড়া আগুনে ঝলসিয়ে তার দ্বারাই ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করেছিলেন।—(রাওজুল আনফ)

---

১. তাবারী ইবনে সা'দ প্রমুখ গ্রন্থকারগণ বিস্তারিতভাবে এ চুক্তিপত্রটির বিষয়বস্তু আলোচনা করেছেন, কিন্তু রসূলে পাক (সাঃ)-কে তাদের হাতে অর্পণ করে দেয়ার কথা শুধুমাত্র "মাওয়াহিবে লুদুন্নিয়া" নামক গ্রন্থেই উল্লেখ করা হয়েছে।

বিখ্যাত সীরাতকার ইবনে সা'দ লিখেছেন, ছোট ছোট শিশুরা যখন ক্ষুৎপিপাসায় অস্থির হয়ে চিৎকার করত, তখন বাইরে থেকে কোরাইশরা তা শুনে আনন্দিত হত। আবার কোন কোন সহৃদয় ব্যক্তি দুঃখিতও হত। একদিন হযরত খাদিজার (রাঃ) ভ্রাতুষ্পুত্র হাকিম ইবনে হাযাম স্বীয় দাসের মাধ্যমে হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর নিকট সামান্য গম পাঠাচ্ছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে আবু জাহল দেখতে পেয়ে তা ছিনিয়ে নিবার উপক্রম করলে ঘটনাক্রমে আবুল বোখতারী সেখানে উপস্থিত হন। তিনি যদিও কাফের ছিলেন কিন্তু অন্তরে দয়ামায়া ছিল। তিনি বললেন, এক ব্যক্তি তার ফুফুর নিকট সামান্য খাবার পাঠাচ্ছে, তাতে তুমি বাধা দিচ্ছ কেন?

রসূলে পাক (সাঃ) বনী হাশেমসহ একাধারে তিন বছর অবরুদ্ধ থাকার পর শেষ পর্যন্ত কাফেরদের পক্ষ থেকেই চুক্তিভঙ্গের আন্দোলন শুরু হল। হিশাম ইবনে আমেরী নামক এক ব্যক্তি বনী হাশেম গোত্রের নিকটাত্মীয় ছিলেন এবং নিজ গোত্রেরও অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি গোপনে গোপনে তাদের নিকট খাদ্যদ্রব্য পাঠাতেন। তিনি একদিন আবদুল মুত্তালিবের দৌহিত্র যুবাইরের কাছে গিয়ে বললেন, "কিহে যুবাইর! তোমার কি পছন্দ হয় যে তুমি প্রচুর পরিমাণে পানাহার এবং যাবতীয় আনন্দ উপভোগ করবে, আর তোমার মামার ভাগ্যে একটি দানাও জুটবে না?"তিনি বললেন, "কি করব? আমি একা। যদি আমাকে সমর্থন করার মত একজন লোকও পেতাম, তবে এ অন্যায় চুক্তিপত্র অবশ্যই ছিঁড়ে ফেলতাম।" হিশাম বলল, "আমি তোমার সঙ্গে আছি।" অতঃপর তাঁরা উভয়ে মিলে মোত'আম ইবনে আদির কাছে গিয়ে হাযির হলেন। অপরদিকে আবুল বোখতারী, ইবনে হিশাম এবং যুম'আ ইবনুল আস্ওয়াদও তাঁদেরকে সমর্থন দান করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। পরদিন সবাই মিলে পবিত্র হরম শরীফে উপস্থিত হলেন। সেখানে যুবাইর সমবেত জনতাকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলেন, "হে মক্কাবাসিগণ! এটা কেমন কথা যে আমরা সুখে-শান্তিতে দিন যাপন করব, আর বনী হাশেমদের ভাগ্যে সামান্য খাবারও জুটবে না? খোদার কসম! এ অন্যায় চুক্তি ছিঁড়ে না ফেলা পর্যন্ত আমি শান্ত হব না।" একথা শুনার পর আবু জাহল সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করল, "সাবধান! এ চুক্তিপত্রের বিরুদ্ধে কাকেও কিছু করতে দেয়া হবে না।" যুম'আ দাঁড়িয়ে বলল, "তুমি মিথ্যাবাদী! এ চুক্তি সম্পাদনের সময় আমরা রাজী ছিলাম না।" এমনি বাক-বিতণ্ডার মধ্য দিয়ে মোত'আম ইবনে আদি চুক্তিপত্রটি স্বহস্তে ছিঁড়ে ফেললেন। অতঃপর মোত'আম ইবনে আদি ইবনে কায়েস, যুম'আহ ইবনুল আসওয়াদ আবুল বোখতারী প্রমুখ সকলে সশস্ত্র হয়ে বনী হাশেম গোত্রকে অবরোধ থেকে উদ্ধার করলেন। (এ ঘটনাটি কেবল মাত্র তারীখে ইবনে সা'দে উল্লিখিত হয়েছে।) ইবনে সাদের মতে নবুওতের ১০ম সনে এ ঘটনাটি ঘটেছিল। এ সময়েই রসূলে পাক (সাঃ) মে'রাজে গমন করেছিলেন এবং এ সময় পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়েছিল। মে'রাজের বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে দেয়া হয়েছে।

হযরত খাদিজা (রাঃ) ও হযরত আবু তালেবের ইনতিকাল (১০ম নববী সন)

রসূলে পাক (সাঃ) "শেআবে আবি তালেবের" অবরুদ্ধাবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে মাত্র কয়েকদিন শান্তিতে অবস্থান করতে না করতেই হযরত আবু তালেব ও হযরত খাদিজা (রাঃ) উভয়েই ইহজগতের মায়া কাটিয়ে পরলোকের পথে যাত্রা করলেন।

হযরত আবু তালেবের মৃত্যুকালে রসূল (সাঃ) তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে আবু জাহ্ল ও আবদুল্লাহ্ ইবনে উমাইয়্যাকে সেখানে দেখতে পেলেন। তিনি হযরত আবু তালেবকে বললেন, চাচাজান! মৃত্যুর সময় আপনি মাত্র একবার লাইলাহা ইল্লাল্লাহ .... বলুন। আমি আল্লাহ্ পাকের দরবারে আপনার ঈমান গ্রহণের সাক্ষ্য প্রদান করব।" আবু জাহ্ল এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে উমাইয়্যা বলল, "আবু তালেব, তুমি কি তোমার পিতা আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম পরিত্যাগ করবে?" সবশেষে আবু তালেব বললেন, "আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের ওপরই আছি।" অতঃপর রসূলে পাক (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বললেন, "আমি অবশ্যই কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যেতাম, কিন্তু কোরাইশরা মনে করবে যে,আমি মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করছি। তাই তা থেকে বিরত রইলাম।" রসূলে পাক (সাঃ) বললেন, "আল্লাহ্ পাক আমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি আপনার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে থাকব।"[১]

উপরোক্ত ঘটনাটি সহীহ্ বোখারী ও সহীহ্ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইবনে ইস্হাকের বর্ণনায় দেখা যায়, মৃত্যুর সময় হযরত আবু তালেবের ঠোঁট নড়ছিল। হযরত আব্বাস (রাঃ) যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি, তাঁর ঠোঁটের নিকট কান লাগিয়ে রসূলুল্লাহ্কে (সাঃ) বললেন, "মোহাম্মদ! তুমি তাঁকে যে কলেমা পাঠ করতে বলছিলে, তিনি তাই পাঠ করছেন।[২]

এ কারণেই হযরত আবু তালেবের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। কিন্তু যেহেতু সহীহ্ বোখারী ও সহীহ্ মুসলিমের হাদীস অন্যান্য অপেক্ষা বেশি গ্রহণযোগ্য বলে সর্বত্র স্বীকৃত তাই অধিকাংশ মোহাদ্দেসীনের মতে তিনি কাফের অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

---

১. সহীহ্ বোখারী ও সহীহ্ মুসলিম, বাবুল জানায়েয। কিন্তু হযরত আবু তালেবের শেষ কথাটি সহীহ্ মুসলিমে আছে, বোখারীতে নেই।

২. ইবনে হিশাম, মিসরে মুদ্রিত, পৃঃ ১৪৬।

কিন্তু মোহাদ্দেসসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে গেলে বোখারী শরীফের এ হাদীসটি মোটেই যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয় না। কেননা, এ হাদীসের সর্বশেষ বর্ণনাকারী হযরত মুসাইয়্যির (রাঃ) মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি হযরত আবু তালেবের মৃত্যুর সময় বর্তমান ছিলেন না। এ জন্যই আল্লামা আইনী এ হাদীসটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একে মুরসাল বলে অভিহিত করেছেন।[১]

হযরত ইবনে ইস্হাকের বর্ণনাসূত্রেও এক জায়গায় আব্বাস ইবনে আবদুল্লাহ্, ইবনে মা'বাদ ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নাম রয়েছে। কিন্তু এখানেও এ দু'জনের মধ্যকার একজন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং প্রমাণ হিসাবে উভয় হাদীসের মর্যাদাই সমান।[২]

হযরত আবু তালেব (রাঃ) রসূলে পাক (সাঃ)-এর জন্য যে সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করেছেন সমগ্র বিশ্বে তার কোন নজির নেই। তিনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য আপন ঔরশজাত সন্তানদিগকে পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন। তিনি আল্লাহ্র রসূলের জন্য সমগ্র আরববাসীকে শত্রুতে পরিণত করেছিলেন, বন্দী হয়েছিলেন, উপবাস সহ্য করেছিলেন, শহর পরিত্যাগ করেছিলেন এবং সুদীর্ঘ তিন বছর যাবত অসহনীয় কষ্ট ভোগ করেছিলেন। এ স্নেহ, এ ভালবাসা এবং এ আত্মত্যাগ কি বৃথা যাবে?

হযরত আবু তালেব রসূলে করীম (সাঃ) অপেক্ষা ৩৫ বছরের বড় ছিলেন এবং তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। একবার তিনি পীড়িত হয়ে পড়লে রসূলে করীম (সাঃ) তাঁকে দেখতে গেলে তিনি বললেন, "ভাতিজা! যে আল্লাহ্

---

১. আইনী, কিতাবুল জানায়েয, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২০০।

২. গ্রন্থাকারের এ মতের সাথে আমি একমত নই। কেননা, সহীহ্ বোখারীর সর্বশেষ বর্ণনাকারী হযরত মুসাইয়্যিব (রাঃ) সাহাবী ছিলেন। বলা বাহুল্য, যে কোন সাহাবী ন্যূনপক্ষে অন্য কোন সাহাবীর নিকট থেকে বর্ণনা করবেন। এ জন্যেই মারাসীলে সাহাবা গ্রহণযোগ্য। অপরদিকে ইবনে ইস্হাকের হাদীস মুনকাতে। উপরন্তু যে বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা হয়নি তিনি সাহাবী নন। স্বয়ং ইবনে ইস্হাকও উচ্চ পর্যায়ের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। সুতরাং এ দুটি হাদীসকে একই পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। অধিকন্তু হযরত মুসাইয়্যিবের এ হাদীসটির সমর্থনে হযরত আব্বাসের (রাঃ)ও একটি হাদীস সহীহ্ বোখারীতে বর্ণিত রয়েছে। সে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত আব্বাস (রাঃ) একদিন নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া-রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)! হযরত আবু তালেব আপনার দ্বারা কি উপকার লাভ করেছেন? তিনি তো আপনাকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করতেন এবং আপনার শত্রুদের সঙ্গে সর্বদাই যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন।" রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, "তাঁর পায়ের মাত্র টাখনু দুটি দোযখের আগুনে জ্বলবে। কিন্তু মস্তক পর্যন্ত তার প্রতিক্রিয়া হবে। যদি আমি সুপারিশ না করতাম, তবে তিনি গভীর দোযখে নিক্ষিপ্ত হতেন। এ হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে হযরত আবু তালেব ইসলাম গ্রহণ না করেই মৃত্যুবরণ করেছেন এবং হযরত আব্বাস (রাঃ) তা অবগত ছিলেন। বোখারীর আবু তালেব জীবনীর অধ্যায়ে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে এ ধরনের একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

তোমাকে রসূলরূপে প্রেরণ করেছেন তাঁর নিকট আমার রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা কর।" রসূলে করীম (সাঃ) প্রার্থনা করার পর তিনি রোগমুক্ত হলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ পাক তোমার কথা শুনেন। তিনি বললেন, চাচাজান! যদি আপনিও আল্লাহ্র আদেশ পালন করেন, তবে তিনি আপনার প্রার্থনাও গ্রহণ করবেন। (ইসাবা ফী আহ্ওয়ালিস্সাহাবা ঃ যিকরে আবু তালেব)।

হযরত আবু তালেবের মৃত্যুর কিছুদিন পর হযরত খাদিজা (রাঃ)-ও পরলোক গমন করেন। কোন কোন হাদীসে বর্ণিত আছে যে,হযরত খাদিজা (রাঃ) হযরত আবু তালেবের পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাঁদের মৃত্যুর পর রসূলে করীম (সাঃ)-এর আর কোন সাহায্য ও সহায়তাকারী রইল না। সাহাবায়ে কেরাম নিজেরাই বিপদাপন্ন ছিলেন। রসূল (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেবার সুযোগ ও ক্ষমতা তাঁদের মোটেই ছিল না। এ সময়টাই ইসলামের জন্য সর্বাপেক্ষা সংকটজনক কাল ছিল এবং রসূলে পাক (সাঃ) নিজেই এ বছরটিকে "আমুল-হুযন" (শোক ও দুঃখের বছর) হিসাবে অভিহিত করেছেন।—(মাওয়াহিবে লুদুন্নিয়া)

হযরত খাদিজা (রাঃ) নবুওতের দশম সনে রমযান মাসে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। মৃত্যুর পর তাঁকে "জিহুন" নামক স্থানে সমাহিত করা হয়। রসূলে পাক (সাঃ) নিজেই তাঁর কবরে নেমেছিলেন। তখন পর্যন্ত জানাযার নামায ফরয হয়নি বলে তাঁর জানাযা পড়া হয়নি।—(ইবনে সা'দ)

হযরত আবু তালেব ও হযরত খাদিজার (রাঃ) মৃত্যুর পর কোরাইশদের ভয় করার মত আর কেউ ছিল না। এখন তারা অত্যন্ত নির্ভয়ে ও নির্মমভাবে রসূলে পাক (সাঃ)-এর প্রতি নির্যাতন চালাতে লাগল। একদা তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় কোন দুষ্ট তাঁর মাথার সিঁথিতে মাটি ঢেলে দিলে তিনি ঘরে ফিরে এলেন। তাঁর কন্যা পিতার মাথায় মাটি দেখে পানি এনে তা ধুয়ে দিচ্ছিলেন এবং কাঁদছিলেন। রসূলে পাক (সাঃ) বললেন, "বৎস! কেঁদো না, আল্লাহ্ পাক তোমার পিতাকে অবশ্যই রক্ষা করবেন।"—(তাবারী ও ইবনে হিশাম)

রসূলে পাক (সাঃ) মক্কাবাসীদের সম্পর্কে একেবারে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তায়েফে গিয়ে ইসলাম প্রচার করার ইচ্ছা করলেন। তায়েফ শহরে বহু বড় বড় ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি বসবাস করত। তাদের মধ্যে উমাইয়ের বংশই সমস্ত গোত্রের মধ্যে প্রধান গোত্ররূপে বিবেচিত হত। আবদে ইয়ালীল, মসউদ ও হাবীব নামে তারা তিন ভাই ছিল। রসূলে পাক (সাঃ) তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। তারা রসূলে পাক (সাঃ)-কে অত্যন্ত জঘন্য ভাষায় উত্তর দিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন বলল, "যদি আল্লাহ্ পাক তোমাকে রসূলরূপে পাঠিয়ে থাকেন, তবে পবিত্র কাবা শরীফের সম্মানহানি করেছেন।" অপর একজন

বলল, "খোদা বোধ হয় তোমাকে ছাড়া রসূলরূপে পাঠাবার জন্য আর কাকেও পাচ্ছিলেন না।" তৃতীয় জন বলল, "আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই না। কেননা, যদি তুমি সত্য সত্যই নবী হয়ে থাক, তবে তোমার সাথে কথা বলা ধৃষ্টতা। আর যদি তুমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক, তবে তুমি আমার সাথে কথা বলার উপযুক্ত নও।"

এ অসভ্যরা তাঁর সাথে শুধু রূঢ় ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হল না। উপরন্তু তায়েফের বাজারী লোকজনকে তাঁর বিরুদ্ধে খেপিয়ে দিল। শহরের গুণ্ডা-বদমাশরা চারদিক থেকে রসূলে পাক (সাঃ)-কে উত্ত্যক্ত করতে লাগল। এ অসভ্য ও দুর্বৃত্তের দল দু'দলে বিভক্ত হয়ে রসূলে পাক (সাঃ) যে দিকেই যেতেন সেদিক হতেই তাঁর পদ মোবারকে প্রস্তর নিক্ষেপ করত। তাদের প্রস্তর বর্ষণের দরুন তাঁর পদযুগল ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেত এবং জুতা রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে যেত। অত্যাচারের মাত্রা এখানেই শেষ হয়নি। তিনি ক্ষতের ব্যথায় অস্থির হয়ে কোথাও বসে পড়লে তারা তাঁর হাত ধরে উঠিয়ে দিত। তিনি যখন আবার চলতে আরম্ভ করতেন, তখন পুনরায় তারা প্রস্তর বর্ষণ করতে শুরু করত এবং অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিত ও হাতে তালি বাজাত।[১] অবশেষে তিনি ওতবা ইবনে রাবিয়াহ্ নামক এক ব্যক্তির আঙ্গুর বাগানে গিয়ে আশ্রয়গ্রহণ করলেন। ওতবা যদিও কাফের ছিলেন, তথাপি অত্যন্ত সুসভ্য ও সৎস্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তিনি নবী করীম (সাঃ)-কে এমন দুর্দশাগ্রস্ত দেখে তার দাস আদ্দাসের মাধ্যমে কয়েক ছড়া আঙ্গুর পাঠিয়ে দিলেন। এ সফরে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর সঙ্গী ছিলেন।[২]

তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করে নবী করীম (সাঃ) কিছুদিন 'নাখলা' নামক স্থানে অবস্থান করেন। পরে হিরা নামক স্থানে এসে তিনি মাত'আম ইবনে আদীর আশ্রয় চেয়ে সংবাদ পাঠালেন। আরবদের রীতি ছিল যে কোন শত্রুও যদি কারো নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করত, তবে তাকে আশ্রয় দেয়া হত। সুতরাং মাত'আম ইবনে আদি তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং ছেলেদেরকে ডেকে বললেন, অস্ত্রসজ্জিত হয়ে এখুনি হরম শরীফে যাও।

---

১. এ ঘটনার পূর্ণ বিবরণ মূসা ইবনে উকবার হাওয়ালাতে মাওয়াহিবে লুদুন্নিয়াহ নামক গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। তাবারী এবং ইবনে হিশামেও বিবরণ রয়েছে।

২. অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হল যে একটি ঘটনাকে যদি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়, তবে ভিন্ন ভিন্ন আকারেই দৃষ্ট হয়। মারগুলিয়থ সাহেব রসূলে পাক (সাঃ)-এর এ তায়েফ সফরেও ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়েছেন। তিনি বলেছেন, তায়েফ মক্কার নিকটবর্তী একটি ছোট শহরের না নাম এবং মক্কার প্রভাবাধীন এলাকা। সেখানে মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বাগ-বাগিচাও ছিল। সুতরাং মক্কার লোকেরা সেখানে প্রায়ই যাতায়াত করত এবং তায়েফবাসিগণও প্রয়োজন হলে মক্কায় আগমন করত। যখন মক্কার নেতৃবর্গ তাঁর বিরুদ্ধে ছিল, তখন তায়েফবাসিগণের নিকট তাঁর কি আশা থাকতে পারে? কিন্তু স্যার উইলিয়াম ম্যুর তাঁর তায়েফ ভ্রমণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে "মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ধর্মবিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাস এমন গভীর ও প্রত্যয়পূর্ণ ছিল যে যাবতীয় ব্যর্থতা সত্ত্বেও তিনি একা একটি শত্রু শহরে গমন করে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন।"
সত্যিকারের শ্রেষ্ঠত্ব তাই যা শত্রুগণও স্বীকার করে।

রসূলে পাক (সাঃ) পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করছিলেন এবং মাত'আম ইবনে আদী উটে আরোহণ করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। পবিত্র হ্রম শরীফের কাছে এসে মাত'আম উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করলেন, "আমি হ্যরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে আশ্রয় দান করেছি।" রসূলে পাক (সাঃ) পবিত্র হ্রম শরীফে আগমন করে নামায পড়লেন। মাত'আম এবং তার পুত্রগণ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে পাহারা দিলেন।[১]

মাত'আম বদর যুদ্ধের পূর্বেই অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। রসূলে পাক (সাঃ)-এর দরবারি কবি হ্যরত হাস্সান ইবনে সাবেত (রাঃ) তাঁর শোকগাথা গেয়েছিলেন। সুবিখ্যাত গ্রন্থকার যারকানী (রাঃ) বদর যুদ্ধের আলোচনা করতে গিয়ে এ শোকগাথাটি বর্ণনা করেছেন।[২] হ্যরত নবী করীম (সাঃ) অবিশ্বাসীদেরও সৎকর্মের প্রশংসা করতে কোন প্রকার বাধা নেই বলে মন্তব্য করেছেন। মাত'আম রসূলে পাক (সাঃ)-এর যে খেদমত করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

আরবের বিভিন্ন গোত্রের সাথে সাক্ষাত

প্রতি বছর হজের সময় আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকজন মক্কা নগরীতে আগমন করত এবং শহরের আশপাশে তাঁবু টাঙ্গিয়ে হজ সম্পাদন করত।

এ সময়ে রসূলে পাক (সাঃ) অভ্যাস মত প্রত্যেক গোত্রের লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাতেন। এছাড়া আরবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হত। উক্ত মেলাতে বহু লোকের সমাগম হত। রসূলে পাক (সাঃ) এসব মেলাতেও ইসলামের আহ্বান জানাতেন।

আরবের বিশিষ্ট মেলাগুলোর মধ্যে ওকায মেলাই ছিল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও আনন্দমুখর। এ মেলাতে আরববাসীগণ তাদের জাতীয় বীরত্ব ও বিদ্যার গৌরব গাথা বর্ণনা করত। এটা ব্যতীত মাজনা এবং জুলমাজায নামক অপর দুটি মেলার কথাও ঐতিহাসিকরা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। আরবের গোত্রগুলোর মধ্যে বনু আমের, মাহারিব, ফাযারাহ্, গাস্সান, মুররাহ্, হানীফা, সালীম, আবস, বনু-নযীর, কান্দাহ্, কালব, হারেস ইবনে কা'ব, আযরাহ্ এবং হাযারেমাহ্ নামক গোত্রগুলো বিশেষভাবে খ্যাত ছিল।

---

১. তারীখে ইবনে সা'দের ১৪২ পৃষ্ঠায় মাওয়াহেবে লুদুন্নিয়া অপেক্ষা একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এ বর্ধিত অংশটি ইবনে ইসহাকের বর্ণনা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। ইবনে হিশাম এ সমস্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করেননি।

২. যারকানী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১৬।

রসূলে পাক (সাঃ) উপরোক্ত প্রত্যেকটি গোত্রে গিয়ে[১] তাদেরকে ইসলামের আমন্ত্রণ জানাতেন। কিন্তু আবু লাহাব তাঁকে অনুসরণ করে প্রত্যেক স্থানেই যেত এবং লোকজনকে রসূলে পাক (সাঃ) সম্পর্কে সাবধান করত। রসূলে পাক (সাঃ) যখন কোন জনসমাবেশে বক্তৃতা করতেন, তখন সে অনবরত বলতে থাকত যে তিনি পিতৃ-পিতামহের ধর্মত্যাগ করেছেন এবং সর্বদা মিথ্যা কথা বলেন।[২]

বনী হানীফা গোত্রের লোকজন ইয়ামামার অধিবাসী ছিল। তারা রসূলে পাক (সাঃ)-কে অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় উত্তর দিয়েছিল।[৩] মিথ্যা নবুওতের দাবিদার, ভণ্ড মুসাইলামা ছিল এ গোত্রেরই নেতা।

একদা রসূলে পাক (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে নিয়ে বনূ ইবনে শায়বান গোত্রের নিকট গমন করেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) এ গোত্রের একজন বিশিষ্ট নেতা মাফরুককে বললেন, তোমরা যে রসূলের কথা ইতিপূর্বে শুনেছ ইনিই সে রসূল। মাফরুক নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ভ্রাতঃ! আপনি কি শিক্ষা প্রদান করেন? তিনি বললেন, "আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয় এবং আমি তাঁর পয়গম্বর।" অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পাঠ করলেন।

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَنْ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ وَمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ـ

"আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা আস, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যা নিষিদ্ধ (হারাম) ঘোষণা করেছেন তা আমি তোমাদেরকে বলব। আল্লাহ্ পাকের সাথে কাউকে অংশীদার করো না এবং পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করবে; দারিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা করবে না; কেননা, আমিই তোমাদেরকে এবং তাদেরকে রিজিক প্রদান করে থাকি এবং তোমরা অশ্লীলতার নিকটবর্তী হইও না, তা প্রকাশ্যেই হোক, অথবা গোপনেই হোক; তোমরা অনর্থক প্রাণনাশ করো না। কেননা, আল্লাহ্ পাক প্রাণনাশ করা হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন; তোমাদের প্রতি এটাই নির্দেশ। হয়ত তোমরা বুঝতে পারবে।" (সূরা আনআম, রুকূ-১৯)

মাফরুক, মুসান্না এবং কাবিসা এ তিনজন ছিলেন এ গোত্রের নেতা, সৌভাগ্যবশত তারা সবাই এখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সবাই কালামে পাকের

১. ইবনে সা'দ তাঁর রচিত গ্রন্থে সমুদয় গোত্রের বিবরণ প্রদান করেছেন।
২. মুস্তাদরাকে হাকিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫ (হায়দ্রাবাদে মুদ্রিত)।
৩. ইবনে হিশাম।

এ অনন্যাসর্বণনাভঙ্গির প্রশংসা করলেন। পরে তাঁরা বললেন, "বহুকালের বংশগত ধর্ম হঠাৎ পরিত্যাগ করা ঠিক নয়। তাছাড়া আমরা পারস্য সম্রাটের অধীন এবং তার সাথে আমরা এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ যে আমরা অন্য কারো অধীনতা স্বীকার করব না।" রসূলে পাক (সাঃ) তাদের সত্যবাদিতার প্রশংসা করলেন এবং বললেন, "আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর ধর্মের সাহায্য করবেন।"—(রওজুল আনফ্ হাওয়ালায়ে কাসেম ইবনে সাবেত)

আমের গোত্রের বুহাইরা ইবনে ফেরাস নামক এক ব্যক্তি রসূলে পাক (সাঃ)-এর বক্তৃতা শুনে মন্তব্য করলেন, "যদি এ ব্যক্তিকে আমি হস্তগত করতে পারি, তবে সমগ্র আরব আমার অধীন হয়ে যাবে।" অতঃপর রসূলে পাক (সাঃ)-কে বললেন, "আমরা যদি আপনাকে সাহায্য করি এবং আপনি যদি আপনার বিরুদ্ধবাদীদের উপর জয়ী হন, তবে আপনার মৃত্যুর পর আমরা নেতা হতে পারব কি?" তিনি বললেন, "তা আল্লাহ্ পাকের হাতে।" সে বলল, "আমরা আপনার ধর্মের জন্য শত্রুর সম্মুখে বুক পেতে দেব এবং রাজত্ব অন্যে করবে তা আমি চাই না।"—(তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ—১২০৫)

রসূলে পাক (সাঃ)-এর প্রতি নির্যাতন

উপরোক্ত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে কোরাইশরা রসূলে পাক (সাঃ)-এর বিরোধিতা আরম্ভ করল। তারা মনে করল, তাঁকে এমন কঠিনভাবে নির্যাতন করতে হবে যেন তিনি বাধ্য হয়ে ইসলাম প্রচারের কাজ পরিহার করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে যে সমস্ত কাফের তাঁর প্রতিবেশী ছিল (যেমন, আবু জাহল, আবু লাহাব, আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগোস, ওলীদ ইবনে মুগীরাহ, উমাইয়্যাহ ইবনে খাল্ফ, নাজর ইবনে হারেস, হাম্বাহ ইবনে হাজ্জাজ, ওকবা ইবনে আবি মুঈত ইত্যাদি) সবাই ঘোর শত্রু ছিল।—(ইবনে সা'দ ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৪)

তারা রসূলে পাক (সাঃ)-এর চলার পথে কাঁটা পুঁতে রাখত। নামাযের সময় ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। সেজদা করতে গেলে মৃত উটের নাড়ীভুঁড়ি তাঁর উপর চাপিয়ে দিত। গলায় চাদর লাগিয়ে এমন জোরে টানত যাতে শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হত। তাঁর অস্বাভাবিক মনোবল দেখে লোকে তাঁকে জাদুকর (ঐন্দ্রজালিক) বলত, নবুওতের দাবি শুনে পাগল (উন্মাদ) বলত। তিনি কোথাও বের হলে দুষ্ট ছেলে-মেয়েরা দল বেঁধে তাঁর পেছনে হৈ চৈ করতে থাকত। (মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, প্রথম খণ্ড পৃঃ ৩০২) জামাতের নামাযে উচ্চৈঃস্বরে কোরআন পাঠ করলে তারা কোরআন ও তার বাহক (রসূল) এবং পরম দয়ার আধারকে (আল্লাহ্) অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করত।—(সহীহ্ বোখারী, পৃঃ ৬৮৬)

একদিন নবী করীম (সাঃ) পবিত্র হরম শরীফে নামায পড়ছিলেন। কোরাইশ নেতৃবর্গও সেখানে উপস্থিত ছিল। আবু জাহল বলল, "কেউ যদি উটের নাড়ীভুঁড়ি এনে মোহাম্মাদ (সাঃ) যখন সেজদা করতে অবনত হয়, তখন তাঁর ঘাড়ে রেখে দিত, তবে কি মজাই না হত।" ওকবা বলে উঠল, "আমি এ কাজটি করছি।" অতঃপর নাড়ীভুঁড়ি এনে রসূলে পাক (সাঃ)-এর ঘাড়ের ওপর রেখে দিলে কোরাইশ পাষণ্ডরা আনন্দে গড়াগড়ি খেতে লাগল। এ সংবাদ শুনে রসূলে করীম (সাঃ)-এর ৫ বছরের কন্যা ফাতেমা (রাঃ) দৌড়ে এলেন এবং তাঁর পিতার পিঠের উপর থেকে তা সরালেন এবং উকবাকে অভিসম্পাত করতে লাগলেন। —(সহীহ্ বোখারী বাবু-তাহারাত ওয়াল জিযিয়া ওয়াল জিহাদ এবং সহীহ্ মুসলিম যারকানী ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৪)

রসূলে পাক (সাঃ) যখন কোন জনসমাবেশে ইসলাম সম্পর্কে বক্তৃতা করতেন, তখন আবু লাহাব অবিরতভাবে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে থাকত। সাহাবী বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রসূলে পাক (সাঃ)-কে একদিন যুল-মাজাযের বাজারে দেখতে পাই। তিনি জনতার ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করে জনগণকে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পড়তে বলেছেন। আবু লাহাব তাঁর প্রতি ধূলাবালি নিক্ষেপ করছিল এবং চিৎকার করে বলছিল, "কেউ এ ব্যক্তির প্রতারণায় পড় না; সে চায়, তোমরা লাত ও উযযার উপাসনা ছেড়ে এক আল্লাহ্ তা'আলার উপাসনা কর।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৩) তায়েফ শহরের কাফেররা তাঁকে যে অসহনীয় নির্যাতন করেছিল তার বিবরণ পূর্বেই দেয়া হয়েছে।

একদা নবী করীম (সাঃ) পবিত্র হরম শরীফে নামায পড়ছিলেন। এমতাবস্থায় ওকবা ইবনে আবি মুঈত তাঁর গলায় চাদর জড়িয়ে এমন জোরে টান দিল যে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। এমনি সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) সেখানে উপস্থিত হলেন এবং রসূলে পাক (সাঃ)-এর গলা থেকে চাদর খুলে তাঁকে ওকবার হাত থেকে রক্ষা করলেন এবং বললেন, "তুমি এমন একজন লোককে হত্যা করতে চাও, যিনি শুধু বলেন যে আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়" (সহীহ্ বোখারী বাবু মা লাকীয়ান নাবীয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আসহাবাহু বি-মক্কাতা)।

যে সমস্ত লোক রসূলে পাক (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে শত্রুতা করার জন্য সদা সচেষ্ট থাকত এবং দিবা-রাত্র তাঁর অনিষ্ট কামনায় ব্যস্ত থাকত, বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনে সা'দ তাদের নামের একটি তালিকা তৈরি করেছেন। অপর পৃষ্ঠায় তালিকাটি তুলে ধরা হল ঃ

"১। আবু জাহ্‌ল, ২। আবু লাহাব, ৩। আসওয়াদ ইবনে ইয়াগোস, ৪। হারেস ইবনে কায়স, ৫। ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা, ৬। উমাইয়্যাহ্‌, ৭। উবাই ইবনে খালফ, ৮। আবু কায়স ইবনে ফাকেহা ইবনুল মুগীরা, ৯। আ'স ইবনে ওয়ায়েল, ১০। নাজর ইবনে হারেস, ১১। মুনাব্বিহ্‌ ইবনুল হাজ্জাজ, ১২। যুহাইর ইবনে আবি উমাইয়্যাহ্‌, ১৩। সায়েব ইবনে সাইফী, ১৪। আসওয়াদ ইবনে আবদুল আসাদ, ১৫। 'আস ইবনে সাঈদ ইবনুল 'আস, ১৬। আস ইবনে হাশিম, ১৭। ওকবা ইবনে আবি মুঈত, ১৮। হাযলা, ১৯। হাকাম ইবনে আবিল 'আস, ২০। আদি ইবনে হামরা।"

এরা সবাই রসূলে পাক (সাঃ)-এর প্রতিবেশী ছিল এবং তাদের অধিকাংশই অত্যন্ত প্রভাবপ্রতিপত্তির অধিকারী ছিল।

রসূলে পাক (সাঃ) ও তাঁর অনুসারী মুসলমানদের উপর যে ধরনের অসহনীয় অত্যাচার ও নির্যাতন চালানো হয়েছিল, তা যদিও অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক ছিল, কিন্তু আশ্চর্যজনক ছিল না। কারণ, বিনাদ্বিধায় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন অপরিচিত মতবাদ গৃহীত হবার কোন উদাহরণ আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোথাও সৃষ্টি হয়নি।

হযরত নূহ্‌ (আঃ)-কে শত শত বছর পর্যন্ত স্বীয় কওমের ঘৃণা ও বিদ্বেষের মোকাবিলা করতে হয়েছে। গ্রীস বিশ্বসভ্যতার অগ্রদূত ছিল, কিন্তু সক্রেটিসকে সেখানে বিষপানে আত্মহত্যা করতে হয়েছে এবং ঈসা (আঃ)-কে ওদের অকল্পনীয় নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে।

সুতরাং আরব ও কোরাইশরা যা করেছে তা নিতান্ত অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। তবে লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে রসূলে পাক (সাঃ) তাদের বিরুদ্ধে কি কর্মপন্থা গ্রহণ করলেন?

সক্রেটিস হলাহলপূর্ণ পেয়ালা পানে মৃত্যুবরণ করেছিল এবং হযরত নূহ্‌ (আঃ) কাফেরদের বিরোধিতায় অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট মহাপ্রলয়ের জন্য প্রার্থনা করায় বিশ্বের একটি বিরাট অংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। হযরত ঈসা (আঃ) মাত্র ৩০/৪০ জন মানুষকে সুপথে আনার পরই খৃষ্টানদের মতে, শূলে চড়ে প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু রসূলে পাক (সাঃ)-এর দায়িত্ব তাঁদের সবার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হযরত ইবনুল আরাত নামক সাহাবী যখন কোরাইশদের অত্যাচার ও নির্যাতনে নিতান্ত কাতর কণ্ঠে রসূলে করীম (সাঃ)-এর দরবারে নিবেদন করলেন, "হুযুর! আপনি তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে অভিযোগ করেন না কেন?" একথা শুনে রসূলে পাক (সাঃ)-এর মুখমণ্ডল ক্রোধে লাল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "তোমাদের পূর্বে এমন অনেক নবী পৃথিবীতে এসেছিলেন, যাঁদের দেহে করাত চালিয়ে দু'ভাগ করা হয়েছে, তথাপি নিজ কর্তব্য সম্পাদনে তাঁরা

বিরত হননি। আল্লাহ্ পাক পবিত্র ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে বিজয়দান করার ফলে দেশময় এমন শান্তি স্থাপিত হবে যে কোন উষ্ট্রারোহী সানা থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত একা নিঃশংকচিত্তে ভ্রমণ করতে পারবে এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাকেও তার ভয় করার থাকবে না।" (বোখারী, যিকরে মা-সালকিয়ান্নাবী (সাঃ) ওয়া আসহাবাহু মিনাল মুশরিকীন, ওয়া যিকরে আইয়ামে জাহেলিয়াহ) পরবর্তীকালে এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতেই বিশ্ববাসী দেখেছে।

মদীনা মোনাওয়ারা ও আনসার সম্প্রদায়

সূর্যোদয়ের পর যেভাবে তার আলো সারা বিশ্বময় বিকশিত হয়, কাননে প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশির মনোমুগ্ধকর সুগন্ধ যেভাবে মলয় প্রবাহে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক তেমনিভাবে মক্কায় উদিত ইসলাম-রবির উজ্জ্বল কিরণ মক্কা থেকে দূরে অবস্থিত মদীনাবাসীকেও উদ্ভাসিত করছিল, মুখরিত করে তুলছিল ইসলামের অমিয় বাণীতে মদীনাবাসিগণের হৃদয়-মন।

মদীনার আসল নাম ছিল ইয়াসরেব। মহানবী (সাঃ)-এর এখানে শুভাগমনের পর এর নামকরণ করা হয় মদীনাতুন্নবী বা নবীর শহর। অতঃপর এটি সংক্ষেপে 'মদীনা' নামে খ্যাতিলাভ করে।

এ শহর সুদীর্ঘকাল থেকেই আবাদ ছিল। আদিযুগে ইহুদীরা এখানে বসতি স্থাপন করে। ফলে, অধিক হারে এখানে তাদের বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে। পরবর্তীকালে তারা মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকাও দখল করে নেয়। তারা মদীনা ও তার উপকণ্ঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ নির্মাণ করে বসবাস করত।

বস্তুত আনসার সম্প্রদায় ছিল কাহ্তান বংশোদ্ভূত ইয়ামনের অধিবাসী। ইয়ামনে যখন বিখ্যাত প্লাবন 'সয়লে ইরাম' আসে, তখন এরা সেখান থেকে বেরিয়ে মদীনায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে। 'আওস' ও 'খাযরাজ'—এ দু'ভ্রাতার উত্তরপুরুষরাই প্রধানত 'আন্সার' নামে পরিচিত ছিলেন। আন্সারের সমস্ত গোত্র এ ভ্রাতৃদ্বয়েরই বংশধর।[১] এ সম্প্রদায় যখন মদীনায় আসে তখন ইহুদীরা বিপুল ক্ষমতাবান ও প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী ছিল। পার্শ্ববর্তী স্থানগুলোও তাদের দখলে ছিল এবং ধনৈশ্বর্যের কোন অভাব তাদের ছিল না। যেহেতু বংশবৃদ্ধির ফলে তারা কুড়ি-একুশ গোত্রে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, তাই বহু দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তাদের বসতি বিস্তৃত হয়। আনসারগণ তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু অবশেষে তাদের প্রভাবপ্রতিপত্তি দেখে তাদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে।[২]

১. আনসার সম্প্রদায়ের বংশপরিচয় এবং মদীনায় তাদের বসতি স্থাপনের বিস্তারিত বিবরণ 'অফাউল অফা' নামক গ্রন্থের ১ম খণ্ড ১১৬-১৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২. যেসব গোত্র পরস্পরের সহায়তা ও অংশীদারদের চুক্তি সম্পাদন করে তাদেরকে "হালীফ" বা মিত্র বলা হয়।

দীর্ঘকাল যাবৎ এ অবস্থাই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু পরে আনসারদের বংশবৃদ্ধি ঘটে এবং ক্রমে তারা ক্ষমতাশালী হতে থাকলে ইহুদীরা ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তাদের সাথে পূর্বস্বাক্ষরিত সন্ধিচুক্তি বাতিল করে দেয়।

নৈতিক দিক দিয়ে ইহুদীরা ছিল বিলাসপ্রিয়, চরিত্রহীন, লম্পট প্রকৃতির। তাদের সমাজপতির নাম ছিল ফাতিয়ুন। এ হতভাগ্য নরাধম নির্দেশ দেয় যে সমস্ত যুবতী কন্যাকে বিয়ের পূর্বে তার সাথে মিলিত হতে হবে। শয়তান ফাতিয়ুনের এ নির্দেশ ইহুদীরা বিনাপ্রতিবাদেই মেনে নেয়। কিন্তু যখন আনসারদের পালা আসে, তারা এর কড়া প্রতিবাদ জানায়। আনসারদের এক দলপতি ছিলেন মারেক ইবনে আজলা। সে সময় তাঁর এক ভগ্নীর বিয়ে স্থির হয়। বিয়ের দিনই সে ঘর থেকে বের হয়ে আসে এবং তার ভ্রাতা মালেকের সামনে দিয়ে বেপর্দায় চলে যায়। মালেক তার বোনের এ আত্মমর্যাদাহানিকর আচরণে নিজেকে খুবই অপমানিত বোধ করেন। ঘরে ফিরে বোনকে তিরস্কার করেন। বোন উত্তর দেয়, অবশ্যই! কিন্তু কাল যে দৃশ্য দেখবে, তা যে আরো ভয়ানক, মারাত্মক। পরের দিন মালেকের বোন দুলহান সেজে ইহুদী ফাতিয়ুনের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে। এ সময় মালেকও নারীর পোশাকে বান্ধবীদের সাথে সেখানে উপস্থিত হন। সুযোগ বুঝে তারা ফাতিয়ুনকে হত্যা করে। অতঃপর সেখান থেকে তিনি সিরিয়ায় পালিয়ে যান। সিরিয়ায় তখন গাস্‌সানী রাজত্ব ছিল এবং শাসনকর্তার নাম ছিল আবু জাবাল্লা। তিনি এ ঘটনার বিবরণ শুনে এক বিরাট সেনাবাহিনীসহ মদীনায় উপস্থিত হন এবং আওস ও খাযরাজ নেতৃবৃন্দকে ডেকে এনে বিপুলভাবে পুরস্কৃত করেন। অতঃপর ইহুদী সমাজপতিদেরকে তলব করেন এবং একজন একজন করে সকলকে প্রতারণামূলকভাবে হত্যা করেন। এরপর সেখানে ইহুদী শক্তি হ্রাস পেতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে আনসাররা শক্তিশালী হয়ে ওঠে।[১]

আনসারেরা মদীনা ও তার উপকণ্ঠে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ নির্মাণ করে। আওস ও খাযরাজ গোত্র এ পর্যন্ত একতাবদ্ধ থাকলেও আরবদের স্বভাব অনুযায়ী পুনরায় তারা গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে মারাত্মক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আরম্ভ হয়। "বোআস" যুদ্ধ ছিল তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ও ভয়ানক। এতে উভয়পক্ষের প্রায় সমস্ত বিশিষ্ট নেতাই প্রাণ হারায়। এভাবে আনসাররা এতই দুর্বল হয়ে পড়ে যে শেষ পর্যন্ত কোরাইশদের নিকট দূত পাঠিয়ে তাদেরকে মিত্র হিসাবে গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু কোরাইশ দলপতি আবু জাহল সমস্ত ব্যাপারটাই পণ্ড করে দেয়।

---

১. 'অফাউল অফা' গ্রন্থে এই ঘটনার বিভিন্ন দিক বর্ণিত হয়েছে এবং এতে এ সকল বর্ণনার উল্লেখ রয়েছে।

মদীনার আনসারগণ পৌত্তলিক ও অংশীবাদী ছিল বটে, কিন্তু সেখানকার শাস্ত্রজ্ঞ ও শিক্ষিত ইহুদী সম্প্রদায়ের সাহচর্য ও প্রভাবের ফলে নবুওত এবং আসমানী কিতাব কিংবা একেশ্বরবাদ সম্পর্কে তারা অবিদিত ছিল না। ইহুদীদের সাথে আনসারদের শত্রুতা থাকলেও তাদের জ্ঞানচর্চা ও বিদ্যাবুদ্ধিকে স্বীকার করতে আনসাররা কুণ্ঠাবোধ করত না। ইহুদীরা মদীনায় যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিল এবং যেগুলোকে তারা 'বাইতুল মাদারেস' বলত, তাতে তওরাতের শিক্ষা দেয়া হত। বোখারী প্রভৃতিতে সেগুলোর নাম উল্লেখ আছে।[১]

আনসাররা ছিল শিক্ষা-দীক্ষায় পশ্চাদপদ। তাই তাদের ওপর ইহুদীরা জ্ঞান-বুদ্ধি ও শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে অহেতুক প্রভাব বিস্তার করত। কিন্তু আনসারদের মধ্যে যাদের সন্তান-সন্ততি জীবিত থাকত না, তারা মানত করত যে সন্তান জীবিত থাকলে তাকে ইহুদীধর্মে দীক্ষিত করা হবে।[২] ইহুদীরা সাধারণভাবে বিশ্বাস করত যে অতঃপর আরো একজন নবীর আবির্ভাব হবে। তাই আনসাররাও একজন প্রতিশ্রুত নবীর নাম সম্পর্কে অবগত ছিল।

আনসারদের মধ্যে সুভায়দ ইবনে সামেত একজন বিশিষ্ট কবি ও বীর যোদ্ধা ছিলেন। হযরত লোকমানের (আঃ) উপদেশাবলী সংবলিত 'নুসখা' বা পুস্তক (আমসালে লোকমান) তাঁর হস্তগত হয়। তিনি সেটিকে ঐশী গ্রন্থ মনে করতেন। একবার তিনি হজ পালন করতে যান। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) জানতে পেরে স্বয়ং তার সাথে সাক্ষাত করতে যান। সুভায়দ হযরত লোকমানের (আঃ) পুস্তক পাঠ করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে শুনাল। সেটি শুনে মহানবী (সাঃ) বললেন, "আমার নিকট এর চাইতেও উত্তম জিনিস আছে"। এ বলে তিনি পবিত্র কোরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করেন। সুভায়দ তার প্রশংসা করেন।[৩] তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে "বোআস" যুদ্ধে নিহত হন। তবে তিনি ইসলামে বিশ্বাসী ছিলেন।

সুভায়দ বীরত্ব ও কাব্যচর্চায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। আরবগণ এ ধরনের গুণী ব্যক্তিকে 'কামেল' বা 'পরিপূর্ণ' বলত এবং এ কারণে তাঁকেও এ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[৪]

১. বোখারী ২য় খণ্ড, ১০২৭—পৃষ্ঠা।
২. তফসীর গ্রন্থসমূহ "ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই" এ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
৩. আল-বেদায়া ওয়ান্নেহায়া, ইবনে কাসীর ৩য় খণ্ড, ১৪৭— পৃঃ।
৪. ইবনে হিশামে সুভায়দের উল্লেখ আছে। কিন্তু রওযাতুল আনফে আরও বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। 'এসাবাতে'ও তার বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর বংশ সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে এবং তাতে হযরত লোকমানের উপদেশাবলীর কোন উল্লেখ নেই।

সুভায়দের যে ইসলামী অনুপ্রেরণা ও গভীর অনুরাগ ছিল, তা আনসারদের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল। আওস ও খাযরাজদের সংঘর্ষে আওসদের পরাজয় হলে এ গোত্রের দলপতিরা কোরাইশদের নিকট গিয়ে খাযরাজদের মোকাবিলা করার জন্য তাদেরকে মিত্র হিসাবে গ্রহণ করার অনুরোধ জানায়। এ প্রতিনিধিদলে ইয়াস ইবনে মাআযও ছিলেন। রসূলে পাক (সাঃ) যখন তাদের আগমনের খবর জানতে পারেন, তখন স্বয়ং তিনি এ আওস দলপতিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং কোরআন করীমের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনান। ইয়াস তার সঙ্গীদেরকে বললেন, "আল্লাহুর কসম! তোমরা যে উদ্দেশে এখানে এসেছ এটি তা অপেক্ষাও উত্তম কাজ।" কিন্তু কাফেলার নেতা আবুল হীস একখানা প্রস্তরখণ্ড নিয়ে ইয়াসের মুখের দিকে নিক্ষেপ করে বলল, "আমরা এসব জানার জন্য আসিনি।" অতঃপর 'বোআস' যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং ইয়াস রসূলে পাক (সাঃ)-এর হিজরত বা দেশত্যাগের পূর্বে ইন্তেকাল করেন। কথিত আছে যে ইন্তেকালের সময় ইয়াসের কণ্ঠে আল্লাহু আকবার তকবীর উচ্চারিত হচ্ছিল।[১]

আনসারদের ইসলাম গ্রহণের সূচনা

মহানবী হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর নিয়ম ছিল যে তিনি হজের মওসুমে বিভিন্ন গোত্রের দলপতি ও নেতৃবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের মাঝে ইসলাম প্রচার করতেন। সে বছর (নবুওতের দশম বছর, রজব মাস) তিনি বিভিন্ন গোত্রের নিকট গমন করেন। আকাবার নিকট বর্তমানে যেখানে মসজিদে আকাবা অবস্থিত, সেখানে খাযরাজ গোত্রের কতিপয় লোকের সাথে হযরতের সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি তাদের নাম, বংশপরিচয় ইত্যাদি জিজ্ঞেস করেন। আগত এসব বিদেশী লোক নিজেদেরকে খাযরাজী বলে পরিচয় দেয়। হযরত তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান এবং পবিত্র কোরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনান। তারা একে অপরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। অতঃপর তারা বলে, "দেখুন! ইহুদীরা যেন আমাদেরকে পরাজিত করতে না পারে।" একথা বলে সকলেই একযোগে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। এরা সংখ্যায় ছিলেন ছয়জন।[২]

এদের নাম এই—

১। আবুল হাইসাম ইবনে তাইয়েহান।

---

১. এ ঘটনা তাবারী ও এসাবা গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণিত রয়েছে। বলা হয়েছে যে ইয়াসের জীবনী ইমাম বোখারী তাঁর 'তারীখে কবিরে' লিপিবদ্ধ করেছেন। আল-বেদায়া ওয়ান্নেহায়া, ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড ১৪৮ পৃঃ।

২. মদীনার এসব লোক সর্বপ্রথম ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। কোন কোন সীরাত লেখক এ ঘটনাকে আকাবার প্রথম বাইআত বলে উল্লেখ করেছেন।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

২। আবু উমামা আসআদ ইবনে যোরারা। সাহাবাদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম হিজরী এক সনে পরলোকগমন করেন।

৩। আওফ ইবনে হারেস, ইনি বদর যুদ্ধে শাহাদতবরণ করেন।

৪। রাফে ইবনে মালেক ইবনে আজলান, বিগত দশ বছর যতটুকু কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়েছিল হযরত তার এক প্রস্থ নকল তাঁর হাতে সমর্পণ করেন। তিনি ওহুদ প্রান্তরে শহীদ হন।

৫। কোৎবা ইবনে আমের ইবনে হাদীদা, আকাবার তিনটি বাইআতেই তিনি অংশগ্রহণ করেন।

৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (ইবনে রোবার)। প্রসিদ্ধ সাহাবী জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ছাড়া ইনি অন্য একজন ছিলেন। বদর ও অন্যান্য সমরে ইনি অংশগ্রহণ করেন।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

যখন পাঠকবর্গ হাকেমে মোস্তাদরেক ২য় খণ্ড, ৬২৪ পৃঃ, ইবনে কাসির, ফতহুল বয়ানের টীকা নবম খণ্ড ৪৪৩ পৃঃ প্রভৃতি গ্রন্থে প্রথম আকাবার বাইআতে বার ব্যক্তির নাম দেখেন, তখন সেটা তাদের জন্য বিভ্রান্তিকর মনে হয়।

বর্ণনার এ পার্থক্যের দরুন কোন কোন সীরাত লেখক আকাবার ২য় বাইআতে ১২ এবং কেউ কেউ ৭৩ জন উল্লেখ করেছেন। বস্তুত প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা ছয় বা আটজন। এ ঘটনাকে আকাবার প্রথম বাইআত বলা হয় না বরং আনসারদের ইসলাম গ্রহণের সূচনা বলা উচিত। পরবর্তী বছর যখন ১১/১২ জন হযরতের দরবারে উপস্থিত হয় তখন সেটিকে আকাবার ১ম বাইআত বলা হয়ঈরাতে হালবিয়া ২য় খণ্ড পৃঃ ৮) হযরত ওবাদা ইবনে সামেতের স্পষ্ট বর্ণনা এই যে গত বছর ১ম আকাবায় আমরা ১১ জন ছিলাম। মোস্তাদরেক ২য় খণ্ড, ৬২৪ পৃঃ। হযরত ওবাদার এই বর্ণনায় গত বছর দ্বারা ১ম আকাবার বাইআত বুঝান হয়েছে। এ বর্ণনায় ১১ জনের উল্লেখ আছে। অর্থাৎ, ইতিপূর্বে যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আকাবার ১ম বাইআতের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই।

যারা আনসারদের ইসলাম গ্রহণের সূচনাকে আকাবার ১ম বাইআত বলেন, তাদের মতে আকাবার বাইআত তিনবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অর্থাৎ ১ম আকাবার বাইআত। দ্বিতীয় আকাবার বাইআত আকাবার বাইআতে এগারজন লোক উপস্থিত ছিল। তৃতীয় আকাবার বাইআতে ৭৩ জন ইসলামধর্মে দীক্ষালাভ করেন। এ তিনটি ঘটনাই এক বছরের ব্যবধানে হজের মওসুমে অনুষ্ঠিত হয়। আর যারা আনসারদের ইসলাম গ্রহণের সূচনার ঘটনাকে কেবল আনসারদের ইসলাম গ্রহণের সূচনা বলে আখ্যায়িত করতে চান, তারা একাদশ ব্যক্তির আকাবার বাইআত এবং ৭৩ ব্যক্তির বাইআতকে আকাবার ২য় বাইআত আখ্যায়িত করেন। তারীখে খামিস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৬, ৩১৬, ৩১৭ এবং যারকানী পৃঃ ৩৬২ ও ৩৬৭ দ্রষ্টব্য।

এ সকল ঘটনা ইতিহাস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। আমরা যারকানীর বর্ণনার অনুসরণ করছি। কেননা, তাতে বিভিন্ন ধরনের সকল বর্ণনা একত্রিত করা হয়েছে। সে সকল লোকের সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ আছে।

এ সংখ্যা কেউ কেউ আটজন বলেছেন। আসআদ ইবনে যোরারা ও আবুল হাইসাম প্রথম থেকেই উপস্থিত ছিলেন বলে ইবনে সা'দ তবকাতে উল্লেখ করেন। ৩য় খণ্ড বদরের আনসাররা অধ্যায় ২২ পৃঃদ্রঃ।

আকাবার প্রথম বাইআত

নবুওতের একাদশ বছর

পরের বছর বারজন মদীনাবাসী পূর্বকথিত আকাবা নামক স্থানে হযরতের (সাঃ) সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলামধর্মে দীক্ষিত হন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁরা হযরতকে (সাঃ) বলেন যে আমাদেরকে ইসলামের আহকাম শিক্ষা দিতে পারেন এমন একজন লোক আমাদের সঙ্গে দিলে ভাল হত। হযরত (সাঃ) তখন তাঁর একজন অতি প্রিয় সাহাবী মোসআব ইবনে ওমাইরকে তাদের সঙ্গে মদীনায় পাঠান। মোসআব ইবনে ওমাইর হাশেম বিন আবদে মানাফের পৌত্র এবং প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পতাকা তিনিই বহন করেছিলেন। মদীনায় আসার পর সেখানকার বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত দলপতি আসআদ ইবনে যোরারার বাড়িতে অবস্থান করতে থাকেন। মোসআবের নিয়ম ছিল যে রোজ তিনি এক-একটি ঘরে গিয়ে মদীনাবাসীকে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি আহ্বান জানাতেন এবং কোরআন পাঠ করে শোনাতেন। মোসআবের এ শিক্ষা ও প্রচারের ফলে প্রতিদিন দু'একজন করে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। ক্রমে মদীনা থেকে কোবা পর্যন্ত প্রত্যেক ঘরেই ইসলামের আলো বিস্তার লাভ করে। কেবল খাত্‌মা, ওয়ায়েল এবং ওয়াকেফের কতিপয় লোক ছাড়া সর্বত্র ইসলাম প্রচারিত হয়ে যায়। ইবনে সাদ 'তবকাতে' এ সমস্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দান করেছেন।

হযরত সা'দ ইবনে মাআয ছিলেন আওস গোত্রের দলপতি। স্বগোত্রে তাঁর এত প্রভাবপ্রতিপত্তি ছিল যে প্রত্যেকটি কাজ তাঁরই ইঙ্গিতে চলত। মোসআব যখন তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান, তখন প্রথমে তিনি ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কিন্তু মোসআব যখন পবিত্র কোরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনান, তখন সা'দ ইবনে মাআযের হৃদয় বিগলিত হয়ে যায় এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আওস গোত্র ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়।

আকাবার দ্বিতীয় বাইআত

নবুওতের দ্বাদশ সন

পরের বছর অর্থাৎ নবুওতের দ্বাদশ সনে হজের মওসুমে মদীনা থেকে একদল লোক তীর্থ ও বাণিজ্য উপলক্ষে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে। এদের সঙ্গে কিছুসংখ্যক পৌত্তলিকও ছিল। এরা সংখ্যায় ছিল ৭২ জন। মক্কায় আসার পর তারা পৌত্তলিক সঙ্গীদের থেকে সরে গিয়ে গোপনে মিনা নামক স্থানে (আকাবায়) মিলিত হয় এবং হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর হাতে দীক্ষা গ্রহণ কর। তখন সেখানে হযরতের পিতৃব্য হযরত আব্বাসও উপস্থিত ছিলেন। তিনি

তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। হযরত আব্বাস আনসারদের উদ্দেশে এ মর্মে এক ভাষণ দান করেন ঃ "হে খাযরাজ গোত্র! মোহাম্মদ (সাঃ) হাজার হোক আমাদেরই লোক। তাঁর সম্ভ্রম ও মহত্ত্ব সবাই স্বীকার করে। শত্রুদের মোকাবিলায় আমরা সব সময় তাঁর সাথেই আছি। এখন আপনারা তাঁকে স্বদেশে নিয়ে যেতে চাইছেন। ভেবে দেখুন, মৃত্যু পর্যন্ত যদি তার সাথে থাকতে পারেন, ভাল কথা, নতুবা এখনই বুঝে দেখুন।"

হযরত আব্বাসের বক্তব্য শেষ হলে, হযরত বারা আনসারদের পক্ষ থেকে হযরতের উদ্দেশে বললেন, "আমরা তরবারির নিচে লালিত-পালিত, যুদ্ধ-বিগ্রহ আমাদের অজ্ঞাত বিষয় নয়, পুরুষানুক্রমে আমরা তাতে বিশেষভাবে অভ্যস্ত।" বারার বক্তব্যে বাধা দান করে আবুল হাইসাম কথার মোড় পরিবর্তন করে বলতে লাগলেন, "হে আল্লাহর রসূল! স্বদেশে ইহুদী ও অন্য জাতির সাথে দীর্ঘকাল ধরে আমাদের বন্ধুত্ব ছিল এবং নানা রকম সম্পর্কে আমরা পরস্পর সম্পর্কিত রয়েছি। হযরত! আপনার নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর তাদের সাথে আমাদের আর কোন সম্পর্ক থাকছে না, তারা আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। আমরা সে জন্য প্রস্তুত, কিন্তু আপনার কাছে আমাদের জিজ্ঞাস্য, এর বিনিময়ে আমরা কি পাব? ইসলাম যখন জয়যুক্ত হবে এবং আপনি শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হবেন, তখন আপনি কি আমাদেরকে ছেড়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন?"

হযরত ঈষৎ হেসে বললেন, "না, কখনই না। তোমাদের সাথে আমার জীবন-মরণের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে গেছে। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, সমরে-শান্তিতে, জয়ে-পরাজয়ে সর্বাবস্থায় আমি তোমাদেরই সঙ্গে থাকব। আর তোমরা বিনিময়ে পাবে মুক্তি, অনন্ত স্বর্গ, আল্লাহর সন্তোষ।"

অতঃপর হযরত (সাঃ) আনসারদের মধ্য থেকে বারজনকে প্রতিনিধি মনোনীত করলেন। এদের নামও স্বয়ং তিনি ঠিক করলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন নয়জন খাযরাজ বংশীয়। ইবনে সা'দ এ সকল প্রতিনিধির নাম নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেন —

১। উসাইদ ইবনে হোযাইর। তাঁর পিতা 'বোআস' যুদ্ধে আওসের দলপতি ছিলেন।

২। আবুল হাইসাম ইবনে তাইয়েহান।

৩। সা'দ ইবনে খায়সামা। ইনি বদর যুদ্ধে শহীদ হন।

৪। আসআদ ইবনে যোরারা। পূর্বে উল্লিখিত এ ব্যক্তি নামাযের ইমাম ছিলেন।

৫। সা'দ ইবনে ওবাদা। ওহুদ যুদ্ধে শাহাদতবরণ করেন।

৬। আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা। প্রসিদ্ধ কবি, মূতা অভিযানে ইনি শহীদ হন।

৭। সা'দ ইবনে ওবাদা। প্রসিদ্ধ সাহাবী, সকীফায়ে বনী সায়েদায় ইনি সর্বপ্রথম খেলাফতের দাবি করেন।

৮। মোনযির ইবনে আমর। ইনি বীরে মউনা অভিযানে শাহাদতবরণ করেন।

৯। বারা ইবনে মা'রূর। আকাবার বাইআতে ইনিই আনসারদের পক্ষ হতে ভাষণ দান করেন। হযরতের পূর্বে তিনি পরলোকগমন করেন।

১০। আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর। ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন।

১১। ওবাদা ইবনে সামেত। প্রসিদ্ধ সাহাবী, ইনি বহু হাদীসের বর্ণনাকারী।

১২। রাফে ইবনে মালেক। ইনি ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হন।

হযরতের নিকট যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে মদীনাবাসীগণ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ ঃ

(১) আমরা এক আল্লাহ্র এবাদত করব, তাঁকে ছাড়া আর কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে উপাস্য রূপে স্বীকার করব না, কাকেও আল্লাহ্র শরীক করব না।

(২) আমরা চুরি-ডাকাতি বা অন্য কোন প্রকারের পরস্বত্ব অপহরণ করব না।

(৩) আমরা ব্যভিচারে লিপ্ত হব না।

(৪) আমরা কোন অবস্থায়ই সন্তান হত্যা, বধ বা বলিদান করব না।

(৫) আমরা কারো প্রতি মিথ্যা আরোপ করব না বা কারো চরিত্রের প্রতি অপবাদ দেব না।

(৬) আমরা প্রত্যেক সৎকর্মে হযরতের অনুগত থাকব — কোন ন্যায় কাজে অবাধ্য হব না।[১]

যখন আনসারদের কাছ থেকে বাইআত গ্রহণ করা হচ্ছিল, ঠিক তখন সা'দ ইবনে যোরারা দাঁড়িয়ে বললেন—হে আমার স্বগোত্রীয়গণ! ক্ষান্ত হও, একটু স্থির হয়ে আবার চিন্তা করে দেখ। জেনে রেখো, এটা আরব-অনারব নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। এতে করে সবাই আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। সবাই বলে উঠল, হ্যাঁ, আমরা যথেষ্ট বুঝে-শুনেই দেখেছি, এ সবকিছুর জন্যই আমরা প্রস্তুত।

আনসারদের মধ্যে যে বারজনকে প্রতিনিধি মনোনীত করা হয়, তাঁরা সবাই স্ব স্ব গোত্রের প্রধান ছিলেন। তাঁদের ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে গোটা আনসার সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করে। পরদিন ভোরে এ বাইয়াতের খবর সর্বত্র প্রচারিত হয়ে যায়। কোরাইশরা এসে আনসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে থাকে এবং

---

১. এটি বোখারীর বর্ণনা। সীরাত গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে যে এগুলো প্রথম আকাবার শর্ত ছিল। শেষ বাইআতের শর্ত ছিল এই যে মদীনার আনসারগণ হযরতের দেহ রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করবে।

তাদের সমালোচনা শুরু করে। আনসারদের সাথে যে সকল পৌত্তলিক ছিল, তারা এ গুপ্ত বাইয়াতের খবর অবহিত ছিল না। খবরটি তারা বিশ্বাস করতে পারল না। কারণ, তাদের ধারণা মতে এ ধরনের খবর তাদের কাছে গোপন থাকতে পারে না।

এবার মদীনা হল ইসলামের আশ্রয়কেন্দ্র। মহানবী (সাঃ) সাহাবিগণকে অনুমতি দান করলেন হিজরত বা দেশ ত্যাগের। কোরাইশরা এ খবর জানতে পেরে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু মক্কার নও-মুসলিমগণ সংগোপনে স্বদেশত্যাগ করতে থাকে। ক্রমে বহুসংখ্যক সাহাবী মদীনা চলে যান। শুধু হযরত রসূলে করীম (সাঃ), হযরত আবু বকর (আঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) থেকে যান। যাঁরা অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র ছিলেন তাঁরা বাধ্য হয়ে আরো কিছুদিন মক্কায় অবস্থান করতে থাকেন। নিচের এ আয়াতটি তাঁদের উদ্দেশেই অবতীর্ণ হয়েছে—

অর্থাৎ, "দুর্বল, পুরুষ, নারী ও শিশু যারা বলত, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এ শহর থেকে অব্যাহতি দাও, এখানকার লোকেরা জালেম-অত্যাচারী।" (সূরা নেসা, আয়াত-১০)।

হিজরত

সত্যের আহ্বানের জবাবে যখন সর্বদিক থেকে শত্রুর তরবারির ঝংকার ধ্বনি হতে লাগল, তখন বিশ্বপরিচালক এ দুঃসময়ে নও-মুসলিমদেরকে শান্তির নগরী মদীনার দিকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তখন স্বয়ং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অস্তিত্বই ছিল বিপন্ন, বিপর্যস্ত। জালেম শত্রুরা তাঁকে সুযোগ পেলেই হত্যা করতে উদ্যত হত। তাই হযরত (সাঃ) তখন স্বদেশ ত্যাগ বা হিজরতের জন্য আল্লাহ্‌র আদেশের প্রতীক্ষা করছিলেন। মক্কার উপকণ্ঠে বসবাসকারী প্রভাবশালী মুসলমানগণ এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে হযরতের নিরাপত্তা বিধানের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন দাওস গোত্রের একটি সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। এ গোত্রের দলপতি তোফায়েল ইবনে আমর হযরতের আশ্রয়ের জন্য তার সে দুর্গটি হযরতকে দান করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু প্রিয় নবীজী তা গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না।[১]

অনুরূপ, বনী হামদানের এক ব্যক্তি একই কথা আগ্রহের সাথে প্রকাশ করল। সে জানাল যে তার গোত্রকে সে প্রিয়তম নবীজী (সাঃ) আগমন সংবাদ পৌঁছাবে এবং পরবর্তী বছর আবার তাঁর দরবারে উপস্থিত হবে।[২] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ

১. মোসলেম শরীফ ১—৫৮।
২. মোস্তাদরেক, ২-৬১৩। যারকানী, ১-৩৫৯।

কাফেররা প্রিয় নবীজীর (সাঃ) শোয়ার ঘর অবরোধ করে। রাত গভীর হলে পর তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন অবরোধকারীদের দৃষ্টি এড়িয়ে নিজের ঘর থেকে বাইরে চলে যান। তিনি কাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে মক্কা নগরী! সমগ্র জগৎ অপেক্ষা তুমি আমার প্রিয়। কিন্তু তোমার সন্তানেরা আমাকে এখানে থাকতে দিচ্ছে না।"

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সঙ্গে আগেই কথা ছিল। উভয়ই প্রথমে 'জবলে সওরে'র গুহায় গিয়ে আত্মগোপন করলেন। আজও এ গুহাটি বিদ্যমান এবং একটা দর্শনীয় ভক্তি আবেগের স্থানরূপে সুপরিচিত।[১] হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর যুবক পুত্র আবদুল্লাহ্ রাত্রে গুহায় তাঁদের সাথে থাকতেন এবং খুব ভোরে শহরে চলে যেতেন। তিনি কাফেরদের গতিবিধি ও পরামর্শ সম্পর্কে যেসব খবর সংগ্রহ করতে পারতেন, রাতে এসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জানাতেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ক্রীতদাস সারাদিন ছাগপাল চরিয়ে রাতে গুহায় এসে হাজির হত। হুযুর (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) সেসব বকরীর দুধ পান করতেন। তিনদিন পর্যন্ত তাই ছিল তাঁদের একমাত্র খাদ্য। কিন্তু ইবনে হেশাম লিখেছেন যে প্রতিদিন সন্ধ্যায় হযরত আসমা (রাঃ) ঘর থেকে খাবার তৈরি করে গুহায় নিয়ে আসতেন। এভাবে তিনদিন গুহায় অতিবাহিত হয়।[২]

অবরোধের রাত অতিক্রান্ত হয়ে গেল। সকাল বেলায় অবরোধকারীরা ভিতরে লোক পাঠিয়ে দেখল যে বিছানার ওপর নবী করীম (সাঃ)-এর পরিবর্তে হযরত আলী (রাঃ) শুয়ে আছেন।

জালেম নরাধমরা হযরত আলীকেই (রাঃ) ধরে হরম শরীফে (কাবায়) নিয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ তাঁকে আটকে রাখার পর ছেড়ে দেয়।[৩] অতঃপর তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সন্ধানে বের হয় এবং তালাশ করতে করতে সওর গুহা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মানুষের আনাগোনার শব্দ শুনে হযরত আবু বকর (রাঃ) বিচলিত হয়ে পড়েন। প্রিয় নবীজী (সাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, "শত্রুরা এখন আমাদের এতই নিকটবর্তী যে তারা নিজেদের পায়ের প্রতি দৃষ্টি করলেই (অর্থাৎ, নিচের দিকে তাকালেই) আমাদেরকে দেখে ফেলবে।" নবী করীম (সাঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে অভয় বাণী শোনালেন ঃ

"বিচলিত হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গেই আছেন।"—(সূরা তওবা)

১. এ গুহা মক্কা থেকে তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। পর্বতের চূড়া প্রায় এক মাইল উঁচু। এখান থেকে সমুদ্র দেখা যায়। যারকানী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮০।

২. বিস্তারিত বিবরণের জন্যে বোখারী হিজরত অধ্যায় দ্রষ্টব্য। মোহাজেরীনদের গুণাবলী শীর্ষক অধ্যায়ে যে অতিরিক্ত বর্ণনা সংযোজিত হয়েছে এখানে আমরা তাও উদ্ধৃত করে দিয়েছি।

৩. তাবারী ৩য় খণ্ড পৃঃ ১২৩৪।

বর্ণিত আছে, কাফেররা যখন গুহার নিকটে পৌঁছে, তখন আল্লাহর আদেশে তৎক্ষণাৎ সেখানে বাবলা বৃক্ষ জন্মায় এবং তার শাখা প্রসারিত হয়ে নবী করীম (সাঃ) ও কাফেরদের মধ্যে আড়াল সৃষ্টি করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দুটি কবুতর এসে বাসা বাঁধে এবং তাতে ডিম দেয়। বর্তমানে হরম শরীফের কবুতরগুলো ঐ কবুতরেরই বংশজাত। মাওয়াহেবে লুদুন্নিয়ায় এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। যারকানী বাযযার প্রমুখ থেকে এ সারাংশ বর্ণনা করেছেন। অবশ্য এসব দীর্ঘ বর্ণনা ভেজালমুক্ত নয়। আলোচ্য ঘটনার আসল বর্ণনাকারী হলেন আউন ইবনে আমর। তাঁর সম্বন্ধে রেজাল শাস্ত্রের ইমাম ইয়াহীয়া ইবনে মুঈনের উক্তি হল অর্থাৎ, মোটেও গ্রহণযোগ্য নন। ইমাম বোখারী বলেন যে আউন হাদীস অস্বীকারকারী ও অজ্ঞাত বর্ণনাকারী। এ ঘটনার অপর একজন বর্ণনাকারী আবু মোসআব মক্কী। তার পরিচয় জানা যায় না। তাই আল্লামা যাহাবী 'মীযানুল এ'তেদাল' গ্রন্থে আউন ইবনে আমরের বর্ণনায় এ সকল উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এবং স্বয়ং এ বর্ণনাও উদ্ধৃত করেছেন।[১]

চতুর্থ দিন মহানবী (সাঃ) গুহা থেকে বের হন। আবদুল্লাহ ইবনে উরাইকেত নামক এক বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পথপ্রদর্শন করার জন্য মজুরীর বিনিময়ে ঠিক করা হয়। সে পথপ্রদর্শন করে সামনে চলতে থাকে। একদিন একরাত চলার পর দ্বিতীয় দিন দুপুরে যখন প্রচণ্ড গরম পড়ছিল, হযরত আবু বকর (রাঃ) চাইলেন, মহানবী (সাঃ) কিছুক্ষণ ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করুন। চারদিকে তাকিয়ে একটি প্রস্তরময় ভূমিতে কিছুটা ছায়া দেখতে পেলেন। সোয়ারী থেকে নেমে তিনি মাটি মুছে সেখানে নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন। মহানবী (সাঃ) তাতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেন। এ সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) কোথাও কিছু খাদ্য পাওয়া যায় কিনা, অনুসন্ধান করতে বের হলেন। কাছেই এক রাখাল তার মেষ ছাগল চরাচ্ছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাকে একটি বকরীর স্তন পরিষ্কার করে দিতে বললেন এবং নিজের হাতও ভালভাবে পরিষ্কার করে বকরীর দুধ দোহালেন। কাপড় দ্বারা পাত্রের মুখ ঢেকে দিলেন, যেন দুধে ময়লা বা ধুলাবালি পড়তে না পারে। হযরত আবু বকর (রাঃ) অতঃপর দুধ নিয়ে নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং দুধের সাথে সামান্য পানি মিশিয়ে মহানবী (সাঃ)-কে দিলেন। হযরত তা পান করে বললেন, "আমাদের যাত্রার সময় কি এখনো হয়নি।" সূর্য এখন ঢলে পড়েছে। এরপর তাঁরা সেখান থেকে পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন।[২]

---

১. সিরাতুন্নবী ৩য় খণ্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠায় এ সকল বর্ণনার সমালোচনা করা হয়েছে।

২. হুবহু এ বিবরণ বোখারীতে মোহাজের অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু বকরের (রাঃ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মনোভাব অবগত হওয়ার জন্য আমরা সকল খুঁটিনাটি বিষয়ের উল্লেখ করলাম।

কোরাইশরা বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে দিয়েছিল যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) অথবা হযরত আবু বকরকে (রাঃ) যে ব্যক্তি বন্দী করে আনতে পারবে, তাকে একজনের রক্তপণের সমপরিমাণ অর্থাৎ একশ'টি উট পুরস্কার দেয়া হবে। সোরাকা ইবনে জো'শুম নামক এক দুর্ধর্ষ বেদুঈন একথা শুনে পুরস্কারের লোভে অশ্বযোগে তাঁদের অনুসন্ধানে বের হল। নবী করীম (সাঃ) তখন মদীনার অভিমুখে অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেছেন। সোরাকা তিনসদস্যের এই ক্ষুদ্র কাফেলাটি দেখে ফেলল এবং দ্রুতগতিতে তাঁদের নিকটবর্তী হতে লাগল। কিন্তু তাঁদের নিকটবর্তী হওয়া মাত্র তার অশ্বটি মাটিতে পড়ে গেল। সোরাকা তখন আরবের প্রচলিত প্রথা অনুসারে তূণীর থেকে তীর বের করে যাত্রার 'ফলাফল' দেখতে লাগল। গণনার ফল নেতিবাচক হল। কিন্তু সে গণনা-ফল অগ্রাহ্য করে আবার অগ্রসর হল। এসময় সোরাকার অশ্বের পা ভূগর্ভে প্রোথিত হতে লাগল।[১]

সোরাকা ঘোড়া থেকে নেমে আবার তীর বের করে যাত্রার ফলাফল দেখতে লাগল। এবারও গণনা-ফল নেতিবাচকই হল। বার বার গণনা-ফল 'না' দেখে সোরাকা অনেকটা বিষণ্ণ ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। কিন্তু একশতটি উট প্রাপ্তির লোভ তাকে উদ্বেলিত করতে লাগল। মনে করল, সম্ভবতঃ গণনাই ভুল হয়েছে। অবশেষে নিরুপায় হয়ে সে নবী করীম (সাঃ)-এর শরণাপন্ন হল এবং সরাসরিভাবে তার আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করল। তার অনুরোধক্রমে মহানবী (সাঃ) তাকে একখানা 'নিরাপত্তাপত্র' লিখে দিতে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ক্রীতদাস আমের ইবনে ফোহায়রাকে আদেশ করলেন এবং তদনুযায়ী তিনি একখানা চর্মখণ্ডে 'নিরাপত্তপত্র' লিখে দিলেন।[২]

সৌভাগ্যক্রমে হযরত যোবায়ের (রাঃ) বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে আসছিলেন। তিনি নবী করীম (সাঃ) এবং হযরত আবু বকরের (রাঃ) খেদমতে কিছু মূল্যবান পোশাক পেশ করলেন, যা এ সংকটকালে উপকারে আসতে পারে।

ইবনে সা'দ তবকাত গ্রন্থে এ পবিত্র সফরের মনযিলসমূহের উল্লেখ করেছেন। আরবের মানচিত্রসমূহে বর্তমানে সেসকল স্থানের নাম না থাকলেও অনুসন্ধানী পাঠকগণ শুধু নাম থেকেও কিছুটা অনুধাবন করতে পারবেন। মনযিলসমূহের নাম ঃ

---

১. সোরাকা পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইরান বিজয়ের সময় শাহে ইরানের অলংকারাদি যখন গণীমতের মাল হিসাবে মুসলমানদের হস্তগত হয়, তখন হযরত ওমর(রাঃ) সেগুলো সোরাকাকে পরিধান করিয়ে প্রদর্শনী দেখেন।

২. বোখারী হিজরত অধ্যায়। এতে প্রমাণিত হয় যে বিপদের সময়ও হযরত দোয়াত-কলম সাথে রাখতেন।

(১) খারার, (২) সানিয়্যাতুল মোররা, (৩) লাক্‌ফ, (৪) মাদলাজা, (৫) মারজাহ, (৬) হাদায়েদ, (৭) আসাখির, (৮) রাবেগ (লোহিত সাগরের তীরবর্তী এ স্থানটি এখন একটি সমুদ্র বন্দর হিসাবে গড়ে উঠেছে, এখানে মহানবী (সাঃ) মাগরেবের নামায আদায় করেছিলেন।) (৯) যা-সালাম, (১০) উসানিয়া, (১১) কালেহা, (১২) আরাজ, (১৩) জাদওয়াত, (১৪) রকূবা, (১৫) আকীক, (১৬) জাসজাসা।

মহানবী (সাঃ)-এর মদীনা রওয়ানা হওয়ার খবর পূর্বেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। সমগ্র শহরবাসী প্রতীক্ষা করছিল। কচি শিশুরা গর্ব ও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে বলছিলেন যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর শুভাগমন হচ্ছে। লোকেরা ভোরে উঠেই শহরের বাইরে এসে সমবেত হত এবং দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করে নিরাশ হয়ে ফিরে যেত। একদিন অন্যান্য দিনের মতই অপেক্ষা করে সবাই ফিরে যাচ্ছিল। এমন সময় এক ইহুদী দুর্গ শীর্ষ থেকে কয়েকজন আগন্তুককে দেখতে পেল এবং অবস্থাদৃষ্টে আন্দাজ করতে পারল যে এটি মহানবী (সাঃ) কাফেলাই হবে। সে চীৎকার করে বলতে লাগল—"হে ইয়াসরাববাসীগণ! তোমরা যাঁর অপেক্ষা করছিলে তিনি এসে গেছেন।" সাথে সাথে তকবীরের আওয়াযে গোটা শহর মুখরিত হয়ে উঠল। আনসারগণ সুসজ্জিত হয়ে অধীর আগ্রহের সাথে নিজ নিজ ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।

মদীনা মোনাওয়ারা থেকে তিন মাইল দূরে যে উঁচু বসতিটি ছিল, তাকে 'আলিয়া' এবং 'কোবা' বলা হত। এখানে আনসারদের বহু পরিবার বসবাস করত। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গণ্যমান্য ও সম্মানিত ছিল আমৃর ইবনে আউফের পরিবার এবং কুলসুম ইবনে আলহাদাম এ গোত্রের নেতা ছিলেন। নবী করীম (সাঃ) সেখানে পৌঁছলে সমগ্র গোত্র বিপুল উৎসাহ-আনন্দে "আল্লাহু আকবর" ধ্বনি দিতে থাকে। এটা তাদের এক বিরাট সৌভাগ্য যে হযরত তাদের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। আনসারগণ গভীর আনন্দ সহকারে দলে দলে তাঁর খেদমতে সালাম আরজ করতে থাকেন।[১]

হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর যেসকল সাহাবী ইতিপূর্বে মদীনা আগমন করেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশ একই ঘরে অবস্থান করছিলেন। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ), মেকদাদ (রাঃ), খোবাব (রাঃ), সুহাইল (রাঃ), সফওয়ান (রাঃ), ইয়ায (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে আবি সার (রাঃ), ওয়াহাব ইবনে সা'দ (রাঃ), মোয়াম্মার ইবনে আবি সারহ (রাঃ), ওমাইর ইবনে আউফ (রাঃ) প্রমুখ এ যাবৎ কুলসুম ইবনে হাদামেরই অতিথি ছিলেন।[২]

১. বোখারী পৃঃ ৫৬০, তবকাতে ইবনে সা'দ পৃঃ ১৫৮।
২. ইবনে সা'দ তাজকেরায়ে কুলসুম ইবনে হাদাম।

হযরত আমীর হামযা (রাঃ) যিনি হুযুরের যাত্রার তিনদিন পর মক্কা থেকে রওয়ানা হন, তিনিও ইতিমধ্যে এসে পৌছলেন এবং এখানেই অবস্থান করতে থাকেন। সমস্ত ইতিহাসবিদ ও সীরাত লেখকগণ লিখেছেন যে মহানবী (সাঃ) এখানে চারদিন অবস্থান করেন। কিন্তু বোখারীতে চৌদ্দদিনের উল্লেখ আছে এবং এ বর্ণনাই অধিক যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।

এখানে নবী করীম (সাঃ)-এর প্রথম কাজ ছিল একটি মসজিদ নির্মাণ। হযরত কুলসুমের এক খণ্ড পতিত জমি ছিল। সেখানে খেজুর শুকানো হত। এতেই মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র হাতে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। এ মসজিদ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

"আত্মশুদ্ধির ভিত্তিতে যে মসজিদের বুনিয়াদ কায়েম করা হয়েছে তার হক এই যে তোমরা তাতে দণ্ডায়মান হবে, তাতে এমন লোক আছে, যারা পাক-পবিত্রতাকে পছন্দ করেন এবং আল্লাহ্ উত্তমরূপে পবিত্রতা অবলম্বনকারিগণকে ভালবাসেন।"— (সূরা তওবা, আয়াত ১৩)

মসজিদ নির্মাণের সময় মহানবী (সাঃ) কর্মীদের সাথে নিজেও কাজ করতেন। ভারী ভারী পাথর বহনের সময় তাঁর পবিত্র শরীর কুঁজো হয়ে যেত। ভক্তরা আরজ করত, "আমাদের মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক, আপনি কাজ থেকে বিরত থাকুন, কাজ করার জন্য আমরা তো আছি।" রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের অনুরোধ রক্ষা করলেও একই পরিমাণের অপর পাথর বহন করতে শুরু করতেন।[১]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহা একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনিও শ্রমিকদের সঙ্গে পাথর বহনের কাজে অংশগ্রহণ করেন এবং শ্রমিকগণ পরিশ্রান্ত হয়ে ক্লান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে যেভাবে গান করত, তিনিও তেমনি কবিতা পাঠ করতেন এবং মহানবী (সাঃ)-ও তার সঙ্গে যোগ দিতেন।[২]

افلح من يعالج المساجد ـ ويقرأ القرآن قائما وقاعدا

ولا يبيت الليل عنه راقدا ـ

"যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে এবং উঠতে-বসতে কোরআন পাঠ করে ও রাত্রে জাগ্রত থাকে, সে কৃতকার্য। হুযুরে পাক (সাঃ) প্রত্যেক ছন্দের সঙ্গে কণ্ঠস্বর মিলাতেন।

১. ওফাউল ওফা তিবরানী কবীরের বরাত সহকারে, ১ম খণ্ড, পৃঃ-১৮০।
২. ওফাউল ওফা, ইবনে শাববার বরাতসহ, ১ম খণ্ড পৃঃ-১৮১।

মহানবী (সাঃ)-এর কোবায় প্রবেশ ইসলামের একটি বিশেষ যুগের সূচনা। তাই ঐতিহাসিকগণ এ তারিখকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অধিকাংশে ঐতিহাসিক একমত যে ১৩তম নবুওত সনের ৮ই রবিউল আউয়াল (মোতাবেক ২০শে সেপ্টেম্বর ৬২২ খৃঃ) তারিখে এ ঘটনা ঘটে। মোহাম্মদ ইবনে মুসা খাওয়ারেযমী লিখেছেন যে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত, ফারসী মাসের চার তারিখে এবং রুমী ইস্কাকান্দারী ৯২৩ সনের ১০ তারিখ ছিল।[১] ঐতিহাসিক ইয়াকুবী জ্যোতির্বিদদের বরাত দিয়ে যে গ্রহসূচি পেশ করেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

সূর্য	কর্কট রাশিতে	২৩ ডিগ্রী ৬ সেকেণ্ড
শনিগ্রহ	সিংহ রাশিতে	২ ডিগ্রী
বৃহস্পতিগ্রহ	মীন রাশিতে	৬ ডিগ্রী
শুক্রগ্রহ	সিংহ রাশিতে	১৩ ডিগ্রী
বুধগ্রহ	সিংহ রাশিতে	১৫ ডিগ্রী

চৌদ্দ দিন কোবা পল্লীতে অবস্থান করার পর নবী করীম (সাঃ) মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেদিন ছিল শুক্রবার।[২] কিছুদূর যেতে না যেতেই বনী সালেম গোত্রের পল্লীর কাছে জুমার নামাযের সময় হল এবং সেখানেই তিনি জুমার নামায সম্পন্ন করলেন। জুমার পূর্বে তিনি খোৎবা দান করলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রথম জুমার নামায এবং প্রথম খোৎবা। মহানবী (সাঃ)-এর মদীনা যাত্রার সংবাদে সর্বত্র আনন্দ-উল্লাসের সাড়া পড়ে যায়। মদীনাবাসীদের মধ্যে আনন্দ উৎসাহের সীমা ছিল না। তাঁকে সাদরে সম্ভাষণ জানাবার জন্য দলে দলে ভক্তবৃন্দ সমবেত হতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাতৃকূলের আত্মীয় বনু নাজ্জারের লোকজন সুসজ্জিত হয়ে[৩] তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য কোবা থেকে মদীনায় আসতে লাগলেন। ভক্তের দল রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে থাকে।

ভক্তরা এসে অনুরোধ করতে লাগলেন, হযরত! দয়া করে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন, এ প্রাসাদ, এ ধন-সম্পদ এমন কি, প্রাণটুকু পর্যন্ত আপনার জন্য উৎসর্গ করে দিব। মহানবী (সাঃ) তাদের অনুরোধের উত্তরে কৃতজ্ঞতা সহকারে তাদের প্রতি দোয়া ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করতে থাকেন। তিনি শহরের যতই

---

১. বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ আইনী ২য় খণ্ড ৩৫৪ পৃঃ। কনস্টান্টিনোপলে প্রকাশিত আইনী গ্রন্থে মুদ্রণ প্রমাদ বশতঃ ৭৩৩ লেখা হয়েছে। সেটিকে নয় শত পড়তে হবে। রুমী মাসের দশ তারীখের পরিবর্তে আধুনিক অংক শাস্ত্রানুযায়ী ২০ তারিখ প্রমাণিত হয়। খারেযমী বৃহস্পতিবার রাত বলেছেন। কিন্তু আধুনিক হিসাব অনুযায়ী সোমবার হবে।

২. খারেযমীর হিসাব অনুযায়ী আগমনের দিন বৃহস্পতিবার ধরা হলে চতুর্দশ দিবস শুক্রবার হয়।

৩. *বোখারী বিভিন্ন* অধ্যায় যথা মসজিদ, হিজরত ইত্যাদিতে এ ঘটনার উল্লেখ আছে।

নিকটবর্তী হতে থাকেন, ততই দর্শকবৃন্দের ভিড় বাড়তে থাকে এবং মদীনার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে। প্রিয় নবীজী (সাঃ)-এর নগরে প্রবেশের সাথে সাথে অন্তপুরবাসিনী মহিলাগণ উন্মুক্ত ছাদের উপর এসে আনন্দে গাইতে লাগলেন —

طلع البدر علينا — من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا — مادعى لله داع

"চাঁদ উঠেছে, ঐ সানিয়াতুল বিদা' পর্বতমালার পেছন থেকে; সে পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হয়েছে।"

"অতএব, এ সৌভাগ্যের জন্য মদীনাবাসীর পক্ষে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য। হ্যাঁ, শুকরিয়া, অনন্তকালের জন্য অফুরন্ত শুকরিয়া।"

নিষ্পাপ বালিকারা 'দফা' বাজাতে বাজাতে গান গাইতে লাগল।

نحن جوار من بنى النّجار — ياحبذا محمد امن جار

"আমরা নাজ্জার বংশের কন্যা, আমাদের কি সৌভাগ্য! মোহাম্মদ (সাঃ) আমাদের প্রতিবেশী হবেন।"[১]

হযরত নবী করীম (সাঃ) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, " তোমরা কি আমাকে ভালবাসবে, আদর করবে?"তারা সমস্বরে উত্তর দিল, অবশ্যই। তিনি সহাস্যে তার উত্তর করিলে, " আচ্ছা বেশ, আমিও তোমাদেরকে ভালবাস, আদর করব।"

বর্তমানে যেখানে মসজিদে নববী অবস্থিত, তার সংলগ্নই ছিল হযরত আবু-আইয়ুব আনসারীর বাড়ি। নূরনবী (সাঃ) এখানে পদার্পণ করলে সমস্যা দেখা দেয়, কোথায় কার ঘরে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করবেন! কারণ, সবাই তাঁকে আপন গৃহে স্থান দিতে লালায়িত। এ সমস্যার সমাধান বের করার জন্য লটারী

১. ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খণ্ড ১৮৭ পৃষ্ঠা প্রথম কবিতাগুলো সম্পর্কে যারকানীতে হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ইবনে কাইয়্যিম 'সানিয়্যাতুল বেদা' সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছিলেন, এটি সিরিয়া নহে, মক্কার দিকে অবস্থিত, সে প্রশ্নেরও উত্তর দেয়া হয়েছে। এ সকল কবিতা হালওয়ানী ইমাম বোখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী উদ্ধৃত করছে বলে মাওয়াহেবে বর্ণিত হয়েছে।
বোখারীতে তবুক যুদ্ধ প্রসঙ্গে এসব কবিতা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ দুটি বিষয়ে কোন বিরোধ নেই। কেননা, সম্ভবতঃ উভয় ক্ষেত্রেই এ সকল কবিতা পাঠ করা হয়ে থাকবে।

দেয়া হল এবং শেষ পর্যন্ত লটারীতে হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর নাম উঠল।[১]

হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর ঘর ছিল দ্বিতলবিশিষ্ট। তিনি রসূল (সাঃ)-কে উপরতলায় অবস্থান করতে বিস্তর অনুরোধ করলেন। কিন্তু সাক্ষাৎপ্রার্থীদের বিরামহীন গমনাগমনে নানা অসুবিধা হতে পারে মনে করে হযরত (সাঃ) এ প্রস্তাবে সম্মত হননি। তিনি নিচের তলাই মনোনীত করলেন। আবু আইয়ুব মহানবী (সাঃ)-এর জন্য নিয়মিতভাবে খাবার তৈরি করে পাঠাতে থাকেন। হযরত (সাঃ) সে পাত্র হতে খাদ্য গ্রহণ করার পর যা অবশিষ্ট থাকত, ভক্ত-দম্পতি তাবাররুক জ্ঞানে পরমানন্দে তা গ্রহণ করতেন। ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে যে পাত্রস্থ খাদ্যের যেখানে হযরতের আঙ্গুলের চিহ্ন দেখা যেত, আবু আইয়ুব ঠিক সেখানেই আঙ্গুল দিয়ে তাবারক গ্রহণ করতেন।

ঘটনাক্রমে একদিন ঘরের উপর তলায় পানির পাত্র ভেঙে যাওয়ার ফলে, পানি গড়িয়ে নিচে পতিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এতে মহানবী (সাঃ)-এর কষ্ট হতে পারে মনে করে আবু আইয়ুব নিজেদের একমাত্র লেপখানার মাধ্যম সে কর্দমাক্ত পানি শুকিয়ে ফেললেন।[১]

হযরত আবু আইয়ুবের গৃহে নবী করীম (সাঃ) সাত মাস অবস্থান করেন। অতঃপর যখন মসজিদে নববী ও আশপাশের কুটীরগুলো নির্মিত হয়ে যায়, তখন তিনি স্থান পরিবর্তন করেন।

মদীনায় পদার্পণের পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) যায়েদ ও তাঁর ক্রীতদাস আবু রাফে'কে দুটি উট ও পাঁচশ' দেরহাম দিয়ে নবী দুলালী ও নবী সহধর্মিনীদেরকে মদীনায় নিয়ে আসার জন্য মক্কায় পাঠালেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর পুত্র আবদুল্লাহর কাছে পত্র লিখে দিলেন, তিনি যেন মাতা ও ভগ্নীদেরকে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় চলে আসেন। তখন হযরতের কন্যাদের মধ্যে হযরত রোকেয়া (রাঃ)

১. আবু আইউবের নাম খালেদ। সাহাবীগণের জীবনী সম্বলিত এসাবা গ্রন্থে এ নামেরই উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় এবং এ ঘটনাও সেখানে বর্ণিত হয়েছে। সীরাত ও ইতিহাসের অধিকাংশ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে মদীনায় প্রত্যেক ভক্তই যেহেতু হযরতকে তার ঘরে নিয়ে যেতে চাইতেন, তাই তিনি বললেন, আমার উট ছেড়ে দাও সেটি আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশ প্রাপ্ত। হযরতের ইচ্ছানুযায়ী উট ছেড়ে দেয়া হল, স্বাধীনভাবে সে অগ্রসর হতে লাগল। অবশেষে আবু আইয়ুব আনসারীর ঘরের সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে গেল। সুতরাং হযরত তার গৃহেই অবস্থান করলেন। কিন্তু মোসলেম শরীফে হিজরত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে ভক্তদের মধ্যে যখন হযরতকে বরণ প্রশ্নে তুমুল প্রতিযোগিতা শুরু হল, তখন হযরত বললেন, আমি বনু নাজ্জারের ঘরে অবস্থান করব। বনু নাজ্জার আবদুল মোত্তালেবের মাতুল বংশীয় ছিলেন।
এতে প্রমাণিত হয় যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইচ্ছাকৃতভাবেই এরূপ করেছিলেন। ইমাম বোখারী 'তারিখে সগীরে'-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে এ আত্মীয়তার ফলেই হযরত আবু আইউবের গৃহে অবস্থান করেছিলেন।

২. এসাবা, আবু আইউয়ুবের বর্ণনা যারকানী, কাযী আবু ইউসুফ হাকামের বরাত সহকারে এবং ওকাউল ওফা।

তাঁর স্বামী হযরত ওসমানের (রাঃ) সঙ্গে আবিসিনিয়ায় অবস্থান করছিলেন। হযরত যয়নাবকে (রাঃ) তাঁর স্বামী (সে তখনও মুসলমান হয়নি) আসতে বিরত রাখে। যায়েদ কেবল হযরত ফাতেমা (রাঃ), হযরত উম্মে কুলসুল (রাঃ) এবং নবী সহধর্মিনী হযরত সাওদা (রাঃ)-কে সঙ্গে করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর ভ্রাতা আবদুল্লাহ্‌র সঙ্গে আগমন করেন।[১]

মসজিদ ও নবী-সহধর্মিনীগণের কুটীর নির্মাণ

মদীনায় পৌছার পর হযরত নবী করীম (সাঃ) সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌র উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট কোন ব্যবস্থা না থাকায় নিজ নিজ গৃহ কিংবা যেখানেই সুযোগ হত, সেখানেই নামায আদায় করতেন।[২] নবী করীম (সাঃ)-এর বাসস্থানের কাছেই বনূ নাজ্জার গোত্রের একখণ্ড পড়ো জমি ছিল। এতে কিছু পুরাতন কবর এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খেজুর বৃক্ষ ছিল। হযরত (সাঃ) এ জমির দখলদারদের ডেকে সেটি ক্রয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তারা বলল, হযরত এ সামান্য ভূখণ্ডের জন্য মূল্যের কোনই প্রয়োজন নেই, আমরা এটি আল্লাহ্‌র রাহে দান করলাম। মূলত জমিটির মালিক ছিল দুটি পিতৃহীন বালক। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বয়ং উক্ত বালকদ্বয়কে ডেকে তাদের মতামত জানতে চাইলেন। বালকরাও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বলল, "আমরা মূল্য নেব না, আমরা এটি আল্লাহ্‌র নামে দান করছি। (তারা তখন বালক নহে— অপরিণত বয়স্ক তরুণ-যুবক ছিল। কিন্তু তথাপি হযরত তাদের এ দান গ্রহণ করলেন না)। অবশেষে হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) জমির মূল্য পরিশোধ করে দেন। অতঃপর ভূখণ্ডখানি সমান ও ভরাট করা হল এবং মসজিদ নির্মাণ আরম্ভ করা হল। সরওয়ারে দোজাহান স্বয়ং মজুরের কাজে প্রবৃত্ত হলেন। সাহাবিগণ ইটের বোঝা বয়ে আনতেন আর সমবেত কণ্ঠে পবিত্র ভাব উদ্রেককারী কোরাস সঙ্গীত ধ্বনিত হত এবং হযরতও তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইতেন।[৩]

اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْاٰخِرَةِ ـ فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةِ

হে আল্লাহ্ ! পরকালের কল্যাণই পরম কল্যাণ, এছাড়া আর কোন কল্যাণ নেই। হে আল্লাহ্ ! আনসার ও মোহাজেরগণকে ক্ষমা করে দিও।

১. ইবনে সা'দ, নারীদের প্রসঙ্গ ৪৯ পৃঃ।
২. আবু দাউদ, মসজিদ নির্মাণ অধ্যায়।
৩. বোখারী মাসজিদ, হিজরত, হজ্ব ও বয়ু অধ্যায় এবং বোখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ আইনী ২য় খণ্ড, ৩৫ পৃঃ এবং বারকানী।

বিশ্ব মুসলিমের মিলনকেন্দ্র এ প্রথম মসজিদ বাহ্যিক আড়ম্বর ও কারুকার্য হতে মুক্ত ছিল এবং এটি ছিল ইসলামের সহজ ও সরলতার জীবন্ত প্রতীক। এ মসজিদ যে সকল উপকরণ দ্বারা নির্মিত হয়েছিল তা হল, কাঁচা ইটের প্রাচীর, খেজুরের আড়া ও খেজুরপাতার ছাউনি। বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে কেবলা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু যখন কেবলা পরিবর্তন হয়ে কাবার দিকে নির্ধারিত হয়, তখন উত্তর দিকে একটি নতুন দরজা খোলা হয়। কাঁচা ইট দ্বারা মসজিদের ভিত নির্মিত হওয়ায় বৃষ্টির পানি পড়লে তাতে কাদা হয়ে যেত। একদিন সাহাবীগণ নামায পড়তে আসার সময় কিছু প্রস্তরখণ্ড নিয়ে আসেন এবং সেগুলো বিছিয়ে দিয়ে প্রস্তরখণ্ডের উপরই তাঁরা বসেন। হযরত নবী করীম (সাঃ) এ ব্যবস্থা পছন্দ করলেন এবং প্রস্তরখণ্ড বিছিয়ে সমগ্র মেঝেটিই উঁচু করিয়ে নিলেন।

মসজিদের পাশেই খেজুর শাখার ছাদবিশিষ্ট আর একটি কুটীর নির্মাণ করা হল। এর নাম ছিল 'সুফফা'। ছিন্নমূল মোহাজের, প্রিয় নবীজীর (সাঃ) সার্বক্ষণিক সঙ্গী, সেবক, ত্যাগী ও কর্মীদের এটিই ছিল আশ্রয়স্থল।

মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর মসজিদের পাশেই হযরত নবী করীম (সাঃ) তাঁর সহধার্মিনীগণের থাকার ঘর নির্মাণ করান। তখন পর্যন্ত তাঁর সহধর্মিনীরূপে কেবল হযরত সওদা (রাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ)-ই ছিলেন। সুতরাং এঁদের জন্যে দুটি ঘর নির্মিত হয়। ক্রমে আরো স্ত্রীগণের আগমনের পর আরো গৃহ নির্মিত হতে থাকে। এসব ঘরও কাঁচা ইট দ্বারাই তৈরি করা হয়। এগুলোর মধ্যে পাঁচখানা কামরা খেজুরপাতা দ্বারা তৈরি হয়। কাঁচা ইটের গৃহগুলোর অভ্যন্তরের কক্ষসমূহও খেজুরপাতার ছিল। যথাক্রমে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ), হযরত উম্মে হাবিবা (রাঃ), হযরত যয়নব (রাঃ), হযরত জুওয়ায়রিয়াহ্ (রাঃ), হযরত ময়মুনা (রাঃ) এবং হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের (রাঃ) ঘরগুলো মসজিদের পশ্চাদমুখী আর হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত সুফিয়া (রাঃ) ও হযরত সওদার (রাঃ) কক্ষগুলো অগ্রমুখী ছিল।[১] এসব ঘর মসজিদের এতই কাছে ছিল যে হযরত যখন মসজিদে 'এতেকাফ' করতেন, মসজিদ থেকে মাথা বের করে দিলে তাঁর স্ত্রীগণ তাঁদের ঘরে বসেই হযরতের মাথা ধুয়ে দিতে পারতেন।

এসব ঘরের প্রত্যেকটি দৈর্ঘ্যে দশ হাত এবং প্রস্থে ছয়-সাত হাত ছিল। ঘরগুলোর ছাদের উচ্চতা এমন ছিল যে একজন লোক দাঁড়িয়ে তা স্পর্শ করতে পারত। দরজাগুলোতে পর্দা ঝুলানো থাকত।[২] ভেতরের অবস্থা ছিল এই যে অনেকসময় রাত্রে বাতিও জ্বলত না।[৩]

---

১. তবকাতে ইবনে সা'দ, সীরাতে নববী ১৬১ পৃঃ।
২. নবীগৃহের অবস্থা, তবকাতে ইবনে সা'দ ৮ম খণ্ড ১১৭ পৃঃ এবং ওফাউল ওফায় বিস্তারিত বর্ণিত আছে।
৩. বোখারী বিছানায় নামায অধ্যায়।

মহানবী (সাঃ)-এর প্রতিবেশীদের মধ্যে যেসব সম্পদশালী আনসার বাস করতেন তাঁদের মধ্যে হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রাঃ), হযরত সা'দ ইবনে মাআয (রাঃ), হযরত ওম্মারা ইবনে হাযাম (রাঃ) এবং হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা প্রিয় নবীজী (রাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের জন্য দুধ পাঠাতেন। তাই ছিল অন্যতম প্রধান খাদ্য। হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রাঃ) নিয়মিতভাবে তাঁর বাড়ি থেকে প্রিয় নবীজীর (সাঃ) জন্য একটি বড় পাত্রে খাদ্য পাঠাতেন। কখনো তাতে তরকারি আবার কখনোবা দুধ-ভর্তি থাকত।[১] হযরত আনাসের (রাঃ) মাতা হযরত উম্মে আনাস (রাঃ) তাঁর সম্পত্তি মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে পেশ করলে, তিনি তা সাদরে গ্রহণ করে তাঁর ধাত্রী হযরত উম্মে আইমানকে (রাঃ) দিয়েছেন।[২]

আযানের সূচনা

ইসলামের প্রধান এবাদত হচ্ছে নামায আর নামাযের সাথে জামাতের সম্পর্ক অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। হিজরতের আগে এবং হিজরতের পরেও কিছুদিন পর্যন্ত জামাত অনুষ্ঠানের বিশেষ কোন ব্যবস্থা না থাকায় বিক্ষিপ্তভাবেই নামায সম্পন্ন হত। সমবেতভাবে তা সুসম্পন্ন হত না। মদীনায় মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর কিছু দিন পর্যন্ত লোকে অনুমান করে নামাজের সময় নিরূপণ করে মসজিদে আগমন করতেন। তাতে যে অসুবিধা হত তা আল্লাহর রসূল (সাঃ) বিশেষভাবে অনুভব করতেন। তাই তিনি এ অবস্থায় উদ্‌গ্রীব ছিলেন। হযরতের ইচ্ছা ছিল যে লোকদেরকে নামাযের সময় হলে ডেকে আনার জন্য কিছুসংখ্যক লোক নিয়োগ করা। কিন্তু তাতে যথেষ্ট অসুবিধাও ছিল। তাই তিনি সাহাবিগণকে নিয়ে এ সম্পর্কে পরামর্শ করতে বসলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপিত হল— কেউ কেউ বললেন, নামাযের সময় মসজিদে একটি পতাকা উড়িয়ে দেয়া হোক। এ পতাকা দেখে লোক আগমন করবে। কিন্তু হযরত (সাঃ) এ প্রস্তাব 'অপছন্দ' করলেন। কেউ কেউ প্রস্তাব করলেন, খৃষ্টানদের ন্যায় ঘণ্টা বাজিয়ে সবাইকে নামাযের সময় জানিয়ে দেয়া যেতে পারে। কেউ কেউ বললেন, ইহুদীদের মত শঙ্খধ্বনি দ্বারা সকলকে নামাযের জন্য আহ্বান করা হোক। হযরত ওমর (রাঃ)-ও পরামর্শ-সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, একটা লোক পাঠিয়ে সবাইকে ডেকে আনলে হয় না? হযরত তাঁর রায় পছন্দ করলেন এবং হযরত বেলালকে (রাঃ) বললেন,— "উঠে লোকদেরকে নামাযের জন্য

---

১. তবকাতে ইবনে সা'দ কিতাবুন্নেসা, ১১৬ পৃঃ।

২. বোখারী, দানের ফজিলত অধ্যায়, ৩৫৮ পৃঃ।

আহ্বান কর, অর্থাৎ, আযান দাও।"[৩] এতে একদিকে নামাযের সাধারণ ঘোষণা এবং অপর দিকে দিনে পাঁচবার নামাযের জন্য আহ্বান করা হয়।

সেহাহ্ সিত্তার কোন কোন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়েদই আযানের প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি স্বপ্নে আযানের শব্দাবলী অবলোকন করেছিলেন। অপর এক বর্ণনা মতে, হযরত ওমর (রাঃ)-ও এ ধরনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু বোখারীর বর্ণনার মোকাবিলায় অন্য কোন বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দেয়া যায় না।[১]

বোখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট ঘণ্টা (নাকুস) এবং শিঙ্গা (বুক) বাজাবার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) আযানের প্রস্তাব করলে হযরত (সাঃ) সে অনুযায়ী হযরত বেলাল (রাঃ)-কে ডেকে আযানের নির্দেশ দান করেন, এতে স্বপ্নের কোন উল্লেখ নেই।

পরস্পর ভ্রাতৃত্ব কায়েম

মক্কা মোয়াযযমা থেকে মদীনায় হিজরতের সময় মোহাজেরগণ তাঁদের সঙ্গে কিছুই আনতে পারেননি ; সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় স্বদেশত্যাগ করতে হয়। তাঁদের সঙ্গে স্বচ্ছল অবস্থাসম্পন্ন লোক থাকলেও যেহেতু তাঁরা মক্কার বিধর্মী কাফের-মোশরেকদের ভয়ে গোপনে হিজরত করেছিলেন, তাই তাঁরাও প্রায় রিক্ত হস্তেই মদীনায় আগমন করেছিলেন।

মোহাজেরদের জন্য আনসারদের ঘরগুলো যদিও "মেহমানখানা"রূপে অবারিত ছিল, তথাপি তাঁদের জন্য একটা স্থায়ী নিয়মিত ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। নযর-নিয়ায বা দান-খয়রাতের উপর নির্ভর করে তাঁরা জীবনযাপন করা মোটেই পছন্দ করতেন না। আত্মনির্ভরশীলতা ছিল তাঁদের কাম্য। স্বভাবত তাঁরা স্বহস্তে উপার্জন করতে অভ্যস্ত ছিলেন। এতদসত্ত্বেও মদীনায় তাঁরা যেহেতু একেবারেই বাস্তুহারা ছিলেন, তাই রসূলে করীম (সাঃ) চিন্তা করলেন যে আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে।

---

১. আবু দাউদ, আযানের সূচনা অধ্যায়, বোখারী আযান অধ্যায়; বোখারীতে যায়েদের ঘটনার উল্লেখ নেই।

২. এ বর্ণনা বোখারী ব্যতীত, মোসলেম, তিরমিযী এবং নাসাঈ গ্রন্থেও বর্ণিত আছে। কিন্তু অন্যান্য বর্ণনা এবং ওলামায়ে কেরামের গবেষণা ও অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে আসল ব্যাপারটি এ বলে মনে হয় যে হযরত ওমর (রাঃ) অন্যান্যদের মোকাবিলায় নিজের এ মত প্রকাশ করেছিলেন। যেমন, বোখারীর বর্ণনায় আছে যে "একটি লোক পাঠিয়ে সবাইকে ডেকে আনলে হয় না?" হযরত (সাঃ) তাঁর রায় পছন্দ করলেন এবং " অস্সালাতু জামেআতুন' বা নামাযের জমা'তের জন্যে সবাই সমবেত হও" ঘোষণা করালেন। অতঃপর স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবাও স্বপ্নযোগে আযানের প্রচলিত শব্দাবলী শ্রবণ করেন। হযরত (সাঃ) একে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশিত মনে করে গ্রহণ করেন এবং সে অনুযায়ী প্রচলিত আযানের নির্দেশ দান করেন। ফতহুল বারী, নববী, যারকানী, রওযুল আনুফ, আযানের সূচনা অধ্যায়ে এ সকল বিবরণ বিদ্যমান।

মদীনায় মসজিদ নির্মাণ শেষ হওয়ার পর হযরত (সাঃ) আনসারদেরকে তলব করলেন। তাঁর আহ্বানে সবাই হযরত আনাস ইবনে মালেকের (রাঃ) ঘরে সমবেত হন। তখন হযরত আনাসের বয়স মাত্র দশ বছর। উপস্থিত প্রবাসী মোহাজেরদের সংখ্যা ছিল পঁয়ত্রিশ জন। মহানবী (সাঃ) সমবেত আনসারদের উদ্দেশ্যে বললেন, " এরা তোমাদের ভাই"। অতঃপর রাসূল (সাঃ) মোহাজের ও আনসারদের মধ্য থেকে দু' দুজনকে ডেকে বলতে লাগলেন, "তোমরা ধর্ম সম্বন্ধে পরস্পর ভাইস্বরূপ" এবং এরপর থেকেই তাঁরা ভাই ভাই হয়ে গেলেন। আনসারগণ মোহাজেরদের সঙ্গে নিয়ে নিজ নিজ ঘরে চলে গেলেন। ঘরের প্রত্যেকটি জিনিস হিসাব-নিকাশ করে বললেন, এর অর্ধেক তোমার, অর্ধেক আমার। সা'দ ইবনে রবি এবং আবদুর রহমান ইবনে আওফ এ দুজনের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হল। সা'দের দুই স্ত্রী ছিল। তিনি আবদুর রহমানকে তাঁর একটি স্ত্রী গ্রহণের আহ্বান জানালেন এবং বললেন যে আমি এক স্ত্রীকে 'তালাক' দিচ্ছি, আপনি তাকে বিবাহ করে নিন। কিন্তু আবদুর রহমান কৃতজ্ঞতা সহকারে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।[১]

সে সময় টাকা-পয়সার কোন প্রচলন ছিল না,[২] বিষয়-সম্পত্তি বলতে যা বুঝাত, তা ছিল একমাত্র খেজুর বাগান ও ঘর-বাড়ি। আনসারগণ মহানবী (সাঃ)-কে অনুরোধ করলেন, এ সকল বাগ-বাসিচা আমাদের ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিন। প্রবাসী মোহাজেরগণ স্বদেশত্যাগের পূর্বে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন এবং এজন্য তাঁরা কৃষিকার্য সম্পর্কে কিছুই অবগত ছিলেন না। সুতরাং হযরত (সাঃ) তাঁদের পক্ষ থেকে আনসারদের এ প্রস্তাব নাকচ করে দেন। অতঃপর আনসারগণ প্রতিশ্রুতি দিলেন যে মোহাজেরদের কোন কাজ করতে হবে না, আমরাই তাঁদের সকল কাজ-কারবারের ব্যবস্থা করে দেব। সমস্ত কাজ আমরাই সমাধা করব। কেবল উৎপাদিত সম্পদের অর্ধেক অংশ তাঁরা ভোগ করবেন। মোহাজেরগণ এ প্রস্তাব মনজুর করেন।[৩]

আনসার ও মোহাজেরদের এ ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সত্যিকারের আত্মীয় সম্পর্কে পরিণত হয়ে গেল। কোন আনসারের মৃত্যু হলে তার বিষয়-সম্পত্তি ও অর্থ-সম্পদের অধিকারী হত মোহাজের এবং তার ভাই বঞ্চিত থাকত।[৪] এ ব্যবস্থা আল্লাহর এ আদেশেরই বাস্তবরূপ ছিল ঃ

---

১. ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের উল্লেখ এবং এক একজনের নাম ইবনে হিশামের ১৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। আব্দুর রহমানের ঘটনা বোখারীর, নবীর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

২. বোখারী , ৩১৩ পৃষ্ঠা

৩. সহীহ বোখারী, ৩১২ পৃষ্ঠা।

৪. বোখারী কিতাবুত্ তাফসীর আয়াত — وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে। (তাঁরা এবং মদীনার সে সকল বিশ্বাসীগণ) যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে তাঁরা একে অন্যের 'ওলী' বা নিকটাত্মীয়"। সূরা আনফাল—১০

বদর যুদ্ধের পর যখন মোহাজেরদের এ সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল না, তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

"উত্তরাধিকারিগণের একজন অন্যজন অপেক্ষা উত্তম।"

অর্থাৎ, সে সময় থেকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনজনিত এ উত্তরাধিকার স্বত্ব রহিত হয়ে যায়। তফসীর ও হাদীস গ্রন্থসমূহে বিষয়টি স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ রয়েছে। চতুর্থ হিজরী সালে বনূ নাযীর যখন নির্বাসিত হয় এবং তাদের বিষয়-সম্পত্তি ও খেজুর বাগান মুসলমানদের দখলে চলে আসে। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আনসারদেরকে ডেকে বললেন, মোহাজেরগণ দরিদ্র, তোমরা সম্মত হলে কেবল নতুন দখলকৃত এলাকা তাদেরকে দেয়া যেতে পারে এবং তোমাদের খেজুর বাগানগুলো তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া যায়। তাঁরা বললেন, আমাদের বাগানসমূহ মোহাজের ভাইদের কাছেই থাকবে এবং নতুন এলাকাগুলোও তাঁরা ভোগদখল করবেন।[১]

মদীনার আনসারগণের উদারতা ও আত্মত্যাগের এসব ঘটনার প্রশংসা না করে পারা যায় না। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে মোহাজেরদের এ ব্যাপারে কি ভূমিকা ছিল। তাঁরাও আত্মনির্ভরশীলতার যে নিদর্শন রেখে গেছেন, তাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মদীনার প্রধান ধনী ব্যক্তি সা'দ ইবনে রবী, প্রবাসী আবদুর রহমানকে প্রতিটি জিনিস হিসাব করে তার অর্ধেক গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। তখন আবদুর রহমান অতি সংযত ভাষায় ধন্যবাদ সহকারে তাঁর প্রস্তাব নাকচ করে বলেন, " ভাই, আমাকে তোমাদের বাজারের পথ দেখিয়ে দাও।" তখন সা'দ তাঁকে 'বনী কাইনোকা' বাজারের পথ দেখিয়ে দিলেন। আবদুর রহমান প্রথমে সামান্য ঘি ও পনীর কিনে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেচাকেনা করতে থাকেন। এভাবে তাঁর ব্যবসা আরম্ভ হয় এবং এদ্দারা এককালে তিনি বহু ধন-সম্পদের অধিকারী হন। অতঃপর তিনি বিয়ে করেন।[২] পরবর্তীতে তাঁর ব্যবসায় এতই উন্নতি লাভ করল যে স্বয়ং তিনি বলেন, " মাটি স্পর্শ করলেও তা সোনা হয়ে যায়।" তার বাণিজ্য-সামগ্রী শত শত উট বোঝাই হয়ে আসা-যাওয়া করত এবং যেদিন তিনি আমদানীকৃত পণ্যসামগ্রী নিয়ে মদীনায় পৌছতেন, সমগ্র শহরবাসীর মধ্যে মহা আনন্দের ধুম পড়ে যেত।[৩]

---

১. ফাতহুল বোলদান, ইউরোপে প্রকাশিত, পৃঃ ১২০।
২. বোখারীতে দুটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ ঘটনার উল্লেখ আছে। বেচাকেনার অধ্যায়, নবী কিরূপে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন অধ্যায়, মোহাজের ও আনসারদের মধ্যে নবীর ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা অধ্যায়, ওয়ালিমা একটি মাত্র বকরী হলেই যথেষ্ট অধ্যায়।
৩. উসদুল গাবা ৩য় খণ্ড ৩১৪ , ৩১৫ ইত্যাদিতে এ ঘটনার উল্লেখ আছে।

কোন কোন সাহাবী দোকান আরম্ভ করলেন। 'সাখ' নামক স্থানে হযরত আবু বকরের (রাঃ) একখানা কাপড়ের কারখানা ছিল।[১] বনু কাইনোকার বাজারে হযরত ওসমানের (রাঃ) খেজুরের ব্যবসা ছিল।[২]

হযরত ওমর (রাঃ) ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়েন।[৩] সম্ভবত তাঁর বাণিজ্য সুদূর ইরান পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল।[৪] অন্যান্য সাহাবিগণও এ ধরনের ছোট-বড় ব্যবসায়ের সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। বোখারীতে বর্ণিত আছে যে লোকে যখন প্রতিবাদ করতে লাগল যে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এত অধিক পরিমাণে হাদীস বর্ণনা করেন কেন অথচ অন্যান্য সাহাবীরাতো এত বেশি বর্ণনা করেন না। এর উত্তরে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এতে আমার অপরাধ কি হতে পারে? অন্যান্য সাহাবী বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকতেন, আর আমি দিন-রাত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত থাকতাম।

অতঃপর যখন খায়বার বিজয় হয়, তখন মোহাজেরগণ আনসারদের সমস্ত খেজুর বাগান ফেরত দেন। মোসলেম শরীফের জেহাদ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে "রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন খায়বার যুদ্ধ থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন, মোহাজেরগণ আনসারদের সকল খেজুর বাগান যা দানস্বরূপ পেয়েছিলেন তা ফেরত দেন।"

মোহাজেরদের বসবাসের জন্য আনসারদের বাড়ি সংলগ্ন অনাবাদী পতিত জমিগুলো তাঁরা মোহাজেরদের ছেড়ে দিলেন এবং যেসব আনসারের অতিরিক্ত ভূমি ছিল না, তাঁরা নিজেদের বাড়ির একাংশ ছিন্নমূল মোহাজেরদের ছেড়ে দেন। সর্বপ্রথম হযরত হারেসা ইবনে নো'মান তাঁর ভূমি দান করেন। বনু যোহরা মসজিদে নববীর সংলগ্নে বসতি স্থাপন করে। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) একটি দুর্গ তৈরি করিয়েছিলেন যাকে দুর্গ না বলে একটি গড় বলা যেতে পারে। হযরত যোবায়ের ইবনে আওফ (রাঃ) একখণ্ড জমিপ্রাপ্ত হন। হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত মেকদাদ্ (রাঃ) এবং হযরত ওবায়েদ (রাঃ)-কে আনসারগণ নিজেদের বাড়ির সন্নিকটের জমি দান করেন।[৫]

ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার জন্য একজন আনসার ও একজন মোহাজেরকে নিয়ে যে 'যুগল' নির্বাচন করা হয়, তাঁদের মধ্যে কতিপয় সাহাবীর নাম পরের পৃষ্ঠায় দেয়া হল ঃ[৬]

---

১. ইবনে সা'দ ৩য় খণ্ড পৃঃ- ১৩০।
২. মুসনাদে ইমাম হাম্বল ১ম খণ্ড ৬২ পৃঃ।
৩. মুসনাদে ইমাম হাম্বল ৪র্থ খণ্ড ৪০০ পৃঃ।
৪. ঐ ৩য় খণ্ড ৩৪৭ পৃঃ।
৫. মো'জামুল বোলদানে মদীনা মোনাওয়ারা অধ্যায়ে এর পূর্ণ বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে।
৬. এর বিস্তারিত বিবরণ ইবনে হিশামে ১৭৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত।

মোহাজের	আনসার
হযরত আবু বকর (রাঃ)	হযরত খারেজা ইবনে যায়েদ আনসারী (রাঃ)
হযরত ওমর (রাঃ)	হযরত ওত্বান ইবনে মালেক আনসারী (রাঃ)
হযরত ওসমান (রাঃ)	হযরত আওস ইবনে সাবেত আনসারী (রাঃ)
হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রাঃ)	হযরত ইবনে মা'আয আনসারী (রাঃ)
হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রাঃ)	হযরত সালাম ইবনে ওয়াক্কাস (রাঃ)
হযরত মোসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)	হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ)
হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ)	হযরত হোযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ)
হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ)	হযরত মোনযের ইবনে আমর (রাঃ)
হযরত সালমান ফারসি (রাঃ)	হযরত আবু দারদা (রাঃ)
হযরত বেলাল (রাঃ)	হযরত আবু রুওয়াইহা (রাঃ)
হযরত আবু হোযাইফা ইবনে ওতবা (রাঃ)	হযরত ওব্বাদ ইবনে বিশ্র (রাঃ)
হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ)	হযরত ওবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)

বাহ্যত ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ একটি সাময়িক প্রয়োজনেই কায়েম করা হয়, যাতে স্বদেশত্যাগী-গৃহহারা আশ্রয়হীন মোহাজেরদের কিছুদিনের জন্য অস্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু ইসলামের এ মহান উদ্দেশ্য তার পূর্ণতারই কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইসলাম নৈতিক পবিত্রতা ও মহত্ত্বের সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে। এ খোদায়ী রাজত্বের জন্য উযীর, রাষ্ট্র পরিচালক, সৈন্যাধ্যক্ষ সব রকমের যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের আবশ্যক। মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র সাহচর্যের মহিমায় মোহাজেরদের মধ্য থেকে এ সকল গুণ ও যোগ্যতার অধিকারী একটি দলের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁদের মধ্যে এমন গুণের অধিকারী লোকও ছিলেন, যাঁদের প্রশিক্ষণকেন্দ্র হতে আরো বহুসংখ্যক প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছিল। তাই যাঁদেরকে নিয়ে ভ্রাতৃত্বযুগল নির্বাচন করা হয়, তাঁদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি মহানবী (সাঃ) বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছিলেন। সবার মানসিক গতি, রুচি ও প্রকৃতি সম্যকরূপে অনুশীলন করে ঠিক যাকে যার সাথে যুক্ত করে দিলে তাদের আত্মাও পরস্পরকে গ্রহণ করতে পারে, মানব-চরিত্রের মহাপণ্ডিত হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ঠিক তেমনটি করেই এ যুগল নির্বাচন করেছিলেন। হাজার হাজার লোকের প্রকৃতি, মানসিক গতি ও রুচির সঠিক অনুশীলনই করা একটি অসম্ভব, দুঃসাধ্য ব্যাপার বই নয়। তাই স্বীকার করতে হয় যে এটা শানে নবুওতের মহিমা বৈশিষ্ট্যাবলীরই অন্যতম নিদর্শন।

হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) 'আশারায়ে মোবাশশারা' অর্থাৎ যাঁরা দুনিয়াতে থেকেই বেহেশতী হওয়ার সুসংবাদ লাভে ধন্য হয়েছিলেন তাঁদের একজন। তাঁর পিতা যায়েদ মহানবী (সাঃ)-এর নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে মিল্লাতে ইবরাহীমী বা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মাবলম্বী ছিলেন। এক কথায়, তাঁকে ইসলামের পূর্বসুরী বলা যেতে পারে। হযরত সাঈদ তাঁরই সান্নিধ্যে থেকে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। তাই ইসলামের নাম শ্রবণ করা মাত্রই তিনি এ ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। তাঁর মাতাও তাঁর সাথে কিংবা তাঁর পূর্বে ইসলামে দীক্ষালাভ করেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁরই গৃহে এবং তাঁর অনুপ্রেরণায় ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান-গরিমায় তিনি মহানবী (সাঃ)-এর একজন শ্রেষ্ঠ সাহাবী হিসাবে পরিগণিত হতেন। তাঁর সাথে কা'বের পুত্র ওবাইয়ের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। এ গৌরব অর্জনের জন্য হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে সায়্যিদুল মুসলেমীন— মুসলমানদের প্রধান নেতা বলতেন। সর্বপ্রথম ইনিই মহানবী (সাঃ)-এর মীর মুন্‌শী নিযুক্ত হন। অর্থাৎ, রসূল (সাঃ)-এর দরবারের সবকিছুই তিনি লিপিবদ্ধ করতেন। তাছাড়া কেরা'ত শাস্ত্রের ইমাম হিসাবে সবাই তাঁকে স্বীকৃতি দান করেছিলেন।[১]

হযরত আবু হোযায়ফা (রাঃ) ওতবা ইবনে রবিয়ার পুত্র। তিনি কোরাইশদের প্রধান দলপতি ও সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। এ সম্পর্কের দরুন তাঁকে হযরত ওব্বাদ ইবনে বিশরের ভাই নির্বাচন করা হয়। ওব্বাদ (রাঃ) ছিলেন আশ্‌হাল গোত্রের প্রধান।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক "আমীনুল-উম্মত" খেতাবপ্রাপ্ত ওবায়দা ইবনুল জাররাহ্ একদিকে সিরিয়া বিজয়ীর গৌরবে ভূষিত ছিলেন, অপরদিকে ইসলামের মোকাবেলায় পিতা-পুত্রের সম্পর্কও তাঁকে প্রভাবিত করতে পারত না। তাই দেখা যায়, বদর যুদ্ধে যখন তাঁর পিতা তাঁর মোকাবিলায় লড়াই করতে এল, তখন তিনি প্রথমত পিতৃত্বের অধিকার রক্ষা করেন। কিন্তু অবশেষে ইসলামের উপর পিতাকেই উৎসর্গ করতে হল। আওস গোত্রের প্রধান দলপতি সা'দ ইবনে মা'আযের সাথে তাঁর ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হয়। তাঁর মধ্যেও উদারতার-গুণ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। বনী কোরাইযা তাদের মিত্র ছিল। আরবদের প্রথা অনুযায়ী তারা মিত্রতার সম্পর্ককে রক্ত সম্পর্কের মতই মনে করত। তথাপি বনী কোরাইযার অভিযানের সময় যখন ইসলামের মোকাবিলা হয়, তখন তিনি তাঁর চারশ' মিত্র ইসলামের খাতিরেই পরিত্যাগ করেন।

---

১. ইসাবা ওবাই বিন কা'ব অধ্যায়।

হযরত বেলাল (রাঃ)-এর সাথে হযরত আবু রুওয়াইহা (রাঃ), হযরত সালমান (রাঃ)-এর সঙ্গে হযরত আবুদ দারদা (রাঃ), হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)-এর সঙ্গে হযরত হোযায়ফা ইবনে য়ামান (রাঃ), হযরত মোসআব (রাঃ)-এর সঙ্গে হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর (রাঃ) মধ্যে এমন সামঞ্জস্য ও অভিন্নতা বিদ্যমান ছিল, যার দৌলতে কেবল শিষ্য নয়, গুরুকেও শিষ্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত করে তুলত। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) মদীনায় আসার পর প্রথমে মাথায় বয়ে পনীরের ব্যবসা করতেন। প্রধান ধনী সা'দ ইবনে রাবির (রাঃ) সংশ্রবে থেকে তিনিও বিরাট অবস্থাশালী হয়ে যান।

আনসারগণ মোহাজেরদের প্রতি আতিথ্য ও মহানুভবতা প্রদর্শনের যে নজির স্থাপন করেন, তা দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল। মুসলমানেরা যখন বাহরাইন জয় করেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আনসারদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি এ এলাকা তোমাদের মধ্যে বণ্টন করতে চাই, তোমাদের কি মত? তাঁরা উত্তর করলেন, প্রথমে আমাদের মোহাজের ভাইদের জন্য সমপরিমাণ জমি দান করা হোক, এরপরই আমরা গ্রহণ করব।[১]

একদিন জনৈক ক্ষুধার্ত ব্যক্তি মহানবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থাপিত হয়ে নিজের অবস্থা জ্ঞাপন করলে, হযরত (সাঃ) প্রথমে নিজের ঘরে খোঁজ করে জানতে পারলেন, পানি ছাড়া বাড়িতে আর কিছুই নেই। তখন তিনি বাইরে এসে বললেন, "আজ কে এ ক্ষুধার্তের সেবা করবে?" হযরত আবু তালহা (রাঃ) নিবেদন করলেন, "আমি প্রস্তুত!" হযরত আবু তালহা (রাঃ) মেহমানকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি গিয়ে জানতে পারলেন যে কেবল তাঁর সন্তানদের প্রয়োজন মত কিছু খাদ্য আছে। আবু তালহা (রাঃ) ও তাঁর স্ত্রী শিশু-সন্তানগুলোকে ভুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখলেন, ঘরের বাতি নিভিয়ে দেয়া হল এবং (আরবী প্রথানুসারে) উভয়ে স্বামী-স্ত্রী সে অতিথির সঙ্গে দস্তরখানে বসে এমন ভাব দেখাতে লাগলেন যেন তাঁরাও খাচ্ছেন। কোরআন করীমের নিম্ন আয়াতটি এ ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়।[২]

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ - حشر - ١

"এবং তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হয়েও অন্যের অভাবকে নিজেদের অভাব অপেক্ষা অগ্রগণ্য মনে করে থাকে।" (সূরা হাশ্‌র-১)

---

১. সহীহ্ বোখারী আনসারদের ফযীলত অধ্যায়।
২. সহীহ্ বোখারী ও ফতহুল বারী ফাযায়েলে আনসার অধ্যায়।

সুফ্ফা ও আসহাবে-সুফ্ফা

ইসলামী পরিভাষায় আসহাবে-সুফফা একটি প্রচলিত নাম। এর মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য সম্পর্কেও সবাই অবহিত। চাতাল বা চবুতরাকে সুফ্ফা বলা হয়। মহানবী (সাঃ)-এর সহচর সাহাবিগণ সাধারণত নিজেদের দ্বীনী দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাষ-বাসের কাজে আত্মনিয়োগ করতেন। এ জন্য তাঁরা সবাই সবসময় মহানবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত থাকতে পারতেন না। কিন্তু সুফ্ফার সংসারবিরাগীদের পুত্র-পরিবার কিছুই ছিল না। সে দলের মধ্যে বিয়ে-শাদী করে গৃহী হতেন, তাঁরা বাড়ি যেয়ে চলে যেতেন। এ সর্বত্যাগীদের দল মহানবী (সাঃ)-এর সান্নিধ্যেই পড়ে থাকতেন। তাঁরা দিবাভাবে জঙ্গলে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে আনতেন এবং তা বিক্রয় করে যে মূল্য পাওয়া যেত, তা দিয়ে নিজের এবং সুফ্ফার সঙ্গিগণের জন্য খাদ্য ক্রয় করতেন।

এ ভক্তের দল রাত্রিকালে নিজেদের সে নির্দিষ্ট আবাসটিতেই এবাদত বন্দেগীতে নিয়োজিত থাকতেন এবং সেখানেই পড়ে থাকতেন। আর দিনের বেলা হযরত রসূল (সাঃ)-এর পাশে পাশে থেকে তাঁর অমিয় বাণী শুনতে থাকতেন। সর্বত্যাগী এ দলের মধ্যে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর নামও রয়েছে। এঁদের পরিধানে প্রায় দু'খানি বস্ত্র জুটত না। একখানা চাদর গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হত এবং তাই হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে থেকে তাঁরা অঙ্গাচ্ছাদন ও লজ্জা নিবারণ করত। অধিকাংশ সময় আনসারগণ খেজুর ছড়া এনে তাঁদের কুটীরের ছাদে টানিয়ে দিতেন। যেসব খেজুর কাঁদি থেকে ঝড়ে নিচে পড়ত, তাঁরা সেগুলো তুলে খেতেন। কখনো কখনো দু'দিন পর্যন্তও খাওয়ার কিছু মিলত না, অনাহারে কাটাতেন। প্রায়শ এমন হত যে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মসজিদে আগমন করে নামায পড়তেন। কিন্তু অনাহারজনিত কারণে অনেক সময় এঁদের পক্ষে দাঁড়িয়ে নামায পড়াও সম্ভবপর হত না। দুর্বলতার জন্য অনেক সময় নামায পড়তে গিয়ে তাঁরা পড়ে যেতেন। তাঁদেরকে দেখলে উন্মত্ত-উন্মাদ-উদভ্রান্ত বলে মনে হত।[১] মহানবী (সাঃ)-এর কাছে যখন কোন সদকার খাবার আসত, তিনি সম্পূর্ণভাবে তা আসহাবে-সুফ্ফার জন্য পাঠিয়ে দিতেন এবং যখন দাওয়াত বা ওলিমার খানা আসত, তখন তাঁদের ডেকে এক সঙ্গেই খেতেন। অনেক সময় এমনও হত, রাত্রিকালে হযরত (সাঃ) তাঁদেরকে আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে ভাগাভাগি করে দিতেন। অর্থাৎ, প্রত্যেকে নিজের সামর্থ্যনুযায়ী এক একজন দু' দুজন করে সাথে নিয়ে যেতেন এবং পানাহার করতেন।

---

১. তিরমিযী হযরতের সাহাবাগণের জীবন-যাপন অধ্যায়।

সাহাবীদের মধ্যে হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রাঃ) ছিলেন বিত্তশালী, উদার ও হৃদয়বান ব্যক্তি। একেক সময় তিনি আশি জন পর্যন্ত মেহমান নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতেন।[১] মহানবী (সাঃ) এসব সংসারবিরাগীদের প্রতি এতই লক্ষ্য রাখতেন যে নিজের পরিবার-পরিজনের অসুবিধা সত্ত্বেও এদের সেবাকে অগ্রাধিকার দান করতেন। একদা নবী দুলালী হযরত ফাতেমা (রাঃ) মহানবী (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, "আব্বাজান! যাঁতা পিষতে পিষতে আমার হাতে কড়া পড়ে গেছে। আপনি আমাকে একটা বাঁদী রেখে দিন।" কন্যার এ আবদারের উত্তরে হযরত (সাঃ) বললেন, "ফাতেমা! আসহাবে-সুফ্ফার লোকেরা অন্নাভাবে মারা যাবে, আর আমি তোমাকে বাঁদী দেব, এটা কি সঙ্গত হবে?"[২]

সুফ্ফার অধিবাসিগণ সাধারণত রাত্রিকালে এবাদত-বন্দেগীতে নিয়োজিত থাকতেন এবং কোরআন মজীদ অধ্যয়ন করতেন। তাঁদের জন্য একজন ওস্তাদ নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা এ ওস্তাদের কাছে কোরআন অধ্যয়ন করতেন।[৩] এ জন্য তাঁদের মধ্যে অনেকেই 'ক্বারী' নামে পরিচিত ছিলেন। বিপদসংকুল স্থানসমূহে ইসলাম প্রচারের জন্য এঁদেরকে পাঠানো হত। বীরে মউনা অভিযানে এঁদের মধ্য থেকে সত্তর জনকে ইসলাম শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল।

সুফ্ফার অধিবাসীদের সংখ্যা কম-বেশি হতে থাকত। সর্বোচ্চ তাদের সংখ্যা চারশ' পর্যন্ত উঠেছিল। আর কখনও একই সময়ে এত অধিক সংখ্যা হয়নি। চবুতরাতেও এত অধিক সংখ্যক লোকের সংকুলান ছিল না। এ সকল সংসারত্যাগী লোকের বিস্তারিত বিবরণ সংবলিত একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ ইবনুল আরাবী আহ্মদ ইবনে মোহাম্মদ আল বসরী মৃত ৩০৪ হিজরী (ইবনে মান্দার ওস্তাদ) রচনা করেছেন।[৪] সালমাও তাঁদের জীবনী সংক্রান্ত একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৫]

১. যারকানী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩০, আসহাবে সুফ্ফা ও মসজিদে নববী অধ্যায়।
২. ঐ।
৩. মুসনাদে ইবনে হাম্বল, ৩য় খণ্ড ১৩৭ পৃঃ।
৪. 'আসহাবে সুফ্ফা' শিরোনামায় একখানা পুস্তিকা হাফেজ সুয়ূতী রচনা করেন। এ পুস্তিকায় ক্রমানুসারে তিন শ' লোকের নাম উল্লিখিত হয়েছে।
৫. আসহাবে সুফ্ফার বিবরণ বোখারী মাগাযী অধ্যায় প্রভৃতি এবং মোসলেমে বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। যারকানী অন্যান্য গ্রন্থ থেকে সংকলন করে, আরও বর্ধিত করেছেন। আমি এ সকল ঘটনা বোখারী, মোসলেম ছাড়াও যারকানীর বরাতে লিখেছি। মুসনাদে ইবনে হাম্বল ৩য় খণ্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা।

মদীনার ইহুদী ও তাদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি

আরব ঐতিহাসিকদের বিবরণ অনুযায়ী, মদীনার ইহুদীরা বংশগতভাবেই বনী-ইসরাঈলের অন্তর্গত ছিল। আরবে তাদের আগমনের কারণ হল এই যে হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে আমালেকাদের মোকাবিলা করার জন্য এখানে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণাদিতে বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণিত হয় না। ইহুদীরা সমগ্র দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে গেলেও তারা নিজেদের নাম-ধাম কোথাও পরিবর্তন করেনি। আজও তারা যেখানে বসবাস করে, সেখানে ইস্রায়েলী নামই অবলম্বন করে থাকে। অথচ আরবের ইহুদীদের নাম নাযীর, কাইনোকা, মারহাব, হারেস প্রভৃতি। ইহুদী জাতি সাধারণত কাপুরুষ ও দুষ্ট প্রকৃতির হয়। তাই হযরত মূসা (আঃ) যখন তাদেরকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানলেন, তারা বলে উঠল ঃ

فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ ـ

"তুমি ও তোমার রব উভয়ে গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে থাকব।" (সূরা মায়েদা—৪)

পক্ষান্তরে[১] মদীনার ইহুদীরা অত্যন্ত সাহসী ও বীর যোদ্ধা ছিল। এ সকল যুক্তিপ্রমাণ ছাড়াও একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইয়াকুবী স্পষ্টভাবে বলেছেন যে কোরায়যা ও নযীর গোত্রের লোকেরা আরব বংশোদ্ভূত ছিল। পরে এরা ইহুদী হয়ে যায়। তিনি বর্ণনা করেছেন ঃ

"অতঃপর বনূনাযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এরা জুযাম গোত্রের একটি অংশ ছিল। কিন্তু পরে ইহুদী হয়ে গিয়েছিল এবং অপর ইহুদী গোত্র বনী কোরায়যার অবস্থাও ছিল অনুরূপ।"[২]

ঐতিহাসিক মাসউদীও কিতাবুল আশরাফ ওয়াত্‌তাম্বীহ্[৩] গ্রন্থে অপর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে এরা জুযাম গোত্রের লোক ছিল। এক সময় আমালেকা ও তাদের পৌত্তলিকতার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে মূসা (আঃ)-এর ধর্মে দীক্ষা লাভ করে এবং শাম থেকে হেজাযে স্থানান্তরিত হয়।

---

১. মিঃ মারগুলিয়থ ইহুদী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে সম্ভবতঃ এটাই সঠিক যে ইহুদীদের বিশাল বসতি এলাকায় দুটি আসল ইস্রাঈলী পরিবারও ছিল, যে সকল আরব ইহুদী হয়ে গিয়েছিল তারাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

২. য়াকুবী ২য় খণ্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা।

৩. ঐ ইউরোপে প্রকাশিত পৃঃ— ২৪৭।

এ তিনটি গোত্র হল— বনূ কাইনোকা, বনূ নাযীর এবং বনূ কোরায়যা। এদের আদি নিবাস ছিল মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ। এরা সুদৃঢ় দুর্গ ও সুউচ্চ ভবনাদি নির্মাণ করেছিল।

আনসারদের গোত্রদ্বয়—আওস ও খাযরাজ পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তাদের সর্বশেষ যুদ্ধ 'বোআস যুদ্ধ' নামে খ্যাত। এ যুদ্ধের ফলে আনসারদের শক্তি একেবারেই ধ্বংস হয়ে যায়। ইহুদীদের সর্বদা উদ্দেশ্য থাকত যাতে আওস ও খাযরাজ কখনো পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে।

এসব কারণে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন প্রথমে তাঁর কর্তব্য ছিল এসকল জাতির মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা এবং মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে সুদৃঢ় ও স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং হুযুর (সাঃ) আনসার ও ইহুদীদের ডেকে একখানা চুক্তিপত্র সম্পাদনের মাধ্যমে উভয় পক্ষ দ্বারা তা অনুমোদন করিয়ে নিলেন। এ চুক্তিপত্র ইবনে হিশামে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রয়েছে। এখানে তাঁর সংক্ষিপ্তসার উদ্ধৃত হল ঃ

(১) রক্ত বিনিময় পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে।

(২) ইহুদী সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে আপন ধর্মকর্ম পালন করতে পারবে, কেউ কারো ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না।

(৩) ইহুদী ও মুসলমান পরস্পর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করবে।

(৪) ইয়াহুদ বা মুসলমান কোন শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে সমবেত শক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করবে।

(৫) কোরাইশদেরকে কেউ আশ্রয় দেবে না।

(৬) মদীনা আক্রান্ত হলে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সবাই মিলে যুদ্ধ করবে।

(৭) কোন শত্রুর সঙ্গে এক পক্ষ সন্ধি করলে অপর পক্ষও সন্ধি করবে। কিন্তু ধর্মীয় যুদ্ধের বেলায় এ শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

বিবিধ ঘটনা

একই বছর আনসারদের দুজন বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইন্তেকাল করেন তাঁরা হলেন হযরত কুলসুম ইবনে হদম (রাঃ) এবং হযরত আসআদ ইবনে যোরারা (রাঃ)। হযরত নবী করীম (সাঃ) মক্কা থেকে হিজরত করে কোবায় উপনীত হওয়ার পর কুলসুমের গৃহেই অবস্থান করেন। অধিকাংশ সাহাবীও তাঁর গৃহে অবস্থান করেছিলেন। হযরত আসআদ ইবনে যোরারা (রাঃ), সে ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তির অন্যতম, যাঁরা সর্বপ্রথম মক্কায় গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাতে হাত রেখে বাইআ'ত গ্রহণ করেছিলেন। ইবনে সা'দের বর্ণনা মতে, এ ছয়জনের মধ্যে সর্বপ্রথম আসআদ ইবনে যোরারা (রাঃ) বাইআ'ত গ্রহণ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম মদীনায় জুমা'র নামাযের ব্যবস্থা করেছিলেন।

আসআদ (রাঃ) বনূ-নাজ্জার গোত্রের প্রধান ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর এ গোত্রের লোকেরা মহানবী (সাঃ)-এর নিকট আবেদন জানাল যে আসআদের স্থানে যেন অপর কোন নাজ্জার গোত্রের লোককে দলপতি মনোনীত করা হয়। যে কোন ব্যক্তিকে এ পদ প্রদান করা হলে ভুল বোঝাবুঝি ও সন্দেহ সৃষ্টির আশংকা থাকায় হযরত রসূল (সাঃ) বললেন, "আমি স্বয়ং তোমাদের নকীব বা প্রতিনিধি।"[১] যেহেতু রসূল (সাঃ)-এর পিতামহ আবদুল মোত্তালেবের মাতৃকুল ছিল নাজ্জার বংশীয়, তাই অন্যান্য গোত্রের হিংসা ও বিদ্বেষভাব পোষণ করার সুযোগ রইল না।

হযরত আসআদের মৃত্যুতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দারুণ মর্মাহত হয়েছিলেন। মদীনার কপট বিশ্বাসী ইহুদীরা এতে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল এবং তিরস্কারের ভাষায় বলতে লাগল, "দেখ, মোহাম্মদ (সাঃ) যদি সত্যনবী হতেন তাহলে কি তাঁর বন্ধু এমন করে মরে যেত। তাঁর অন্তরে এত আঘাত কেন?" হযরত (সাঃ) এদের মূর্খজনোচিত কথাবার্তা শুনে সকলকে সম্বোধন করে বললেন, "আল্লাহ্‌র যা ইচ্ছা তাই হবে। আল্লাহ্‌র কাজের উপর আমার নিজের বা কোন বন্ধুর সম্বন্ধে আমার কোনই শক্তি বা অধিকার নেই।" (তাবারী ১২৬১-পৃঃ)।

কি আশ্চর্য দৈবচক্র! ঠিক এ সময় দুজন প্রসিদ্ধ কাফের ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা— হযরত খালেদের পিতা এবং আস ইবনে ওয়ায়েল সাহ্‌মী মারা যায়। আসের পুত্র হযরত আমর ইবনে আস মিসর বিজেতা হিসাবে সুপরিচিত এবং তিনি হযরত আমীর মোয়াবিয়ার (রাঃ) রাজত্বকালে তাঁর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

একই সময়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়েরের (রাঃ) জন্ম হয়। তাঁর পিতা হযরত যোবায়ের (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ফুফাতো ভাই ছিলেন এবং তাঁর মাতা হযরত আসমা (রাঃ) হযরত আবু বকরের (রাঃ) কন্যা হযরত আয়েশার (রাঃ) বৈমাত্রেয় বোন ছিলেন। মুসলমানদের মদীনায় হিজরতের পর এ যাবত মোহাজেরদের কারো কোন সন্তান জন্মলাভ না করায়, ইহুদীরা জাদুর মাধ্যমে সন্তান প্রজনন বন্ধ করে রেখেছে বলেও একটি গুজব প্রচার করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের জন্মলাভ করায় মোহাজেরদের আনন্দের সীমা রইল না, তাঁরা জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন।

হিজরতের পূর্বে নামায দু'রাকা'ত করে ফরয হয়েছিল। মদীনা আগমনের পর জোহর, আসর ও এশা চার রাকাত পড়বার আদেশ হয়। তবে প্রবাসে তখনো দু'রাকাত পড়ার ব্যবস্থাই বলবত থাকে।

---

১. তাবারী, ১২৬১ ও ১২৬২ পৃঃ।

দ্বিতীয় হিজরী

কেবলা পরিবর্তন ও জেহাদের সূচনা

হিজরী দ্বিতীয় সাল থেকে ইসলামের ইতিহাসে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সূত্রপাত হয়। প্রথমত, মুসলিম উম্মাহর জন্য নিজস্ব একটি বিশেষ কেবলা নির্ধারণ যা আজও ১২৫ কোটি মুসলমানের অন্তরের কেন্দ্রস্থল হিসাবে পরিগণিত। দ্বিতীয়ত, ইসলামের শত্রুরা এ সময় থেকেই ইসলামের বিরোধিতায় অস্ত্রধারণ করে সশস্ত্র সংগ্রামের সূত্রপাত করে এবং মুসলমানগণ তা প্রতিহত করার লক্ষ্যে সশস্ত্র প্রস্তুতি গ্রহণ করার নির্দেশ লাভ করেন।

কেবলা পরিবর্তন ঃ শা'বান ২য় হিজরী

সকল জাতি, সকল গোত্র এবং সকল ধর্মের একটি বিশেষ নিদর্শন বা প্রতীক থাকে যার অনুপস্থিতিতে সে জাতির স্বতন্ত্র জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামে নামাযের জন্য কেবলা নির্ধারণ করা হয়, যাতে মূল উদ্দেশ্য ছাড়াও নিহিত রয়েছে বহু আদেশ ও রহস্যের প্রতীক। ইসলামের বিশেষ গুণ হল সমতা, গণতন্ত্র এবং তওহীদ বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন। অর্থাৎ, সমগ্র মুসলিম জাতি সমতা ও ঐক্যের ভিত্তিতে একটিমাত্র অভিন্ন জাতিসত্তায় পরিচিত হবে।

ইসলামের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হল নামায, যা প্রতিদিন পাঁচবার প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এর প্রকৃত স্বরূপ এই যে জামাতে দলবদ্ধভাবে এবং সম্মিলিতভাবে নামায আদায় করবে এবং এমনভাবে আদায় করবে যাতে লক্ষ লক্ষ লোকের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব মিটে গিয়ে একই অস্তিত্বে পরিণত হয়ে যায়। এজন্য দলবদ্ধভাবে নামায আদায় করার জন্য একজন ইমাম প্রয়োজন যার ইঙ্গিতে মোক্তাদী ও অনুসারীদের প্রত্যেকটি কাজ সম্পন্ন হবে। তাই সবার কেন্দ্র ও লক্ষ্য এক ও অভিন্ন হওয়া আবশ্যক। এ নীতির ভিত্তিতেই একাধিক কেবলা না হয়ে একটি মাত্র কেবলা নির্ধারণ করা হয়। এ রীতি অনুসরণের আওতা এত প্রশস্ত করা হয় যে সে কেবলার দিকে মুখ করতেই কুফরের আওতা থেকে নিজেকে মুক্ত করা হয়। এখন কেবলা সম্পর্কে কেবল এ প্রশ্ন থেকে যায় যে এর জন্য কোন্ দিকটি নির্ণয় করা হবে? ইহুদী-খৃষ্টানরা বায়তুল মোকাদ্দাস বা জেরুজালেমকে কেবলা মনে করত। কেননা, তাদের জাতীয় এবং ধর্মীয় নেতা [হযরত মূসা (রাঃ) এবং ঈসা (আঃ)] জেরুজালেমের সঙ্গেই জড়িত ছিলেন। কিন্তু পৌত্তলিকতার বিনাশসাধনকারী

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উত্তরাধিকারীর জন্য কেবলা হিসাবে একমাত্র কাবাই নির্ধারিত হওয়া সমীচীন ছিল। এ কাবাই ইসলামের মহান ভিত্তি তাওহীদের খাঁটি নিদর্শন ও মহান তাওহীদবাদীর অক্ষয় স্মৃতিফলক হিসাবে সুপরিচিত।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যতদিন মক্কায় অবস্থান করেন, ততদিন একই সঙ্গে দুটি প্রয়োজন দেখা দেয়। অর্থাৎ মিল্লাতে ইবরাহীমের প্রতিষ্ঠা ও পুনর্গঠনের দিক দিয়ে কাবার দিকে মুখ করার প্রয়োজন ছিল অধিক। কিন্তু এতে কেবলা নির্ণয়ের যে প্রকৃত উদ্দেশ্য তা অর্জিত হয় না। কেননা, আরবের অবিশ্বাসী (কাফের-মুশরেক) বিধর্মীরাও কাবাকেই নিজেদের কেবলা মনে করত। হযরত নবী করীম (সাঃ) মাকামে ইবরাহীমের সামনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন। যার মুখ ছিল মূলত বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে। এ অবস্থায় দুটি কেবলাই সামনে পড়ত। সে সময় মদীনায় দুটি সম্প্রদায় বাস করত, মুশরেক (অংশীবাদী) যাদের কেবলা ছিল খানায়ে কাবা আর আহলে-কেতাব যারা জেরুজালেমের দিকে মুখ করে নামায আদায় করত। শিরকের মোকাবিলায় তখন ইহুদী ও নাসারাদের প্রাধান্য ছিল। কাজেই হযরত (সাঃ) একটা নির্ধারিত সময় (ষোল মাস) পর্যন্ত জেরুজালেমের দিকে মুখ করে নামায আদায় করেন। কিন্তু মদীনায় ইসলাম বিস্তারের পর মূল কেবলার পরিবর্তে ভিন্ন কেবলার দিকে নামায আদায় করার কোন প্রয়োজন অবশিষ্ট ছিল না। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নলিখিত আয়াত নাযিল করেন, যার ফলে সাবেক কেবলা পরিবর্তন হয়ে যায়।[১]

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ۔ (١٨)

"(হে নবী!) আপনি নিজের মুখ মসজিদে হারামের (কাবার) দিকে ফেরান এবং তোমরা যেখানেই থাক, সে দিকেই নিজেদের মুখ ফেরাবে।

— (সূরা বাকারা— ১৮)

কেবলা পরিবর্তনের ঘটনা ইহুদীদের দারুণ অসন্তোষ ও তীব্র ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মুশরেকদের মোকাবিলায় তাদের ধর্মীয় বিশেষত্ব ও প্রাধান্যের কথা স্বীকৃত ছিল। এমন কি, (আবু দাউদের বর্ণনা অনুযায়ী) যাদের সন্তান হয়ে মরে যেত তারা মান্নত করত যে সন্তান জীবিত থাকলে আমরা তাকে ইহুদীধর্মে দীক্ষিত করব। কেবলা পরিবর্তনে তাদের এ ধর্মীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছিল। তথাপি এযাবৎ

১. এ নিবন্ধে বর্ণিত ঘটনাবলী বোখারী (নামাযের কেবলা সম্বন্ধীয় হাদীস) এবং বোখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুলবারী হতে সংকলিত।

ইসলামের কেবলা যেহেতু জেরুজালেমই ছিল, তাই তারা গর্ববোধ করত যে ইসলামও তাদের কেবলার দিকেই মুখ করে নামায আদায় করারই বিধান দেয়। কিন্তু কেবলাও যখন পরিবর্তিত হয়ে গেল, তখন তাদের ক্ষোভ ও ক্রোধের আর সীমা রইল না। তারা তিরস্কার করতে লাগল যে মোহাম্মদ (সাঃ) যেহেতু সব ব্যাপারেই আমাদের বিরোধিতা করতে চান, তাই কেবলাও পরিবর্তন করে নিয়েছেন। দুর্বল বিশ্বাসী মুসলমান ও মোনাফেক কপট বিশ্বাসীদের অন্তরেও বিষয়টি আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তারা বলতে লাগল, কেবলা কিছুতেই পরিবর্তন করার বস্তু নয়। এর দ্বারা অস্থিরতা ও ইতস্ততাই শুধু প্রকাশ পায়। সেজন্য কেবলার প্রকৃত রূপের প্রয়োজনীয়তা এবং পরিবর্তনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে কতিপয় আয়াত অবতীর্ণ হয়, তাতে এসব বিষয়ের সমাধান হয়ে যায়।

আয়াতগুলো এই ঃ

● "মানুষের মধ্যে জ্ঞানহীন লোকেরা বলবে, মুসলমানগণ যে কেবলার দিকে ছিল, কিসে তাদের তা থেকে বারণ করল? বল, পূর্ব ও পশ্চিম (সব দিকই) আল্লাহ্র।"

● "হে নবী! যে কেবলার দিকে আপনি ছিলেন সেটি এ জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল যাতে আমি যেন জানতে পারি, কে রসূলের অনুসরণ করে এবং কে তা থেকে বিরত থাকে। যদিও এটা অত্যন্ত বড় ব্যাপার কিন্তু আল্লাহ্ যাদের পথ প্রদর্শন করেছেন (তাদের জন্য নয়)।"—(সূরা বাকারা— ১৭)

● "তোমরা পূর্বাভিমুখী হও বা পশ্চিমাভিমুখী হও তাতে কোন পুণ্য নেই; বরং পুণ্য রয়েছে, যে আল্লাহ্ তা'আলা, পরকাল, ফেরেশতাগণ, আল্লাহ্র গ্রন্থ ও নবিগণে বিশ্বাস স্থাপন করে; যে আল্লাহ্র মহব্বতে আত্মীয়দের, পিতৃহীন শিশু সন্তানদেরকে, দরিদ্র ও ভিক্ষুকদের অর্থদান করে, যে দাসত্ব মোচনে অর্থ ব্যয় করে।" (সূরা বাকারা — ২২)

এ সকল আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে বলেছেন যে কেবলা কোন বিশেষ উদ্দিষ্ট বিষয় নয় ; আল্লাহ্র এবাদতের জন্য পূর্ব-পশ্চিম সবাই সমান। আল্লাহ্ প্রত্যেক স্থানে, প্রত্যেক দিকেই বিরাজমান। অতঃপর কেবলা নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন যে তা একটি বিশেষ রীতি, যা খাঁটি ও কৃত্রিম মুসলমানদের পৃথক করে দেয়। বহু ইহুদী এমনও ছিল, যারা মুনাফেকী করে নিজেকে মুসলমান রূপে পরিচিত করত এবং তাদের সঙ্গে নামাযও আদায় করত। বস্তুত এরা ছিল ইসলামের ক্ষতিসাধনকারী গোপন শত্রু। কিন্তু যখন জেরুজালেমের পরিবর্তে খানায়ে কাবা কেবলারূপে নির্ধারিত হয়, তখন

মুনাফেকদের স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে যায়। কোন ইহুদী কিছুতেই মেনে নিতে পারত না যে তাদের জাতীয়তা, ধর্ম, এমন কি, তাদের অস্তিত্বের ভিত্তিমূলে (জেরুজালেম) যে বিষয়টি আঘাত হেনে ছিন্নভিন্ন করে দেবে, তা বরণ করা যায়। অতঃপর পুনরায় আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট করে বলে দেন যে কোন কেবলা বিশেষের দিকে মুখ করা আসল পুণ্যের বিষয় নয়, বস্তুত বিশ্বাস ও সৎকার্যের নামই প্রকৃত পুণ্য বা সওয়াব।

জেহাদের সূচনা

সীরাত লেখকগণ জেহাদের কাহিনী যতই বিস্তারিত, যতই দীর্ঘায়িত ও দৃঢ়চিত্তে বর্ণনা করেন, পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা সে বর্ণনা ও বিবরণ ততই মনোযোগ ও বিপুল আগ্রহ সহকারে শুনতে ইচ্ছা করে। তাদের কামনা এ কাহিনী বা যুদ্ধ বিবরণ আরও বিস্তারিত ও বিশদভাবে বর্ণিত হোক। কেননা, পাশ্চাত্যের এসব জ্ঞান-পাপীরা ইসলামের বা মুসলিম উম্মাহর কোথাও কোন অন্যায়-যুলুম আঁচ করতে পারলে তা ফলাও করে প্রচার করা জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। ইসলাম সীমিত রক্তপাত নয়, বরং যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে বিরাট রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করেছে, এমনটা জানার জন্যই ইউরোপীয়দের ঔৎসুক্য সবচেয়ে বেশি।[১]

ইউরোপের ঐতিহাসিকরা এমনভাবে সীরাতে নববী রচনা করেছে যা পাঠ করলে অনুমিত হবে যে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর গোটা জীবনই বুঝি যুদ্ধবিগ্রহের একটি অব্যাহত ধারা এবং এর উদ্দেশ্যও ছিল মানুষকে বলপূর্বক ইসলামে দীক্ষিত করা।

কিন্তু এ ধারণা বাস্তবে যেহেতু সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা, তাই জেহাদের আলোচনা আরম্ভ করার পূর্বে এ বিতর্কের একটা মীমাংসা হয়ে যাওয়া উচিত।

সাধারণ ধারণা মতে, ইসলাম যতদিন মক্কার গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল, ততদিন আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) ও তাঁর অনুসারিগণ বহু রকমের বিপদ-সংকটের সম্মুখীন ছিলেন। মদীনায় আসার পর এ সকল বিপদ কিছুটা প্রশমিত হয় এ কিন্তু ধারণা সঠিক নয়। মক্কার বিপদ কঠিন হলেও তা ছিল একক অবিচ্ছিন্ন। পক্ষান্তরে,

১. যে সকল কারণে যুদ্ধের সূচনা হয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যে ধরনের ঘটনাবলী সংঘটিত হয়, সেগুলোর জন্য আমরা একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছি। কেননা, উপশিরোনামা দ্বারা এ উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু এ শিরোনামা তখনই অন্তরে রেখাপাত করতে পারে, যখন একেবারে সকল যুদ্ধের বর্ণনা এক নজরে দেখা যাবে। তাই আমরা তা সকল যুদ্ধের পরে লিখেছি। পাঠকবর্গ এখন হতে লক্ষ্য রাখবেন।

মদীনার বিপদের কোন অন্ত ছিল না। নানাভাবে নানাদিক থেকে ইসলাম বিভিন্নমুখী বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। মক্কাবাসীরা ছিল একজাতি। মদীনায় আনসারদের পাশাপাশি ইহুদীদেরও বসবাস ছিল। এরা ধর্মকর্ম, রীতিনীতি, চালচলন ও সমাজ-সংস্কৃতিতে আনসারদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ছিল। এরা একে অন্যের প্রতিপক্ষ বা শত্রু ছিল। তাছাড়া আরো একটি তৃতীয় পক্ষ ছিল কপট বিশ্বাসী মুনাফেকের দল। ঘরের শত্রু হওয়ায় এরা উপরোক্ত দু'পক্ষ অপেক্ষা অধিক মারাত্মক ও ভয়ঙ্কর ছিল। মক্কা যদি মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে থাকত, তাহলে হরমের (কাবার) ব্যাপক প্রভাবের ফলে সমগ্র আরববাসী নতজানু হয়ে যেত। কিন্তু মদীনার প্রভাব ছিল অত্যন্ত সীমিত। এ পর্যন্ত মদীনা বাইরের যাবতীয় আশংকা থেকে মুক্ত ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবাসভূমি হওয়ার দরুন এই শান্ত মদীনাই কোরাইশদের সমস্ত ক্ষোভ ও ক্রোধের একটি লক্ষ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করেন তার কিছুদিন পরেই কোরাইশরা আবদুল্লাহ ইবনে ওবাইকে একখানা পত্র প্রেরণ করে। আবদুল্লাহ হিজরতের পূর্বে আনসারদের প্রধান দলপতি ছিল এবং আনসারগণ তাকে মুকুট পরিয়ে রাজকীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপনের প্রস্তুতিও সম্পন্ন করেছিল।[১] তার নামে কোরাইশদের প্রেরিত পত্রটির মর্ম ছিল নিম্নরূপ ঃ "হে মদীনাবাসিগণ! তোমরা আমাদের স্বধর্মাবলম্বী হয়েও আমাদের পরম শত্রু মোহাম্মদকে (সাঃ) নিজেদের দেশে আশ্রয় দিয়েছ। হয় তোমরা যুদ্ধ করে তাকে ধ্বংস করে ফেলবে, নাহয় নিজেদের দেশ থেকে বহিষ্কার করবে। আমরা পরমেশ্বরের শপথ করে বলছি, যদি এ দুটি শর্তের কোন একটি তোমরা অবলম্বন না কর, তবে আমরা নিশ্চয় নিজেদের সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাদের আক্রমণ করব, তোমাদের যুবক দলকে নিহত করব এবং তোমাদের স্ত্রীদের হস্তগত করব।" (আবু দাউদ, ২-৬৭ 'নাযীব' গোত্রের খবর অধ্যায়।)

নবী করীম (সাঃ) এ সংবাদ অবগত হয়ে আবদুল্লাহ ইবনে ওবাই-এর নিকট গিয়ে বললেন, "তুমি কি তোমার স্বদেশী ভ্রাতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে? কেননা, অধিকাংশ মদীনাবাসী ততদিনে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, তাই আবদুল্লাহর এ ব্যাপারটি বুঝতে কষ্ট হল না এবং সে আর কিছু বলল না। কোরাইশদের নির্দেশও মানতে পারল না। বদর যুদ্ধের পর কোরাইশরা আবার একই মর্মে পত্র লিখল।

১. সহীহ বোখারী "আত্তাসলিমু ফি মাজলিসিন ফিহি এখলাতুম মিনাল মোসলেমীন ওয়াল মোশরেকীন" অধ্যায়।

এতদসত্ত্বেও কোরাইশদের প্ররোচনায় মদীনার কপট বিশ্বাসী মুনাফেক ও ইহুদীদের মতিগতি আবার পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন অর্থাৎ, বদর যুদ্ধের পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বনূ হারেস ইবনে খাযরাজের মহল্লায় গমন করেন। তথায় একস্থানে মোশরেক, মুনাফেক, ইহুদী ও কোন কোন মুসলমান সমবেত ছিল। গাধার চলার ফলে রাস্তায় ধুলাবালি উড়তে থাকে। আবদুল্লাহ্ কাপড় দ্বারা নিজের মুখ ঢেকে ফেলল এবং বিদ্রূপ করে বলে উঠল, "ধূলাবালি উড়িও না।" হযরত নবী করীম (সাঃ) উপস্থিত সমাবেশকে সালাম জানালেন এবং কোরআনের কতিপয় আয়াত পাঠ করে শুনালেন। আবদুল্লাহ্ তার উত্তরে বলে উঠল,[১] ওহে! আমি এটা পছন্দ করি না। যদি তোমার কথা সত্য হয়ে থাকে তাহ্লেও আমাদের মজলিসে এসে আমাদের বিরক্ত করো না। যে তোমার কাছে যায় তাকে এ সমস্ত কথা বলো। মুসলমানের এ অবমাননাকর ও অপমানজনক উক্তির জন্য উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, যার ফলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হল। এমন কি, দু'পক্ষের মধ্যে মারাত্মক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশংকাও দেখা দেয়। হযরত নবী করীম (সাঃ) পরিস্থিতির নাজুকতা অনুধাবন করে দু'পক্ষকে শান্ত করে দিলেন।

এ সময় আনসার প্রধান হযরত সা'দ ইবনে মাআয (রাঃ) ওমরা সম্পন্ন করার জন্য মক্কায় যান। মক্কায় উমাইয়া ইবনে খাল্ফের সঙ্গে পূর্ব থেকেই তাঁর যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল, সে হিসাবে তিনি সঙ্গোপনে উমাইয়ার ঘরে অতিথি হন। একদিন তিনি উমাইয়ার সঙ্গে কাবা প্রদক্ষিণ করছিলেন, এমন সময় আবু জাহ্ল সেখানে উপস্থিত হয়ে উমাইয়াকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার সঙ্গে এ লোকটি কে?" উমাইয়া সংক্ষেপে উত্তর করল, "ইনি সা'দ।" সা'দের নাম শুনে আবু জাহ্ল ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে সা'দকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল, "তোমরা মক্কার 'ধর্মত্যাগী' 'সাবী'গুলোকে আশ্রয় দিয়েছ। (কাফেররা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও মুসলমানদেরকে সাবী অর্থাৎ, ধর্মত্যাগী বলত।) সুতরাং কাবা তীর্থে আসতে পারবে না। তুমি উমাইয়ার সঙ্গে আছ, নচেৎ তোমাকে আর নিজেদের পরিজনবর্গের মুখ দেখতে হত না।" হযরত সা'দ ধৈর্যচ্যুত হলেন না। ধীরস্থিরভাবে বললেন, "তোমরা কাবা তীর্থে বাধা দিলে, আমরা তোমাদের সিরিয়ার বাণিজ্য-পথ বন্ধ করে দেব, তখন মজা দেখবে।"[২]

১. সহীহ্ মুসলিম, পৃঃ-৯৩, সহীহ্ বোখারী ২ পর্বে বর্ণিত অধ্যায়।
২. পূর্ণ ঘটনা আরও বিশদভাবে বোখারী 'মাগাযী' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

হরমের (কাবার) খেদমত ও তত্ত্বাবধানের দরুন সমগ্র আরবজাতি কোরাইশদের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করত। মক্কা হতে মদীনার পথে যে সকল পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের বসতি ছিল তাদের সকলেই তাদের প্রাধান্য স্বীকার করত।[১] কোরাইশরা এ সকল সম্প্রদায়কে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগল। হিজরতের ষষ্ঠ বছর পর্যন্ত ইয়ামন প্রভৃতি অঞ্চলের লোক হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট পৌঁছতে পারত না। সুতরাং ষষ্ঠ হিজরীতে যখন বাহ্‌রাইন থেকে আবদুল কাইসের প্রতিনিধিদল মদীনায় গমন করে হযরত (সাঃ)-এর নিকট আবেদন করেন যে মোযের গোত্ররা আমাদের আপনার খেদমতে আসতে বাধা দান করে। তাই আমরা কেবল হজের মওসুমে যখন সাধারণত আরবগণ যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে, তখনই আপনার খেদমতে হাযির হতে পারি।[২]

এ সকল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির পরও কোরাইশরা ক্ষান্ত হতে পারে না। তারা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগল। মদীনায় আক্রমণ চালিয়ে ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করার জন্যও তারা আবদুল্লাহ ইবনে ওবাইকে লিখেছিল। এমতাবস্থায় বহুদিন যাবৎ হযরত নবী করীম (সাঃ) রাত্রিকালে জাগ্রত থাকতে হত। নাসায়ী শরীফের বর্ণনা মতে, মদীনা আগমনের পর অনেক সময় হযরতকে (সাঃ) সমস্ত রাত্রি জেগে কাটাতে হয়েছিল।

বোখারী 'জেহাদ' অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে একদা হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন, "আজ রাত পাহারা দেয়ার জন্য উত্তম ব্যক্তি কে আছে?" একথা শুনে হযরত সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে সারা রাত্রি পাহারা দিতে থাকেন। ইত্যবসরে হযরত (সাঃ) বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

এর চেয়েও বড় প্রমাণ, হাকেমের 'রেওয়ায়েতে' বলা হয়েছে ঃ ওবাই ইবনে কা'ব বলেছেন, "যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর সহচরগণ মদীনায় এলেন এবং আনসারগণ তাঁদের আশ্রয় দিলেন, তখন সমগ্র আরব একযোগে তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত হল। এ অবস্থায় সাহাবিগণ ভোর পর্যন্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিদ্রা যেতেন।[৩]

১. ইবনে হেশামে প্রতিনিধি দলের ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। অর্থাৎ আরবের বিভিন্ন পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের উপর কোরাইশদের যে প্রাধান্য ছিল, তা আরব নেতৃবর্গও স্বীকার করতেন এবং কোরাইশরা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিল।
২. আব্দুল কাইস প্রতিনিধিদলের বর্ণনায় বোখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে এ ঘটনার উল্লেখ আছে।
৩. ইমাম ছয়ুতীর লুবাব ফি আছহবুন নুযুলে সূরা নূরের এই আয়াত অর্থাৎ আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন তোমাদের সেই লোকের সাথে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে। মাসনাদে দারেমীতেও এই বর্ণনার উল্লেখ আছে।

ঐতিহাসিকগণ এ সকল ঘটনাকেই 'মাগাযী' বা যুদ্ধের কারণ বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন যে এ বছর আল্লাহ্ তা'আলা জেহাদ করার আদেশ করেন, কিন্তু একজন সূক্ষ্মদর্শী এ সকল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে জেহাদে অবতীর্ণ হওয়ার প্রকৃত কারণ কি তা অনুধাবন করতে পারবেন না। মাওয়াহেবে লুদুন্নিয়া এবং যারকানীতে বর্ণিত আছে যে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বিতীয় হিজরী সনের ১২ই সফর তারিখে জেহাদের আদেশ দেন। এর সনদে ইমাম যোহরীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, 'জেহাদ' সম্পর্কে সর্বপ্রথম এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

"যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে অনুমতি প্রদান করা হল। কারণ; তারা অত্যাচারিত এবং আল্লাহ্ তাঁদের সাহায্য করতে নিশ্চয় শক্তিমান। (যারকানী, নাসায়ী, ১-৪৪৮)

তফসীরে ইবনে জারীর-এ বর্ণিত আছে ঃ "জেহাদ সম্পর্কে সর্বপ্রথম যে আয়াত অবতীর্ণ হয়, তা হল এই ঃ

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ - بقره-٤٢-

"যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয়, আল্লাহ্র পথে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।" (সূরা বাকারা—২৪)

কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে উল্লিখিত উভয় আয়াতে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, ঐ সকল লোকের সঙ্গে, যারা প্রথমে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে প্রকৃতপক্ষে কাফেররাই অব্যাহত আগ্রাসনের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করে।

মোটকথা, মদীনায় আগমনের পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রথম কাজগুলো ছিল নিজের জন্য আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা। এটা কেবল নিজের জন্য নয় বরং আনসার ও মোহাজেরদের জন্যও এর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কেননা, আনসারগণ মুসলমানদের আশ্রয় দিয়েছে, এ অজুহাতে কোরাইশরা মদীনা ধ্বংস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং আরবের সমস্ত অংশীবাদী ঐক্যবদ্ধ গোত্রকে উত্তেজিত করে তোলে। তাই হযরত নবী করীম (সাঃ) দুটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। প্রথমত, সিরিয়ার সঙ্গে কোরাইশদের যে ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল তা বন্ধ করে দেয়া। এটা ছিল তাদের অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। এটা বন্ধ করে দেয়া হলে তারা সন্ধি করতে বাধ্য হবে। উল্লেখযোগ্য যে হযরত সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস মক্কায় আবু জাহ্লকে এ বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত দিয়ে সতর্ক করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ মদীনার আশপাশে যেসব গোত্র বসবাস করত তাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্থাপন করা।

বদরের পূর্বে পরিচালিত অভিযানসমূহ

মক্কার কোরাইশদের শত্রুতা মদীনা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মহানবী (সাঃ) বদর যুদ্ধের পূর্বেই একশ'-একশ' ও পঞ্চাশ-পঞ্চাশ জনের বিভিন্ন দল-উপদল মক্কার দিকে প্রেরণ করতে থাকেন। 'আবওয়া' অভিযানের পূর্বে হযরত (সাঃ) স্বশরীরে কোন অভিযানে অংশগ্রহণ করেননি। আবওয়ার অভিযানে ২য় হিজরীর সফর মাসে পরিচালিত হয় এবং স্বয়ং হুযুর (সাঃ) তাতে অংশ নেন। সীরাত লেখকদের বর্ণনা মতে, "আবওয়া" অভিযানের পূর্বে আরও তিনটি অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। সীরাত লেখকদের পরিভাষায় এ সকল অভিযানকে "সারিয়া" বলা হয়। এ তিনটি "সারিয়া" হল "হামযার (রাঃ) সারিয়া", "ওবায়দা ইবনে হারেছের (রাঃ) সারিয়া" এবং "সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের (রাঃ) সারিয়া"। কিন্তু এসব অভিযানের কোনটাতেই কোন রক্তপাত ঘটেনি, আপোস-মীমাংসার ভিত্তিতে যুদ্ধাবস্থার সমাধান হয়ে যায় এবং সব পক্ষ নিরাপদে নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে যায়। সীরাত লেখকগণ এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন যে এসব অভিযান কোরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য প্রেরণ করা হত। অর্থাৎ, হযরত সা'দের সতর্কবাণী অনুসারে কোরাইশদের সিরিয়ার বাণিজ্যপথ বন্ধ করে দেয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। বিরুদ্ধবাদীরা বলে থাকে যে হযরতের (সাঃ) সহচরদের লুণ্ঠনের শিক্ষা দেয়া হত। কিন্তু এ অভিযোগ যে কতটা মূর্খজনোচিত তা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রথমত, ইসলামধর্মে লুণ্ঠন মহাপাপ। দ্বিতীয়ত, ঘটনাপ্রবাহ কি প্রমাণ করে? এগুলোর মধ্যে একটি অভিযানেও কি এর কোন উল্লেখ আছে যে সাহাবিগণ কাফেলার অর্থ লুণ্ঠন করেছেন? তৃতীয়ত এ সকল অভিযানের উদ্দেশ্য যদি লুণ্ঠনই হত কোরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা ব্যতীত এ উদ্দেশ্য কি আর কোথাও সাধিত হতে পারত না?

মদীনার পার্শ্বস্থ যেসব সম্প্রদায়ের প্রতি সন্ধি ও সখ্য সংস্থাপনের জন্য অভিযান প্রেরণ করা হয়, সেগুলোর মধ্যে "জোহায়না' গোত্রের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এ পৌত্তলিক গোত্রটি মদীনা হতে তিন মঞ্জিল দূরে বাস করত। এদের প্রভাবাধীন পার্বত্য এলাকা বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এদের সঙ্গে এ মর্মে সন্ধি হল যে ভবিষ্যতে কোরাইশ ও মুসলমানগণ পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত হলে তারা নিরপেক্ষ থাকবে।[১]

১. ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনা পৃথকভাবে উল্লেখ করেননি বরং যেখানেই সর্বপ্রথম বনী যোমরা অভিযানের উল্লেখ করেছেন, সেখানে মাজদী জোহায়নী (গোত্রের নেতা) সম্পর্কে লিখেছেন যে তিনি উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে হযরত (সাঃ) স্বয়ং ষাটজন মোহাজেরসহ মদীনা থেকে 'আবওয়া' নামক স্থানে উপস্থিত হন। (এরই কাছে আবওয়া বা ওদ্দান যুদ্ধ সংঘটিত হয়।) এখানেই হযরত (সাঃ)-এর শ্রদ্ধেয়া জননীর সমাধি। আবওয়ার কেন্দ্রস্থলটির নাম 'ফারা'। এটি ছিল মূলত একটি বিশাল পল্লী। সেখানে মোযানিয়া গোত্রের লোকেরা বাস করত এবং মদীনা থেকে এটি প্রায় আট মঞ্জিল অর্থাৎ, আশি মাইল দূরে অবস্থিত। এটি মদীনার প্রভাবাধীন অঞ্চলের শেষ প্রান্তে ছিল। পার্শ্ববর্তী এলাকায় বনূ যোমরা গোত্র বাস করত এবং তারাই সেসব এলাকা নিয়ন্ত্রণ করত। হযরত (সাঃ) সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করে বনূ-যোমরা গোত্রগুলোর সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন ও তাদের সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করেন। এ গোত্রের দলপতির নাম ছিল মাখশা ইবনে আমর যোমরী। সন্ধিপত্রে লিখিত হল ঃ "এটি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক বনূ যোমরার জন্য লিখিত সন্ধিপত্র। এ গোত্রের জানমাল নিরাপদ থাকবে এবং শত্রুপক্ষ এদেরকে আক্রমণ করলে আল্লাহ্র দ্বীনের প্রতিকূল না হলে তাদেরকে যথাসাধ্য সাহায্য করা হবে। পক্ষান্তরে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করলে তারাও সাহায্য করবে।" (রওযুল আন্‌ফ, ২-৫৮, যারকানী ১-৪৫৯)

সকল মোহাদ্দেসই মনে করেন যে আবওয়ার এ অভিযান থেকেই পরবর্তী যুদ্ধের সূচনা হয়। বোখারীতেও একে প্রথম অভিযান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এ ঘটনার ন্যূনাধিক একমাস পরে কুর্য ইবনে জাবের ফেহ্‌রী নামক মক্কার এক প্রভাবশালী ব্যক্তি একটি সশস্ত্র সৈন্য বাহিনী নিয়ে মদীনার প্রান্তবর্তী কৃষিক্ষেত্রগুলোর (চারণভূমির) উপর আক্রমণ করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কয়েকটি গৃহপালিত পশু লুণ্ঠন করে পালিয়ে যায়।[১] তার পশ্চাদ্ধাবন করেও তাকে ধরা সম্ভব হয় না। (কুর্য পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং মক্কা বিজয়ের সময় একাকী পথ চলাকালে শাহাদতবরণ করেন)।

জমাদিউস্‌সানি অর্থাৎ এ ঘটনার তৃতীয় মাসে হযরত (সাঃ) দু'শ মোহাজেরসহ মদীনা থেকে যুল ওশায়রা নামক স্থানে বনী মোদলেজের সঙ্গে সন্ধি করেন। স্থানটি মদীনা থেকে ৯ মঞ্জিল (৯০ মাইল) দূরে ইয়াম্বু নামক স্থানের উপকণ্ঠে অবস্থিত ছিল।

---

১. এছাড়া কুর্য ইবনে ফেহ্‌রীর বর্ণনা।

বনী মোদলেজ গোত্রীয় বনী যোমরা গোত্রের সঙ্গে পূর্ব থেকেই মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল এবং যেহেতু বনী যোমরা পূর্বেই মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন তাই তারা সহজেই সন্ধির শর্তগুলো মনজুর করে নেয়।[১]

এ ঘটনার কিছুদিন পর অর্থাৎ, দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশকে বারজন সাহাবীসহ মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলায় প্রেরণ করেন। এটি মক্কা থেকে একদিন একরাতের দূরত্বে অবস্থিত। হযরত আবদুল্লাহ্‌কে একখানা পত্র দিয়ে বললেন ঃ নাখলা অভিমুখে দু'দিন ভ্রমণ করার পর এটি পাঠ করবে।

আবদুল্লাহ তদনুসারে দু'দিন অতিবাহিত হওয়ার পর পত্রখানা খুলে দেখেন, তাতে লেখা আছেঃ "নাখলায় অপেক্ষা কর এবং কোরাইশদের গতিবিধি অনুসন্ধান করে আমাকে অবহিত কর।"

ঘটনাচক্রে কোরাইশদের কিছু লোক সিরিয়া থেকে বাণিজ্যসামগ্রী নিয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করছিল। আবদুল্লাহ্‌র সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। ফলে, আমর ইবনে আল হাযরমী নিহত হয়। তাদের পণ্যদ্রব্য লুণ্ঠিত ও দুজন বন্দী হয়। হযরত আবদুল্লাহ বন্দীদ্বয় ও লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ মদীনায় ফিরে হযরত (সাঃ) সমীপে উপস্থিত হন। হুযুর (সাঃ) লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করেননি, পরন্তু আবদুল্লাহ্‌র এ অবৈধ কর্মে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেন ঃ "আমি তোমাকে একাজের আদেশ করিনি।" সাহাবিগণও হযরত আবদুল্লাহ্‌র প্রতি ভর্ৎসনা করে বলেন ঃ "তুমি এমন কর্মই করেছ, যা করার আদেশ তোমাকে দেয়া হয়নি এবং পবিত্র মাসে যুদ্ধ করেছ অথচ এ মাসে যুদ্ধ করার আদেশও তোমাকে দেয়া হয়নি।" (তাবারী, ১২৭৫ পৃঃ)

১. আমি স্বীকার করি যে ঐতিহাসিকগণ প্রথমোক্ত দুটি ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন যে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কোরাইশদের কাফেলা লুণ্ঠন করা। কিন্তু ঘটনাক্রমে এ কাফেলার সন্ধান পাওয়া যায়নি। ফলে, কাফেলার লোকেরা বেঁচে যায়। কিন্তু আমি ঘটনাবলী স্বীকার করি এবং কেয়াস বা অনুমান করা আমার উদ্দেশ্য নয়। প্রকৃত ঘটনা এই যে হযরত ঐ সমস্ত স্থান পর্যন্ত গমন করে সেখানকার গোত্রগুলোর সাথে সন্ধি করেন।

ঐতিহাসিকগণ আরও কেয়াসের আশ্রয় নিচ্ছেন যে কোরাইশদের কাফেলার উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্য থাকলেও তা সাধিত হয়নি। খোদা না করুন, যদি কাফেলা লুণ্ঠন করাই উদ্দেশ্য হত তা হলে (আল্লাহুর পানাহ) হযরতকে এতই অবিবেচক বলতে হবে যে যার জন্য তিনি প্রত্যেক বারই ব্যর্থ হয়েছেন এবং কাফেলা রক্ষা পেয়ে গিয়েছে। এমন কি, বার বার অভিজ্ঞতা লাভের পরও বদর যুদ্ধের ঘটনায়ও এ ধরনের ব্যর্থতা হয় আর কাফেলা নিরাপদে চলে যায়।

যারা বন্দী ও নিহত হয় তারা সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিল। নিহত আমর ইবনে আবদুল্লাহ্ আল্ হায্রমীর পিতা কোরাইশদের সর্বপ্রধান নেতা হওয়ার সুবাদে আমীর মোয়াবিয়ার দাদা হারব ইবনে উমাইয়্যার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল।[১] আবদুল মোত্তালেবের পর কোরাইশদের নেতৃত্বের দায়িত্ব তার উপরই অর্পিত হয়েছিল এবং বন্দীকৃত ব্যক্তিদ্বয় ওসমান ও নওফল উভয়ই মক্কার বিশিষ্ট নেতা মোগীরার পৌত্র ছিল।[২] মুগীরা ওয়ালিদদের পিতা এবং হযরত খালেদের দাদা ছিল। তাই এ আকস্মিক ঘটনা কোরাইশদের চরমভাবে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। বলতে গেলে এটাই প্রতিশোধ গ্রহণের একটি ভিত্তিমূল ছিল।

বদর যুদ্ধের সূচনা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত। হযরত ওরওয়াহ্ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ভাগিনা ছিলেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে হাযরমী হত্যাই কোরাইশদের সঙ্গে সংঘটিত বদর যুদ্ধ এবং অন্যান্য সকল যুদ্ধের কারণ। আল্লামা তাবারী বলেন,[৩] "ওয়াকেদীও মন্তব্য করেছেন যে সাহ্মী কর্তৃক হাযরমী হত্যার ঘটনাই মক্কাবাসীদের বদর যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করেছিল এবং এ ঘটনাই কোরাইশ মোশরেক ও হুযুর (রাঃ)-এর সহিত অনুষ্ঠিত সকল যুদ্ধের সূচনা ছিল।"

যেহেতু, বদর যুদ্ধ ছিল সকল যুদ্ধের মূল, তাই প্রথমে এ ঘটনাটি আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে উদ্ধৃত করার পর এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

বদর যুদ্ধ

"এবং আল্লাহ্ তোমাদের বদরে সাহায্য করেছেন, যখন তোমরা দুর্বল ছিলে। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় কর, হয়ত তোমরা শোকর গুযার হবে।" (সূরা আল ইমরান)

১. এসাবা, আলা আল হাযরামীর বর্ণনা।
২. তাবারী, ১২৭৪ পৃঃ।
৩. ঐ, ১২৮৪ পৃঃ।

দ্বিতীয় হিজরী

রমযান মাস

মদীনা থেকে প্রায় ৮০ মাইল দূরে সিরিয়া থেকে মদীনায় আসার পথে দুর্গম এলাকায় অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র জনপথের নাম বদর। প্রতি বছর এখানে একটি মেলা বসত। আটদিন পর্যন্ত এ মেলা চলত। মক্কা ও আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে দলে লোক এ মেলায় যোগদান করত। এখানেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

আমরা পূর্বেই আলোকপাত করেছি যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হিজরতের সঙ্গে সঙ্গেই মক্কার কোরাইশরা মদীনা আক্রমণ করার জন্য সর্বপ্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। তারা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে এ মর্মে চিঠি লিখে পাঠাল যে "মোহাম্মদ (সাঃ)-কে হত্যা কর, অন্যথায় আমরা তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার জন্যও উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হব।" কোরাইশরা ছোট ছোট দল বেঁধে মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ঘোরাফেরা করতে লাগল। এমন কি, মক্কার প্রসিদ্ধ গোত্রপতি কুরয্ ফেহ্রী মদীনার চারণভূমি আক্রমণ করে লুট-তরাজ করে চলে গেল।

কোন যুদ্ধাভিযান পরিচালনার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যুদ্ধব্যয়ের ব্যবস্থা করা। এ যুদ্ধব্যয় সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই মক্কার একটি বাণিজ্যিক কাফেলা বিপুল বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়েছিল। মক্কার সকল নাগরিকই যার নিকট যা ছিল, সমস্ত এ কাফেলার সঙ্গে পুঁজি দিয়েছিল।[১] শুধু পুরুষই নয়, মহিলারাও বিশেষত, যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব কমই অংশগ্রহণ করে থাকত, তাদেরও প্রত্যেকেই এতে অংশগ্রহণ করেছিল।

এ বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করার পূর্বেই হাযরমী নিহত হয়। ফলে, কোরাইশদের আক্রোশ চরমে উঠল এবং তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা দ্বিগুণ ও চতুর্গুণ বেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটি মিথ্যা গুজবও মক্কার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল যে মদীনার মুসলমানেরা তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা লুট করে নেয়ার জন্য এগিয়ে আসছে। এতে কোরাইশদের প্রতিহিংসার আগুন এমনি প্রবল বেগে বইতে লাগল যে সমগ্র আরব জাহানকে গ্রাস করে ফেলল।

১. ইবনে সাআদ ৭ম খণ্ড।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ সমস্ত ঘটনা জানতে পেরে সাহাবিগণকে সমবেত করে প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবিগণও আবেগময়ী বক্তৃতা করলেন, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শুধু আনসারদের দিকে দেখতে লাগলেন কেননা, আনসারগণ শুধু এ চুক্তিই করেছিল যে যখন কোন বাহিনী মদীনা আক্রমণ করতে উদ্যত হবে, তখন তারা অস্ত্রধারণ করবে। খাযরাজ গোত্রের প্রধান সা'দ ইবনে উবাদা (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, "হুযুর (সাঃ) কি আমাদেরকে কোন ইঙ্গিত করছেন? আল্লাহ্র কসম, আপনি নির্দেশ দিলে আমরা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তেও কুণ্ঠিত হব না।"

সহীহ্ বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনা ঃ হযরত মেকদাদ (রাঃ) বললেন, আমরা হযরত মূসা (আঃ)-এর কওমের মত বলব না যে,"আপনি ও আপনার খোদা গিয়ে যুদ্ধ করুন।" বরং আমরা আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে ডান, বাম, সম্মুখ ও পশ্চাত চার দিক থেকেই আমরা যুদ্ধ করব।" মেকদাদের এ আশ্বাসবাণীতে হুযুর (রাঃ)-এর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মোটকথা, দ্বিতীয় হিজরীর ১২ই রমযান, হুযুর (সাঃ) প্রায় তিনশ' নিবেদিত প্রাণ একটি ক্ষুদ্র দল নিয়ে মদীনা থেকে বের হলেন। প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করার পর হুযুর (সাঃ) সৈন্যদের গণনা করলেন যাতে অল্প বয়স্ক বালকগণকে ফেরত পাঠিয়ে দিতে পারেন। কারণ, এমন ভয়াবহ্ অভিযানে বালকদের অংশগ্রহণ সমীচীন ছিল না। ওমায়র ইবনে আবু ওয়াক্কাস ছিল একজন অল্প বয়স্ক বালক। তাঁকে ফিরে যেতে বললে, তিনি দুঃখে-ক্ষোভে কাঁদতে লাগলেন। অবশেষে হুযুর (সাঃ) তাকে অনুমতি দিলেন। তাঁর ভাই সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস এ অল্প বয়স্ক বালকের গলায় তলোয়ারের খাপ ঝুলিয়ে দিলেন।[১] পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মুসলিম বাহিনীর সর্বমোট সংখ্যা ৩১৩ জন। তন্মধ্যে ৬০ জন মোহাজের, আর অবশিষ্ট ২৫৩ জন আনসার। যেহেতু অনুপস্থিত ক্ষেত্রে মুনাফেক ও ইহুদীদের প্রতি কোন প্রকারেই নির্ভর করা সম্ভব ছিল না। এ জন্য হুযুর (সাঃ) আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মোনযেরকে মদীনার শান্তি-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে ফেরত পাঠালেন। আলীয়াতে (মদীনার উচ্চতম এলাকা) আসেম ইবনে আদিকে পর্যবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করা হল। এ সমস্ত শৃংখলা বিধান করার পর তিনি বদরের দিকে এগুতে লাগলেন। যেদিক থেকে মক্কাবাসীদের আক্রমণের আশংকা ছিল, পূর্বেই বুসাইর ও আদিকে অগ্রগামী সৈন্য হিসাবে তাদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সেদিকে পাঠিয়ে দেয়া হল।

---

১. মুন্তাখাবে কানযুল উম্মাল।

'রাওহা, মুন্‌সারাফ, যাতে আজদাল, মুআলাত, আসিল প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করে অবশেষে ১৭ই রমযান হুযুর (সাঃ) এ ক্ষুদ্র দল নিয়ে বদরের নিকট উপস্থিত হলেন। অগ্রগামী সৈন্যদ্বয় এসে জানাল যে কোরাইশ বাহিনী প্রান্তরের শেষসীমা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। হুযুর (সাঃ) এখানেই অবস্থান গ্রহণ করার জন্য সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন।

মক্কা থেকে কোরাইশরা বিপুল সাজ-সরঞ্জামসহ এক হাজার সৈন্যের এক বিরাট সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছিল। তাদের অশ্বারোহীর সংখ্যা ছিল একশ'। কোরাইশদের প্রায় সকল নেতাই এ বাহিনীতে অংশগ্রহণ করেছিল। আবু লাহাব যদিও বিশেষ অসুবিধার কারণে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, কিন্তু তার প্রতিনিধি হিসাবে অন্য একজন অংশগ্রহণ করে। কোরাইশ নেতৃবৃন্দ এত বিপুল পরিমাণ যুদ্ধসামগ্রীর ব্যবস্থা করেছিল যে তা ভেবে অবাক হতে হয়। অর্থাৎ আব্বাস (ইবনে মুত্তালিব), ওতবা ইবনে রবিয়া, হারেস ইবনে আমর, নযর ইবনে হারেস, আবু জাহল, উমাইয়্যা প্রমুখ নেতা পালাক্রমে প্রত্যেক দিন দশ-দশটি উট জবাই করে এ সৈন্যবাহিনীর খাওয়ার ব্যবস্থা করত।[১] এ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিল কোরাইশদের সবচেয়ে সম্মানিত নেতা ওতবা ইবনে রবিয়া।

কোরাইশরা বদরের কাছে পৌছার পর জানতে পারল যে আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা বিপদমুক্ত হয়ে মক্কায় চলে গেছে। যুহরা ও আদী গোত্রদ্বয়ের নেতারা বলল, তাহলে এখন আর যুদ্ধের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু আবু জাহল কোন মতেই তাদের সঙ্গে একমত হল না। সুতরাং যুহরা ও আদী গোত্রদ্বয়ের লোকজন ফিরে গেল। অবশিষ্ট বাহিনী নিয়ে আবু জাহল এগিয়ে এল।

যেহেতু, কোরাইশ সৈন্যরা পূর্বেই বদরে পৌছে গিয়েছিল, তাই তারা ভাল ও সুবিধাজনক অবস্থান দখল করে নিয়েছিল, তাতে মুসলমানগণ খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হন। তাঁদের জন্য পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না। পানির নহর ও কুয়া পূর্বেই কোরাইশবাহিনী দখল করে নিয়েছিল। মুসলমানদের অবস্থানস্থল এমন বালুকাময় ছিল যে উট পর্যন্ত চলতে পারত না। উটের পা বালুতে ঢুকে যেত। হোবাব ইবনে মোনযের হুযুর (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলনে, স্থান নির্বাচন কি ওহীর মাধ্যমে হয়েছে, না যুদ্ধের কৌশল হিসাবে? হুযুর (সাঃ) নেতিবাচক জওয়াব দিলেন। হোবাব বললেন, তাহলে সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে কুয়া দখল করে আশপাশের অন্যান্য কুয়াসমূহ বেকার করে দেয়াই মঙ্গলজনক হবে।[১] হুযুর (সাঃ)

---

১. ইবনে হিশাম।

তার এ মত পছন্দ করলেন এবং সে অনুযায়ী নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ্র রহমত, মুসলমানদের সৌভাগ্য যে ইতিমধ্যে বিপুল বৃষ্টিপাতের ফলে নানা স্থানে পানি জমে যায়, তারা ছোট ছোট হাউজ বানিয়ে পানি আটকে রাখে, যাতে ওযু-গোসলের অসুবিধা না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এ রহমতের কথা কোরআন করীমে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

"তাদেরকে পবিত্র করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলেন।" মুসলমানগণ যদিও পানি দখল করে নিয়েছিলেন, কিন্তু রাহ্মাতুললিল আলামীন, দয়ার সাগর শত্রুপক্ষকেও পানি নিতে অনুমতি দিলেন।[১] গভীর রাত পর্যন্ত সকল সাহাবী অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ খুলে বিশ্রাম করছিলেন, কিন্তু মহানবী (সাঃ) রাত জেগে আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করতে লাগলেন। নামাযান্তে জিহাদ সম্পর্কে তিনি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিলেন।[২]

মক্কার কোরাইশরা যুদ্ধের জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তাদের কোন কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের প্রাণ অনর্থক রক্তপাতের আশংকায় প্রকম্পিত হচ্ছিল। তন্মধ্যে হাকীম ইবনে হাযাম (তিনি পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন) সেনাপতি ওতবাকে বলল, তুমি ইচ্ছা করলে আজকের দিনে তোমার বিচক্ষণ নেতৃত্বের সুনাম চিরস্মরণীয় করে রাখতে পার। ওতবা বলল, সে কি ভাবে? হাকীম বললেন, কোরাইশদের একমাত্র দাবী হাযরামীর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ। তিনি ছিলেন তোমার হালীফ বা মিত্র। কাজেই তুমি নিজের তরফ থেকে তার বদলা দিয়ে একটি নৃশংস রক্তপাত বন্ধ করতে পার। ওতবাও প্রকৃতপক্ষে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন লোক ছিল। সে সন্তুষ্টচিত্তে হাকীমের প্রস্তাব গ্রহণ করে নিল কিন্তু যুদ্ধ পরিহারের জন্য আবু জাহ্লের সঙ্গে ঐক্যমতের প্রয়োজন। হাকীম ওতবার এ প্রস্তাব নিয়ে আবু জাহ্লের কাছে গেল। আবু জাহ্ল একথা শোনা-মাত্র তূনির থেকে তীর খুলতে খুলতে বলল, হ্যাঁ, ওতবা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গেছে, তাছাড়া ওতবার পুত্র আবু হুযাইফা ইসলাম গ্রহণ করেছে, এ যুদ্ধে তিনিও হুযুর (সাঃ)-এর সঙ্গে অংশ নিচ্ছেন। আবু জাহ্ল ওতবার প্রতি বিরূপ কটাক্ষ করে বলতে লাগল যে ওতবা এ সমস্ত কারণেই এ যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছে। যাতে তার পুত্রের কোন ক্ষতি না হয়।

আবু জাহ্ল হাযরামীর ভাই আমেরকে ডেকে বলল, দেখ, তোমাদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের সকল আয়োজন তোমাদের সামনেই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। আমের একথা শুনে আরবের রীতি মোতাবেক গায়ের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে উলঙ্গ হয়ে গেল এবং ধূলি উড়িয়ে হায় আমর! হায় আমর! বলে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করতে লাগল। এতে সমস্ত সৈনিকের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল।

---

১. ইবনে হিশাম ২য় খণ্ড ১২ পৃঃ।
২. মুন্তাখাবে কানযুল উম্মাল বদর যুদ্ধ মুসনাদে ইবনে হাম্বলের বর্ণনা অনুযায়ী।

ওতবা আবু জাহলের শ্লেষপূর্ণ উক্তির জবাবে ক্ষোভ ও ক্রোধভরে বলল, যুদ্ধক্ষেত্রই প্রমাণ করবে, কাপুরুষতার গ্লানি কে বহন করে। এ বলে সে যুদ্ধের পোশাক পরে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করল। তার মস্তক এত বড় ছিল যে সেনাবাহিনীর কারও শিরস্ত্রাণ তার মস্তকে ঢুকত না, তাই মাথায় একটি চাদর পেঁচিয়ে নিল। যেহেতু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বহস্তে রক্তের দাগ লাগানো পছন্দ করতেন না, তাই সাহাবিগণ প্রান্তরের পাশেই একটি ছাউনি নির্মাণ করে হুযুর (সাঃ)-এর অবস্থানের ব্যবস্থা করলেন। সা'দ ইবনে মাআযকে তাঁর পাহারায় রাখা হল। যাতে কেউ এদিকে আসতে না পারে।

যদিও পূর্ব থেকেই আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে মুসলমানদের বিজয়ের শুভসংবাদ ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া ছিল এবং সে মতে ফেরেশ্তাদের এক বিরাট বাহিনী মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছিল, তথাপি হুযুর (সাঃ) পার্থিব উপায়-উপকরণস্বরূপ যুদ্ধ-কৌশল হিসাবে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করলেন। মুহাজিরদের পতাকাবাহী মুসআব ইবনে ওমাইরকে নির্বাচন করলেন। খাযরাজদের পতাকা বহন করছিলেন হোবার ইবনে মোনযার এবং আওসের পতাকা বহন করছিলেন সা'দ ইবনে মা'আয।

সকাল হতেই হযরত নবী করীম (সাঃ) ব্যূহ রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। তখন তাঁর হাতে ছিল একটি তীর। তারই ইশারায় তিনি ব্যূহ সোজা করছিলেন যাতে কেউ সামান্য পরিমাণও অগ্র-পশ্চাৎ হতে না পারে।

যুদ্ধের সময়ে হৈ-চৈ কোলাহল হওয়া স্বাভাবিক বিষয়, কিন্তু হুযুর (সাঃ) সাহাবিগণকে কোন প্রকার শোরগোল করতে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। যখন শত্রুদের বিরাট বাহিনী স্বল্পসংখ্যক মুসলিম সৈনিকের হাতে পর্যুদস্ত হয়, তখন স্বভাবতই আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে কিছুটা শোরগোলের সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায়ও হুযুর (সাঃ) সম্পূর্ণ নীরব থাকতে নির্দেশ দিলেন।

মহানবী (সাঃ) ছিলেন প্রতিশ্রুতি পূরণের আদর্শ। হুযাইফা ইবনে ইয়ামান এবং আবু হামীল কোথাও থেকে আসছিলেন। রাস্তায় কাফেররা তাদের গতিরোধ করল। তারা জিজ্ঞেস করল, এরা হুযুর (সাঃ)-কে সাহায্য করতে যায় কিনা। এরা অস্বীকার করল এবং ওয়াদা করল যে এ যুদ্ধে তাঁরা অংশগ্রহণ করবেন না। অতঃপর তাঁরা মহানবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। হুযুর (সাঃ) বললেন, আমরা যে কোন অবস্থাতেই ওয়াদা পূরণ করব। আমাদের জন্য শুধু আল্লাহ্র সাহায্যই যথেষ্ট অন্য কারও নয়।[১]

---

১. সহীহ্ মুসলিম।

এখন দুটি বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি। একদিকে হক, অন্যদিকে বাতিল। একদিকে আলো, অন্যদিকে অন্ধকার। একদিকে ইসলাম, অন্যদিকে কুফর। আল্লাহ্ তা'আলা এ ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে এরশাদ করেন ঃ

"যে দুটি বাহিনী পরস্পর যুদ্ধ করেছিল, তাতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। একদল আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করছিল, অন্যদল সত্যকে প্রত্যাখ্যান করছিল।"

সত্যি বিস্ময়ের বিষয় যে বিশাল এ পৃথিবীর বুকে মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকই সেদিন তওহীদের জন্য জীবন কোরবান করতে প্রস্তুত হয়েছিল। সহীহ্ বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিনয়নম্র অবস্থায় পবিত্র হস্তদ্বয় প্রসারিত করে বলছিলেন ঃ "আয় পরওয়ারদেগার! তুমি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, আজ তা পূর্ণ কর।" এমনই নিবিষ্টচিত্তে তিনি দোয়া করছিলেন যে তাঁর কাঁধ থেকে বার বার চাদর নিচে গড়িয়ে পড়তে থাকে, কিন্তু আদৌ টের পাচ্ছিলেন না। কোন কোন সময় সেজদারত অবস্থায় বলতেন, "হে আল্লাহ্ ! যদি এ কয়েকটি জীবন ধ্বংস হয়ে যায়, তবে কেয়ামত পর্যন্ত কেউ তোমার এবাদত করবে না।"

মহানবী (সাঃ)-এর এহেন ব্যাকুল অবস্থা দেখে বিশিষ্ট সাহাবায়ে-কেরামও বিচলিত হয়ে উঠলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) নিবেদন করলেন, হুযুর! আপনাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ নিশ্চয় পূর্ণ করবেন। অবশেষে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আল্লাহ্র তরফ থেকে বিজয়ের চূড়ান্ত শুভ সংবাদ দেয়া হল। হৃষ্ট চিত্তে উচ্চারণ করলেন সেই বাণী ঃ

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ -

"শীঘ্রই কোরাইশ বাহিনী পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে এবং পালিয়ে যাবে।" (সূরা ক্বামার)

কোরাইশ বাহিনী এখন একেবারে নিকটবর্তী। তবু নবী করীম (সাঃ) স্বীয় সাহাবিদের এগিয়ে যাবার অনুমতি দিচ্ছেন না। তিনি বললেন, "দুশমন যখন নিকটে এসে পড়ে, তখন তাকে তীর দ্বারা বাধা দান কর।"

এ যুদ্ধ আত্মত্যাগের এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করেছিল। উভয় বাহিনী পরস্পর সম্মুখীন। যুদ্ধ ময়দানে দেখা গেল তাঁদেরই কলিজার টুকরো নয়নমণি তাদেরই তলোয়ারের সামনে দাঁড়ানো। হযরত আবু বকরের পুত্র (তখনও মুসলমান হননি) যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হলে আবু বকর (রাঃ) তলোয়ার কোষমুক্ত করলেন। ওতবা ময়দানে উপস্থিত হলে তার পুত্র হুযাইফা তার মোকাবিলার জন্য এগিয়ে এলেন। হযরত ওমরের তলোয়ার স্বীয় মামার রক্তে রঞ্জিত হল।

যুদ্ধের সূচনা ঃ সর্বপ্রথম আমের হাজরামী, যে স্বীয় ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধের দাবি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিল। সেই প্রথমে এগিয়ে এলো। হযরত ওমর (রাঃ)-এর ক্রীতদাস মেহ্জা তাকে বাধা দিতে গিয়ে নিহত হলেন।

কোরাইশ বাহিনীর সেনাপতি ওতবা আবু জাহলের শ্লেষপূর্ণ উক্তিতে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। কাজেই সে তার ভাই ও পুত্রদের নিয়ে সর্বপ্রথম ময়দানে নেমে মুসলমানদের মল্লযুদ্ধের জন্য আহ্বান করল। আরবের চিরাচরিত প্রথা ছিল যে কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি কোন বিশেষ প্রতীক ধারণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করত। সে অনুযায়ী ওতবার বক্ষদেশে একটি উট পাখির পালক শোভা পাচ্ছিল। আউফ, মা'আয, আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা প্রমুখ তাকে বাধা দান করার জন্য ময়দানে নামলেন। ওতবা তাদের নামসহ তাদের পরিচয় জানতে চাইল, যখন সে জানতে পারল যে তারা সবাই আনসার (মদীনার সাহায্যকারী), তখন সে বলল, তোমাদের সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নাই, তোমরা আমাদের লক্ষ্যও নও।[১] তারপর হুযুর (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলতে লাগল, মোহাম্মদ! এ সমস্ত লোক আমাদের সমকক্ষ নয়! হুযুর (সাঃ)-এর নির্দেশে আনসারগণ ফিরে এলেন এবং হযরত হামযা, আলী, উবাইদা প্রমুখ ময়দানে অবতরণ করলেন। যেহেতু তাঁরা সবাই মুখোস পরিহিত ছিলেন। ওৎবা পুনরায় তাঁদের নাম-নসবসহ্ পরিচয় জানতে চাইলেন, সকলেই স্ব-স্ব পরিচয় দান করার পর ওৎবা বলল হ্যাঁ, এখন আমাদের সমকক্ষ লোক হয়েছে। ওতবা হযরত হামযার সঙ্গে। ওয়ালিদ হযরত আলীর সঙ্গে যুদ্ধ করে মারা গেল, কিন্তু হযরত উবায়দা ওতবার ভাই শায়বার সঙ্গে যুদ্ধ করে আহত হলেন। হযরত আলী (রাঃ) এগিয়ে গিয়ে শায়বাকে কতল করলেন এবং উবায়দাকে কাঁধে করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির করলেন। উবায়দা হুযুর (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি শাহাদতের অমূল্য রত্ন হতে বঞ্চিত হলাম? হুযুর (সাঃ) বললেন, "না, তুমি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছ।" উবায়দা বলল, "আজ যদি আবু তালেব জীবিত থাকতেন, তবে স্বীকার করতেন যে তাঁর এ কাব্যের অধিকারী আমিই।"

وَنُسْلِمُهُ حَتّٰى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ ـ وَنَذْهَلُ عَنْ اَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلُ

অর্থাৎ, "আমরা যতক্ষণ যুদ্ধ করে না মরি, যতক্ষণ আমরা আমাদের স্ত্রী-পুত্রের কথা না ভুলি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মোহাম্মদ (সাঃ)-কে দুশমনের হাতে তুলে দেব না।"

হাদীসে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ওতবা বলেছিল, আমার প্রয়োজন আমার চাচাত ভাইদের। তোমাদের সঙ্গে আমার কোন প্রয়োজন নেই। এ দ্বারা আনসারদের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এর অর্থ হল এই যে রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের দাবি কোরাইশদের নিকট, আনসারদের নিকট নয়। তবে বোঝা যায় যে মক্কাবাসীরা মদীনা বাসীদের তাদের সমকক্ষ মনে করত না। সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে আবু জাহল মৃত্যুর সময় অশেষ অনুতাপ করে বলেছিল, যদি আমাকে কৃষক ছাড়া অন্য কেউ মারত, তবে আমার কোন দুঃখ হত না। মদীনার আনসারগণ কৃষি কাজ করত বলে মক্কাবাসীগণ তাদেরকে তুচ্ছজ্ঞান করত।

সাঈদ ইবনে আ'সের পুত্র উবায়দা আপাদ-মস্তক লৌহ-বর্ম পরিধান করে ব্যূহ থেকে বের হয়ে এসে যুদ্ধ আহ্বান করে বলল, "আমি আবু কুরশ।" যুবাইর (রাঃ) তার মোকাবিলা করতে ময়দানে অবতরণ করে দেখলেন, উবাইদার চক্ষু ব্যতীত আপাদমস্তক লৌহবর্মে আবৃত। সুতরাং তিনি লক্ষ্য স্থির করে তার চোখে এমনভাবে বর্শা নিক্ষেপ করলেন যে এক আঘাতেই সে ধরাশায়ী হয়ে মৃত্যুবরণ করল। বর্শাটি এমনভাবে বিদ্ধ হয়েছিল যে হযরত যুবায়ের (রাঃ) তার লাশের উপর পা রেখে সজোরে তা খুলতে সমর্থ হলেও বর্শার উভয় পাশের ধারই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পরে এ বর্শাটি একটি স্মরণীয় বস্তু হিসাবে রক্ষিত ছিল। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত যুবাইরের নিকট থেকে এ বর্শাটি চেয়ে নিয়েছিলেন। পরবর্তী চার খলীফার কাছেই সেটি হস্তান্তরিত হয়ে অবশেষে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের হস্তগত হয়।[১]

হযরত যুবাইর এ যুদ্ধে কয়েকটি মারাত্মক আঘাতে আহত হয়েছিলেন। তাঁর বাহুতে এমন আঘাত লেগেছিল যে আরোগ্যলাভের পরও তাতে একটি আঙ্গুল ঢুকে যেত। তাঁর পুত্র 'ওরওয়া' শিশুকালে এ গর্তটি নিয়ে খেলা করতেন। তিনি যে তরবারি দ্বারা যুদ্ধ করেছিলেন, যুদ্ধ করতে করতে তা তাঁর হাত থেকে মাটিতে পড়ে যায়। অতঃপর মক্কা অবরোধ যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের যখন শহীদ হন, তখন খলীফা আবদুল মালেক তাঁর পুত্র ওরওয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার পিতার তরবারি চিনতে পারবে? ওরওয়া বললেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয় পারব।" আবদুল মালেক জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন করে চিনবে?" ওরওয়া বললেন, "বদর যুদ্ধে তা এমন হয়ে গিয়েছিল।" আবদুল মালেক তাঁর কথার সত্যতা স্বীকার করে তলোয়ারটি ওরওয়াকে দিয়ে দেন। তিনি সেটির মূল্য যাচাই করলে তিন হাজার দেরহাম উঠল। তরবারিটির বাঁটে সোনালী কাজ করা ছিল।[২]

অতঃপর ব্যাপক যুদ্ধ শুরু হল। মুশরিকরা নিজেদের বল ভরসার ভিত্তিতে লড়াই করছিল। আর অপরদিকে দোজাহানের সরদার রসূল (সাঃ) সেজদায় পড়ে একমাত্র আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করে যাচ্ছিলেন।

ইসলামের প্রতি আবু জাহ্লের শত্রুতার বিষয়টি বহুল আলোচিত ছিল। ফলে, আনসারদের মধ্য থেকে মোওয়্যায ও মাআ'য নামক দু'ভাই প্রতিজ্ঞা করছিল যে এ পাপাত্মাকে যেখানেই পাওয়া যায়, হয় তাকে শেষ করে দেব, নাহয় নিজেরা মরে যাব। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ বলেন, "আমি ব্যূহের মাঝে

---

১. সহীহ্ বোখারী বদর যুদ্ধ অধ্যায়ে পূর্ণ বর্ণনা উল্লেখ আছে।
২. সহীহ্ বোখারী বদর যুদ্ধের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখি ডানে ও বামে দুটি কিশোর দাঁড়িয়ে। একজন আমার কানে কানে জিজ্ঞেস করল, আবু জাহ্‌ল কোন লোক? ওকে কি আমাদের দেখিয়ে দিতে পারবেন?" আমি বললাম, ভাতিজা! আবু জাহ্‌লের কথা জেনে কি করবে? সে বলল, "আমি আল্লাহ্‌র নামে কসম করছি যে প্রিয় নবীজী (সাঃ)-এর দুশমনটিকে যেখানেই পাব হত্যা করব, অথবা নিজে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করব।" আমি তখনো জওয়াব দিয়ে সারিনি, অপর নওজোয়ানটিও আমার কাছে এসে একই কথা জিজ্ঞেস করল। আমি দুজনকেই আবু জাহ্‌লের প্রতি ইশারা করে, দেখিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে উভয় কিশোর মিলে শিকারী বাজের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল• এবং আবু জাহ্‌ল ধরাশায়ী হল। এরা ছিল আফরার পুত্র 'মা'আয' ও 'মোওয়্যায'।[১] আবু জাহ্‌লের পুত্র ইকরিমা পেছন থেকে এসে মা'আযের বাম বাহুতে তলোয়ার দ্বারা এমনভাবে আঘাত করল যে তার বাহুটি কেটে গেল, কিন্তু পুরোপুরি তা ছিন্ন হল না। মা'আয ইকরিমার পিছু ধাওয়া করলেন, কিন্তু সে বেঁচে গেল। মা'আয এ অবস্থাতেই ঝুলন্ত হাতে যুদ্ধ করতে লাগল। এতে তাঁর খুবই অসুবিধা বোধ হচ্ছিল। শেষে তিনি ঝুলন্ত হাতটি পায়ের নিচে রেখে সজোরে টেনে ছিঁড়ে ফেললেন। এবার তিনি ছিলেন মুক্ত।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যুদ্ধের পূর্বেই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে কাফেরদের সঙ্গে যে সমস্ত লোক এসেছে তাদের মধ্যে এমনও আছে, যারা খুশীতে আসেনি বরং কোরাইশরা তাদেরকে আসতে বাধ্য করেছে। তিনি সে সমস্ত লোকদের নাম পর্যন্ত বলে দিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল আবুল বুখ্‌তারী। আনসারীদের এক মিত্র মুজায্‌যার আবুল বুখ্‌তারীকে দেখে বলল, "যেহেতু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, তাই তোমাকে ছেড়ে দিলাম।" আবুল বুখতারীর সঙ্গে তার এক বন্ধুও ছিল। আবুল বুখতারী তার বন্ধুর প্রতি ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করল একেও কি? মুজায্‌যার বললেন, না। তখন আবুল বুখতারী বলল, তবে আমি আরব্য রমণীদের এ অভিযোগ শুনতে রাজী নই যে আবুল বুখতারী নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য বন্ধুকেও ছেড়ে দিয়েছে। এ বলে সে এ কাব্যাংশটি পাঠ করতে করতে মুজায্‌যারের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করল।

"কোন শরীফ সন্তানই মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অথবা স্বীয় রাস্তা না দেখা পর্যন্ত বন্ধুকে ত্যাগ করতে পারে না।"

ওতবা ও আবু জাহ্‌লের মৃত্যুতে কোরাইশ বাহিনীর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণরূপে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল।

---

১. কোন কোন বর্ণনায় দুটি নওজোয়ানের নাম মা'আয ইবনে ওমর ও মা'আয বিন আফরা বলে বর্ণিত হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরম দুশমন উমাইয়্যা ইবনে খালফ্ও বদর যুদ্ধে শরীক ছিল। এক সময়ে আবদুর রহ্মান ইবনে আউফ তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে যদি কোন সময় তুমি মদীনায় আস, তবে আমি তোমার জীবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করব। বদর যুদ্ধের সময় এ দুশমনের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করার সুবর্ণ সুযোগ এলেও যেহেতু প্রতিশ্রুতি পূরণ করা ইসলামের একটি মূলনীতি বিধায় আবদুর রহ্মান ইবনে আউফ চাইছিলেন, সে যেন কোন প্রকারে প্রাণে বেঁচে যায়। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাকে নিয়ে এক পাহাড়ে চলে গেলেন। দৈবক্রমে বিলাল তাকে দেখতে পেয়ে আনসারদের খবর দিয়ে দিলেন। দলে দলে লোক এসে ভিড় করল। তিনি উমাইয়্যার পুত্রকে এগিয়ে দিলেন। জনতা তাকে হত্যা করেও তৃপ্ত হল না। উমাইয়্যার প্রতি এগুতে লাগল। তখন আবদুর রহ্মান ইবনে আউফ তাকে বললেন, তুমি মাটিতে শুয়ে পড়। সে শুয়ে পড়ল। তিনি তার উপর শুয়ে তার সমস্ত শরীর ঢেকে দিলেন, যাতে কেউ তাকে হত্যা করতে না পারে। কিন্তু জনতা তাঁর পায়ের নিচে দিয়ে আঘাত করে উমাইয়্যাকে হত্যা করল। এতে হযরত আবদুর রহ্মান ইবনে আউফের একটি পা আহত হল। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এ আঘাতে চিহ্ন তার পায়ে বর্তমান ছিল।[১]

আবু জাহ্ল ও ওতবার মৃত্যুর পর কোরাইশ বাহিনী হাতিয়ার ফেলে দিলে মুসলমানেরা তাদেরকে গ্রেফতার করতে লাগল।

হযরত আব্বাস, হযরত আলীর ভাই আকীল, নওফেল, আসওয়াদ ইবনে আমের, আবদুল্লাহ্ ইবনে জাময়াসহ্ কোরাইশদের অনেক শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দও বন্দী হল।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, তোমাদের কেউ গিয়ে আবু জাহ্লের পরিণতি দেখে এসে আমাকে জানাও। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ গিয়ে দেখলেন, অসংখ্য লাশের মধ্যে আহত আবু জাহ্ল মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি আবু জাহ্ল?" সে বলল, "এক ব্যক্তিকে তার স্বগোত্রের লোকেরা হত্যা করেছে, তাতে গর্বের কি থাকতে পারে?" আবু জাহ্ল একবার আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদকে চপেটাঘাত করেছিল তিনি তাঁর প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে তার কাঁধে পা রেখে দিলেন। আবু জাহ্ল বলল, "হে বকরীর রাখাল ! দেখ্ত কোথায় পা রেখেছিস।" অবশেষে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ তার শিরচ্ছেদ করে ফেললেন এবং তার ছিন্ন মস্তক এনে হুযুর (সাঃ)-এর পায়ের সামনে রেখে দিলেন।

---

১. সহীহ্ বোখারী কিতাবুল ওয়াকালা। কিতাবুল মাগাযীতে এ ঘটনার উল্লেখ নেই বলে এর প্রতি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি পড়েনি।

পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণ সাধারণত বস্তুবাদী। বস্তুজগতের প্রত্যেকটি ঘটনাকেই তাঁরা বাস্তবতার নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ করে থাকে। তাঁরাও এ চিন্তা করে দিশেহারা হয়ে পড়েন যে মাত্র তিনশ' পদাতিক লোক, কেমন করে একশ' অশ্বারোহীসহ এক হাজার সৈন্যের একটি সুসজ্জিত বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্র কুদরতি সাহায্যে এরূপ বহু অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। তবুও বস্তুবাদীদের সান্ত্বনার জন্য এ যুদ্ধেই যথেষ্ট উপাদান বিদ্যমান ছিল। কোরাইশদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ছিল না। সেনাপতি ওতবা যুদ্ধ করতে অসম্মত ছিল। যোহ্রা গোত্রের লোকেরা বদর পর্যন্ত এসেও ফিরে গিয়েছিল। প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুণ অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে কোরাইশ বাহিনী যে স্থানে অবস্থান করছিল, সেখানে কাদার জন্য চলাফেরা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। ভীতসন্ত্রস্ত কোরাইশ বাহিনী প্রতিপক্ষ মুসলিম সৈন্য সংখ্যাকে ভ্রান্তিমূলকভাবে নিজেদের দ্বিগুণ ভাবছিল। পবিত্র কোরআনে এ ঘটনার আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

"ওরা দিব্য দৃষ্টিতে মুসলমানদের নিজেদের দ্বিগুণ দেখছিল।" কাফেরদের সেনাবাহিনীর কোন প্রশিক্ষণ ছিল না। তারা ব্যূহও রচনা করেনি। পক্ষান্তরে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজ হাতে একান্ত শৃংখলার সঙ্গে মুসলিম বাহিনীকে ব্যূহ রচনা করে দিয়েছিলেন। সারারাত মুসলিম বাহিনী নিশ্চিন্তে নিদ্রায় কাটায়। কিন্তু অপর দিকে কাফেররা অস্বস্তি ও অস্থিরতার দরুন সারারাত শুতেও পারেনি। অনিদ্রায় রাত কাটাতে হয় তাদের। এ তো গেল বাহ্যিক উপকরণ, কিন্তু অপরদিকে, মুসলমানদের ঐক্য ও দৃঢ় মনোবলই ছিল আল্লাহ্র সাহায্য। কিন্তু যদি কোরাইশ বাহিনী ও মুসলিম বাহিনীর তুলনামূলক পর্যালোচনা করা যায়, তবে কি সামরিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মুসলমানদের বিজয়ের আশা করা যেতে পারে? কোরাইশ বাহিনীতে এমন সব বড় বড় সম্পদশালী লোক অংশগ্রহণ করেছিল, যারা একাই সমস্ত বাহিনীর রসদ ও সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে পারত। অপরপক্ষে, মুসলমানদের কিছুই ছিল না। কোরাইশ বাহিনীর সংখ্যা ছিল এক হাজার আর মুসলমান ছিলেন মাত্র তিনশ'। কোরাইশদের ছিল একশ' অশ্বারোহী আর মুসলমানদের নিকট মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল। মুসলিম বাহিনীর অধিকাংশ সৈনিকের পর্যাপ্ত হাতিয়ার ছিল না। অপরদিকে কোরাইশ বাহিনীর প্রত্যেকটি সদস্য লৌহ বর্মে সম্পূর্ণ আবৃত ছিল।

তা সত্ত্বেও যুদ্ধাবসানের পর দেখা গেল যে মুসলমানদের মাত্র চৌদ্দ ব্যক্তি শাহাদতবরণ করেছেন। ছয়জন মুহাজির ও আটজন আনসার। অপর দিকে এ যুদ্ধে কোরাইশদের মূল শক্তিই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কোরাইশদের স্বনামধন্য বীর বিভিন্ন গোত্রের নেতৃবৃন্দ একে একে সবাই এ যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। তন্মধ্যে

শায়বা, ওতবা, আবু জাহল, আবুল বোখতারী, জামআ ইবনে আসওয়াদ, আ'স ইবনে হিশাম, উমাইয়্যা ইবনে খাল্‌ক, মাম্‌বাহ্‌ ইবনে হাজ্জাজ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কোরাইশদের মাথার মণি ছিল। মোটকথা এসব নেতাসহ ৭০ ব্যক্তি নিহত এবং অনুরূপ সংখ্যক বন্দী হয়েছিল। যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে ওকবা এবং নজর ইবনে হারেসকে হত্যা করা হয়েছিল। অবশিষ্ট বন্দীদের মদীনায় নিয়ে আসা হয়। তন্মধ্যে হযরত আব্বাস, আলীর ভাই আকীল, হুযুর (সাঃ)-এর কন্যার স্বামী আবুল আসও ছিলেন।

যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর নিয়ম ছিল, যেখানেই তিনি কোন লাশ দেখতেন, সেটিকে দাফন করিয়ে দিতেন।[১] কিন্তু এ যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা ছিল অনেক। এ জন্য প্রতিটি লাশ পৃথক পৃথক দাফন করা খুবই কঠিন ছিল বলে নিকটবর্তী একটি প্রশস্ত কূপের মধ্যে সমস্ত লাশ একত্রে ফেলে দেয়া হয়। কিন্তু উমাইয়্যার লাশ এমনভাবে ফুলে যায় যে সেটিকে স্থানান্তরিত করা সম্ভব ছিল না। সেটিকে সেখানেই মাটি চাপা দেয়া হয়।

মদীনায় যখন যুদ্ধবন্দীদের রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সামনে পেশ করা হল, তখন উম্মুল-মুমিনীন হযরত সাওদাও উপস্থিত ছিলেন। বন্দীদের মধ্যে তাঁর আত্মীয় সুহাইল ইবনে আমরকে দেখে তিনি নিজের অজান্তেই বলে উঠলেন, "তুমি মেয়েদের মত বেড়ি পরছ কেন? যুদ্ধ করে মরতে পারলে না?"[২]

রসূল (সাঃ) যুদ্ধবন্দীদের দু' দু' চার চারজন করে প্রত্যেক সাহাবীকে ভাগ করে দিয়ে তাদের আরাম-আয়েশের প্রতি লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ দিলেন। রসূল (সাঃ) এবং সাহাবীগণ তাঁদের সঙ্গে এমন উদার ব্যবহার করলেন যে তাঁরা নিজেরা খেজুর খেয়ে দিন কাটাতেন এবং বন্দীদের জন্য নিয়মিত খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এ যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে হযরত মুসআব ইবনে উমাইরের ভাই আবু আযীযও ছিল। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন যে, যে-সমস্ত আনসার আমাকে তাঁদের গৃহে আবদ্ধ রাখেন, যখন সকাল বা সন্ধ্যায় খাবার নিয়ে আসতেন তখন আমার সামনে রুটি দিয়ে তাঁরা নিজেরা খেজুর খেতেন। তাতে আমি খুবই লজ্জা পেতাম। আমি তুলে নিয়ে তাঁদের হাতে দিয়ে দিতাম, কিন্তু তাঁরা তাতে হাতও লাগাতেন না। আবার আমাকে ফিরিয়ে দিতেন। এর একমাত্র কারণ ছিল এ যে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) তাদেরকে বন্দীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৩]

১. রাওজুল আনূফ।
২. ইবনে হিশাম।
৩. তাবারী, ১৩৩৮ পৃঃ।

যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে সুহাইল ইবনে আমর নামে এক কবিও ছিল, প্রকাশ্য সভায় সে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করত। হযরত উমর (রাঃ) বললেন, হুযুর! এ লোকটির নিচের দুটি দাঁত উপড়ে দেয়া হোক। তাহলে সে আর ভালভাবে কথাই বলতে পারবে না! রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, যদি আমি তার অঙ্গ বিকৃতি করি, তবে যদিও আমি নবী কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এর বদলায় আমারও অঙ্গ বিকৃতি করে দিতে পারেন।[১]

যুদ্ধবন্দীদের কারও অতিরিক্ত কাপড় ছিল না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু হযরত আব্বাস এত লম্বা ছিলেন যে কারও জামা তাঁর শরীরে ঠিকমত লাগত না। মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর সমান উঁচু ছিল। সে তার জামা আনিয়ে হযরত আব্বাসকে দান করল। সহীহ্ বোখারীর বর্ণনায় আছে সে দয়ার প্রতিদানেই হযরত আব্বাস (রাঃ) আবদুল্লাহ্‌র কাফনের জন্য স্বীয় জামা দান করেছিলেন।[২]

সাধারণত বর্ণিত আছে যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় এসে যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন যে এদের সম্পর্কে কি করা যায়? হযরত আবু বকর (সাঃ) আরয করলেন, এদের প্রায় সবাই আত্মীয়স্বজন, সুতরাং ফিদইয়া বা মুক্তিপণের বিনিময়ে এদের ছেড়ে দেয়া হোক। কিন্তু হযরত ওমরের (রাঃ) নিকট ইসলামের ব্যাপারে আত্মীয়-অনাত্মীয়, দোস্ত ও দুশমনের কোন ভেদাভেদ ছিল না। তিনি পরামর্শ দিলেন যে এদের সবাইকে হত্যা করা হোক এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বললেন যে আমাদের প্রত্যেকেই স্বহস্তে তার নিকটতম আত্মীয়কে কতল করবে। কিন্তু রহ্‌মাতুল্‌লিল আলামীন হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে মুক্তিপণ গ্রহণপূর্বক বন্দীদের মুক্তি ঘোষণা করলেন। এতে আল্লাহ্ তা'আলা ভর্ৎসনাপূর্বক আয়াত নাযিল করলেন।

"যদি আল্লাহ্‌র বিধান পূর্বেই লেখা না হত, তবে তোমরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছ, এ ব্যাপারে কঠিন শাস্তি নাযিল হত।" আল্লাহ্ তা'আলার এ ভর্ৎসনা বাক্য শুনে হুযুর (রাঃ) স্বয়ং এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) কেঁদে ফেললেন।

সমস্ত ইতিহাসেই এবং হাদীসের কিতাবসমূহেও এ বিষয়টি উদ্ধৃত রয়েছে। কিন্তু ভর্ৎসনার কারণ সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। তিরমিযীর বর্ণনা অনুযায়ী এ সিদ্ধান্তের কারণ এই যে, তখনও গনীমতের মাল সম্পর্কে কোন নির্দেশ নাযিল হয়নি, অথচ সাহাবীগণ আরবের প্রাচীন প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী গনীমতের মাল

১. তাবারী ১৩৪৪ পৃঃ।
২. সহীহ বোখারী ৪৪২ পৃঃ।

ব্যয় করেছিলেন। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলার ভর্ৎসনা নাযিল হয়েছিল। যেহেতু, এ সম্পর্কে পূর্বে কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি, তাই এ অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে যে গনীমতের সমস্ত মাল হাতে এসেছিল তার বৈধতা ঘোষণা করে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ

অর্থ ঃ "যে সমস্ত মাল গনীমত হিসাবে তোমাদের হস্তগত হয়েছে, তা তোমাদের জন্য হালাল ও পবিত্র। এখন তা খাও।" (আন্‌ফাল)

এ আয়াতে স্পষ্টভাবেই বিবৃত হয়েছে, যে সমস্ত মাল হাতে এসেছে তা বৈধ করা হয়েছে। বস্তুত, তাই ছিল গনীমতের মাল। মোটকথা, সহীহ্ মুসলিম এবং তিরমিযীর ভাষ্য অনুযায়ী গনীমতের মাল অথবা মুক্তিপণ এ দুটির একটি ছিল ভর্ৎসনার কারণ। সহীহ্ মুসলিমে আছে, যখন ভর্ৎসনার আয়াত নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) কাঁদতে লাগলেন এবং যখন হযরত ওমর তাঁর ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন, তখন বললেন, "তোমার সাথীরা যে মুক্তিপণ আদায় করেছে তাতে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে যা নাযিল হয়েছে তাই আমার ক্রন্দনের কারণ।" ভুল বোঝাবুঝির দরুন সাধারণত মানুষ মনে করেছিল যে বন্দীদের হত্যা না করে মুক্তি দেয়াতেই ভর্ৎসনা নাযিল হয়ে থাকবে। অতএব, এ আয়াতকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

"কোন নবীর জন্য উচিত নয় যে ভালরূপ রক্তপাত ছাড়া মানুষকে বন্দী করবে।"

এ আয়াতের অর্থ এই যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণ রক্তপাত ব্যতীত বন্দী করা উচিত নয়। এতে কিভাবে প্রমাণিত হবে যে রক্তপাতের পূর্বে যে সমস্ত লোক বন্দী হবে, যুদ্ধাবসানের পর তাদের হত্যা করা যাবে?

যাহোক, প্রত্যেক যুদ্ধবন্দীর কাছ থেকে চার হাজার দেরহাম হারে মুক্তিপণ আদায় করা হল। যারা অভাবের দরুন মুক্তিপণ আদায় করতে ব্যর্থ হল, তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হল এবং তাদের যারা লেখা জানত তাদের প্রতি নির্দেশ হল তাদের প্রত্যেকে দশটি করে বালককে লেখা শিখিয়ে দিয়ে মুক্তি লাভ করবে।[১] হযরত যায়েদ ইবনে সাবেতও এভাবেই লেখা শিখেছিলেন।[২]

১. ইবনে হাম্বল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৬।
২. তাবকাতে ইবনে সা'আদ, পৃঃ ১৪।

আনছারগণ হুযুরের খেদমতে নিবেদন করলেন যে আব্বাস আমাদের ভাগিনা, আমরা তাঁর ফিদইয়ার দাবী ত্যাগ করছি। যদিও হযরত আব্বাস (রাঃ) ছিলেন নবী করীম (সাঃ)-এর আপন চাচা কিন্তু সমতার ভিত্তিতে হুযুর (সাঃ) তাঁদের এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন এবং তাঁকেও ফিদইয়া আদায় করে মুক্তিলাভ করতে হল। ফিদইয়ার সাধারণ পরিমাণ ধার্য করা হয়েছিল চার হাজার দেরহাম। কিন্তু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ফিদইয়া আরও বেশি ছিল। হযরত আব্বাস (রাঃ) সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে অতিরিক্ত মুদ্রা আদায় করা হয়। তিনি হুযুরের (সাঃ) নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগও করেছিলেন। কিন্তু তখনও তিনি জানতেন না যে ইসলাম যে সমতা[১] প্রতিষ্ঠা করেছে তাতে আপন-পর, আত্মীয়-অনাত্মায়ীয়ের যাবতীয় বৈষম্য চিরদিনের জন্য মিটিয়ে দিয়েছে। (কিন্তু একদিকে সমতা প্রতিষ্ঠায় কর্তব্যের তাড়না, অপরদিকে মহব্বতের প্রেরণা)। বন্দী অবস্থায় হযরত আব্বাসের ক্রন্দন শুনে হুযুর (সাঃ) সারা রাত ঘুমুতে পারেননি। লোকেরা যখন তাঁর বন্ধন খুলে দিল। তখন তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কন্যার স্বামী আবুল আসও যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে ছিলেন। তাঁর কাছে ফিদইয়ার অর্থ ছিল না। তাঁর স্ত্রী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কন্যা হযরত জয়নবকে ফিদইয়ার অর্থ পাঠিয়ে দেয়ার জন্য খবর দেয়া হল। তখন তিনি মক্কায় ছিলেন। হযরত জয়নবের বিয়ের সময় খাদীজা (রাঃ) উপহারস্বরূপ তাঁকে একটি মূল্যবান হার দিয়েছিলেন। হযরত জয়নব (রাঃ) ফিদইয়ার অর্থের সঙ্গে সে মূল্যবান হারটিও পাঠিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সেটি দেখলেন; তখন পঁচিশ বছরের দাম্পত্য জীবনের ঘটনাবলী স্মরণ করে অতিকষ্টেও অশ্রু দমন করতে পারলেন না, তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেঁদে ফেললেন। সাহাবিদের লক্ষ্য করে বললেন; "যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তবে আমার কন্যাকে তার মায়ের এ স্মৃতি চিহ্নটি ফেরত পাঠিয়ে দিতে পার।" সবাই তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করে হার খানা ফেরত পাঠিয়ে দেন।[১]

আবুল আস মুক্তিলাভ করে মক্কায় এসে হযরত জয়নবকে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। আবুল আস ছিলেন একজন ধনী ব্যবসায়ী। কয়েক বছর পর বিপুল বাণিজ্যসম্ভারসহ তিনি সিরিয়ায় গিয়েছিলেন। সিরিয়া থেকে ফেরার পথে মুসলমানরা মাল-সামানসহ তাঁকে বন্দী করে তাঁর সমস্ত মালামাল সাহাবীদের ভাগ-বন্টন করে দেন। তিনি নিজে কোন প্রকারে লুকিয়ে হযরত জয়নবের কাছে

১. বোখারী, পৃঃ ৫৭২।
২. তাবারী পৃঃ ৩৪৮ এবং আবু দাউদ।

এসে আশ্রয় নেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবীদের ডেকে বললেন, "তোমরা যদি ভাল মনে কর, তবে আবুল আসের আসবাবপত্র ফেরত দিয়ে দাও।" সাহাবিগণ আবার সম্মতিতে মাথা অবনত করেন এবং যার কাছে যা ছিল সমস্ত আসবাবপত্র ফেরত দিয়ে দিলেন। এবারের আক্রমণ বেকার যায়নি। আবুল আস মক্কায় এসে সমস্ত অংশীদারদের হিসাব-নিকাশ বুঝিয়ে দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর অংশীদারদের বলেন যে আমি এখানে এসেই এ জন্যই তোমাদের হিসাবপত্র বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছি যাতে তোমরা একথা বলতে না পার যে আবুল আস আমাদের অর্থ আত্মসাত করে হিসাব দেয়ার ভয়ে মুসলমান হয়ে গেছে।

বদরের যুদ্ধের খবর যখন মক্কায় পৌছল, তখন ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল পড়ে গেল। অবশ্য অপমানবোধে কোরাইশরা ঘোষণা করে দিয়েছিল যে কেউ কাঁদতে পারবে না। এ যুদ্ধে কবি আসওয়াদের তিনটি পুত্র নিহত হয়। তার অন্তর ফেটে গেলেও জাতীয় ইজ্জতের খাতিরে সেও কাঁদতে পারেনি। ঘটনাক্রমে একদিন ক্রন্দনের ধ্বনি শুনে সে মনে করল, হয়ত কোরাইশরা কাঁদার অনুমতি দিয়েছে। কে কাঁদছে জানার জন্য ভৃত্যকে নির্দেশ করল ঃ "দেখ্ত কাঁদার অনুমতি হয়েছে কি না? আমার সিনায় আগুন লেগে আছে। দিল খুলে কাঁদতে পারলেই হয়ত কিছুটা শান্তি পেতাম।" ভৃত্য ফিরে এসে জানাল, একটি স্ত্রীলোক উট হারিয়ে গেছে এ জন্য সে কাঁদছে। একথা শুনে আস্ওয়াদ বলে উঠল ঃ

اَتَبْكِىْ اَنْ يَّضِلَّ لَهَا بَعِيْرٌ -- وَيَمْنَعُهَا مِنَ النَّوْمِ السُّهُوْدُ

وَلَا تَبْكِىْ عَلٰى بِكْرٍ وَّلٰكِنْ -- عَلٰى بَدْرٍ تَقَاصَرَتِ الْجُدُوْدُ

فَبَكِّىْ اِنْ بَكَيْتِ عَلٰى عَقِيْلٍ -- وَبَكِّىْ حَارِثًا اَسَدَ الْاُسُوْدِ

অর্থ ঃ "একটি উট হারানোর শোকে সে কাঁদছে, তার ঘুম আসে না। হে নারী! উটের জন্য কেঁদো না, বরং বদরের কথা স্মরণ করে কাঁদ। যেখানে আমাদের ভাগ্যের বিপর্যয় ঘটেছে। যদি কাঁদতেই হয়, তবে বীরবর আকীল ও হারেসের জন্য কাঁদ।"

কোরাইশদের মধ্যে উমাইর ইবনে ওয়াহাব ইসলামের কঠিন দুশমন ছিল। একদিন সে এবং সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা বদরে নিহত ব্যক্তিদের জন্য শোক প্রকাশ করছিল। সাফওয়ান বলল, "খোদার কসম! এখন আর বাঁচার সাধ নেই।" উমাইর বলল, "সত্যই বলছ। যদি আমার মাথায় ঋণের বোঝা এবং ছেলেমেয়েদের চিন্তা না থাকত,তবে মদীনায় গিয়ে মোহাম্মদ (সাঃ)-কে হত্যা করে

ফিরে আসতাম, আমার পুত্রও সেখানে বন্দী।" সাফওয়ান বলল, "তুমি তোমার ছেলেমেয়ে ও ঋণের জন্য কোন চিন্তা করো না, আমি এ সমস্তের জন্য যিম্মাদার।" উমাইর ঘরে এসে তলোয়ারটি বিষাক্ত পদার্থে ভিজেয়ে নিয়ে মদীনায় উপনীত হয়। কিন্তু সে হযরত ওমরের (রাঃ) সন্ধানী চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। ভাব-ভক্তি দেখে হযরত ওমরের (রাঃ) মনে সন্দেহ হল। তিনি তাকে ঘাড় ধরে হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির করলেন। হুযুর (সাঃ) বললেন, "ওমর (রাঃ) একে ছেড়ে দাও।" তারপর বললেন, "উমাইর! তুমি আমার কাছে আস।" রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "কি উদ্দেশ্যে আগমন!" সে উত্তর দিল, "পুত্রকে মুক্ত করতে এসেছি।" হুযুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "তবে তলোয়ার কেন!" উমাইর প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারল না। তখন হুযুর (সাঃ) বললেন, "তুমি এবং সাফওয়ান একত্রে বসে আমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করনি কি?" উমাইর একথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল এবং তখনই বলে উঠল, "হে মোহাম্মদ (সাঃ) নিশ্চয়ই আপনি পয়গম্বর। আমি এবং সাফওয়ান ব্যতীত এ ঘটনা সম্পর্কে আর কেউই অবগত নয়।" কোরাইশরা যেখানে মহানবীর কতলের খবর শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, তারা তার পরিবর্তে উমাইরের ইসলাম গ্রহণের খবর শুনল।

উমাইর ইসলাম গ্রহণ করে বীরদর্পে মক্কায় ফিরে এলেন। তখন মক্কার প্রতিটি ধূলিকণাও মুসলমানদের রক্তের পিপাসায় অধীন ছিল। এ অবস্থায় ইসলামের পূর্বতন পরম শত্রু এবার মক্কায় এসে ইসলামের প্রচার শুরু করলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোককে ইসলামে দীক্ষিত করে করেন।[১]

পবিত্র কোরআনে বদর যুদ্ধের আলোচনা

অন্যান্য যুদ্ধের তুলনায় এ যুদ্ধের একটি বিশেষত্ব এই যে এর বিস্তারিত আলোচনা এবং এতে আল্লাহ্ তা'আলার বিভিন্ন অনুগ্রহ ও যুদ্ধ সংক্রান্ত বিবিধ মাসআলার আলোচনার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনের একটি সূরা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। বাস্তব ঘটনার অবগতির জন্য এর চেয়ে সত্য ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আসমানের নিচে দ্বিতীয় আর নেই। আল্লাহ্ তা'আলা সূরায়ে আনফালে বলেন ঃ

(١)- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ....
وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ -

অর্থ ঃ "বিশ্বাসী তারাই যখন আল্লাহুর নাম স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর ভয়ে কেঁপে ওঠে এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াত পাঠ করা হয়, তখন

১. তাবারী পৃঃ ১৩৫৪।

তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তারা তাদের পালনকর্তার প্রতিই সমর্পিত হয়ে যায়।"

যারা সালাত কায়েম করে এবং আমার দেয়া জীবিকা থেকে সদ্ব্যয় করে, তারাই প্রকৃত মোমেন। তাদের পালনকর্তার নিকট তাদের উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার ব্যবস্থা রয়েছে। এটি এমনি ব্যাপার, যেমন আপনার পালনকর্তা আপনাকে ন্যায়ভাবে ঘর থেকে বের করলেন, অথচ একদল ঈমানদার তা পছন্দ করল না। সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা আপনার সঙ্গে বিতর্ক করে; মনে হয় তারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে। আর তারা যেন তা প্রত্যক্ষভাবে দেখছে। স্মরণ কর, আল্লাহ্ তখন তোমাদের ওয়াদা দিলেন যে দু'দলের যে কোন একদল তোমাদের আয়ত্তে আসবে, অথচ তোমরা কামনা করছিলে যে নিরস্ত্র দলটি তোমাদের হাতে আসুক। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল যে তিনি সত্যকে তাঁর বাণীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং অবিশ্বাসীদের নির্মূল করে দেবেন।"

"এমনটা এ জন্যই ঘটেছিল যাতে তিনি এর দ্বারা সত্যকে সত্য এবং অসত্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করতে পারেন ; যদিও অপরাধীরা তা পছন্দ করে না।"

"যখন তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকট বিনীত প্রার্থনা করেছিলে, তিনি তা কবুল করেছিলেন। আমি তোমাদের এক হাজার ফেরেশ্তার দ্বারা সাহায্য করব, তারা একের পর এক আসবে।"

"আল্লাহ্ তাই করলেন, শুধু মাত্র তোমাদের শুভ সংবাদ দেয়ার জন্য এবং যাতে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে। আর সাহায্য আসে শুধু আল্লাহ্র নিকট হতেই। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

"স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের স্বস্তির জন্য তোমাদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে দেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র ও স্নিগ্ধ করার জন্য আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তোমাদের হৃদয় হতে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করে দেন ও তোমাদের হৃদয়কে মজবুত এবং তোমাদের পা'কে দৃঢ় করে দেন।"

"যখন তোমাদের পালনকর্তা ফেরেশ্তাদের নির্দেশ করলেন যে আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, সুতরাং ঈমানদারদের অবিচল রাখ। আমি অবিশ্বাসীদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করব ; অতএব, তোমরা ওদের কাঁধে ও সর্বাংগে আঘাত কর, এ জন্যই যে ওরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে, আল্লাহ্ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।"

"সুতরাং তোমরা এর আস্বাদ গ্রহণ কর এবং অবিশ্বাসীদের জন্য আগুনের শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।"

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা অবিশ্বাসীদের সম্মুখীন হবে, তখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। সেদিন যুদ্ধকৌশল অবলম্বন কিংবা স্বদলে স্থান লওয়া ব্যতীত যদি কেউ তাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তবে সে তো আল্লাহ্‌র বিরাগ ভাজন হবেই এবং তার আশ্রয় হবে জাহান্নাম, আর সেটি কতইনা নিকৃষ্ট স্থান!"

"তোমরা ওদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহ্‌ই হত্যা করেছেন। আর তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তুমি নিক্ষেপ করনি, বরং আল্লাহ্‌ই তা নিক্ষেপ করেছিলেন। এটা শুধু মোমেনদের উত্তম পুরস্কার দান করার জন্য, আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"

"এভাবেই আল্লাহ্‌ অবিশ্বাসীদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করেন। তোমরা সত্যের বিজয় কামনা করছিলে; তা তোমাদের কাছে এসেছে। হে অবিশ্বাসীরা! যদি তোমরা বিরত থাক, তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি তোমরা পুনরায় এরূপ কর, তবে আমিও পুনরায় শাস্তি দেব এবং তোমাদের দল সংখ্যায় অধিক হলেও তা তোমাদের কোন কাজে আসবে না এবং আল্লাহ্‌ মোমেনদের সঙ্গে রয়েছেন।"

(٢) وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ

وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ ...... وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ

অর্থ ঃ "আর জেনে রেখো, যুদ্ধে তোমরা যা গনীমত লাভ করেছ, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র রসূলের, রসূলের স্বজনদের, পিতৃহীনদের, দরিদ্রদের এবং মুসাফিরদের, যদি তোমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস কর। যেদিন দু'দল পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিলে, তখন আমি আমার বান্দার উপর যা অবতীর্ণ করেছি যদি তাতে বিশ্বাস কর, বস্তুত আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। স্মরণ কর, তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে এবং তারা ছিল দূর-প্রান্তে। আর উষ্ট্রারোহী দল তোমাদের অপেক্ষায় নিম্নভূমিতে অবস্থান করছিল! যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করতে চাইতে, তবে এ সম্বন্ধে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হত; কিন্তু যা ঘটার ছিল তা সম্পন্ন করার জন্য আল্লাহ্‌ উভয় দলকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সমবেত করলেন, যাতে যে ধ্বংস হবে আর যে জীবিত থাকবে সেও যেন স্পষ্টভাবে সত্যাসত্য প্রকাশের পর জীবিত থাকে, আল্লাহ্‌ সবশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"

"স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্‌ আপনাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে ওরা সংখ্যায় অল্প, যদি আপনাকে দেখাতেন যে ওরা সংখ্যায় অধিক, তবে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং যুদ্ধ সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তোমাদের রক্ষা করেছেন। কেননা, অন্তরের ভেদ সম্পর্কে তিনি বিশেষ অবহিত।"

"স্মরণ কর, যা ঘটবার ছিল, তা সম্পন্ন করার জন্য যখন তোমরা পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিলে, তখন তিনি তাদের তোমাদের দৃষ্টিতে সংখ্যায় নগণ্য দেখিয়েছিলেন এবং তোমাদের তাদের দৃষ্টিতে সংখ্যায় বিপুল দেখিয়েছিলেন। সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌রই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।"

"হে মুমেনগণ ! যখন তোমরা কোন শত্রুদলের সম্মুখীন হবে, তখন অটল থাকবে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার।"

"আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা মনোবল হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের চিত্তের দৃঢ়তা বিনষ্ট হবে। তোমরা ধৈর্যধারণ কর। জেনো, আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।"

"তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা গর্বভরে ও লোক দেখানোর জন্য স্বগৃহ থেকে বের হয় এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে লোকদের বাধা দান করে। তারা যা করে আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।"

(৩) مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ.....

اِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ـ

অর্থ : "দেশ সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধবন্দীকে আটকে রাখা নবীর পক্ষে সঙ্গত হত না। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর, আর আল্লাহ্ চান তোমাদের পারলৌকিক কল্যাণ। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

"আল্লাহ্‌র বিধান পূর্ব থেকে নির্ধারিত না থাকলে, তোমরা যা গ্রহণ করেছ সেজন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি নাযিল হত।"

"যুদ্ধে তোমরা যা কিছু লাভ করেছ তা বৈধ ও পবিত্র। তোমরা তা খাও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

"হে নবী! আপনার আয়ত্তাধীন বন্দীদেরকে বলুন, যদি আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে ভাল কিছু দেখেন, তবে তোমাদের কাছ থেকে যা নেয়া হয়েছে তা অপেক্ষা সে উত্তম কিছু তোমাদের দান করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

"ওরা আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইলে করতে পারে। কারণ, ওরা পূর্বে আল্লাহ্‌র সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করেছেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।"

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এ বিশেষ অনুগ্রহের কথা ওহুদ্ যুদ্ধের সময় স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন ঃ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ -

অর্থ ঃ "আল্লাহ্ তোমাদের বদরে সাহায্য করেছেন, তখন তোমরা দুর্বল ছিলে, অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। হয়ত এতে তোমরা শোকরগুজার হবে।"

পর্যালোচনার দৃষ্টিতে বদরের যুদ্ধ

ঘটনাবলীর সাধারণ আলোচনার পর এখন বদর যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করার সময় এসেছে। সাধারণ ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, আক্রমণকারী কোরাইশদের প্রতিরোধ অথবা আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য-কাফেলা লুট, এ দুটির যে কোন একটি ছিল বদর যুদ্ধের উদ্দেশ্য।

আমরা বিশেষভাবেই অবগত যে ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনা কার্যত দেওয়ানী আদালতের ঘটনা বিবরণী লিপিবদ্ধ করার কাজ নয়, এতদুভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। আমরা এ সত্যও স্বীকার করি যে ইতিহাসের ঘটনাপ্রাহ্ বিকৃত বা পরিবর্তন করা আমাদের দায়িত্ব নয়। কিন্তু অনেকের হাতেই বদরের ঐতিহাসিক ঘটনাটি তার প্রকৃত স্বরূপ অতিক্রম করে দেওয়ানী মোকদ্দমার নথিপত্রের রূপ পরিগ্রহ করেছে। কাজেই আমরাও আমাদের ভূমিকা পরিহার করে বিচারকের ভূমিকা পালনে কলম ধরতে বাধ্য হয়েছি।

এ সিদ্ধান্তে আমার প্রতিপক্ষ হবেন সাধারণ ঐতিহাসিকগণ। তবে এতে আমরাও খুব একটা সন্ত্রস্ত নই। কারণ, সত্য একাই বিজয়লাভ করে। আর তা খুব শীঘ্রই পাঠকদের সম্মুখে পেশ করতে পারব বলে আশা করি। কথার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য সর্বপ্রথম মূল ঘটনাটির অবতারণা প্রয়োজন।

মূল ঘটনা—আমর হাযরামীর 'কতল' সমস্ত মক্কাবাসীকে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্বেলিত করেছিল এবং এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে বহু ছোট ছোট সংঘর্ষও হয়ে গিয়েছিল। দু'পক্ষই একে অন্যকে ঘায়েল করার সুযোগের সন্ধান করছিল। এমতাবস্থায় সাধারণত যা হয়, মিথ্যা গুজব প্রচারিত হয়ে পরিস্থিতিকে জটিল হতে জটিলতর করে তুলল। এমনি সময়ে আবু সুফিয়ান বাণিজ্য-কাফেলা নিয়ে সিরিয়া গমন করেছিল। সে সিরিয়ায় থেকেই খবর পেল যে মুসলমানরা তার বাণিজ্য কাফেলা লুট করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। এ খবর শুনে সে লোক মারফত মক্কায়

খবর পাঠিয়ে দিল। এতে মক্কাবাসীরা যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগল এবং মদীনাতেও এ খবর ছড়িয়ে পড়ল যে কোরাইশরা বিরাট এক বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে আসছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক এ বাহিনীর প্রতিরোধ করতে গিয়েই বদর যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল।

এ আলোচনায় সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্যই যে সমস্ত বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত, প্রথমে সে সমস্ত বিষয়কে একসঙ্গে লিপিবদ্ধ করে নেয়া উচিত। যাতে পৃথক পৃথক আলোচনার সময় সেগুলোকে মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করা যায়। সেগুলো হল ঃ

(ক) যদি পবিত্র কোরআনে কোন ঘটনার স্পষ্ট উল্লেখ থাকে, তবে সেক্ষেত্রে কোরআনের পরিপন্থী কোন বর্ণনা বা কোন ইতিহাসের আদৌ কোন মূল্য নেই।

(খ) হাদীস গ্রন্থসমূহে নির্ভরশীলতার দিক দিয়ে যে পর্যায়ক্রম রয়েছে তা মানতে হবে।

এটা সাধারণ স্বীকৃত সত্য যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন জানতে পারলেন যে কোরাইশরা এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়েছে তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সমবেত করে তাঁদের মতামত জিজ্ঞেস করলেন। মুহাজিরগণ খুব আগ্রহ-উৎসাহের সঙ্গে যুদ্ধের পক্ষে মত প্রকাশ করলেন।

কিন্তু হুযুর (সাঃ) মদীনার আনসারদের মতামত জানতে চাইলেন। বিষয়টি লক্ষ্য করে সা'দ অথবা অন্য কোন একজন সম্মানিত আনসার দাঁড়িয়ে বললেন, "হুযুর কি আমাদের কোন প্রকার ইঙ্গিত করেছেন? আমরা তো হযরত মূসা (আঃ)-এর সেসব অনুসারীদের মত নই যারা বলেছিল যে তুমি ও তোমার খোদা গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে থাকব! আল্লাহ্‌র কসম! যদি আপনি নির্দেশ করেন তবে আমরা উত্তাল সমুদ্রে বা জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তেও প্রস্তুত।"

এটাও একটি স্বীকৃতকথা যে সাহাবীদের মধ্যেও এরূপ কিছু কিছু লোক ছিলেন, যাঁরা যুদ্ধ এড়াতে বিভিন্ন প্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছিলেন। যেমন, স্বয়ং কোরআনের আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে ঃ

وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ ـ

অর্থাৎ "মুসলমানদের একটি দল এ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে ছিল।"

সাধারণ ঐতিহাসিক ও হাদীসবিশারদগণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আনসারদের মতামত জানতে চেয়েছিলেন এ জন্যই যে যখন আনসারগণ মক্কায় তাঁর বায়আ'ত গ্রহণ করেন তখন শুধু এ চুক্তিই হয়েছিল যে যদি কোন শত্রু বাহিনী মদীনার উপর অভিযান পরিচালনা করে, তখন আনসারগণ

সর্বশক্তি নিয়োগ করে তার প্রতিরোধ করবেন। মদীনার বাইরে কোন অভিযানে অংশগ্রহণের কোন চুক্তি তাঁদের সঙ্গে ছিল না। এ আলোচনার পর আর একটি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় হল এই যে এর পরামর্শটি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা নির্ণয় করা।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন ; রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শুধু বাণিজ্য কাফেলা লুট করার উদ্দেশ্যেই মদীনা থেকে বের হয়েছিলেন। দু'চার মনযিল অতিক্রম করার পর যখন তিনি জানতে পারলেন যে কোরাইশদের বাহিনী মদীনা আক্রমণ করত এসেছে, তখন তিনি মোহাজির ও আনসারদের সমবেত করে তাঁদের' মতামত জানতে চাইলেন। পূর্ববর্তী ঘটনাবলীও এ স্থানেই সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু সীরাতের কিতাব, ইতিহাস ও অন্যান্য প্রমাণাদি ছাড়াও আমাদের কাছে এমন একটি জিনিস আছে (কোরআন) যার সামনে আমাদের সকলকেই মাথা নত করতে হবে! এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ - يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ - وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ -

অর্থ ঃ "এটা এরূপ, যেমন আপনার পালনকর্তা আপনাকে ন্যায়ভাবে ঘর থেকে বের করেছিলেন, অথচ মুমিনদেরই একদল লোক তা পছন্দ করেনি।"

"সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা আপনার সঙ্গে বিতর্ক করছিল ; মনে হচ্ছিল, তারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে আর তারা যেন তা প্রত্যক্ষভাবে দেখছে।"

"স্মরণ কর. আল্লাহ্ তোমাদের ওয়াদা দিয়েছিলেন যে দু'দলের যে কোন দল তোমাদের আয়ত্তে আসবে, অথচ তোমরা চেয়েছিলে যেন নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তে আসে, অথচ আল্লাহ্ চেয়েছিলেন সত্যকে তাঁর বাণীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং অবিশ্বাসীদের নির্মূল করবেন।"

১। ব্যাকরণিক বিশ্লেষণে দেখা যায় وَإِنَّ এর ওয়াওটি অবস্থা বোধক অধিকরণ কারক। এর অর্থ হবে এই যে "এক দল মুসলমান যুদ্ধ এড়াবার জন্য চেষ্টা করছিল।" এটা স্পষ্টই মদীনা থেকে বের হবার সময়ের ঘটনা। মদীনা থেকে বের হয়ে কিছুদূর এগুবার পরের ঘটনা নয়। কেননা, 'ওয়াও'-এর অর্থের

প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মদীনা থেকে বের হওয়া এবং এক দলের যুদ্ধ এড়ানোর ভাব একই সময়ে হতে হয়।

২। উল্লিখিত আয়াতে স্পষ্টভাবেই বিবৃত হয়েছে যে এ ঘটনাটি তখনকার, যখন বাণিজ্য কাফেলা ও কোরাইশ বাহিনীর দুটি দলই তাঁদের সামনে ছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন, কোরআনে বর্ণিত ঘটনাটি ঐ সময়ের যখন হুযুর (সাঃ) বদরের নিকটে পৌছান, তখন আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা নিরাপদে চলে গিয়েছিল। তবে এমনটা কি করে ঠিক হবে যে এরপর দুটির যেকোন একটির জন্য আল্লাহ্ পাক ওয়াদা করবেন। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট কথা যে পবিত্র কোরআনের স্পষ্ট ভাষ্য অনুযায়ী এ ঘটনাটি তখনকারই হতে হবে, যখন দুটি দলই হস্তগত হবার সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল এবং এ সম্ভাবনা শুধু ঐ সময়েই হতে পারে, যখন হুযুর (সাঃ) মদীনায় ছিলেন, এবং দু'দলেরই খবর এসেছিল যে একদিকে আবু সুফিয়ান বাণিজ্য-কাফেলা নিয়ে এসেছে অপরদিকে কোরাইশরা বিপুল যুদ্ধ সরঞ্জামসহ মক্কা থেকে রওয়ানা হয়েছে।

৩। সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার হল এই যে পবিত্র কোরআন কাফেরদেরকে দু'দলে বিভক্ত করেছে। একটি বাণিজ্য কাফেলা, দ্বিতীয়টি যুদ্ধবাহিনী। অর্থাৎ, মক্কার কোরাইশ বাহিনী যারা যুদ্ধ করার জন্য মক্কা থেকে আসছিল। আয়াতের স্পষ্ট ভাষ্য এই যে মুসলমানদের একদল বাণিজ্য কাফেলার উপর আক্রমণ করতে চাইছিলেন, আল্লাহ্ তাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন ঃ

"তোমরা চেয়েছিলে, নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্ চেয়েছিলেন তাঁর বাণীর মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং অবিশ্বাসীদের মুলোৎপাটন করবেন।"

একদিকে কিছু লোক চায় বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণ করতে, অন্যদিকে আল্লাহ্ চান সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে এবং অবিশ্বাসীদের সমূলে উৎপাটিত করতে। এখন প্রশ্ন হল, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ দুটি মতের কোন্‌টির সমর্থক ছিলেন? প্রচলিত বর্ণনায় এ প্রশ্নের যে উত্তর দেয়া হয়েছে, তা ভাবতেও শরীর শিউরে ওঠে।

৪। এখন মূল ঘটনার প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করা যাক। ঘটনাটি এই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রায় তিন শতাধিক আত্মনিবেদিত মোহাজির-আনসারদের সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা হচ্ছিলেন, যাদের মধ্যে খায়বর বিজয়ী সাহাবিগণ ছাড়াও সাইয়্যেদুশ শুহাদা হযরত আমির হামযা (রাঃ)ও ছিলেন, যাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন একাই একটি সৈন্যবাহিনীর সমমর্যাদাসম্পন্ন। (পবিত্র কোরআনেও এটা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত)।

এতদসত্ত্বেও ভয়ভীতিতে অনেকেই হীনবল হয়ে পড়েছিলেন, তাদের দেখে মনে হচ্ছিল, যেন সত্যি সত্যিই কেউ তাঁদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

অর্থ ঃ "মুসলমানদের একদল এ সিদ্ধান্তকে অপছন্দ করছিল। সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবার পরও তারা তোমার সঙ্গে বিতর্ক করছিল। মনে হচ্ছিল যেন তাদের নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।"

যদি বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণ করাই উদ্দেশ্য হত, তবে সাহাবীদের মধ্যে এ ভয়ভীতি ও অস্থিরতার কি কারণ থাকতে পারত? ঐতিহাসিকের ভাষ্য অনুযায়ী ইতিপূর্বেও বহুবার কোরাইশদের কাফেলা আক্রমণ করার জন্য ছোট ছোট দল পাঠানো হয়েছিল এবং তখনও তাদের কোন ক্ষতি হয়নি। আর এবার যেখানে তিন শতাধিক বিশিষ্ট বীরযোদ্ধার একটি বাহিনী সেখানে ভয়ভীতিতে সাহাবীদের একদল মুহ্যমান। এতে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে মদীনাতেই এ খবর এসে পৌঁছেছিল যে মক্কা থেকে কোরাইশরা এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে আসছে।

৫। বদর যুদ্ধ সম্বন্ধে কোরআনের অন্য একটি আয়াতে হুযুর (সাঃ) মদীনায় থাকতেই নাযিল হয়। সহীহ্ বোখারীর সূরায়ে নিসার তফসীরে স্পষ্টভাবেই এর উল্লেখ রয়েছে।

আয়াতটি এই ঃ

অর্থ ঃ "সমান নয় সেসব মুসলমান, যারা কোন ওযর ছাড়াই ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহ্র পথে জেহাদ করে স্বীয় জান-মাল দ্বারা। আল্লাহ্ তাদের মর্যাদা অনেক বর্ধিত করে দিয়েছেন। যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে জেহাদ করে গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায়।"

সহীহ্ বোখারী এ আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন যে বদর যুদ্ধে যে সমস্ত লোক অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যাঁরা অংশগ্রহণ করেননি তাঁরা পরস্পর মর্যাদায় সমান হতে পারেন না। সহীহ্ বোখারীতে একথাও আছে যে যখন আয়াত নাযিল হয় তখন غير اولى الضرر কথাটি ছিল না। এ আয়াত শুনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে স্বীয় অন্ধত্বের কথা নিবেদন করলেন। অতঃপর একথাটি নাযিল হল। এতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে মদীনায় থাকা অবস্থায়ই সকলে জানতে পেরেছিলেন যে কাফেলা আক্রমণ নয়, বরং যুদ্ধ করে প্রাণ দেয়াই এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল।

৬। যে সমস্ত কোরাইশ যুদ্ধ করার জন্য মক্কা থেকে বদরে এসেছিল তাদের সম্পর্কে কোরআনের ভাষ্য হল ঃ

"আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা শক্তি-মদমত্ততা প্রদর্শন এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্য গর্বভরে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছে।"

কোরাইশরা যদি শুধু তাদের বাণিজ্য কাফেলার নিরাপত্তার জন্যই বের হত, তবে আল্লাহ্ একথা কেন বলেন যে তারা তাদের শক্তিপ্রদর্শেনের জন্য, লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে বাধাদানের জন্য বের হয়েছিল। বাণিজ্য কাফেলার নিরাপত্তাবিধানে শক্তিপ্রদর্শনের কোন কথাই ওঠে না। এতে আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে বাধাদানইবা কেমন করে হতে পারে? অতএব বোঝা গেল যে প্রকৃত প্রস্তাবে তারা মদীনা আক্রমণ করতেই বের হয়েছিল এবং এতে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, শক্তিপ্রদর্শন এবং ইসলামের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করা। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা এ জাতীয় গর্ব প্রকাশ, শক্তিপ্রদর্শন ও বাধা সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন।

পবিত্র কোরআনের পরবর্তী স্থানই হল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে বদর যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও কা'ব ইবনে মালেকের হাদীস ব্যতীত অন্য কোন হাদীসে দেখা যায় না যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বদর যুদ্ধে মক্কার কোরাইশদের বাণিজ্য-কাফেলা লুট করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। কা'বের হাদীসটি বিভিন্ন কারণে সমালোচনার বাইরে নয়।

১। হযরত কা'ব ইবনে মালেক স্বয়ং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। এ কারণে এ ব্যাপারে তাঁর বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ নয়।

২। এ বর্ণনা দ্বারা বদর যুদ্ধের গুরুত্ব কম দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যাতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার দরুন তাঁর গুরুত্ব যেন না কমে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিভিন্ন দিক দিয়েই বদর যুদ্ধ বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী ছিল। পবিত্র কোরআন একে يوم الفرقان অর্থাৎ, চরম 'ফয়সালার দিন' বলে ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ্ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। বদরী সাহাবীর সম্মান সবচেয়ে বেশি। এমন কি, হযরত ওমর (রাঃ) বদরী সাহাবীদের ভাতা সবচাইতে বেশি নির্ধারিত করেছিলেন। কোন সাহাবীর নামের পর বদরী উপাধি বিশেষ গুরুত্ববাহী ছিল। হযরত কা'বের হাদীসটি এই ঃ

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব বলেন, আমি তাবুক ও বদর যুদ্ধ ছাড়া আর কোন যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পেছনে ছিলাম না। বদর যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেনি। তাদের কাউকে ভর্ৎসনা করা হয়নি। নবী করীম (সাঃ) শুধু কোরাইশদের কাফেলার উদ্দেশে বের হয়েছিলেন, তখন ঘটনাক্রমেই আল্লাহ্ তা'আলা দু'দলকে পরস্পরের সম্মুখীন করেছিলেন।"

পক্ষান্তরে, হ্যরত আনাস (রাঃ)-এর হাদীস যা সহীহ্ মুসলিম ও ইবনে আবি শাইবার কিতাবে উদ্ধৃত রয়েছে, তা হল ঃ

হ্যরত আনাস (রাঃ) বলেন, "হুযুর (সাঃ) আবু সুফিয়ানের কাফেলার খবর জানতে পেরে সাহাবীদের পরামর্শ চাইলেন। সর্বপ্রথম আবু বকর (রাঃ) কথা বললেন, কিন্তু হুযুর(সাঃ) তা গ্রহণ করেননি। তারপর হ্যরত ওমর (রাঃ) কথা বললেন, হুযুর (সাঃ) তাঁর কথার প্রতিও গুরুত্ব দিলেন না। অবশেষে সা'দ ইবনে ওকবা দাঁড়িয়ে আরয করলেন, হুযুর (সাঃ) কি আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান? আল্লাহ্র কসম! যদি আপনি আমাদের গভীর সমুদ্রে সওয়ারী প্রবেশ করাতে নির্দেশ দেন, তবে আমরা তাই করব, যদি আপনি আমাদের ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ কোন প্রান্তরেও পৌছতে আদেশ করেন, তবে আমরা তাই করব। হ্যরত আনাস (রাঃ) বলেন, এরপর হুযুর (সাঃ) সমস্ত লোককে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করলে সবাই যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হতে লাগল এবং বদর প্রান্তরে উপনীত হলেন।"

"সর্বপ্রথম কোরাইশদের অগ্রগামী দল এসে উপস্থিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে বনী হাজ্জাজের একটি হাবশী ক্রীতদাসও ছিল। মুসলমানেরা তাকে গ্রেফতার করে আবু সুফিয়ান ও তার কাফেলার খবর জিজ্ঞেস করল। সে বলল, আমি আবু সুফিয়ানের কোন খবর জানি না। কিন্তু আবু জাহ্ল, ওতবা, শাইবা ও উমাইয়্যা ইবনে খালফ্ আসছে। একথা শুনে মুসলমানগণ তাকে মারধর করতে লাগল। তখন সে বলল, বিশ্বাস করুন, সত্য সত্যই আমি আবু সুফিয়ানের কোন খবর জানি না। তবে আবু জাহ্ল ও অন্যান্য কোরাইশ প্রধানগণ এগিয়ে আসছে। এ সময় নবী করীম (সাঃ) নামায পড়ছিলেন। নামাযের পর লোকটিকে মারপিট করতে দেখে তিনি বললেন, "কসম সে আল্লাহ্র, যার হাতে আমার প্রাণ, যখন লোকটি সত্য কথা বলে, তখন তোমরা তাকে মারপিট কর, আর যখন সে মিথ্যা বলে, তখন তোমরা তাকে ছেড়ে দাও।" (বোখারী)

এ হাদীসের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে যখন আবু সুফিয়ানের আগমন সংবাদ জানা যায়, তখনই তিনি মোহাজের ও আনসারদের সমবেত করে পরামর্শ করেন এবং বিশেষত, আনসারদের সাহায্য কামনা করেন। আর এ ব্যাপারে সবাই একমত যে আবু সুফিয়ানের আগমন সংবাদটি মদীনায় থাকাকালীনই তিনি পেয়েছিলেন। এরই ভিত্তিতে দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হল যে আনসারদের নিকট থেকে যে সাহায্য-সহানুভূতির আকাঙ্ক্ষা তিনি করেছিলেন তাও মদীনাতেই করেছিলেন। অন্যথায় যদি মদীনার বাইরে এসে এ ঘটনা অনুষ্ঠিত হত (যেমন সাধারণ ইতিহাসের কথা), তবে তখন সেখানে আনসার কোথা থেকে আসবে এবং হাদীসে তাদের কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে এ পরামর্শের পরই হুযুর (সাঃ) সবাইকে

যুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। অথচ ঐতিহাসিকদের কথা অনুযায়ী ঘটনাটি এমন হওয়ারই কথা ছিল যে আনসারগণ পূর্ব চুক্তি ও প্রচলিত প্রথার কোন ধার না ধেরেই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বেরিয়ে পড়েন। তারপর হুযুর (সাঃ) তাদের মনোভাব জানতে চাইলেন এবং তাদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। এটা যে পাগলের প্রলাপ বৈ আর কিছুই নয়, তা সবাই বুঝতে পারে।

হাদীসের অপর অংশের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পূর্বেই হুযুর (সাঃ) ওহী যোগে বা অন্য কোন উপায়ে জানতে পারেন যে এটা বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণ নয় বরং একটি সুসজ্জিত সামরিক বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা। যদিও সাধারণ মানুষ তা জানত না।

এ হাদীসের আরও একটি বিষয় খোলাসা করে দেয়া প্রয়োজন। যদি শুধু আবু সুফিয়ানের আগমন বার্তাতেই হুযুর (সাঃ) মদীনা থেকে বের হতেন, কোরাইশ বাহিনীর কোন খবরই না জানতেন তবে এত বিপুল আয়োজনসহ এবং এত গুরুত্ব সহকারে সৈন্য সমাবেশের ব্যবস্থা করলেন কেন? এতেও বুঝা যায় যে আবু সুফিয়ানের পরিবর্তে মক্কার কোরাইশ বাহিনীর আগমনের খবরই হুযুর (সাঃ) পেয়েছিলেন এবং এ ঘটনাকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট বীর হযরত আলী (রাঃ)-এর বর্ণনায় ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদে, ইবনে আবি শাইবা তাঁর গ্রন্থে, ইবনে জরীর তাঁর ইতিহাসে, বায়হাকী তাঁর দালায়েলে বর্ণনা করেছেন এবং একে সহীহ্ বলে স্বীকার করেছেন।

"হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে মদীনায় আসার পর এখানকার ফলমূল খাওয়াতে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। হুযুর (সাঃ) বদরের সন্ধান করছিলেন। তারপর আমরা যখন খবর পেলাম যে মুশরেকরা আসছে, তখন হুযুর (সাঃ) বদরে চলে গেলেন। বদর একটি কূপের নাম এবং এ নামেই সেখানে একটি ক্ষুদ্র জনবসতিও রয়েছে। আমরা সেখানে মুশরেকদের পূর্বেই পৌছেছিলাম।"

"হযরত আলী (রাঃ)-এর এ হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে মক্কার মুশরেকদের আক্রমণের খবর শুনে তিনি মদীনা থেকে বের হয়েছিলেন এবং বদরে অবস্থান করেছিলেন। এ হাদীসে আবু সুফিয়ানের কাফেলার কোন আলোচনাই নেই।

এ সমস্তই নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদির পর আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তবুও অধিকতর নিশ্চয়তার জন্য নিম্নবর্ণিত ঘটনাবলীর প্রতিও লক্ষ্য করা যেতে পারে।

১। ইতিপূর্বে কোরাইশ কাফেলার উপর আক্রমণ করতে কোন কোন সময় কুড়ি বা ত্রিশ অথবা এক'শ, দু'শ লোকের যে বাহিনী পাঠানো হত, সে সমস্ত বাহিনীতে কখনও কোন আনসারকে পাঠানো হয়নি। ঐতিহাসিকগণ খুব স্পষ্ট করে এটা লিখেছেন যে মদীনার বাইরে কোন অভিযান পরিচালনার জন্য তাদের সঙ্গে হুযুর (সাঃ)-এর কোন চুক্তি ছিল না। এবারও যদি মদীনা থেকে বের হবার সময় শুধু কাফেলা আক্রমণই উদ্দেশ্য থাকত তবে আনসারগণ তাঁর সঙ্গে না থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে এ যুদ্ধে আনসারদের সংখ্যা মুহাজিরদের চাইতে অনেক বেশি ছিল। অর্থাৎ ৩০৫ জনের মধ্যে ৭৪ জন মুহাজির এবং অবশিষ্ট ২৩১ জন ছিলেন আনসার।

এতে একথাই বিশেষভাবে প্রমাণ করে যে যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনা থেকে বের হচ্ছিলেন, তখন কোরাইশরা মদীনা আক্রমণ করতে আসছিল। সে জন্যই তিনি আনসারদের লক্ষ্য করে প্রতিরোধের কথা বলেছিলেন। কেননা, পূর্বচুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করার যথাযথ সময় তখনই উপস্থিত হয়েছিল।

২। মক্কা থেকে যে সমস্ত বাণিজ্য-কাফেলা সিরিয়া গমন করত, সেগুলোকে মদীনার কাছ দিয়েই যেতে হত। মদীনা থেকে মক্কা পর্যন্ত যে সমস্ত গোত্র বাস করত, তারা সকলেই মক্কার কোরাইশদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। কিন্তু মদীনা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত অঞ্চলে কোরাইশদের কোন প্রভাব ছিল না। এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে হুযুর (সাঃ) যদি বাণিজ্য-কাফেলা আক্রমণ করতে চাইতেন, তবে সিরিয়ার দিকেই যেতেন। এটা সম্পূর্ণ একটি অযৌক্তিক কথা যে সিরিয়া থেকে বাণিজ্য কাফেলা আসছে, অথচ, হুযুর (সাঃ) তাদের খবর পাওয়ার পরেও সিরিয়ার পথে না গিয়ে মক্কার পথে এগিয়ে গেলেন এবং পাঁচ মঞ্জিল অতিক্রম করার পর জানতে পারলেন যে বাণিজ্য কাফেলা নিরাপদে মক্কায় চলে গেছে। তারপর কোরাইশদের সঙ্গে যুদ্ধ হল।

৩। প্রকৃতপক্ষে বদর যুদ্ধের ঘটনা পরম্পরা নিম্নরূপ ঃ

(ক) কোরাইশ নেতৃবৃন্দ অনেক আগেই মদীনার প্রসিদ্ধ নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে চিঠি দিয়েছিল যে মোহাম্মদ (সাঃ)-কে তাঁর সহচরদেরসহ মদীনা থেকে বের করে দাও। অন্যথায় আমরা মদীনা আক্রমণ করে তার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরও শেষ করে দেব। (সুনানে আবু দাউদ)।

(খ) সা'আদ ইবনে জাবাল কাবা শরীফের তওয়াফ করতে গেলে আবু জাহ্ল তাঁকে দেখে বলেছিল, "তোমরা আমাদের অভিযুক্ত পলাতক লোকগুলোকে আশ্রয় দিয়ে প্রশান্ত চিত্তে কাবা তওয়াফ করছ। তুমি উমাইয়্যার মেহমান না হলে আমি তোমাকে হত্যা করতাম।"

(গ) কুরজ ইবনে জাবির দ্বিতীয় হিজরীর জমাদিউস-সানিতে মদীনার চারণ ভূমি আক্রমণ করে হুযুর (সাঃ)-এর উট লুট করেছিল।

(ঘ) এ ঘটনার পরই রজব মাসে হুযুর (সাঃ) কোরাইশদের গতিবিধ লক্ষ্য করার জন্য আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ্‌কে নিযুক্ত করেছিলেন।

(ঙ) আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ হুযুর (সাঃ)-এর অনুমতি ছাড়াই কোরাইশদের একটি ছোট্ট কাফেলা লুট করে এক ব্যক্তিকে হত্যা এবং দু'ব্যক্তিকে বন্দী করেছিলেন।

মক্কায় অবস্থানকালে কোরাইশরা মুসলমানদের সঙ্গে যে নির্মম ব্যবহার করেছিল সে সমস্ত ঘটনাবলীর আলোকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা কোন দিক দিয়েই হ্রাস পাওয়ার মত ছিল না। তারা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে লিখেছিল, আমরা মদীনায় এসে তোমাকে এবং মোহাম্মদ (সাঃ)-কে নিপাত করব। কুরজ ফেহ্‌রীর অতর্কিত আক্রমণ ইত্যাদি এবং এ সময়েই আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহ্‌শ কর্তৃক তাদের একটি কাফেলা লুট, তাদের সম্মানিত গোত্রের দুজন সদস্যের বন্দী ইত্যাদিতে কোরাইশরা কোন প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প করেনি, বরং তারা সম্পূর্ণ ধৈর্য্য ধারণ করে বসে থাকে এবং অতঃপর যখন মক্কাবাসীদের বিপুল বাণিজ্যসম্ভারসহ যে কাফেলা সিরিয়া থেকে প্রত্যাগমন করছিল সেটি মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক আক্রান্ত হবার সমূহ্ সম্ভাবনা প্রতিরোধ করতে এসেই বদরে উপস্থিত হয়েছিল। অতঃপর তারা যখন জানতে পারল যে কাফেলা নিরাপদে চলে গেছে, তখন তাদের প্রসিদ্ধ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যেমন ওতবা যে সৈন্যবাহিনীর প্রধান ছিল, তাদের মত হল, এখন যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন নেই; আমাদের ফিরে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। ঘটনার এ বিবরণ কি কোরাইশদের শত্রুতা ও হুযুর (সাঃ)-এর নবীসুলভ আচরণের পক্ষে হতে পারে?

৪। ঐতিহাসিকগণ সাধারণভাবে লিখেছেন যে যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় বাণিজ্য কাফেলা লুট করার জন সাহাবীদের উত্তেজিত করছিলেন, তখন লোকেরা খুব উৎসাহ্ প্রকাশ করেনি। কারণ, কোন যুদ্ধ বা সংঘর্ষ ছিল না শুধু মালে-গনীমত লাভই ছিল উদ্দেশ্য। এ জন্যই যারা অভাবগ্রস্ত ছিলেন তারাই এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, আনসারদের প্রায় সকল গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গই বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। তাঁদের তো কোন অভাবই ছিল না! অভাবী ছিলেন মুহাজিরগণ। তদুপরি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্য সংখ্যার মধ্যে আনসারদের সংখ্যা ছিল মুহাজিরদের তিন গুণেরও অধিক।

হুযুর (সাঃ) যখন সাহাবীদের মনোভাব জানতে চাইলেন, তখন কারা জবাব দিয়েছিলেন। মুহাজিরদের পক্ষ হতে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর ও হযরত মেকদাদ (রাঃ) এবং আনসারদের পক্ষ হতে জবাব দিয়েছিলেন সা'আদ ইবনে উবাদা। কিন্তু সা'আদ ইবনে উবাদা বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। তিনি মদীনায়ই ছিলেন কাজেই একথা মানতে বাধ্য যে সা'আদ যে জবাব দিয়েছিলেন, তা মদীনাতেই দিয়েছিলেন এবং সেখানে কোরাইশদের আক্রমণের খবর জানতে পেরে আনসারদের মতামত জিজ্ঞেস করেছিলেন।

৫। ইতিহাস ও হাদীসের অধিকাংশ কিতাবে দেখা যায়, যখন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে হুযুর (সাঃ) লোকদেরকে উৎসাহিত করছিলেন তখন অনেক লোকই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে ইতস্তত করছিলেন। এর একমাত্র কারণ ছিল যে তাঁরা নিশ্চিতরূপেই জানতেন যে এটা কোন প্রকার জেহাদ বা সংগ্রাম সংঘর্ষ নয়, শুধু বাণিজ্য-কাফেলা লুণ্ঠন, এ জন্যই এতে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল না, যার ইচ্ছা অংশ গ্রহণ করতে পারে, যার ইচ্ছা অংশ গ্রহণ নাও করতে পারে। তাবারীতে আছে ঃ

"যখন হুযুর (সাঃ) জানতে পারলেন যে আবু সুফিয়ান বাণিজ্য-কাফেলা নিয়ে সিরিয়া থেকে দেশে ফিরছে, তখন তিনি সাহাবীদের সমবেত করে বললেন, কোরাইশদের বাণিজ্য-কাফেলা আক্রমণ কর। হয়ত এতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য গনীমতের ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু কিছু লোক অংশগ্রহণ করতে বিরত রইল। কেননা, তারা নিশ্চিতরূপেই জানতে পেরেছিল যে এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন সংগ্রাম-সংঘর্ষের সম্মুখীন হবেন না।"

কিন্তু এ ঘটনা কোরআনের স্পষ্ট ভাষ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কোরআন স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছে যে যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে ইতস্তত করছিল তাদের সম্পদের কোন প্রয়োজন নেই বলে ইতস্ততঃ করেনি, বরং তাদের ইতস্তত করার কারণ ছিল এই যে তারা দিব্য উপলব্ধি করছিলেন যেন তাদের মৃত্যুর দ্বারে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্কেই বলেছেন ঃ

وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ -

"একদল মুসলমান এ সিদ্ধান্ত অপছন্দ করছিল। সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবার পরও তোমার সঙ্গে তারা বিতর্ক করছিল যেন তাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।"

৬। সমস্ত হাদীস ও সীরাতের কিতাবে দেখা যায়, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনা হতে প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করার পর আবু গিবতার কূপের পাশে সৈন্য বাহিনী গণনা করেছিলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ও অন্যদের এখান থেকেই ফেরত পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের বয়স পনর বছরের নিচে ছিল বা তাঁরা প্রাপ্তবয়স্ক হননি। যদি কাফেলা লুট করাই উদ্দেশ্য হত, তবে তরুণ যুবকরাই এ সমস্ত কাজে বেশি উপযোগী বলে বিবেচিত হতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধই উদ্দেশ্য ছিল এবং এটা ছিল আল্লাহ্র তরফ থেকে ফরয কাজ। এ জন্যই প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া এর জন্য শর্ত থাকার দরুন হুযুর (সাঃ) অল্পবয়স্ক বালকদের যোগ্য বিবেচনা না করে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

৭। হাফেয ইবনে আবদুল বার ইস্তীআব নামক কিতাবে লিখেছেন, যখন হুযুর (সাঃ) কোরাইশ কাফেলা লুট করতে উৎসাহিত করলেন, তখন খোসাইমা নামক একজন আনসার স্বীয় পুত্র সা'দকে বললেন, "আমি যাচ্ছি, তুমি বাড়িতে থেকে পরিবারের তত্ত্বাবধান করো।" সা'দ বললেন, "হযরত! যদি এটা অন্য কোন বিষয় হত, তবে আমি আপনাকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতাম। কিন্তু যেহেতু এটা শাহাদতের মর্যাদা, আমি এটা ছাড়তে পারি না।" অতএব লটারীর ব্যবস্থা করা হল। সা'দ লটারীতে জিতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহীদ হন।

ঘটনার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে বাণিজ্য কাফেলা লুট করা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং যুদ্ধ করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এবং সাহাবীগণ শাহাদতের অমৃত সুধা পান করতেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

বদর যুদ্ধের মূল কারণ ঃ আরবের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল যে যখনই কোন প্রকারে কোন বংশের কোন লোক অপর বংশের কারও হাতে নিহত হত, তখন একে কেন্দ্র করে দীর্ঘস্থায়ী দাঙ্গার সৃষ্টি হত। উভয় পক্ষের লোক দলে দলে যুদ্ধে অবতীর্ণ হত, রক্তের বন্যা প্রবাহিত হত। সর্বোপরি, এ সমস্ত সংগ্রাম-সংঘর্ষ দীর্ঘদিন চলতে থাকত। কোন কোন গোত্র সমূলে ধ্বংসও হয়ে যেত, তবুও যুদ্ধ বন্ধ হত না। আরবের লোক শিক্ষিত ছিল না। তবুও নিহত ব্যক্তিদের নামের তালিকা লিখিয়ে বংশের উত্তরাধিকারীদের দিয়ে রাখত এবং এ প্রতিশোধ স্পৃহা বংশানুক্রমে চলতে থাকত। সন্তানদের এ সমস্ত নামের তালিকা মুখস্থ করান হত, যেন বড় হয়ে তারা এ রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। ওয়াহেস ও বাসূসের প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধ দীর্ঘ চল্লিশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এতে অগণিত লোক জীবন দিয়েছিল। একেই আরবী ভাষায় "ছার" বা প্রতিশোধ বলা হয়। এটি ছিল আরবের ইতিহাসে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

আমরা পূর্বেই আলোকপাত করেছি যে আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহ্শের সঙ্গে সংঘর্ষে আমর ইবনে হাযরামী নিহত হয়েছিল। কোরাইশদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা ওতবা ছিল তার 'হালিফ' বা মিত্র। বদরসহ কোরাইশ এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মধ্যে যে সমস্ত সংগ্রাম ও সংঘর্ষ হয়েছে, হাযরামীর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করা ছিল সে সবগুলোর মূল। ওরওয়া ইবনে জুবাইর (হযরত আয়েশার ভাগিনা) এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা করে বলেন যে বদর সহ অন্যান্য যেসব সংগ্রাম-সংঘর্ষ হুযুর (সাঃ) ও আরবের মুশরেকদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে সেসবের মূলে ছিল আমর হাযরামীর রক্তের প্রতিশোধ স্পৃহা। ওয়াকিদ ইবনে আবদুল্লাহ তায়াসি ছিল তার নায়ক।[১]

একটি সাধারণ ভ্রান্তির কারণেই আলোচ্য ঘটনায়ও একটি ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। তা হল এই যে বদর যুদ্ধই কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সর্বপ্রথম সংঘর্ষ। প্রকৃতপক্ষে বদর যুদ্ধের পূর্বেও অনেক ছোট বড় সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছিল। ওরওয়া ইবনে জুবাইর বদর যুদ্ধ সম্পর্কে আবদুল মালিককে যে পত্র দিয়েছিলেন, তার প্রথমাংশ এরূপ ছিল ঃ

"আবু সুফিয়ান ইবনে হারব প্রায় সত্তর জন সঙ্গীসহ (যাদের সকলেই কোরাইশ বংশীয়) সিরিয়া থেকে ফিরে আসছিল। হুযুর (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করলেন। এর আগে থেকেই উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ চলে আসছিল, যাতে আম্র হাযরামীসহ কোরাইশদের কিছু লোক নিহত হয়েছে এবং কিছু লোক বন্দী হয়েছে। এ ঘটনাই হুযুর (সাঃ) এবং কোরাইশদের মধ্যে ব্যাপক যুদ্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তাতে সর্বপ্রথম একে অন্যের প্রতি কঠিন আঘাত হানে। এ সংঘর্ষ আবু সুফিয়ানের সিরিয়া ত্যাগের পূর্বের ঘটনা।"

এতে স্পষ্টভাবেই বিবৃত হয়েছে যে আবু সুফিয়ান সিরিয়া ত্যাগ করার পূর্ব থেকেই যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বদর যুদ্ধ আবু সুফিয়ান সিরিয়া থেকে ফিরে আসার পরে সংঘটিত হয়।

যে কোন ঘটনার তাৎপর্যপূর্ণ সমালোচনা করতে হলে উভয়পক্ষের সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ জাতীয় সাক্ষীও খুব কমই পাওয়া যায়। সৌভাগ্যের কথা যে এ ঘটনায় উভয় পক্ষের সাক্ষীই আমাদের সামনে রয়েছে। হযরত হাকীম

---

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহ্শ (রাঃ), যাঁর নেতৃত্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, তিনি হযরত হামযার ভাগিনা এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর মামাত ভাই ছিলেন এবং তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-এর বংশের হালিফ ছিলেন। তিনি হযরত ওমরের খেলাফতের প্রথম দিকে জীবিত ছিলেন। (তাবাকাত)।

ইবনে হাযাম (হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র) বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি বয়সে হুযুর (সাঃ) অপেক্ষা পাঁচ বছরের বড় ছিলেন। জাহেলিয়াতের সময়ও তিনি হুযুর (সাঃ)-এর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। নবুওতের পরও তাঁদের মাঝে প্রীতির সম্পর্ক বর্তমান ছিল। কিন্তু তবুও মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি ছিলেন কোরাইশদের একজন বিশিষ্ট নেতা। হরম শরীফের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ আগন্তুকদের অভ্যর্থনা করা ছিল তাঁর দায়িত্ব। 'দারুন্-নদওয়া' বা পরামর্শ সভার সভাপতিও তিনিই ছিলেন। তিনি মারওয়ান ইবনে হাকামের খেলাফত কাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। একবার তিনি খলীফা মারওয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে খলিফা মারওয়ান তাঁর প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। খলিফা তাঁর সম্মানার্থে নিজের আসন ছেড়ে দেন। অতঃপর তাঁর পাশে এসে বললেন, বদরের ঘটনা বলুন। তিনি ঘটনার প্রাথমিক অবস্থা বর্ণনার পর বললেন, যখন আমাদের সৈন্যবাহিনী ময়দানে অবতরণ করল, তখন আমি সেনাপতি ওতবার নিকট গিয়ে বললাম,. "হে আবু ওয়ালিদ! তুমি আজকের কাজের দ্বারা সারা জীবনের সুনাম অটুট রাখতে পারবে না? সে বলল, কিসে? আমি বললাম, তোমরা মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট থেকে ইবনে হাযরামীর রক্তের বদলা হিসাবেই এমনটা করছ। হাযরামী তো তোমার মিত্র ছিল, তুমি নিজেই তার ক্ষতিপূরণ দিয়ে দাও এবং সমস্ত লোককে ফিরে যেতে বল।"[১]

ওতবা এ প্রস্তাব সমর্থন করল। কিন্তু আবু জাহল কোন মতেই এ প্রস্তাবে সায় দিল না বরং আমের হাযরামীকে ডেকে এনে বলল, রক্তের বদলা সামনে রয়েছে। এ সময় তুমি দাঁড়িয়ে কওমের কাছে তা দাবি কর। আরবের প্রাচীন দস্তুর মোতাবেক আমের উলঙ্গ হয়ে চীৎকার করতে লাগল। "হায় আমর! হায় আমর!"[২]

যুদ্ধ শুরু হবার সময় সর্বপ্রথম আমের হাযরামীই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করে।

হাকীম ইবনে হাযাম এবং আমের হাযরামী উভয়ই বদর যুদ্ধ পর্যন্ত কাফের ছিল। ওতবা, আবু জাহল ও অন্যান্য কোরাইশ নেতারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফের ছিল। যদি এ সমস্ত লোক বদর যুদ্ধকে রক্তের প্রতিশোধ হিসাবেই গ্রহণ করে থাকে, তবে আমাদের বলার কিছু নেই, কিন্তু তাদের দীর্ঘ দিন পর যারা জন্মগ্রহণ করেছে তারা বদর যুদ্ধের উদ্দেশ্য কাফেলা লুট করাই বুঝেছে। উভয়ের মধ্যে কত বিরাট পার্থক্য!

১. তাবারী, পৃঃ ১৩১৩।
২. পূর্ণ বিবরণ তাবারী, পৃঃ ১৩১৩-১৩১৪ দ্রষ্টব্য।

একটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয়

যদিও একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে কাফেলা লুট করা বদর যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল না, তবুও এমন একটি ঘটনা সম্পর্কে ঐ সমস্ত ঐতিহাসিকদের এহেন ভ্রান্তির কারণ কি এবং সহীহ্ বোখারীসহ্ অন্যান্য হাদীসের কিতাব সমূহেও বদর যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কাফেলা লুট করার কথা স্পষ্টই পাওয়া যায় কেন? এ প্রশ্নসমূহের সুষ্ঠু জবাব পাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এর মূল কারণ হল এই যে যুদ্ধনীতি অনুযায়ী অধিকাংশ যুদ্ধে কোথায় কি উদ্দেশ্যে অভিযান করা হচ্ছে—তা প্রকাশ করা হত না। সহীহ্ বোখারীর তাবুক যুদ্ধের আলোচনায় প্রখ্যাত সাহাবী হযরত কা'ব ইবনে মালেকের (রাঃ) বর্ণনায় দেখা যায়। তিনি বলেছেন ঃ

ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة الا ورى بغيرها-

"নবী করীম (সাঃ) যখন কোন যুদ্ধের সংকল্প করতেন, তখন এমন কোন স্থানের কথা বলতেন, যাতে স্পষ্ট কোন স্থান বোঝা যেত না।"

এরূপ অস্পষ্টতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বোখারীর ব্যাখ্যাদাতাগণ লিখেছেন, তিনি এমন স্থানের কথা বলতেন, যার দ্বারা একাধিক স্থান বোঝা যেতে পারে। যদিও আমি ব্যাখ্যাদাতাদের সঙ্গে একমত হতে পারিনি, তবুও ঘটনার পর্যালোচনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কোন কোন সময় মূল ঘটনা অস্পষ্ট রাখা হত, যাতে লোকে বিভিন্ন অনুমান করত। এ কারণেই সা'দ ইবনে খোসাইমা প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলেন যে বদরে কাফেলা লুট নয় বরং মক্কা থেকে আগত সৈন্যবাহনীর সঙ্গে সংঘর্ষই উদ্দেশ্য ছিল। অপরপক্ষে, বোখারীতে হযরত কা'ব ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত আছে, তাতে বুঝা যায় যে কাফেলার সঙ্গে সংঘর্ষই বদর যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল।

ভূমিকায় আমরা আলোকপাত করেছি যে (সাহাবীসহ) যে কোন বর্ণনাকারী যে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন, তা অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত ঘটনার বিবৃতি নয়, বরং তিনি যা বুঝেছেন তাই বর্ণনা করেছেন। বদর যুদ্ধেও তাই হয়েছে। এ জন্যই এটি তেমন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে সাহাবীগণ (রাঃ) বিভিন্ন ধরনের অনুমান করেছিলেন। এরই ফলে যে অনুমানটি পরিবেশের আনুকূল্য লাভ করেছে সেটিই বেশি প্রচারণা লাভ করেছে।

বদর যুদ্ধের ফলাফল

বদর যুদ্ধ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই সুদূরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে এটিই ছিল ইসলাম বিকাশের প্রথম সোপান। যে সমস্ত কোরাইশ নেতৃবর্গ ইসলাম প্রসারের ক্ষেত্রে ভীষণ বাধাস্বরূপ ছিল, তাদের প্রায় সবাই বদরের রণক্ষেত্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ওতবা ও আবু জাহ্লের মৃত্যুতে সর্বময় নেতৃত্বের সম্মানিত শিরোপা আবু সুফিয়ানের মস্তকেই শোভা পেতে থাকে ; যার ফলে, পরবর্তী পর্যায়ে উমাইয়া বংশের খেলাফতের সূচনা হয়। তবে কোরাইশদের মূল শক্তি বদর প্রান্তরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

মদীনার 'আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সলুল' বদরের পূর্ব পর্যন্ত বাহ্যত কাফের ছিল। বদর যুদ্ধের পর সে প্রকাশ্যভাবে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নেয় বটে, তবে আমরণ মোনাফিকই থেকে যায়।

এ সমস্ত অনুকূল পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকূল উপকরণসমূহেও আন্দোলন শুরু হয়েছিল এখান থেকেই। মদীনার ইহুদীদের সঙ্গে চুক্তি হয় যে তারা সর্বাবস্থায় নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু মুসলমানদের এ বিজয় তাদের মনে আক্রোশের বহ্নিশিখা জ্বালিয়ে দেয়। এর বিস্তারিত আলোচনা ইহুদীদের ঘটনায় করা হবে।

ইতিপূর্বে কোরাইশগণ শুধু হাযরামীর জন্যই অশ্রু বিসর্জন করত, কিন্তু বদর যুদ্ধের পর মক্কার ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়ে যায়। বদর যুদ্ধে নিহত নেতৃবর্গের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য শিশুরা পর্যন্ত অধীর হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত সাবীকের যুদ্ধ ও ওহোদের যুদ্ধ সে প্রতিশোধ স্পৃহার ফল হিসাবেই সংঘটিত হয়।

সাবীকের যুদ্ধ ঃ দ্বিতীয় হিজরী

আবু জাহ্লের পর আবু সুফিয়ান কোরাইশদের নেতা হয়। এ পদের প্রথম কর্তব্য ছিল বদর যুদ্ধে নিহত লোকদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ। সে বদর থেকে মুশরিকদের ফিরে আসার পর কসম করেছিল যে বদরে নিহত লোকদের প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত সে গোসল করব না, মাথায় তেল লাগাব না। প্রতিজ্ঞা পালনার্থে অল্প কয়েকদিন পরই সে দু'শ অশ্বারোহীসহ মদীনার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। কোরাইশরা পূর্ব থেকেই ইহুদীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পেরেছিল যে ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করবে। সে আশায় তারা সর্বপ্রথম মদীনার হুয়াই ইবনে আখতাবের কাছে গেল। কিন্তু সে তাদের আসার সংবাদ পেয়ে দরজাই খুলল না। কোরাইশরা নিরাশ হয়ে বনী নাযীরের সর্দার সালাম ইবনে মেশকামের কাছে উপস্থিত হল। বনী নযীরের

বাণিজ্যসম্ভার ভারই তদারকিতে পরিচালিত হত। সে নিতান্ত উৎসাহ ভরে কোরাইশদের অভ্যর্থনা করল, সুস্বাদু খাবার-দাবার ব্যবস্থা করল। উত্তম মদ সরবরাহের ব্যবস্থা করল। মদীনার গোপন তথ্যাদি বলে দিল। প্রত্যুষে আবু সুফিয়ান মদীনার তিন মাইল দূরে "উরাইযের" উপর আক্রমণ করে সা'দ ইবনে আমর নামক একজন সাহাবীকে হত্যা করল। কয়েকটি বাড়িঘর লুট করল এবং চারণভূমিতে আগুন লাগিয়ে দিল। এ সমস্ত দুষ্কৃতির মাধ্যমে সে তার কসম পূরণ করেছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এ খবর জানতে পেরে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। আবু সুফিয়ানের সঙ্গে খাদ্য সম্ভারের মধ্যে শুধু ছাতু ছিল। সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ছাতুর বস্তা ফেলে পলায়ন করে। মুসলমানেরা তাদের সে ছাতু তুলে আনল। আরবী ভাষায় ছাতুকে সাবীক বলা হয়। এ কারণেই এ যুদ্ধের নাম সাবীক যুদ্ধ।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর শাদীয়ে মোবারক

হযরত ফাতেমা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কন্যাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল আঠার বছর। বিভিন্ন স্থান থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসতে থাকে। ইবনে সা'দ বলেন, সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর নিকট এ ব্যাপারে নিবেদন করলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তরে বললেন, আল্লাহর হুকুমই কার্যকরী হবে। তারপর হযরত ওমর (রাঃ)-ও প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ওমর (রাঃ)-কেও পূর্বের উত্তরই দিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যত এ সমস্ত বর্ণনা যথার্থ বলে মনে হয় না। হাকীম ইবনে হাজর 'ইসাবায়' ইবনে সা'দ হযরত ফাতেমা (রাঃ) সম্পর্কিত অধিকাংশ বর্ণনাই লিপিবদ্ধ করেছেন কিন্তু এ দুটি বর্ণনা উল্লেখ করা হয়নি।

যাই হোক, হযরত আলী (রাঃ) যখন বিয়ের প্রস্তাব করলেন, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফাতেমা (রাঃ)-এর মতামত জিজ্ঞেস করলেন। তিনি সম্পূর্ণ চুপ করে রইলেন। এতেই সম্মতি প্রকাশ পেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেন, মহর দেয়ার মত তোমার কি আছে? তিনি বললেন, কিছু নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, বদর যুদ্ধে যে বর্মটি পেয়েছিলে সেটি কোথায়? তিনি বললেন, তা তো আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তাই যথেষ্ট।

পাঠকগণ হয়ত মনে করছেন, সে বর্মটি বুঝি খুবই মূল্যবান ছিল। কিন্তু যদি সে মূল্যের পরিমাণ শুনতে চান, তবে উত্তরে বলা হবে, মাত্র সোয়া শ' টাকা। এ ছাড়া হযরত আলী (রাঃ)-এর সম্বল ছিল মাত্র একটি বকরীর চামড়া এবং একটি পুরাতন চাদর। হযরত আলী (রাঃ) এ সমস্ত বস্তুই হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে দিয়েছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) তখনও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছেই থাকতেন। বিয়ের পর পৃথক ঘরের প্রয়োজন দেখা দিল। হারেস ইবনে নোমান

আন্‌সারীর অনেক ঘর ছিল। তন্মধ্যে ইতিপুর্বে কয়েকটি ঘর তিনি হুযুর (সাঃ)-কে দান করেছিলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) তাঁর কাছ থেকে কোন ঘরের ব্যবস্থা করে দিতে হুযুর (রাঃ)-এর কাছে আবদার করলেন। তিনি বললেন, "আর কত! তাঁর কাছে একথা বলতেও আমার লজ্জা হয়!" হযরত হারেছ একথা শুনে দৌড়ে এসে হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হন এবং নিবেদন করেন, "হুযুর! আমার যা কিছু আছে, সবই আপনার। আল্লাহ্‌র কসম, আপনি আমার যে ঘর নেবেন তাতে আমার আনন্দই বৃদ্ধি পাবে।" মোটকথা তিনি নবদম্পতির জন্য একটি ঘর খালি করে দিলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) সে ঘরেই উঠলেন।

উভয় জাহানের শাহান্‌শাহ্‌ স্বীয় প্রাণাধিক কন্যা বিশ্বনেত্রীর জন্য যে উপহার সামগ্রী দিয়েছিলেন তা ছিল একটি খাট, একটি খেজুর পাতা ভর্তি চামড়ার তোশক, একটি বকরী, একটি মশক, দুটি যাঁতা এবং দুটি মাটির কলসী।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-নতুন ঘরে এলেন। হুযুর (সাঃ) তাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইলেন। তারপর ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে এক বাটি পানি আনালেন এবং দুটি হাত সে পানিতে ডুবিয়ে দিলেন। সে পানি হযরত আলী (রাঃ)-এর সিনা ও বাহুতে ছিটিয়ে দিলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে ডেকে তাঁর উপরও পানি ছিটিয়ে দিলেন। তখন তিনি লজ্জায় অবনত ছিলেন। হুযুর (সাঃ) বললেন, আমি আমার বংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকটই তোমাকে বিয়ে দিয়েছি।[১]

দ্বিতীয় হিজরীর বিভিন্ন ঘটনাবলী

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুসারে এ বছরই পবিত্র রমজানের রোযা ফরয হয়েছিল। ঈদুল ফিতরের ছদকাও এ সনে ওয়াজিব হয়। হুযুর (সাঃ) প্রথম একটি খুৎবার মাধ্যমে ছদকার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে ছদকা প্রদান করার নির্দেশ দিলেন।

জামাতের সঙ্গে ঈদুল ফিতরের নামাযের হুকুমও এ বছর নাযিল হয়। এর পূর্বে আর ঈদের নামায হয়নি।

ঐতিহাসিকদের নীতিমালা অনুযায়ী বনী কায়নুকার যুদ্ধও এ বছরের ঘটনাবলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার কথা। কিন্তু ঘটনার ধারাবাহিকতা ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে পরে তার আলোচনা করা হয়েছে।

১. তাবকাতে ইবনে সা'দ– এসাবা।

ওহোদ [ক]

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

"তোমরা সাহস হারাইও না এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্থও হইও না তোমরাই বিজয়ী থাকবে, যদি তোমরা মুমিন হও।" —আলে-ইমরান-১৪[খ]

আরবে একটি হত্যাকে কেন্দ্র করে এমন দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সূচনা হত, যা শত শত বছরেও শেষ হত না। দু'পক্ষের মধ্যে যারা পরাজিত হত, প্রতিশোধ গ্রহণ করাকে তারা তাদের অস্তিত্বের প্রশ্নের মত একটি অপরিহার্য কর্তব্য বলে মনে করত। বদর যুদ্ধে কোরাইশদের বাছা বাছা সত্তর জন নেতা নিহত হয়েছিল। ফলে সমগ্র মক্কা নগরী প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল।

বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে কোরাইশদের বাণিজ্য কাফেলাটি প্রচুর লাভবান হয়ে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিল। তার মূলধন মালিকদের নিকট ফেরত দেয়া হয়েছিল। কিন্তু লভ্যাংশ আমানতস্বরূপ সংরক্ষিত ছিল।

কোরাইশরা বদর যুদ্ধের প্রাথমিক ধাক্কা কিছুটা সামলে উঠেই প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠল।

আবু জাহলের পুত্র ইকরিমাসহ কতিপয় কোরাইশ সরদার বদর যুদ্ধে নিহত পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে আবু সুফিয়ানের কাছে এসে বলল, "মোহাম্মদ (সাঃ) তো আমাদের বংশের বাতি নিভিয়ে দিয়েছে, এখন প্রতিশোধ গ্রহণের সময়। যে মূলধন আমাদের কাছে সঞ্চিত আছে তা একাজে ব্যয় করা হোক।" দরখাস্তটি এমন সময়োপযোগী ছিল যে পেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তা মঞ্জুর হয়ে গেল। কিন্তু মুসলমানদের শক্তিমত্তা সম্বন্ধে তারা সম্যক অবগত ছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল বদরের যুদ্ধে যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা অবতীর্ণ হয়েছিল, এবার তার চেয়ে অনেক বেশি অস্ত্র এবং সাজ-সরঞ্জামের আয়োজন করতে হবে।

আরববাসীদের যুদ্ধ বা অনুরূপ কোন অভিযানে উদ্দীপিত করার প্রধানতম অস্ত্র ছিল প্রাণস্পর্শী কবিতা। তখনকার দিনে কোরাইশ সম্প্রদায়ের মধ্যে আ'মর জামহী ও মুসআফ নামক দুজন প্রসিদ্ধ কবি ছিল। আমর জামহী বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়েছিল। কিন্তু হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে দয়া পরবশ হয়ে মুক্তি দিয়েছিলেন। কোরাইশদের অনুরোধে সে এবং মুসআফ দুজনেই সমগ্র কোরাইশ গোত্রের মধ্যে তাদের অনলবর্ষী কবিতা দ্বারা আগুন ধরিয়ে দিল।

ক. মদীনার উত্তরে দেড়মাইল দূরে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম।

খ. সহীহ্ বোখারী শরীফে 'ওহোদ যুদ্ধ' পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে যে, আয়াতটি ওহোদ প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয়েছিল।

নারী ছিল আরবদের যুদ্ধ উন্মাদনা সৃষ্টি করা ও যুদ্ধে দৃঢ় থাকার প্রধান উপকরণ। যে সকল যুদ্ধে নারীরা উপস্থিত থাকত, সেগুলোতে আরবের যোদ্ধারা জীবন-মরণ পণ করে লড়াই করত। কেননা, যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীদের দ্বারা লাঞ্ছিত হওয়ার প্রশ্নও জড়িত ছিল। নারীদের মধ্যে অনেকে এমনও ছিল ; যাদের স্বামীসন্তান বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। তারাও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। তারা প্রতিজ্ঞা করল যে স্বামী সন্তান হত্যাকারীদের রক্ত পান না করা পর্যন্ত তারা ক্ষান্ত হবে না। অবশেষে সৈন্য সজ্জিত হল। তাদের সঙ্গে সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারাও যোগদান করল। এদের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিচে দেয়া হল ঃ

১। হিন্দা—ওতবার কন্যা এবং আমির মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর মাতা।

২। উম্মে হাকিম—ইকরিমার(আবু জাহলের পুত্র) স্ত্রী।

৩। ফাতেমা (অলীদ কন্যা)—হযরত খালেদ (রাঃ)-এর ভগ্নি।

৪। বারযা—মাসউদ সাকাফীর (তায়েফের সম্পদশালী ব্যক্তি) কন্যা।

৫। রিতা—আমর ইবনে আসের স্ত্রী।

৬। খোন্নাস–হযরত মুসআব (রাঃ) ইবনে ওমাইরের মাতা।[১]

হিন্দার পিতা ওতবা এবং জুবাইর ইবনে মুতআমের চাচা বদরের যুদ্ধে হযরত হামযা (রাঃ)-এর হাতে নিহত হয়। সুতরাং হিন্দা জুবাইরের দাসকে প্রলুব্ধ করে যে হযরত হামযা(রাঃ)-কে হত্যা করতে পারলে তাকে মুক্ত করে দেয়া হবে। দাসটি ছিল তীরন্দাজীতে সিদ্ধহস্ত।

হযরত আব্বাস (রাঃ) হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাচা ছিলেন। তিনি যদিও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন। তিনি হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কোরাইশদের সকল ষড়যন্ত্রের কথা অবহিত করার জন্য জনৈক দ্রুতগামী দূতকে পাঠালেন এবং তাকে বলে দিলেন যে তিন দিন তিন রাতের মধ্যেই যেন সে মদীনায় গিয়ে পৌঁছায়।

হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ সংবাদ পেয়ে তৃতীয় হিজরীর ৫ই শাওয়াল তারিখে আনাস ও মুনেস নামক দুজন সংবাদ সংগ্রহকারীকে পাঠালেন। তাঁরা ফিরে এসে সংবাদ দেন যে কোরাইশদের সৈন্য মদীনার কাছাকাছি এসে গেছে এবং মদীনার চারণভূমি তাদের ঘোড়ায় খেয়ে পরিষ্কার করে ফেলেছে।

---

১. (তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ-৩৮৬), যারকানী, (৪র্থ খণ্ড, পৃঃ-৩০) উপরোক্ত ছয় জন নারী ব্যতীত ফুলাকা ও উমাইরা নাম্নী আরও দু'জন মহিলার নাম উল্লেখ করেছেন। খোন্নাস ও উমাইরা ব্যতীত আর সকলেই পরে মুসলমান হয়েছিল। খোন্নাস ও উমাইরার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইবনে মানযারকে সৈন্য সংখ্যা জানার জন্য পাঠালেন। তিনি এসে সঠিক ধারণা দিলেন। শহরের উপর যেহেতু আক্রমণের ভয় ছিল তাই চার দিকে পাহারা মোতায়েন করা হল। হযরত সা'দ ইবনে উবাদা এবং হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায অস্ত্র সজ্জিত হয়ে সারা রাত মসজিদে নববীর দরজা পাহারা দিতে লাগলেন।

ভোরে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। অধিকাংশ মুহাজির এবং নেতৃস্থানীয় আনসারগণ মন্তব্য করলেন যে মহিলাদের বহির্দুর্গ পাঠিয়ে দেয়া হোক এবং শহরে থেকেই শত্রু শক্তিকে প্রতিহত করা হোক। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সলুলও এ মত দিলেন। কিন্তু যে সমস্ত তরুণ সাহাবী বদর যুদ্ধে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেননি; তাঁরা জেদ ধরলেন যে শহরের বাইরে গিয়ে শত্রুর উপর আক্রমণ চালানো হোক।[১] হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘরে চলে গেলেন এবং লৌহবর্ম পরে তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলেন। তা দেখে তরুণেরা এ ভেবে লজ্জা বোধ করল যে আমরা হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বের হতে বাধ্য করছি। সকলে আরয করলেন, আমরা আমাদের মত প্রত্যাহার করলাম। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, একবার যুদ্ধ সাজ পরিধান করার পর তা খুলে ফেলা পয়গম্বরের জন্য শোভা পায় না।

কোরাইশরা বুধবার দিন মদীনার নিকটবর্তী হল এবং ওহোদ পাহাড়ের পাদদেশে তাঁবু ফেলল। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জুমআর দিন নামায পড়ে শহর থেকে বের হলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তিনশ' সৈন্যের একটি দলসহ এগিয়ে এসেও এ বলে ফিরে গেল যে "মোহাম্মদ (সাঃ) আমার অভিমত গ্রহণ করেননি।" হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন আর মাত্র সাতশ' সাহাবী। তাঁদের মধ্যে মাত্র একশ' ছিলেন লৌহ বর্ম পরিহিত।

মদীনা থেকে বের হয়ে প্রথমে সৈন্য পরীক্ষা করা হল। অল্পবয়স্ক বালকদের ফেরত পাঠানো হল। এদের মধ্যে ছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে-সাবেত, হযরত বারা ইবনে আযেব, হযরত আবু সায়ীদ খুদরী, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর এবং হযরত আরাবা আউসী (রাঃ) প্রমুখ। জীবন উৎসর্গকারীদের এমন বিস্ময়কর নমুনা ছিল যে হযরত রাফে' ইবনে খাদীজকে যখন বলা হল, তুমি বয়সে ছোট বাড়ি ফিরে যাও, তখন তিনি পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর করে দেহ টান করে দাঁড়ালেন যাতে উঁচু দেখা যায়। অবশ্য তাঁর এ কৌশল কার্যকরী হল। তিনি সৈন্য বাহিনীতে গণ্য হলেন[২] সামুরা নামক অপর এক বালক হযরত রাফে'র

১. যারকানী ২য় খণ্ড পৃঃ-২৫।

২. তাবারী ২য় খণ্ড, পৃঃ–১৩৯১। কিন্তু অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত রাফে'র অনুমতি পাওয়ার মূলে ছিল তিনি অতি অল্প বয়সেই তীরন্দাজীতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন এ সংবাদ জানতে পারলেন তখন তাঁকে গ্রহণ করার অনুমতি দিলেন। ইবনে হিশামে ওহোদ যুদ্ধের আলোচনায় যারকানী ২য় খণ্ড, পৃঃ-২৯ ; বেদায়া, ইবনে কাছীর ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ-১৫।

সমবয়সী ছিলেন, তিনি যুক্তি খাড়া করলেন যে রাফে'কে আমি কুস্তিতে হারিয়ে দিতে পারি ; তাকে যদি নেয়া হয়, তা হলে আমাকেও নিতে হবে। অতঃপর দুজনকে লাগিয়ে দেয়া হল। সামুরা রাফে'কে তুলে মাটিতে আছাড় মারলেন। এ জন্য তাঁকেও গ্রহণ করা হল।

ওহোদ পাহাড় পেছনে রেখে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সৈন্য মোতায়েন করলেন। হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (রাঃ)-এর হাতে পতাকা দান করলেন। হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন, হযরত হামযা(রাঃ) হলেন বর্মহীন সৈন্যদের প্রধান পরিচালক।[১] পেছনের দিক থেকে আক্রমণের ভয় ছিল বলে পঞ্চাশ জনের একটি তীরন্দাজ বাহিনী সেদিকে নিযুক্ত করা হল। এবং আদেশ করা হল যুদ্ধে জয়লাভ করা হলেও তাঁরা যেন স্থানচ্যুত না হন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ) তীরন্দাজ বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হলেন।

কোরাইশরা বদরের যুদ্ধে উপযুক্ত শিক্ষা পেয়েছিল। তাই এবার তারা অত্যন্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে কাতারবদ্ধ হল। দক্ষিণে খালেদ ইবনে অলীদ, পেছনে আবু জাহ্লের পুত্র ইকরিমা সসৈন্যে নিযুক্ত হল। কোরাইশ বংশের নাম করা ধনী সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া নিযুক্ত হল অশ্বারোহী বাহিনীর পরিচালক। তীরন্দাজ বাহিনীর প্রধান ছিল আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই রবিয়া। পতাকা ছিল তালহার হাতে। প্রয়োজন বশত কাজে লাগতে পারে এমন দু'শ ঘোড়া সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় রাখা হয়েছিল।

সর্বপ্রথম যুদ্ধ বাজনার পরিবর্তে কোরাইশ মহিলারা ঢাকের বাজনার তালে তালে নৃত্য করে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে অগ্রসর হল। এ কবিতার মর্মার্থ ছিল বদরের যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের উপর শোক প্রকাশ করা এবং তাদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কোরাইশ বাহিনীকে ক্ষেপিয়ে তোলা। হিন্দা ছিল সম্মুখে এবং তার সঙ্গী ছিল আরও চৌদ্দ জন মহিলা। তাদের কবিতাটির বঙ্গানুবাদ হলঃ

"আমরা সকলে তারকার কন্যা। আমরা গালিচা মাড়িয়ে চলি। তোমরা যদি যুদ্ধ কর, আমরা তোমাদের সঙ্গে কোলাকুলি করব। আর যদি পশ্চাদপসরণ কর, তাহলে আমরা তোমাদেরকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করব।"

যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল এভাবে—প্রথমে আবু আমের নামক এক ব্যক্তি যে মদীনার একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিল এবং পরে মক্কায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে, সে দেড়শ' সৈন্যসহ যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হল। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পবিত্রতা ও ধার্মিকতার জন্য সমগ্র মদীনা তার সম্মান করত। তার বদ্ধমূল ধারণা ছিল, মদীনার আনসাররা তাকে দেখামাত্র মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সঙ্গ ছেড়ে দেবে। সে যুদ্ধের ময়দানে এসে চিৎকার করে বলল, "আমাকে চিনতে পেরেছ? আমি আবু আমের।" আনসাররা বললেন, "হ্যাঁ, এস পাপাত্মা, আমরা তোমাকে চিনতে পেরেছি, আল্লাহ্ তোমার আকাঙ্খা অপূর্ণই রাখবেন।"

---

১. তাবারী ২য় খণ্ড পৃঃ-১৩৯৪।

কোরাইশ পক্ষের পতাকাবাহী তাল্‌হা এগিয়ে গিয়ে আহ্বান জানাল, "কি হে মুসলমানগণ! আছে নাকি তোমাদের মধ্যে এমন কেউ যে আমাকে তাড়াতাড়ি দোযখে পাঠিয়ে দেবে অথবা আমার সঙ্গে বেহেশতে চলে যাবে?"[১] হযরত আলী (রাঃ) "আমিই আছি" বলে এগিয়ে গিয়ে এমন আঘাত হানলেন যে সঙ্গে সঙ্গে তালহার লাশ মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। তাল্‌হার পর তার ভাই ওসমান পতাকা নিজের হাতে তুলে নিল। ওসমানের পেছনের মহিলারা কবিতা আবৃত্তি করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিল। ওসমানও তালে তালে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন তার মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল—"পতাকাবাহীর কর্তব্য হল বল্লমকে রক্তে রঞ্জিত করা অথবা নিজে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া।"

হযরত হামযা (রাঃ) তাকে প্রতিহত করতে এগিয়ে গেলেন এবং তলোয়ারের এক আঘাতে তাকে কোমর পর্যন্ত নামিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ দিয়ে বের হল, "আমি সাকী হাজ্জাজের পুত্র।"

এবার ব্যাপক যুদ্ধ বেধে গেল। হযরত হামযা (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবু দাজানা (রাঃ) শত্রু সৈন্যের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লেন এবং কাতারে কাতারে কোরাইশ সৈন্যের মুণ্ডপাত করতে করতে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

হযরত আবু দাজানা (রাঃ) ছিলেন আরবের বিখ্যাত কুস্তিগীর। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর পবিত্র হাতে তলোয়ার তুলে ধরে বললেন, "কে এর কর্তব্য পালন করবে।" এ সৌভাগ্য লাভের আশায় বহু হস্ত সম্প্রসারিত হল, কিন্তু হযরত আবু দাজানাই তলোয়ার লাভ করলেন। এ অপ্রত্যাশিত গৌরব লাভে তিনি আত্মহারা হয়ে গেলেন। মাথায় রুমাল বেঁধে সদর্পে বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিতে বেরিয়ে এলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, "এ ধরনের চলা আল্লাহ্‌র নিকট অত্যন্ত অপছন্দীয়, কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে অবশ্যই তা পছন্দনীয়।"

হযরত আবু দাজানা (রাঃ) শত্রু সৈন্য নিপাত করতে করতে এগিয়ে গেলেন। সামনেই হিন্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তার মাথার উপর তলোয়ার রেখে তিনি পুনরায় তা তুলে নিলেন, যেহেতু হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর তলোয়ার অবলা নারীর উপর ধার পরীক্ষা করার উপযুক্ত স্থান ছিল না।

হযরত হামযা (রাঃ) দু'হাতে তলোয়ার চালাচ্ছিলেন এবং যেদিকে যাচ্ছিলেন কাতারে কাতারে কোরাইশ সৈন্য পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল। এমনি সময় সিবাগ গুবসানী সামনে পড়ল। তিনি হাঁকলেন ঃ হে খাত্‌নাকারিনীর পুত্র! কোথায় যাচ্ছ? এ বলে তলোয়ার মারলেন। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

১. বিদ্রূপ করে কথাটি বলা হয়েছিল, যেহেতু মুসলমানগণ তাই বিশ্বাস করত।

ওয়াহ্শী ছিল একটি হাবশী দাস। তার প্রভু যুবাইর ইবনে মুতএ'ম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যদি সে হযরত হামযা (রাঃ)-কে হত্যা করতে পারে তাহলে তাকে মুক্ত করে দেয়া হবে। এ আশ্বাসে সে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। হযরত হামযা (রাঃ)- কাছে আসতেই সে "হারবা" (আবিসিনিয়াবাসীদের বিশেষ অস্ত্র) নিক্ষেপ করল এবং তা হযরত হামযার নাভীমূলে বিদ্ধ হল। আহত অবস্থায় হযরত হামযা (রাঃ) তার উপর আক্রমণ করতে চাইলেন, কিন্তু তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে পড়ে গেলেন এবং তাঁর আত্মা দেহত্যাগ করল।[১]

কাফেরদের ঝাণ্ডাবাহী সৈনিকেরা যুদ্ধ করতে করতে শেষ হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ঝাণ্ডা মাটিতে পড়ছিল না। একজন পড়ে গেলে অন্যজন তা তুলে নিচ্ছিল। সাওয়াব নামক এক ব্যক্তি যখন ঝাণ্ডা হাতে নিল, তখন অন্য কে একজন এগিয়ে এসে তলোয়ার দ্বারা তাকে এমন জোরে আঘাত করল যে তার দুটি হাতই কেটে মাটিতে পড়ে গেল। জাতীয় পতাকা মাটিতে পড়বে এ দৃশ্যটি সে স্বচক্ষে দেখতে পারছিল না, তাই পতাকা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বুকের উপর ভর করে মাটিতে পড়ে গেল এবং পতাকা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে এবং "আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি।"[২] বলতে বলতে মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর পতাকাটি বহুক্ষণ মাটিতে পড়ে থাকে। অবশেষে জনৈকা দুঃসাহসী মহিলা (উমরা বিনতে আলকামা) এগিয়ে এসে সেটি তুলে নেয়। এদৃশ্য দেখে চতুর্দিক থেকে কোরাইশ বাহিনী আবার জড়ো হল এবং স্খলিত পদ আবার শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

আবু আমের কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধ করছিল, অথচ তার পুত্র হযরত হানযালা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু দয়ার সাগর বিশ্বনবী হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তা পছন্দ করলেন না। অতঃপর হযরত হানযালা অত্যন্ত দুঃসাহসিক এক আক্রমণে কাফের সৈন্যাধ্যক্ষের (আবু সুফিয়ান) উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তলোয়ারেরর আঘাতে তাকে শেষ করার উপক্রম করলেন। ঠিক এমনি সময়ে পাশ থেকে শাদ্দাদ ইবনে আসওয়াদ দ্রুতবেগে তাঁর তলোয়ারের আঘাতকে রোধ করে। তার প্রতিআক্রমণে হযরত হানযালা শহীদ হলেন।

যুদ্ধে মুসলমানদেরই বিজয় সুনিশ্চিত হয়ে উঠল। কাফের পতাকাবাহীদের মৃত্যু এবং হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আবু দাজানা (রাঃ)-এর অপ্রতিরোধ্য আক্রমণের ফলে কাফের সৈন্যদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। উত্তেজনা সৃষ্টিকারিণী মহিলারাও হতোদ্যম হয়ে পিছু হটতে লাগল।

---

১. সহীহ্ বোখারী হযরত হামযা হত্যা পরিচ্ছেদ, পৃঃ-৫৮৩।
২. ইবনে হিশাম ও তাবারী (৩য় খণ্ড, পৃঃ-১৪০১)।

মুসলমানদের ভাগ্যাকাশ থেকে বিপদের ঘনঘটা কেটে যাওয়ার লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। অতি উৎসাহের বশে মুসলমান সৈন্যরা পলায়নপর শত্রুদের ফেলে যাওয়া মালে গণীমত আহরণে প্রবৃত্ত হলেন। এ অবস্থা দেখে পেছনে নিযুক্ত তীরন্দাজ সৈন্যরাও আনন্দের আতিশয্যে ক্ষণিকের জন্য কঠিন কর্তব্য ভুলে গিয়ে গণীমত আহরণে যোগ দিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ) এতে কঠোরভাবে বাধা দিলেন। কিন্তু তাঁদের ফেরাতে পারলেন না।[১] তীরন্দাজদের স্থান শূন্য দেখে খালেদ ইবনে অলীদ পেছন দিক থেকে প্রতি-আক্রমণ করে বসলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ) কয়েকজন আত্মোৎসর্গকারী সাহাবীকে সঙ্গে নিয়েই স্থির হয়ে দাঁড়ালেন, কিন্তু সকলেই শহীদ হয়ে গেলেন। ফলে, রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল। খালেদ অশ্বারোহী সৈন্যদলের সহায়তায় অত্যন্ত নির্মমভাবে আঘাত হানলেন। এদিকে মুসলিম সৈন্যরা আত্মবিস্মৃত হয়ে গনীমত আহরণে ব্যস্ত ছিলেন। পেছনে ফিরে দেখলেন দুশমনের তলোয়ার তাঁদের মস্তকের উপর। এ আকস্মিক বিপদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুসলিম সৈন্যরা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লেন। অনেকেই কাফের বাহিনীর ভিতরে পড়ে গেলেন। এ অবস্থায় তরবারি চালাতে গিয়ে অনেকেই নিজেদের সৈন্যদের ঘাড়েই তরবারি চালিয়ে দিলেন। ফলে, অনেকেই নিজেদের লোকজনের হাতে শাহাদতবরণ করলেন। হযরত মুসআবের (রাঃ) আকৃতি হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আকৃতির সঙ্গে অনেকটা মিল ছিল, মুসলিম বাহিনীর পতাকাও তখন তাঁরই হাতে ছিল। ইবনে কুমাইয়া তাঁকে শহীদ করে ফেলল। চারদিকে আওয়াজ উঠল হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) শাহাদতবরণ করেছেন। তাই যুদ্ধক্ষেত্রের সর্বত্র এক ব্যাপক নৈরাশ্য নেমে আসল। মুসলমানদের বিশিষ্ট বীরযোদ্ধারাও হতোদ্যম হয়ে পড়লেন। সামনের কাতারের লোকেরা পেছনের কাতারের লোকদের উপর আক্রমণ করে বসলেন। শত্রু মিত্র একাকার হয়ে গেল। এ হট্টগোলের মধ্যে হযরত হুযাইফার (রাঃ) পিতা আক্রমণ করলেন। তাঁর উপর আক্রমণ চলল। হযরত হুযাইফা (রাঃ) চিৎকার করতে লাগলেন 'আমার পিতা', কিন্তু কে কার কথা শোনে। তিনি শহীদ হলেন। হযরত হুযাইফা (রাঃ) বিনয়ের সুরে বললেন, 'হে মুসলমানগণ! আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন।'[২] রসূলুল্লাহ (সাঃ) পেছন ফিরে দেখলেন, মাত্র এগারো জন নিবেদিত প্রাণ তাঁর পেছনে রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরাত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ), হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম, হযরত আবু দাজানা এবং হযরত তালহার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সহীহ্ বোখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকটে কেবলমাত্র হযরত তালহা এবং হযরত সা'দই (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন।

---

১. সহীহ্ বোখারী, ওহোদ যুদ্ধ, পৃঃ-৫৭৯
২. সহীহ্ বোখারী , ওহোদ যুদ্ধ, পৃঃ-৫৮১

এই গোলযোগপূর্ণ ও বিশৃঙ্খলময় পরিস্থিতির মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান সেনাই নিরাশ হয়ে পড়লেন। যে যেখানে ছিলেন সেখানেই হতভম্ব হয়ে বসে পড়লেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সংবাদ কারও জানা ছিল না। হযরত আলী (রাঃ) ক্রমাগত তলোয়ার চালিয়ে শত্রুসৈন্য নিধন করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ (রাঃ)-এর সংবাদ তিনিও রাখতেন। হযরত আনাস (রাঃ)-এর চাচা ইবনে নযর শত্রুসৈন্য ধ্বংস করতে করতে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখলেন, হযরত ওমর (রাঃ) নিরাশ হয়ে অস্ত্র ফেলে দিয়েছেন।[১] জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে আপনি কি করছেন?" তিনি উত্তর দিলেন "আর যুদ্ধ করে কি করব? হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তো শাহাদত বরণ করেছেন।" ইবনে নযর বললেন, "এরপর জীবিত থেকেই আমরা কি করব?" এ বলে তিনি ভিড়ের ভেতরে ঢুড়ে পড়লেন এবং যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করলেন। যুদ্ধ শেষে যখন তাঁর লাশ উদ্ধার করা হল, তখন দেখা গেল আশিটিরও অধিক তীর-তলোয়ার ও বল্লমের আঘাতের দাগ তাঁর শরীরে বিদ্যমান। কেউ তাঁকে চিনতেই পারছিল না। তাঁর ভগ্নিই একমাত্র হাতের আঙ্গুল দেখে তাঁকে চিনতে পারেন।[২]

প্রকৃত নিবেদিতপ্রাণরাই প্রাণপণে যুদ্ধ করছিলেন এবং হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অনুসন্ধান করছিলেন। সর্বপ্রথম হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) তাঁকে দেখতে পেলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে চিনতে পেরে তিনি সজোরে চিৎকার করে উঠলেন, "হে মুসলমানরা, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এখানে আছেন।" একথা শুনে মুসলমানগণ চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কাফেররাও চতুর্দিক থেকে জড়ো হয়ে দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করতে লাগল। কিন্তু মুসলমানদের তলোয়ারের বিদ্যুৎ গতি তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে লাগল। এক সময় এমন ভিড় হল যে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, "কে আমার জন্য জীবন দিতে পার?" যিয়াদ ইবনে সাকিন পাঁচজনের একটি দল নিয়ে এগিয়ে এলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে সবাই শাহাদতবরণ করলেন।[৩] হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আদেশ করলেন, যিয়াদের লাশ আমার কাছে নিয়ে এস। লোকজন ধরাধরি করে তাকে নিয়ে এলেন। রূহ্ তখনও বাকি ছিল। অতিকষ্টে তিনি হামাগুড়ি দিয়ে হুযুর (সাঃ)-এর পদযুগলের উপর মুখ রাখলেন এবং এ অবস্থায়ই দেহত্যাগ করলেন।

১. এটা সাধারণ ঐতিহাসিকের অভিমত, সহীহ্ বোখারীতে এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে তবে সেখানে হযরত ওমর (রাঃ)-এর নাম নেই।
২. সহীহ্ বোখারী ওহোদ যুদ্ধ পৃঃ ৫৭৯। সহীহ্ মুসলিম ২য় খণ্ড পৃঃ ১৩৮।
৩. সহীহ্ মুসলিম শরীফের ওহোদ যুদ্ধের বিবরণে রয়েছে যে, সাত জনই আনসার ছিলেন এবং একের পর এক প্রত্যেকেই শাহাদত বরণ করেন।

জনৈক মুসলমান এ অবস্থায় দাঁড়িয়ে খেজুর খাচ্ছিলেন। সামনে এগিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)! আমি যদি এ যুদ্ধে মারা যাই, তাহলে কোথায় থাকব?" তিনি বললেন, 'বেহেশতে।' এ সুসংবাদ শুনে তিনি আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং কাফেরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শাহাদত বরণ করলেন।[১]

কোরাইশ বাহিনীর জনৈক প্রসিদ্ধ যোদ্ধা আবদুল্লাহ্ ইবনে কুমাইয়া ভিড় ঠেলতে ঠেলতে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট এস পড়ল এবং পবিত্র মুখমণ্ডলের উপর সজোরে তরবারির আঘাত করল। এ আঘাতে শিরস্ত্রাণের দুটি দাঁত তাঁর মুখের ভেতরে ঢুকে গেল। চারদিক থেকে তীর-তলোয়ার বিরামহীনভাবে বর্ষণ হতে লাগল। অবস্থা দেখে সাহাবিগণ হুযুর (সাঃ)-কে চারদিক থেকে ঘিরে ধরলেন। আবু দাজানা (রাঃ) ঝুঁকে ঢালের ন্যায় তাঁকে আড়াল করলেন। এমতাবস্থায় যত তীর আসতে লাগল সবই আবু দাজানার পিঠে বিদ্ধ হতে লাগল। হযরত তালহা (রাঃ) হাত দ্বারা তলোয়ারের আঘাত প্রতিহত করতে লাগলেন। তাঁর একখানি হাত কেটে নিচে পড়ে গেল। নির্মম পাষণ্ডের দল হযরত রসূলুল্লাহর (সাঃ) উপর ক্রমাগত তীর নিক্ষেপ করতে লাগল। তখনও হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র মুখ থেকে ক্রমাগত উচ্চারিত হচ্ছিল—

رَبِّ اغْفِرْ قَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ্, তুমি আমার কওমকে ক্ষমা কর, কেননা তারা জানে না।"[২]

হযরত আবু তালহা ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ তীরন্দাজ। তিনি এমনভাবে তীর ছুঁড়তে লাগলেন যে দু-তিনখানা ধনুক তাঁর হাতে ভেঙে খানখান হয়ে গেল। তিনি ঢাল দ্বারা হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে এমনভাবে ধরলেন যাতে অতঃপর আর কোন প্রকার আঘাত তাঁর গায়ে না লাগতে পারে। হযরত যখন মুখ তুলে সৈন্যদের দিকে তাকালেন, তখন আবু তালহা (রাঃ) আরয করলেন, আপনি মুখ উঁচু করবেন না। এমন আবার না হয় যে কোন তীর দৈবাৎ আপনার গায়ে লাগে, এই আমার বক্ষ সামনে আছে।[৩] হযরত ইবনে ওয়াক্কাস (রাঃ)-ও একজন প্রসিদ্ধ তীরন্দাজ ছিলেন। তিনি হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে একই ঘোড়ায় আরোহী ছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর নিজের তূণ সা'দের সামনে রাখলেন এবং বললেন, "তোমার উপর আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক। তীর চালাও।[৪]

---

১. সহীহ্ বোখারী, ওহোদ যুদ্ধ, পৃঃ-৫৭৯।
২. সহীহ্ মুসলিম, ওহোদ যুদ্ধ, ২য় খণ্ড, পৃঃ-৯১।
৩. সহীহ্ বোখারী, ওহোদ যুদ্ধ পৃঃ-৫৮১।
৪. সহীহ্ বোখারী, ওহোদ যুদ্ধ, পৃঃ-৫৮০।

এ অবস্থায় হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "যে জাতি তাদের নবীর উপর আক্রমণ করে, তারা ত্রাণ পারে কি করে!" আল্লাহ্ পাকের দরবারে কথাটি কবুল হল এবং সঙ্গে সঙ্গে আয়াত নাজিল হল ঃ

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ -

অর্থাৎ "এ ব্যাপারে আপনার কোন অধিকার নেই।"

অতঃপর ওহোদের যুদ্ধ সম্বন্ধে সহীহ্ বোখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দৃঢ় পদক্ষেপে পাহাড়ের চূড়ার উপর আরোহণ করলেন, যাতে শত্রু সৈন্য সেখানে পৌছতে না পারে। আবু সুফিয়ান তা দেখে কতিপয় সৈন্যসহ পাহাড়ে উঠতে লাগল, হযরত ওমর (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) পাথর নিক্ষেপ করে তাদেরকে প্রতিহত করলেন।[১]

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শাহাদতের সংবাদ মদীনায় গিয়ে পৌছাল। ভক্ত অনুরক্তের দল শোকে মুহ্যমান হয়ে ওহোদের দিক ছুটছিল। হযরত ফাতেমা (রাঃ) এসে দেখলেন, পবিত্র মুখমণ্ডল থেকে তখনও রক্ত ঝরছে। হযরত আলী (রাঃ) ঢাল ভরে পানি আনলেন, হযরত ফাতেমা (রাঃ) রক্ত ধুয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু রক্ত কোনমতেই বন্ধ হচ্ছিল না। অবশেষে এক টুকরো চাটাই পুড়িয়ে তার ছাই ক্ষত স্থানে চেপে ধরলেন, সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।[২]

আবু সুফিয়ান সামনে পাহাড়ে উঠে চীৎকার করে বলল, "এখানে মোহাম্মদ (সাঃ) আছেন কি? " হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জবাব দিতে নিষেধ করলেন। আবু সুফিয়ান এবার হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর নাম ধরে আওয়াজ দিল। কোন উত্তর না পেয়ে সে চীৎকার করে উঠল, "তাহলে সবাই শেষ হয়ে গেছে!"

একথা শুনে হযরত ওমর (রাঃ) আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না, গর্জে উঠে আওয়াজ দিলেন, "রে আল্লাহর দুশমন! আমরা সবাই জীবিত আছি।"

আবু সুফিয়ান বলল,

اعل هبل "হে হোবল[৩] তুমি উর্ধ্বে থাক।" সাহাবীগণ হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আদেশ মত বললেন,

اَللّٰهُ اَعْلٰى وَ جَلَّ "আল্লাহ্ সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ।"

---

১. তাবারী, পৃঃ-১৪১০-১৪১১।
২. সহীহ্ বোখারী, ওহোদ যুদ্ধ, ২য় খণ্ড, পৃঃ-৫৮৪।
৩. মূর্তির নাম।

আবু সুফিয়ান বলল, لَنَا الْعُزّٰى وَلَا عُزّٰى لَكُمْ "আমাদের জন্য উযযা[১] আছে তোমাদের উয্‌যা নেই।"

সাহাবীগণ বললেন, اَللّٰهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلٰى لَكُمْ "আল্লাহ্ আমাদের প্রভু, তোমাদের কোন প্রভু নেই।"

আবু সুফিয়ান বলল, "আজ বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হল। সৈন্য বাহিনীর লোকেরা মৃত ব্যক্তিদের নাক-কান কেটে দিয়েছে। আমি অবশ্য আদেশ দিইনি। তবে একথা শুনে আমার দুঃখও হয়নি।"[২]

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মহিলা ও শিশুদের য়ামান ও হযরত সাবেত (রাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে মদীনার নিকটবর্তী একটি দুর্গে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদ শুনে তাঁরা ওহোদের দিকে দৌড়ালেন। হযরত সাবেত মুশরেকদের হাতে শাহাদতবরণ করলেন। হযরত য়ামানকে মুসলমানদের ভিড়ে চেনা যায়নি। তিনি মুসলমানদের হাতেই শহীদ হলেন। হযরত য়ামানের পুত্র হযরত হুযাইফা (রাঃ)-বার বার 'আমার পিতা' বলে পরিচয় দিতে লাগলেন, কিন্তু কে কথা শোনে! হুযাইফা শেষে এ বলে ক্ষান্ত হলেন যে "হে মুসলমানগণ, আল্লাহ্ পাক তোমাদের ক্ষমা করে দিন।" হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুসলমানদের নিকট থেকে হত্যার বদলা গ্রহণ করতে চাইলেন, কিন্তু হযরত হুযাইফা ক্ষমা করে দিলেন। ইবনে হিশামে এ ঘটনাটি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ্ বোখারী শরীফেও এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে।

কোরাইশ মহিলারা বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মুসলমানদের মৃত লাশের উপর আক্রমণ চালাল। লাশের নাক-কান কেটে নিল এবং হার বানিয়ে গলায় পরল। হিন্দা হযরত হামযা (রাঃ)-এর লাশের উপরে উঠে তাঁর পেট চিরল এবং কলিজা বের করে চিবিয়ে খেতে চাইল; কিন্তু গিলতে না পেরে উদ্‌গীরণ করে দিতে হল। এ কারণে হিন্দাকে কলিজা খাদক বলে অভিহিত করা হয়। মক্কা বিজয়ের সময় হিন্দা ইসলাম গ্রহণ করে। তার ইসলাম গ্রহণ একটি স্মরণ রাখার মত ঘটনা, যথাস্থানে তা বর্ণনা করা হবে।

এ যুদ্ধে বহু মুসলমান মহিলাও অংশগ্রহণ করেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত আনাস (রাঃ)-এর মাতা হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)-আহতদের পানি পান করাতেন। সহীহ্ বোখারী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে আমি হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)-কে মশক ভরে পানি এনে আহতদের পান করাতে দেখেছি। মশক খালি হলে আবার গিয়ে

---

১. মূর্তির নাম। শাব্দিক অর্থ, সম্রান্ত।
২. সহীহ্ বোখারী শরীফে ওহোদ যুদ্ধের ঘটনায় ইহার বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে।

আনতেন।[১] অন্য এক হাদীসে রয়েছে, হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর মাতা হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)-ও এ কাজে নিয়োজত ছিলেন।[২]

কাফেররা যখন সংঘবদ্ধভাবে মুসলমানদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং রসূলুল্লাহ (রাঃ)-এর আশপাশে মাত্র কয়েকজন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন ঠিক তখনি উম্মে আম্মারা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে ঢালের ন্যায় সামনে দাঁড়িয়ে যান। কাফেররা যখন হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর আক্রমণ করছিল তখন তিনি তীর ও তলোয়ার দিয়ে তা প্রতিহত করছিলেন। কুনাইয়া যখন ক্ষিপ্ত হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে যায়, তখন হযরত উম্মে আম্মারা (রাঃ) এগিয়ে গিয়ে তার গতি রোধ করেন। এতে তাঁর কাঁধে আঘাত লাগে এবং তিনি বসে পড়েন। তিনিও তলোয়ার মেরেছিলেন কিন্তু দুই প্রস্থ লৌহ বর্ম পরিহিত থাকায় তাঁর আঘাত কার্যকরী হয়নি।[৩]

হযরত হামযা (রাঃ)-এর ভগ্নী হযরত সাফিয়া (রাঃ) মুসলমানদের পরাজয়ের সংবাদ শুদে মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়েন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর পুত্র যুবাইর (রাঃ)-কে ডেকে আদেশ করলেন, "সাবধান, হামযার (রাঃ) লাশ যেন তোমার মাতা দেখতে না পান।" হযরত যুবাইর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ পয়গাম তাঁকে শোনালেন। তিনি বললেন, "ভাইয়ের সংবাদ আমি শুনেছি, কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় এটি কোন বড় কোরবানী নয়।" হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে লাশ দেখার অনুমতি দিলেন। তিনি কাছে গিয়ে ভাইয়ের ক্ষতবিক্ষত দেহটি দেখলেন। তাঁর রক্ত উথলে উঠতে থাকে, কিন্তু তিনি "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন" পড়ে চুপ হয়ে যান এবং শুধু দোয়া পড়তে থাকেন।[৪]

জনৈকা আনসার মহিলার পিতা, ভ্রাতা ও স্বামী এ যুদ্ধে শাহাদতবরণ করেন। একের পর এক এ তিনটি দুর্ঘটনার সংবাদ তার কানে এলে তিনি প্রত্যেক বারই জিজ্ঞেস করেন, হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) কেমন আছেন? লোকেরা বলেন, তিনি কুশলেই আছেন। তিনি কাছে এসে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখেন এবং উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠেন ঃ[৫]

كُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ

অর্থাৎ, আপনার বর্তমানে সকল বিপদই অতি তুচ্ছ।

---

১. পৃঃ- ৫৮১, কেতাবুল মাগাযী ওহোদ যুদ্ধ।
২. সহীহ বোখারী, পৃঃ-৫৮২, ইম্মে ছুলাইত্তের বর্ণনা।
৩. ইবনে হিশাম, পৃঃ-৮৪।
৪. তাবারী, পৃঃ-১৪২১।
৫. তাবারী, পৃঃ-১২৫।

"পিতা গেল ভ্রাতা গেল, গেল প্রাণের স্বামী,
দীনের নবী থাকতে বেঁচে কিইবা আবার দামী।"

এ যুদ্ধে মুসলমানদেরর সত্তর (৭০) জন লোক শাহাদতবরণ করেন। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন আনসার। মুসলমানেরা তখন এত দরিদ্র ছিলেন যে শহীদদের দেহ ঢেকে সমাহিত করার মত কাপড় সংস্থানের সংগতিও তাঁদের ছিল না। হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (রাঃ) নামক এক সাহাবীকে দাফন করার সময় তাঁরর মাথা ঢাকতে গেলে পা খুলে যাচ্ছিল আবার পা ঢাকতে গেলে মাথা খুলে যাচ্ছিল। অবশেষে তাঁকে ঘাস দ্বারা ঢেকে দাফন করা হয়। এ ঘটনটি পরে মুসলমানদের মনে কঠিন পীড়ার কারণ হয়। শহীদদের বিনা গোসলে রক্তমাখা দেহে এক কবরে দু'দুজন করে দাফন করা হত। কোরআন মজীদ যিনি বেশি জানতেন তাঁকে আগে দাফন করা হত। সে সময় তাড়াহুড়ার মধ্যে কোন শহীদেরই জানাযার নামায পড়া হয়নি।[১]

আট বছর পর এবং ইন্তেকালের দু'এক বছর পূর্বে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন এ পথে আগমন করেন, তখন তিনি শোকে অভিভূত হয়ে পড়েন এবং এমন বেদনা ভরা উক্তি করেন যেন জীবিত ও মৃতদের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করছেন।

দাফন কার্য সমাপ্ত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখানে দাঁড়িয়ে এ মর্মে এক খোতবা দান করলেন, "মুসলমানগণ! তোমাদের প্রতি এমন ভয় আর নেই যে তোমরা পুনরায় মুশরেক হয়ে যাবে। কিন্তু ভয় রয়েছে, তোমরা না আবার দুনিয়াদারীর মধ্যে ডুবে যাও।"[২]

উভয় পক্ষের সৈন্যদল যখন যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে চলে যায়, তখন দেখা গেল মুসলমানদের প্রায় সবাই ভীষণভাবে যখমী হয়েছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও আবু সুফিয়ান মুসলমানদের পরাজিত মনে করে পুনরায় আক্রমণ করতে পারে আশঙ্কায় হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "কে তাদের পিছু ধাওয়া করতে পারবে?" এ বাক্য উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে সত্তর জন সাহাবীর একটি দল প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত যুবাইর (রাঃ) প্রমুখও ছিলেন।[৩]

---

১. এটা হল সহীহ্ বোখারী শরীফের বর্ণনা। অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত হামযা (রাঃ)–এর উপর বিশেষ করে এবং অন্যান্য শহীদদের উপরও জানাযার নামায পড়েছিলেন। শহীদদের একজন একজন করে। অন্য হাদীছে রয়েছে দশজন দশজন করে আনা হত এবং হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের উপর জানাযার নামায পড়তেন। হযরত হামযা (রাঃ)-এর লাশের উপর প্রত্যেক দলের সাথে প্রায় সত্তর বার অথবা শত বার নামায আদায় করা হয়েছিল–শরহে আ'আনীয়িল আসার, তাহাবী 'আজ্জালাতু আলাশ শুহাদা পরিচ্ছেদ থেকে উদ্ধৃত।

২. এ সকল ঘটনা বোখারী শরীফের ওহোদ যুদ্ধের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ছড়িয়ে রয়েছে।

৩. সহীহ্ বোখারী, পৃঃ-৫৮৪.

আবু সুফিয়ান ওহোদ থেকে বেরিয়ে যখন রওহা নামক স্থানে উপস্থিত হল, তখন তার মনে হল কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) একথা পূর্বাহ্নেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই দ্বিতীয় দিনেই তিনি ঘোষণা করে দিলেন, কেউ যেন ফিরে না যায়। অতঃপর সকলে মদীনা থেকে আট মাইল দূরে 'হামরা আসাদ' নামক স্থানে চলে গেলেন।

খোযাআ' গোত্র তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি, কিন্তু প্রকারান্তরে তারা মুসলমানদের পক্ষে ছিল। গোত্রের সরদার মা'আদ খোযায়ী মুসলমানদের পরাজয়ের খবর পেয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং সেখান থেকে ফিরে এসে আবু সুফিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। আবু সুফিয়ান তাঁর উদ্দেশ্য জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমি দেখে এসেছি। মোহাম্মদ (সাঃ) এমনভাবে প্রস্তুতি নিয়ে ধেয়ে আসছেন যে তাঁকে প্রতিরোধ করা এখন সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। একথা শুনে আবু সুফিয়ান ফিরে গেল। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ঐতিহাসিকগণ যুদ্ধের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্যই হয়ত এ অভিযানকেও একটি নতুন যুদ্ধ ধরে নিয়েছেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন সমগ্র মদীনায় শোকের কালো ছায়া নেমে এসেছে। ঘরে ঘরে কান্নার রোল। এ দৃশ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। ক্ষণিকের জন্য তাঁর মনে এ কথাও উদয় হল যে সবাই তাদের প্রিয়জনদের জন্য শোক প্রকাশ করছে। কিন্তু হযরত হামযা (রাঃ)-এর শোকে রোদন করার মত কেউই নেই। তিনি অভিভূত হয়ে বলে ফেললেন,

أَمَّا حَمْزَةُ فَلَا بَوَاكِيَ لَهُ

অর্থাৎ, "কিন্তু হামযা (রাঃ)-এর জন্য ক্রন্দন করার কেউ নেই।"

আনসারগণ একথা শুনে ব্যথিত হলেন এবং সবাই গিয়ে তাঁদের বিবিদেরকে আদেশ করলেন, তোমরা সবাই গিয়ে হযরত হামযার জন্য শোক প্রকাশ কর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দেখলেন, পর্দানশীন আনসার মহিলারা এসে হযরত হামযা (রাঃ)-এর জন্য শোক প্রকাশ করে বিলাপ করছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদের জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন, "তোমাদের সহানুভূতির জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তবে এমনভাবে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করা বৈধ নয়।" আরবের নিয়ম ছিল যে মৃতদের শোকে মহিলারা জোরে জোরে বিলাপ করত। শোকগাথা উচ্চারণ করত, কাপড় ছিঁড়ত, গালে আঁচড় কাটত, গালে চাপেটাঘাত করত এবং

চিৎকার দিয়ে সুর করে কাঁদত। এ কু-প্রথা সেদিন থেকে বন্ধ করে দেয়া হয় এবং বলা হয় যে আজ থেকে যেন মৃতের উপর বিলাপ না করা হয়।[১] পরে একথাও বলা হয় যে এভাবে বিলাপ করা মুসলমানদের উচিত নয়।[২] কোরআন মজীদের সূরা আলে ইমরানে ওহোদ যুদ্ধের বিবরণ রয়েছে।

তৃতীয় হিজরীর অন্যান্য ঘটনাবলী

হিজরী তৃতীয় সালের ১৫ই রমযান হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

এ বছর হযরত ওমর (রাঃ)-এর কন্যা হযরত হাফ্‌সা (রাঃ)-কে যিনি বদর যুদ্ধে বিধবা হয়েছিলেন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিয়ে করেন।

এ বছর হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কন্যা হযরত উম্মে কুলসুমের বিয়ে হয়।

এ বছর উত্তরাধিকার (ওয়ারিশ) আইন অবতীর্ণ হয়। ইতিপূর্বে উত্তরাধিকারের মধ্যে যাবীল আর্‌হামের (যাবীল ফুরূয ও আসাবা নহে এমন অংশীদার যথা, দৌহিত্র, নানা, ভাগ্নেয়, মামা, ফুফু, খালা ইত্যাদি) কোন অংশ নির্ধারিত ছিল না। এদের অংশের বিস্তরিত বিবরণও দেয়া হয়।

ইতিপূর্বে মুসলমানদের জন্য মুশরেক নারী বিয়ে করা বৈধ ছিল কিন্তু এ বছর তাও অবৈধ ঘোষণা করা হয়।

চতুর্থ হিজরীর অন্যান্য গাযওয়া ও সারায়া[৩]

দু'একটি গোত্র ব্যতীত প্রায় সমস্ত আরব গোত্রই ইসলামের শত্রু ছিল। তাদের এ শত্রুতার মূল কারণ ছিল এই যে আরবের প্রত্যেক গোত্রই মূর্তি পূজা করত এবং এ মূর্তি পূজাকে তারা বিধি-ধর্ম বলে মনে করত। অপর দিকে ইসলাম মূর্তি পূজা সমূলে উচ্ছেদ করার নির্দেশ দিত। এতদ্ব্যতীত সারা আরব বিশ্বে কোরাইশদের একটা আলাদা প্রভাব ছিল। হজ্বের মওসুমে আরবের সকল গোত্রের লোকই মক্কায় সমবেত হত এবং কোরাইশরা তাদেরকে নানা অপপ্রচারের মাধ্যমে ক্ষেপিয়ে তুলত।

১. ইবনে হিশাম (ওহোদ যুদ্ধ), মুসনাদে আহমদ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৪।
২. সহীহ্ বোখারী, কিতাবুল জানায়েজ।
৩. গাযওয়া ও সারায়ার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি সম্পর্কে নানা প্রকার মতভেদ রয়েছে। তবে সর্বজন স্বীকৃত অভিমত হল, যে যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন তাকে গাযওয়া এবং যে যুদ্ধে সাহাবীগণকে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে পাঠানো হয়েছে তাকে সারিয়া বলা হয়।

মুসলমানদের সঙ্গে তাদের শত্রুতার আর একটি বড় কারণ ছিল, আরবের বিভিন্ন গোত্রের জীবিকার একটি উৎস্য ছিল লুটতরাজ ও চুরি-ডাকাতি কিন্তু ইসলাম এ সমস্ত গর্হিত কাজ সম্পর্কে শুধু নিষেধই করত না, বরং কার্যকরীভাবে তা বন্ধ করার চেষ্টা করত। এ কারণে তারা মনে করত, ইসলাম যদি সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে আমাদের জীবিকার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

বদর যুদ্ধের পর আরবদের মনে এক কঠিন ভীতির সঞ্চার হয়েছিল এবং তারা অনেকটা অবদমিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওহোদ যুদ্ধের পর তারা আবার যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সীরাতের কিতাবসমূহে যে অসংখ্য সারায়ার (ছোট যুদ্ধ) ঘটনা উল্লেখ রয়েছে, তার প্রত্যেকটির সূত্র এখানে। সাধারণ ঐতিহাসিকগণ যদিও তাদের অভ্যাসবশত সেসব যুদ্ধের কারণ উল্লেখ করেননি কিন্তু ইবনে সা'আদ 'তাবকাতে' এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ প্রায় অধিকাংশ ঘটনার কারণ লিপিবদ্ধ করেছেন। অর্থাৎ, যখন কোন গোত্র মদীনা আক্রমণের ইচ্ছা করেছে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তখনই তা প্রতিহত করার জন্য সৈন্য পাঠিয়েছেন।

সারিয়ায়ে আবী সালামা

চতুর্থ হিজরীর মহররম মাসে 'কায়েদ' পার্বত্য অঞ্চলের 'কাতান' নামক স্থানের অধিবাসী তালহা ও খুয়াইলিদ নামক দু'ব্যক্তি মদীনা আক্রমণ করতে তাদের গোত্রকে উদ্বুদ্ধ করল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ সংবাদ পেয়ে হযরত আবু সালামার নেতৃত্বে একশ' পঞ্চাশজন মুহাজির ও আনসারকে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তারা এ সংবাদ পেয়ে বিচলিত হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ প্রস্তুতি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়।[১]

সারিয়ায়ে ইবনে উনাইস

অতঃপর চতুর্থ হিজরীর মহররম মাসে পার্বত্য অঞ্চলে উরাইনার সরদার লেহয়ান গোত্রের সুফিয়ান ইবনে খালেদ মদীনা আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তাকে বাধা দেয়ার জন্য হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উনাইস (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন। তিনি কৌশলে সুফিয়ানকে হত্যা করেন।[২]

১. ইবনে সা'আদ, পৃঃ ৩৫।
২. তাবকাতে ইবনে সা'আদ পৃঃ-৩৬।

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে কেলাব গোত্রের সরদার আবু বারা কেলাবী[১] রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলেন যে কয়েকজন লোক আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন যারা আমার গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেবেন।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, "নজদের দিক থেকে আমার ভয় হয়।" আবু বারা বলল, আমি তার জন্য যামিন রইলাম। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অবশেষে রাজী হলেন এবং সত্তর জন আনসারের একটি দল সেখানে প্রেরণ করলেন। লোকগুলো অত্যন্ত সৎ ও দরবেশ প্রকৃতির ছিলেন এবং অধিকাংশই ছিলেন আসহাবে সুফ্‌ফার অন্তর্ভুক্ত। তাদের কাজ ছিল সারা দিন কাঠ কুড়িয়ে সন্ধ্যায় তা বিক্রি করা এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থের কিছু আসহাবে সুফ্‌ফার জন্য ব্যয় করা এবং অবশিষ্ট দ্বারা নিজেদের ব্যয়ভার নির্বাহ করা।

বীরে মাঊনা

আনসার দলটি বীরে মাঊনা নামক স্থানের কাছে এসে তাঁবু গাড়লেন এবং হারাম ইবনে মেলহানকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পত্রসহ দলপতি আমের ইবনে তোফায়েলের নিকট পাঠালেন। আমের হারামকে হত্যা করল এবং আশপাশের উসাইতা, রেআল, যাকওয়ান প্রভৃতি গোত্রে লোক পাঠিয়ে দিল যাতে তারা তৈরি হয়ে আসে।

একটি বিরাট সৈন্যদল তৈরি হয়ে গেল এবং আমেরের নেতৃত্বে এগুতে লাগল।

সাহাবিগণ হারামের অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর দেরি দেখে অবশেষে তাঁরা নিজেরাই রওয়ানা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যেই আমেরের সৈন্যদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। কাফেররা তাঁদের ঘেরাও করে একে একে সবাইকে হত্যা করে ফেলল।[২]

আমের একমাত্র হযরত আমর[৩] ইবনে উমাইয়াকে এ বলে ছেড়ে দিল যে "আমার মা একটি দাসমুক্ত করবেন বলে মানত করেছিলেন, তাই তোমাকে ছেড়ে দিলাম।"

১. আবু বারা পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিনা সে সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতের বিভিন্ন ধরনের মত রয়েছে। যাহাবী বলেন, সর্ব সম্মত মত হল, সে ইসলাম গ্রহণ করেনি। ইছাবায় রয়েছে যে, তার ইসলাম গ্রহণের প্রমাণ কোন হাদীসে উল্লেখ নেই। তবে কোন কোন হাদীসের উপর ভিত্তি করে এক দলের অভিমত হল, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। –যারকানী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৬।

২. সাহাবীদের দলে হযরত কা'ব ইবনে যায়েদও ছিলেন। কাফেররা মনে করেছিল সকলেই শহীদ হয়ে গিয়েছেন কিন্তু তিনি জীবিত ছিলেন এবং পরিখার (খন্দক) যুদ্ধে শহীদ হন।–যারকানী, পৃঃ ৮৮।

৩. হযরত আমর ইবনে উমাইয়া এবং হযরত মুনযির ইবনে মুহম্মদ আকাবা আনছারী পিছনে ছিলেন। যখন তাঁরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন তখন হযরত মানজারকে শহীদ করে দেয়া হয় এবং হযরত আমর ইবনে উমাইয়াকে বন্দী করা হয়। পরে তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয়। –যারকানী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৯।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এ সংবাদ পেয়ে এমন দুঃখিত ও মর্মাহত হলেন যে জীবনে তিনি এমন দুঃখ আর কখনও পাননি। সারা মাস তিনি ফজরের নামাযে কুনূতে নাযেলা পাঠ করে জালেমদের শাস্তির জন্য দোয়া করতে থাকেন।

হযরত আমর ইবনে উমাইয়া ফেরার পথে আমেরের বংশের দুজন লোককে হত্যা করেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এদের জীবনের নিরাপত্তা দিয়েছিলেন, কিন্তু হযরত আমর তা জানতেন না। তিনি মনে করেছিলেন, যারা হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাহাবীগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছে আমি তাদের প্রতিশোধ নিচ্ছি।[১]। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একথা শুনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং আমেরকে এ দুজনের রক্তপণ পরিশোধ করার নির্দেশ দিলেন।

রাজী'র ঘটনা

আযাল ও কারাহ্ নামক দুটি প্রসিদ্ধ গোত্রের কয়েকজন লোক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, আমাদের গোত্রের লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমাদের এমন কয়েকজন লোক দিন যারা আমাদের ইসলামের হুকুম-আহ্কাম শিক্ষা দেবেন। রসূলুল্লাহ্(সাঃ) হযরত আছেম ইবনে ছাবেত (রাঃ)-এর নেতৃত্বে দশজনের একটি দল তাদের সঙ্গে পাঠালেন। এরা যখন মক্কা ও আসফানের মধ্যবর্তী 'রাজী' নামক স্থানে উপস্থিত হলেন, তখন বে-ঈমানরা প্রতারণা করে এঁদেরকে হত্যা করার জন্য বনী-লেহ্ইয়ান নামক একটি গোত্রকে প্ররোচিত করল। বনী-লেহ্ইয়ান একশ' তীরন্দাজসহ দুশ' লোকের একটি সুসজ্জিত দল নিয়ে তঁদের পিছু ধাওয়া করল। সাহাবিগণ উপায়ান্তর না দেখে একটি টিলার (পাহাড়ের) উপরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তীরন্দাজরা তাঁদেরকে বলল, "নেমে আস, আমরা তোমাদের নিরাপত্তা দিচ্ছি।" হযরত আসেম বললেন, "আমি কাফেরদের নিরাপত্তা চাই না।" এ বলে তিনি আল্লাহ্র নিকট আরয করলেন, "হে আল্লাহ্, তোমার নবীকে সংবাদ দিয়ে দাও।" তারপর তিনি সাতজন সাহাবীসহ্ যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করলেন। কোরাইশরা হযরত আসেমের শরীরের কিছুটা গোশত কেটে আনার জন্য কয়েকজন লোক পাঠাল, কিন্তু আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদদের এ অবমাননা আল্লাহ্ সহ্য করলেন না। তিনি মধু মক্ষিকাকে হযরত আসেমের দেহরক্ষী করে পাঠালেন। কাফেররা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে আসল। এদের মধ্যে[২] হযরত খোবাইব ও হযরত যায়েদ কাফেরদের

---

১. আল বেদায়া ওয়ান্ নেহায়া, ইবনে কাছীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৭৩, যারকানী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯২।

২. হারেছের পুত্র আবু ছারুয়া হযরত খোবাইব (রা)-কে শহীদ করেছিলেন। অবশ্য পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবী হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। —যারকানী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৮।

প্রতারণায় পড়ে গেলেন এবং টিলা থেকে নিচে নেমে এলেন। কাফেররা তাঁদেরকে মক্কায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিল। হযরত খোবাইব (রাঃ) ওহোদের যুদ্ধে হারেস ইবনে আমেরকে হত্যা করেছিলেন ; এই কারণে হারেসের পুত্ররা তাঁকে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য খরিদ করে নিল। কয়েকদিন তাঁকে বাড়িতে রাখা হল।

একদিনের ঘটনা! সেদিন হযরত খোবাইব হারেসের দৌহিত্রীকে নিয়ে খেলা করছিলেন। ঘটনাক্রমে তাঁর হাতে একখানা ছুরি ছিল। ইত্যবসরে শিশুটির মাতা বাইরে থেকে এসে হযরত খোবাইবের হাতে খোলা ছুরি দেখে শিউরে ওঠে। হযরত খোবাইব বললেন, "তোমরা কি মনে করছ আমি এই অবুঝ শিশুটিকে হত্যা করব? এটা আমাদের কাজ নয়।"

হারেসের পুত্ররা হযরত খোবাইব (রাঃ)-কে হরম শরীফের সীমানার বাইরে নিয়ে গেল এবং হত্যা করতে চাইল। হযরত খোবাইব (রাঃ) জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে তাদের কাছে শুধু দু'রাকাত নামায আদায় করার অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হল। হযরত খোবাইব (রাঃ) সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকাত নামায পড়লেন এবং বললেন, "মনে সাধ হচ্ছিল, নামায দীর্ঘ করি কিন্তু যদি তোমরা মনে কর যে মৃত্যুর ভয়ে আমি দেরী করছি।" অতঃপর তিনি এই কবিতাটি পাঠ করতে করতে শাহাদতের দিকে এগিয়ে গেলেন।

অর্থাৎ, "যখন আমি ইসলামের জন্য কোরবান হচ্ছি, তখন কোন্ পাশে হচ্ছি তার পরওয়া নেই। আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তো আল্লাহ্র উদ্দেশে নিবেদিত। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে দেহের প্রতি টুকরায় তিনি বরকত দান করবেন।"

তখন থেকেই নিয়ম চালু হয়েছে যে প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত মুসলিম ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বাহ্নে দু'রাকআত নামায পড়ে থাকেন[১]। এটা মুস্তাহাব মনে করা হয়।[২]

দ্বিতীয় ব্যক্তি হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে হত্যা করার মানসে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া খরিদ করেছিল। হত্যার দিন কোরাইশদের বড় বড় সরদারেরা তামাশা দেখার উদ্দেশে বধ্যভূমিতে উপস্থিত হল। তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ানও উপস্থিত ছিল। ঘাতক যখন তলোয়ার তুলে নিল, তখন আবু সুফিয়ান বলল, "সত্য করে বল, এখন যদি তোমার বিনিময়ে মোহাম্মদ (সাঃ)-কে হত্যা করা হয়, তাহলে

---

১. এ নামায মুস্তাহাব হবার কারণ হল, হযরত খোবাইবের নামাযের ঘটনা যখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম শুনলেন তখন তিনি খুবই সন্তোষ প্রকাশ করলেন। মুহাদ্দেসগণের মতে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে যদি কোন কাজ করা হয়ে থাকে এবং তিনি তা অবগত হয়েছেন, কিন্তু কোন প্রকার অমত প্রকাশ করেননি তাকে সুন্নত বা মুস্তাহাব অথবা জায়েয গণ্য করা হবে।

২. নেত্তাহ্ পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। (যারকানী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৪)।

তুমি কি তা তোমার সৌভাগ্য মনে করবে না?" তিনি বললেন, "আল্লাহ্র কসম! আমার জীবনকে আমি এতটুকু প্রিয় মনে করি না যে আমার জীবনের বিনিময়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পায়ে একটি কাঁটাও বিদ্ধ হোক।" সাফওয়ানের দাস নেস্তাছ হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে হত্যা করল।

চতুর্থ হিজরীর অন্যান্য ঘটনা

এ বছর শা'বান মাসে হযরত হোসাইন (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। এ বছর উম্মুল মুমেনীন হযরত যয়নাব বিন্তে খোযায়মাহ্ পরলোক গমন করেন। এ বছরই হযরত (সাঃ)-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল।

এ বছর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত যায়েদ ইবনে সাবেতকে ইবরানী (হিব্রু) ভাষা শেখার নির্দেশ দেন এবং বলেন, "ইহুদীদের উপর আমি আশ্বস্ত হতে পারি না।" ইতিহাস থেকে জানা যায় যে হযরত যায়েদ মাত্র পনর দিনে হিব্রু ভাষা শিখেছিলেন। এতে অনুমান করা যায় যে মদীনার লোকেরা হিব্রু ভাষা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা রাখত।

এ বছর শাওয়াল মাসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত উম্মে সালমার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

এ বছর ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সমীপে জনৈক ইহুদীর মামলা পেশ করেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তওরাতের বিধান মোতাবেক রজমের (পাথর নিক্ষেপে হত্যার) আদেশ দেন।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এ বছরই মদ্যপান হারাম হওয়ার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকারের বর্ণনা পাওয়া যায়। "আহ্কামে শরইয়া" আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ইহুদীদের সঙ্গে সন্ধি এবং যুদ্ধ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ইহুদীরা বহুদিন যাবৎ মদীনার শাসনক্ষমতা অধিকার করে রেখেছিল। আনসারগণ এসে তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করেন, কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের এ সম্পর্ক শত্রুতায় পর্যবসিত হয় এবং 'বুআস যুদ্ধে' তাদের জাতীয় শক্তি সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে। এরপর থেকে আনসারগণ কোন ব্যাপারেই আর ইহুদীদের সমকক্ষতা করতে পারতেন না। ইহুদীরা 'কায়নুকা', 'নাযীর' এবং 'কুরাইযা' এ তিনটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। এ তিনটি গোত্রই মদীনা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাস করত। তাদের পেশা ছিল প্রধানত জমিদারী,

ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, কারিগরী ইত্যাদি। 'কায়নুকা' সম্প্রদায় সাধারণত স্বর্ণকারের কাজ করত। তারা যোদ্ধা ছিল বলে সর্বদা তাদের নিকট নানাবিধ যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রচুর পরিমাণে মওজুদ থাকত। আনসারগণ সাধারণত তাদের নিকট অর্থলগ্নি এবং অন্যান্যভাবে বাঁধা ছিল। প্রশাসন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সাথে ইহুদীদের ধর্মীয় এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রচুর প্রভাব ছিল। আনসারগণ সাধারণত মূর্তিপুজারী ও অশিক্ষিত ছিলেন। ফলে তাঁরা ইহুদীদের সম্মান করতেন এবং সভ্য-ভদ্র বলে জানতেন। যদি কারও সন্তান হয়ে মরে যেত, তবে সে মানত করত যে পরবর্তী সন্তানটি জীবিত থাকলে তাকে ইহুদী ধর্মে দীক্ষা দেব। মদীনায় এ ধরনের নতুন ইহুদীর সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল।

বহুদিন থেকে ইহুদীরা বিভিন্ন প্রকার চরিত্র দোষে দুষ্ট হয়ে উঠেছিল। তারা চারদিকে এমন সব মহাজনী কারবার বিস্তার করে রেখেছিল যাতে সমস্ত এলাকা তাদের ঋণভারে নিমজ্জিত ছিল। যাবতীয় ধনসম্পদ তাদের কুক্ষিগত ছিল বলে অত্যন্ত অমানুষিকভাবে তারা সুদের বোঝা বাড়াত এবং সম্পদের জামিন হিসাবে ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিদের সন্তান-সন্ততি, এমন কি, স্ত্রী পর্যন্ত বন্ধক বাবত গ্রহণ করত। কা'ব আশরাফ নামক ইহুদী নিজেই তার জনৈক আনসার বন্ধুর নিকট এ দাবি জানিয়েছিল। এতদ্ব্যতীত বহু উপায়ে জনসাধারণের নিকট থেকে তারা ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করত। সীমাহীন লোভ-লালসা চরিতার্থ করার জন্য সামান্য দু'চার টাকার সুদের দাবির কারণে মাসুম শিশুদের পর্যন্ত পাথর মেরে হত্যা করতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করত না। টাকা-পয়সা বেশি হওয়ার কারণে ব্যভিচার এবং কুকাজের অবাধ প্রচলন ছিল। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা এসব কাজে লিপ্ত ছিল বলে তাদের কোন প্রকার শাস্তি ভোগ করতে হত না। একদা হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ইহুদীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমাদের ধর্মে ব্যভিচারের শাস্তি কি শুধু দুর্‌রা (চাবুক) মারা?" সে উত্তরে বলল, "না বরং পাথর মেরে হত্যা করাও। কিন্তু আমাদের সমাজের উপর তলার মানুষের মধ্যে ব্যভিচারের মাত্রা বেশি। যদি কোন সম্মানী লোক এ অপরাধে ধরা পড়েন তাহলে আমরা তাকে ছেড়ে দেই। তবে সাধারণ মানুষকে আমরা শাস্তি দিয়ে থাকি।" অবশেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে পাথর মারার শাস্তি চাবুকের দ্বারা পরিবর্তিত করা হোক, যাতে নেহায়েত প্রয়োজন দেখা দিলে ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সবাই এ শাস্তি গ্রহণ করতে পারে এবং সবাইকে একই প্রকার শাস্তি দেয়া যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত তাই চালু হল।

মদীনায় যখন ইসলামের আবির্ভাব হল, তখন ইহুদীরা বুঝতে পারল, তাদের অত্যাচার-অবিচারের দিন শেষ হয়ে আসছে। ইসলামের প্রসার দিন দিন যতই বাড়তে লাগল, ইহুদীদের মর্যাদা এবং প্রতিপত্তি ততই কমতে লাগল। মদীনার

মুশরিকদের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি ইহুদীধর্মের প্রসার হচ্ছিল, তা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল। তাছাড়া নতুন নতুন যুদ্ধ বিজয়ের দরুন আনসারদের অবস্থারও উন্নতি হতে লাগল এবং তাঁরা ইহুদীদের মহাজনী কারবারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে লাগলেন। অপরদিকে সম্পদশালী হওয়ার কারণে ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত যেসব অনাচারের কথা এতদিন গোপন ছিল তা দিন দিন প্রকাশিত হতে লাগল।

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে যদিও তাদের চুক্তি হয়েছিল যে তাদের জানমালের কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা হবে না এবং তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে ; তবুও নবুওতের কর্তব্যে অকাজ, কুকাজ ও বদ-অভ্যাসের বিরুদ্ধে আদেশ-উপদেশ দেয়া হুযুর (সাঃ)-এর পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ল। কোরআন মজীদেও তাদের দুষ্কর্ম সম্পর্কে একের পর এক আয়াত অবতীর্ণ হতে লাগল। যেমন ঃ

"তারা মিথ্যা কথা শ্রবণকারী এবং ভয়ঙ্কররূপে হারাম মাল ভক্ষণকারী।" —মায়েদা—৬।

"তুমি তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকদের দেখবে যে তারা দ্রুতগতিতে গুনাহ্ ও অত্যাচারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।"—মায়েদা-৯।

"তারা সুদ গ্রহণ করে থাকে, অথচ সুদ গ্রহণ করতে তাদের নিষেধ করা হয়েছে এবং হারাম ও অবৈধ উপায়ে মানুষের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।"—নিসা-২২।

এসব কারণে ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদীদের মনে ধীরে ধীরে কঠোর অসন্তুষ্টি দানা বাঁধতে থাকে। তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তথা ইসলামের বিরুদ্ধে নানা রকম ষড়যন্ত্র আঁটতে আরম্ভ করে। অবশ্য হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপর নির্দেশ ছিল যে তাদের সর্বপ্রকার অনিষ্টের বিরুদ্ধে যেন তিনি ধৈর্যধারণ করেন।

অর্থাৎ "তুমি আহলে কিতাব ও মুশরিকদের পক্ষ থেকে বহু দুঃখজনক (কথা) শুনবে। যদি তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং এড়িয়ে চল, তবে তা হবে অত্যন্ত দৃঢ়তার কাজ।"—আলে ইমরান-১৯।

ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে "আস্সালামু আলাইকুম" বলার পরিবর্তে "আস্সামু আলাইকুম" অর্থাৎ "তোমার মৃত্যু হোক" বলত। একদা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সামনে এমনি একটি ঘটনা ঘটে। তিনি তা সহ্য করতে না পেরে বলে ফেললেন, "রে হতভাগারা! তোদেরই মৃত্যু হোক।" তখন রসূলুল্লাহ্

(সাঃ) বললেন, "আয়েশা! নম্রতা অবলম্বন কর" হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, আপনি কি শুনেছেন, তারা কি বলেছে?" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "হ্যাঁ, তবে আমি তদুত্তরে, "তোমার উপর, বলে দিয়েছি এতটুকুই যথেষ্ট।"[১]

রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইহুদীদের কোন কোন ব্যাপারে শুধু মৌনতাই অবলম্বন করতেন না, সামাজিক কোন ব্যাপারে তাদের মতের সঙ্গে একমতও হয়ে যেতেন এবং তাদের ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকায় আঘাত না দেয়ারই চেষ্টা করতেন। তিলকে তাল করা ছিল আরবদের অভ্যাস। অর্থাৎ, সামান্য ব্যাপারেই প্রলয়কাণ্ড বাধানো। ইহুদীদের অভ্যাস ছিল ঠিক তার বিপরীত। অর্থাৎ চাতুর্যের সঙ্গে কাজ উদ্ধার করা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ ব্যাপার ইহুদীদের অনুসরণ করতেন। সহীহ্ বোখারীতে আছে—"যে বিষয়ে আল্লাহ্ পাকের কোন নির্দেশ না থাকত, সে ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আহলে কিতাবদের অনুসরণ করতেন।"

হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় আগমনের পর দেখলেন যে ইহুদীরা আশুরার দিনে রোযা পালন করে, তিনিও সাহাবিদের এ দিনে রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন।[২]

রাস্তা দিয়ে কোন ইহুদীর জানাযা অতিক্রম করতে দেখলে হুযুর (সাঃ) তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন।

একদা জনৈক ইহুদী হযরত মূসা (আঃ)-এর এমন প্রশংসা আরম্ভ করল যাতে মনে হল তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এতে এক আনসারের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি ইহুদীর গালে সজোরে এক চপেটাঘাত করে বসলেন। ইহুদী লোকটি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট নালিশ করল। তিনি বললেন, "আমাকে অন্যান্য নবীদের উপর এমন শ্রেষ্ঠত্ব দিও না যাতে তাঁদের সামান্যতম মর্যাদা হানিরও আশঙ্কা থাকে। কেয়ামতের দিন সমস্ত লোক বেহুঁশ হয়ে যাবে। আমি সর্বপ্রথম চৈতন্য ফিরে পাব এবং দেখব যে হযরত মূসা (আঃ) আরশের পায়া ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।"[৩]

তখনও পর্যন্ত কোরআন মজীদে যে সকল হুকুম অবতীর্ণ হচ্ছিল তাতে আহলে কিতাবদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ আসত। বলা হয়েছে— "আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল।" (মায়েদা-১)

সাধারণত তাদের মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হত ঃ

"হে বনী ইসরাইল, আমার দেয়া নেয়ামতের কথা স্মরণ কর। আমি তোমাদের সারা বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।—বাকারা-১৫।

১. সহীহ্ বোখারীতে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।
২. বোখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬২।
৩. বোখরী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৬৮।

ইসলাম প্রচারের খাতিরে সে সময় তাদের সামনে যা কিছু পেশ করা হত তা ছিল ঃ "হে মোহাম্মদ (সাঃ)! আপনি বলে দিন, হে আহ্‌লে কিতাব, এমন একটি কথার মধ্যে তোমরা এসো যা তোমরা-আমরা উভয়েই মানতে পারি। কথা হল, আমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করব না এবং কাকেও তাঁর অংশীদার (শরীক) সাব্যস্ত করব না। আর আমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্য কাউকেও আমাদের প্রভু বানাব না। এতে যদি তারা পশ্চাদপসরণ করে তাহলে তোমরা বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলমান।"

—আলে ইমরান-১৯।

এর একটি কথাও তাদের মত, পথ ও ধর্মীয় বিশ্বাসের বহির্ভূত ছিল না। কিন্তু তবুও তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ঘোর শত্রুতায় লিপ্ত হয়ে পড়ল।

ইসলামের গৌরব ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার জন্য মুশরিকদের কাছে গিয়ে বলত, "ধর্মের দিক দিয়ে তোমরাই তো মুসলমানদের চেয়ে উত্তম।"

"তারা কাফেরদের উদ্দেশ্য করে বলত, মুসলমানদের চেয়ে তারাই অধিক সৎপথ প্রাপ্ত।"—নিসা-৮।

ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তারা ইসলাম গ্রহণ করে পুনরায় তা পরিত্যাগ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়া যে ইসলাম সত্য ধর্ম হলে তা গ্রহণ করে মানুষ কেন তা পুনরায় পরিত্যাগ করবে! কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

"আহলে কিতাবদের মধ্যে একদল বলে থাকে, মুসলমানদের উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর প্রভাতে ঈমান আন এবং সন্ধ্যাবেলা অস্বীকার কর। সম্ভবত তারাও (মুসলমানগণ) ফিরে যাবে।"—আলে ইমরান-৮।

এতদ্ব্যতীত ইসলামকে সমূলে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে ইহুদীরা রাজনৈতিক চালও যথেষ্ট প্রয়োগ করছিল। তারা জানত, ইসলামে শক্তির মূল উৎস হল তাদের ঐক্য। আনসারদের 'আওছ' ও 'খাযরাজ' এই দুটি গোত্রের মধ্যে যদি অতীত শত্রুতা নতুন করে উস্কে দেয়া যায়, তাহলে ইসলাম অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। আরবদের মধ্যে অতীতের গোত্রীয় বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলা খুবই সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল। একদা দু'সম্প্রদায়েরই কিছু লোক একত্রে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। এমন সময় কয়েকজন ইহুদী যেখানে গিয়ে 'বুআস যুদ্ধের' কথা তুলল। এ যুদ্ধে আনসারদের দুটি গোত্রের মধ্যে বহু রক্তক্ষয় হয়েছিল। যুদ্ধের কথা স্মরণ হতেই তাদের অতীত স্মৃতি আবার সামনে ভেসে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গালি গালাজ থেকে আরম্ভ করে তলোয়ার পর্যন্ত কোষমুক্ত হল। দৈবক্রমে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘটনাটি জানতে পারলেন। তিনি এসে ওয়ায-নসীহত দ্বারা উভয় পক্ষকে শান্ত করলেন। এ সম্পর্কে কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

"হে মুসলিমগণ! যদি তোমরা আহ্‌লে কিতাবদের কথা শোন, তবে তারা তোমাদেরকে আবার কাফের বানিয়ে দেবে।"—আলে ইমরান।

মুনাফেকদের একটি দল ছিল, যারা প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা ইসলামের ঘোর শত্রু ছিল। এ দলের প্রধান ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল। ইহুদীরা তাদের সামনে রেখে নিজেদের অশুভ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে তৎপর হল।

কোরাইশরা বদর যুদ্ধের পূর্বে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে এ মর্মে পত্র লিখেছিল যে "মুসলমানদেরকে বের করে দাও, নতুবা আমরা এসে তোমাদের ধ্বংস করে দেব।" কিন্তু বদরের যুদ্ধে জয়লাভ করতে না পেরে পুনরায় বদরের পর তারা লিখল, "তোমাদের নিকট যুদ্ধের সরঞ্জাম ও দুর্গ রয়েছে। তোমরা আমাদের শত্রু মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, নতুবা আমরা তোমাদের চূড়ান্ত সর্বনাশ করে ছাড়ব। তোমরা তোমাদের বিবিদের কাছে গিয়ে লুকালেও এ ব্যাপারে আমাদের নিরস্ত করতে পারবে না।"

ইমাম আবু দাউদ বনূ নাযীর গোত্রের বর্ণনায় এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি শুধু বনূ নাযীরের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আসলে কোরাইশদের পত্রটি ছিল সাধারণভাবে ইহুদীদের সকলকে উদ্দেশ্য করে লেখা। মোহাদ্দেস হাকেম এ কারণে বনূ নাযীর ও বনী-কায়নুকা উভয়ের ঘটনাই এক বলে ধারণা করেছেন।

যাহোক, অবস্থা এমন হল যে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) রাত্রে ঘর থেকে বেরোতে ইহুদীদের ভয় পেতেন। হযরত তালহা ইবনে বারা (রাঃ) নামক জনৈক সাহাবী মৃত্যুকালে বলে গিয়েছিলেন, "আমি যদি রাত্রে মৃত্যুবরণ করি, তবে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সংবাদ দিও না। কেননা, ইহুদীদের গতিবিধি দেখে আমার ভয় হয়, আবার আমার কারণে না তাঁর উপর কোন বিপদ নেমে আসে।" হাফেয ইবনে হাজার এসাবা গ্রন্থে ইমাম আবু দাউদ প্রমুখ মোহাদ্দেসগণের সনদ উল্লেখ করে পূর্ণ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

গাযওয়ায়ে বনী কায়নুকা

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের পর ইহুদীরা বিশেষভাবে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। তারা স্পষ্ট বুঝতে পারে যে মুসলমানদের শক্তি দিন দিন বেড়েই চলেছে। ইহুদীদের মধ্যে বনী কায়নুকাই ছিল বল-বীর্যে বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন। তাই তারাই সর্বপ্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে তাদের যে চুক্তি ছিল তারাই প্রথমে তা ভঙ্গ করে। ইবনে হিশাম ও তাবারী ইবনে ইসহাকের বর্ণনার মাধ্যমে আসেম ইবনে কাতাদা আনসারীর নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন ঃ

"বনী কায়নুকাই সর্বপ্রথম হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও ইহুদীদের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল তা ভঙ্গ করে এবং বদর ও ওহুদের মধ্যবর্তী সময়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।"

ইবনে সা'দ বনী কায়নুকা যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"বদরের যুদ্ধে ইহুদীরা হিংসাত্মক কাজ, নানা প্রকার গণ্ডগোল এবং চুক্তিভঙ্গ করেছিল।"

একটি আকস্মিক ঘটনা এ আগুনকে আরও উস্কে দেয়। জনৈকা আনসার-পত্নী মদীনার বাজারে এক ইহুদীর দোকানে আগমন করেন। মহিলা বোরকা পরিহিতা ছিলেন। ইহুদীটি মহিলার অসম্মান করে। এক মুসলমান ব্যাপারটি দেখে আর ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না, তিনি ঘটনাস্থলেই সে ইহুদীকে হত্যা করলেন। অতঃপর ইহুদীরা মিলে উক্ত মুসলমানকেও হত্যা করে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ সংবাদ পেয়ে সেখানে যান এবং বলেন, "আল্লাহ্কে ভয় কর, এমন যেন না হয় যে বদরের মত তোমাদের উপর শাস্তি নেমে আসে।"

উত্তরে তারা বলল, "আমরা কোরাইশ নই। যদি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে, তবে দেখিয়ে দেব যে যুদ্ধ কাকে বলে।"

অবশেষে ইহুদীদের তরফ থেকে চুক্তিভঙ্গ ও যুদ্ধের ঘোষণা এল। বাধ্য হয়ে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) যুদ্ধ করলেন। তারা দুর্গের মধ্যে অবরুদ্ধ হল। পনের দিন অবরুদ্ধ থাকার পর তারা রাজী হল যে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যা মীমাংসা করবেন আমরা তাই মেনে নেব। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তাদের পক্ষ অবলম্বন করে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আবেদন করল যে তাদেরকে নির্বাসিত করা হোক। অতঃপর সিরিয়ার 'আযরেয়াত' নামক স্থানে তাদেরকে নির্বাসিত করা হয়। তারা সংখ্যায় ছিল সাতশ', তাদের মধ্যে তিনশ' ছিল বর্ম পরিহিত। এটা দ্বিতীয় হিজরীর শওয়াল মাসের ঘটনা।

কা'ব ইবনে আশ্রাফ হত্যা ঘটনা

কা'ব ছিল ইহুদীদের একজন বিখ্যাত কবি। তার পিতা 'তায়ী' আশরাফ মদীনার বনু নাযীরদের সঙ্গে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এমন প্রভাব ও সম্মান অর্জন করেছিলেন যে ইহুদীদের ইমাম ও হেজাযের বনিক বলে খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি আবু রাফে ইবনে ওয়াল হাকীকের কন্যাকে বিয়ে করতে সমর্থ হন। কা'ব তারই উদরে জন্মগ্রহণ করে। এ দু'তরফা সম্বন্ধের ফলে কা'ব ইহুদী ও আরবদের মধ্যে সমভাবে মর্যাদার অধিকারী হয়ে ওঠে। এতদ্ব্যতীত একজন নামজাদা কবি হিসাবেও গোটা আরবের উপর তার একটা আলাদা প্রভাব ছিল।

অত্যধিক টাকা-পয়সার মালিক হওয়ার কারণে তাকে সমগ্র ইহুদীদের সরদার বলে গণ্য করা হত। ইহুদী ওলামা ও ধর্মীয় ইমামদের বেতন পর্যন্ত তার পক্ষ হতে পরিশোধ করা হত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মদীনায় শুভাগমন করেন এবং ইহুদী আলেমগণ কা'বের নিকট তাদের মাসিক ভাতা নেবার জন্য আসে, কা'ব তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে তাদের অভিমত জিজ্ঞেস করে। আলেমগণ কা'বের পক্ষ সমর্থন করলে সে তাদের ভাতা বৃদ্ধি করে দেয়।[1]

ইসলামের প্রতি কা'ব মজ্জাগত শত্রুতা পোষণ করত। বদরের যুদ্ধে নিহত কোরাইশ সরদারদের জন্য শোক প্রকাশার্থে সে মক্কায় গমন করে এবং প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তার রচিত কবিতার মাধ্যমে মক্কাবাসীদের ক্ষেপিয়ে তোলে। ইবনে হিশাম এ ঘটনার আলোচনা প্রসঙ্গে কা'ব-এর রচিত সে সমস্ত কবিতাও উদ্ধৃত করেছেন। নমুনাস্বরূপ দু'এক পংক্তি এখানে লিপিবদ্ধ করা হল ঃ

طحنت رحى بدر لمهلك اهله - ولمثل بدر يستهل وتدمع - كم

قد اصيب به من ابيض ماجد ذى بهجة تاوى اليه الضبع -

অর্থাৎ, "বদরের যুদ্ধের যাঁতা তথায় অভিযানকারীদের পিষে ফেলেছে। বদরের মত একটি দুঃখজনক ঘটনার জন্য ক্রন্দন করা ও মাথা পেটানো উচিত। কত সম্ভ্রান্ত ঘরের শুভ্র চেহারার মানুষ নিহত হয়েছে, যাদের কাছে অভাবগ্রস্তরা আশ্রয় গ্রহণ করত।"

মদীনায় ফিরে এসে কা'ব হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কবিতা আবৃত্তি করে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তুলতে আরম্ভ করল।[2]

আধুনিক বিশ্বে বড় বড় রাজনীতিবিদদের গরম গরম বক্তৃতা ও প্রভাবশালী সংবাদপত্রের অগ্নিক্ষরা লেখা যেমন গণমনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তখনকার আরব জাহানে কবিতার তেমনি প্রভাব ছিল। সাধারণ একজন কবি গোত্রে-গোত্রে গিয়ে কবিতা আবৃত্তি করে আগুন ধরিয়ে দিত।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, কা'ব চল্লিশজনের একটি দল নিয়ে মক্কায় যায়। সেখানে আবু সুফিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। আবু সুফিয়ান এবং মক্কার অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গকে সে বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণে ক্ষেপিয়ে তোলে। এ

---

১. যারকানী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯।
২. আবু দাউদ (২), খামীস, পৃঃ ৫১৭।

উস্কানির পরিপ্রেক্ষিতেই আবু সুফিয়ান সবাইকে নিয়ে কাবা প্রাঙ্গণে আসে এবং হরমের পর্দা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে যে বদরের প্রতিশোধ অবশ্যই লওয়া হবে।[১]

কিন্তু এর উপর ভরসা না করে কা'ব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে গোপনে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। আল্লামা ইয়াকুবী তাঁর লিখিত ইতিহাসে বনূ নাযীরের প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

"কা'ব ইবনে আশরাফ ইহুদী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রতারণা করে হত্যা করতে মনস্থ করেছিল।"

হাফেয ইবনে হাজার 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে হযরত ইকরিমা (রাঃ) থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা উপরোক্ত হাদীসেরই পৃষ্ঠপোষকতা করে। হাদীসে আছে, কা'ব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নিমন্ত্রণ করল এবং আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে প্রতারণা করে হত্যা করার জন্য লোক নিযুক্ত করল।

গোলযোগ যখন চরমে উঠল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ বিষয়ে সাহাবিদের কাছে পরামর্শ জিজ্ঞেস করলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুমতিক্রমে মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা আউস গোত্রের সরদারদের পরামর্শ মতে তৃতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে কা'বকে হত্যা করেন। হাদীস বর্ণনাকারীগণ লিখেছেন যে মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আরয করেছিলেন, "আমাকে কিছু বলার অনুমতি দেয়া হোক।" ঐতিহাসিকগণ এর অর্থ কার্যোদ্ধারের জন্য প্রয়োজনে মিথ্যা বলার অনুমতি চেয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন এবং হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও অনুমতি দান করেছিলেন, যেহেতু যুদ্ধের ময়দানে ধোঁকা দেয়া জায়েয রয়েছে। কিন্তু বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে "আমাকে কিছু বলার অনুমতি দান করুন।"

এতে মিথ্যা বলার অনুমতি চাওয়া হল কোথায়? তাদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা অবশ্যই হয়ে থাকবে। মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা কা'বকে বললেন, "আমরা মোহাম্মদ (সাঃ)-কে স্থান দিয়ে সমগ্র আরবকে শত্রু বানিয়েছি। তিনি বার বার শুধু আমাদের কাছে চাঁদা চাইতে আসেন। এখন আপনার কাছে কিছু রেখে কর্জ নিতে হবে। কা'ব বলল, "তোমরা নিজেরাই একদিন মোহাম্মদ (সাঃ)-এর কারণে বিরক্ত হয়ে উঠবে। এখন কর্জের জন্য তোমার স্ত্রীকে আমার কাছে বন্ধক রাখ।" মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা বললেন, "আপনি যেরূপ সুপুরুষ, তাতে আমার স্ত্রী শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকতে পারবে বলে আমি ভরসা করতে পারি না।" অতঃপর মোহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে তাঁর কোন একজন সন্তান বন্ধক রাখার প্রস্তাব দিল। তিনি এ প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে কিছু অস্ত্র বন্ধক রাখার প্রস্তাব দিলেন।

---

১. খামীছ, পৃঃ ৫১৭।

সহীহ্ বোখারী শরীফে কা'ব হত্যার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে তাঁরা বন্ধুত্বসুলভ ভাব দেখিয়ে ডেকে তাকে ঘরের বাইরে নিয়ে এলেন। তারপর চুলের ঘ্রাণ নেয়ার ছলে তার চুলের গোছা চেপে ধরে হত্যা করলেন। কিন্তু হাদীসে এর কোন বর্ণনা নেই যে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) সংশ্লিষ্ট সাহাবীকে প্রতারণামূলক কোন কথা বলার অনুমতি দিয়েছিলেন। আরবে অবশ্য এ ধরনের হত্যা কোন দূষণীয় ব্যাপার ছিল না। এ ঘটনা পরে বিশদভাবে বর্ণনা করা হবে।

গাযওয়ায়ে বনূ নাযীর

হযরত আমর ইবনে ওমাইর (রাঃ) আমের গোত্রের যে দুজন লোককে হত্যা করেছিলেন, যার রক্তপণ তখনও পরিশোধ করা হয় নি এবং যার অংশ চুক্তি অনুযায়ী বনূ নাযীর গোত্রের ইহুদীদের উপরও অবশ্য পরিশোধ্য ছিল, হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) সে বিষয়ে নিষ্পত্তির জন্য বনূ নাযীরের কাছে গমন করলেন। তারা স্বীকার করল, কিন্তু গোপনে ষড়যন্ত্র করল যে এক ব্যক্তি চুপি চুপি দালানের ছাদে উঠে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর পাথর ছুঁড়ে মারবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দেয়ালের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিলেন। আমর ইবনে জাহ্‌শ নামক এক ইহুদী এ অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য দালানের উপর উঠল। এদিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের কুমতলবের কথা জানতে পারলেন এবং তৎক্ষণাৎ মদীনায় ফিলে এলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে কোরাইশরা পত্র মারফত লিখেছিল, "মোহাম্মদ (সাঃ)-কে হত্যা কর, নতুবা আমরা নিজেরাই এসে তোমাদেরকে সমূলে উচ্ছেদ করব।" বনূ নাযীর প্রথম থেকেই ইসলামের শত্রু ছিল, কোরাইশদের এ বার্তা পেয়ে তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট সংবাদ পাঠাল যে আপনি ত্রিশজন লোক নিয়ে আসুন, আমরাও আমাদের পাদ্রীদের সঙ্গে রাখব। আপনার কথা শুনে যদি আমাদের পাদ্রী বিশ্বাস করতে পারেন, তাহলে আপনার ধর্ম গ্রহণ করার ব্যাপারে আমাদের আর কোন দ্বিধা থাকবে না।

ইহুদীদের গোপন ষড়যন্ত্রের কথা অনুমান করে রসূলুল্লাহ (সাঃ) লিখে পাঠালেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা একটি চুক্তিপত্র না লিখে দেবে, ততক্ষণ আমি তোমাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। কিন্তু তারা এ প্রস্তাবে সম্মত হল না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলমানদের প্রতি কিঞ্চিৎ বন্ধু ভাবাপন্ন 'কুরাইযা' গোত্রের লোকের সঙ্গে দেখা করে তাদের চুক্তিপত্র পুনঃস্বাক্ষর করতে বললেন। তারা তাতে সম্মত হয়ে চুক্তিপত্রে পুনরায় স্বাক্ষর করল।

বনূ নাযীরের জন্য অবশ্য এটি একটি শিক্ষণীয় বিষয় ছিল যে তাদের স্বধর্মীয় একটি গোত্র যখন নতুন করে চুক্তি স্বাক্ষর করল, সেক্ষেত্রে তারা কেন সম্মত হতে পারল না?[১] অবশেষে তারা পুনরায় হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট বার্তা পাঠিয়েছিল যে আপনি তিনজন লোক নিয়ে আসুন, আমরাও তিনজন আলেম নিয়ে আসছি। এ আলেমগণ যদি আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন, তাহলে আমরাও আপনার উপর ঈমান আনব। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন। কিন্তু পথিমধ্যেই বিশ্বস্তসূত্রে তিনি অবগত হলেন যে ইহুদীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়ে আছে, তিনি সেখানে উপস্থিত হলেই তাঁকে হত্যা করা হবে।[২]

বনূ নাযীরের ঔদ্ধত্যের বহু কারণ ছিল। তারা অত্যন্ত মজবুত দুর্গে অবস্থান করত, যা অবরোধ করা সহজ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই বার্তা পাঠিয়েছিল যে, "তোমরা আত্মসমর্পণ করবে না, বনূ কুরাইযা তোমাদের সহযোগিতা করবে এবং আমিও দু'হাজার লোক নিয়ে তোমাদের সাহায্যের জন্য আসব।"

কোরআন মজীদে বর্ণিত আছে ঃ

"তুমি কি দেখ না, মুনাফেক তাদের কাফের মিত্রদেরকে বলে থাকে যে তোমরা বের হলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে বের হব এবং আমরাও তোমাদের ব্যাপারে কারও কথা মানব না ; যদি তোমাদের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ করে, তাহলে আমরাও তোমাদের সাহায্যের জন্য ছুটে আসব।"—(সূরা হাশর-২)

কিন্তু বনূ নাযীরদের সমস্ত কল্পনা মিথ্যা প্রমাণিত হল। বনূ কুরাইযা তাদের সহায়তা করল না এবং মোনাফেকরা প্রকাশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে যেতে পারল না।

হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) পনেরো দিন ধরে তাদেরকে ঘেরাও করে রাখলেন। দুর্গের চারদিকে যে খেজুর বাগান ছিল তা থেকে কিছু গাছ কেটে ফেললেন। সোহাইলী "রওযুল-আনাফ" গ্রন্থে লিখেছেন যে সমস্ত খেজুর গাছ কাটা হয়নি। 'লিনা' নামে যে এক প্রকার বিশেষ ধরনের খেজুর গাছ ছিল এবং যা আরবদের সাধারণ খাদ্য ছিল না, তাই কাটা হয়েছিল। কোরআন মজীদেও এর বিবরণ রয়েছে।

"তুমি যে লিনা বৃক্ষ কেটেছ এবং যা রেখে দিয়েছ, সবই আল্লাহ্র হুকুমে হয়েছে। আল্লাহ্ পাক ফাসেকদের (গোনাহগারদের) লাঞ্ছিত করে থাকেন।"

---

১. এ সকল ঘটনা বিশদভাবে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব ভূমিকা পালন করেছেন।

২. ফতহুল বারী, গাযওয়ায়ে বনু-নাযীর, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৫।

সম্ভবত গাছের আড়াল হতে সংবাদাদি আদান-প্রদান করা হত, যার কারণে সেগুলো কেটে ফেলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।[১]

অবশেষে বনু নাযীররা সম্মত হল যে তারা যে পরিমাণ ধন-সম্পদ তাদের উটের পিঠে করে নিয়ে যেতে পারবে, তা নিয়ে তারা মদীনার বাইরে কোথাও চলে যাবে। সুতরাং ঘরবাড়ি ছেড়ে তারা সবাই চলে গেল। তাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত সরদারগণ যেমন, সালাম ইবনে উবাই, কেন না ইবনে রবী, হুযাই ইবনে আখতাব প্রমুখ সবাই খায়বারে চলে গেল। সেখানকার লোকেরা তাদের এমন সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করল যে অচিরেই তারা খায়বারের সরদার নিযুক্ত হল। এ ঘটনা এ জন্য স্মরণ রাখার দরকার যে এটাই ছিল পরবর্তী পর্যায়ে খায়বার যুদ্ধের প্রকৃত পটভূমি।

বনু কুরাইযা দেশ ছেড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তাদের সে যাত্রা দৃশ্য দেখলে সাধারণত উৎসবযাত্রা বলে ভ্রম হত। তারা উটে চড়ে বাজনা বাজাতে বাজাতে যাচ্ছিল। গায়িকা মহিলারা তবলা বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে পথ চলছিল. ওরওয়া ইবনে আরদে আবসী নামক বিখ্যাত কবির স্ত্রী—যাকে ইহুদীরা খরিদ করে নিয়েছিল, সেও তাদের সঙ্গে ছিল।

মদীনাবাসীদের বক্তব্য মোতাবেক এমন ধন-সম্পদ বহনকারী সওয়ারী ইতিপূর্বে কখনও তাদের চোখে পড়েনি। তারা যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও ধন-সম্পদ যাত্রাকালে ফেলে গিয়েছিল, তার মধ্যে ছিল পঞ্চাশ খণ্ড স্বর্ণ, পঞ্চাশটি শিরস্ত্রাণ এবং তিনশ' চল্লিশখানা তলোয়ার। তাদের যাত্রার পর এ নিয়ে গোলযোগ দেখা দেয় যে আনসারদের যেসব সন্তান ইহুদীধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং ইহুদীরা যাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল, আনসাররা তাদেরকে যেতে বাধা দান করেছিলেন। এমন সময় কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হল।

"ধর্মীয় ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই।"

আবু দাউদ (রঃ) কিতাবুল জেহাদে باب في الأسير على الإسلام শিরোনামায় আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস হতে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

১. গ্রন্থকারের মন্তব্য, ইমাম আহমদ (রাঃ)-এর মন্তব্য দ্বারা আরও মজবুত প্রমাণিত হয় যে, বৃক্ষাদি তখনই কাটা হয়ে থাকে যখন যুদ্ধক্ষেত্রে তা না কাটলে কোন পথ থাকে না। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, শত্রু যদি গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকে, তাহলে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়া দুরস্ত।

গাযওয়ায়ে মোরাইসী ঃ অপবাদের ঘটনা
গাযওয়ায়ে আহ্যাব

কোরাইশ ও ইহুদীদের সংঘবদ্ধ ষড়যন্ত্রে মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত সর্বত্র বিদ্বেষের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল। আরবের যতগুলো গোত্র ছিল, সবাই মদীনার উপর আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। সর্বপ্রথম আনমার ও সা'লাবা গোত্রদ্বয় অগ্রসর হল। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সংবাদ পেয়ে ৫ম হিজরীর ১০ই মহর্‌রম তারিখে চারশ' সাহাবী নিয়ে মদীনা থেকে বের হলেন এবং "যাতুর রেকা" পর্যন্ত গমন করলেন। কিন্তু আক্রমণকারীরা হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আগাম অভিযানের সংবাদ পেয়ে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গেল।[১]

৫ম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সংবাদ এল যে 'দৌমাতুল জন্দল' প্রান্তে কাফেরদের একটি বিরাট বাহিনী সমবেত হচ্ছে। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক হাজার সাহাবীর একটি দল নিয়ে মদীনা থেকে বের হলেন। এরাও সংবাদ পেয়ে পালিয়ে গেল।

গাযওয়ায়ে মোরাইসী বা বনী মুস্তালেক[২]

আরবের খোযাআ গোত্রটি কোরাইশদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিল। এককালে কোরাইশদের ধারণা ছিল যে আমরা হযরত ইবরাহীমের বংশধর। কাজেই অন্যদের তুলনায় আমাদেরকে উত্তম ও বিশিষ্ট হতে হবে।

হজের একটি বড় রোকন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। কিন্তু এ স্থানটি হরম শরীফের বাইরে বলে তারা আরাফাতের পরিবর্তে মুয্দালেফায় অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেয়। এ ধরনের আরও বহু বৈশিষ্ট্য তারা নিজেরা উদ্ভাবন করে। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা নিজেদের 'আহ্মাস' বলে পরিচয় দিত। এ বিষয়ে তারা এত উদার ছিল যে যারা তাদের এ সকল বিধি-নিষেধ মেনে চলত তাদেরও তারা এ উপাধি প্রদান করত এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করত। খোযাআ গোত্রকেও এ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল।[৩]

১. ইবনে সা'দ, পৃঃ-৪৩। বোখারী শরীফ হতে প্রমাণিত হয় যে যাতুর রেকা যুদ্ধ পরিখা যুদ্ধের পরে হয়েছিল। এ যুদ্ধেই সর্বপ্রথম 'সালাতুল খাওফ' আদায় করা হয়।

২. ইবনে ইসহাক, তাবারী ও ইবনে হিশাম এ যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয় বলে মন্তব্য করেছেন। মূসা ইবনে আকাবা, আল্লামা ইবনে হাজর, বায়হাকী, হাকেম, আবু মা'শার প্রমুখের বর্ণনায় ৫ম হিজরীর কথা উল্লেখ রয়েছে। সহীহ বোখারী শরীফেও এর আলোচনা হয়েছে। কিন্তু ভুলক্রমে ৫ম হিজরীর পরিবর্তে ইবনে আকাবার অভিমতে ৪র্থ হিজরী লেখা হয়েছে। বিস্তারিত অবগতির জন্য ফতহুল বারী দ্রষ্টব্য।

৩. এ ঘটনা ইবনে হিশাম বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

বনূ খোযাআর একটি শাখা গোত্রের নাম ছিল বনূ মুস্তালেক। তারা মদীনার নয় মাইল দূরে মোরাইসী নামক স্থানে বসবাস করত। এ গোত্রের সরদার ছিল হারেস ইবনে আবী দারার। সে কোরাইশদের পরামর্শে অথবা নিজেই মদীনার উপর আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ আভাস পেয়ে হযরত যায়েদ ইবনে খুসাইবকে বিষয়টি ভালমত তদন্ত করে দেখার জন্য প্রেরণ করলেন। তিনি ফিরে এসে সংবাদটির সত্যতা স্বীকার করলেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবীদের প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। ৬ই শাবান সাহাবিগণ মদীনা থেকে রওনা হলেন। হারেস বাহিনী এ সংবাদ পেয়ে প্রথমত, উদ্বিগ্ন হল এবং পরে পালিয়ে অন্যদিকে চলে গেল। কিন্তু মোরাইসীয়ায় অন্যান্য যারা ছিল তারা সারিবদ্ধ হয়ে বহুক্ষণ পর্যন্ত তীর নিক্ষেপ করতে লাগল। মুসলমানরা যখন সংঘবদ্ধভাবে আক্রমণ করল, তখন তারা দিশেহারা হয়ে চারদিক অন্ধকার দেখতে লাগল। তাদের দশ ব্যক্তি নিহত হল। বন্দীর সংখ্যা ছিল প্রায় ছ'শ। যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির মধ্যে দু'হাজার উট, পাঁচ হাজার ছাগল ইত্যাদি হস্তগত হল।

সহীহ্ বোখারী ও সহীহ্ মুসলিম শরীফে রয়েছে, ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বনূ মুস্তালেকের উপর এমন অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেন যে তারা তার কিছুই জানত না। তখন তারা নিত্যকার মত গবাদিপশুকে পানি খাওয়াচ্ছিল।

ইবনে সা'দ এ হাদীসও বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি লিখেছেন যে প্রথম বর্ণনাই বেশি নির্ভরযোগ্য। এ বিষয়ে হাফেয ইবনে হাজার 'ফতহুল বারী'তে লিখেছেন, সহীহ্ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের বর্ণনার কাছে ইতিহাসের বর্ণনা প্রাধান্য পেতে পারে না। অথচ আসল ঘটনা হল, সহীহ্ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের বর্ণনাও উসূলে হাদীসের সূত্র অনুযায়ী দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু, এ বর্ণনার সূত্র নাফে' পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যায়। নাফে' যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা তো দূরের কথা, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভও করেননি। এ কারণে হাদীসটি মুহাদ্দেসগণের কাছে সনদ-কর্তিত (মুন্‌কাতা)।[১]

যাহোক, এটি যদিও একটি সামান্য যুদ্ধ ছিল কিন্তু বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে এর গুরুত্ব এমনি বেড়ে যায় যে পরবর্তীকালে ইতিহাসের পাতায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে সমর্থ হয়। এ যুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের

১. সম্ভবত গ্রন্থকার সনদের প্রথমাংশের দিকে লক্ষ্য করে হাদীসটির সনদ মুনাকাতা বলে অভিহিত করেছেন। নতুবা হাদীস বর্ণনার পর ব্যাখ্যা রয়েছে, নাফে' এ হাদীস হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে শুনেছেন। তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরপর হাদীসটি আর সনদ কর্তিত থাকতে পারে না। 'স'

লোভে বহু মুনাফেকের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়া। মুনাফেকরা সর্বক্ষণ চেষ্টা করত যাতে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বাধানো যায়। একদিন এক ঝরনায় পানি তোলার সময় একজন মুহাজের ও একজন আনসারের মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। আনসারটি আরবের পুরাতন রীতি অনুযায়ী 'আনসারদের জয়' বলে চীৎকার আরম্ভ করলেন। মুহাজেরটিও 'হে মুহাজের দল' বলে চীৎকার আরম্ভ করলেন। চীৎকার শুনে মুহাজের ও আনসার উভয় পক্ষ তীর-তলোয়ার সঙ্গে নিয়ে দলে দলে বেরিয়ে এলেন। এভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সংঘর্ষ অত্যাসন্ন হয়ে উঠল। কিন্তু সময়মত সুধীজনের হস্তক্ষেপের ফলে দু'দলের মধ্যে পুনরায় সমঝোতা হয়ে গেল। মুনাফেক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এ সুযোগ হেলায় হারাল না। সে আনসারদেরকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমরা এ আপদ নিজেরাই কিনে এনেছ, মুহাজেরদের ডেকে এনে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছ যে তারা এখন তোমাদের সমান বলে দাবি করে। এখন সুযোগ চলে যায়নি, যদি তোমরা আর তাদের সাহায্য-সহায়তা না কর, তাহলে বাধ্য হয়ে তারা চলে যাবে।

লোকে এ ঘটনা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সমীপে এসে জানাল। হযরত ওমর (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিষয়টি শুনে রাগে টগবগ করতে লাগলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে সে মুনাফেকটির শিরশ্ছেদের অনুমতি চাইলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "তোমরা কি পছন্দ কর যে মোহাম্মদ (সাঃ) তার সঙ্গীদের হত্যার করার পরামর্শ দেবেন।"[১]

এটি ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর ঘটনা যে উবাই যেমনি মুনাফেক ও ইসলামের চরম শত্রু ছিল, তার ছেলে আবদুল্লাহ ঠিক তার বিপরীত অর্থাৎ, ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অসন্তুষ্টির কারণে চারদিকে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। এ সংবাদ পেয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পুত্র আবদুল্লাহ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, "দুনিয়া জানে যে আমি পিতার কেমন বাধ্য ছেলে! যদি অনুমতি হয় তাহলে আমি এখনই পিতার মস্তক ছিন্ন করে হুযুরের সমীপে হাযির করি। এমন যেন না হয় যে অন্য কাউকেও আপনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন এবং আমি পিতৃশোকে অভিভূত হয়ে পুনরায় তাকে হত্যা করি।" রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "হত্যার পরিবর্তে আমি তার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

---

১. সহীহ বোখারী, পৃঃ ৭২৮।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এ বাণীই সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যুর পর তার কাফনের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের চাদর দান করেন এবং জানাযার নামায পড়ান। হযরত ওমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বাধাদান করলেন। কিন্তু দয়ার সাগরে একবার ঢেউ উঠলে তা আর কে রোধ করতে পারে?

হযরত জুয়াইরিয়ার (রাঃ) ঘটনা

বনী মুস্তালেক যুদ্ধে বন্দীদের মধ্যে হারেস ইবনে আবু যারারের কন্যা হযরত জুয়াইরিয়াও ছিলেন। যুদ্ধবন্দীদের দাসদাসী হিসাবে সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়েছিল। হযরত জুয়াইরিয়া পড়েছিলেন হযরত সাবেত ইবনে কায়েসের ভাগে। তিনি হযরত সাবেতের নিকট মুক্তিপণের বিনিময়ে তাঁকে মুক্তি দেয়ার আবেদন করেন। হযরত সাবেতও এতে রাজী হয়ে যান। কিন্তু তাঁর নিকট কোন অর্থ-কড়ি না থাকায় চাঁদা নিয়ে মুক্তিপণ পরিশোধ করবেন বলে তিনি মনস্থ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হন।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর আবেদন শুনে বললেন, লোকের কাছে থেকে চাঁদা চেয়ে মুক্ত হওয়ার চাইতে যদি তোমার জন্য এর চাইতে উত্তম কোন ব্যবস্থা করা হয়, তা কি তুমি গ্রহণ করবে? তিনি বললেন, তা কেমন? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, "আমি যদি তোমার মুক্তিপণ পরিশোধ করে দেই এবং তোমাকে বিয়ে করি?" তিনি বললেন, "আমি রাজী আছি।" অতঃপর হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর মুক্তিপণ পরিশোধ করে তাঁকে বিয়ে করেন।[১]

অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ হযরত জুয়াইরিয়ার পিতা হারেস ছিলেন আরবের একজন নামকরা সরদার। হযরত জুয়াইরিয়ার বন্দি হওয়ার সংবাদ পেয়ে তিনি হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দরবারে এসে আবেদন করলেন, "আমার কন্যা দাসী হতে পারে না, এটা আমার ব্যক্তিত্বে বাধা দেয়। অতএব, আমার কন্যাকে মুক্তি দেয়া হোক।" হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, "বিষয়টি খোদ জুয়াইরিয়ার উপর ছেড়ে দেয়াই কি উত্তম নয়?" হারেস কন্যার নিকট গিয়ে ঘটনাটি খুলে বললেন এবং তাকে অপদস্থ না করার জন্য পরামর্শ দিলেন। তিনি পিতাকে বললেন, "আমি হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে থাকতে মনস্থ করেছি।" অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে বিয়ে করে নেন।

---

১. এ সমস্ত ঘটনা আবু দাউদের দাসমুক্তি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীসটি ইবনে হাজর ইসাবাতে ইবনে মানদাহ্ হতে বর্ণনা করে লিখেছেন যে এর সনদ শুদ্ধ। ইবনে সা'দ তাবকাতে লিখেছেন, হযরত জুয়াইরিয়ার পিতাই তার মুক্তিপণ পরিশোধ করেন। মুক্তির পর হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে বিয়ে করেন।

এ বিয়ের সুফল ঃ হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন হযরত জুয়াইরিয়ার সঙ্গে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন, তখন সে সমস্ত যুদ্ধবন্দী— যারা সাহাবীদের ভাগে পড়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত করে দেয়া হল। সাহাবিগণ বললেন, "যে বংশে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিয়ে করেছেন, সে বংশের লোক আর দাস থাকতে পারে না।"[১]

অপবাদের ঘটনা

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে মুনাফেক দল যে অপবাদ রটনা করেছিল, তা এ যুদ্ধ থেকে ফেরার পথেই সংঘটিত হয়েছিল। বিভিন্ন হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থে এ ঘটনা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু যে ঘটনা সম্বন্ধে কোরআন মজীদে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে, লোকেরা তা শুনে সঙ্গে সঙ্গে কেন বলেনি, "এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা" সে ঘটনার বিস্তারিত আলোচনার কোন প্রয়োজনই পড়ে না। তবে এ ঘটনা থেকেই ধারণা করা যায় যে মিথ্যা ও বাজে সংবাদ কিভাবে বাতাসের গতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য এজন্য তাদের অপবাদ রটনার শাস্তিও দেয়া হয়েছিল। সহীহ্ মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে এর উল্লেখ রয়েছে।

আজকাল খৃস্টান ঐতিহাসিকেরাও তখনকার মুনাফেকদেরই মত এ ঘটনাটি বর্ণনা করতে প্রয়াস পাচ্ছে। খৃষ্টান লেখক বন্ধুদের পক্ষ থেকে এ ধরনের মানসিকতা মোটেও অপ্রত্যাশিত নয়। এ ধরনের নোংরামি দ্বারা তারা নিজেদের জঘন্য মানসিকতাটুকুই বার বার ফুটিয়ে তোলেন।

গাযওয়ায়ে আহ্যাব
(সমগ্র আরব গোত্রের সংঘবদ্ধ যুদ্ধ)

বনূ নাযীররা মদীনা থেকে নির্বাসিত হয়ে খায়বরে এসে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক বিরাট ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে। সালাম ইবনে আবিল হুকাইক, হুয়াই ইবনে আখতাব, কিনানা ইবনে রবী প্রমুখ ইহুদী সরদার মক্কায় গিয়ে কোরাইশদের বলল, যদি তোমরা আমাদের সহযোগিতা কর, তবে মুসলমানদের সমূলে উচ্ছেদ করা যাবে। কোরাইশরা পূর্ব থেকেই এ জন্য প্রস্তুত ছিল। তারা ইহুদীদের প্রস্তাব সর্বান্তকরণে সমর্থন করল।

১. সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল ইত্ক।

কোরাইশদের সমর্থন পেয়ে তারা গাত্ফান গোত্রের কাছে উপনীত হল এবং লোভ দেখাল যে খায়বরের অর্ধেক উৎপাদন সর্বদা তাদের দেয়া হবে। এরাও পূর্ব থেকে এ ব্যাপারে প্রস্তুত ছিল। গাযওয়ায়ে বী'রে মাউনার ঘটনার কথা স্মরণ থাকতে পারে যে দলপতি আমের এ গাত্ফানদেরই আক্রমণের হুমকি দিয়েছিল। এ জন্য এরা সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল। বনূ আসাদ গাত্ফান গোত্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিল। তারাও গাত্ফানদের আহ্বানে বেরিয়ে পড়ল। বনূ-সুলাইমদের সঙ্গে কুরাইশদের আত্মীয়তার সুবাদে তারাও কোরাইশদের সঙ্গী হল। বনূ-সা'দ ইহুদীদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকায় তারাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। মোট কথা, সমগ্র আরবের প্রতিটি গোত্র একত্রিত হয়ে মদীনার দিকে রওয়ানা হল। 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে তাদের সংখ্যা দশ হাজার ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১]

কাফেরদের এ বিরাট বাহিনী স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত ছিল।[২] গাত্ফান বাহিনীর[৩] প্রধান ছিল উয়াইনা ইবনে হিস্ন ফুযারী (আরবের একজন নামকরা সরদার)। বনূ আসাদ বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হল তোলায়হা এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ছিল সমগ্র আরব বাহিনীর প্রধান সেনাপতি।[৪]

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ আক্রমণের সংবাদ পেয়ে সাহাবাগণকে ডেকে পরামর্শ করলেন । সালমান ফারসী (রাঃ) ইরানী হওয়ার কারণে যুদ্ধের বিভিন্ন কলাকৌশল তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি মত প্রকাশ করলেন যে খোলা ময়দানে যুদ্ধ করা সমীচীন হবে না ; বরং একটি নিরাপদ স্থানে সৈন্য মোতায়েন করে সম্ভাব্য আক্রমণের দিকটিতে পরিখা খনন করে স্থানটি পূর্ব হতে সুরক্ষিত করে রাখাই হবে বিচক্ষণতার কাজ।

উপস্থিত সকলেই তাঁর এ প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং খন্দক খননের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ্ করলেন।

মদীনার তিন পাশে ছিল ঘরবাড়ি ও খেজুর বাগান। তাতে সাধারণত শহর রক্ষার কাজ হত। একমাত্র সিরিয়ার দিকটি খোলা ছিল। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তিন হাজার সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে গেলেন এবং সে উন্মুক্ত অংশে খন্দক খননের কাজ আরম্ভ করে দিলেন। এটা ছিল ৫ম হিজরীর যিলকদ মাসের আট তারিখের ঘটনা।

---

১. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭, ফতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩০১।
২. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭।
৩. গ্রন্থকার সংক্ষিপ্তভাবে প্রসিদ্ধ গোত্রগুলোর বাহিনী প্রধানদের নাম উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিকগণ অন্যান্য বাহিনী প্রধানদের নামও লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন, বনূ সুলাইম বাহিনী প্রধান ছিল সুফিয়ান ইবনে আবদ শামস, আশজা বাহিনীর প্রধান মসউদ ইবনে রুখাইলা এবং বনূ মুররা বাহিনী প্রধান ছিল হারেস ইবনে আওফ। হারেছ ইবনে তোলায়হা পরে ইসলাম গ্রহণ করেন।— যারকানী ২য় খণ্ড, পৃঃ-১২১, তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ২য়, খণ্ড, পৃঃ-৪৭।
৪. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ২য় খণ্ড, পৃঃ-৪৭।

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সীমানা নির্ধারণ করলেন এবং দাগ কেটে দশ জনের জন্য দশ দশ গজ পরিখা খননের কাজ ভাগ করে দিলেন। পরিখার গভীরতা পাঁচ গজ রাখা হল। তিন হাজার লোক বিশ দিনে এ খন্দক তথা পরিখা খননের কাজ সম্পন্ন করলেন।

স্মরণ থাকতে পারে যে মসজিদে নববী নির্মাণের সময় হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বয়ং মজদুরের কাজ করেছিলেন, এ খন্দক খননের সময়েও তিনি তেমনি ভূমিকা পালন করলেন।

তখন ছিল শীতকাল। বরফ-জমা ঠাণ্ডার রাত্রে তিন দিন অভুক্ত অবস্থায় মোহাজের ও আনসাররা মাটি কেটে পিঠে বয়ে নিয়ে ফেলতেন আর ভক্তি গদগদ কণ্ঠে গাইতেন ঃ

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا ۔ عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

অর্থাৎ "আমরা সেই সমস্ত লোক যারা মোহাম্মদের (সাঃ) হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছি জেহাদের, যে পর্যন্ত জীবিত থাকব।" দোজাহানের বাদশাহ্ হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ও মাটি ফেলছিলেন। পিঠের সঙ্গে পেট লেগে গিয়েছিল। এ অবস্থায় তিনি পাঠ করছিলেন ঃ

وَاللّٰهِ لَوْلَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا ـ وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا ـ وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَاقَيْنَا
اِنَّ الْاَعْدَاءَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ـ اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا

অর্থাৎ "আল্লাহ্র কসম! যদি তাঁর অনুগ্রহরাশি না হত, তবে আমরা নামায পড়তে পারতাম না, সদকাও দিতে পারতাম না। হে মাবুদ! আমাদের মধ্যে শান্তির ধারা প্রবাহিত কর, আর শত্রুদলের সম্মুখীন হলে পর আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ। শত্রুরা আমাদের উপর চড়াও হয়েছে। এরা যখনই ফেতনা-ফাসাদের চেষ্টা করেছে, আমরা প্রতিহত করার চেষ্টা করেছি।"

ابينا শব্দটি আসলেই তিনি উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন এবং বারবার উচ্চারণ করতেন।[১] সঙ্গে সঙ্গে আনসার ও মোহাজেরগণের জন্য এইমর্মে দোয়াও করতেন ঃ

"ইয়া আল্লাহু! আখেরাতের কল্যাণ ব্যতীত কোন কল্যাণই কল্যাণ নয়। করুণাময়, তুমি আনসার এবং মোহাজেরদের কল্যাণে পূর্ণ করে দাও।"

---

১. সহীহ্ বোখারী, গাযওয়ায়ে আহ্যাব।

পাথর খুঁড়তে খুঁড়তে এক সময় বিরাট এক খণ্ড পাথর বেরিয়ে এল। কারও পক্ষে সেটি ভাঙ্গা সম্ভব হচ্ছিল না। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে খবর দেয়া হল, তিনি পাথরটির কাছে গেলেন। তিন দিন অনাহারে! পেটে পাথর বাঁধা! কাছে গিয়ে তিনি প্রস্তরখণ্ডের উপর আঘাত করলেন, অমনি পাথরটি খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল।[১]

সিল্আ' নামক পাহাড়কে পিছনে রেখে সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল। মহিলাদের শহরের অভ্যন্তরভাগে একটি সুরক্ষিত দুর্গে পাঠানো হল। ইহুদী গোত্র বনূ কোরাইযার তরফ হতে আক্রমণের ভয় ছিল বলে হযরত সালমা ইবনে আসলাম (রাঃ)-কে দুশ' সৈন্য সহ শহরের ভেতরেই মোতায়েন রাখা হল।

বনূ-কুরাইযার ইহুদীরা তখন পর্যন্তও কিছুটা নিরপেক্ষ ছিল। কিন্তু বনূ নাযীর তাদের দলভুক্ত করার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেল। হুয়াই ইবনে আখতাব নিজেই বনূ কুরাইযার সরদার কা'ব ইবনে আসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। কিন্তু কা'ব তাদের দলভুক্ত হতে অস্বীকার করল। হুয়াই তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, আমরা এবার সৈন্যের একটি পাহাড় নিয়ে এসে মদীনার উপর আপতিত হয়েছি। সমস্ত কোরাইশ গোত্রও সম্মিলিতভাবে আজ মোহাম্মদ (সাঃ)-এর রক্ত পান করার জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। এ সুযোগ হেলায় হারিও না। এবার ইসলামের ধ্বংস অনিবার্য।

এত আশ্বাসের পরও কা'ব রাজী হল না। সে বলল, "আমরা মোহাম্মদ (সাঃ)-কে সর্বদা প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী পেয়েছি। তাঁর সঙ্গে ওয়াদা ভঙ্গ করা মানবতাবিরোধী কাজ হবে।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত হুযাইর মন্ত্রণাই কার্যকর হল।

হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ সংবাদ জানতে পেরে ঘটনাটি যাচাই করার জন্য হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায ও হযরত সা'দ ইবনে উবাদাকে বলে পাঠালেন যে প্রকৃতপক্ষেই যদি তারা চুক্তিভঙ্গ করে থাকে, তাহলে সে সংবাদ নিয়ে এসে অবোধগম্য ভাষায় বর্ণনা করবে, যাতে সাধারণ সৈনিকদের মনে কোন প্রকার নৈরাশ্য সৃষ্টি না হতে পারে।

আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর প্রেরিত এ দুজন সাহাবী বনূ কুরাইযার সরদারের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের পূর্বেকার চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। কিন্তু উত্তরে পাপাত্মারা ভিন্নমূর্তি ধারণ করল। তারা বলে বসল, "আমরা জানি না, মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সঙ্গে কি মর্মে চুক্তি হয়েছিল।"

---

১. সহীহ্ বোখারী, গাযওয়ায়ে আহ্যাব।

বনূ কুরাইযারা শত্রু সৈন্যের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দিল। কোরাইশ, ইহুদী এবং আরবের অন্যান্য গোত্র হতে আগত দশ হাজার সৈন্যের এ বিরাট বাহিনী তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে মদীনার তিন পাশে এমন তর্জন-গর্জন সহকারে দাঁড়াল যে মদীনার মাটি পর্যন্ত কাঁপতে লাগল। এ যুদ্ধের চিত্র অবশ্য আল্লাহ্ পাক নিজেই তুলে ধরেছেন ঃ

"উপর নিচ সকল দিক থেকেই শত্রু যখন তোমাদের উপর আপতিত হল, যা দেখে তোমাদের চক্ষু স্থির হয়ে গিয়েছিল। ত্রাসে প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত হবার উপক্রম হল, আর তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা করতে লাগলে, তখন মুসলমানদের পরীক্ষার সময় উপস্থিত হল এবং তাদের সাংঘাতিক রকমের একটি দোদুল্যমান অবস্থায় ফেলে দেয়া হল।—(আল্-আহ্যাব—২)

মুসলমান সৈন্যদলে মুনাফেকদের সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের সঙ্গেই ছিল। কিন্তু প্রচণ্ড শীত, সাজ-সরঞ্জামের স্বল্পতা, নিয়মিত উপবাস, নিদ্রাবিহীন রজনী, আর অসংখ্য সৈন্যের ভিড়ে তাদের মনের গোপন কথা প্রকাশ হয়ে পড়তে লাগল। তারা একে একে এসে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আবেদন করতে লাগল যে তাদের বাড়িঘর অরক্ষিত, তাদের শহরে ফিরে যাবার অনুমতি দেয়া হোক। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ "তারা বলতে লাগল, আমাদের বাড়িঘর খালি, কিন্তু আসলে তাদের ঘর খালি ছিল না; বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল পলায়ন করা।"—(আহ্যাব-২)

অপরদিকে নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীগণের অবস্থা ছিল স্বতন্ত্র। তাঁদের নিষ্ঠা ছিল তুলনাবিহীন। বলা হয়েছে ঃ

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ... وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ـ (احزاب ٣)

"মুসলমানগণ যখন এ বিপুলসংখ্যক শত্রুসৈন্য দেখতে পেলেন, তখন তাদের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এল, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সাঃ) ওয়াদা করেছিলেন এরা তারাই। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল সত্য। এটা তাদের বিশ্বাস ও আনুগত্য আরও বৃদ্ধি করে দিল।"

প্রায় এক মাস পর্যন্ত এ কঠিন অবরোধ স্থায়ী রইল। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবিগণ তিন দিনের অনাহারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। একদিন সাহাবিগণ ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে এসে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-

এর সামনে তাদের পেট খুলে দেখালেন, পেটে পাথর বাঁধা ছিল কিন্তু হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন নিজের পেট খুললেন, তখন দেখা গেল, তাঁর পেটে দু'খণ্ড পাথর বাঁধা।[১] অবরোধ এমন কঠিন ও ভয়াবহ্ আকার ধারণ করল যে একবার হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "এমন কেউ আছ কি, যে বাইরে গিয়ে অবরোধকারীদের সংবাদ আনতে পারবে।" তিনবার বলার পরেও হযরত যুবাইর (রাঃ) ব্যতীত অন্য কারও কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ সময়েই হযরত যুবাইর (রাঃ)-কে 'হাওয়ারী' (প্রাণ উৎসর্গকারী) উপাধিতে ভূষিত করেন।[২]

অবরোধকারীরা একদিকে খন্দক পাহারা দিচ্ছিল; আর অপরদিকে মদীনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত করছিল। কেননা, তারা জানতে পারল যে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং সাহাবীদের পরিবার-পরিজনবর্গ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু অবরোধকারীরা খন্দক অতিক্রম করতে না পেরে দূর হতে তীর ও পাথর নিক্ষেপ করছিল। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খন্দকের বিভিন্ন অংশে সৈন্য ভাগ করে দিয়েছিলেন। তাঁরা অবরোধকারীদের আক্রমণ প্রতিহত করছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজেই এক অংশের ভার গ্রহণ করেছিলেন।

অবরোধের কঠোরতা দেখে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) চিন্তা করলেন যে এতে আনসারদের মনোবল না আবার ভেঙে পড়ে। তাই তিনি গাত্ফানদের সঙ্গে এ মর্মে সন্ধি করতে চাইলেন যে মদীনার উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ তাদেরকে দিয়ে দেয়া হবে। হযরত সা'দ ইবনে উবাদা এবং হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায নামস দুজন আনসার সরদারকে ডেকে তিনি তাদের পরামর্শ চাইলেন। উভয়ে আরয করলেন, যদি এটা আল্লাহ্র হুকুম হয়, তাহলে অস্বীকার করার উপায় নেই; কিন্তু যদি কারও রায় বা ব্যক্তিগত অভিমত হয়ে থাকে, তাহলে কুফর অবস্থায়ও আমাদের কাছে কেউ রাজস্ব চাইতে সাহস করেনি, আর এখন তো ইসলাম আমাদের মর্যাদা অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

তাদের দৃঢ়তা দেখে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আশ্বস্ত হলেন। হযরত সা'দ চুক্তিনামার কাগজখানা হাতে নিয়ে লাইনগুলো সব মুছে ফেললেন[৩] এবং বললেন, তারা যা করতে চায়, করতে দিন।

---

১. সহীহ্ বোখারী, গাযওয়ায়ে আহ্যাব। সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল। তবে ইবনে হিশামে এ স্থানে হযরত হোযাইফা ইবনে ইয়ামানের নাম রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার এবং যারকানী প্রমাণ করেছেন যে, অবরোধকারীদের মধ্যে কোরাইশদের সন্ধানে হযরত হোযাইফা এবং বনূ কুরাইযাদের সন্ধানে হযরত যুবাইর গিয়েছিলেন।— ফতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, পৃঃ-৩১২। যারকানী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৮।

২. আরবদের অভ্যাস ছিল যে, কঠিন ক্ষুধায় তারা পেটে পাথর বাঁধত, যাতে কোমর বেঁকে না যায়।— শামায়েলে তিরমিযী।

৩. তাবারী, পৃঃ ১৪৭৪।

এবার মুশরেকরা আক্রমণের প্রস্তুতি হিসাবে কোরাইশদের নাম করা সেনাপতি যথা, আবু সুফিয়ান, খালেদ ইবনে অলীদ, আমর ইবনে আস, যারার ইবনে খাত্তাব, জুবাইরা প্রমুখ এক একদিন নির্দিষ্ট করে নিল। প্রত্যেক সেনাপতি তার নির্ধারিত দিনে সমস্ত সৈন্যসহ যুদ্ধ করবে। তারা খন্দক অতিক্রম করতে পারছিল না। কিন্তু খন্দকের প্রস্থ অধিক ছিল না বলে তারা তীর ও পাথর নিক্ষেপ করছিল।

এ ব্যবস্থায় কৃতকার্য না হতে পেরে অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হল যে এবার ব্যাপকভাবে আক্রমণ করা হবে। সকল সৈন্য একত্রিত হল। সরদাররা ছিল অগ্রভাগে। ঘটনাক্রমে খন্দক এক স্থানে একটু কম প্রশস্ত ছিল এবং এ স্থান দিয়েই আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল।

আরবের বিখ্যাত বীরগণ যথা যারার, জুবাইরা, নওফেল ও আমর ইবনে আবদে উদ্দ খন্দকের এক প্রান্ত থেকে ঘোড়া হাঁকিয়ে অপর প্রান্তে গিয়ে উঠল। আমর ইবনে আবদে উদ্দ ছিল তাদের মধ্যে বেশ শক্তিশালী। তাকে এক হাজার ঘোড়সওয়ারের সমতুল্য মনে হত। আমর বদরের যুদ্ধে আহত হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে "যতদিন এর প্রতিশোধ গ্রহণ না করতে পারব, ততদিন মাথায় তেল দেব না।" তখন তার বয়স ছিল নব্বই বছর। প্রথমে আমর এগিয়ে এসে আরবের প্রথা অনুযায়ী হাঁক দিল, "কে আছ, আমাকে বাধা দান করার মত?" হযরত আলী (রাঃ) উঠে বললেন, "আমি আছি।" হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "এ সেই আমর ইবনে আবদে উদ্দ!" হযরত আলী বসে পড়লেন। আমরের ডাকে কেউ সাড়া দিলেন না। আমর আবার হাঁক দিল, কিন্তু এবারও সেই একই আওয়ায উচ্চারিত হল। তৃতীয়বার যখন হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন যে "এ সেই আমর ইবনে আবদে উদ্দ" তখন হযরত আলী (রাঃ) বললেন, "হ্যাঁ, তাকে আমি চিনি, এই সে আমর।" হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) অবশেষে তাঁকে অনুমতি দিলেন। নিজের হাতে তাঁকে তলোয়ার তুলে দিলেন এবং মাথায় পাগড়ি বেঁধে দিলেন।

আমরের বক্তব্য ছিল, দুনিয়ার কেউ যদি তাকে তিনটি বিষয়ে প্রার্থনা করে, তার মধ্যে সে অন্তত একটি নিশ্চয়ই পূর্ণ করবে। হযরত আলী বললেন, এটা কি সত্যই তোমার কথা। তারপর নিম্নোক্ত কথাবার্তা হল।

হযরত আলী (রাঃ) ঃ আমি নিবেদন করছি যে তুমি ইসলাম গ্রহণ কর।

আমর— এটা কখনও হতে পারে না।

হযরত আলী— যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে যাও।

আমর— আমি কোরাইশ মহিলাদের ভর্ৎসনা শুনতে পারব না।

হযরত আলী— আমার সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।

একথা শুনে আমর হেসে বলল, আমার ধারণা ছিল না যে আকাশের নিচে কেউ আমাকে এমন কথাও বলতে পারবে। হযরত আলী (রাঃ) পদাতিক ছিলেন বলে আমর ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এল এবং তলোয়ারের আঘাতে প্রথমত ঘোড়ার পা কেটে ফেলল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কে?" হযরত আলী নাম বললেন। আমর বলল, "আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই না।" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তবে আমি চাই।" আমর তা শুনে রাগে গর্জে উঠল এবং তলোয়ার কোষমুক্ত করে এগিয়ে এসে আঘাত হানল। হযরত আলী (রাঃ) ঢাল দ্বারা তা প্রতিহত করলেন। কিন্তু ঢাল কেটে তলোয়ার তাঁর কপালে গিয়ে লাগল। আঘাত যদিও সামান্য ছিল, কিন্তু এ চিহ্ন তাঁর ললাটদেশে একটি স্মরণীয় চিহ্ন হয়ে রয়ে গিয়েছিল।

কামুসে লিখিত আছে যে হযরত আলী (রাঃ)-কে যুল কারনাইনও বলা হত, যেহেতু তাঁর কপালে দুটি ক্ষত চিহ্ন ছিল, একটা আমর কর্তৃক এবং অপরটি ইবনে মুলজেম কর্তৃক।

শত্রুর আক্রমণের পর এবার হযরত আলী(রাঃ) আক্রমণ করলেন। তলোয়ারের আঘাতে আমরের একটি বাজু কেটে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে উঠলেন এবং বিজয় ঘোষণা করলেন। আমরের পর যারার এবং জুবাইরা উভয়ে ময়দানে এল। কিন্তু যুলফিকারের সেই অজেয় বাহু উর্ধ্বে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তারা পিছনে হটতে আরম্ভ করল। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) যারারের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। যারার ঘুরে তাঁকে বর্শায় বিদ্ধ করতে চাইল, কিন্তু আবার ক্ষান্ত হয়ে বলল, "ওমর (রাঃ)! এ অনুগ্রহের কথা স্মরণ রেখো।"

নওফেল দৌড়াতে দৌড়াতে খন্দকের মধ্যে পড়ে গেল। সাহাবিগণ তীর নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করলেন। নওফেল বলল, "হে মুসলমানগণ! আমি মর্যাদার মৃত্যু কামনা করছি।" হযরত আলী তার আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং খন্দকে নেমে তলোয়ারের আঘাতে তার মস্তক ছিন্ন করে দিলেন।[১]

তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। সারাদিন যুদ্ধের ময়দান সরগরম রইল। কাফেররা চার দিক থেকে তীর ও পাথর নিক্ষেপ করছিল। যুদ্ধ বিরতির কোন লক্ষণই ছিল না। এ যুদ্ধেই হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যায়।[২] যেহেতু বিরামহীন তীর নিক্ষেপ ও পাথর বর্ষণের কারণে স্থানচ্যুত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাই যথাসময়ে নামায আদায় করা সম্ভব হয়নি।

১. এ ঘটনা অবশ্য সংক্ষিপ্তভাবে সকল গ্রন্থেই রয়েছে, তবে আমরা যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছি, তা ইবনে সা'দ ও খামীস হতে গ্রহণ করা হয়েছে।

২. এ বিষয়ে মুহাদ্দেসগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে যে, চার ওয়াক্ত নামাযই কাযা হয়েছিল, না এক ওয়াক্ত। আর চার ওয়াক্ত কাযা হলে তা কি একই দিনে, না কয়েক দিনে।

বনূ কুরাইযাদের আবাসভূমির সংলগ্ন একটি দুর্গে মুসলমান মহিলাদের রাখা হয়েছিল। মুসলমানেরা হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নেতৃত্বে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করেছেন ভেবে ইহুদীরা দুর্গটি আক্রমণ করে বসল। জনৈক ইহুদী দুর্গের ফটকে গিয়ে আক্রমণের পথ খুঁজছিল। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ফুফু হযরত সাফিয়া (রাঃ) লোকটিকে দেখতে পেলেন এবং দুর্গ রক্ষণাবেক্ষণে রত হযরত হাসসানকে (কবি) বললেন, "লোকটিকে হত্যা করুন, নতুনা সে ফিরে গিয়ে শত্রপক্ষকে সব জানিয়ে দেবে।"

হযরত হাস্‌সানের একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল, যাতে তিনি এমন ভীত হয়ে পড়েছিলেন যে নিজের চোখে তিনি কোন যুদ্ধবিগ্রহ দেখতে পারতেন না। এ কারণে তিনি তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। হযরত সাফিয়া তাঁবুর একটি খুঁটি উপড়ে নিজেই ইহুদীর মাথায় এমন জোরে আঘাত করলেন যে তার মাথা ফেটে রক্ত বইতে লাগল। তিনি ফিরে এসে হাস্‌সানকে ইহুদীর সাজসজ্জা খুলে আনতে বললেন, কিন্তু হযরত হাস্‌সান তাতেও অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। হযরত সাফিয়া অবশেষে বললেন, "আচ্ছা! তার মাথাটি কেটে বাইরে ফেলে দিন", সেটি দেখে ইহুদীরা ভয় পেয়ে যাবে। কিন্তু তাও তাঁর দ্বারা সম্ভব হল না। অবশেষে হযরত সাফিয়া নিজেই এ কাজ সমাধা করলেন। ইহুদীরা বুঝতে পারল যে দুর্গে নিশ্চয়ই সৈন্য মোতায়েন রাখা হয়েছে। অতঃপর তারা আর দুর্গ আক্রমণের সাহস পেল না।[১]

অবরোধের দিন যত বাড়তে লাগল, অবরোধকারীদের সাহস ও বল-ভরসা ততই বিনষ্ট হতে লাগল। দশ হাজার সৈন্যের খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করা সহজ ব্যাপার ছিল না। এতদ্ব্যতীত তখন ছিল শীতকাল। তারই মাঝে এক সময়ে এমন প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হলে লাগল যে তাদের খাদ্যের ডেগ পর্যন্ত চুলার উপর থেকে উল্‌টে পড়ে যেতে লাগল এবং তাঁবুর দড়ি, খুঁটি ছিঁড়ে উপড়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে লাগল। মুসলমানদের জন্য এ ঝঞ্ঝাপ্রবাহ সৈন্য অপেক্ষাও অধিক ফলপ্রদ হল। কোরআন মজীদে এ ঘূর্ণিঝড়কে "আল্লাহর সৈন্য" বলে অভিহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

"হে মুমেনগণ! আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর। যখন তোমাদের উপর (কাফের) বাহিনী আক্রমণ করল, তখন আমি তাদের উপর ঘূর্ণিঝড় অবতীর্ণ করলাম এবং এমন এক ধরনের সৈন্য পাঠালাম, যাদের তোমরা দেখতে পাচ্ছিলে না।"—(আহ্‌যাব-২)

১. যারকানী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৯।

নায়ীম ইবনে মসউদ আশ্‌জায়ী নামে গাত্‌ফান গোত্রের এক সরদার ছিলেন। কোরাইশ ও ইহুদী উভয় সম্প্রদায় তাঁকে মান্য করত। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু সে সংবাদ কারোরই জানা ছিল না। তিনি পৃথকভাবে কোরাইশ ও ইহুদীদের মধ্যে গিয়ে এমন সব কথাবার্তা বললেন, যাতে তাদের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব বেধে গেল।

ইবনে ইসহাক বর্ণিত হাদীসে আছে যে নায়ীম হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শিক্ষা "যুদ্ধে প্রতারণা বিধেয়" (الحرب خدعة।) অনুযায়ী কোরাইশ ও ইহুদীদের মধ্যে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তবে ইবনে ইসহাক এ হাদীসের সনদ বর্ণনা করেননি। আর যদি করতেন তবুও শুধু তাঁর সনদ অনুযায়ী এমন একটি ঘটনা বিশ্বাস করার উপায় ছিল না। এতদ্ব্যতীত কোন প্রকার মিথ্যা কথা বা প্রতারণা না করলেও অন্যান্য ঘটনাপ্রবাহ একটির পর একটি এমনভাবে ঘটে চলেছিল, যাতে এ বিশাল কাফের বাহিনীর মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার কোন উপায় আর ছিল না।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় আছে যে নায়ীম ইহুদীদের কাছে গিয়ে বললেন, কোরাইশরা তো দু'চার দিন পরেই এখান থেকে চলে যাবে, তোমরা ও মুসলমানরা এখানে একত্রে বসবাস করবে। অতএব, কেন চিরকালের জন্য একটা অহেতুক কলহ খরিদ করছ? আর যদি তোমরা সেই অবশ্যম্ভাবী কলহের জন্য প্রস্তুতই থাক, তাহলে কোরাইশদের বল, তারা কয়েকজন সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোক তোমাদের কাছে জামিনস্বরূপ রাখুক। যদি তারা যুদ্ধের কোন মীমাংসা না করে চলে যেতে চায়, তাহলে তোমরা তাদেরকে আটকে রাখবে।

একথাও সত্য যে বনূ কোরাইযা গোত্র প্রথম প্রথম মুসলমানদের সঙ্গে পূর্বকৃত চুক্তি ভঙ্গ করতে ইতস্তত করেছিল। কিন্তু হুয়াই ইবনে আখ্‌তাব তাদের এ বলে রাজী করিয়েছিল যে কোরাইশরা যদি চলে যায়, তাহলে আমি খায়বার ছেড়ে তোমাদের এখানে চলে আসব। কোরাইশদের পক্ষে অবশ্য এ ধরনের জামিন রাখার প্রস্তাব গ্রহণ করা ছিল নিতান্তই অসম্মানজনক। অতএব, যখন তারা এ প্রস্তাবে সম্মত হতে অস্বীকার করত, তখনই উভয় দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব অপরিহার্য হয়ে উঠত। সুতরাং একজন সাহাবীর মিথ্যা বলা বা প্রতারণা করার প্রয়োজনই পড়ে না।[১]

---

১. গ্রন্থকারের এ উক্তির সমর্থনে মুসা ইবনে আকাবার হাদীস উল্লেখযোগ্য। যা ইবনে কাসীর তাঁর ইতিহাসে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বনূ কুরাইযারা কোরাইশদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের জামিনের শর্তে যুদ্ধে যোগদান করেছিল। তাদের এ শর্ত পূরণ না করার কারণে কোরাইশদের বিরুদ্ধে তাদের মনে অবিশ্বাসের সৃষ্টি হল এবং গোপনে তারা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর নিকট সংবাদ পাঠাল যে খায়বরে নির্বাসিত বনূ কোরাইযাদের পুনরায় মদীনায় আসার অনুমতি দেয়া হোক। নায়ীম ইবনে মাসউদ সাকাফী এ সময় প্রথম ইসলাম গ্রহণের জন্য এসেছিলেন। তিনি প্রকৃতিগতভাবে একটু হাল্কা ধরনের লোক ছিলেন এবং কোন কথা তাঁর পেটে জমা থাকত না। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর নিকট হতে বনূ কোরাইযাদের এ সন্ধির কথা শুনে কোরাইশদের নিকট গিয়ে তা তিনি প্রকাশ করে দেন। এতে বনূ কোরাইযাদের বিরুদ্ধে কোরাইশদের মনে অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয় এবং এভাবেই কোরাইশ ও বনূ কোরাইযাদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটে, যা পরে তাদের চুক্তির বাঁধন কেটে দেয়। ইবনে কাসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ-১১৩।

যাহোক, শীতের প্রচণ্ডতা, অবরোধের দীর্ঘতা, ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ, ইহুদীদের প্রতারণামূলক আচরণ প্রভৃতি ঘটনা একটির পর একটি এমনভাবে এসে একত্রিত হল যে কোরাইশদের সেখানে টিকে থাকার আর কোন উপায়ই ছিল না। আবু সুফিয়ান সৈন্যদের বললেন, রসদপত্র শেষ হয়ে গেছে, মওসুমের এ অবস্থা, তদুপরি স্থানীয় ইহুদীদের দোদুল্যমান অবস্থা, এ অবস্থায় আর অবরোধ রাখা যায় না। এ বলে তিনি প্রস্থানের আদেশ দিলেন। গাত্ফানরাও তাদের সঙ্গে প্রস্থান করল। বনূ-কোরাইযারাও তাদের নিজেদের দুর্গে আশ্রয় নিল। দীর্ঘ ২০/২২ দিন মদীনার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার পর আবার পরিষ্কার হয়ে গেল। আল্লাহ্ বলেন ঃ

"আল্লাহ্ পাক ক্রোধান্ধ কাফেরদের ফিরিয়ে দিলেন। তাদের কোন ফল লাভ হল না এবং আল্লাহ্ পাক মুসলমানদের যুদ্ধের সম্মুখীন হতে দিলেন না।"—(আহ্যাব-৩)

এ যুদ্ধে মুসলমানদের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কম হয়েছিল সত্য, কিন্তু আনসারদের ডান হাতটি ভেঙে দিয়েছিল। অর্থাৎ, আওস সরদার হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায এ যুদ্ধে আহত হয়ে অবশেষে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর আহত হওয়ার ঘটনাটি ছিল বড়ই হৃদয়বিদারক।

হযরত আয়েশা (রাঃ) যে দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন, হযরত সা'দ ইবনে মুয়াযের মাতাও সে দুর্গে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি দুর্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, এমন সময় পেছন দিকে কারো পদশব্দ শুনে চমকে উঠলাম। তাকিয়ে দেখলাম, হযরত সা'দ বর্শা হাতে বীরত্বের সঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং আবৃত্তি করছেনঃ

"ক্ষণিক দেরি কর, যুদ্ধে একজন অংশগ্রহণ করুক। সময় এলে মৃত্যুর ভয় কিসের?"[১]

হযরত সা'দ-এর মাতা একথা শুনে ডেকে বললেন, বৎস, দৌড়ে যাও, তুমি দেরি করে ফেলেছ। হযরত সা'দের বর্মটি এত ছোট ছিল যে তার দু'খানা হাতই বাইরে ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত সা'দের মাতাকে বললেন, আহা! যদি সা'দের বর্মটি আর একটু লম্বা হত!

এদিকে ইবনে আরাফা নামক এক শত্রুসৈন্য তাক করে হযরত সা'দের খোলা হাতে তীর বিদ্ধ করিয়ে দিল। এতে তাঁর হাতের প্রধান শিরাটি কেটে গেল। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খন্দক হতে ফিরে এসে তাঁর জন্য মসজিদের প্রাঙ্গণে

১. ইবনে হিশাম, তাবারী এবং খামীস।

একটি তাঁবু খাটিয়ে দিয়ে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন।[১] এ যুদ্ধে রাফিদা নাম্নী জনৈক মহিলাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সর্বদা ওষুধপত্র থাকত এবং তিনি আহতদের চিকিৎসার কাজ করতেন। হযরত সা'দের চিকিৎসার ভারও তাঁর উপর ন্যস্ত হল। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বহস্তে তাঁর ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে সহায়তা করলেন, কিন্তু কোনই ফললাভ হল না। কয়েকদিন পর বনূ-কোরাইযাদের উৎখাতের পর তিনি ইন্তেকাল করলেন।

বনূ কোরাইযাদের উৎখাত

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় আগমন করে প্রথমত, ইহুদীদের সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং এতে তাদের জানমাল ও ধর্মকর্ম প্রভৃতির নিরাপত্তা ও পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়। কিন্তু কোরাইশরা যখন তাদের লোভ ও ভয় দেখিয়ে পত্র লিখল, তখন তারা চুক্তি ভংগ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে তৎপর হয়ে ওঠে। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের সঙ্গে নতুনভাবে চুক্তি করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু বনূ-নাযীর তাতে অস্বীকৃতি জানাল এবং তাদের নির্বাসিত করা হল। অবশ্য বনূ-কোরাইযাগণ নতুন চুক্তি করে নিল।[২] এবং মুসলমানদের তরফ থেকে তাদের পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়া হল।

সহীহ্ মুসলিম শরীফে এ ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে বনূ নাযীর ও কোরইযার ইহুদীরা হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বনূ নাযীরকে নির্বাসনদণ্ড দান করেন এবং বনূ কোরাইযাকে (মদীনায়) অবস্থান করতে দেন ও তাদের উপর সদয় হন।"

বনূ নাযীরদের নির্বাসনের পর তাদের বড় বড় সরদারগণ যেমন, হুয়াই ইবনে আখ্তাব, আবু রাফে, সালাম ইবনে ওয়ায়েল হাকীক প্রমুখ খায়বরে গিয়ে বসবাস স্থাপন করে এবং সেখানে যথেষ্ট প্রভাব অর্জন করতে সমর্থ হয়।

১. এ বর্ণনা খামীস হতে বর্ণিত হয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজর ইসাবা'তে ইমাম বোখারীর 'আদাবুল মুফরাদ' হতে বর্ণনা করেছেন যে রাফিদা একজন চিকিৎসক ছিলেন এবং হযরত সা'দ (রাঃ) তাঁরই তত্ত্বাবধানে চিকিৎসিত হচ্ছিলেন। ইবনে সা'দ রাফিদার বিবরণে লিখেছেন, মসজিদের সংলগ্ন তাঁর একটি তাঁবু ছিল। তিনি সেখানে রোগী ও আহতদের চিকিৎসা করতেন। সহীহ্ বোখারী শরীফেও রাফিদার তাঁবু ও তাঁর চিকিৎসালয়ের কথা উল্লেখ রয়েছে।

২. ওয়াকেদী, হুয়াই ইবনে আখতাবের ভাষায় বনূ কোরাইযাদের এ চুক্তির ঘটনাকে তাদের ষড়যন্ত্রমূলক কাজ বলে বর্ণনা করেছেন। হুয়াই ইবনে আখতাব বলেছেন, তারা পুনরায় এ জন্য চুক্তি নবায়ন করেছিল যে সুযোগ পেলেই কাফেরদের সাথে মিলিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করবে।—নাসায়ী, ওয়াকেদী, পৃঃ ৩৬২।

খন্দকের যুদ্ধ তাদেরই চেষ্টার ফল। তারাই আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকদের হাত করে এবং বিশেষ করে কোরাইশদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মদীনা আক্রমণ করে। বনূ-কোরাইযাগণ তখনও মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল; কিন্তু হুয়াই ইবনে আখ্তাব তাদের বিভ্রান্ত করে চুক্তিভঙ্গে প্ররোচিত করে এবং অংগীকার করে যে আল্লাহ্ না করুন যদি কোরাইশরা যুদ্ধ ক্ষান্ত দিয়ে চলে যায়, তাহ্লে আমি খায়বার ছেড়ে তোমাদের এখানে এসে বসবাস করব। শেষ পর্যন্ত হুইয়া তার সে অঙ্গীকার পূরণ করল।

বনূ কোরাইযাগণ প্রকাশ্যে খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।[১] তারা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যখন ফিরে আসে, তখন চুক্তিমত হুইয়া ইবনে আখ্তাবকেও সংগে নিয়ে আসে।

এদিকে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খন্দক হতে প্রত্যাবর্তন করে কাউকেও অস্ত্র না খুলতে নির্দেশ দিলেন এবং বনূ কোরাইযাদের দিকে এগিয়ে যেতে বললেন। যেহেতু তাদের সঙ্গে একটি চূড়ান্ত মীমাংসা না করে আর থাকার উপায়ও ছিল না। বনূ-কোরাইযারা যদি কোন আপোস-মীমাংসায় রাজী হত তাহলে হয়ত উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও জরিমানার পর তাদের পুনরায় নিরাপত্ত দেয়া হত, কিন্তু তারা মুসলমানদের উপর আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করছিল। হযরত আলী (রাঃ) যখন তাদের দুর্গের নিকট উপস্থিত হলেন, তখন তারা প্রকাশ্যে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে গালি দিতে আরম্ভ করল।

অবশেষে তাদের দুর্গ অবরোধ করা হল। এক মাস অবরোধের পর তারা আবেদন করল যে হযরত সা'আদ ইব্নে মুয়াযের বিচার তারা মেনে নেবে।

হযরত সা'আদ ইবনে মুয়ায এবং তাঁর গোত্র (আউস) বনূ কোরাইযাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিল। এ গোত্রীয় চুক্তি আরবদের নিকট রক্তের সম্পর্কের চাইতেও অধিক ঘনিষ্ঠ ও মূল্যবান বলে বিবেচিত হত। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন।

কোরআন মজীদে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিশেষ আদেশ না হত ততক্ষণ হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব তওরাত, ইঞ্জিল প্রভৃতির নির্দেশাবলী অনুসরণ করতেন। যেমন, নামাযের কেবলা (দিক), ব্যভিচারের শাস্তি হিসাবে

১. স্যার উইলিয়াম ম্যুর ঐতিহাসিকগণের এ উক্তি স্বীকার করেন না যে বনূ কোরাইযাগণ এ যুদ্ধে কোন কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল। তাঁর দলিল হল, যদি তাই হত তাহলে কোরআন মজীদে যেখানে গোত্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে তাদের নামও নিশ্চয়ই প্রকাশ করা হত। কিন্তু কোরআনে পরিষ্কার আয়াত রয়েছে—

"আর আহ্লে কিতাবগণও প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হল।" কোরআনে উল্লিখিত "প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচারণ" কথাটি যেখানে ব্যক্ত হয়েছে সেখানে আর কোন যুক্তির অবকাশ কোথায়?

প্রস্তরাঘাতে হত্যা, কেসাস (মৃত্যুদণ্ড) ইত্যাদি সম্বন্ধে যতদিন পর্যন্ত কোন ওহী অবতীর্ণ হয়নি, ততদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তওরাতের অনুসরণ করছিলেন। হযরত সা'আদ (রাঃ) ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ অনুসরণ করেই নির্দেশ দিলেন যে যারা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকে হত্যা করতে হবে, মহিলা ও শিশুরা বন্দী হবে, মাল-সম্পদ যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হবে।[১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে যুদ্ধনীতি সম্পর্কে তওরাতে সুস্পষ্ট বলা আছে যে "যখন তুমি কোন শহর আক্রমণ করতে যাও, তখন প্রথমেই সন্ধির প্রস্তাব দেবে। যদি তারা সন্ধিচুক্তি মেনে নেয় এবং তোমার জন্য দরজা খুলে দেয়, তাহলে যত লোকই সেখানে আছে সবাই তোমার দাস হয়ে যাবে। যদি সন্ধি না করে, তাহলে তাদের অবরোধ কর এবং তোমার প্রভু যখন তোমাকে বিজয় দান করবেন, তখন সেখানকার সকল পুরুষকে হত্যা কর, মহিলা, শিশু, জীবজন্তু এবং শহরের যা কিছু আছে সবই তোমার জন্য মালে-গণীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) হবে।"

হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত সা'আদ যখন এ মীমাংসা করলেন, তখন হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, "তুমি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ীই বিচার করলে।" একথা দ্বারা তওরাতের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইহুদীদের কানে যখন এ বিচারের সংবাদ গেল, তখন তাদের মুখ দিয়ে যে বাক্য বেরিয়েছিল তাতেও প্রমাণিত হয় সে তারা এ বিচারকে আল্লাহ্র বিচারের অনুরূপই মনে করত।

সকল ষড়যন্ত্রের চাবিকাঠি হুইয়াই ইবনে আখতাবকে তার প্রাপ্য বিচারের জন্য উপস্থিত করা হলে যে প্রথমে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,

"হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম, আমার কোন অনুশোচনা নেই যে আমি কেন আপনার শত্রুতা করেছি। তবে কথা হল, যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ছেড়ে দেয় আল্লা তা'আলাও তাকে পরিত্যাগ করেন।

অতঃপর জনতার দিকে তাকিয়ে সে বলতে লাগল,[২]

১. সহীহ্ মুসলিম ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৭ এবং সহীহ্ বোখারী শরীফেও এ ঘটনা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। মার্গুলস সাহেব বলেছেন, " হযরত সা'আদ ইবনে মুয়ায এ যুদ্ধে জনৈক কোরাইযার হাতে তীরবিদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাতে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। এ কারণে তিনি বনূ কোরাইযাদের উপর এমন নির্দয় ও কঠোর বিচার করেছিলেন।" কিন্তু আসলে সে তীর নিক্ষেপকারী ছিল একজন কোরাইশী, কোরাইযী নয়। সহীহ্ বোখারী ও সহীহ্ মুসলিম শরীফে পরিষ্কারভাবে এর উল্লেখ রয়েছে।

২. উপরোক্ত বর্ণনা দুটি ইবনে হিশামে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাবারীতেও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

"হে আমার স্বগোত্রীয়গণ! আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করলে কোন ক্ষতি নেই। এটা আল্লাহ্‌র একটি আদেশ, যা লিপিবদ্ধ ছিল। এটা একটা শাস্তি, যা আল্লাহ্ পাক বনী-ইসরাঈলদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছিলেন।"

হুইয়া ইবনে আখ্‌তাব সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে যখন সে নির্বাসিত হয়ে খায়বারে যাচ্ছিল, তখন প্রতিজ্ঞা করেছিল যে কখনো সে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শত্রুদের সাহায্য করবে না।[1] এ প্রতিজ্ঞার ব্যাপারে সে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করেছিল। কিন্তু খন্দক যুদ্ধে সে যেভাবে ওয়াদা ভঙ্গের পরিচয় দিয়েছিল, তা আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই।

বনূ-কোরাইযাদের সম্পর্কে ইসলামের শত্রুপক্ষ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন যে তাদের উপর নির্মম অত্যাচার করা হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত ঘটনাপ্রবাহের প্রতি লক্ষ্য করা দরকার।

(১) হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় আগমন করেই তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব চুক্তি সম্পাদন করেন। যাতে তাদের ধর্মের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয় এবং জানমালের নিরাপত্তারও পূর্ণ ব্যবস্থা করা হয়।

(২) বনূ কোরাইযা পদমর্যাদায় বনূ নাযীর অপেক্ষা নিম্নস্তরে ছিল। অর্থাৎ বনূ-নাযীরদের কোন লোক যদি বনূ কোরাইয়ার কোন লোককে হত্যা করত, তাহলে তাদের মাত্র অর্ধেক রক্তপণ পরিশোধ করতে হত। কিন্তু বনূ কোরাইযাকে পূর্ণ রক্তপণ পরিশোধ করতে হত। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বনূ কোরাইযাদের মান উন্নয়ন করে বনূ নাযীরদের সমান মর্যাদায় উন্নীত করেছিলেন।[2]

(৩) হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বনূ নাযীরদের নির্বাসনদণ্ড দেয়ার সময় বনূ-কোরাইযাদের সঙ্গে পুনরায় নতুনভাবে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

(৪) এতদূর করা সত্ত্বেও তারা চুক্তিভঙ্গ করে এবং খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

(৫) রসূল পরিবারকে নিরাপত্তার জন্য দুর্গে পাঠানো হয়, কিন্তু দুর্বৃত্তরা তাঁদের উপরও আক্রমণের চেষ্টা করে।

(৬) হুইয়াই ইবনে আখ্‌তাব যাকে পূর্বেই বিদ্রোহের শাস্তিস্বরূপ নির্বাসিত করা হয়েছিল এবং যার প্রচেষ্টাতেই আরব গোত্রসমূহ সংঘবদ্ধ হয়ে খন্দকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল তাকে কোরাইযা গোত্রীয়রা পুনরায় ডেকে আনে।

বনূ কোরাইযাদের এসব প্ররোচনামূলক কার্যকলাপের পরও তাদের সঙ্গে আর কি ধরনের ব্যবহার সম্ভব ছিল?

১. বালাজুরী, ইউরোপে প্রকাশিত পৃঃ-২২।
২. আবু দাউদ, ২ খণ্ড।

এখানে স্মরণযোগ্য যে চুক্তিবদ্ধ দুটি আরব গোত্রের মধ্যে রক্তের সম্পর্কের চেয়ে অধিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য থাকত। বনূ কোরাইযারা আনসারদের (আউস) সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। আনসারগণ সবাই মিলে তাদের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। হযরত সা'আদ ইবনে মুয়ায (রাঃ) আউস গোত্রের সরদার ছিলেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই ছিলেন এ চুক্তির উদ্যোক্তা। তিনি বনূ-কোরাইযার বিচারের দায়িত্ব লাভ করে প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি একটি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। আবহমানকাল থেকে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ একটি গোত্র জীবন মরণের সম্মুখীন, এতদ্ব্যতীত সমস্ত আনসারের সম্মিলিত সুপারিশ, কিন্তু হযরত সা'আদ এ বিচার ছাড়া তাদের জন্য আর কোন উপায় উদ্ভাবন করতে পারলেন না।

ঐতিহাসিকগণ নিহতের সংখ্যা ছয়শতেরও অধিক ছিল বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহে তাদের সংখ্যা চারশ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে মাত্র একজন ছিল মহিলা। তাকে রক্তপণ হিসাবে হত্যা করা হয়। দুর্গের উপর থেকে পাথর ছুঁড়ে সে জনৈক মুসলমানের প্রাণ বধ করেছিল। মহিলার জীবন দানের বীরত্বপূর্ণ ঘটনা সুনানে আবু দাউদে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে।

মহিলাটির জানা ছিল যে প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নামের তালিকায় তার নামও রয়েছে। দণ্ডপ্রাপ্তদের বধ্যভূমিতে এনে হত্যা করা হচ্ছিল। একজনের পর আর একজনের নাম ডাকা হচ্ছিল এবং মহিলাটি গভীর মনোযোগ সহকারে তা শুনছিল আর উপর দিকে মুখ তুলে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। কথায় কথায় সে হাসছিল, আনন্দ করছিল। হঠাৎ জল্লাদ যখন তার নাম ধরে ডাক দিল, তখন মহিলাটি হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল। হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ দিকে? মহিলা উত্তরে বলল, আমি একটি পাপ করেছি, তারই শাস্তি গ্রহণ করতে যাচ্ছি। অতঃপর হৃষ্টচিত্তে সে বধ্যভূমিতে এসে তলোয়ারের নিচে মাথা রাখল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) ঘটনাটি যখন বর্ণনা করতেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিস্ময়াভিভূত হতেন।

রায়হানা সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের অনেকেই মন্তব্য করেছেন যে বনূ কোরাইযার বন্দীদের মধ্যে রায়হানা নাম্নী এক ইহুদী মহিলাকে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) আলাদা করে রাখার নির্দেশ দেন এবং কয়েকদিন পর তাকে অন্তঃপুরে নিয়ে যান। তাঁদের মতে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এসব যুদ্ধবন্দী দাসীদের সঙ্গে সহবাস করতেন। তাঁরা রায়হানা ও মারিয়া কিবতিয়া নাম্নী দুই মহিলার উদাহরণ উপস্থাপিত করেছেন। কোন কোন খৃষ্টান ঐতিহাসিক এ ঘটনাকে অত্যন্ত জঘন্য ভাষায় বর্ণনা করেছে। জনৈক ঐতিহাসিক অকথ্য ভাষায় লিখেছেন যে ইসলামের প্রবর্তক যখন শত শত ইহুদী লাশের মৃত্যুর দৃশ্য দেখলেন, তখন ঘরে ফিরে মন-তুষ্টির জন্য........।" কিন্তু আসলে ঘটনাটি আগাগোড়াই মিথ্যা, উর্বর-মস্তিষ্ক বিদ্বেষপরায়ণদের সাজানো কাহিনী মাত্র।

রায়হানার অন্দরে প্রবেশের যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সব কয়টিই ওয়াকেদী অথবা ইবনে ইসহাক থেকে গৃহীত হয়েছে। ওয়াকেদী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) রায়হানাকে বিয়ে করেছিলেন। ইবনে সা'আদ ওয়াকেদী থেকে যে বর্ণনা করেছেন তাতে স্বয়ং রায়হানার বক্তব্যও তুলে ধরা হয়েছে।

"হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে মুক্ত করে দেন এবং পরে বিয়ে করেন।"

হাফেয ইবনে হাজার 'ইসাবা' গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে হাসান রচিত মদীনার ইতিহাসে যে বর্ণনা রয়েছে তা থেকে এ বাক্যটি তুলে ধরেছেন ঃ

"কোরাইযা বংশীয় রায়হানা যিনি হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পত্নী ছিলেন, তিনি এ ঘরে অবস্থান করতেন।"

হাফেয ইবনে মান্দা রচিত এবং পরবর্তীকালে মোহাদ্দেসগণের যাবতীয় বর্ণনার সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসস্থল হিসাবে বিবেচিত, 'তবকাতে সাহাবা' গ্রন্থে লেখা হয়েছে,[১]

"রায়হানাকে বন্দী করা হয় এবং পরে মুক্তি দেয়া হয়। তিনি তাঁর গোত্রে ফিরে যান এবং সেখানে মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপন করতে থাকেন।"

হাফেয ইবনে মান্দার বর্ণনায় স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে মুক্ত করে দেন এবং তিনি নিজের পরিবারে ফিরে গিয়ে পরিপূর্ণ মর্যাদায় জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন।

---

১. ইসাবা ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩০৯।

আমাদের নিকট সত্য ঘটনা হল, যদি একথা স্বীকারও করে নেয়া হয় যে তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর অন্তঃপুরে আগমন করেছিলেন তাহলে তিনি নিশ্চিতভবে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েই এসে থাকবেন, দাসী হিসাবে নয়।[১]

হযরত যয়নাবের সঙ্গে বিয়ে

হিজরীর ৫ম সালে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত যয়নাবকে বিয়ে করেন। বিয়ে একটি সাধারণ ব্যাপার এবং এর বর্ণনা হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিবিগণ শীর্ষক অধ্যায়ে হওয়া উচিত। কিন্তু এ বিয়ে ইসলামের শত্রুদের কাছে একটি মুখরোচক ঘটনা হয়ে দেখা দেয়। খৃষ্টান ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনাকে বেশ রং চং লাগিয়ে বর্ণনা করেছেন এবং হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে জঘন্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

আমরা ঘটনাটিকে বিশদভাবে এখানে বর্ণনা করছি, যাতে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পূত-চরিত্রের উপর শত্রুদের কালিমা লেপনের গোপন তথ্যটি ফাঁস হয়ে যায়।

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস যায়েদকে সন্তানসম লালনপালন করেছিলেন। যায়েদ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বীয় ফুফাত বোন হযরত যয়নাবের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিতে মনস্থ করেন। কিন্তু হযরত যয়নাব এতে রাজী ছিলেন না। ফাতহুল বারীতে বর্ণিত হয়েছে,

"হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর মুক্ত করা দাস যায়েদ ইবনে হারেসার সঙ্গে হযরত জয়নাবের বিয়ে দিতে চাইলেন, কিন্তু তিনি তা পছন্দ করলেন না।[২]

অবশেষে হযরত যয়নাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নির্দেশ মনে করে বিয়েতে সম্মত হলেন। প্রায় এক বছর কাল তিনি হযরত যায়েদের বিবাহিতা স্ত্রী হিসাবে অতিবাহিত করেন। উভয়ের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই মনোমালিন্য বিরাজ করত। অবশেষে হযরত যায়েদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দরবারে অভিযোগ করেন এবং যয়নাবকে তালাক দিতে মনস্থ করেন। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

---

১. হযরত রায়হানা সম্পর্কে ইতিহাসে তিন প্রকার বর্ণনা রয়েছে —
(ক) হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে মুক্ত করে দেন এবং তিনি তার পরিবারে গিয়ে পর্দানশীন জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন।
(খ) হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে থাকতে চাইলেন।
(গ) হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে মুক্তি দিয়ে পরে বিয়ে করে নেন।

২. ফতহুল বারী, তফসীরে সূরা আহ্যাব অধ্যায়।

"হযরত যায়েদ হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করলেন যে যয়নাব আমার সঙ্গে কঠিন ভাষা ব্যবহার করে, সুতরাং আমি তাকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

কিন্তু হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বার বার তাকে তালাক না দেয়ার জন্য বোঝাতে থাকেন। কোরআন মজীদে আছে,

"আল্লাহ্ ও আপনি যার উপর সদয় হয়েছেন, তাকে যখন বলতেন, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে (ঘর-সংসার করতে) থাক এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর।" (আহ্‌যাব-৫)

কিন্তু কোন প্রকারেই তাঁদের মধ্যে সমঝোতা সম্ভব না হওয়ায় যায়েদ হযরত যয়নাবকে তালাক দিয়ে দেন। হযরত যয়নাব ছিলেন হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সম্পর্কীয়া বোন এবং তাঁরই শিক্ষা-দীক্ষায় প্রতিপালিত। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এরই নির্দেশ মত তিনি যায়েদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব এতে বাধা দিচ্ছিল। ফলে, একদিনের জন্যও তাঁদের দাম্পত্য জীবনে শান্তি আসতে পারেনি।

যাহোক, হযরত যয়নাব যখন পরিত্যক্তা হলেন, তখন হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মানসিকভাবে যয়নাবের এ দুর্ভাগ্যের প্রতিকার করার জন্যই তাঁকে নিজে বিয়ে করতে ইচ্ছা করলেন। তখনকার দিনে আরবেরা পালক পুত্রকে ঔরসজাত পুত্র বলে মনে করত। সুতরাং সাধারণ মানুষের ধারণার ব্যাপারে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। কিন্তু এটি ছিল একটি জাহেলী প্রথা এবং এক সমূলে উৎপাটিত করার প্রয়োজন ছিল, তাই কোরআনে আয়াত অবতীর্ণ হল,

"আপনি অন্তরে যে কথা গোপন করছেন আল্লাহ্ তা' প্রকাশ করে দেবেন। এ ব্যাপারে আপনি মানুষকে ভয় করেন, কিন্তু একমাত্র আল্লাহ্‌কে ভয় করাই আপনার পক্ষে সমীচীন।"

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অবশেষে হযরত যয়নাবকে বিয়ে করেন এবং অন্ধকার যুগের পালক পুত্রকে পুত্র গণ্য করার নিয়মকে চিরতরে বাতিল করেন। এতে অবশ্য মুনাফেক ও নিন্দুকেরা বিভিন্ন রকম কুৎসা রটনা করতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যের সাগরে তাদের সকল প্রকার ব্যর্থ প্রচেষ্টা নিমজ্জিত হয়ে যায়।

আসল ঘটনা হল, শত্রুপক্ষ এ ঘটনাকে যেভাবে বর্ণনা করেছে যদিও তা আগাগোড়াই মিথ্যা।

তাবারীতে বর্ণিত হয়েছে যে একদিন হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যায়েদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাঁর বাড়ি যান। যায়েদ তখন বাড়িতে ছিলেন না। হযরত

যয়নাব কাপড় পরছিলেন। এমনি সময়ে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে দেখে ফেলেন এবং একথা বলতে বলতে বাইরে চলে এলেন।

"আল্লাহ্ পাক পবিত্র ও সবচাইতে বড়। সে আল্লাহ্ই পবিত্র যিনি অন্তরকে পরিবর্তিত করে দেন।[১]

হযরত যায়েদ এ ঘটনা জানতে পেরে হযরত-রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হন এবং আরজ করেন, যয়নাবকে যদি আপনার পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আমি তাকে তালাক দিয়ে দিই।

আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং মনের উপর রীতিমত অত্যাচার করে এ মিথ্যা ও বাজে রটনাটি বর্ণনা করলাম। কেননা, "কোন কুফরী কথা নকল করা কুফরী নয়।" তবে মোটামুটিভাবে পাশ্চাত্যের খৃষ্টান ঐতিহাসিদের বর্ণনার মূল সূত্র হচ্ছে উপরোক্ত ভিত্তিহীন বর্ণনাটিই। কিন্তু নাদানদের জানা নেই যে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য উপরোক্ত বর্ণনাটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য। তাবারী এ ঘটনা ওয়াকেদী থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি ছিলেন বর্ণনার ব্যাপারে অত্যন্ত অসাবধান এবং অনেক মিথ্যা বর্ণনার মূল সূত্র। এ ধরনের মিথ্যা ও কল্পকাহিনী রচনা করার পেছনে বিলাসী আব্বাসীয় সুলতানদের বিলাসব্যসনের সপক্ষে সনদ সরবরাহ করাই হয়তো ওয়াকেদীর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হয়ে থাকবে।

তাবারী ছাড়া অন্যান্য কিছু সংখ্যক বর্ণনাকারীও এ ধরনের মিথ্যা ঘটনা বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মোহাদ্দেসগণ সেগুলোকে এ পর্যায়ের মনে করেননি যে যা বাদ দেয়া যেতে পারে। হাফেয ইবনে হাজারের মত সনদের ব্যাপারে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ভাষ্যকারও ফতহুল বারীতে ঘটনার উল্লেখ করার পর লিখেছেন,

"অন্যান্য আরও বহু বর্ণনা রয়েছে যা ইবনে আবি হাতেম এবং তাবারী বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ তফসীরকারও তা লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে এ বর্ণনার দিকে আকৃষ্ট না হওয়াই উচিত।"

"ইবনে আবি হাতেম এবং ইবনে জারীর এখানে কয়েকজন পূর্ববর্তীদের উদ্ধৃতিতে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা আমরা এ কারণে উপেক্ষা করতে চাই যে সেগুলো মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। ইমাম আহমদও এ ঘটনা সম্পর্কে হযরত আনাসের (রাঃ) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যা সনদের মাপকাঠিতে 'গরীব'। আমরা তার আলোচনাও পরিত্যাগ করেছি।"

---

১. তাবারী।

ব্যাপার হল এই যে ঘটনাটি যে সময়কার তখন মুনাফেকদের দৌরাত্ম্য ছিল খুবই বেশি। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর উপর যে অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল, তা এ সময়েরই ঘটনা। মুনাফেকরা এ ধরনের অলীক কথাবার্তা এমন দক্ষতার সঙ্গে প্রচার করত যে ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে পর্যন্ত সেগুলো কথিত হতে থাকত। এমন কি, হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি আরোপিত অপবাদে কয়েকজন মুসলমানও জড়িয়ে পড়েছিলেন। অবশ্য তাঁদের আবার শরিয়তের বিধান অনুযায়ী শাস্তিরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ ধরনের বাজে গল্প এখনও হয়তো কোন কোন বাজারী বাজে পুস্তিকায় দেখা যায়। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য কোন মোহাদ্দেস যাঁরা সত্য হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কঠোর সাধনা করে গেছেন, যেমন— ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখ, তাঁদের কোন হাদীসে এ ধরনের বর্ণনার কোন নামগন্ধও পাওয়া যায় না।

৫ম হিজরীর অন্যান্য ঘটনাবলী

ইসলামের ইতিহাসে পঞ্চম হিজরী সালের প্রসিদ্ধ ঘটনা হল মহিলাদের জন্য বিভিন্ন সংশোধনমূলক নির্দেশের অবতারণা।

মুসলমান মহিলাগণ তখনও পর্যন্ত প্রচলিত অন্ধকার যুগের চাল-চলনেরই অনুসরণ করতেন এবং সে ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনাদি পরতেন। এবার তাঁদের উপর হুকুম হল, কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা যদি বাড়ির বাইরে যেতে চায় তাহলে তাঁকে একটি বড় চাদর দ্বারা নিজেকে ঢেকে নিতে হবে। মুখ ঢাকতে হবে, আঁচল বক্ষের উপর রাখতে হবে এবং পা খটখট করে চলা যাবে না। পর্দার অন্তরালে থেকে কথা বলবে। সুর করে বা রং-ঢংয়ের কথা বলা যাবে না। নবীপত্নীগণের জন্যও পরপুরুষের সামনে যাওয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হল।

এ বছরই যিনার (ব্যভিচার) শাস্তি হিসাবে একশ' বেত্রাঘাতের নির্দেশ জারি হয়।

সতী নারীদের উপর অপবাদ আরোপ করা অন্ধকার যুগের একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল এবং এটা প্রতিরোধ করার মত কোন আইনগত ব্যবস্থা তাঁদের হাতে ছিল না। এ বছরই 'হদ্দে কাযাফ' (অপবাদ রটনার শাস্তি সম্বলিত বিধান) অবতীর্ণ হয়। এ আইন বলে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া একজনের উত্থাপিত অপবাদকে অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়। আর সাক্ষ্য-প্রমাণ না পাওয়া গেলে 'লেআন'-এর নির্দেশ দেয়া হয়। অর্থাৎ নারী-পুরুষ উভয়েই তাদের সততা এবং বিরুদ্ধ পক্ষের মিথ্যা রটনার উপর কসম করবে এবং এরপর তাদের পৃথক করে দেয়া হবে।[১]

১. বোখারী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭০৭; আবু দাউদ ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১২, ফতহুল বারী ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৬।

আরবে 'যেহার' (মা-বোন প্রমুখদের সঙ্গে স্ত্রীর তুলনা) নামে এক প্রকার তালাক ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। এ বছরই সেটি অকেজো ঘোষণা করা হয় এবং এ ধরনের অপরাধের জন্য কাফ্‌ফারা নির্ধারিত হয়।

পানি না পাওয়া গেলে তায়াম্মুম করার বিধানও এ বছরই নাযিল হয়।

সহীহ্ হাদীস গ্রন্থের মতে, এ বছর কোরআনে "সালাত খাওফ" বা ভয়ের নামাযের আদেশ অবতীর্ণ হয়।

হুদাইবিয়ার সন্ধি ও বাইআতে রিদ্‌ওয়ান

মক্কা মুআযযমা থেকে এক মঞ্জিল দূরে অবস্থিত একটি কূপের নাম হুদাইবিয়া।

এ কূপের নাম অনুসারে গ্রামটিও হুদাইবিয়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। মক্কাবাসীদের সঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইতিহাস প্রসিদ্ধ সন্ধিপত্র এখানেই সম্পাদিত হয়েছিল। এ কারণে এ ঘটনাটিও 'হুদাইবিয়ার সন্ধি' নামে অভিহিত হয়।

হুদাইবিয়ার সন্ধি ইসলামের ইতিহাসে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ, ইসলামের পরবর্তী যাবতীয় সাফল্যের মূল সূচনা ছিল এটাই। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও এটা ছিল পরাজয়মূলক একটি সন্ধিচুক্তি, তথাপি পাক কোরআনে আল্লাহ্ তা'আলা একে সুস্পষ্ট বিজয় বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কাবা শরীফ ইসলামের মূল প্রাণকেন্দ্র। ইসলামী উম্মাহর মূলভিত্তি স্থাপন করেন হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এবং 'ইসলাম' শব্দটিও তাঁরই দেয়া নাম। বলা হয়েছে —

"হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-ই তোমাদের মুসলমান নামে অভিহিত করেন।" (সূরা হজ ঃ ১০ রুকু)

রসূলে খোদা (সাঃ)-এর শরীয়ত কোন নতুন শরীয়ত নয় এবং এর মূলে রয়েছে হ্যরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর শরীয়ত। বলা হয়েছে—

"এটা তোমাদের পিতা ইব্‌রাহীমেরই ধর্ম।" (সূরা হজ—১০)

হ্যরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর বংশধরগণ মূর্তিপূজক হয়ে গিয়েছিল, তথাপি তাঁর পুণ্যস্মৃতি 'কাবা শরীফ' সর্বদা আরববাসীদের কেবলাগাহ্ বা তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত হয়ে আসছিল। সমগ্র আরববাসী একে নিজেদের পৈতৃক উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি হিসাবে জ্ঞান করত। শুধু যে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর বংশধরগণই এরূপ জ্ঞান করত এমন নয়, কাহ্‌তানীরাও যাদের বংশ পরম্পরা ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর খান্দান থেকে আলাদা ছিল তারাও অনুরূপ ধারণা পোষণ করত। আরবের গোত্রসমূহ সারা বছর লুট-তরাজ এবং পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত

থাকত। এ লুটতরাজ দৃশ্যত তাদের নেশা হলেও মূলত অনেক ক্ষেত্রে এটাই ছিল তাদের জীবিকা। এতদসত্ত্বেও 'আশহুরে-হুরুম' তথা পবিত্র বা সম্মানিত মাসরূপে আখ্যায়িত চারটি মাসে তারা সর্বপ্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ রাখত। দূর-দূরান্ত থেকে আরব গোত্রসমূহ (এ সময়ে) সফর করে উক্ত কেবলাগাহে পৌছে স্ব-স্ব ধর্মীয় উপাসনার আচার-অনুষ্ঠানাদি পালন করত এবং ভক্তি ও প্রেমের অর্ঘ্য নিবেদন করত। যারা একে অপরে ঘোরতর রক্ত পিপাসু শত্রু এমন সব গোত্রকেও এসব মাসে এক স্থানে সমবেত হতে দেখা যেত। ভাই ভাই হিসাবে তারা পরস্পর মেলামেশা করত। মুসলমানগণ মক্কা থেকে বিতাড়িত হলেও কাবা শরীফের উপর তাদেরও ততটুকু অধিকারই যতটুকু অধিকার অন্যান্য গোত্রের, এ পরম সত্য ধারণাটি তখনও তাদের হৃদয় থেকে মুছে যায়নি। এতদ্ব্যতীত মক্কার সঙ্গে তাদের আরও বিভিন্ন প্রকার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। এটি ছিল তাদের সাবেক এবং প্রিয়তম বাসস্থান। এর কথা স্মরণ হতেই সর্বদা তাদের অন্তঃকরণে কন্টক যন্ত্রণা হতে থাকত। হযরত বিলাল (রাঃ) মক্কায় থাকাকালীন সময়ে কতই না নির্যাতিত হয়েছিলেন। তথাপি যখনই মক্কার কথা স্মরণ করতেন তাঁর দু'চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। অনেকেই চীৎকার করে নিম্নোক্ত চরণগুলো আবৃত্তি করতেন,

الا ليت شعرى هل ابيتن ليلة بواد وحولى اذخر وجليل وهل اردن

يوما مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل —

"হায়! সেদিন কি আর কখনও ফিরে আসবে যে আমি মক্কা উপত্যকায় ইযখার এবং জলীল ঘাসের মাঝখানে মাত্র একটি রাত্রি যাপন করতে পারব?

এমনও কি কখনও হবে যে আমি তাঁদের মাজিন্নার ক্ষুদ্র জলাশয়গুলোতে অবতরণ করব আর আমার চোখের সামনে শামা ও তফীল উদ্ভাসিত হতে থাকবে?"[১]

অধিকসংখ্যক মোহাজিরই মক্কা থেকে একা একা প্রাণ বাঁচিয়ে চলে এসেছিলেন। তাঁদের পরিবার-পরিজন এবং সন্তান-সন্ততি সেখানেই রয়ে গিয়েছিলেন।

ইসলামের বিধান অনুযায়ী অবশ্য পালনীয় কাজগুলোর মধ্যে কাবা শরীফে পৌঁছে হজ্জ পালন করাও অন্যতম প্রধান ফরয। নানাবিধ কারণে হুযুর (সাঃ)

১. এ চরণগুলো সহীহ্ বোখারী শরীফেও উল্লেখ রয়েছে।

মক্কা শরীফ রওয়ানা হবার সংকল্প করলেন। মক্কার কোরাইশগণ যাতে অন্য কোন সন্দেহে পতিত না হয়, সেজন্য তিনি ওমরা করার জন্য এহ্‌রাম পরিধান করলেন এবং কোরবানীর উটও সঙ্গে নিলেন। সহচরদের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রওয়ানা করতে নিষেধ করে দিলেন। তৎকালীন আরবে সফরের জন্য তরবারি জরুরী অস্ত্র হিসাবে বিবেচিত হত। এ কারণে কোষবদ্ধ থাকার শর্তে কেবল তাই সঙ্গে রাখার অনুমতি প্রদান করলেন।

মোহাজেরগণ সামগ্রিকভাবে এবং আনসারদের অধিকাংশ লোকই পূর্ব হতেই এ সৌভাগ্য অর্জন করার প্রতীক্ষায় ছিলেন। তাই সর্বমোট চৌদ্দ শ' লোক সফরের সঙ্গী হলেন। 'যুল হুলাইফা' নামক স্থানে পৌঁছে তাঁরা কোরবানীর প্রাথমিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। অর্থাৎ, কোরবানীর পশু বলে বিবেচিত হবার জন্য সঙ্গীয় উষ্ট্রসমূহের গ্রীবায় লৌহের পাদুকা ঝুলিয়ে দিলেন।

খুযা'আ গোত্রের এক ব্যক্তি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মক্কার কোরাইশদের তা জানা ছিল না। তাদের মনোভাব উপলব্ধি করার জন্য প্রথমত হযরত (সাঃ) তাঁকে মক্কায় পাঠালেন। সাহাবীবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে হযরত যখন 'আসফান' নামক স্থানের নিকটবর্তী হলেন, তখন এ ব্যক্তি এসে জানাল যে "কোরাইশরা সকল গোত্রকে সমবেত করে ঘোষণা করে দিয়েছে যে মোহাম্মদ (সাঃ)-কে তারা কিছুতেই মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না।"

কোরাইশরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মহাবিক্রমে যুদ্ধের জন্য তৈরি হল। সংযুক্ত আরব গোত্রসমূহের কাছে সংবাদ পাঠানো হলে তারাও বিরাট বাহিনী সহকারে এগিয়ে মক্কার অনতিদূরে "বালদাহ" নামক স্থানে কোরাইশ বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হল। খালেদ ইবনে ওলীদ তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। আবু জাহ্‌ল তনয় ইকরিমা সহ দু'শ অশ্বারোহী সৈন্যের অগ্রবর্তী দল হিসাবে এগিয়ে এসে 'রাবেগ ও জাহ্‌ফা' নামীয় স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী 'গামীম' নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছাল।

হযরত নবী করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, কোরাইশরা খালেদকে অগ্রবর্তী সেনাদল সহকারে পাঠিয়েছে। বর্তমানে সে গামীম পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। সুতরাং মোড় পরিবর্তন করে সকলে ডানদিকে এগিয়ে যাও। ইসলামী সেনাবাহিনী গামীমের নিকটবর্তী হলে খালেদ অগ্রসরমান নবীজীর (সাঃ) কাফেলা থেকে উত্থিত ধূলিরাশি আকাশে উড়তে দেখল। দ্রুত অশ্ব হাঁকিয়ে গিয়ে সে কোরাইশদের মুসলমানদের আগমন বার্তা জ্ঞাপন করে। ওদিকে হযরত নবী করীম (সাঃ) দ্রুত এগিয়ে গিয়ে "হুদাইবিয়া" নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। এখানে ছিল পানির অভাব। মাত্র একটি কূপ; তাও

কাফেলা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পানি নিঃশেষ হয়ে গেল। মোজেযার বরকতে কূপটির পানি এত বৃদ্ধি পেল যে সবাই যাবতীয় প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হলেন।

খুযা'আ গোত্রীয়রা যদিও তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি, তথাপি তারা ছিল মুসলমানদের অন্তরঙ্গ। মক্কার কোরাইশ এবং অন্যান্য কাফেররা যখনই ইসলামের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র কিংবা পরিকল্পনা গ্রহণ করত, তারা হযরত (সাঃ)-কে তা জানিয়ে দিত। বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা ছিল এ গোত্রের প্রধান (মক্কা বিজয়কালে সে ইসলাম গ্রহণ করে)। যখন সে জানতে পারল যে হযরত নবী করীম (সাঃ) হুদাইবিয়া প্রান্তরে এসে অবস্থান করছেন, তখন কতিপয় লোকসহকারে সে তথায় উপস্থিত হয়ে বলল কোরাইশরা বহু সৈন্য সহকারে এদিকে এগিয়ে আসছে এবং আপনাকে কাবা প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতে না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন, তাদেরকে গিয়ে বল, আমরা ওমরার[১] উদ্দেশ্যে এসেছি, যুদ্ধ করতে নয়। যুদ্ধের ফলে তারা চরম অবস্থায় পৌঁছেছে এবং মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সুতরাং একটি নির্দিষ্টকালের জন্য সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে আমাকে আরবদের হাতে ছেড়ে দেয়াই তাদের পক্ষে উত্তম হবে। যদি এতেও তারা সম্মত না হয়, তবে ঐ খোদার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন, যে পর্যন্ত না আমার গর্দান (দেহ থেকে) বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং তাঁর যা ইচ্ছা করে না দেবেন, আমি তাদের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকব।

বুদাইল কোরাইশদেরকে গিয়ে বলল, আমি মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট থেকে একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। অনুমতি পেলে ব্যক্ত করব। কতিপয় দুর্বৃত্ত বলে উঠল, (যাও হে!) মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রস্তাব শোনার আমাদের কোন দরকার নেই। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকেরা সম্মতি জানালে সে রসূলে খোদা (সাঃ)-এর যাবতীয় শর্তাদি তাদের সামনে উত্থাপন করল।

শুনে উরওয়া ইবনে মসউদ সাকাফী দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, "হে কোরাইশগণ! আমি কি তোমাদের পিতৃতুল্য এবং তোমরা আমার সন্তানতুল্য নও? তারা সমস্বরে হ্যাঁ-সূচক ধ্বনি করল। উরওয়া বলল, আমার সম্পর্কে তোমাদের তো কোন কু-ধারণা নেই? সকলেই না-সূচক ধ্বনি করল। উরওয়া বলল, তা হলে আমি নিজে গিয়ে সমাধান করে আসি এ বিষয়ে সর্বসম্মতভাবে আমাকে অনুমতি দান কর। মোহাম্মদ (সাঃ) সত্যই যুক্তিযুক্ত শর্তাদি পেশ করেছেন।"

---

১. ওমরা যেন একটি ছোট হজ্ব। এতে হজ্বের প্রায় অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ হরম শরীফের বাইরে মীকাতে যেয়ে এহ্রামের বস্ত্র পরিধান করে ছাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যে সা'ঈ' করতঃ কা'বা শরীফের তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করতে হয়। অবশেষে কেশগুচ্ছ মুড়িয়ে বা কর্তন করে ফেলতে হয়। (সূ')

উরওয়া রসূলে খোদা (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে কোরাইশদের সব কথা ব্যক্ত করল। অতঃপর বলল, মোহাম্মদ (সাঃ)! মনে কর, তুমি কোরাইশদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছ। কেউ স্বজাতিকে স্বমূলে ধ্বংস করে দিয়েছে, এর কি কোন দৃষ্টান্ত আছে? এতদ্ব্যতীত যুদ্ধের পট পরিবর্তিত হলে তোমার সঙ্গে সৈন্যদের যে ক্ষুদ্র দলটি রয়েছে ধূলিকণার ন্যায় কোথায় উড়ে যাবে। উরওয়ার এ অশোভনীয় উক্তি শুনে হযরত আবু বকর ভীষণ ক্রুদ্ধ হল। তিরস্কার করে বললেন, তুমি কি ধারণা কর যে আমরা মোহাম্মদ (সাঃ)-কে ছেড়ে চলে যাব? উরওয়া হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, এ লোকটি কে? হযরত (সাঃ) বললেন, আবু বকর। উরওয়া বলল, আমি তার এ কঠোর বাক্যের উত্তর দিতাম, কিন্তু আমার প্রতি তার একটি দান রয়েছে যা আমি অদ্যাবধি পরিশোধ করতে পারিনি।

উরওয়া হযরত নবী করীমের (সাঃ) প্রতি কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন না করে একান্ত বেপরোয়াভাবে কথা বলছিল। আরবের প্রথা ছিল কথাবার্তা বলার সময় যার সঙ্গে কথা বলা হয় তার শ্মশ্রু স্পর্শ করা। প্রথা অনুযায়ী উরওয়াও হস্ত দ্বারা বারংবার হযরতের শ্মশ্রু-মোবারক স্পর্শ করছিল। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা সশস্ত্র অবস্থায় হযরতের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি উরওয়ার এ ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ সহ্য করতে না পেরে বলে উঠলেন, "উরওয়া, সাবধান! হাত গুটাও! পুনরায় যদি তোমার হাত পবিত্র শ্মশ্রু স্পর্শ করে, তবে আর অক্ষত অবস্থায় ফিরে যাবে না।" উরওয়া মুগীরাকে চিনতে পেরে বলল, "ওহে দাগাবাজ! দাগাবাজি সূচক ব্যবহারের জন্য আমি কি তোমার কাজ করে যাচ্ছি না?" (হযরত মুগীরা (রাঃ) কতিপয় লোককে বধ করেছিলেন, উরওয়া নিজের তরফ থেকে তাদের রক্তের মূল্য বা ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করেছিলেন)।

রসূলে খোদা (সাঃ)-এর সঙ্গে সাহাবীদের অকপট ভক্তি এবং বিস্ময়কর মহব্বতের দৃশ্য দেখে উরওয়ার মনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সে কোরাইশদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, "আমি (রোম সম্রাট) কাইসার, (পারস্য সম্রাট) কিস্‌রা এবং (আবিসিনিয় সম্রাট) নাজ্জাশীর দরবার দেখেছি বটে, কিন্তু এরূপ অগাধ ভক্তি, বিশ্বাস এবং আত্মবিস্মৃতি আর কোথাও দেখিনি। মোহাম্মদ (সাঃ) কথা বলা আরম্ভ করতেই নীরবতা ছেয়ে যায়, কেউ তাঁর দিকে মাথা তুলে দেখতে সাহস পায় না, ওযু করা কালে পানি ঝড়ে পড়া মাত্র সবাই তা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে থাকে, কফ বা থুথু নিক্ষেপ করতেই ভক্ত দল তা হাতে হাতে তুলে নেয় এবং চেহারা ও হস্তে মলতে থাকে।"[১]

---

১. বোখারী জেহাদ এবং হরবীদের সঙ্গে সন্ধি করার শর্তাদি অধ্যায়।

ব্যাপারটি অসম্পূর্ণ থাকায় মহানবী (সাঃ) উমাইয়া তনয় হযরত খেরাশ (রাঃ)-কে নিজস্ব উটের উপর সওয়ার করিয়ে কোরাইশদের কাছে পাঠালেন। কোরাইশরা উটটিকে হত্যা করল। অতঃপর খেরাশকেও বধ করতে উদ্যত হলে সংযুক্ত আরব গোত্রের অপর লোকজন তাঁকে রক্ষা করে। ফলে, তিনি কোন রকমে আত্মরক্ষা করে ফিরে আসেন।

কোরাইশরা মুসলমানদের কাফেলা আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র একটি সেনাদল পাঠাল। এরা সবাই মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ল। যদিও এটা জঘন্যতম দুষ্কৃতি ছিল, তথাপি রহমতে আলম (সাঃ)-এর ক্ষমার ভাণ্ডার ছিল অধিক প্রশস্ত। তিনি তাদের ক্ষমা করে মুক্তি দিয়ে দিলেন। কোরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াত এ ঘটনাটির দিকেই ইঙ্গিত করেছে।[১]

"আর সে আল্লাহই মক্কায় তোমাদের তাদের (কোরাইশদের) উপর বিজয়ী করার পর তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে প্রতিরোধ করে দিয়েছেন।" (সূরা ফাত্হ, ৩য় রুকু)।

বাইআতে রিদ্ওয়ান

অতঃপর হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য হযরত ওমর (রাঃ)-কে নির্বাচন করলেন। তিনি আরয করলেন, কোরাইশরা আমার ঘোর শত্রু। মক্কায় আমার স্বগোত্রীয় এমন কোন লোক নেই যে আমার পক্ষাবলম্বন করবে। হযরত নবী করীম (সাঃ) তখন ওসমান (রাঃ)-কে কোরাইশদের কাছে পাঠিয়ে দিতে মনস্থ করলেন। তিনি (আবান ইবনে সাঈদ) নামীয় জনৈক আত্মীয়ের সহায়তায় মক্কায় পৌঁছে তাদের নিকট রসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। তারা এর কোন গুরুত্ব না দিয়ে ওসমান (রাঃ)-কে বন্দী করল। অপরদিকে তিনি শহীদ হয়েছেন বলে সর্বত্র ব্যাপক খবর ছড়িয়ে পড়ল। খবরটি হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর শ্রুতিগোচর হলে তিনি (মর্মাহত হয়ে) বললেন, হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করা ফরয। সুতরাং ওসমানের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতেই হবে। অতঃপর তিনি একটি বাবলা গাছের নিচে বসে সাহাবায়ে কেরাম থেকে আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গ করার বাইআত গ্রহণ করলেন। পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে সাহাবাদের সবাই বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর পবিত্র হাতে দ্বীনের জন্য আত্মদান করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। ইসলামের ইতিহাসে এটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এটাই 'বাইআতে রিদওয়ান' নামে অভিহিত। পাক কালামে সূরা-ফাত্হ-এর মধ্যে উক্ত ঘটনা এবং গাছের কথা উল্লিখিত হয়েছে ঃ

---

১. অত্র আয়াতের শানে নুযূলে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। তবে উপরোক্ত রেওয়াতেই অধিক বিশ্বস্ত বলে গণ্য।

"আল্লাহ্ মুসলমানদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, যখন তারা আপনার হাতে গাছের নিচে বাইআত গ্রহণ করছিল, ফলত তিনি তাদের অন্তর (যে উদ্দীপনা বিরাজ করছিল) তা পরিজ্ঞাত রয়েছেন, অতঃপর তাদের প্রতি তিনি শান্তি অবতরণ করেছেন এবং তাদের আশু বিজয় দান করেছেন।" (সূরা-ই-ফাত্হ, ৩য় রুকু)

কোরাইশরা আমরের পুত্র সুহাইলকে (সন্ধি করার জন্য) দূতস্বরূপ প্রেরণ করে। সে একান্ত লালিত্য ও মাধুর্যপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা করত। এ কারণে লোক তাকে খতীবে কোরাইশ[1] তথা কোরাইশদের বক্তা বা বাগ্মী খেতাবে ভূষিত করে। মোহাম্মদ (সাঃ)-কে এবার ফিরে যেতে হবে শুধু এ শর্তেই সন্ধি হতে পারে বলে তারা তাঁকে জানিয়ে দিল।

সুহাইলও হযরত (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘ সময়ব্যাপী সন্ধির শর্তাদি সম্পর্কে আলোচনা করে। অবশেষে কয়েকটি শর্তে তাঁদের মধ্যে মতৈক্য হয়। মহানবী (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে ডেকে সন্ধিপত্র লেখার নির্দেশ দিলেন। হযরত আলী (রাঃ) তার শিরোভাগে

(বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম) লিখলেন। بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

চিঠিপত্রের পুরোভাগে ' বিসমিকাল্লাহুম্মা' লেখা ছিল আরবের প্রাচীন প্রথা। 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম' লেখার সঙ্গে তারা পরিচিত ছিল না। এ কারণে তদস্থলে প্রাচীন প্রথার শব্দগুলো লেখার জন্য সুহাইল বায়না ধরলে হযরত নবী করীম (সাঃ) তা মঞ্জুর করে নিলেন। চুক্তিপত্রের শিরোনামে লেখা হল, هٰذَا مَا قَضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ অর্থাৎ, এটা সে চুক্তিপত্র রসূলে খোদা মোহাম্মদ (সাঃ) যা স্বীকার করে নিয়েছেন। সুহাইল বাধা দিয়ে বলল, আমরা যদি তোমাকে নবী বলেই স্বীকৃতি দিতাম তবে আর যুদ্ধবিগ্রহ কিসের ? তুমি কেবল তোমার এবং তোমার পিতার নাম লেখতে পার। ফলে, অর্থ হবে, এটি সে চুক্তিপত্র আবদুল্লাহ-তনয় মোহাম্মদ (সাঃ) যা স্বীকার করে নিয়েছেন। হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন, যদিও তোমরা অস্বীকার কর, কিন্তু খোদার কসম করে বলছি, নিশ্চয়ই আমি তাঁর প্রেরিত পয়গম্বর। অতঃপর তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে শুধু তাঁর নাম লেখার নির্দেশ দিলেন।

নিঃসন্দেহে হযরত আলী (রাঃ) অপেক্ষা অধিকতর অবগত ও আজ্ঞাবহ হওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু ভালোবাসা ও প্রেমের রাজ্যে এমনও অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় যখন আজ্ঞার ব্যতিক্রম করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সে মতে হযরত আলী (রাঃ) উত্তর করলেন, আমি কিছুতেই আপনার পবিত্র নাম কেটে দিতে পারব না। হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন, আচ্ছা, তবে আমার নামটি

---

১. যারকানী।

কোথায় আমাকে দেখিয়ে দাও। হযরত আলী (রাঃ) নামের জায়গাটি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে হযরত (সাঃ) স্বহস্তে "রসূলুল্লাহ " শব্দটি কেটে দিলেন।[1]

হযরত নবী করীম (সাঃ) লিখতে জানতেন না। এ জন্যই তিনি উম্মী বা নিরক্ষর নামে অভিহিত। মুসলিম শরীফের যে স্থানে এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে সেখানে একথাও উল্লিখিত আছে যে হযরত (সাঃ) রসূলুল্লাহ শব্দটি কেটে 'ইবনে আবদুল্লাহ' (আবদুল্লাহ্‌তনয়) শব্দ লিখে দেন। বোখারী শরীফের এ ঘটনার বর্ণনা সাধারণ বর্ণনাসমূহের পরিপন্থী। এ কারণে এটি একটি মহাবিতণ্ডার রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে প্রত্যহ লেখা-পড়ার কাজ পরিদৃষ্ট হতে থাকলে নিরক্ষর লোকও নিজ নামের অক্ষরগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়ে যায়। অথচ শুধু এতটুকুতেই উম্মী হওয়ার বিশেষণে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না। নিঃসন্দেহে মহানবী (সাঃ)-এর উম্মী হওয়া বিশেষ গৌররের বিষয়। স্বয়ং কোরআন করীমেও তাঁর গৌরব এবং মর্যাদা জ্ঞাপক স্থলে উক্ত বিশেষণটি ব্যবহৃত হয়েছে।

"যারা প্রেরিত উম্মী বা নিরক্ষর নবীর অনুসরণ করে।"—(সূরা আরাফ ১৯ রুকু)

সন্ধির শর্তসমূহ ঃ

(১) মুসলমানগণ এব্যরকার মত ফিরে যাবে।

(২) আগামী বছর তারা (হজ বা ওমরা উপলক্ষে মক্কায়) আসতে পারবে এবং মাত্র তিনদিন অবস্থান করার পর তাদের ফিরে যেতে হবে।

(৩) কেউ অস্ত্রসজ্জিত হয়ে আসতে পারবে না, কোষবদ্ধ তরবারি আনতে পারবে।

(৪) মুসলমানদের মধ্যে যারা পূর্ব থেকেই মক্কায় রয়েছে তাদের কাউকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না এবং তাদের মধ্য থেকে যদি কেউ মক্কায় থেকে যেতে চায়, তবে তাকেও বাধা দিতে পারবে না।

(৫) কাফের অথবা মুসলমানদের কেউ মদীনায় গেলে তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। পক্ষান্তরে, যদি কোন মুসলমান মক্কায় চলে আসে, তবে তাকে ফেরত দেয়া হবে না।[2]

১. সহীহ বোখারী শরীফের অত্র বর্ণনায় হযরত আলী (রাঃ)-এর নাম তাঁর উপলক্ষে কথোপকথনের কথা উল্লেখ হয়নি। বোখারী শরীফের كتاب المغازى বা যুদ্ধ-বিগ্রহে অভ্যন্তরীণ باب عمرة القضاء ওমরাতুল কাযা পরিচ্ছেদে এটা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ মোসলেম শরীফেও এ ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

২. এ সমুদয় শর্ত সীরাত গ্রন্থাদি ব্যতীত সহীত মোসলেম শরীফেও উল্লেখ হয়েছে।

(৬) (মুসলমানগণ এবং কোরাইশ) উভয়পক্ষের মধ্যে যে কোনটির সঙ্গে আরব গোত্রসমূহের সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার থাকবে।

বাহ্যত এ সবগুলো শর্তই ছিল মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী। যখন সন্ধিপত্র লেখা হচ্ছিল দুর্ঘটনাক্রমে ঠিক তখনই সুহাইলের পুত্র হযরত আবু জন্দল (রাঃ) শৃঙ্খল বেষ্টিত অবস্থায় কোনরূপে পালিয়ে সবার সামনে এসে উপস্থিত হল। ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে মক্কার কাফেররা তাঁকে বন্দী করে রেখেছিল এবং তার প্রতি নানা রকম নির্যাতন চালাচ্ছিল। সুহাইল বলে উঠল, মোহাম্মদ (সাঃ), এখনি প্রমাণ হবে সন্ধি রক্ষা হয় কিনা? সন্ধি পালন করার যে এটাই প্রথম সুযোগ। শর্ত অনুযায়ী আবু জন্দলকে আমার হাতে অর্পণ কর। হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন, এখন সন্ধিপত্র সমাপ্ত হয়নি। (সুতরাং তাকে সমর্পণ করা যায় না)। সুহাইল বলল, তাহলে আমরাও সন্ধিপত্র প্রত্যাখ্যান করলাম। হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন, তবে তাকে এখানেই থেকে যেতে দাও। সুহাইল তাও অগ্রাহ্য করল। তারপরও হযরত নবী করীম (সাঃ) কয়েকবার তাকে পীড়াপীড়ি করলেন। কিন্তু সুহাইল কিছুতেই সম্মত হল না। নিরুপায় হয়ে হুযুর (সাঃ) আবু জন্দলকে তাঁর পিতা সুহাইলের হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য হল। কাফেরদের অমানবিক অত্যাচারে আবু জন্দলের সর্বাঙ্গে দাগ পড়ে গিয়েছিল। তিনি সবাইকে তা দেখিয়ে বললেন, বেরাদরানে ইসলাম! এরপরেও কি আপনারা আমাকে অনুরূপ অবস্থায় দেখতে চান! আমি তো ইসলাম গ্রহণ করেছি! তবে কেন আপনারা পুনরায় আমাকে কাফেরদের হাতে অর্পণ করছেন?

একথা শুনে মুসলমানগণ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। হযরত ওমর (রাঃ) ধৈর্যধারণ করতে না পেরে হযরত (সাঃ) সমীপে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি কি সত্য পয়গম্বর নন?

হযরত (সাঃ) ঃ নিশ্চয়ই।

ওমর (রাঃ) ঃ আমরা কি সত্য পথে নেই?

হযরত (সাঃ) ঃ নিঃসন্দেহে আমরা সত্য পথে আছি।

হযরত ওমর (রাঃ) ঃ তবে কেন আমরা ধর্মীয় ব্যাপারে এ অপমান সহ্য করব?

হযরত (সাঃ) ঃ আমি আল্লাহ্র পয়গম্বর। তাঁর আদেশ অমান্য করতে পারব না। তিনি অবশ্য আমাদের সাহায্য করবেন।

ওমর (রাঃ) ঃ আপনি কি বলেননি যে আমরা কাবা শরীফের তওয়াফ করব?

হযরত (সাঃ) ঃ কিন্তু এমনটি ত বলিনি যে এ বৎসরই করব।

অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) সেখান থেকে প্রস্থান করে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে এসে উপরোক্ত বাক্যগুলো আবৃত্তি করলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, তিনি আল্লাহর পয়গম্বর যা করেন আল্লাহর নির্দেশেই করে থাকেন।[১]

এ অনিচ্ছাকৃত ধৃষ্টতাসূচক উক্তিগুলোর জন্য হযরত ওমর (রাঃ) চিরজীবন অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে গিয়েছেন। অতঃপর কাফ্ফারাস্বরূপ তিনি বহু নফল নামায পড়েছেন, রোযা রেখেছেন, দান-খয়রাত করেছেন এবং ক্রীতদাস মুক্ত করেছেন। বোখারী শরীফে যদিও এ সকল আমলের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু ইবনে ইস্হাক (রাঃ) তা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

উদ্ভূত পরিস্থিতিটি মেনে নেয়া ছিল সাহাবাদের আনুগত্যের পক্ষে একটি ভয়ঙ্কর অগ্নিপরীক্ষা। (কেননা তখন) একদিকে ছিল (বাহ্যত) ইসলামের লাঞ্ছনা ও অবমাননা, ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গে অংগীকারবদ্ধ চৌদ্দ শ' সাহাবাবৃন্দের সামনে শৃঙ্খল বেষ্টিত অবস্থায় হযরত আবু জন্দলের ফরিয়াদ সবার হৃদয়ে দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। রসূলে করীম (সাঃ)-এর এতটুকু ইঙ্গিত পেতেই চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য খুরধার অসির বদ্ধপরিকর থাকা—তদ্রূপ অপরদিকে ছিল উভয় পক্ষের স্বাক্ষর সম্পাদিত হয়ে সন্ধিপত্রের চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করা এবং চুক্তি রক্ষা করার সুকঠিন দায়িত্ব পালন করা। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আবু জন্দলের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

"হে আবু জন্দল! ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমার এবং মুসলমানদের জন্য (অব্যাহতি লাভের) কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন করবেন। (আমাদের এবং কোরাইশদের মধ্যে) সন্ধি সম্পাদিত হয়ে গেছে। আমরা তাদের সঙ্গে সন্ধিভঙ্গ করতে পারি না। (ইবনে হিশাম)

বস্তুত হযরত আবু জন্দলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থাতেই পুনরায় ফিরে যেতে হল।

মহানবী (সাঃ) সাহাবাদের হুদাইবিয়া প্রান্তরেই মদীনা থেকে নিয়ে আসা জন্তুগুলো কোরবানী করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাঁরা এতই মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন যে কেউই এতে সাড়া দিলেন না। সহীহ্ বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে ঃ[২] মহানবী (সাঃ) একে একে তিনবার বলার পরও কেউ কোরবানী করতে প্রস্তুত হলেন না। হযরত নবী করীম (সাঃ) তখন তাঁবুতে গিয়ে উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) কাছে ব্যাপারটি ব্যক্ত করলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন—আপনি কাউকে কিছু না বলে নিজে গিয়ে কোরবানী করতে থাকুন এবং

---

১. সহীহ্ বোখারী বা শর্তাদি অধ্যায়। ('সূ')
২. শর্ত অধ্যায়। ('সূ')

এহ্‌রাম খোলার উদ্দেশে মাথা মুড়িয়ে নিন। সেমতে হ্যরত (সাঃ) কোরবানী করে মাথা মুড়িয়ে ফেললেন। এতে সাহাবাবৃন্দের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে উক্ত সিদ্ধান্তের কোনরূপ পরিবর্তন হবার নয়। সুতরাং সবাই কোরবানী করে (যথাবিধি) এহ্‌রাম খুলে ফেললেন।

সন্ধির পর তিনদিন পর্যন্ত হ্যরত নবী করীম (সাঃ) হুদাইবিয়ায় অবস্থান করেন। অতঃপর (মদীনার পথে) রওয়ানা হন। পথে নিম্নোক্ত সূরা অবতীর্ণ হয়।

"নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করলাম।" (সূরা ফাত্‌হ, ১ম রুকু)

মুসলমানদের সবাই যে বিষয়টিকে পরাজয় বলে ভাবছিলেন, আল্লাহ্‌ তাকে বিজয় বলে অভিহিত করলেন। মহানবী (সাঃ) হ্যরত ওমর (রাঃ)-কে ডেকে উক্ত আয়াত শুনালেন। তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটাও কি বিজয়? হ্যরত নবী করীম (সাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই! সহীহ্‌ মুসলিম শরীফে উক্ত আছে (হ্যরতে দৃঢ়তাপূর্ণ উত্তর শুনে), হ্যরত ওমরের সন্দেহভঞ্জন হল এবং তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।[১] পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের অন্তর্নিহিত রহস্যাবলী উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেছে।

এতদিন যাবৎ মুসলমান এবং কাফেরদের মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশা ছিল না। সন্ধি হয়ে যাওয়ায় তাদের মধ্যে পরস্পর যোগাযোগ ও যাতায়াত আরম্ভ হয়। বংশগত এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কের সূত্রে কাফেরদের অনেকেই মদীনায় এসে মাসের পর মাস অবস্থান করতে থাকে। মুসলমানদের সঙ্গে ওঠা-বসার ফলে কথা প্রসঙ্গে তাদের মধ্যে ইসলাম বিষয়ক আলোচনাও হতে থাকে। মুসলমান মাত্রই ছিলেন আন্তরিকতা, সদাচার, সদ্ব্যবহার ও সচ্চরিত্রতার প্রতীক। তাঁদের মধ্য থেকে যারা মক্কা যেতেন তাঁদের প্রত্যেকের দ্বারাই উপরোক্ত গুণাবলী সক্রিয়ভাবে প্রকাশ পেত। ফলে, কাফেরদের অন্তর আপনা থেকেই ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে। ইতিহাসবেত্তাদের মতে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত অধিক সংখ্যক লোক ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়, তেমন আর কখনও হয়নি। (সিরিয়া বিজয়ী) হ্যরত খালিদ এবং (মিসর বিজয়ী) হ্যরত আমর ইবনে আস (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণও এ সময়ের ঘটনা।

---

(১) হুদাইবিয়া সন্ধির ঘটনাবলী সহীহ্‌ বোখারীতে অতি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু ইহা كتاب المغازى বা যুদ্ধবিগ্রহ বর্ণনা অধ্যায়ে উল্লেখ না হয়ে كتاب الشروط তথা শর্তাদি বর্ণনা অধ্যায়ে উক্ত হয়েছে। সীরাত রচয়িতাদের দৃষ্টি হতে উক্ত ঘটনাবলী উহ্য থাকার কারণ এটি। গাযওয়া বা যুদ্ধ বর্ণনা অধ্যায়ে কোথাও কোথাও কিছুটা ঘটনা উল্লেখ হয়েছে। আমরা তাও সংকলন করে দিয়েছি। বাকি অংশগুলো সহীহ্‌ মুসলিম এবং ইবনে হিশাম হতে সংগৃহীত হয়েছে।

সন্ধিপত্রের এ শর্ত, যে মুসলমান মক্কা থেকে (মদীনা) চলে যাবে তাকে পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে দিতে হবে, শুধু মুসলমান পুরুষগণই উক্ত শর্তের আওতাভুক্ত ছিলেন, নারীগণ নয়! অতঃপর নারীদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়—

—"হে মুসলিমগণ! যখন তোমাদের কাছে মহিলারা হিজরত করে আসে, তখন তাদের পরীক্ষা করে নাও, আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত। অনন্তর যদি তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় যে তারা (বাস্তবিকই) মুসলমান, তবে তাদের আর কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিও না। (এখন থেকে আর) তারা কাফেরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফেররাও আর তাদের জন্য বৈধ নয়। এদের (মহর বাবত) তাদের কাফের স্বামীরা যে পরিমাণ দান করেছে তা তাদের প্রত্যর্পণ কর, আর তোমরা এদের মহর আদায় সাপেক্ষে বিয়ে করতে পার, (কিন্তু সাবধান)! কাফের মহিলাদের নিজের বিবাহ বন্ধনে রেখো না।"

—(সূরা মুম্‌তাহানা, ২য় রুকু);

যেসব মুসলমান বাধ্য হয়ে মক্কায় রয়ে গিয়েছিলেন, কাফেরদের কঠোর নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে তারা পালিয়ে মদীনায় আসতে লাগলেন। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম আগমন করেন হযরত ওতবা ইবনে উলাইদ (আবু বসীর) (রাঃ)। তাঁকে প্রত্যর্পণ করার জন্য কোরাইশরা হযরত (সাঃ)-এর কাছে দুজন দূত প্রেরণ করে। হযরত তাঁকে ফিরে যেতে বললে তিনি বললেন, কুফরীর প্রতি বাধ্য করার জন্যই কি আপনি আমাকে কাফেরদের কাছে ফিরে যেতে বলছেন? হযরত (সাঃ) বললেন, (যাতে তুমি রক্ষা পেতে পার) আল্লাহ্ তার কোন সুরাহা করে দেবেন। নিরুপায় হয়ে হযরত ওতবা সে কাফেরদ্বয়ের পাহারায় মক্কা রওয়ানা হল। যুল হুলাইফা নামক স্থানে এসে ওতবা (আবু বসীর) কাফেরদের একজনকে হত্যা করে ফেললেন। অপরজন আত্মরক্ষা করে মদীনায় এসে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট ঘটনাটি বিবৃত করে। ইত্যবসরে হযরত আবু বসীরও হযরত (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, সন্ধির শর্ত অনুযায়ী আপনি আমাকে প্রত্যর্পণ করেছেন। বর্তমানে আপনার আর কোন দায়িত্ব নেই। এ বলেই তিনি মদীনার বাইরে চলে গেলেন এবং যু-মারওয়ার নিকটবর্তী সমুদ্রতীরে 'ঈষ' নামক স্থানে আশ্রয়গ্রহণ করলেন। মক্কার নিপীড়িত ও নির্যাতিত লোকেরা যখন জানতে পারল যে আত্মরক্ষার মত একটি আশ্রয়স্থল আবিষ্কৃত হয়েছে, তখন তারাও সংগোপনে পালিয়ে ওখানে বসে সমবেত হতে লাগল। দেখতে দেখতে কিছু দিনের মধ্যেই ওখানে ছোটখাট একটি জমায়েত হয়ে গেল। অতঃপর তাঁরা এতটা শক্তিশালী হয়ে উঠলেন যে কোরাইশদের সিরিয়াগামী বাণিজ্য কাফেলার উপর নির্বিঘ্নে আক্রমণ চালিয়ে যেত লাগলেন। এ আক্রমণে যেসব লুণ্ঠিত দ্রব্য তাদের হস্তগত হত তাই ছিল তাঁদের জীবনধারণের অবলম্বন।

উদ্ভূত পরিস্থিতির চাপে নিরুপায় হয়ে কোরাইশরা হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট পত্র লিখে জানাল যে সন্ধিপত্রের ৫নং শর্ত আমরা বাতিল করছি। এখন থেকে যে কোন মুসলমান মদীনায় গিয়ে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারবে। আমরা আর তাদের উৎপীড়িত করব না। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সেসব বাস্তুহারা মুসলমানদের পত্র লিখে তাদের মদীনায় চলে আসার নির্দেশ দিলেন। সেমতে হযরত আবু জন্দল সাথিগণসহ মদীনায় চলে আসলেন। ফলে, সিরিয়ার সঙ্গে কোরাইশদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল।[১]

মুসলমান মহিলাদের মধ্যে মক্কার সর্দার (ওকবা ইবনে আবু মুঈত) তনয়া হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) মদীনায় হিযরত করে চলে আসেন। উমারা ও ওলীদ নামীয় তাঁর দুই ভাই মদীনায় এসে তাঁকে মক্কায় প্রত্যর্পণ করার জন্য হযরত (সাঃ)-এর নিকট আবেদন করল। হযরত (সাঃ) তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। অপরদিকে সাহাবাবৃন্দের যে সমস্ত অমুসলমান স্ত্রী মক্কায় রয়ে গিয়েছিল, তাঁরা তাদের তালাক দিয়ে দিলেন।

১. উপরোক্ত উদ্ধৃতটি খামীস কর্তৃক اكتفا، كلاعى ইক্‌তিফা ই-কালাঈ হতে সংগৃহীত হয়েছে

বাদশাহ্‌দের নিকট ইসলামের দাওয়াত

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

হুদাইবিয়ার সন্ধির কারণে কিছুটা স্বস্তিলাভ হলে ইসলামের অমিয় বাণী সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেয়ার সময় উপস্থিত হল। রসূলে খোদা (সাঃ) একদিন সাহাবায়ে কেরামকে সমবেত করে এক খুতবা দান করলেন— "হে মানবগণ! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য রহমত ও পয়গম্বর বানিয়ে পাঠিয়েছেন। সাবধান, হযরত ঈসা (আঃ)-এর হাওয়ারী বা সাহায্যকারীদের মত তোমরা মতভেদ করো না। যাও, আমার পক্ষ থেকে দিকে দিকে সত্যের পয়গাম পৌঁছে দাও।" অতঃপর তিনি রোমের সম্রাট কাইসার, পারস্যের সম্রাট কিস্‌রা, মিসরের শাসনকর্তা আযীয মিস্‌র এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রপতিদের নামে ইসলামের আহ্বান জানিয়ে কয়েকটি পত্র পাঠালেন। পত্রবাহক এবং যাদের পত্র লেখা হয়েছিল, নিম্নে তাদের নাম উল্লেখ করা হল।[১]

দূত বা পত্রবাহক	যাদের নামে পত্র লেখা হয়েছিল
হযরত দহ্ইয়া কাল্‌বী (রাঃ)	রোমের সম্রাট কাইসার
হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হুযাফা সাহ্‌মী(রাঃ)	পারস্যের সম্রাট খসরু পারভেজ
হযরত হাতিব ইবনে আবী বালতাআ'(রাঃ)	মিসরের শাসনকর্তা আযীযে মিস্‌র
হযরত আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ)	হাবশ বা আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশী
হযরত সালিত ইবনে ওমর ইবনে আবদে শাম্‌স (রাঃ)	ইয়ামামার গোত্রপতিগণ
হযরত শুজা'অ ইবনে ওয়াহাব আসাদী (রাঃ)	সিরিয়া সীমান্ত অধিপতি হারেস গাস্‌সানী

পারসিকগণ কয়েক বছর পূর্বে সিরিয়া আক্রমণ করে রোমকদের পরাজিত করে। কোআনের غُلِبَتِ الرُّوْمُ আয়াতে তাই উল্লিখিত হয়েছে। এ পরাজয়ের (গ্লানি সহ্য করতে না পেরে তার) প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে রোম সম্রাট হিরাক্‌ল (হিরাক্লিয়াস)[২] বিপুল অস্ত্র ও বহু সৈন্যসহ্ পারসিকদের প্রতি পাল্টা আঘাত হেনে তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। অতঃপর শুকরানা আদায়

১. তাবারী প্রথম খণ্ড ৫৫৯ পৃষ্ঠা এবং 'ইবনে হিশাম'-এর অর্থাৎ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের রাজন্যবর্গ সমীপে পত্র প্রেরণ অধ্যায়। 'সূ'

২. হিরাকল বা হিরাক্লিয়াস রোমক সম্রাট কাইসারের নাম। যেমন তদানীন্তন পারস্য সম্রাটের নাম খসরু পারভেজ এবং মিসরের শাসনকর্তা আযীযে মিসরের নাম মুকাউকিস ইত্যাদি।— অনুবাদক।

করার উদ্দেশ্যে তিনি মহাসমারোহে সিরিয়ার শহর 'হেমস' থেকে বাইতুল মোকাদ্দাস আগমন করেন। কথিত আছে, যেখানেই তিনি আগমন করতেন তাঁর চলার পথে মাটিতে গালিচা বিছানো হত এবং তার উপর ফুল সাজিয়ে দেয়া হত।[১]

সিরিয়ার বিখ্যাত গাস্‌সান নামীয় শক্তিশালী আরব গোত্রটি রোম সম্রাট কাইসারের[২] শাসনাধীন ছিল। তৎকালে সিরিয়ার রাজধানী বর্তমানে হুরান নামে প্রসিদ্ধ দামেশকের অন্তর্গত 'বুসরা' নামক শহরে অবস্থিত ছিল। হারেস গাস্‌সানী ছিলেন রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে নিয়োজিত এ জনগোষ্ঠীর শাসনকর্তা। হযরত দাহ্‌ইয়া কালবী (রাঃ) 'বুস্‌রা' উপস্থিত হয়ে হুযুর (সাঃ)-এর পত্রটি হারেস গাস্‌সানীর হাতে সমর্পণ করেন। তিনি পত্রটি কাইসার সমীপে পৌঁছাবার জন্য বাইতুল মোকাদ্দাস পাঠিয়ে দেন। পত্রপ্রাপ্তির পর কাইসার আরবের কোন লোক পাওয়া গেলে তাকে দরবারে উপস্থিত করার নির্দেশ জারি করেন। ঘটনাক্রমে আবু সুফিয়ান তখন আরব বণিকদের সঙ্গে 'গায্‌যাহ' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। কাইসারের লোকেরা সেখান থেকে তাদের এনে দরবারে উপস্থিত করে।

কাইসার মহা আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সঙ্গে দরবার স্থাপন করেন। স্বয়ং রাজমুকুট পরিধান করে সিংহাসনে সমাসীন হলেন এবং সিংহাসনের চার দিকে বিশিষ্ট খৃষ্টান সৈন্যাধ্যক্ষ, উচ্চ পর্যায়ের পাদ্রী এবং সন্ন্যাসীদের সারিবদ্ধভাবে বসালেন। অতঃপর আরবদের লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি নবী বলে দাবি করছে তোমাদের মধ্যে তাঁর নিকটতম আত্মীয় কেউ আছে কি?

আবু সুফিয়ান উত্তর দিলেন, আমি।

অতঃপর তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্ত কথোপকথন হল ঃ

কাইসার — নবুওতের দাবিদার লোকটির বংশমর্যাদা কেমন?

আবু সুফিয়ান— সম্ভ্রান্ত।

কাইসার— তাঁর বংশধরদের মধ্যে কি আরও কেউ নবুওতের দাবি করেছিল?

আবু সুফিয়ান— না।

কাইসার— তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কি কোন দিন রাজা ছিল?

---

১. হিরাক্লের পূর্ণ ঘটনা (বোখারী শরীফের শরাহ্) ফতহুল বারী ১ম খণ্ড ৩১ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত হল। মূল বিষয়টি বোখারী শরীফের "ওহীর প্রারম্ভিকতা কিভাবে হয়েছিল, জেহাদ এবং ইসলাম ও নবুওতের দিকে রসূলে করীম (সাঃ)-এর আহ্বান বিষয়ক অধ্যায়সমূহে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে (ফতহুল বারী গ্রন্থাকার) হাফেজ ইবনে হাজর (রহঃ) বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে এর বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। 'সু'

২. কাইসার কারো নাম নয়; বরং তৎকালীন রোমক সম্রাটদের উপাধি। তেমনি কিস্‌রা, ফাজকুলাহ্, আযীযে মিসর এবং নাজ্জাশীও নাম নয় বরং এগুলো যথাক্রমে পারস্য সম্রাট, ইরানের রাজা, মিসরের শাসনকর্তা ও হাবশ বা আবিসিনিয়ার বাদশাহদের উপাধি—অনুবাদক।

আবু সুফিয়ান— না।

কাইসার— যারা তাঁর ধর্মগ্রহণ করেছে, তারা দুর্বল প্রকৃতির লোক, না প্রতিপত্তিশালী?

আবু সুফিয়ান— অধিকাংশই দুর্বল প্রকৃতির।

কাইসার—তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বাড়ছে, না কমছে?

আবু সুফিয়ান— বাড়ছে।

কাইসার— তিনি কখনও মিথ্যা বলেছেন বলে তোমাদের জানা আছে কি?

আবু সুফিয়ান— না।

কাইসার— তিনি কি কখনও অঙ্গীকার বা সন্ধিভঙ্গ করেছেন?

আবু সুফিয়ান— এখন পর্যন্ত তো করেননি। তবে বর্তমানে (আমাদের এবং তাঁর মধ্যে) নতুন সন্ধি হয়েছে, তাতে তিনি দৃঢ় থাকেন না ভঙ্গ করেন, তা দেখার অপেক্ষায় আছি।

কাইসার— তাঁর সঙ্গে তোমাদের কি কোন যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে?

আবু সুফিয়ান— হ্যাঁ, একাধিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।

কাইসার— যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছে?

আবু সুফিয়ান— কখনও আমরা জিতেছি, কখনও তিনি।

কাইসার— তিনি কি শিক্ষা দেন?

আবু সুফিয়ান— তিনি শিক্ষা দেন যে এক, অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র এবাদত কর, তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করো না, নামায পড়, সচ্চরিত্রতা অবলম্বন কর, সত্য কথা বল এবং আত্মীয়তা রক্ষা কর।

উপরোক্ত কথোপকথনের পর কাইসার দোভাষীর মাধ্যমে বললেন; তোমরা তাঁকে সদ্বংশজাত বলেছ। পয়গম্বর চিরদিনই সদ্বংশজাত হয়ে থাকেন। তোমরা বলেছ, তাঁর বংশধরদের মধ্যে অন্য কেউ নবুওত দাবি করেননি। যদি দাবি করে থাকত, তবে মনে করতাম, এটা বংশগত ভাবধারার প্রতিক্রিয়া। তোমরা অস্বীকার করেছ যে এ বংশে কখনও কোন রাজা ছিলেন না। যদি থাকতেন, তবে মনে করতাম, তিনি রাজত্বের লোভে এমনটা করছেন। তোমরা বলছ, জীবনে কখনও তিনি মিথ্যা বলেননি। যিনি মানুষের সঙ্গে মিথ্যা বলেন না, তাঁর দ্বারা কখনও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলা সম্ভব হতে পারে না। তোমরাই বললে, দুর্বল প্রকৃতির লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করে। পয়গম্বরদের প্রাথমিক অনুসারী দরিদ্রপ্রকৃতির লোকেরাই হয়ে থাকে। তোমরা স্বীকার করলে যে তাঁদের ধর্ম (ক্রমান্বয়ে) উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। যেকোন সত্যধর্মের এ একই অবস্থা হয় অর্থাৎ ক্রমোন্নতির পথেই তা এগুতে থাকে। তোমরা বলেছ তিনি কখনও

প্রবঞ্চনা করেননি। পয়গম্বর কখনও প্রবঞ্চনা করতে পারেন না। তোমরা বললে, তিনি নামায, সংযম এবং সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে থাকেন। যদি তা সত্য হয়, তবে আমার পায়ের তলা পর্যন্ত তাঁর অধিকারে চলে যাবে। একজন পয়গম্বর আগমন করবেন বলে আমার অবশ্যই ধারণা ছিল। কিন্তু তিনি আরবে আবির্ভূত হবেন কখনও এমনটা ধারণা করিনি। যদি আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতে পারতাম, তবে স্বয়ং তাঁর চরণযুগল ধুয়ে দিতাম।

উপরোক্ত উক্তিসমূহ ব্যক্ত করার পর কাইসার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পত্রটি পড়ে শুনাবার নির্দেশ দিলেন।[১]

পত্রের এবারত নিম্নরূপ ছিল ঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مِنْ مُّحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلٰى هِرَقْلَ
عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ اَدْعُوْكَ
بِدِعَايَةِ الْاِسْلَامِ اَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَاِنْ
تَوَلَّيْتَ فَاِنَّ عَلَيْكَ اِثْمَ الْاَرِيْسِيِّيْنَ وَيَا اَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى
كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ -

"বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম। আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রসূল মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে রোমের সম্রাট হিরাক্ল (হিরাক্লিয়াস) সমীপে হেদায়েত অনুসারীদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকতে পারবেন। তাহলে আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন। পক্ষান্তরে, যদি তা অমান্য করেন, তবে সমগ্র দেশবাসীর পাপের জন্য আপনি দায়ী থাকবেন। হে আহ্লে কিতাবগণ, এমন একটি বাণীর দিকে এগিয়ে এসো যা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে সমান, বরাবর। তা এই যে আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারও এবাদত করব না, তাঁর সঙ্গে কাকেও অংশীদার করব না, আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে আমাদের কেউ যেন কাকেও তাঁর আসনে না বসায়। কিন্তু যদি তারা একথা না মানে তবে বলে দিন, আমরা মানছি, তোমরা এ ব্যাপারে সাক্ষী থেকো।"

১. উল্লিখিত উক্তিসমূহ সহীহ্ বোখারীর বিভিন্ন অধ্যায়ে তথা গ্রন্থের প্রথমাংশের বিভিন্ন স্থানে এবং জেহাদ অধ্যায়ে বর্ণিত রয়েছে।

আবু সুফিয়ানের সঙ্গে কাইসারের এরকম কথোপকথনে সৈন্যাধ্যক্ষ এবং পাদ্রীদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। পত্রটি পাঠ করার পর তারা আরও বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে গেল। এহেন অবস্থাদৃষ্টে কাইসার আরবদের রাজদরবার থেকে উঠিয়ে দিলেন, যদিও ইসলামের জ্যোতিতে তাঁর অন্তর জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল, পরন্তু রাজ্য ও সিংহাসনচ্যুতির আশঙ্কায় তা সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হয়ে গেল।[১]

(পারস্য সম্রাট) খসরু পারভেজের নামে লেখা যে চিঠি নিয়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হুযাইফা (রাঃ) গিয়েছিলেন তার এবারত ছিল এই ঃ

"পরম করুণাময়, কৃপানিধান আল্লাহ্‌র নামে আল্লাহ্‌র রসূল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাট কিসরা সমীপে তাদের প্রতি যারা হেদায়াত অনুসরণ করে এবং সাক্ষ্য দেয় যে এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই, আর আমি প্রেরিত হয়েছি সমস্ত বিশ্ববাসীর নিকট পয়গম্বর রূপে—যেন তিনি (পয়গম্বর) সকল জীবন্ত মানুষকে আল্লাহ্‌র ভয় প্রদর্শন করেন। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হবে। অন্যথায় অগ্নি উপাসনার যাবতীয় পাপের জন্য আপনি দায়ী থাকবেন।"

মহা প্রতাপান্বিত পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ। তাঁর রাজত্বকালে রাজদরবার যে অসীম প্রতাপ ও প্রভাবশীল হয়ে ওঠে তেমনটি ইতিপূর্বে আর কখনও হয়নি। রাজা-বাদশাহ্‌দের প্রতি পত্র লিখতে হলে শিরোনামায় প্রথমত তাদের নাম উল্লেখ করা ছিল তৎকালীন অনারববদের রীতি। রসূলে খোদা (সাঃ)-এর পত্রে প্রথমত আল্লাহ্‌র নাম তারপর আরবদের রীতি অনুযায়ী তাঁর নিজের নাম উল্লেখ ছিল। (এভাবে পত্র লেখায়) খসরু এতে করে তাঁকে তাচ্ছিল্য করা হয়েছে বলে মনে করেন এবং রাগান্বিত হয়ে বলতে লাগলেন; কি স্পর্ধা? আমার দাস হয়ে আমাকে এভাবে পত্র লেখা? অতঃপর তিনি পবিত্র পত্রটি ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেললেন। ফলে, কিছুদিনের মধ্যেই বিশাল পারস্য সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেল।

---

১. মুসনাদে ইবনে হাম্বল ৪র্থ খণ্ডের পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে—কাইসার হযরত দাহ্‌ইয়ার (রাঃ) সাথে পত্রোত্তর সহকারে নিজস্ব একজন দূত নবী করীমের (সাঃ) দরবারে প্রেরণ করেন। নবুওত সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করার জন্যও তিনি দূতকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। দূত প্রশ্ন উত্থাপন করলে রসূলে খোদা (সাঃ) তার প্রত্যেকটির যথাযথ উত্তর দান করেন। এতদসত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ ছাড়াই কাইসার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। উক্ত হাদীসটি ঠিক নয়। কেননা, কাইসারের উত্তর সংবলিত পত্র পাঠের জন্য রসূলে খোদা (সাঃ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-কে ডেকে পাঠান এবং তিনি এসে তা পাঠ করে শোনান বলে উক্ত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে ঐ সময় পর্যন্ত হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) ইসলামে দীক্ষিত হননি।
ইবনে হাজার (রাঃ)-এর সিদ্ধান্ত অনুসারে সবার মতে এটি অন্য ঘটনা এবং পূর্বোক্ত ঘটনার পরে এটি সংঘটিত হয়। ফতহুল বারী ৮ম খণ্ড ৯৭ পৃষ্ঠা এবং যারকানী ৩য় খণ্ড ৮৮ ও ৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এ হাদীসে এটি তাবুকের ঘটনা বলে স্পষ্ট উল্লিখিত রয়েছে। মক্কা বিজয়ের পর নবম হিজরীর রজব মাসে তাবুকের যুদ্ধ হয়। হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর এক বা দু'বছর পূর্বে হুদাইবিয়ায়, কিংবা মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হন। তবে তিনি তাবুকে যোগদান করেছিলেন বলে কোথাও উল্লেখ নেই।—আবু ওবাইদ আল কাসেম ইবনে সালাম প্রণীত এবং মিসর থেকে প্রকাশিত 'কিতাবুল আমওয়াল' গ্রন্থের ২৫৫ পৃষ্ঠায়ও এ রেওয়ায়েতটি একই সনদে উল্লিখিত হয়েছে।—'সু'

প্রখ্যাত পারস্য মহাকবি হযরত নেযামী (রঃ) পূর্ণ ইসলামী তেজস্বিতার সঙ্গে 'শিরী-খসরু' নামক কাব্যগ্রন্থে উপরোক্ত কাহিনীটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। নিচে আমরা তার কিছু চরণ উদ্ধৃত করলাম।

তৎকালে সমগ্র বিশ্ব তাঁর অধীন ছিল, মাশরিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত তাঁর নামযশ ব্যাপ্ত ছিল।

আমাদের রসূল (সাঃ) অকাট্য প্রমাণাদির মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে তাঁর নবুয়ত প্রচার করলেন।

কখনও তিনি কঠিন শিলাখণ্ডের সঙ্গে চুপিসারে কথা বলতেন, আবার কখনও আরবের ধুলোবালি তাঁর সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে কথা বলত।

দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দ্বারা তিনি সৃষ্ট জগৎকে শান্তির পানপাত্র দান করিয়েছেন এবং সকল দেশের লোককেই তা গ্রহণ করার ব্যাপক আহ্বান জানিয়েছেন।

তাঁর আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রজ্ঞাজনিত আতর সদৃশ সুগন্ধিযুক্ত অমিয় বাণী সংবলিত পত্রাদি প্রত্যেকের নামে লিখিত হল।

নাজ্জাশী সমীপে লিখে অবসরপ্রাপ্ত হলে তিনি খসরুর নামে পত্র লিখলেন।

দূত বা পত্রবাহক এ পত্রটি খসরুর দরবারে উপস্থাপন করলে ক্রোধে ও উত্তেজনায় তার দেহ কাঁপতে থাকে।

ক্রোধে তার প্রতিটি লোম তীরের মত কাঁটা দিয়ে ওঠে এবং প্রতিটি শিরা-উপশিরা থেকে যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বেরোতে থাকে।

আশ্চর্য! মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে পারভেজ সমীপে পত্র? এ কারণে তাঁর জ্বলন্ত চোখের পুত্তলিগুলো বিস্ফোরিত হয়ে প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে।

যখন তিনি রসূলে খোদা (সাঃ)-এর পত্রটির শিরোনামার প্রতি লক্ষ্য করলেন, তখন তুমি যদি উপস্থিত থাকতে তবে বলতে, কুকুরে কাটা জলাতঙ্কগ্রস্ত ব্যক্তির যেন পানির উপর দৃষ্টি পড়েছে।

রাজত্বের অহঙ্কার তাকে পথচ্যুত ও বিপথগামী করে ফেলে, (তাই সে ভাবতে লাগল) কি স্পর্ধা? কার এমন বুকের পাটা ও সাহস যে আমার মত মহাবিক্রম ও প্রতাপান্বিত সম্রাট সমীপে নামের উপর নিজের নাম উল্লেখ করে পত্র লিখতে পারে!

উত্তেজনায় জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড রূপ ধারণ করে তিনি মনে মনে একটি কুমতলব আঁটলেন। অতঃপর তা বাস্তবে পরিণত করলেন।

তিনি দর্প চূর্ণকারী উক্ত নামা মুবারক বা পবিত্র পত্রটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন— বস্তুত নামা মুবারক নহে; বরং নিজের নামটিই যেন ছিঁড়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন।

নিছক ধুঁয়াবিশিষ্ট উক্ত ক্রোধাগ্নি সম্পর্কে যখন মহিমান্বিত রসূলে পাক (সাঃ) অবগত হলেন, তখন তিনিও ক্রোধান্বিত হয়ে তার জন্য পতঙ্গ সদৃশ আকাশে বিদ্যুত গতিতে উড়ন্ত শক্তিসম্পন্ন বদদোয়া করলেন।

উক্ত বদদোয়ার কারণে পারস্য সম্রাট কিসরার পতন ঘটে এবং তাঁর মস্তক থেকে রাজমুকুট খসে পড়ে।

তিনিই সে মহান শাহানশাহ্ রসূলে খাদা (সাঃ) বেহেশতের সুসংবাদ এবং দোযখের ভয় প্রদর্শনের মাধ্যম যিনি তদানীন্তন ফরীদুন এবং জমশীদ তুল্য রাজাধিরাজদের উপরও রাজত্ব করেছিলেন।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্তসারের বিস্তারিত বর্ণনা

রসূলে খোদা (সাঃ)-এর পত্র পৌছার পর খসরু পারভেজ হেজাযে কোন লোক পাঠিয়ে নতুন নবুওতের দাবিদার লোকটিকে গ্রেফতার করে তাঁর দরবারে হাযির করার জন্য ইয়ামনের শাসনকর্তা 'বাযানের' প্রতি ফরমান জারি করেন। বাযান তদনুসারে বাবওয়াইহি এবং খরখসরা নামক দুজন দূতকে মদীনায় পাঠালেন। তারা নবী করীমের (সাঃ) দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, পারস্য সম্রাট (কিসরা) আপনাকে তলব করেছেন। আজ্ঞা পালনে অসম্মত হলে তিনি আপনার দেশসহ আপনাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন, যে কিস্‌রা (সম্রাট) তোমাদিগকে এ অন্যায় নির্দেশসহ প্রেরণ করেছেন; তিনি সম্ভবত এখন আর দুনিয়াতে নেই। কিসরার সিংহাসনে যিনিই থাকুন তাঁকে জানিয়ে দিও। তোমরা ফিরে যাও, সম্রাটের সিংহাসন পর্যন্ত ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি লাভ করবে।[১] এ বার্তা পৌছিয়ে দূতদ্বয় যখন ইয়ামনে ফিরে আসে, তখন খবর আসে, খসরু পারভেজ (তৎপুত্র) শেরওয়াহ্ কর্তৃক নিহত হয়েছে।

(আবিসিনীয় সম্রাট) নাজ্জাশী রসূলে পাক (সাঃ)-এর ইসলামী দাওয়াত-নামার উত্তরে লিখে পাঠালেন—"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহ্ তা'আলার সত্য পয়গম্বর।" হযরত জাফর তাইয়্যার (রাঃ) আবিসিনিয়ায় হিজরত করে আসার পর থেকে সেখানেই অবস্থান করছিলেন। নাজ্জাশী তাঁর হাতে ইসলামের 'বাইআত' গ্রহণ করেন। ইবনে ইস্‌হাক (রঃ) বর্ণনা করে—

(স্বয়ং উপস্থিত হতে না পারায়) নাজ্জাশী স্বীয় পুত্রকে ষাটজন সহচর সহকারে হযরত রসূলে খোদা (সাঃ)-এর খেদমতে আনুগত্য এবং হাজির হতে না পারার ওজর পেশ করার জন্য পাঠিয়ে দেন। দুঃখের বিষয়, যে জাহাজে করে তারা মদীনায় আসছিলেন সেটি পথে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ায় তাদের সকলেরই সলিল সমাধি ঘটে।[২]

১. তাবারী (তৃতীয় খণ্ড) ১৫৭২ পৃষ্ঠা।
২. তাবারী (তৃতীয় খণ্ড) ১৫৬৯ পৃষ্ঠা।

সাধারণ সীরাত রচয়িতাগণ লিখেছেন, নাজ্জাশী নবম হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। রসূলে করীম (সাঃ) তখন মদীনায় অবস্থান করছিলেন। এ সংবাদ শুনে তিনি গায়েবী জানাযা নামায আদায় করলেন। কিন্তু এটি একটি ভুল ধারণা। কেননা, সহীহ্ মুসলিম শরীফে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে রসূলে করীম (সাঃ) যে নাজ্জাশীর জানাযার নামায পড়েছিলেন, তিনি আলোচ্য বাদশাহ্ নাজ্জাশী ছিলেন না, (বরং অন্য কোন নাজ্জাশী ছিলেন)। পক্ষান্তরে, ইবনে কায়্যিম (রঃ) সীরাত গ্রন্থকারদের বর্ণনা সমর্থন করে বলেন, মুসলিম শরীফের বর্ণনার ঐ অংশটুকু বর্ণনাকারীর ভুলবশ, সংযোজিত হয়েছে।[১]

যারা হিজরত করে হাবশ তথা আবিসিনিয়ায় চলে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে হযরত আমির মুআবিয়া (রাঃ)-এর ভগ্নী হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ)-ও ছিলেন। কিছুকাল পূর্বে তাঁর পতি বিয়োগ হয়েছিল। হুযুরে আকদাস (সাঃ) তাঁকে বিয়ের পয়গাম জ্ঞাপন করে উম্মে হাবীবাকে (রাঃ) তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেবার জন্য নাজ্জাশীকে পত্র লিখে পাঠান। নাজ্জাশী হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আসকে উকীল নিয়োজিত করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পক্ষে চার শত দিনার মহরের এওয়াজে এ বিয়ের ইজাব-কবুল তথা বিবাহ্ অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। হযরত (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে নাজ্জাশী নিজেই এ মহ্র পরিশোধ করে দেন। অতঃপর হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) জাহাজযোগে সাগর পাড়ি দিয়ে মদীনায় উপনীত হন। নবী করীম (সাঃ) তখন খায়বরে অবস্থান করছিলেন। হযরত (সাঃ) প্রায়ই উম্মে হাবীবা (রাঃ)-এর নিকট নাজ্জাশীর হাল অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন।[২]

আযীযে মিসর (বা মিসরের শাসনকর্তা মুকাউকিসের) প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আহ্বান-লিপি এসে পৌঁছালে তিনি আরবী ভাষায় নিম্নোক্ত উত্তর পাঠান—

لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط، سلام عليك،
أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه
وقد علمت أن نبيا بقي وكنت أظن أن يخرج من الشام، وقد
أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان من
القبط عظيم وكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك-

"মোহাম্মদ (সাঃ) ইবনে আবদুল্লাহ্ নামে কিবতী প্রধান মুকাউকিসের পক্ষ থেকে ; আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আপনার পত্র পাঠ করেছি

১. (যাদুল মাআদ)। 'সু'
২. তারিখে তাবারী, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৫৭০ পৃঃ।

এবং তার মর্ম ও বিষয়বস্তু অনুধাবন করেছি। একজন নবীর আবির্ভাব হবে বলে অবশ্য আমার জানা ছিল এবং ধারণা ছিল যে তিনি শামের কোন অঞ্চলে আবির্ভূত হবেন। আপনার মহান দূতের প্রতি আমি (যথোপযুক্ত) সম্মান প্রদর্শন করেছি। কিবতীদের (মিসরীয় জাতিবিশেষের) মধ্যে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত দুটি কিশোরী[1] কিছু বস্ত্র এবং আপনার আরোহণের জন্য একটি খচ্চর সহকারে আমি দূতকে আপনার নিকট প্রেরণ করলাম।

কিন্তু তারপরেও আযীযে মিসর ইসলামের পতাকার নিচে আশ্রয় গ্রহণ করেননি। তিনি যে কিশোরী দুটি পাঠিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনের নাম ছিল মারিয়া কিবৃতিয়া (রাঃ) হযরত (সাঃ) তাঁকে নিজ হরম বা অন্তঃপুরের অন্তর্ভুক্ত করেন। দ্বিতীয় জনের নাম শিরীন (রাঃ)। তাঁকে হযরত হাস্‌সান (রাঃ)-এর হাতে সমর্পণ করা হয়। খচ্চরটির নাম ছিল দুলদুল। হাদীস গ্রন্থে প্রায়ই এর নাম উল্লেখ থাকে। এতে আরোহণ করে হুযুর (সাঃ) খয়বারের যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ইতিহাসবেত্তা তাবারি উল্লেখ করেছেন— মারিয়া এবং শিরীন সহোদরা বোন ছিলেন। বলতা'আ পুত্র হযরত হাতিব (রাঃ)-এর মাধ্যমে মহানবী (সাঃ) মুকাউকিসের কাছে পত্র পাঠিয়েছেন। তাঁরই শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ উভয় সহোদরা নবীজীর (সাঃ) দরবারে উপনীত হবার পূর্বে ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁরা বাঁদী ছিলেন না, বরং মুসলমান হয়েই দরবারে উপনীত হয়েছিলেন। রসূলে খোদা (সাঃ) হযরত মারিয়াকে বিয়ে করেছিলেন, বাঁদী হিসাবে তিনি তাঁর অন্তঃপুরে স্থান দেননি।

আরব সর্দার এবং নেতৃবৃন্দের নিকট যেসব পত্র লেখা হয়েছিল সেগুলোর বিভিন্ন রকম উত্তর পাওয়া যায়। ইয়ামামার সর্দার হুযা ইবনে আলী লিখে পাঠালেন "আপনার কথাসমূহ অতি উত্তম। তবে যদি আমাকেও প্রাপ্ত ক্ষমতার অংশ দান করেন, তাহলে আমি আপনার অনুগামী হওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছি।" রাজ্যলাভের জন্য ইসলামের আবির্ভাব হয়নি। সেমতে হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন— যমীনের একটি ক্ষুদ্র অংশও আমি তাকে দিতে রাজী নই।

সিরীয় সীমান্ত অধিপতি হারেস গাস্‌সানী রোমক শাসনাধীনে সীমান্তের একটি বিস্তৃত অঞ্চলে আরব অধিবাসীদের উপর রাজত্ব করে আসছিল। রসূলে খোদার (সাঃ) পত্র পাঠ করে সে ক্রুদ্ধ হয়ে সৈন্যদের প্রস্তুতির নির্দেশ দিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইসলামী দাওয়াত সংবলিত পত্র প্রেরণ তাঁর নিকট মহা

১. আমরা جارية জারিয়ার শব্দার্থ কিশোরী লিখেছি। আরবী ভাষায় কিশোরী এবং বাঁদী উভয়কেই جارية জারিয়া বলা হয়। সীরাত রচয়িতাদের মতে হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ) বাঁদী ছিলেন। কিন্তু মুকাউকিস তাঁর সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন অর্থাৎ মিসরীয় কিবতীদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিতা। বাঁদীদের ক্ষেত্রে এরূপ উক্তি কিছুতেই প্রযোজ্য হতে পারে না।

অপরাধ বলে গণ্য হল। অতএব, এ অপরাধের দরুন মুসলমানদের সর্বদা তার আক্রমণ প্রতিহত করার প্রতীক্ষায় থাকতে হত। এরই অশুভ পরিণাম হিসাবে শেষ পর্যন্ত মুতা এবং তবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[১]

ষষ্ঠ হিজরীর বিভিন্ন ঘটনা

হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ এবং হযরত আমৃর ইবনে আসের ইসলাম গ্রহণ

আল্লাহ্ তা'আলা হুদাইবিয়ার সন্ধিকে মহাবিজয় বলে ঘোষণা করেছেন। তবে ক্ষমতাজনিত বিজয় নয়, বরং আধ্যাত্মিক বিজয়। দিকে দিকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য শান্তি এবং নিরাপত্তার প্রয়োজন ছিল। (আল্লাহ্র মেহেরবানীতে) এ সন্ধির ফলেই তা সফল হয়। এ কারণেই, ইসলামের পরম শত্রুও একে বিজয় বলেই মনে করছিল।

কোরাইশ এবং মুসলমানদের মধ্যে এ পর্যন্ত যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সব ক্ষেত্রেই কোরাইশদের সঙ্গে হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)-এর নাম অমিততেজা একজন দক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। জাহেলিয়াত যুগেও তাঁর প্রতি রিসালা অর্থাৎ, সহস্র সৈন্যের বিরাট বাহিনী পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিল। ওহুদের যুদ্ধে টিকতে না পেরে কোরাইশগণ যখন পালাতে ব্যস্ত তখন তাঁরই রণ-কৌশলে তারা পুনঃ সুসংহত হয়। হুদাইবিয়ার সন্ধিকালেও দেখা যায় কোরাইশদের তেলায়া বা প্রহরী সেনাদল তাঁরই নেতৃত্বে প্রহরারত ছিল। কিন্তু কোরাইশদের এত বড় একজন সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তিনি ইসলামের যুগপ্লাবী অভিযানের প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি।

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর হযরত খালেদ মক্কা থেকে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে হযরত আমর ইবনে আসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আমৃর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি উত্তর করলেন, আর কত কাল? ইসলাম গ্রহণ করার অভিপ্রায়ে (মদীনা) রওয়ানা হয়েছি। হযরত আমৃর ইবনে আস বললেন, আমারও একই অভিপ্রায়। অতঃপর তাঁরা উভয়েই একত্রে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে পবিত্র ধর্মে দীক্ষিত হন।[২] (আল্লাহ্র অপার মহিমা)। এতদিন যে শৌর্য-বীর্য ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষয় হয়ে আসছিল, এখন থেকে তা ইসলামের মহব্বতে উৎসর্গিত হতে লাগল।

---

১. এতদ্ব্যতীত আরবের অন্যান্য আমীর এবং বিভিন্ন গোত্রের সর্দারদের নিকট ইসলামের আহ্বান যুক্ত যেসব পত্র লিখা হয়েছিল উহার বিস্তারিত বিবরণ অত্র গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের تبليغ و اقعات বা তবলীগী ঘটনাবলী অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হবে! 'সু'

২. ইবনে ইসহাকের বরাতে ইসাবী-ই-ইবনে হাজার (রাঃ) প্রথম খণ্ড ৪১৩ পৃঃ।

মক্কা বিজয়ের দিন হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) যখন একটি সেনাদলের সেনাপতি নিযুক্ত হয়ে রসূলে করীম (সাঃ)-এর সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? সাহাবাগণ উত্তর করলেন, খালেদ। হযরত (সাঃ) বললেন, সাইফুল্লাহ'; আল্লাহ্‌র অসি।[১]

মুতার যুদ্ধে হযরত জাফর, যায়েদ ইবনে হারেসা এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবাদের শাহাদতবরণ করার পর হযরত খালেদ (রাঃ) স্বহস্তে ইসলামের পতাকা তুলে নিতেই মুসলমানদের ভয়ভীতি ও বিপদাপদ যেন কোথায় উড়ে গেল।

খেলাফতে রাশেদার যুগে হযরত খালেদ (রাঃ) (রোম সম্রাট) কাইসারকে পরাজিত করে সমগ্র মুলকে শাম দখল করেন। অপরদিকে হযরত আম্‌র ইবনে আস (রাঃ) মিসর বিজয় করে বিশেষ গৌরব অর্জন করেন।

খয়বর অভিযান

'খয়বর' শব্দটি সম্ভবত হিব্রু ভাষার শব্দ। এর অর্থ দুর্গ বা কেল্লা। এ স্থানটি মদীনা থেকে আট মঞ্জিল দূরে অবস্থিত। ইউরোপীয় পর্যটকদের মধ্যে 'ডাউটি' ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কয়েক মাস এখানে অবস্থান করেছিলেন। তিনি মদীনা থেকে এর দূরত্ব দু'শত মাইল বলে উল্লেখ করেছেন।[২] খয়বরের তিন দিকে বিস্তৃত শস্য শ্যামল উর্বর ভূমি। ইহুদীরা এখানে কয়েকটি সুদৃঢ় দুর্গ স্থাপন করেছিল। আজও সেগুলোর কোন কোনটির ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট রয়েছে।

খয়বর ছিল আরবের ইহুদীদের প্রধান শক্তিকেন্দ্র। বনূ নাযীরের দলপতিরা মদীনা থেকে দেশান্তরিত হয়ে এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। অতঃপর তারা সমগ্র আরববাসীকে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে থাকে। খন্দকের যুদ্ধ তারই প্রথম বহিঃপ্রকাশ। এ দলপতিদের মধ্যে আখ্‌তাব পুত্র হুয়াই কোরাইযার যুদ্ধে নিহত হলে আবুল হাকীক তনয় আবু রাফে' সাল্লাম তার স্থলাভিষিক্ত হয়। সে ছিল প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য ব্যবসায়ী এবং প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। আরবের প্রচুর ক্ষমতাসম্পন্ন গাতফান গোত্রের বস্তিটিও ছিল খয়বরেরই সংলগ্ন। তারা সর্বদাই খয়বরের ইহুদীদের সঙ্গে মৈত্রী এবং সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকত[৩] হিজরী ষষ্ঠ সনের শেষাংশে সাল্লাম স্বয়ং তার চারদিকে বসবাসকারী গোত্রগুলোকে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে প্ররোচিত করতে থাকে। এভাবে এক বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করে সে মদীনা আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে।[৪] রসূলে খোদা (সাঃ) এ সম্পর্কে

১. তিরমিযী, মানাকিব অধ্যায়।
২. মার্গোলিস ৩৫৬ পৃঃ।
৩. ইবনে খালদুন ২য় খণ্ডে আরবিয় গোত্রসমূহের বর্ণনা অধ্যায় এবং তারীখে খামীস দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৩ পৃঃ খায়বর যুদ্ধ অধ্যায়।— 'সূ'
৪. ইবনে সা'দ ৬৬ পৃঃ।

অবগত হলে তাঁরই ইঙ্গিতে (হিজরী ষষ্ঠ সনের রমযান মাসে) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আতিক নামীয় এক খাযরাজী আনসারের হাতে সাল্লাম খয়বরের নিজ দুর্গে ঘুমন্ত অবস্থায় নিহত হয়। সাল্লামের পর ইহুদীরা উমাইর ইবনে যিরামকে তার স্থলাভিষিক্ত করে। উমাইর ইহুদীদের সমস্ত গোত্রকে সমবেত করে বলল, মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণজনিত পূর্ববর্তী নেতৃবৃন্দের যাবতীয় চেষ্টা-তদবীরই ছিল ভুল। মোহাম্মদ (সাঃ)-এর রাজধানী শহর মদীনা আক্রমণ করাই হবে যথোচিত ব্যবস্থা। সুতরাং আমি এ পন্থাই অবলম্বন করব। এতদুদ্দেশ্যে সে গাতফান এবং অন্যান্য গোত্রে ঘুরেফিরে একটি বিশাল বাহিনী গঠন করে। রসূলে খোদা (সাঃ) সমীপে এসব সংবাদ পৌছলে তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে খয়বরে পাঠিয়ে দেন প্রকৃত ঘটনা তদন্ত করার উদ্দেশ্যে। আবদুল্লাহ কয়েকজন লোক দিয়ে খয়বরে উপনীত হন এবং গোপনে নিজে উমাইরের মুখেই তার পরামর্শ ও তা বাস্তবায়নের উপায়াদি শুনে নেন। সেখান থেকে ফিরে এসে সেসব বিষয় মহানবী (সাঃ)-কে অবহিত করেন। তিনি (সাঃ) হযরত আব্দুল্লাহকে ৩০ জন লোকসহ খয়বর অভিমুখে রওয়ানা করেছেন। তাঁরা উমাইরকে বললেন, মহানবী (সাঃ) আমাদেরকে পাঠিয়েছেন, যাতে তুমি মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হও। তাহলে তোমাকে খয়বরের শাসনক্ষমতা দিয়ে দেয়া হবে। সুতরাং সে ৩০ জন লোকসহ খায়বর থেকে বেরিয়ে পড়ে। সতর্কতামূলকভাবে এ যৌথ কাফেলা একজন ইহুদী ও একজন মুসলমান একই বাহনে আরোহণ করে এগোতে লাগল। কারকারাহ্ নামক স্থানে পৌছার পর উমাইরের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হল। সে হাত বাড়িয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইসের তলোয়ারটি ছিনিয়ে নিতে চাইল। তিনি বললেন, ওহে আল্লাহর দুশমন! ওয়াদা লংঘন করতে চাস? এ বলে সওয়ারী এগিয়ে নিয়ে যান এবং উমাইর তাঁর হাতের আওতায় এসে গেলে তার উপর আঘাত হানেন। তার রান কেটে নিচে পড়ে যায় এবং সেও ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে যেতে হযরত আবদুল্লাহকেও আহত করে দেয়। অবস্থা দেখে মুসলমানরা ইহুদীদের উপর আক্রমণ করে বসেন। ফলে, একজন ছাড়া বাকি সমস্ত ইহুদী নিহত হয়। ঘটনাটি ছিল ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষ কিংবা ৭ম হিজরীর মহররমের ঘটনা।

এ সময় খায়বর ছিল মুসলমানদের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বী। তারা মক্কায় গিয়ে কোরাইশদের মাধ্যমে সমগ্র আরবে এক ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি করে দিল। এতে আহ্যাব যুদ্ধে ইসলামী কেন্দ্র মদীনা মুনাওয়ারাকে পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল। তাদের এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও, আনুষঙ্গিক ইসলাম বিরোধী বিষয়গুলো তখনো সক্রিয় থেকে যায়।

যারা আহযাব যুদ্ধ বাঁধিয়েছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী ছিল ইবনে আবীল হোকাইকের খান্দান। এরা ছিল বনী নাযীর গোত্রের একটা শাখা। মদীনা থেকে নির্বাসিত হয়ে খায়বরে এসে বসবাস করছিল। এরা খায়বরের বিখ্যাত দুর্গ কামূস অধিকার করে রেখেছিল। এ সাল্লাম ইবনে আবিল হোকাইক ছিল আশিটি খান্দানের সরদার। তার নিহত হওয়ার পর তারই ভ্রাতুষ্পুত্র কেনানাহ্ ইবনে রবী ইবনে আবিল হোকাইক খান্দানের সরকার হিসাবে নির্বাচিত হয়।

খায়বরের ইহুদীরা একদিকে গাতফান গোত্রের ছত্রচ্ছায়ায় ইসলামের মোকাবিলা করার ষড়যন্ত্র করছিল, অপরদিকে মদীনার মোনাফেকরা মুসলমানদের খবরাখবর পাচার করে যাচ্ছিল এবং তাদের উৎসাহিত করছিল যে মুসলমানরা তোমাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না।

মহানবী (সাঃ) চাচ্ছিলেন, যাতে তাদের সঙ্গে একটা সমঝোতা হয়ে যায়। এরই প্রেক্ষিতে তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহাকে পাঠিয়ে ছিলেন, কিন্তু একদিকে যেমন ইহুদীরা ছিল একটি কঠোর প্রকৃতির, সন্দেহপ্রবণ জাতি, অপরদিকে মুনাফেকদের উস্কনিমূলক তৎপরতা। এ সময়েই শ্রেষ্ঠ মুনাফেক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সলুল খায়বরবাসীদের বলে পাঠাল যে মুহম্মদ (সাঃ) তোমাদেরকে আক্রমণ করতে চাইছেন। কিন্তু তোমরা তাঁর ব্যাপারে কোন ভয় করো না। তাঁর অস্তিত্বইবা কতটুকু! মুষ্টিমেয় লোক মাত্র। অস্ত্রশস্ত্রও নেই তাদের। ইহুদীরা এসব কথা শুনে কেনানাহ্ ও হুদাহ্ ইবনে কাইসকে বনূ গাতফানের কাছে পাঠিয়ে দিল যে আমাদের সঙ্গে মিলে মদীনা আক্রমণ করলে আমরা মদীনার খেজুর বাগানগুলোর অর্ধেক উৎপাদন তোমাদেরকে দিয়ে দেব। (এক বর্ণনায় আছে যে) বনূ গাতফান এ প্রস্তাব মেনে নেয়।

গাতফানের এক শক্তিশালী গোত্র ছিল বনূ ফাযারাহ্। তারা যখন জানতে পারল যে খায়বরবাসীরা মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি আক্রমণ করতে চাইছে, তখন তারা নিজেরাই খায়বরে এসে জানায় যে আমরাও তোমাদের সঙ্গে মিলে লড়াই করতে চাই। মহানবী (সাঃ) যখন এ সংবাদ জানতে পালেন,তখন বনূ ফাযারাহ্কে লিখে বললেন যে তোমরা খায়বরবাসীর সহযোগিতা পরিহার কর। খায়বর বিজিত হলে তোমাদেরও তার অংশ দেয়া হবে। কিন্তু বনূ ফাযারাহ্ তা অস্বীকার করল। (হুনাইনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা)

যী-কা'র্দ-মহররম ৭ হিঃ ঃ গাতফানের যুদ্ধে অংশগ্রহণের ভূমিকা ছিল এই যে যী-কা'র্দের চারণভূমিতে যা মূলত মহানবী (সাঃ)-এর উটদের চারণভূমি ছিল (গাতফান গোত্রের কয়েক ব্যক্তি আবদুর রহমান ইবনে উয়াইনা নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে ২০টি উট ধরে নিয়ে যায়। এসব

উটের রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত হযরত আবু যর (রাঃ)-এর পুত্রকে হত্যা করে এবং তাঁর বিবিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। মুসলমানরা পিছু ধাওয়া করলে তারা পাহাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করে। যেখানে গাতফান গোত্রের সেনাপতি উয়াইনাহ্ ইবনে হিস্ন তাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত ছিল। এদিকে বিখ্যাত সাহাবী সালমা ইবনে আক্ওয়া সর্বপ্রথম তাদের আত্মগোপনের খবর পেয়ে 'ওয়া সাবাহা' ধ্বনি দিয়ে আক্রমণকারীদের উপর চড়াও হন। তখন তারা উটগুলোকে পানি খাওয়াচ্ছিল। সালমার তীর বর্ষণের মুখে শত্রুরা পালাতে লাগল। তিনি তাদের পিছু ধাওয়া করলেন এবং তাদের সঙ্গে লড়াই করে উটগুলোকে উদ্ধার করে আনলেন। তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর দরবারে এসে নিবেদন করলেন যে আমি শত্রুদের পিছু হটিয়ে দিয়েছি। আমরা এখন যদি শতেক লোক নিয়ে চেষ্টা করি তাহলে তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে আনতে পারি। সালমার বিবরণ শুনে রহমতের আধার মহানবী (সাঃ) এরশাদ করলেন, "সবল হলে ক্ষমা প্রদর্শন কর।"[১]

এ ঘটনার তিনদিন পরেই খায়বর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[২]

খায়বর যুদ্ধের সূচনা অন্যান্য যুদ্ধের তুলনায় এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সীরাতকারদের দৃষ্টি এ বিষয়টির উপর পড়েনি যে এ বৈশিষ্ট্যের কারণ কি ছিল? তথাপি ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতায় তাদের মুখ থেকেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়গুলো বেরিয়ে এসেছে। সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে মহানবী (সাঃ) খায়বর অভিযানের ইচ্ছা করার সঙ্গে সঙ্গেই তা সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে "আমাদের সঙ্গে শুধু তারাই থাকতে পারবেন যারা জেহাদ কামনা করেন।"

এ পর্যন্ত যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সেগুলো একান্তই আত্মরক্ষামূলক। এটাই মুসলমানদের প্রথম অভিযান যাতে অমুসলমানদের প্রজা বানানো হয় এবং সরকারপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। ইসলামের মুখ্য উদ্দেশ্য হল তাবলীগ ও দাওয়াত। সুতরাং কখনো কোন জাতি সম্প্রদায় যদি এ দাওয়াতের পথে বাধা সৃষ্টি না করে, তাহলে না তাদের সঙ্গে ইসলামের কোন যুদ্ধ হবে, না তাদের প্রজা বানানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। বরং শুধু সন্ধিচুক্তিই যথেষ্ট হয়। এর বহু দৃষ্টান্তও ইতিহাসে রয়েছে। কিন্তু যখনই কোন জাতি-সম্প্রদায় ইসলামের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, কিংবা তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইবে, তখনই বাধ্য হয়েই ইসলামের অনুসারিদের আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অস্ত্র তুলে নিতে হয় এবং আগ্রাসী প্রতিপক্ষকে নিজের ক্ষমতাধীন রাখতে হয়। এ রীতি মোতাবেক খায়বরই ইসলামের প্রথম বিজিত অঞ্চল ছিল।

---

১. বোখারী, মুসলিম।
২. কোন কোন সীরাত লেখক অবশ্য এ ঘটনাকে খায়বর যুদ্ধের তিন বছর পূর্বের ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন।

গয্ওয়া তথা যুদ্ধসংক্রান্ত আলোচনার পর বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হবে যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানুষ জেহাদকেও আরবের আদি প্রথা অনুযায়ী জীবিকার উপায় বলেই বিবেচনা করত। আলোচ্য খায়বর অভিযান পর্যন্ত এ ভ্রান্ত ধারণাই চলে আসছিল।

এটাই প্রথম অভিযান যার মাধ্যমে প্রকাশ্য জানিয়ে দেয়া হয় যে পূর্বের ধারণাগুলো একান্তই ভ্রান্ত। সুতরাং মহানবী (সাঃ) এরশাদ করলেন যে এ অভিযানে শুধুমাত্র তারাই অংশগ্রহণ করবে, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে জেহাদ ও আল্লাহ্র বাণী প্রচার।

বস্তুত, মহানবী (সাঃ) গাতফান ও ইহুদীদের আক্রমণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে ৭ম হিজরীর মহররম মাসে হযরত সিবা, ইবনে উরফাত গিফারী (রাঃ)-কে মদীনার প্রশাসক নিযুক্ত করে মদীনা থেকে রওনা হয়ে যান। এ অভিযানে মহান বিবিদের মধ্য থেকে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সৈন্য সংখ্যা ছিল দুশ' অশ্বারোহীসহ মোট ষোলশ'। এবারই তিনি প্রথমবারের মত তিনটি পতাকা নির্মাণ করিয়ে নেন। তার দুটি হুবাব ইবনে মুনযির (রাঃ) ও হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রাঃ)-কে অর্পণ করেন এবং উম্মত জননী হযরত আয়েশার (রাঃ)-এর চাদর দ্বারা নির্মিত বিশেষ নববী পতাকা জনাব আমীর (রাঃ)-এর হাতে অর্পণ করেন। এ ইসলামী সেনাবাহিনী রওয়ানা হলে বিশিষ্ট কবি হযরত আমের (রাঃ) ইবনে আক্ওয়া নিম্নের রাজ্য (শারী) পড়তে পড়তে এগিয়ে যেতে থাকেন।

اَللّٰهُمَّ لَوْلَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ـ وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

হে আল্লাহ্, তুমি হেদায়েত না করলে আমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হতে পারতাম না। না দান-খয়রাত করতাম, না-ইবা নামায আদায় করতাম।

فَاغْفِرْ فِدَاءً لَّكَ مَا اتَّقَيْنَا ـ وَاَلْقِيَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا

আমরা তোমার প্রতি নিবেদিত। যারা তোমার নির্দেশ মানতে পারেনি, তাদের ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ কর।

وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَّاقَيْنَا ـ اِنَّا اِذَا صِيْحَ بِنَا اَتَيْنَا

আমরা যখন (শত্রুর সঙ্গে) মোকাবিলায় লিপ্ত হই, আমাদের দৃঢ়পদ রাখ। মানুষ যে আমাদের ডেকে সাহায্য কামনা করছে।

এসব কবিতাপংক্তি বোখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত করা হয়েছে। মুসনাদে ইবনে হাম্বল আরো কয়েকটি পংক্তি অতিরিক্ত উদ্ধৃত রয়েছে। তাতে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে এ যুদ্ধেও প্রথম আক্রমণ করেছিল শত্রুপক্ষই। পংক্তিগুলো এরূপ —

إِنَّ الَّذِيْنَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا - إِذَا أَرَادُوْا فِتْنَةً أَبَيْنَا

وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا

যারা আমাদের উপর হাত বাড়িয়েছে (আক্রমণ করেছে) যখন তারা কোন হাঙ্গামা বাধাতে চায়, তখন আমরা তাদের প্রতি ভীত হই না। হে আল্লাহ্! আমরা তোমার সাহায্যের প্রতি অমুখাপেক্ষী নই।

পথে একটি প্রান্তর উপস্থিত হয়। সাহাবায়ে কেরাম সুউচ্চ কণ্ঠে নারয়ে তকবীর ধ্বনি দিতে থাকেন। যেহেতু শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া ক্রমাগতই চলতে থাকত এবং পতি পদক্ষেপেই শরীয়তের খুটিনাটি বিষয় শিক্ষাদান চলত, তাই মহানবী (সাঃ) এরশাদ করলেন, "একটু আস্তে! কারণ, তোমরা কোন বধির কিংবা বহু দূরের কাউকে ডাকছ না। তোমরা যাকে ডাকছ। তিনি তোমাদের কাছেই রয়েছেন। (বোখারী খায়বর অভিযান।)

এ অভিযানে কিছু মহিলাও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সেনাবাহিনীর সঙ্গে শরীক হয়েছিলেন। মহানবী (সাঃ) বিষয়টি জানতে পেরে তাঁদের ডেকে পাঠালেন এবং রাগের সুরে বললেন, তোমরা কার সঙ্গে এসেছ? কার হুকুমে এসেছ? তাঁরা বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমরা চরখা কেটে কিছু উৎপাদন করব এবং একাজে সাহায্য করব। আমাদের সঙ্গে আহতদের জন্য কিছু ওষুধও রয়েছে। তাছাড়া আমরা তীর কুড়িয়ে আনব।" অতঃপর যুদ্ধ শেষে গনীমতের মালামাল বন্টনের সময় তাঁদেরও অংশ রাখলেন। কিন্তু এ অংশটি কি ছিল? তা হিরা-জহরত ছিল না, ধন-সম্পদ ছিল না, টাকাকড়ি ছিল না, বরং তা ছিল শুধু কিছু খেজুর। সমস্ত মুজাহেদীন তাই পেয়েছিলেন। সে সঙ্গে পর্দানশীনরাও তাই প্রাপ্ত হন।

এ ঘটনাটি আবু দাউদে উল্লিখিত রয়েছে। হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থরাজি থেকে প্রমাণিত হয় যে অধিকাংশ গযওয়া তথা অভিযানেই মহিলারা অংশগ্রহণ করতেন। তাঁরা যুদ্ধাহতদের চিকিৎসাদান এবং সৈনিকদের পানি পান করাতেন। ওহুদ যুদ্ধে হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক মশক ভরে ভরে পানি আনা এবং আহতদেরকে তা পান করানোর ঘটনা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মহিলারা

যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তীর কুড়িয়ে এসে সৈনিকদেরকে সরবরাহ্ করতেন এ বিষয়টি একমাত্র আবু দাউদই উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এর সনদ একান্তই শুদ্ধ। সুতরাং কোনরকম সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। তাছাড়া এমনিতেও বীর প্রসবিনী আরব মহিলাদের থেকে অন্তত এতটুকু অবশ্যই আশা করা যেতে পারে।

একথা যেহেতু পূর্বাহ্নেই জানা ছিল যে গাতফানরা খায়বরবাসীরে সাহায্যে এগিয়ে আসবে, তাই মহানবী (সাঃ) গাতফান ও খায়বরের মধ্যবর্তী 'রাজী' নামক স্থানে সৈন্যদের নামিয়ে কিছু আসবাবপত্র তাঁবু আদি ও মহিলাদের এখানে রেখে সৈনিকরা খায়বরের দিকে এগিয়ে যান। পরে গাত্ফানরা জানতে পারে যে ইসলামী বাহিনী খায়বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে,তখন তারা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে সেদিকেই এগুতে থাকে। কিন্তু পরে যখন জানতে পারে যে তাদের বাড়ি-ঘরই অরক্ষিত, তখন সেখান থেকে ফিরে যায়। (তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৫৭৫ পৃঃ)।

খায়বরে সালেম, কামুস, নাতাত, কাসারাহ্, শিক্ ও মুরবাতাহ্ নামে ৬টি দুর্গ ছিল। ইয়াকুবীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী যেসব দুর্গে বিশ হাজার সৈন্য অবস্থান করছিল। এসব দুর্গের মধ্যে কামুস দুর্গটিই ছিল সর্বাধিক মজবুত ও সংরক্ষিত। হাজার বীরের সেরা বীর বলে কথিত মারহাব ছিল সে দুর্গেরই সেনাধ্যক্ষ। মদীনা থেকে নির্বাসিত হয়ে খায়বরের আধিপত্য অর্জনকারী ইবনে আবিল হোকাইকের খান্দানও এ দুর্গেই অবস্থান করত।

ইসলামী বাহিনী খায়বরের নিকটবর্তী সাহ্বা নামক স্থানে পৌছালে আসর নামাযের সময় হয়ে যায়। মহানবী (সাঃ) সেখানেই আসরের নামায আদায় করেন এবং খাবার আনতে বলেন। রসদভাণ্ডারে খাবার হিসাবে ছাতু ছাড়া আর কিছুই রইল না। তিনি তাই পানিতে গুলে পান করলেন। (বোখারী) রাত নেমে আসতে আসতে ইসলামী বাহিনী খায়বরের উপকণ্ঠে পৌছে গেল। সেখান থেকে খায়বরের দালান-কোঠা দেখা যাচ্ছিল। মহানবী (সাঃ) সকলকে সমবেত করলেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র নাম নিয়ে নিম্নের দোয়া করেন ঃ

"হে আল্লাহ্ আমরা তোমার দরবারে এ জনপদের, এ জনপদবাসীর এবং এর অন্যান্য যাবতীয় বস্তুসামগ্রীর কল্যাণ কামনা করছি। এর যাবতীয় অকল্যাণ থেকে তোমার নিরাপত্তা কামনা করছি।"

ইবনে হিশাম লিখেছেন যে এটা মহানবী (সাঃ)-এর সাধারণ অভ্যাস ছিল যে যখনই তিনি কোনখানে পদার্পণ করতেন, তখন দোয়া করে নিতেন। যেহেতু রাতের বেলায় আক্রমণ করা হযরত নবী করীমের (সাঃ) রীতিবহির্ভূত ছিল, তাই তিনি সেখানেই (অর্থাৎ খায়বরের উপকণ্ঠে) রাত্রি যাপন করেন। ভোরে খায়বরে প্রবেশ করেন। ইহুদীরা ইতিমধ্যে তাদের মহিলাদের নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে

দেয়, খাদ্যশস্য, রসদপাতি নায়েম নামক দুর্গে একত্রিত করে এবং 'নাতাত' ও 'কামূস' দুর্গে সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। তখন আসলাম ইবনে মিশ্‌কাম নাযারী অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং নাতাত দুর্গে অবস্থিত বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করে।

যুদ্ধ করার ইচ্ছা মহানবী (সাঃ)-এর আদৌ ছিল না। কিন্তু ইহুদীরা যখন বিপুল প্রস্তুতি নিয়ে যুদ্ধে এগিয়ে আসে, তখন তিনি সাহাবিগণকে উদ্দেশ্য করে উপদেশ দানসহ্ যুদ্ধের প্রতি উৎসাহিত করেন। 'তারীখে খামীস' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে ঃ

"যখন মহানবী (সাঃ) নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে ইহুদীরা যুদ্ধ করবেই, তখন তিনি সাহাবিগণকে উপদেশদানপূর্বক জেহাদে উৎসাহিত করেন।"

সর্বপ্রথম ইসলামী বাহিনী গানেম দুর্গের দিকে এগিয়ে যায়। হযরত মাহ্‌মুদ ইবনে মুস্‌লিমাহ্ (রাঃ) অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করতে থাকেন। প্রচণ্ড গরম থাকায় ক্লান্ত হয়ে যখন তিনি দুর্গের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন দুর্গের ফসীল থেকে কেনানাহ্ ইবনে বারী তাঁর মাথার উপর যাঁতার একটি পাট ফেলে দেয়। ফলে, তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু অতঃপর শীঘ্রই দুর্গটি বিজিত হয়। (ইবনে হিশাম)

নায়েমের পর অন্যান্য দুর্গগুলো সহজেই বিজিত হয়ে যায়। কিন্তু 'কামূস' দুর্গটি ছিল বীরযোদ্ধা মারহাবের ক্ষমতা ও শক্তির কেন্দ্রবিন্দু। সুরক্ষিত দুর্গের ফটক ভেদ করার অভিযানে মহানবী (সাঃ) হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)-কে নিয়োগ করেন। কিন্তু একে একে তাঁরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। তাবারীতে বর্ণিত আছে যে খায়বরী সৈনিকেরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলে হযরত ওমর (রাঃ) তার মোকাবিলায় টিকতেই পারেননি। পরে মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে এসে অভিযোগ করেন যে আমাদের সহযোদ্ধারা ভীরুতা প্রদর্শন করেছে। অবশ্য অন্যান্য সৈন্যরা তাঁর বিরুদ্ধে ঐ একই অভিযোগ করেন।

এ রেওয়ায়েতটি তাবারী যে সনদে বর্ণনা করেছেন, তার একজন রাবী বা বর্ণনাকারী হলেন আউফ। তাঁকে অনেকেই বিশ্বস্ত বা সেক্বা বলেছেন। কিন্তু বিন্‌দার যখন তাঁর কোন রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেন, তখন তাঁকে রাফেযী ও শয়তান বলে অভিহিত করেন। এ শব্দটি খুবই কঠিন। তবে তিনি যে শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন তা সর্বজনস্বীকৃত এবং যদিও শিয়া হওয়াটাই অবিশ্বাসযোগ্য হওয়ার প্রমাণ নয়, কিন্তু এটা বাস্তব যে যেসব রেওয়ায়েতে হযরত ওমরের (রাঃ) পলায়নের ঘটনা বিবৃত হয়ে থাকবে কোন শিয়ার দৃষ্টিতে সে রেওয়াতের কি গুরুত্ব থাকতে পারে? তাছাড়া উপরোল্লিখিত রাবী (বর্ণনাকারী) আব্দুল্লাহ্ ইবনে বারীদাহ্ তাঁর পিতার বরাত দিয়ে রেওয়ায়েত করেছেন। কিন্তু হাদীসবেত্তাগণ পিতার বরাতে বর্ণনাকৃত তাঁর রেওয়ায়েতসমূহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছেন।

তা সত্ত্বেও রেওয়ায়েতের এতটুকু অবশ্যই সত্য যে এ অভিযানে প্রথমে বড় বড় সাহাবীকে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু বিজয়ের গৌরব লেখা ছিল অন্য কারো ভাগ্যেই। তাই অভিযানে যখন অনেক বিলম্ব ঘটতে লাগল, তখন একদিন সন্ধ্যায় মহানবী (সাঃ) এরশাদ করলেন, আগামীকাল আমি অভিযানের পতাকা (তথা নেতৃত্ব) এমন একজনের হাতে তুলে দেব, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ বিজয় দান করবেন। সে আল্লাহ্ ও রসূলকে ভালবাসে। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলও তাঁকে ভালবাসেন। (বোখারী) এ রাতটি ছিল একান্ত আশা ও অপেক্ষার রাত। সাহাবিগণ সারারাত এ অস্থিরতার মাঝে অতিবাহিত করেন যে দেখা যাক, এ গৌরবের মুকুট কার হাতে অর্পিত হয়। হযরত ওমর (রাঃ) আত্মতুষ্টি ও বলিষ্ঠ মনমানসিকতার দরুন কখনো সরকার কিংবা সরদারীর আশা করেননি। কিন্তু যেমন সহী মুসলিমে হযরত আলীর প্রশাস্তি শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে, তিনি নিজেও স্বীকার করতেন যে আলোচ্য এ সুযোগের আকাঙক্ষার কারণে তাঁর সে ব্যক্তিত্ববোধও স্থির থাকতে পারেনি।

ভোর হতেই সহসা কানে এ আওয়ায ভেসে এল যে আলী (রাঃ) কোথায়? বিষয়টি ছিল একান্তই অপ্রত্যাশিত। কারণ, তখন হযরত আলীর চোখে পানি পড়ার উপসর্গ ছিল। সবাই জানতেন যে তিনি যুদ্ধে অপারগ। কিন্তু তলব অনুযায়ী তিনি গিয়ে নবী করীমের (সাঃ) দরবারে হাযির হল। মহানবী (সাঃ) তাঁর চোখ নিজের মুখে সামান্য লালা লাগিয়ে দেন এবং দোয়া করেন। অতঃপর যখন তাঁর হাতে পতাকা তুলে দেয়া হল, তিনি নিবেদন করলেন ইহুদীদের যুদ্ধে মুসলমান করে ফেলব? এরশাদ হল, "নম্রতার সঙ্গে তাদের সামনে ইসলাম পেশ কর। একটি লোকও যদি তোমার হেদায়েতে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তবে তাও অগণিত সংখ্যক লাল উটের চাইতে উত্তম।"(বোখারী)

কিন্তু ইহুদীরা ইসলাম কবুল করতে অথবা সন্ধিস্থাপনে সম্মত হতে পারছিল না। মাযহাব দুর্গের ভেতর থেকে নিম্নলিখিত সারি গাইতে গাইতে বেরিয়ে এল ঃ

"খায়বর একথা জানে যে আমি হলাম মারহাব। আমি নির্ভীক, অভিজ্ঞ ও বর্মপরিহিত।"

মারহাবের মাথায় তখন ইয়ামনে নির্মিত সবুজ রঙের 'মিগ্‌ফার' (শিরস্ত্রাণ) ছিল। তার উপর শোভা পাচ্ছিল পাথরের খৌদ। পুরানো দিনে গোল পাথরকে ভেতর থেকে খোদাই করে ফাঁকা করে নেয়া হত।

মারহাবের সেই বাগাড়ম্বরের জবাবে হযরত আলী (রাঃ) বললেন ঃ

انا الذى سمتنى امى حيدره - كليث غابات كريه المنظره

অর্থাৎ, "আমি হলাম সে ব্যক্তি আমার মাতা যার নাম রেখেছিলেন সিংহ। আমি বনের সিংহের মতই ভয়ঙ্কর, বিকটদর্শন।"

মারহাব সদর্পে এগিয়ে এল। কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) তলোয়ারের এমন প্রচণ্ড আঘাত হানলেন যে তার মাথা দ্বিখণ্ডিত হয়ে দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত নেমে এল এবং আঘাতের শব্দ সৈন্যদের কানে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাল। (তাবারী, ১৫৭৯ পৃঃ) মারহাবের মত যোদ্ধা বীরের মৃত্যু ছিল সমগ্র পরিবেশ স্তব্ধ করে দেয়ার মত একটা ঘটনা। কাজেই বিস্ময়প্রিয়তা এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত বাড়াবাড়িপূর্ণ গুজব রটনা করে। 'মা আলেমুত্তানযীল' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত আলী (রাঃ) যখন তলোয়ার মারলেন, মারহাব তখন তা ঢাল দ্বারা প্রতিহত করল, কিন্তু যুলফিকার (কোন বাধাই মানল না) শিরস্ত্রাণ ও মস্তক কেটে দাঁত পর্যন্ত নেমে এল। মারহাবের নিহত হবার পর ইহুদী বাহিনী যখন ব্যাপক আক্রমণ করল, তখন দৈবাৎ হযরত আলীর (রাঃ) হাত থেকে ঢালটি ফসকে পড়ে গেল। তখন তিনি দুর্গের লৌহনির্মিত কপাটটিই খসিয়ে নিলেন এবং সেটিই ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে লাগলেন। এ ঘটনার পর আবু রাফে' সাতজন লোক সঙ্গে নিয়ে সেটি তুলে আনতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু জায়গা থেকে এতটুকু নাড়াতে পারলেন না। এসব বর্ণনা ইবনে ইসহাক ও হাকেম উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু আসলে এসবই বাজারী কাহিনী। আল্লামা সাখাভী 'মাকাসেদে হাসানাহ' গ্রন্থে এগুলোকে كلها واهية (এসবই বাজে গল্প) বলে অভিহিত করেছেন।

আল্লামা যাহাবী 'মীযানুল এ'তেদাল' গ্রন্থে আলী ইবনে আহমদ ফররুখ-এর অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত রেওয়ায়েতটিও উদ্ধৃত করেছেন যে এটি অগ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েত। ইবনে হিশাম যে ধারাবাহিকতায় এসব ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তার একটিতে মাঝখান থেকে একজন বর্ণনাকারীর নামই বাদ দিয়ে দিয়েছেন। আর দ্বিতীয়টিতে এ সমুদয় ত্রুটির সঙ্গে সঙ্গে বারীদাহ ইবনে সুফিয়ানের নাম উল্লেখ করেছেন যাকে ইমাম বোখারী, আবু দাউদ ও দারেকুত্নী বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করেননি।

ইবনে ইসহাক, মূসা ইবনে ওক্বা, ওয়াকেদী প্রমুখ উল্লেখ করেছেন যে মারহাবকে মুহম্মদ ইবনে মুসাল্লামাহ্ হত্যা করেছিলেন। মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল ও মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থ নববীতেও এমনি এক বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু সহীহ্ মুসলিম ও হাকেম (২য় খণ্ড, ৩৯ পৃঃ)-তে হযরত আলী (রাঃ)-কেই মারহাবের হত্যাকারী এবং খায়বর বিজয়ী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত, এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ বর্ণনা।

যাহোক, এ কামুস দুর্গ বিশ দিনের অবরোধের পর বিজিত হয়। এসব অভিযানে ৯৩ জন ইহুদী নিহত হয়। এদের মধ্যে হারেস, আইসার, ইয়াসির আমের প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সাহাবিগণের মধ্যে ১৫ জন শাহাদাতবরণ করেন। ইবনে সা'দ তাঁদের বিস্তারিত আলোচনা লিখেছেন।

বিজয়ের পর বিজিত ভূমি দখল করে নেয়া হয়। কিন্তু ইহুদীরা বিনীত নিবেদন জানাল যাতে ভূমি তাদেরই হাতে থাকতে দেয়া হয়। তারা উৎপাদনের অর্ধেক অংশ পরিশোধ করে দেবে। এ আবেদন গৃহীত হয়। ফসল কাটার সময় হলে মহানবী (সাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে (রাঃ) পাঠিয়ে দিতেন। তিনি শস্যের দু'ভাগ করে ইহুদীদেরকে বলতেন, যেটা ইচ্ছা তোমরা নিয়ে নাও। ইহুদীরা এ নিরপেক্ষতায় বিস্মিত হয়ে বলত, এ ন্যায়বিচারের দরুনই আসমান ও যমীন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। (ফুতূহুল বুলদান, ২৭ পৃঃ খায়বর বিজয়, তাবারী ১৫৮৯ পৃঃ)। পরে খায়বরের সমুদয় ভূমি এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহেদীনের মাঝে বিতরণ করে দেয়া হয়। এর মধ্যেই ছিল মহানবী (সাঃ)-এর এক-পঞ্চমাংশ।

সাধারণভাবে বর্ণিত আছে যে গনীমতের যাবতীয় মালামালের মধ্য থেকে এক-পঞ্চমাংশ ছাড়াও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্য বিশেষভাবে একটা অংশ আলাদা করে নেয়া হত, যাকে বলা হত 'সাফী'। এরই প্রেক্ষিতে (কেনানা ইবনে রাবী'র স্ত্রী) হযরত সাফিয়া (রাঃ)-কে তিনি নিয়ে নেন এবং পরে মুক্ত করে বিয়ে করে নেন।

হযরত সাফিয়াহ্ (রাঃ)-এর ঘটনার বিশ্লেষণ ঃ হযরত সাফিয়া (রাঃ) সম্পর্কে কোন কোন হাদীস ও সীরাত গ্রন্থে এ ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে যে মহানবী (সাঃ) প্রথমে তাঁকে হযরত দাহিয়া কালবী (রাঃ)-এর ভাগে দিয়ে দেন। পরে কেউ গিয়ে নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে তাঁর অনন্য রূপের প্রশংসা করলে তিনি হযরত দাহিয়া কালবীর কাছ থেকে সাফিয়াকে চেয়ে নেন এবং তার বিনিময়ে তাঁকে ৭টি বাঁদী দান করেন। বিরুদ্ধবাদীরা এ রেওয়ায়েতটিকে অত্যন্ত নোংরাভাবে উপস্থাপন করেছে। বস্তুত, প্রকৃত রেওয়ায়েতে যখন এতটুকু উল্লেখ রয়েছে, তখন বলাই বাহুল্য বিরোধীরা একে কিভাবে ব্যবহার করতে পারে।

মূলত হযরত সাফিয়াহ্ (রাঃ)-এর ঘটনাটি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত আনাস থেকেই বেশ কয়েকটি রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে যেগুলোর মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য বিদ্যমান। বোখারীতে খায়বর প্রসঙ্গে যে রেওয়ায়েতখানি রয়েছে তাতে এ বিশ্লেষণও রয়েছে যে খায়বর দুর্গ বিজিত হবার পর লোকেরা মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে হযরত সাফিয়াহ্র অপরূপ রূপের কথা বলেন। তখন তিনি তাকে নিজের জন্য নিয়ে নেন। রেওয়ায়েতটির মূল ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ

فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية حيى بن اخطب
وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها النبى لنفسه -

অর্থাৎ, "আল্লাহ্ যখন দুর্গটি বিজয় করিয়ে দেন, তখন লোকেরা মহানবী (সাঃ)-এর কাছে সাফিয়াহ বিনতে হুইয়াই ইবনে আখ্‌তাবের রূপ-লাবণ্যের

প্রশংসা করেন। তাঁর স্বামী এ যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। মহানবী (সাঃ) তাঁকে নিজের জন্য পছন্দ করে নেন।

অবশ্য বোখারীর সালাত অধ্যায়ে এবং মুসলিমের বাঁদীর মুক্তিদান অধ্যায়ের হযরত আনাসেরই (রাঃ) অন্য এক রেওয়ায়েতে বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে যখন যুদ্ধের পর বন্দীদের সমবেত করা হয়, তখন হযরত দাহিয়াহ্ কালবী (রাঃ) মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে নিবেদন করলেন, "এদের মধ্য থেকে একটি বাঁদী আমাকে দিয়ে দিন।" হুযুর (সাঃ) তাঁকে বললেন যে "নিজেই গিয়ে কোন একটি বাঁদী নিয়ে নাও।" তখন তিনি হযরত সাফিয়াহ্কে পছন্দ করলেন। কিন্তু উপস্থিত লোকেরা তাতে আপত্তি করল। একজন এসে মহানবী (সাঃ)-এর কাছে বলল ঃ

نبی الله اعطیت دحیة صفیة بنت حیی سید قریظة والنضیر
لا تصلح الا لك ـ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহর রসূল, আপনি সাফিয়াহ্ বিনতে হুইয়াইকে দাহিয়ার হাতে সমর্পণ করেছেন, অথচ সে হল কোরাইযা ও নাযীর গোত্রের প্রধান নেতার কন্যা। আপনাকে ছাড়া তার যোগ্য আর কেউ নেই।"

অতঃপর তিনি হযরত সাফিয়াহ্কে মুক্ত করে দিয়ে তার সঙ্গে বিয়ে করে নেন। আবু দাউদ এ দুটি রেওয়ায়েতেই হযরত আনাস (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। বস্তুত আবু দাউদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিখ্যাত মোহাদ্দেস মাযারী (রাহঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে মহানবী (সাঃ) হযরত সাফিয়াহ্ (রাঃ)কে এ কারণে হযরত দাহিয়াহ্ (রাঃ) থেকে নিয়ে বিয়ে করে নেন যে

"যেহেতু তিনি অতি সম্মানিত ইহুদী নেতার কন্যা ছিলেন, তাই তাঁর পক্ষে অন্য কারো কাছে যাওয়া একান্তই তার অবমাননা ছিল।"

হাফেয ইবনে হাজারও ফাত্হুল বারী গ্রন্থে প্রায় একই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

এ বিষয়টি স্পষ্ট যে হযরত সাফিয়াহ্ (রাঃ) তাঁর বংশের ধ্বংসের বাইরে স্ত্রী কিংবা বাঁদী হয়ে থাকছিলেন। বস্তুত তিনি খায়বর অধিপতির কন্যা ছিলেন এবং তাঁর স্বামী বনূ নাযীর গোত্রের নেতা ছিল। পিতা ও স্বামী উভয়েই নিহত হয়েছিল। এমতাবস্থায় তাঁর সন্তুষ্টি, মর্যাদা রক্ষা ও মানসিক প্রশান্তির লক্ষ্যে এ ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না যে স্বয়ং মহানবী (সাঃ) তাঁকে নিজের স্ত্রী হিসাবে বরণ করে নেবেন। অবশ্য তিনি বাঁদী হয়েও থাকতে পারতেন, কিন্তু মহানবী (সাঃ) তাঁর বংশমর্যাদার প্রেক্ষিতে তাঁকে মুক্ত করে দেন এবং পরে বিয়ে করেন। (মুসনাদে আহ্মদ ইবনে হাম্বলে বর্ণিত আছে যে মুক্তি দেবার পর তাঁকে স্বাধীনতা

দেয়া হয় যে ইচ্ছা করলে তিনি নিজের বাড়িতেও চলে যেতে পারেন কিংবা নবী করীম (সাঃ)-এর বিবাহবন্ধনেও নিজেকে আবাদ করে নিতে পারেন। তিনি দ্বিতীয় বিষয়টি পছন্দ করেন। অর্থাৎ, মহানবী (সাঃ)-এর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।—মুস্‌নাদে আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল, ৩য় খণ্ড, ১৩৮ পৃঃ মিস্‌রী)।

গযওয়ায়ে বনী মুসতালিকে হ্যরত জুওয়াইরিয়াহ্‌ (রাঃ)-এর ক্ষেত্রেও এমনি ঘটনা ঘটে এবং তার যে প্রতিক্রিয়া হয়, তা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

বিজয়ের পর মহানবী (সাঃ) কয়েক দিন খায়বরে অবস্থান করেন। যদিও তখন ইহুদীদের পুরোপুরি নিরাপত্তা ও অভয়দান করা হয় এবং তাদের সঙ্গে সবরকম সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তথাপি তাদের আচরণ ছিল একান্ত বিদ্রোহাত্মক ও বিদ্বেষপূর্ণ। একদিন সালাম ইবনে মিশ্‌কাম-এর স্ত্রী ও মারহাবের আশ্রিতা যয়নব মহানবী (সাঃ)-কে কয়েকজন সাহাবীসহ দাওয়াত করলে তিনি দয়া করে তা কবুল করে নেন। যয়নব খাবারের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দেয়। হুযুর (সাঃ) একটি লুকমা (গ্রাস) মুখে দিয়ে থেমে যান। কিন্তু সাহাবী বিশ্‌র ইবনে বারার পেট ভরে খেয়ে ফেলেন এবং বিষক্রিয়ায় শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেন। মহানবী (সাঃ) যয়নবকে ডেকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করেন। সে অপরাধ স্বীকার করে। ইহুদীরা বলল, "আমরা খাবারে এজন্য বিষ দিয়েছি যে আপনি যদি নবী হয়ে থাকেন, তাহলে বিষের কোন প্রতিক্রিয়াই হবে না, আর যদি নবী না হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার কবল থেকে আমরা অব্যাহতি পেয়ে যাব।"

মহানবী (সাঃ) কখনো নিজের ব্যক্তিগত বিষয়ে কারো কাছ থেকে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। সেজন্যই তিনি যয়নবের প্রতিকার করেননি। কিন্তু দু'তিনদিন পর যখন হযরত বিশ্‌র বিষক্রিয়ায় ইন্তেকাল করেন, তখন যয়নবকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

একবার সাহাবীদের মধ্য থেকে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সুহাইল (রাঃ) ও হযরত মুহাইসাহ্‌ (রাঃ) দুর্ভিক্ষের সময় খায়বরে গেলে ইহুদীরা হযরত আবদুল্লাহকে প্রতারণার মাধ্যমে হত্যা করে এক নহরে ফেলে দেয়। হযরত মুহাইয়াহ (রাঃ) ফিরে এসে মহানবী (সাঃ)-কে বিষয়টি অবহিত করেন। তিনি বলেন, তুমি কি কসম খেয়ে বলতে পার, ইহুদীরাই তাঁকে হত্যা করেছে? নিবেদন করলেন, তারা যে পঞ্চাশ জন মুসলামন হত্যা করেও মিথ্যা কসম খেয়ে নেবে! যেহেতু হত্যাকাণ্ডের ঘটনার কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষী সংগ্রহ করা যায়নি, এ জন্য হযরত নবী করীম (সাঃ) ইহুদীদের উপর থেকে কোনরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করার অনুমতি দেননি। বরং বাইতুল মাল থেকে নিহতের রক্ত বিনিময় দিয়ে দিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ইহুদীরা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)-কে ঘুমন্ত অবস্থায় কোঠার উপর থেকে নিচে ফেলে দেয়, যাতে করে তাঁর হাত-পা ভেঙে যায়। এমনিভাবে এরা বরাবরই দাঙ্গা-হাঙ্গামা করতে থাকত। ফলে, হযরত ওমর (রাঃ) বাধ্য হয়ে ওদের সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে নির্বাসিত করে দেন।

খায়বরের ঘটনাবলী লিখতে গিয়ে সীরাতকারগণ একটি কঠিন ভুল রেওয়ায়েত সন্নিবেশিত করে ফেলেছেন এবং তা অধিকাংশ গ্রন্থে উদ্ধৃতও করা হয়েছে যা ব্যাপকভাবে প্রচারও হয়ে গেছে। তা হল এই যে প্রথমে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইহুদীদের এ শর্তে নিরাপত্তা দান করেছিলেন যে তারা কখনো কোন বিষয় গোপন করবে না।

কিন্তু কেনানাহ্ ইবনে রবী' যখন স্বীয় ধনভাণ্ডারের সন্ধান দিতে অস্বীকার করল, তখন হযরত যুবাইরকে নির্দেশ দেয়া হল যাতে কঠোর ব্যবস্থার মাধ্যমে ধনভাণ্ডারের তথ্য বের করার চেষ্টা করেন। ফলে, তিনি চক্‌মকি জ্বালিয়ে কেনানাহ্র বুকে দাগ দিতে থাকেন, যাতে করে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত তিনি কেনানাহকে হত্যা করিয়ে ফেলেন এবং সমস্ত ইহুদী কিশোরীকে বাঁদী বানিয়ে নেন। (ফুতূহুল বুলদান, ২৪ পৃঃ)

রেওয়ায়েতের এ অংশটুকু সত্য যে কেনানাহকে হত্যা করিয়ে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তার কারণ এ ছিল না যে সে ধনভাণ্ডারের সন্ধান দিতে অস্বীকার করছিল। বরং তার কারণ ছিল এই যে কেনানাহ্ মাহমূদ ইবনে মুসলিমা (রাঃ) নামক একজন সাহাবীকে হত্যা করেছিল। তাবারীতে লেখা হয়েছে ঃ

"অতঃপর মহানবী (সাঃ) কেনানাহকে মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমাহ্র হাতে সমর্পণ করেন এবং তিনি নিজের ভাই মাহমূদ মুসলিমাহ্র কেসাসস্বরূপ তাকে হত্যা করেন।" (তাবারী, পৃঃ ১৫৮২)

এ রেওয়ায়েতটির বাকি অংশের অবস্থা ছিল এই যে এটি তাবারী ইবনে হিশাম উভয়েই ইবনে ইসহাক থেকে উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু ইবনে ইসহাক উল্লিখিত কোন রাবী বা বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেননি। তবে মোহাদ্দেসীন আসমাউর রিজাল সংক্রান্ত গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন যে ইবনে ইসহাক ইহুদীদের কাছে করীম (সাঃ)-এর অভিযানের ঘটনাবলী বর্ণনা করতেন। এ রেওয়ায়েতটিকেও সেসব রেওয়ায়েতেরই অন্তর্ভুক্ত মনে করা উচিত। সেজন্যই ইবনে ইসহাক রাবী বা বর্ণনাকারীর নাম বলেন না।

কোন লোকের প্রতি ধনভাণ্ডারের সংবাদ বলার জন্য এমন কঠোর আচরণ করা যে তার বুকে চমকি জ্বালিয়ে আগুন ধরানো হবে এমনটা রাহমতুল্লীল্ আলামীনের শানের একান্ত পরিপন্থী।

যে ব্যক্তি নিজেকে বিষ দেয়ার জন্যেও কোনরকম ব্যবস্থা নেন না, তিনি কি কয়েকটি মুদ্রার জন্য কাউকে আগুনে জ্বালানোর নির্দেশ দিতে পারেন?

না। প্রকৃত ঘটনা হল এই যে কেনানাহ্ ইবনে আবুল হোকাইককে এ শর্তে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিল যে সে কোন রকম প্রতারণা করবে না কিংবা মিথ্যা বলবে না। (আবু দাউদ) কোন কোন বর্ণনায় এমনও আছে যে সে একথাও স্বীকার করে নিয়েছিল যে যদি সে এর ব্যতিক্রম করে, তাহলে সে মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য হবে। (তাবকাতে ইবনে সা'দ, খায়বর অভিযান, পৃঃ ১৮)

পরে কেনানাহ্ শর্ত ভঙ্গ করে এবং এতে করে নিরাপত্তাচুক্তি ভেঙে যায়। কেনানাহ্ মাহমূদ ইবনে মুসলিমাহ্কে হত্যা করে এবং এরই পরিণতিতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

এখন লক্ষণীয়, এ রেওয়ায়েতের সঙ্গে কি কি বিষয় বর্ধিত হল ঃ

(১) হত্যার ঘটনাটি কেনানার সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিল। ধনভাণ্ডার গোপন করার জন্য সে অপরাধী ছিল। মাহমূদ ইবনে মুসলিমাহ্কেও সে হত্যা করে, যে জন্য সেও হত্যাযোগ্য ছিল। পরিবর্ধনের প্রথম ধাপ হল এই যে ইবনে সা'দ বিক্‌র ইবনে আবদুর রহ্মান থেকে যে রেওয়ায়েত করেছেন, তাতে কেনানাহ্র সঙ্গে তার ভাইয়ের নামটিও বাড়িয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ উভয়কেই হত্যা করা হয়। বলা হয়েছে فضرب اعناقهما وسبى اهليهما অর্থাৎ মহানবী (সাঃ) উভয়কেই হত্যা করিয়ে দেন এবং তাদের মহিলা ও সন্তানদের দাসদাসী করে নেয়া হয়।

(২) তাতেও রক্ষা ছিল। কিন্তু ইবনে সা'দ আফ্ফান ইবনে মুসলিম থেকে যে রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, সেটি এর চাইতেও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। অর্থাৎ দু'ভাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইহুদীকেই গ্রেফতার করে গোলাম-বাঁদীতে পরিণত করা হয়। বলা হয়েছে—

"ধনভাণ্ডার পাওয়া গেল যা তারা উটের চামড়ায় লুকিয়ে রেখেছিল, তখন তাদের নারীদের গ্রেফতার করে বাঁদীতে পরিণত করা হয়।"

কিন্তু এসব রেওয়ায়েতকে মোহাদ্দেসগণের অনুসৃত মূলনীতির আলোকে যাচাই করতে গেলে তার ছাল-বাকল খসে পড়তে থাকে এবং প্রকৃত সত্যটাই থেকে যায়।

ইহুদীদের হত্যা এবং নারী-শিশুদের গ্রেফতারীর বিষয়টি সহীহ্ বোখারীর রেওয়ায়েতে প্রমাণিত যে কেনানাহ্র ভাইকে হত্যা করা হয়নি এবং সে হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকাল পর্যন্ত বেঁচে ছিল।

বোখারীতে আছে—

"অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) যখন পূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন, তখন আবুল হোকাইকের এক ছেলে তাঁর কাছে এসে হাযির হল। সে বলল, ইয়া আমীরুল মু'মেনীন, আপনি আমাদেরকে খয়বর থেকে বের করে দিচ্ছেন, অথচ হযরত মুহম্মদ (সাঃ) আমাদেরকে 'খেরাজ'-এর বিনিময়ে থাকতে দিয়েছিলেন।" (বোখারী, ১ম খণ্ড, মুস্তফায়ী, পৃঃ ৩৭৭).

হাফেয ইবনে হাজার ফাত্হুল বারী গ্রন্থে এর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখেছেন, এ ছিল কেনানাহ্ ইবনে আবিল হোকাইকের ভাই।

হাফেয ইবনে কায়্যিম যাদুল মা'আদ গ্রন্থে সাধারণ রেওয়ায়েতগুলোর ব্যাপকতা কমিয়ে এ পর্যন্ত পৌঁছে দেন যে

ولم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلح الا ابنى ابى الحقيق –

অর্থাৎ, "মহানবী (সাঃ) সন্ধিস্থাপনের পর আবিল হুকাইকের দু'পুত্র ছাড়া আর কাউকেও হত্যা করেননি। (খায়বর অভিযান প্রসঙ্গ)

কিন্তু তিনি (হাফেয ইবনে কায়্যিম) যদি সহীহ্ বোখারীর উপরোক্ত এবারতখানির প্রতি লক্ষ্য করতেন, তাহলে সম্ভবত হত্যার সংখ্যা আরো কমে যেত।

আবু দাউদের 'আরদে-খায়বর' শিরোনামে শুধুমাত্র ইবনে আবুল হোকাইকের হত্যার কথা লেখা হয়েছে। এ বিষয়টির প্রতিও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে আবু দাউদে লেখা হয়েছে যে মহানবী (সাঃ) হুইয়াই ইবনে আখ্তাবের চাচা সাইআতাহ্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে ধনভাণ্ডার কি হল? সে বলল, "যুদ্ধে ব্যয় হয়ে গেছে।" এরপরেও মহানবী (মাঃ) শুধু কেনানাহ্কেই হত্যার নির্দেশ দেন। এটা এ বিষয়েরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে কেনানাহ্র হত্যাটি মাহমুদ ইবনে মুস্লিমাহ্র কেসাস হিসাবেই সংঘটিত হয়েছিল। তা নাহলে, যদি ধনভাণ্ডার গোপন করা অপরাধই হত্যার কারণ হত, তবে এ অপরাধে আরো অনেক অপরাধী ছিল। ইতিহাসবিদরা প্রথম ভুলটি করেন এ যে ধনভাণ্ডার গোপন করাকেই কেনানাহ্ হত্যার কারণ মনে করেন। আর যেহেতু এ অপরাধে আরো অনেকেই যুক্ত ছিল, তাই স্বাভাবিকভাবেই এ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়ে যায় যে কেনানাহ্র গোটা পরিবারকেই হত্যা করা হয়ে থাকবে।

আরেকটি তথ্য ঃ সাধারণভাবে একথা স্বীকৃত যে খায়বরের ঘটনাটি মহররম মাসে ঘটেছে। অর্থাৎ মহানবী (সাঃ) যখন এ উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে যাত্রা করেন, তখন মহররম মাসের শেষদিক ছিল। অথচ মহররমে শরীয়ত অনুযায়ী যুদ্ধবিগ্রহ

হারাম। সুতরাং এর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ফেকাহবিদ ও মোহাদ্দেসগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। অনেক ফেকাহবিদের মত হল যে ইসলামের প্রথম দিকে অবশ্য এসব মাসে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু পরে সে হুকুম রহিত হয়ে যায়। আল্লামা ইবনে কায়্যিম লিখেছেন, হারাম হওয়ার প্রথমে যে হুকুম অবতীর্ণ হয় তা হয়েছিল এ আয়াতের ভিত্তিতে, "বলে দাও, এ মাসে লড়াই করা বড় গুনাহ এবং আল্লাহর পথে বাধাদানের নামান্তর।" (সূরা বাকারাহ-২৭)

অতঃপর সূরা মায়েদার আয়াত নাযিল হয়। তাতে বলা হয়—

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ -

অর্থাৎ, "হে মুসলমানগণ, আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা ও পবিত্র মাসসমূহের অসম্মান করো না।"

এ দ্বিতীয় আয়াতটি প্রথম আয়াতের আট বছর পর অবতীর্ণ হয়। এ দীর্ঘ সময় যাবৎ অবৈধতার হুকুমটি বলবৎ থাকে। কাজেই এখন এমন কোন আয়াত কিংবা হাদীস থাকতে পারে যার মাধ্যমে হুকুমটি রহিত হয়ে থাকতে পারে।

"আর আল্লাহর কিতাব ও হাদীসে সে হুকুমকে মনসূখ করার কোন হুকুম নেই।"

গবেষকগণ প্রমাণ করেছেন যে মক্কা বিজয়,তায়েফ অবরোধ, বাইআতে রিদওয়ান প্রভৃতি সবই নিষিদ্ধ মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কাজেই যদি নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা জায়েয না-ই হবে, তাহলে নবী করীম (সাঃ) কেমন করে তা জায়েয রাখলেন? হাফেয ইবনে কায়্যিম এর উত্তর প্রসঙ্গে লিখেছেন যে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা প্রাথমিক পর্যায়ে হারামই বটে, কিন্তু শত্রু যদি আক্রমণ করে বসে, তাহলে তা প্রতিহত করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করা সর্বসম্মতিক্রমেই বৈধ।

আর সে সবগুলো ঘটনাই ছিল প্রতিরোধমূলক। নবী করীম (সাঃ) আক্রমণ করেননি, বরং আগ্রাসন প্রতিহত করেছেন। বাইআতে রিদওয়ানও এ উদ্দেশ্যেই নেয়া হয়েছিল যে এমন সংবাদ প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল যে কাফেররা হযরত ওসমান (রাঃ)-কে (যিনি দূত হিসাবে গিয়েছিলেন) হত্যা করে ফেলেছে। তাছাড়া তায়েফের অবরোধটিও কোন আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ছিল না, বরং সেটি ছিল হুনাইন যুদ্ধের জের, যাতে কাফেররা চারদিক থেকে একত্রিত হয়ে পুনরাক্রমণ করে বসে। অপরদিকে মক্কা বিজয়ের ঘটনাটিও ছিল হুদায়বিয়ার পরাজয়ের পরিণতি, যার সূচনা করেছিল কোরাইশরা।

হাফেয ইবনে কায়্যিম যথার্থ উত্তরই দিয়েছেন, কিন্তু বিশেষভাবে খায়বরের ব্যাপারে তিনি সে গিটটি খুলতে পারেননি। বিষয়টি অব্যাখ্যাত রয়ে গেছে। হাফেয ইবনে কায়্যিমের ওস্তাদ আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ নিজেও এক্ষেত্রে সংশয়ে পতিত হয়েছেন। তিনি 'আল-জওয়াবুসসহীহ্ লিমান বাদ্দালা দ্বীনালমসীহ্' গ্রন্থে লিখেছেন যে মহানবী (সাঃ) যেসব যুদ্ধবিগ্রহ করেছেন, সে সবগুলোই ছিল প্রতিরোধমূলক। বদর ও খায়বরও তার ব্যতিক্রম নয়। বদরের

আলোচনা যথাস্থানে বিবৃত হয়েছে। খায়বরের ঘটনাবলীকে বিন্যস্ত করে দেখতে গেলে পরিষ্কার প্রতীয়মান হবে যে ইহুদী ও গাতফান গোত্রীয়রা মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল।

ভূমি বন্টন ঃ খায়বরের বিজিত ভূমি প্রথমত সমান দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। অর্ধেক বাইতুলমাল, আপ্যায়ন ও বৈদেশিক দূতগণের বাবতে প্রয়োজনীয় ব্যয় ভার বহনের জন্য নির্ধারিত রাখা হয়। বাকি অর্ধেক এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করে দেয়া হয়। সৈন্যসংখ্যা ছিল ১৪ শ'। দুশ' ছিল অশ্বারোহী। অশ্বারোহীদের অশ্বের ব্যয় বাবত পদাতিক অপেক্ষা দ্বিগুণ দেয়া হত। ফলে, এ প্রেক্ষিতে এ সংখ্যা আঠারশ'-এর বরাবর ছিল। এ হিসাবমত মোট ভূমির আঠারশ' অংশে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক মুজাহিদের ভাগে একটি অংশ আসে। সরওয়ারে কায়েনাত (সাঃ) সাধারণ মুজাহিদদের সমান সমান একটি অংশপ্রাপ্ত হন। (ফুতূহুল বুলদান, খায়বর প্রসংগ। আবু দাউদ খায়বরের ভূমির বন্টন প্রসঙ্গ) বলা হয়েছে —

ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل سهم واحدهم -

অর্থাৎ রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যও সাধারণ লোকদেরই মত একটি অংশই ছিল।

রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি ও ফেকাহর হুকুম ঃ খায়বর বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক অবস্থার নতুন যুগের সূচনা হয়। তখনো পর্যন্ত ইসলামের প্রকৃত শত্রু ছিল দুটি শ্রেণী। একটি মুশরেক, অপরটি ইহুদী। খৃষ্টানরা যদিও আরবে ছিল, কিন্তু তাদের কোন প্রভাবপ্রতিপত্তি ও ক্ষমতা ছিল না। মুশরেকীন ও ইহুদীরা ধর্মমতের দিক দিয়ে পারস্পরিক বিভিন্ন থাকলেও রাজনৈতিক স্বার্থে তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মদীনার ইহুদীরা ছিল সাধারণভাবে আনসারদের মিত্র আর একইভাবে খায়বরের ইহুদীরা ছিল গাতফানদের মিত্র। কিন্তু মহানবী (সাঃ)-এর মোকাবিলার ক্ষেত্রে মক্কা ও মদীনার সমস্ত মুশরেক ও মুনাফেক মিলে একাত্ম হয়ে গেল। খায়বর বিজয়ের পর ইহুদীদের ক্ষমতা ভেঙে গেলে মুশরেকদের একটা ডানাও অকেজো হয়ে পড়ে।

এ পর্যন্ত ইসলাম চারদিক থেকেই শত্রুকবলিত অবস্থায় ছিল। ফলে, শুধুমাত্র আকীদা-বিশ্বাস ও এবাদতাদি ছাড়া শরীয়তের আহকাম তথা বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করা কিংবা শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ ছিল না। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বক্তব্য মোতাবেক শরীয়তের বিধিনিষেধগুলো ক্রমান্বয়ে আসতে থাকে। সুতরাং এর বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তীতে বর্ণিত হবে। খায়বর বিজয়ে একদিকে ইহুদীদের দুষ্কৃতি থেকে অব্যাহতি মেলে, অন্যদিকে হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে মুশরেকীনদের পক্ষ থেকে মোটামুটি স্বস্তিলাভ হয়। তাতে করে মুসলমানরা নবতর সাংবিধানিক হুকুম আহকাম পালনের যোগ্যতা অর্জনে সমর্থ হয়।

সীরাতবিদগণ খায়বর অভিযান প্রসঙ্গে সাধারণত উল্লেখ করেছেন যে এ সময় কতিপয় নতুন নতুন বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয় এবং মহানবী (সাঃ) তা প্রচার করেন। (এখানে বিধি-বিধান অবতরণ বলতে কোরআনের আয়াত বোঝানো হয়নি।) তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

(১) পাঞ্জা-নখ দ্বারা যেসব পাখি শিকার ধরে সেগুলো (খাওয়া) হারাম করা হয়।

(২) হিংস্র জীবজন্তু হারাম করা হয়।

(৩) গাধা ও খচ্চর হারাম হয়।

(৪) এ সময় পর্যন্ত ক্রীতদাসীর সঙ্গে সহবাস করা সচরাচর বৈধ বিবেচিত হত, কিন্তু এ সময় থেকে তার সঙ্গে সহবাসের জন্য গর্ভশূন্যতার নিশ্চয়তার শর্ত আরোপ করা হয়। অর্থাৎ সে যদি গর্ভবতী হয়ে থাকে, তবে প্রসব পর্যন্ত এবং অন্যথায় একমাস কাল সহবাস জায়েজ না হওয়া।

(৫) সোনা-রূপার ব্যবধানপূর্ণ খরিদদারী হারাম হয়।

(৬) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে মোতা ব্যবস্থাও এ অভিযানেই হারাম হয়।

ওয়াদিউল কোরা ও ফাদাক ঃ তীমা ও খায়বরের মধ্যবর্তী স্থানে একটি উপত্যকা রয়েছে, যেখানে বহু জনবসতি বিদ্যমান। একে ওয়াদিউল কোরা বলা হয়। আদিকালে এখানেই 'আদ' ও 'সামুদ' জাতি বাস করত। আল্লামা ইয়াকুত 'মু'জামুল বুলদান' গ্রন্থে লিখেছেন যে সেখানে এখনো আদ-সামুদের নিদর্শনাদি বিদ্যমান রয়েছে। ইসলামের পূর্বে এসব জনপদে ইহুদীরা বসতিস্থাপন করে এবং কৃষি ও সেচ-ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়ন করে। এ সময় এলাকাটি ইহুদীদের বিশেষ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

খায়বরের পর মহানবী (সাঃ) ওয়াদিউল কোরার প্রতি মনোনিবেশ করেন। কিন্তু কোন রকম যুদ্ধের উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। কিন্তু ইহুদীরা পূর্ব থেকেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। নবী করীম (সাঃ)-এর সেখানে পৌছার সঙ্গে সঙ্গেই ইহুদীরা বাণযুদ্ধ শুরু করে দিল। নবী করীম (সাঃ)-এর সেখানে পৌছার সঙ্গে সঙ্গেই ইহুদীরা বাণযুদ্ধ শুরু করে দিল। তখন মহানবী (সাঃ)-এর গোলাম মিদ্আম তাঁর হাওদা উটের পর থেকে নামাচ্ছিল। এমন সময় একটি তীর এসে লাগল যার ফলে সে নিহত হল। সাধারণ ইতিহাসবিদগণ অবশ্য ইহুদীদের পূর্ব প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু ইমাম বাইহাকী পরিস্কার ভাষায় লিখেছেন —

"ইহুদীরা আমাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে করতে এগুতে লাগল, অথচ আমরা প্রস্তুত ছিলাম না।" যাহোক, যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। কিন্তু সামান্য মোকাবিলার পরই ইহুদীরা পরাজয় বরণ করে। অতঃপর শর্তাবলী অনুযায়ী সন্ধি স্থাপিত হল।[১]

---

১. বাইহাকীর বরাতে মুআত্তা যারকানীসহ জিহাদ এবং গনীমতের মাল চুরি সম্পর্কীয় (৩১৩ পৃঃ।) 'সু'

ওমরা আদায়

হুদাইবিয়ার সন্ধিতে কোরাইশদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল যে রসূলে করীম (সাঃ) আগামী বরছ মক্কায় এসে ওমরা সমাপন করবেন এবং তিনদিন অবস্থান করে প্রত্যাবর্তন করবেন। সে অনুপাতে তিনি এ বছর ওমরা করার অভিপ্রায় ঘোষণা করলেন যে যারা হুদাইবিয়ার ঘটনায় যোগদান করেছিল, তাদের সবাই যেন ওমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, কেউই যেন পেছনে বাদ না থাকে। সেমতে যারা এ বছরের মাঝে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন কেরল তারা ছাড়া সবাই (ওমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার) সৌভাগ্য লাভ করেন।

সন্ধিপত্রে এমনও একটি শর্ত ছিল যে মুসলমানদের নিরস্ত্র অবস্থায় প্রবেশ করতে হবে। সুতরাং মক্কা থেকে আট মাইল দূরে থাকতেই 'বত্‌নে বাহেজ্' নামক স্থানে সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করে দু'শ অশ্বারোহীর একটি দল সেগুলোর সংরক্ষণে নিয়োজিত করা হল।

রসূলে করীম (সাঃ) 'লাব্বাইক' (অর্থাৎ, প্রভু হে! উপস্থিত হয়েছি) বলতে বলতে হরম শরীফ অভিমুখে এগিয়ে গেলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাহওয়াহা সামনের দিক থেকে উটের লাগাম টানতে টানতে নিম্নোক্ত বীরত্বগাথা আবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন ঃ [১]

'ওহে কাফেরের বৎসগণ! দূর হও নবীর পথ ছাড়ি।
অবতরণে তাঁর এলে বাধা আজ হানিব আমি জোর করি।
শয্যাস্থান থেকে জুদা করে শির হানিব ভীষণ আঘাত হেন,
বিস্মরণ করে স্মরণ বন্ধুর, বন্ধুর অন্তর হতে যেন।

একে তো সঙ্গে ছিল সাহাবাদের বিশাল জমায়েত, তদুপরি তাঁদের পুঞ্জীভূত বহু বছরের পুরাতন বাসনা। সুতরাং বিপুল উদ্যম ও উৎসাহের সঙ্গে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করা হতে লাগল। মক্কাবাসীদের ধারণা ছিল, মদীনার আবহাওয়া মুসলমানদের দুর্বল এবং রুগ্ন করে দিয়েছে। কিন্তু এ ধারণা লাঘবের জন্য রসূলে করীম (সাঃ) আদেশ করলেন ঃ তওয়াফের প্রথম তিন চক্করে তারা যেন বীরদর্পে কাঁধ দুলিয়ে ঘনঘন পদ সঞ্চালনে চল। আরবী ভাষায় এভাবে চলাকে 'রমল' বলা হয়। সেমতে তখন থেকে আজো পর্যন্ত এ সুন্নত বলবৎ রয়েছে।

মক্কাবাসীরা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, যদিও ওমরা করার অনুমতি দিয়েছিল, তথাপি এমন অভূতপূর্ব দৃশ্য যেন তাদের চোখে শূলসদৃশ ছিল। এ কারণে প্রায়

১. এ চরণসমূহ এবং উক্ত ঘটনাটি ইমাম তিরমিযী 'শামায়েল গ্রন্থে' উল্লেখ করেছেন।

কোরাইশই প্রধান শহর ছেড়ে পাহাড়-পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তারা হযরত আলী (রাঃ)-এর কাছে এসে বলল, মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বলে দাও, শর্ত পূর্ণ হয়ে গেছে, সুতরাং এখন তিনি মক্কা থেকে চলে যান। হযরত আলী (রাঃ) রসূলে করীম (সাঃ) সকাশে বিষয়টি ব্যক্ত করলে তিনি তখনই মক্কা শরীফ ছেড়ে রওয়ানা হল। চলার পথে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। বীরকেশরী হযরত হামযা (রাঃ)-এর শিশু দুলালী উমামা (রাঃ) এতদিন পর্যন্ত মক্কাতেই ছিল। সে চাচা চাচা বলে[১] দৌড়ে এসে রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হল। হযরত আলী (রাঃ) তাকে স্নেহভরে কোলে তুলে নিলেন। অপরদিকে (হযরত আলীর ভ্রাতা) হযরত জাফর (রাঃ) এবং হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) উভয়েই তার প্রতিপালনভার গ্রহণের জন্যে স্ব-স্ব দাবি উত্থাপন করলেন। হযরত জাফরের দাবি, উমামা আমার পিতৃব্য কন্যা (সুতরাং প্রতিপালনে আমারও অধিকার রয়েছে)। যায়েদের দাবি, হামযা ছিলেন আমার ধর্মীয় ভাই, সুতরাং এ সম্পর্কে সে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী। (অতএব, আমার অধিকারও কিছুতেই খাটো নয়)। হযরত আলীর দাবি, সে আমারও বোন এবং আমার কোলেই প্রথমে এসে উঠেছে। (কাজেই আমার অধিকার তুচ্ছ হতে পারে না) সবার দাবির মান প্রায় সমপর্যায়ের দেখে রসূলে করীম (সাঃ) উমামাকে তার খালা হযরত আস্‌মা (রাঃ)-এর কোলে অর্পণ করলেন। অতঃপর বললেন; খালার মর্যাদা মায়ের সমান।[২]

মূতার অভিযান

মূতা সিরিয়ার অন্তর্গত বলকার পার্শ্ববর্তী একটি স্থানের নাম। পূর্বাঞ্চলীয় বা আরব দেশের বিখ্যাত তলোয়ার এখানেই তৈরি হত। কুসাইর নামক বিখ্যাত কবি এ তলোয়ারের বৈশিষ্ট্য ও উৎকৃষ্টতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন —

'ঐ সমস্ত তরবারি মূতার শাণকাররা শাণ দেয়।"

হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বুসরাধিপতি কিংবা রোম সম্রাটের নামে এক পত্র পাঠিয়েছিলেন। আরব ও সিরিয়ার সীমান্ত এলাকসমূহে যে সমস্ত আরব নেতা বা গোত্রপ্রধান প্রশাসক নিযুক্ত ছিল, তাদের একজনের নাম ছিল শুরাহ্‌বীল ইবনে আমর। সে রোম সম্রাটের অধীনে বল্‌কা এলাকার প্রশাসক ছিল। হারেস ইবনে ওমাইর(রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ পত্র নিয়ে গিয়েছিলেন। শুরাহ্‌বীল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পত্রবাহককে হত্যা করল। এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে

১. রসূলে করীম (সাঃ) সম্পর্কে উমামার ভাই ছিলেন। কিন্তু সম্মানার্থে সে তাঁকে চাচা বলে সম্বোধন করেছিল। অথবা যেহেতু রসূলে করীম (সাঃ) এবং বীর কেশরী হযরত হামযা (রাঃ) উভয়েই দুধ-ভাই ছিলেন এ কারণেও উমামা তাঁকে চাচা বলে ডেকে থাকতে পারে।

২. উপরোক্ত ঘটনার অধিকাংশ বর্ণনা সহীহ্ বোখারী থেকে উদ্ধৃত। অতিরিক্ত কিছুটা অংশ যারকানী থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

হযরত (সাঃ) তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনীকে সিরিয়া অভিমুখে পাঠালেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আযাদকৃত ক্রীতদাস যায়েদ-ইবনে হারেসাকে এ বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করে হযরত (সাঃ) নির্দেশ দিলেন, "যদি যায়েদ-ইবনে হারেসা শাহাদাতবরণ করে, তবে জাফর তাইয়্যার সেনাপতি হবে। যদি সে-ও শহীদ হয়, তাহলে আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা সেনাপতিত্ব করবে।"

যায়েদ (রাঃ) আযাদকৃত হলেও যেহেতু পূর্বে ক্রীতদাস ছিলেন, হযরত জাফর তাইয়্যার (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর সহোদর ভাই এবং হযরতের বিশেষ প্রিয় ছিলেন, আর আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা ছিলেন বিশিষ্ট আনসার ও প্রখ্যাত কবি। অতএব, জনগণ বিস্মিত হলেন যে হযরত জাফর তাইয়্যার (রাঃ) ও আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহার মত খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ বর্তমান থাকতে কোন্ ভিত্তিতে যায়েদ (রাঃ)-কে সেনাপতি মনোনীত করা হল। বিষয়টি নিয়ে নগরবাসীর মধ্যে আলোচনা চলতে লাগল। কিন্তু ইসলাম জগতে যে সাধারণ সমতা নিয়ে এসেছে, তা কায়েম করার উদ্দেশ্যেই এ ধরনের ত্যাগ ও কোরবানীর প্রয়োজন ছিল। পরবর্তীকালে উসামার অভিযানে যোগদানের জন্য হযরত নবী করীম (সাঃ) সমস্ত মুহাজিরদের প্রতি নির্দেশ দান করেন। সে অভিযানেও এই যায়েদ ইবনে হারেসার পুত্র উসামাকে সেনাপতিত্ব দান করা হয়। তখনও জনগণের মধ্যে অনেক আলোচনা-সমালোচনা চলে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিষয়টি জানতে পেরে এক ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন; তোমরা তার পিতাকে সেনাপতি করার সময়ও আপত্তি তুলেছিলে; অথচ নিঃসন্দেহে সে সেনাপতি পদের যোগ্য ছিল।" জগদ্বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সহীহ্ বোখারীর 'মাগাজী; অধ্যায়ে 'বা'ছে-উসামা' শিরোনামে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হয়েছে।

দৃশ্যত যদিও এ অভিযান প্রতিশোধমূলক ছিল, কিন্তু যেহেতু ইসলামের সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের মূল লক্ষ্যই ছিল ইসলাম; সুতরাং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নির্দেশ দিলেন যে সর্বপ্রথম সিরিয়াবাসীদের ইসলামের দাওয়াত দেবে। যদি তারা ইসলাম কবুল করে, তবে যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। হযরত নবী করীম (সাঃ) এ নির্দেশও দিলেন যে যেখানে হারেস ইবনে ওমাইর স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনে জীবন দান করেছেন, সমবেদনা প্রকাশের নিমিত্ত সেখানে যাবে। খোদ হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে 'সানিয়াতুল বিদা' নামক স্থান পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর দরবারে নিরাপত্তা ও বিজয়ের কাতর প্রার্থনা জানালেন।

মদীনা থেকে সেনাবাহিনী সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হল। গুপ্তচর মারফত শুরাহবীল এ খবরপ্রাপ্ত হল। শুরাহবীল মোকাবিলার জন্য পূর্ব থেকেই প্রায় এক লক্ষ্য সৈন্য প্রস্তুত রেখেছিল। এদিকে রোম সম্রাট হিরাক্ল স্বয়ং আরব

গোত্রসমূহের অসংখ্য সৈন্যসহ মা'আব নামক স্থানে অবস্থান করছিল। এটি বলকার অন্তর্গত একটি স্থানের নাম। হযরত যায়েদ বিষয়টি জানতে পেরে মনে করলেন, বিষয়টি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দরবারে খবর পাঠিয়ে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করা যাক। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা বললেন, "আমাদের আসল উদ্দেশ্য বিজয়লাভ নয় বরং-শাহাদত লাভ। আর শাহাদত লাভের সুযোগ সর্বাবস্থায়ই মিলতে পারে।" অবশেষে ক্ষুদ্র এ বাহিনীই এগিয়ে গেল এবং এক লক্ষ সৈন্যের উপর আক্রমণ করল। হযরত যায়েদ (রাঃ) বর্শার আঘাতে শহীদ হল। হযরত জাফর (রাঃ) ঝাণ্ডা তুলে নিলেন। প্রথমে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে তার ঘোড়ার পা দুটি কেটে ফেললেন। অতঃপর তিনি এমন দুঃসাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন যে অবশেষে তিনি তরবারির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ধরাশায়ী হল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর বর্ণনা করেন, আমি জা'ফরের লাশ দেখেছিলাম। তাঁর দেহে তরবারি এবং বর্শার ৯০টি আঘাত ছিল। প্রত্যেকটিই তাঁর শরীরের সম্মুখভাগে ছিল। তাঁর পিঠে একটি জখমের দাগও বহন করেনি। হযরত জাফরের পর আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা ঝাণ্ডা হাতে নিলেন। তিনিও বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে শহীদ হল। এবার হযরত খালেদ (রাঃ) যুদ্ধের পতাকা হাতে বীরবিক্রমে যুদ্ধ শুরু করলেন। সহীহ্ বোখারী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে সেদিন হযরত খালেদের হাতে আটখান তরবারি ভেঙে খানখান হয়ে পড়ে। কিন্তু এক লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে তিন হাজার সৈন্যের কি যুদ্ধ হবে? খালেদ (রাঃ)-এর বিশেষ কৃতিত্ব ছিল এই যে তিনি শত্রুর কবল থেকে সেনাদলকে বাঁচিয়ে আনলেন। বাহ্যত এ পরাজিত সেনাবাহিনী মদীনার নিকটে পৌঁছলে নগরবাসিগণ তাদের স্বাগত জানিতে বেরিয়ে এলেন। তখন তাঁরা তাদের সমবেদনা জানাবার পরিবর্তে তাঁদের চেহারায় ধূলি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, "রে-হতভাগ্য পশ্চাদপসরণকারীর দল! তোরা খোদার রাস্তা থেকে ফিরে এসেছিস!"

এ ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অত্যন্ত মর্মাহত হল। হযরত জাফরকে তিনি বিশেষ স্নেহ করতেন। তাঁর শাহাদতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হল। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মসজিদে গিয়ে শোকার্ত হৃদয়ে বসে রইলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে নিবেদন করলেন যে জাফরের বাড়ির মহিলারা শোকে মুহ্যমান হয়ে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করছে। হযরত তাদের আহাজারী ও ক্রন্দন করতে নিষেধ করে পাঠালেন। লোকটি চলে গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন, "আমি নিষেধ করলাম, কিন্তু তারা বিরত হয়নি।" হযরত তাঁকে পুনরায় পাঠালেন। তিনি পুনরায় গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন, "আমাদের কথা কোন কাজেই আসেনি।" একথা শুনে হযরত নির্দেশ দিলেন যে "যাও তুমি তাদের মুখে মাটি পুরে দাও।"

এ ঘটনা হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে সহীহ্ বোখারীতে বর্ণিত আছে। সহীহ্ বোখারীতে আরো বর্ণিত আছে যে হযরত আয়েশা (রাঃ) সে ব্যক্তিকে বলেছিলেন, "খোদার কসম! তুমি এরূপ করবে না (অর্থাৎ তাদের মুখে মাটি পুরে দেবে না) কারণ এর দ্বারা রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) মনোকষ্ট শুধু বৃদ্ধি পাবে।"

মক্কা বিজয়

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

"নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে এক প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি।" (আল্ কোরআন—৪৮ ঃ ১)

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রথম কর্তব্য ছিল খাঁটি তৌহিদকে পুনর্জীবিত করা এবং কাবাগৃহকে যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করা। কিন্তু পর পর কোরাইশদের আক্রমণ এবং আরব গোত্রসমূহের বিরোধিতার দরুন পুরো একুশ বছর এ দায়িত্ব পালন স্থগিত ছিল। হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে এতটুকু লাভ হয়েছিল যে কিছুদিনের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হল এবং কাবাগৃহকে অন্তত একটা বারের মত হলেও দেখে আসার সুযোগ হল। কিন্তু হুদাইবিয়ার সন্ধিও কোরাইশদের সহ্য হল না। ক্ষমা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এখন সত্যের আলো মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করে তার পূর্ণ আলোকরশ্মিসহ্ বিকশিত হবার সময় এল।

হুদাইবিয়ার সন্ধি মোতাবেক আরব গোত্রসমূহের মধ্যে বনূ খুযা'আ গোত্র রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হল। তাদের শত্রু গোত্র বনূ-বকর কোরাইশদের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনের দলিল পাকা করে নিল। এ দু'শত্রু গোত্রের মধ্যে বহুদিন যাবৎ যুদ্ধবিগ্রহ্ চলে আসছিল। ইসলাম বিকাশের ফলে আরবরা এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। কাজেই তাদের আত্মকলহ্ ও পারস্পরিক লড়াই বন্ধ হল। কারণ, কোরাইশ ও আরব গোত্রসমূহের সর্বশক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যয় হচ্ছিল। হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে তারা কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তখন বনূ বকর গোত্র মনে করল, এখন প্রতিশোধ নেয়ার যথার্থ সময় এসেছে। তারা অকস্মাৎ বনূ খুযা'আর উপর আক্রমণ করে বসল এবং কোরাইশ নেতৃবর্গ প্রকাশ্যভাবে তাদের সাহায্য করল। 'ইকরিমা ইবনে আবু জাহ্ল, সাফওয়ান

ইবনে উমাইয়া, সুহাইল ইবনে আমর প্রমুখ রাত্রির অন্ধকারে মুখোশ পরে বনূ বকরের পক্ষে যুদ্ধ চালাল। বনূ-খুযা'আ অনন্যোপায় হয়ে হরম শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করল। হরম শরীফের মর্যাদা রক্ষা জরুরী মনে বরে বনূ বকর বিরত হল। কিন্তু নওফেল বলল, "এমন সুবর্ণ সুযোগ আর মিলবে না।" শেষ পর্যন্ত 'হরমের' অভ্যন্তরেই বনূ খুযা'আর লোকদের হত্যা করা হল।

হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে নববীতে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ উচ্চারিত হল ঃ

—"হে আল্লাহ! আমি মোহাম্মদ (সাঃ)-কে সে মৈত্রী চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যা আমাদের ও তার পূর্বপুরুষদের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল। হে, আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের সাহায্য করুন এবং আল্লাহর বান্দাদের আহ্বান করুন, তাঁরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবেন।"

হযরত নবী করীম (সাঃ) জানতে পারলেন যে আমর ইবনে সালেমের নেতৃত্বে চল্লিশজন উট সওয়ার উপস্থিত হয়েছে। তারাই উপরোক্ত ফরিয়াদ জানাচ্ছে। সম্পূর্ণ ঘটনা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) অত্যন্ত মর্মাহত হল। তিনি কোরাইশদের কাছে দূত মারফত জানিয়ে দিলেন, নিম্নলিখিত তিনটি শর্তের মধ্যে যে কোন একটি শর্ত যেন তারা মেনে নেয়।

(১) যুদ্ধে নিহতদের রক্তপণ দেয়া হোক।

(২) কোরাইশরা বনূ বকরের সাহায্য থেকে বিরত হোক।

(৩) ঘোষণা করে দেয়া হোক যে হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করা হল।

কুরতাহ্ ইবনে ওমর কোরাইশদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করল যে "কেবলমাত্র তৃতীয় শর্তটি মেনে নিলাম।[১] কিন্তু দূত চলে যাবার পর কোরাইশরা লজ্জিত হল। তারা আবু সুফিয়ানকে হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি নবায়িত করার জন্য দূত হিসাবে পাঠাল। আবু সুফিয়ান মদীনায় পৌছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এ মর্মে আবেদন জানালেন। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। পরে আবু সুফিয়ান হযরত আবু বকর ও ওমরকে মধ্যস্থতার জন্য বললেন, তাঁরাও পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। সবদিক থেকে নিরাশ হয়ে তিনি ফাতেমা যাহ্রার কাছে হাযির হল। ইমাম হাসান (রাঃ)-এর বয়স তখন পাঁচ বছর। আবু সুফিয়ান তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "যদি এ শিশুটি মুখ দিয়ে শুধু এতটুকু বলে যে আমি এ দুপক্ষের বিবাদ মীমাংসা করে দিলাম, তাহলে আজ থেকে সে আরবের নেতা বলে ঘোষিত হবে।" সাইয়েদা ফাতেমা যাহ্রা বললেন, "এ ব্যাপারে শিশুদের কি করণীয় থাকতে পারে?" অবশেষে আবু সুফিয়ান হযরত আলীর ইঙ্গিতে মসজিদে

১. যারকানী ইবনে আয়েম প্রণীত 'মাগাযী' গ্রন্থ।

নববীর কাছে গিঁয়ে ঘোষণা করলেন— "আমি হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি নতুন করে অনুমোদন করলাম।"

আবু সুফিয়ান মক্কায় পৌঁছে সবার কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলে সবাই বলতে লাগল, এটি কোন সন্ধি নয় যে আমরা নিশ্চিন্তে বসে থাকব; যুদ্ধও নয় যে যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগহ্ করব।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি নিলেন। মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ গোত্রসমূহকেও দূত মারফত তৈরি হয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন। মক্কাবাসিগণ যাতে এ অভিযানের খবর জানতে না পারে সে জন্য পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা হল।

হাতেব ইবনে আবী বালতা'আহ্ একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তিনি কোরাইশদের কাছে লিখিত এক চিঠিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মক্কা অভিযানের প্রস্তুতির কথা লিখে গোপনে পাঠিয়ে দিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তা জানতে পেরে পত্রবাহকের কাছ থেকে এ পত্রটি ছিনিয়ে আনার জন্যে হযরত আলীকে প্রেরণ করলেন। পত্র এনে হযরত (সাঃ)-এর খেদমতে পেশ করা হল। হাতেব (রাঃ) কর্তৃক গোপন বিষয় ফাঁস হতে দেখে সবাই স্তম্ভিত হল। হযরত ওমর (রাঃ) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আরয করলেন— "আদেশ দিন, এখনই তার গর্দান উড়িয়ে দিই।" কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শান্তসমাহিত চিত্তে বললেন! ওমর! তোমার কি জানা আছে যে আল্লাহ্ তা'আলা সম্ভবত বদরের যুদ্ধে যোগদানকারীদের লক্ষ্য করে বলেছেন, "তোমাদের কোন অপরাধ ধর্তব্য নয়?"

হাতেব (রাঃ)-এর আত্মীয়স্বজন সবাই তখনও মক্কায় অবস্থান করছিল। সেখানে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল কেউ ছিল না। তিনি কোরাইশদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে চাইলেন যাতে এর প্রতিদানে কোরাইশরা তাঁর আত্মীয়-স্বজনের কোন অনিষ্ট না করে। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দরবারে এ ওযরই পেশ করলেন এবং আল্লাহর রসূল (সাঃ) হাতেবের অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন।

অষ্টম হিজরীর ১০ই রমযান নবীকুলশিরোমণি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) দশ হাজার সৈন্যসহ্ মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হল। পথিমধ্যে আরব গোত্রসমূহ্ এসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সেনাদলে মিলিত হতে লাগল। মাররুয্-যাহ্রান নামক স্থানে শিবির স্থাপন করা হল। সৈন্যরা বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। এ স্থানটি ছিল মক্কা মো'আয্যমা থেকে এক মঞ্জিল অথবা তার চেয়েও কম দূরত্বে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নির্দেশে সৈন্যরা আলাদা আলাদাভাবে আগুন জ্বালাল। তাতে সমগ্র মরুভূমি আলোয় ঝলমল করে উঠল। সৈন্য আগমনের মৃদু আওয়ায কোরাইশদের কানে ইতিমধ্যেই পৌঁছেছিল। সঠিক খবর অনুসন্ধানের জন্য তারা হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র হাকিম ইবনে হিযাম, আবু সুফিয়ান এবং

বুদাইল ইবনে ওয়ারাকাকে পাঠাল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তাঁবুর পাহারায় যে দলটি মোতায়েন ছিল তাঁরা আবু সুফিয়ানকে দেখে ফেললেন। হযরত ওমর (রাঃ) প্রতিশোধের উত্তেজনা দমন করতে না পেরে ত্রস্তপদে এগিয়ে গেলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন যে কাফের নিধনের সময় এসে গেছে। কিন্তু হযরত আব্বাস (রাঃ) তাঁর জীবন রক্ষার আবেদন জানালেন। হযরত ওমর (রাঃ) পুনরায় অনুমতি প্রার্থনা করলে হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন,—"ওমর, যদি এ লোকটি তোমার গোষ্ঠীর লোক হত, তাহলে তুমি এমন কঠিন হৃদয়ের পরিচয় দিতে না।" ওমর (রাঃ) বললেন,—"আপনি এমন বলবেন না। আপনি যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সেদিন আমি এত খুশি হয়েছিলাম যে স্বয়ং আমার পিতা খাত্তাব ইসলাম গ্রহণ করলেও অত খুশী হতাম না।"

আবু সুফিয়ানের ইতিপূর্বেকার সমস্ত কৃতকর্ম সবার সামনে দিবালোকের মত স্পষ্ট। তাঁর অতীতের প্রত্যেকটি কর্মই তার হত্যার দাবিদার। ইসলামের সঙ্গে শত্রুতা, মদীনা আক্রমণ, আরব গোত্রসমূহকে উস্কানি দেয়া, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে গোপনে হত্যার চক্রান্ত ইত্যাদির প্রত্যেকটিই তার খুনের মূল্য হতে পারত। কিন্তু এসবের উর্ধ্বে ছিল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দয়ার্দ্র হৃদয় ও ক্ষমাশীল মন। তিনি আবু সুফিয়ানের কানের কাছে মুখ নিয়ে অনুচ্চস্বরে বললেন, "এটা ভয়ের স্থান নয়।"

বিশ্ববিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সহীহ্ বোখারীতে আছে যে গ্রেফতার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাবারী প্রভৃতি ইতিহাস গ্রন্থে এ সংক্ষেপ উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত সংলাপ লিপিবদ্ধ হয়েছে ঃ

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—"কি আবু সফিয়ান! এখনও কি বিশ্বাস হয়নি যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই?"

আবু সুফিয়ান— "অন্য কোন উপাস্য থাকলে আজ আমার উপকারে অবশ্যই আসত।"

রসূলুল্লাহ (সাঃ)— এতে কি তোমার কোন সন্দেহ্ আছে যে "আমি আল্লাহ্র রসূল?"

আবু সুফিয়ান— "কিঞ্চিৎ সন্দেহ্ আছে বইকি?"

যাহোক, আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেছিলেন এবং তখন যদিও তাঁর ঈমান একটু নড়বড়ে ছিল, কিন্তু ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে তিনি খাঁটি মনেই মুসলমান হয়েছিলেন। এরপর তায়েফের যুদ্ধে তাঁর একটি চোখ জখম হয় এবং ইয়ারমুকে তিনি তাঁর দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেন।

ইসলামের সেনাদল যখন মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন যে আবু সুফিয়ানকে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে দাঁড় করিয়ে দাও, সে খোদায়ী বাহিনীর দৃপ্ত তেজ স্বচক্ষে দর্শন করুক!

কিছুক্ষণ পরেই ইসলাম-সাগর উত্তাল হয়ে উঠল। আরব গোত্রসমূহের ঢেউ তরঙ্গায়িত হয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। প্রথমে গিফার গোত্রের পতাকা দেখা গেল। অতঃপর জুহাইনিয়াহ, হুযাইম ও সুলাইম গোত্র বিপুল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আল্লাহ্ আকবর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে এগিয়ে গেল। আবু সুফিয়ান প্রত্যেকবারেই নির্ভীক সেনাদল দেখে ভীত হয়ে পড়ছিল। সবশেষে আনসার গোত্রগুলো এমন রণসম্ভারে সুসজ্জিত হয়ে এল যে আবু সুফিয়ানের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। তিনি আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, এ কোন সৈন্যদল? আব্বাস (রাঃ) তাঁদের পরিচয় দান করলেন। অকস্মাৎ এ সেনাদলের নেতা সা'আদ ইবনে 'উবাদাহ্ আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে চলে গেলেন এবং আবু সুফিয়ানকে দেখে বলে উঠলেন ঃ

"আজ তুমুল যুদ্ধের দিন! আজ কাবাকে হালাল করে দেয়া হবে!"

সর্বশেষে নবীভাস্কর তাঁর পূর্ণ দীপ্তিসহকারে উদ্ভাসিত হল। তাঁর ছায়াতে মাটির উপর আলোর তরঙ্গ খেলছিল। হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম এ দলের পতাকাবাহী সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। আবু সুফিয়ানের দৃষ্টি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চেহারার উপর পড়তেই চিৎকার করে উঠলেন, "হুযুর উবাদাহ্ কি বলে?" হযরত (সাঃ) উত্তরে বললেন,—"উবাদাহ্ ঠিক বলছে না। আজ বরং কাবার মর্যাদার দিন।" একথা বলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নির্দেশ দিলেন, "ঐ সেনাদলটির পতাকা উবাদার কাছ থেকে নিয়ে তার পুত্রকে অর্পণ কর।"

মক্কায় পৌঁছে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নবুওতের ঝাণ্ডা 'হাজুন' নামক স্থানে স্থাপন করতে নির্দেশ দিলেন। সৈন্যগণকে নিয়ে উচ্চভূমির দিকে আসার জন্যে খালেদ (রাঃ) আদিষ্ট হল। ঘোষণা করা হল—

যে ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করবে, অথবা আবু সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করবে, অথবা ঘরের দরজা বন্ধ করবে, তাকে নিরাপত্তা দেয়া হবে।

কোরাইশদের একটি দল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। তারা হযরত খালেদ (রাঃ)-এর সৈন্যদের তীর বর্ষণ শুরু করে দিল। এতে কুরয ইবনে জাবের ফেহ্রী এবং হুবাইশ ইবনে আশ'আর নামক দুজন সাহাবী শাহাদাতবরণ করলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) অগত্যা তাদের উপর আক্রমণ করতে বাধ্য হল। তারা ৩১টি মৃতদেহ ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তরবারির ঝলকানি দেখে খালেদ (রাঃ)-এর নিকট কৈফিয়ত তলব করলেন। কিন্তু যখন জানতে পারলেন যে এ যুদ্ধের সূচনা শত্রুপক্ষের তরফ থেকে হয়েছে তখন বললেন, "আল্লাহর ফয়সালা এটিই ছিল।"

লোকেরা হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কোথায় অবস্থান করবেন? শরীয়তের আইনে মুসলমান কাফেরদের উত্তরাধিকারী হয় না। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাচা আবু তালেব যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন তাঁর পুত্র আকীল কাফের ছিলেন। সে কারণে তিনিই তার উত্তরাধিকারী হন। তিনি এ সমস্ত ঘরবাড়ি আবু সুফিয়ানের নিকট বিক্রি করে দেন। এ কারণে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "আকীল কি কোথাও বাড়ি রেখেছে যে সেখানে উঠব? কাজেই খাইফেই অবস্থান করব।" এখানেই হিজরতের পূর্বে কোরাইশরা হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও হাশেমী বংশের সমস্ত লোককে মক্কা থেকে বিতাড়িত করে নির্বাসিত করেছিল।

আল্লাহ্র শান! সম্মানিত হরম! যা মূর্তি ধ্বংসকারী অদ্বিতীয় আল্লাহ্র উপাসক হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)-এর পুণ্যস্মৃতি, সে হরমের অভ্যন্তরেই ৩৬০টি মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক-একটি মূর্তিকে লাঠির দ্বারা মৃদু আঘাত করতে লাগলেন আর উচ্চারণ করতে লাগলেন,

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ـ

— "সত্য এসে গেছে, মিথ্যা নির্মূল হয়েছে; নিঃসন্দেহে মিথ্যা নির্মূল হবারই বিষয়।" কাবার অভ্যন্তরে অনেকগুলো মূর্তি ছিল। কোরাইশরা সেগুলোকে খোদা বলে মানত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কাবাগৃহে প্রবেশের পূর্বে নির্দেশ দিলেন যে সমস্ত মূর্তি বের করে দাও। হযরত ওমর (রাঃ) ভেতরে প্রবেশ করে যে সমস্ত ছবি আঁকা ছিল মূর্তিসহ সেগুলোও মুছে ফেললেন। হরম শরীফ এ সমস্ত নাপাকী মুক্ত হলে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) কাবাগৃহের দ্বাররক্ষক ওসমান ইবনে তালহার কাছ থেকে চাবি নিয়ে দরজা খোলালেন। অতঃপর হযরত বেলাল (রাঃ) ও তালহা (রাঃ)-কে সঙ্গে করে ভেতরে প্রবেশ করে নামায আদায় করলেন। বোখারীর এক বর্ণনাতে আছে, তিনি কাবার ভেতরে তাকবির বলেছিলেন—নামায আদায় করেননি।

বিজয়ী ভাষণ

আল্লাহর প্রতিনিধি ও খলীফা হিসাবে ইসলাম সম্রাট হযরত মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রথমবারের মত যে সাধারণ জনসমাবেশে ভাষণ দান করলেন তা কেবলমাত্র মক্কাবাসীর জন্যে ছিল না, বরং সমগ্র বিশ্বের মানুষের উদ্দেশেই ছিল। তিনি বললেন ঃ

—"এক আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোন উপাস্য নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন এবং সম্মিলিত বাহিনীকে একাই পরাভূত করেছেন। জেনে রেখো, আজ থেকে জাহেলিয়াতের সমস্ত গর্ব-অহঙ্কার, পূর্বের সমস্ত রক্তের প্রতিশোধ এবং সমস্ত রক্তপণের দাবি আমার এ পদতলে প্রোথিত। তবে কাবাগৃহের তত্ত্বাবধান ও হাজীদের পানি পান করানোর বিষয়টি স্বতন্ত্র।"

"হে কোরাইশগণ! এখন আল্লাহ্ তা'আলা জাহেলিয়াতের গর্বাহঙ্কার ও বংশ গৌরব মিটিয়ে দিয়েছেন। কারণ, সমগ্র মানুষ আদমের বংশ। আর আদমের সৃষ্টি মাটি থেকে।"

অতঃপর তিনি কোরআন মজীদের এ আয়াতটি পাঠ করলেন।

— "হে মানবকুল! আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বংশ ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনে নিতে পার। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি সে-ই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খোদাভীরু। অবশ্যই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও যাবতীয় বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।"

"অবশ্যই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল মদ্য ক্রয়-বিক্রয় হারাম করে দিয়েছেন।"

সমস্ত আকীদা-বিশ্বাস ও 'আমলের মূল ভিত্তি এবং ইসলামী দাওয়াতের মূল পয়গাম তওহীদ বা একত্ববাদ। এ জন্যে তওহীদ ঘোষণার মাধ্যমেই ভাষণের সূচনা করেন।

ভাষণের মূল উদ্দেশ্য

আরবদের নীতি ছিল, কোন ব্যক্তি যদি কাউকেও হত্যা করত, তবে সে হত্যার প্রতিশোধ নেয়া তাদের খান্দানগত দায়িত্ব বলে বিবেচিত হত। অর্থাৎ, তখনি যদি ঘাতককে পাওয়া না যেত, তাহলে তাদের পারিবারিক সেরেস্তায় মৃতের নাম লিখে রাখত। শত শত বছর অতীত হবার পরও প্রতিশোধ গ্রহণের দায়িত্ব পালন করা অত্যাবশ্যকীয় বিবেচনা করা হত। যদি ঘাতক মরে যেত, তবে, ঘাতকের পরিবারের কোন লোককে হত্যা করার মাধ্যমে হত্যার প্রতিশোধ নেয়া হত। অনুরূপভাবে রক্তপণের দাবিও বংশানুক্রমে চলে আসত। আরবদের মধ্যে খুনের প্রতিশোধ গ্রহণ বিশেষ গর্বের ব্যাপার ছিল। এমনিতর আরও অনেক অর্থহীন ও বাহুল্য ব্যাপার জাতীয় গর্বের বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। ইসলাম এ সমস্ত অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করতে এসেছে। এ কারণেই আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) প্রতিশোধ, রক্তপণ এবং অনুরূপ অন্যান্য সমুদয় মিথ্যা ও ভূয়া গর্ব-অহঙ্কার সম্পর্কে বলেছেন, আমি সেগুলোকে পদতলে দলিত করলাম।

আরব তথা সারা বিশ্বে বংশ ও জাতি-গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই শ্রেণীবিভেদ ও বর্ণভেদের সৃষ্টি হয়েছিল। উদাহরণত হিন্দুরা নিজদেরকে চার বর্ণে বিভক্ত করে রাখে। তাদের মধ্যে শূদ্রদেরকে ইতর প্রাণীর পর্যায়ে নিক্ষেপ করা হয়। তাদের প্রতি এমন বাধ্য-বাধকতা আরোপ করা হয় যাতে তারা এক বিন্দুও সামনে এগুতে না পারে।

ইসলামের সবচাইতে বড় অবদান বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা।—মানুষে মানুষে সমতা ও সম-অধিকার কায়েম করা। ইসলামের দৃষ্টিতে, আরব-আযম, আশরাফ-আতরাফ, বাদশাহ্-ফকীর সবাই সমান। প্রত্যেক মানুষই উন্নতি সাধনের মাধ্যমে যেকোন বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করতে পারে। সে কারণেই হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোরআন মজীদের উল্লিখিত আয়াত তেলাওয়াত করলেন এবং তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন, তোমরা সবাই আদমের সন্তান এবং আদমের সৃষ্টি মাটি থেকে।

ভাষণের পর হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উপস্থিত জনতার দিকে লক্ষ্য করলেন, অত্যাচারী কোরাইশরাও তাঁর সামনেই ছিল। তাদের মধ্যে এমনসব সংগতিপন্ন ও বিত্তবান লোক ছিল, যারা ইসলামকে সমূলে উৎপাটিত করার উদ্দেশ্যে পুরোভাগে থাকত; তারাও ছিল যারা সর্বদা তাঁর প্রতি অহেতুক কটূক্তি উচ্চারণ করতে থাকত; তারাও ছিল যাদের অস্ত্রশস্ত্র তাঁর পবিত্র দেহের প্রতি ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করেছিল। এমন লোকও বিদ্যমান ছিল যারা তাঁর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত; সেও বিদ্যমান ছিল যে তাঁর বক্তৃতার সময় পাথর নিক্ষেপ করে তাঁর দেহ রক্তাপ্লুত করে দিত; তারাও বিদ্যমান ছিল যাদের অদম্য পিপাসা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর তাজা খুন ছাড়া কিছুতেই মিটবার ছিল না; তারাও ছিল যাদের আক্রমণের ঝঞ্ঝা মদীনার প্রাচীরগাত্রে আঘাত হানত; তারাও ছিল যারা মুসলমানদের মরুভূমির অগ্নিঝরা সূর্যতাপের মধ্যে জ্বলন্ত বালুকার উপরে শুইয়ে বুকে আগুনের ছেঁকা দিত।

রাহ্মাতুল্লিল 'আলামীন (সাঃ) তাদের প্রতি লক্ষ্য করলেন এবং অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি জান, আমি তোমাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করব?"

এ লোকগুলো যদিও যালেম ছিল, কঠিন হৃদয়বিশিষ্ট ছিল, কিন্তু মানুষের মেজায বুঝতে পূর্ণ পারদর্শী ছিল। সবাই উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল,

—"আপনি ক্ষমাশীল ভাই ও দয়ার্দ্র ভাতিজা!"

ঘোষণা করলেন—

"আজ তোমাদের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই, যাও, তোমরা সবাই মুক্ত।"

মক্কার কাফেররা সমস্ত মুহাজেরের বাড়িঘর দখল করে নিয়েছিল। এখন সে সমস্ত বাড়িঘর তার প্রকৃত মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দেয়ার সময়। অথচ হযরত (সাঃ) মুহাজেরদের নিজ নিজ বাড়িঘরের স্বত্ব ছেড়ে দিতে নির্দেশ দিলেন।

নামাযের সময় হল। হযরত বেলাল (রাঃ) কাবাগৃহের উপরে উঠে আযান দিলেন। যে সমস্ত বিদ্রোহী এতক্ষণ শান্ত ছিল, আযান শুনে তাদের অহংবোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। 'এতাব ইবনে উসাইদ বলল, "আল্লাহ্ আমার পিতার ইয্যত রেখেছেন, এ আওয়ায শোনার আগেই তিনি তাঁকে তুলে নিয়েছেন।"

— (ইবনে হিশাম)।

অন্য একদল কোরাইশ নেতা বলল, "এখন আর বেঁচে থাকা অর্থহীন।[১]

সাফা পর্বতের উপর একটি উঁচু জায়গায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বসলেন। যারা ইসলাম গ্রহণ করতে আসত, তাঁর হাতে হাত রেখে বাইআত করত। পুরুষদের পালা শেষ হলে স্ত্রীলোকেরা আসত। স্ত্রীলোকদের বাইআতের পদ্ধতি এ ছিল যে তাদের কাছ থেকে ইসলামের আরকানসমূহ (আরকান বলতে ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ— কলেমা, নামায, যাকাৎ, রোযা ও হজকে বোঝায়) এবং সতীত্ব ও চরিত্র রক্ষার শপথ নিতেন। অতঃপর হযরত (সাঃ) পানিপূর্ণ একটি পেয়ালায় তাঁর পবিত্র হাত ডুবিয়ে দিতেন। তাঁর হস্ত ডুবানো এ পানিতে মহিলারা নিজ নিজ হাত ডুবিয়ে নিত এবং এভাবেই তাঁদের বাইআত সুদৃঢ় হয়ে যেত।

এ মহিলাদের মধ্যে হিন্দাও এসেছিল। হিন্দা ছিল আরব নেতা 'ওতবার কন্যা, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী এবং আমীর মুয়াবিয়ার জননী। হযরত হামযাহ্ (রাঃ)-কে শহীদ করিয়ে সে-ই তাঁর বুক চিরে কলজে চিবিয়েছিল। হিন্দা চেহারা আবৃত করে নেকাব ঢাকা অবস্থায় এসেছিল। সম্ভ্রান্ত মহিলারা সাধারণত নেকাব পরেই বের হত। কিন্তু এ সময়ে তার নেকাব পারার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে কেউ তাকে চিনতে না পারে। বাইআতের সময় সে বিশেষ সাহসিকতার (বরং ধৃষ্টতার) সঙ্গে কথোপকথন করে। তার সংলাপ ছিল নিম্নরূপ ঃ

হিন্দা— 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের নিকট থেকে কি কি বিষয়ে শপথ (বাইআত) গ্রহণ করছেন"?

রসূলুল্লাহ (সাঃ)—"আল্লাহর সঙ্গে কাউকেও শরীক করবে না।"

---

১. এসাবাঃ তায্‌কিরাতু'এতাব-বিন-উসাইদ।

হিন্দা—"এ ওয়াদা তো আপনি পুরুষদের কাছ থেকে গ্রহণ করেননি। যাহোক, আমরা তা গ্রহণ করলাম।"

রসূলুল্লাহ (সাঃ)—"চুরি করো না।"

হিন্দা—"আমি আমার স্বামীর (আবু সুফিয়ানের) অর্থ থেকে কোন কোন সময় দু-চার আনা নিয়ে থাকি, তা জায়েয হবে কিনা?"

রসূলুল্লাহ (সাঃ)—"সন্তান-সন্ততি হত্যা করবে না।"

হিন্দা—"আমরা আমাদের সন্তানদেরকে শৈশবে লালনপালন করেছি। বড় হলে (বদরের যুদ্ধে)[১] আপনি তাদের হত্যা করেছেন। তখন আপনি ও তারা বোঝাপড়া করবেন।"

আরব নেতৃবর্গের (রইসদের) মধ্যে ১০ ব্যক্তি ছিল তাদের মধ্যমণি। তাদের মধ্যে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া পালিয়ে জেদ্দায় চলে যায়। ওমাইর ইবনে ওয়াহাব (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে নিবেদন করলেন, কোরাইশ নেতৃবৃন্দ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। হযরত (সাঃ) নিরাপত্তার প্রতীক হিসাবে নিজের পাগড়ি তাকে দিয়ে দিলেন। 'ওমাইর জেদ্দায় গিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনলেন। হুনাইনের যুদ্ধ পর্যন্ত ওমাইর ইবনে ওয়াহাব ইসলাম গ্রহণ করেনি।[২]

আবদুল্লাহ ইবনে যাব'আরা ছিল প্রখ্যাত আরব কবি। সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কুৎসামূলক কবিতা রচনা করত এবং কোরআন মজীদের সমালোচনা করত। সে পালিয়ে নাজরানে চলে গিয়েছিল। পরে এসে ইসলাম গ্রহণ করল।

আবু জাহলের পুত্র ইকরিমাহ ইয়ামনে চলে যায়। তার স্ত্রী উম্মে হাকীম (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে স্বামীর নিরাপত্তা চেয়ে নেন এবং ইয়ামনে গিয়ে তাকে নিয়ে আসেন। আবু জাহল যদি সেদিন বেঁচে থাকত তবে অবশ্য সে দেখত যে তারই কলজের টুকরো কুফরের কুহকজাল ছিন্ন করে ইসলামের শান্তিময় ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এখন তাকে হযরত ইকরিমাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলা হয়।

১. বদরের অভিযানে হিন্দার ছেলেরা যুদ্ধ করে নিহত হয়।
২. তাবারী ও ইসাবাহ গ্রন্থে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার আলোচনা' দ্রষ্টব্য।

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কয়েক ব্যক্তি

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনী লেখকগণ লিখেছেন যে যদিও তিনি মক্কাবাসীকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন, তথাপি দশ[১] ব্যক্তি সম্পর্কে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে যেখানেই পাওয়া যায় তাদের যেন তাৎক্ষণিকভাবে হত্যা করা হয়। তাদের কেউ কেউ যেমন আবদুল্লাহ ইবনে খাত্তাল ও মাকীস ইবনে সাবাবা খুনী আসামী ছিল। তাদের উপর কেসাসের হুকুম অনুযায়ী (ইসলামী আইনে খুনের বদলে খুন) হত্যা করা হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে কতিপয় এমন লোকও ছিল যাদের অপরাধ শুধু এটাই ছিল যে তারা মক্কায় অবস্থানকালে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি নির্যাতন করত অথবা কুৎসামূলক কবিতা রচনা করত।

তাদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোককে এ অপরাধে হত্যা করা হয় যে সে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কুৎসামূলক গান গাইত। কিন্তু মুহাদ্দেস সুলভ পর্যালোচনায় এ বর্ণনা শুদ্ধ বলে বিবেচিত নয়। কারণ, উপরোক্ত অপরাধে তো সমস্ত মক্কাবাসীই অপরাধী ছিল। কোরাইশদের মধ্যে চারজন ছাড়া—কে এমন ছিল, যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জ্বালাতন করেনি। এতদসত্ত্বেও যে সমস্ত লোককেই এ সুসংবাদ শোনানো হয় যে "তোমরা মুক্ত।" যাদের হত্যার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল তারা তো তুলনামূলকভাবে কমই অপরাধী। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে সেহাহ্ সেত্তায় (ছয়খানা সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কারও উপর ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। খয়বর প্রান্তরে যে ইহুদী স্ত্রীলোক হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বিষ প্রয়োগ করেছিল, লোকেরা তার হত্যার হুকুমের জন্যে আরয করলে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছিলেন, "না, তাকে হত্যা করো না।" খয়বরের কুফরপুরীতে একটি ইহুদী বিষ প্রয়োগ করার মত অপরাধ সংগঠন করা সত্ত্বেও মহানবীর (সাঃ) দয়ায় প্রাণে রক্ষা পায়, তবে হরম শরীফে তা অপেক্ষা লঘু অপরাধে অপরাধী কেমন করে তাঁর করুণা হতে বঞ্চিত হতে পারে।

---

১. হাফেয মোগলতাঈ বিভিন্ন উদ্ধৃতিতে (referance) ১৫ ব্যক্তির নাম সন্নিবেশিত করেছেন। কিন্তু তা মুহাদ্দেসদের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর জীবনচরিত রচয়িতাগণ দশ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক ৮ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন। হাদীস গ্রন্থে আবু দাউদ ও দারে কুৎনীর বর্ণনায় ৬ ব্যক্তির নাম উল্লেখ আছে। সহীহ্ বোখারী গ্রন্থে কেবলমাত্র ইবনে খাত্তালের ঘটনা লিখিত আছে :এতে প্রতীয়মান হয় যে গবেষণার ক্ষেত্র যত প্রশস্ত হয় সংখ্যার অঙ্ক তত ছোট হয়ে পড়ে।

সাধারণ বর্ণনাদৃষ্টে যে দশজনের মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণা করা হয়েছিল তারা গুরুতর অপরাধে অপরাধী ছিল। এতদসত্ত্বেও এদের মধ্যে সাত ব্যক্তি পূর্ণ একাগ্রতার সাথে ঈমান এনেছিল। কেবলমাত্র বাকি তিন ব্যক্তি নিহত হয়। এদের মধ্যে দুজন ছিল পুরুষ ও একজন নারী। আবদুল্লাহ্ ইবনে খাত্তাল, মাকীস বিন সাবাবা ও আবদুল্লাহ্ বিন খাত্তালের দাসী কুরাইবা। আবদুল্লাহ্ বিন খাত্তাল ও মাকীস বিন সাবাবা তারা দুজনই খুনী আসামী ছিল। ইবনে খাত্তাল মুসলমান হয়েছিল। পরে তার এক মুসলিম খাদেমকে হত্যা করে মুরতাদ হয়ে যায়। মাকীস-ইবনে সাবাবার ঘটনা এই যে তার এক ভাই ভুলক্রমে এক আনসারের হাতে মারা যায়। হযরত (সাঃ) তার রক্তপণ আদায় করে দেন। তথাপি সে কপটতাসহ্ (মোনাফেকী অন্তরে) ইসলাম গ্রহণ করে এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সেই আনসারীকে হত্যা করে।

ইবনে খাত্তালের দাসী কুরাইবা মক্কার এক গায়িকা ছিল। সে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কুৎসামূলক গান গাইত (যারকানী ও হিশামের গ্রন্থে মক্কা বিজয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

যদি বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন গবেষণালব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর না-ও করা হয়, তবুও কেবলমাত্র বর্ণিত হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে এ ঘটনা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। সহীহ্ বোখারী গ্রন্থে কেবলমাত্র ইবনে খাত্তালের হত্যার কথা উল্লিখিত হয়েছে। আর একথা সর্বজনস্বীকৃত যে তাকে কেসাসস্বরূপ হত্যা করা হয়। মাকীসের হত্যাও শরীয়তের কেসাস মতেই হয়েছিল। বাকি যাদের সম্পর্কে হত্যার হুকুম দেয়া হয়েছিল, তাদের সম্পর্কে বলা হয় যে তারা এক সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নির্যাতন করত। এ প্রসঙ্গের বর্ণনাগুলো কেবলমাত্র ইবনে ইসহাক পর্যন্ত গিয়েই শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ, হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি (অসূলে হাদীস) মোতাবেক তা অসংলগ্ন বা মুনকাতে' যা গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়া স্বয়ং ইবনে ইসহাকও যে বর্ণনাকারী হিসাবে কোন্ মর্যাদার অধিকারী তা আমরা এ গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছি।

এ প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য যে রেওয়ায়েতটি পেশ করা হয় সেটি সুনানে আবু দাউদে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে উল্লেখ আছে যে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন, "চার ব্যক্তির কোথাও নিরাপত্তা দেয়া যেতে পারে না।" কিন্তু ইমাম আবু দাউদ (রাহঃ) নিজেই এ হাদীসটি উদ্ধৃত করার পর মন্তব্য করেছেন যে এ রেওয়ায়েতের সনদ যেরূপ হওয়া প্রয়োজন সেরূপ আমি পাইনি। অতঃপর তিনি ইবনে খাত্তাল সম্পর্কিত রেওয়ায়েত[১] লিপিবদ্ধ করেন। এ রেওয়ায়েতের একজন রাবী বা বর্ণনাকারীর নাম আহ্মদ ইবনে মুফায্যাল। তাঁকে বিখ্যাত হাদীস সমালোচক ইয়াযদী মুনকেরুল হাদীস (অগ্রহণযোগ্য হাদীসবেত্তা) বলে উল্লেখ করেছেন। এ রেওয়ায়েতের আর একজন রাবী আসবাত ইবনে নযর সম্পর্কে ইমাম নাসায়ীর উক্তি, "তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী নন।" যদিও এ ধরনের ত্রুটি কোন রেওয়ায়েতের নির্ভরযোগ্য না হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়; কিন্তু এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্যে বর্ণনাকারীর এতটুকু ত্রুটিই ঐ বর্ণনা 'মাশকুক' বা সন্দেহযুক্ত হবার পক্ষে যথেষ্ট।

একথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে কিছুসংখ্যক কোরাইশ সর্দার যারা ইসলামের শত্রুদের পুরোভাগে ছিল, তাঁরা হযরত (সাঃ)-এর আগমনের সংবাদ শুনে মক্কা থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের হত্যার হুকুম হওয়াতেই যে তারা পালিয়ে যায় তা ইবনে ইসহাকের কেয়াস বা কল্পনাপ্রসূত উক্তি। এ সমস্ত হুলিয়া করা পলাতকদের মধ্যে ইবনে ইসহাক ইকরীমা ইবনে আবু জাহ্লকেও শামিল করেছেন। কিন্তু ইমাম মালেকের মু'আত্তা নামক যে গ্রন্থ সম্পর্কে ইমাম শাফী মন্তব্য করেছেন যে "আসমানের নিচে কোরআন মজীদ ছাড়া এর চাইতে সহীহ্ গ্রন্থ আর একটিও নেই" সে গ্রন্থে এ রেওয়ায়েত যেভাবে লিখিত হয়েছে, তার সার্বিক অনুবাদ নিচে প্রদত্ত হল—

১. আবু দাউদ— কতলুল আসীর বা বন্দীদের হত্যা অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

—"হারেস ইবনে হিশামের কন্যা উম্মে হাকীম ইকরিমা ইবনে আবু জাহ্লের স্ত্রী ছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর স্বামী ইকরিমা ইবনে আবু জাহ্ল ইসলাম গ্রহণে বিমুখ হয়ে ইয়ামনে চলে যায়। উম্মে হাকীম ইয়ামনে গেলেন এবং তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। এতে তিনি মুসলমান হয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে দেখে তৎক্ষণাৎ খুশীর আবেগে উঠে দাঁড়ালেন এবং এত দ্রুত তাঁর দিকে এগুলেন যে তাঁর শরীরে চাদর পর্যন্ত ছিল না। অতঃপর হযরত (সাঃ) তাঁর কাছ থেকে বাইয়াত গ্রহণ করেন।"[১]

এক্ষেত্রে এ বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে যাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়, তাদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয় না। সমস্ত ঐতিহাসিক ও হযরতের জীবনী লেখকগণ প্রকাশ করেছেন যে মক্কা বিজয়ের পর হুনাইনের যুদ্ধে বহুসংখ্যক কাফের শামিল ছিল। সে যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের বিশেষ কারণও তাই ছিল। প্রথম আক্রমণেই কাফেররা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং বিশৃঙ্খলার কারণেই মুসলমানরাও টিকে থাকতে পারেননি।

হরমের ধনভাণ্ডার

হরম শরীফে নযর, মান্নত ও হাদিয়া-তোহ্ফা অনেক দিন থেকে জমা হয়ে আসছিল। হযরত নবী করীম (সাঃ) সে সমস্ত নিজ হেফাযতে রাখলেন। কিন্তু মূর্তি ও প্রতিমূর্তিসমূহ ধ্বংস করে দেয়া হল। এর মধ্যে হযরত ইবরাহীম এবং ইসমাইল (আঃ)-এর মূর্তিও ছিল। হযরত ঈসা (আঃ)-এর মূর্তিও ছিল।[২] এতে অনুমিত হয় যে এক সময়ে খৃষ্টবাদ ও মক্কায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। কাবাগৃহের প্রাচীর গাত্রে যে সমস্ত রঙিন ছবি আঁকা ছিল মুছে, ফেলার পরেও তার আবছা চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর কাবাগৃহ পুনঃনির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত সে সমস্ত চিহ্ন বর্তমান ছিল।[৩] মক্কা মো'আয্যমায় হযরত নবী করীম (সাঃ) পনের দিন অবস্থান করলেন। যখন তিনি এখান থেকে যাত্রা করলেন, তখন হযরত মু'আয্ ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে লোকদের ইসলামের হুকুম আহ্কাম এবং মাস্আলা মাসয়েল শিক্ষা দানের জন্যে নিয়োজিত করে গেলেন।

১. মো'আত্তা কিতাবুন্নিকাহ্।
২. ফতহুলবারী গ্রন্থে মক্কা বিজয়ের আলোচনা অধ্যায়।
৩. ফতহুল বারী মক্কা বিজয় অধ্যায়। যারকানী রচিত 'আখবারে মক্কা'।

মক্কা বিজয় ও মূর্তি ধ্বংস

মক্কা বিজয়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল একত্ববাদের (তৌহিদ) প্রচার এবং আল্লাহ্‌র বাণীকে সমুন্নত করা। কাবা শরীফে বহু দেবমূর্তি ছিল। তন্মধ্যে হুবল দেবতা ছিল মূর্তিপূজকদের প্রধান দেবতা। এটি ছিল গাঢ় লোহিত বর্ণের মূল্যবান ইয়াকূত পাথরে নির্মিত, মানুষের আকৃতিবিশিষ্ট। আদনানের প্রপৌত্র ও মোযারের পৌত্র খুযাইমাহ্ ইবনে মোদ্‌রেকা সর্বপ্রথম এ মূর্তিটি কাবাগৃহে স্থাপন করে। হুবলের সামনে সাতটি তীর থাকত। এ সমস্ত তীরের উপর "হ্যাঁ" ও "না" (نعم ، و ، لا) লেখা ছিল। আরবেরা যখন কোন কাজ করতে মনস্থ করত, তখন ঐ সমস্ত তীরের মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা করে নিত। লটারীতে "হ্যাঁ" অথবা "না" যা উঠত সে মোতাবেক কাজ করত। ওহুদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ান এ হুবল দেবতারই জয়ধ্বনি উচ্চারণ করেছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কাবাগৃহে প্রবেশ করেছিলেন, তখন অন্যান্য দেবমূর্তির সঙ্গে সেটিও উৎপাটিত করা হয়। মক্কার আনাচেকানাচে ও পথেপ্রান্তরে আরও অনেক বড় বড় মূর্তি বিদ্যমান ছিল। সেগুলোর উদ্দেশ্যে হজের অনুষ্ঠান পালন করা হত। সেগুলোর মধ্যে লাত, মানাত ও 'উয্‌যা ছিল সর্ববৃহৎ। উয্‌যা কোরাইশদের এবং লাত তায়েফবাসীদের পূজ্যদেবতা ছিল। মক্কা নগরী থেকে এক মঞ্জিল দূরে 'নখলা' নামক স্থানে 'উয্‌যা নামক দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। বনূ শাইবা গোত্র এ দেবতার পুরোহিত বা সেবাইত ছিল। আরবদের বিশ্বাস ছিল যে আল্লাহ্ শীতকালে লাত দেবতার কাছে এবং গ্রীষ্মকালে 'উয্‌যা' দেবতার কাছে অবস্থান করেন। আরবরা কাবাগৃহে যে সব অনুষ্ঠান পালন করত ও কোরবানী দান করত উয্‌যা দেবতার সামনেও তেমনি আচার-অনুষ্ঠান পালন করত। তারা সেটি প্রদক্ষিণ করত এবং তার নামে কোরবানী করত।[১]

মদীনা মুনওয়ারা থেকে (মক্কার পথে) সাত মঞ্জিল দূরে কাদীদ নামক স্থানের নিকটবর্তী মুশাল্লালে মানাতের দেবমন্দির অবস্থিত। এটি ছিল কারুকার্যবিহীন একটি প্রস্তরখণ্ড। ইয্‌দ, গাসসান, আওস ও খায্‌রাজ গোত্রসমূহ্ এর নিকট হজব্রত পালন করত। আমর ইবনে লুয়াই যে সমস্ত মূর্তি স্থাপন করেছিল এটি ছিল তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আওস ও খায্‌রাজ গোত্রের লোকেরা কাবা শরীফে হজ সমাপনান্তে মস্তকমুণ্ডনপূর্বক এহ্‌রাম ভংগের অনুষ্ঠান এ দেবতার সামনে আদায় করত।"[২]

হুযাইল গোত্রের দেবতা ছিল সুআ। এটি ইয়ামবোয়ের পার্শ্ববর্তী রাহাত নামক স্থানে স্থাপিত ছিল। মূলে এটিও ছিল এক খণ্ড প্রস্তর । বনূ লেহইয়ান গোত্র ছিল এর পুরোহিত ও সেবাইত।

মূর্তিপূজার এ কুহকে সমগ্র আরব নিমজ্জিত ছিল। এখন তাদের সময় এল এবং একযোগে সর্বত্র সেগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হল।

---

১. যারকানী, ২য় খণ্ড ৪০০ পৃঃ।

২. মু'জামু'ল বুলদান গ্রন্থে 'মানাতের', আলোচনা অধ্যায়।

হুনাইন, আওতাস ও তায়েফের যুদ্ধ

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ

—"এবং তোমরা হুনাইনের সময় দিবসকে স্মরণ কর, যখন তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্য দর্শনে বিস্মিত হয়েছিলে"— আল্ কোরআন।

হুনাইন

মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি মালভূমির নাম হুনাইন। যুল মাজায্ আরাফা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত আরবের বিখ্যাত একটি বাজার।

এ স্থানটিকে আওতাসও বলা হয়। বহু শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট এক বৃহৎ গোত্রের নাম হাওয়াযিন।

ইসলামের বিজয় যদিও প্রসার লাভ করছিল, কিন্তু আরববাসীরা লক্ষ্য করছিল যে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মস্থান মক্কা নগরী এখনও সংরক্ষিত। তাদের ধারণা ছিল যে মোহাম্মদ (সাঃ) যদি কোরাইশদের উপর বিজয়ী হন এবং মক্কা বিজিত হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি সত্য পয়গম্বর। মক্কা বিজিত হলে আরবের গোত্রসমূহ স্বেচ্ছায়ই ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়ল এবং দলে দলে ইসলাম কবুল করতে শুরু করল।[১] কিন্তু হাওয়াযিন ও সক্বীফ গোত্রদ্বয়ের উপর বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। এ গোত্রটি অত্যন্ত যুদ্ধবাজ ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। যতই ইসলামের বিজয় সাধিত হতে থাকে ততই তারা বিচলিত হতে থাকে।[২] কারণ, এতে তাদের নেতৃত্ব, কৃতিত্ব ও প্রাধান্যের অবসান ঘটতে লাগল। এ জন্যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে হাওয়াযিন গোত্রের নেতৃবর্গ সমগ্র আরব ভ্রমণ করে এবং প্রত্যেক জায়গায় ইসলামের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করে। পূর্ণ এক বৎসর যাবৎ তারা এ প্রচেষ্টা চালায় এবং সমস্ত গোত্রের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত করে যে ইসলামকে দুনিয়ার বুক থেকে উৎখাত করার জন্যে সকলে মিলে এক সম্মিলিত হামলা চালাতে হবে। মক্কা বিজয়ের পর তাদের বদ্ধমূল ধারণা জন্মাল যে এখন আক্রমণ ত্বরান্বিত না করলে কোন শক্তিই আর ইসলামকে পরাভূত করতে পারবে না।

১. সহীহ্ বোখারীর মক্কা বিজয় অধ্যায়ে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহে ওয়া সাল্লামের মক্কায় অবস্থান শিরোনাম।
২. মাগুলিওস লিখেছেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মদীনা প্রত্যাবর্তনের সময় তাদের কাছে এ ভূয়া খবর এসে পৌঁছাল যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের উপর হামলা চালাবার জন্যেই এগিয়ে আসছেন। কাজেই এখন আর তাদের অপেক্ষা করার প্রয়োজন রইল না। তৎক্ষণাৎ তারা অতি আড়ম্বরের সঙ্গে নিজেরাই আক্রমণের জন্যে অগ্রসর হল। তাদের এমনি উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল যে প্রত্যেক গোত্রই তাদের পরিবারের সমস্ত লোকজনসহ রওয়ানা হল। উদ্দেশ্য এই যে নারী ও শিশুগণ সঙ্গে থাকলে তাদের রক্ষাকল্পে লোকেরা জীবন দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।

এ যুদ্ধে যদিও সক্বীফ ও হাওয়াযিন গোত্রের সমস্ত শাখা-প্রশাখা শামিল ছিল, তবুও কা'আব ও কেলাব গোত্রদ্বয় বিরত থাকে। এ বিশাল সেনাবাহিনীর সেনাপতিত্ব করার জন্যে দু'ব্যক্তিকে মনোনীত করা হল। তাদের একজনের নাম মালেক ইবনে আওফ অপরজনের নাম দারিদ ইবনে আল সিম্মাহ্। প্রথমোক্ত ব্যক্তি হাওয়াযিন গোত্রের গোত্রপ্রধান। দ্বিতীয় ব্যক্তি (দারিদ ইবনে আল্ সিম্মাহ্) বিখ্যাত কবি এবং যশম গোত্রের নেতা ছিল। তার কবিত্ব ও বীরত্ব আরবের ইতিহাসে এখনও স্মরণীয়। কিন্তু সে তখন শতাধিক বৎসর বয়স্ক এক কঙ্কালসার বৃদ্ধ। তবুও যেহেতু আরবের লোকেরা তাকে মান্য করত এবং তাঁর মতামতের প্রতি সমগ্র আরববাসীর আস্থা ছিল, সেহেতু স্বয়ং মালেক ইবনে আওফ নিজেই তাকে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্যে অনুরোধ করেন। খাটিয়ায় তুলে তাকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যাওয়া হল। সে জিজ্ঞেস করল, এ স্থানটির নাম কি? লোকেরা উত্তরে বলল, আওতাস্। সে বলল, হাঁ, এটি যুদ্ধের জন্যে উপযোগী স্থান বটে। এখানকার মাটি খুব শক্তও নয় আবার পা বসে যাওয়ার মত নরমও নয়। আবার প্রশ্ন করল, "শিশুদের কান্নার শব্দ শুনছি কেন? লোকেরা উত্তরে বলল, নারী ও শিশুগণ সঙ্গে এসেছে যাতে কেউ পশ্চাদপসরণ না করে। সে বলল, "যখন পদস্খলন ঘটে, তখন কোন কিছুই আর তাতে দৃঢ়তা আনতে পারে না। যুদ্ধের ময়দানে কেবলমাত্র তরবারিই কাজে আসে। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি পরাজয় ঘটে, তবে স্ত্রীলোকদের জন্যে আরও অপদস্থ হতে হবে।"

অতঃপর জিজ্ঞেস করল, "কা'আব ও কেলাব গোত্র অংশগ্রহণ করেছে কি?" যখন জানতে পারল যে এ দু' সম্মানিত গোত্রের একটি প্রাণীও যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হয়নি, তখন সে মন্তব্য করল যে "আজকের দিন যদি সম্মান সম্ভ্রম লাভের দিন হত, তবে কা'আব ও কেলাব গোত্র অনুপস্থিত থাকত না।" তার অভিমত এ ছিল যে এ ময়দান থেকে সরে গিয়ে কোন সংরক্ষিত স্থানে সৈন্য জমায়েত করে সেখানেই যুদ্ধের ঘোষণা করা। কিন্তু তিরিশ বছরের নব্য যুবক মালিক ইবনে আওফ যৌবনের উদ্দীপনায় তার এ অভিমত মানতে অস্বীকার করে বলল, আপনি অথর্ব হয়ে গেছেন, এখন আপনার জ্ঞান লোপ পেয়েছে।[১]

১. এর বিস্তারিত বিবরণ তাবারী গ্রন্থে বিদ্যমান আছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ খবর পেয়ে ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু জদরদকে পাঠালেন। তিনি গুপ্তচর হিসাবে হুনাইনে গিয়ে কয়েকদিন যাবৎ সৈন্য দলের মধ্যে অবস্থান করে, সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বাধ্য হয়ে মোকাবিলার জন্যে প্রস্তুতি নিলেন। যুদ্ধের রসদ ও সরঞ্জামাদির জন্যে ঋণ করার প্রয়োজন হল। আবু জাহ্লের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আবদুল্লাহ্ ইবনে রবিয়াহ্ অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে ৩০ হাজার দেরহাম ঋণ গ্রহণ করলেন।[১] সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া মক্কার প্রধান রইস (নেতা) ছিলেন। তিনি অতিথিপরায়ণতায় বিখ্যাত ছিলেন। তিনি তখনও পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি। হযরত নবী করীম (সাঃ) তাঁর কাছ থেকে যুদ্ধাস্ত্র ভাড়া চাইলে তিনি এক শত লৌহবর্ম ও তার আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করলেন।[২]

অষ্টম সন, শওয়াল মাস মোতাবেক ছয় শত তিরিশ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি অথবা ফেব্রুয়ারি মাস। বার হাজার ইসলামী সৈন্য পূর্ণ যুদ্ধ সরঞ্জামাদিসহ এমনি সুসজ্জিত হয়ে হুনাইন অভিযানে যাত্রা করলেন যে সাহাবাগণের মুখ দিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবেই বেরিয়ে পড়ল, "আজ আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয় এমন সাধ্য কার?" কিন্তু আল্লাহ্র নিকট এ গর্বানুভূতি নাপছন্দ ছিল। কোরআন মজীদে আছে ঃ

—"এবং হুনায়নের দিনে যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের গর্বে উন্মত্ত করেছিল, অতঃপর সে সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনই কাজে আসেনি, আর ভূ-পৃষ্ঠ প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের নিমিত্ত সংকীর্ণ হতে লাগল, তৎপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করলে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলের প্রতি এবং মুমিনদের প্রতি তাঁর নিজের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং এমন সৈন্যদল নাযিল করলেন, যাদের তোমরা দেখনি আর কাফেরদের শাস্তি প্রদান করলেন; আর এটাই হল কাফেরদের শাস্তি।"—(আল-কোরআন—৯ঃ৫—৬)

বিজয়ের পরিবর্তে প্রথম ধাক্কায়ই ময়দান সাফ! রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) চোখ তুলে দেখলেন, নিকটতম ও বিশিষ্ট বন্ধুদের কেউ তাঁর পাশে নেই। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আবু কাতাদাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যখন দেখলাম যে মুসলমান সৈন্যরা পালিয়ে যাচ্ছে, তখন এক কাফের এক মুসলমানের বুকের উপর চড়ে

১. মুসনাদে আহ্মদ ৪র্থ খণ্ড ৩৬ পৃ; এসাবা নামক গ্রন্থে ইমাম বোখারী হতেও এ রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হয়েছে, কিন্তু ঐ রেওয়ায়েতে কর্জের অঙ্ক দশ হাজার দিরহাম।

২. মুআত্তা গ্রন্থে আছে যখন হযরত (সঃ) তার নিকট অস্ত্র চাইলেন তখন সে প্রশ্ন করল জবরদস্তিমূলক না স্বেচ্ছামূলক?

অর্থাৎ যবরদস্তিমূলক চাইলে আমি দিতে সম্মত নই। হযরত (সঃ) বললেন, যবরদস্তিমূলক নয়, স্বেচ্ছামূলক। সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে "বাবুয্ যেমানাহ্" অধ্যায়েও এ ধরনের বর্ণনা রয়েছে।

রয়েছে। আমি পেছন দিক থেকে তার কাঁধের উপর তরবারির আঘাত হানলাম। সে ঘুরে এর এমনভাবে আমাকে চেপে ধরল যাতে আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়ে গেল! কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই লোকটি পড়ে গেল। এ সময় আমি ওমর (রাঃ)-কে দেখলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "মুসলমানদের অবস্থা কি?" উত্তরে তিনি বললেন, "এটাই আল্লাহ্র ফয়সালা ছিল।"[1]

পরাজয়ের অনেকগুলো কারণ ছিল। (ক) হযরত খালেদ (রাঃ)-এর সেনাপতিত্বে যে অগ্রগামী সেনাদল গঠিত হয়েছিল, তাতে মক্কা বিজয়ের সময় অধিকাংশ নবদীক্ষিত মুসলমানরা শামিল ছিলেন। তারা যৌবনের উন্মত্ত অহঙ্কারে যুদ্ধসাজে সজ্জিত না হয়েই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল।[2] (খ) সেনাবাহিনীতে মক্কা বিজয়ের সময়, মুক্তিপ্রাপ্ত এমন দু'হাজার লোকও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। (গ) যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা ও যুদ্ধ নিপুণতায় হাওয়াযেন গোত্রের সমকক্ষ আরবে আর কেউই ছিল না। তাদের একটি তীরও ব্যর্থ যেত না।[3] (ঘ) কাফেররা ময়দানে পৌঁছে সুবিধাজনক স্থানসমূহ দখল করে নিয়েছিল এবং পাহাড়ের প্রত্যেক ঘাঁটিতে, গুহাগহ্বরে ও সুড়ঙ্গপথে তীরন্দাজ বাহিনী মোতায়েন করে রেখেছিল। (ঙ) অতি প্রত্যূষে অন্ধকার থাকতে থাকতেই ইসলামী বাহিনী আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন। (চ) যুদ্ধের ময়দান এমন অসমতল ছিল যে সামনে এগুনো বিশেষ কষ্টসাধ্য ছিল। তাঁরা এগুবার চেষ্টা করতেই অকস্মাৎ হাজার হাজার শত্রুসৈন্য তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক বিশাল তীরন্দাজ বাহিনী তাদের উপর তীর বর্ষণ করতে লাগল। অগ্রগামী বাহিনী টিকতে না পেরে পশ্চাদপসরণ করল। এ অবস্থা দেখে সমস্ত সৈন্য হতবল হয়ে পালাতে লাগল। সহীহ্ বোখারী গ্রন্থে আছে, "সবাই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন, কেবল একজন স্থির ও অটল রইলেন।" অর্থাৎ, সকলেই একে একে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন, কেবলমাত্র হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্থির ও অবিচল রইলেন।

অজস্র তীর বর্ষিত হচ্ছে, বার হাজার সৈন্য উধাও হয়েছে, কিন্তু এক মহান সেনাপতি, মহান ব্যক্তিত্ব অটল অনড়। তিনি একাই এক সেনাবাহিনী, এক মহাদেশ, এক বিশ্ব বরং সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি!

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দক্ষিণ দিকে লক্ষ্য করে ডাক দিলেন, 'হে আসনারগণ!' ডাকের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, "আমরা উপস্থিত।" অতঃপর তিনি বাম দিকে ঘুরে ডাক দিলেন, তাতেও অনুরূপ আওয়ায এল। তিনি তাঁর বাহন থেকে নেমে পড়লেন এবং রুদ্র হুঙ্কারে ঘোষণা করলেন, "আমি আল্লাহ্র দাস ও তাঁর রসূল" বোখারীর অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন,

—"আমি যে নবী তা মিথ্যা নই; আমি আবদুল মোত্তালেবের পৌত্র।"

---

১. সহীহ্ বোখারী, হুনাইনের যুদ্ধ অধ্যায়।
২. সহীহ্ বোখারী, জেহাদ অধ্যায়।
৩. সহীহ্ বোখারী জেহাদ অধ্যায়।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিষ্ঠ কণ্ঠের অধিকারী লোক ছিলেন। হযরত নবী করীম (সাঃ) তাঁকে আসনারদের ডাকবার জন্যে নির্দেশ দিলেন। তিনি হাঁক দিলেন ঃ[১]

—"হে আনসারগণ ! হে বৃক্ষতলে শপথকারিগণ!" এ মর্মস্পর্শী শব্দ শুনতেই সমস্ত সৈন্য মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এল। প্রচণ্ড ভিড়ের দরুন যাদের ঘোড়া মোড় ঘুরতে পারল না, তারা লৌহবর্ম পরিহার করে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লেন। মুহূর্তের মধ্যে লড়াইয়ের মোড় ঘুরে গেল। কাফেররা পলায়ন করল। যারা রয়ে গেল তাদের সবাই বন্দী হল। বনূ-সক্কীফ গোত্রের শাখা গোত্র বনূ মালেক যুদ্ধে অবিচল রইল। তাদের সত্তর ব্যক্তি নিহত হল। কিন্তু তাদের সেনানায়ক ওসমান ইবনে আবদুল্লাহ্ নিহত হলে তারাও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

পরাজিত সৈন্যের কিছু অংশ আওতাসে একত্রিত হল এবং কিছু সংখ্যক তায়েফে আশ্রয় গ্রহণ করল। তায়েফের এ সৈন্যদের প্রধান সেনাপতি মালেক ইবনে আওফও বর্তমান ছিল।

আওতাসের যুদ্ধ

দরীদ ইবনে আল্ সিম্মাহ্ কয়েক সহস্র সৈন্যসহ আওতাসে উপস্থিত হল। হযরত নবী করীম (সাঃ) তাদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে আবু 'আমের আশ'আরীর নেতৃত্বে সামান্য সংখ্যক সৈন্য পাঠালেন। কিন্তু দরীদের পুত্রের হাতে আবু আমের শহীদ হল। ইসলামী বাহিনীর পতাকা দরীদ পুত্রের হাতে দেখে হযরত আবু মুসা আল-আশ'আরী এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করলেন এবং ইসলামের শত্রুকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়ে তার হাত থেকে পতাকা ছিনিয়ে নিলেন। দরীদ একটি উটের পিঠে আঁটা হাওদার মধ্যে বসে যুদ্ধে পরিচালনা করছিল। রবী'আ ইবনে রফী তার উপর তারবারি হানল। কিন্তু আঘাত ব্যর্থ হল। সে বলল, "তোমার মা তোমাকে ভাল তরবারি দেয়নি, আমার কোষে তরবারি আছে, বের করে নাও। ফিরে গিয়ে তোমার মাকে বল, আমি দরীদকে হত্যা করেছি।" যুদ্ধ শেষে রবী'আ তাঁর মায়ের নিকট গিয়ে দরীদের হত্যার কাহিনী শোনালে তাঁর মা বললেন, দরীদ তোমার তিন মাকে আযাদ করেছে।

যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা এক সহস্রেরও অধিক ছিল। এ যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে হযরত নবী করীমের (সাঃ) দুধ-বোন হযরত শীমা (রাঃ)-ও ছিলেন। সৈন্যরা যখন তাকে গ্রেফতার করে তখন তিনি বলছিলেন, "আমি তোমাদের নবীর ভগ্নী।"

---

১. সহীহ্ বোখারী, ২য় খণ্ড ৬২১ পৃষ্ঠায় হুনাইনের যুদ্ধ।

তাঁর সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে তাঁকে হযরত (সাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত করলেন। তিনি পিঠ উন্মুক্ত করে দেখালেন যে শৈশবে আপনি একবার দংশন করছিলেন, এটাই সে দাগ। হযরত নবী করীম (সাঃ)-ভগ্নীর প্রতি ভালবাসার আবেগে অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তার বসবার জন্যে নিজের গায়ের চাদর বিছিয়ে দিলেন ও তার সঙ্গে স্নেহপূর্ণ কথাবার্তা বললেন। তাকে কয়েকটি উট ও কিছু ছাগ-ছাগী উপহার দিয়ে বললেন, "যদি মন চায়, তবে আমার বাড়িতে গিয়ে থাক, আর যদি ফিরে যেতে চাও, তবে সেখানেই পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করি।" তিনি নিজের পরিবার-পরিজনের প্রতি অনুরাগ বশতঃ আপন বাড়িতে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে তাকে তার আপনজনের নিকট পৌছে দেয়া হল।

তায়েফ অবরোধ

হুনাইনের অবশিষ্ট পরাজিত সৈন্য তায়েফে গিয়ে আশ্রয়গ্রহণ করল। তারা সেখানে পুনরায় যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। তায়েফ অত্যন্ত সংরক্ষিত স্থান ছিল। তায়েফ শব্দের অর্থ, প্রাচীর বেষ্টিত স্থান। এর চারদিকে নগরপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এ জন্য একে তায়েফ বলা হয়। এখানে সক্বীফ গোত্রের লোকেরা বসবাস করত। তারা অত্যন্ত বীরযোদ্ধা এবং সমগ্র আরবে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ও কোরাইশদের সমমর্যাদাসম্পন্ন ছিল।.......ইবনে মাস'উদ এ গোত্রেরই গোত্রপ্রধান এবং আবু সুফিয়ানের জামাতা ছিলেন। মক্কার কাফেররা বলত, কোরআন যদি নাযিলই হত, তাহলে মক্কা ও তায়েফের নেতাদের (রইসদের) উপরই নাযিল হত। এখানকার বাসিন্দারা যুদ্ধবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিল। ঐতিহাসিক তাবারী এবং ইবনে ইসহাক লিখেছেন যে উরওয়া ইবনে মাউ'দ ও গাইলান ইবনে সালমা ইয়ামেনের অন্তর্গত জরশ নামক একটি জনপদে গিয়ে দাব্বাবা, দব্বুর এবং মানজানিক প্রভৃতি কেল্লা বিধ্বংসী যন্ত্রপাতি প্রস্তুতপ্রণালী ও তার ব্যবহারবিধি আয়ত্ত করে এসেছিলেন।

এখানে একটি সংরক্ষিত দুর্গ ছিল। শহরবাসী এবং হুনাইনের যুদ্ধে পরাজিত-পলাতক সৈন্যরা সেটি মেরামত করে নেয়। সারা বৎসরের রসদ ও যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগ্রহ করল। দুর্গের চারদিকে মানজানিক ও অন্যান্য মরণাস্ত্রসহ প্রচুর সৈন্য মোতায়েন করল।

হযরত (সাঃ) হুনাইনের যুদ্ধের গনীমতের মাল ও যুদ্ধবন্দীদের জে'রানা নামক স্থানে সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়ে স্বয়ং তায়েফ অভিযানের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। হযরত খালেদ (রাঃ)-কে অগ্রবর্তী বাহিনীর সেনানায়ক করে পাঠালেন। দুর্গ অবরোধ করা হল। ইসলামের ইতিহাসে এ প্রথমবারের মত কেল্লাবিধ্বংসী

যন্ত্র অর্থাৎ, বাবা ও মানজানিক ব্যবহৃত হল। দুর্গ থেকে দুবাবার উপর গরম লোহার শেল বর্ষিত হল এবং এমন তীব্রভাবে তীর বর্ষিত হতে লাগল যে আক্রমণকারীরা পিছু হটতে বাধ্য হল। বহু লোক আহত হল। বিশ দিন যাবৎ অবরোধ অব্যাহত রইল। কিন্তু নগরদুর্গ অধিকার করা গেল না। হযরত নবী করীম (সাঃ) নওফেল ইবনে মুআবিয়াকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের অভিমত কি? উত্তরে তিনি বললেন, "শেয়াল গর্তে ঢুকে পড়েছে যদি চেষ্টা চালান হয়, তবে নিশ্চয়ই ধরা যাবে, কিন্তু যদি ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলেও বিশেষ ক্ষতির কারণ নেই।"

যেহেতু, এ যুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাদের আক্রমণ প্রতিহত করা, তাই অবরোধ তুলে নেয়া হল। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, আপনি তাদের বদদো'আ দিন। হযরত (সাঃ) দো'আ করলেন ঃ

—"আয় আল্লাহ! তুমি সকীফ গোত্রের লোকদেরকে হেদায়েত কর এবং তাদের আমার কাছে আসার তৌফিক দান কর।"

গনীমত বণ্টন

অবরোধ ত্যাগ করে হযরত (সাঃ) জে'য়েররানায় প্রত্যাবর্তন করলেন। প্রচুর গনীমত স্তূপীকৃত হল। তাতে ছয় হাজার যুদ্ধবন্দী, চব্বিশ হাজার উট, চল্লিশ হাজার ছাগ-ছাগী এবং চার হাজার উকিয়া চান্দি ছিল। যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে হযরত (সাঃ) অপেক্ষা করলেন। উদ্দেশ্য, তাদের আত্মীয়স্বজন এলে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা। কিন্তু কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও তাদের কেউ এল না। গনীমতের মাল পাঁচভাগে বিভক্ত করা হল। চারভাগ সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করা হল। বাকি এক-পঞ্চমাংশ বাইতুল মালের তহবিল এবং গরীব-মিছকিনের জন্য রাখা হল।

মক্কার অধিকাংশ নেতা-উপনেতা অতি সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তখন পর্যন্ত তাদের ঈমান-আকীদা ছিল দোদুল্যমান। কোর'আন মজীদে এ ধরনের মুসলমানদের 'মুয়াল্লেফাতুল কুলুব' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে যাকাৎ গ্রহীতাদের ফিরিস্তি দেয়া হয়েছে, সেখানে তাদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত নবী করীম (সাঃ) তাদের মুক্তহস্তে দান করলেন। অপর পৃষ্ঠায় তাদের প্রদত্ত সম্পদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেয়া হল ঃ

আবু সুফিয়ান ও তাঁর পুত্রগণ	৩০০	উট ও ১২০ উকিয়া চান্দি
হাকীম ইবনে হেযাম	২০০	উট
নযীর ইবনে হারেস কলদা সকফী	১০০	"
সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা।	১০০	"
কায়স ইবনে আদী	১০০	"
সুহাইল ইবনে আমর	১০০	"
হুয়াইতাব ইবনে আবদুল উয্যা	১০০	"
আকরা ইবনে হাবেস	১০০	"
উয়াইনা ইবনে হাসীন	১০০	"
মালিক ইবনে 'আওফ'	১০০	"

এতদ্ব্যতীত আরও অনেকেই পঞ্চাশটি করে উট প্রদান করেছিলেন। সাধারণ বণ্টনের ভিত্তিতে প্রত্যেক সৈন্য চারটি করে উট ও চল্লিশটি করে ছাগ-ছাগী পেয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু অশ্বারোহী সৈন্যদের প্রাপ্য তিন গুণ, সেহেতু তাঁদের প্রত্যেকের অংশে ১২টি করে উট ও ১২০টি করে ছাগ-ছাগী পড়ল।

যাঁদের উপর উপঢৌকনের বন্যা বয়ে গেল তাঁরা অধিকাংশই মক্কাবাসী নওমুসলিম ছিলেন। এতে মদীনাবাসী আনসারগণ মনঃক্ষুণ্ন হল। কেউ কেউ বলেই ফেললেন, "রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোরাইশদের উপঢৌকন দিলেন আর আমাদের বঞ্চিত করলেন; অথচ এখনো পর্যন্ত আমাদের তরবারি থেকে কোরাইশদের রক্ত ঝরছে!" কেউ কেউ বললেন,"বিপদের সময় আমাদের কথা স্মরণ হয়,গনীমত পাওয়ার সময় পায় অন্যেরা।"[১]

হযরতের কানে এ সমস্ত আলোচনা-সমালোচনা পৌছালে তিনি আনসারদের ডেকে পাঠালেন। এক চর্মনির্মিত তাঁবু স্থাপন করা হল। তার মধ্যে সমস্ত লোক সমবেত হল। হযরত নবী করীম (সাঃ) আনসারদের বললেন, তোমরা কি এমন কথা বলেছ? তাঁর উত্তরে বললেন, হুযুর (সাঃ)! আমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল কেউ এমন মন্তব্য করেননি। আমাদের মধ্যেকার অল্পবয়স্ক তরুণ-যুবকেরা এসব কথা বলেছে।[২] সহীহ্ বোখারী গ্রন্থে 'মানাকেবে আন্‌ছার' (আনসারদের মাহাত্ম্য আলোচনা) অধ্যায়ে হযরত আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে যখন হযরত নবী করীম (সাঃ) আনসারদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তখন যেহেতু আনসারগণ মিথ্যা বলেননি, তাই বললেন, "আপনি যা-ই শুনেছেন তা সত্য।"

১. সহীহ্ বোখারী, নেযামী প্রকাশনা হইতে প্রকাশিত গ্রন্থে ৬২১ পৃঃ।
২. সহীহ্ বোখারী, ৬২০ পৃষ্ঠা।

অতঃপর হযরত (সাঃ) এক ভাষণ দান করলেন, যার দৃষ্টান্ত অলঙ্কারশাস্ত্রে দুর্লভ। তিনি আনসারদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, —"এটা কি সত্য নয় যে তোমরা প্রথমে গোমরাহ্ ছিলে, আল্লাহ্ আমার মাধ্যমে তোমাদের হেদায়েত করেছেন? তোমরা বিক্ষিপ্ত ও দুরবস্থার মধ্যে ছিলে, আল্লাহ্ আমার মাধ্যমে তোমাদের ঐক্যবদ্ধ করেছেন; তোমরা নিঃস্ব ও দরিদ্র ছিলে; আল্লাহ্ আমার মাধ্যমে তোমাদের অর্থশালী করেছেন?"

হযরত (সাঃ) এমনিভাবে বলে যাচ্ছিলেন আর আনসারগণ বলছিলেন, "আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের এহ্সান সবার উপরে।"

হযরত (সাঃ)—"না, তোমরা এ উত্তর দাও যে হে মোহাম্মদ (সাঃ), যখন লোকেরা তোমার দ্বীন অস্বীকার করেছে, তখন আমরা তোমার দ্বীন সত্য বলে কবুল করেছি, তোমাকে যখন লোকেরা পরিত্যাগ করেছে, তখন আমরা আশ্রয় প্রদান করেছি, তুমি যখন নিঃস্ব অবস্থায় এসেছিলে, আমরা তোমাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেছি। তোমরা একথা বলতে থাক আর আমি জওয়াব দিতে থাকি, তোমরা সত্যই বলছ। কিন্তু হে আনসারগণ! তোমরা কি পছন্দ করা না যে মানুষ উট-বকরী নিয়ে বাড়ি ফিরুক, আর তোমরা মোহাম্মদ (সাঃ)-কে নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন কর?"

আনসারগণ সমস্বরে বলে উঠলেন, আমাদের কেবলমাত্র মোহাম্মদ (সাঃ)-কে প্রয়োজন। তাঁদের অবস্থা তখন এমন হয়েছিল যে অধিকাংশ লোকই কাঁদতে কাঁদতে দাড়ি ভিজিয়ে ফেলেছিলেন। হযরত (সাঃ) আনসারদের বোঝালেন, "মক্কার লোকেরা নও-মুসলিম। আমি তাদের যা কিছু দিয়েছি প্রাপ্য হিসাবে দেইনি—তাদের মনোরঞ্জনের জন্য দিয়েছি মাত্র।"

হুনাইনের যুদ্ধবন্দীরা তখন পর্যন্তও জে'য়েররানায় অবরুদ্ধ ছিল। এক সম্মানিত প্রতিনিধিদল হযরত (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদানের আবেদন জানালেন। হযরত (সাঃ)-এর দুধ-মাতা হালীমা (রাঃ) এ গোত্রভুক্ত ছিলেন। প্রতিনিধিদলের নেতা যুহাইর ইবনে সা'দ দাঁড়িয়ে ভাষণ দান করলেন। তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বললেন, "যারা ছাপ্পড়ের মধ্যে অবরুদ্ধ তাদের মধ্যে তোমার ফুফু ও খালারা রয়েছে। খোদার কসম, যদি আরবের সুলতানদের মধ্য থেকে কেউ আমাদের বংশের কারও দুধপান করতেন, তাহলে তাঁর কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু আশা-ভরসা থাকত। আর তোমার কাছ থেকে আমরা আরও অধিক আশা রাখি।" হযরত (সাঃ) বললেন, "আবদুল মোত্তালেবের বংশধরদের যেটুকু প্রাপ্য ছিল তা তোমাদের দেয়া হয়েছে। কিন্তু সমস্ত যুদ্ধবন্দীর মুক্তির জন্য জোহরের নামাযের পর সমবেত সমস্ত মুসলমানদের নিকট আবেদন কর। জোহরের নামায শেষে প্রতিনিধিদল সম্মিলিত

মুসলমানদের নিকট আবেদন জানালেন। হযরত (সাঃ) বললেন, "আমি কেবল আমার খান্দানের লোকদের উপর অধিকার রাখি। কিন্তু আমি সমস্ত মুসলমানদের নিকট তাদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করছি।" মোহাজের ও আনসারগণ সমস্বরে বলে উঠলেন, আমাদের অধিকারও আপনার উপর অর্পিত হল। এমনিভাবে একযোগে ছয় হাজার যুদ্ধবন্দী মুক্ত হল।

বিবিধ ঘটনা

এ বৎসরেই হযরত মারিয়া (রাঃ)-এর গর্ভে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। হযরত (সাঃ) তার নাম রাখেন ইব্রাহীম। হযরত এ শিশুকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এ শিশু সতের কি আঠার মাস জীবিত ছিল। যেদিন তার মৃত্যু হয় সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। আরবদের বিশ্বাস ছিল যে সূর্যগ্রহণ কোন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির মৃত্যুর লক্ষণ। তারা ধারণা করল, এ সূর্যগ্রহণ ইব্রাহীমের মৃত্যুর কারণেই সংঘটিত হয়েছে। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) জনগণকে সমবেত করে ভাষণ দান করলেন, "সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ আল্লাহর কুদরত স্বরূপ। কারও মৃত্যুর ফলে তাতে গ্রহণ লাগে না।" পর জামাতের সঙ্গে সূর্যগ্রহণের নামায (সালাতুল কসূফ) আদায় করলেন। হযরত (সাঃ)-এর কন্যা যয়নব (রাঃ)-ও এ বৎসরেই ইন্তেকাল করেন।

ঈলা, শেষ প্রস্তাব ও তবুকের যুদ্ধ[১]

হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিতান্ত জাঁকজমকহীন জীবনযাপন করতেন। কোন কোন সময় একাধারে দু'মাস যাবৎ তাঁর চুলায় আগুন জ্বলত না। দিনের পর দিন উপোস করে কাটাত। জীবনে কোন সময় পর পর দু ওয়াক্ত পেট পুরে আহার তাঁর ভাগ্যে জোটেনি।

নবী-জায়াগণের মধ্যেও অন্যান্য মানুষের ন্যায় মানুষ হিসাবে প্রবৃত্তি বিদ্যমান ছিল। সেহেতু তাঁদের অন্তরেও জাঁকজমক ও জৌলুসপূর্ণ জীবনযাপনের স্পৃহা জাগত। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহচর্যে যদিও তাদের এ মনোবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কোন মানুষের মানবিক দুর্বলতা

---

১. কিছু সংখ্যক মুহাদ্দেসের অভিমত এই যে এ ঘটনা পঞ্চম হিজরীর জিলহজ্জ মাসে সংঘটিত হয়। এ সন্দেহের কারণ এই যে কোন কোন রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে যে এটি পর্দার আয়াত নাযিলের পূর্বের ঘটনা। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে যে যখন এ ঘটনার অস্পষ্টতা মুসলমানদের মনে অশান্তির সৃষ্টি করে, তখন বুঝা গেল যে গাস্সানের বাদশাহ আক্রমণোদ্যত। গাস্সানের আক্রমণ ৯ম হিজরীতে সংঘটিত হয়। হাফেয ইবনে হাজার ও মোহাদ্দেস দেময়াতী প্রমাণাদিসহ স্থির করেছেন যে এটি নবম হিজরীর প্রথম দিকের ঘটনা। (ফতহুল বারী, নবম খণ্ড, ২৫০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষত এমন সময় যখন তাঁরা দেখতে পান যে উপর্যুপরি ইসলামের বিজয় সাধিত হচ্ছে এবং এত প্রচুর গনীমতের মাল সংগৃহীত হয়েছে তার সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র একটি অংশও তাঁদের আরাম-আয়েশের জন্য যথেষ্ট। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁদের ধৈর্য ও সহ্যের বাঁধ ভেঙে পড়া অস্বাভাবিক ছিল না।

নবীজায়াদের সবাই ছিল অভিজাত পরিবারের কন্যা। হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) ছিলেন কোরাইশ গোত্রপ্রধান আবু সুফিয়ানের কন্যা। হযরত জুয়াইরিয়া (রাঃ) ছিলেন বনী মুসতালিক গোত্রপ্রধানের কন্যা। হযরত সাফিয়ার পিতা ছিলেন খয়বরের গোত্রপ্রধান। হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন আবু বকর (রাঃ)-এর কন্যা। আর হযরত হাফসা (রাঃ) ছিলেন ওমরের কন্যা। মানবিক দুর্বলতা হেতু তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কিছুটা মনোবিবাদ বিদ্যমান থাকত এবং আপন প্রতিপক্ষ অপেক্ষা নিজের সান্-শওকত ও মর্যাদা রক্ষার প্রতি লক্ষ্য থাকত। তাঁরা প্রত্যেকেই হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে গভীরভাবে ভালবাসতেন।

একবার কয়েকদিন যাবত হযরত (সাঃ) যয়নব (রাঃ)-এর কাছে তাঁর সাধারণ অভ্যাসের ব্যতিক্রম কিছু অধিক সময় অবস্থান করলেন। কারণ এই ছিল যে. হযরত যয়নব (রাঃ)-এর নিকট কেউ মধু সরবরাহ করেছিল। তিনি হযরত (সাঃ)-এর সামনে তা পরিবেশন করেন। নবী করীম (সাঃ) মধু অত্যন্ত পছন্দ করতেন। তিনি তা পান করলেন। এতে করে নির্ধারিত সময় অপেক্ষা কিছু বেশি সময় সেখানে কেটে গেল। হযরত আয়েশা (রাঃ) এতে ঈর্ষান্বিত হল। তিনি হাফসা (রাঃ)-কে বললেন, 'রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন আমার বা আপনার ঘরে উপস্থিত হন আমরা বলব, "আপনার মুখ থেকে মাগাফীরের গন্ধ আসছে।" মাগাফীর ফুল থেকে মৌমাছি রস সংগ্রহ করে। হযরত (সাঃ) কসম খেয়ে ফেললেন যে তিনি আর মধু পান করবেন না। এরই প্রেক্ষিতে কোরআন মজীদের আয়াত অবতীর্ণ হল—

—"হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদের খুশী করবার জন্যে আল্লাহ্ কর্তৃক হালালকৃত বস্তুকে নিজের জন্যে কেন হারাম করে নিচ্ছেন?"

বিশ্বখ্যাত হাদীস ব্যাখ্যাতা 'আল্লামা বদরউদ্দীন 'আইনী (রহঃ) লিখেছেন।

—"যদি কেউ বলে যে আয়েশা (রাঃ) ও হাফসা (রাঃ)-এর পক্ষে মিথ্যা বলা এবং হযরত (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকান কিভাবে সম্ভব হল? তার জওয়াব এই যে হযরত আয়েশা (রাঃ) অল্পবয়স্কা বালিকা ছিলেন; হযরত (সাঃ)-কে কষ্ট দেয়া তাঁর ইচ্ছা ছিল না, স্ত্রীলোকেরা সতীনের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে যে বাহানা করে এটাও তেমনি নারীসুলভ আচরণ ছিল।"

কিন্তু আল্লামা বদরউদ্দীন আইনী (রহঃ)-এর উপরোক্ত জওয়াব মেনে নেয়া মুশকিল। কারণ, প্রথমত এ ঘটনা ঈলার ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ঈলা সংঘটিত হয় হিজরী নবম সনে। ঐ সময় হযরত আয়েশার (রাঃ) বয়স ছিল ১৭ বছর। দ্বিতীয়ত, হযরত আয়েশ (রাঃ) অল্পবয়স্কা হলেও অন্যান্য নবীজায়াগণ, যাঁরা এ কৌতুকে অংশগ্রহণ করেন তাঁরা তো সবাই পূর্ণবয়স্কা ছিলেন। খোদ হাফসা (রাঃ)-এর বয়স হযরত (সাঃ)-এর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হবার সময়ই ৩৫ বছর ছিল।

আমাদের অভিমত এই যে মাগাফীরের গন্ধের কথা মিথ্যা ছিল না। সমস্ত রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে হযরত (সাঃ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অত্যধিক পছন্দ করতেন এবং রুচিবিবর্জিত সামান্যমত দুর্গন্ধও সহ্য করতে পারতেন না। মাগাফীর ফুলে কোনরূপ দুর্গন্ধ থাকা আশ্চর্যের কিছুই নয়। নবীজায়াগণ (রাঃ) কর্তৃক এরূপ ছলনামূলক কর্ম অবশ্যই আপত্তিকর। কিন্তু নবী পত্নীগণ যে নিষ্পাপ ছিলেন না, তা সর্ববাদীসম্মত। তাঁরা তাঁদের কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কোন জায়েয পন্থা অবলম্বন করতেন না, এ অভিমতও কেউ পোষণ করেন না।

এ সময়েই হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)-কে একটি গোপন কথা বলে অন্যের কাছে তা বলতে বারণ করেন। কিন্তু তিনি তা আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে প্রকাশ করে দেন। এমর্মে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

—"যখন নবী করীম (সাঃ) নিজের কোন পত্নীর কাছে গোপন একটি কথা বললেন, তৎপর যখন সে তা তাঁর অপর এক পত্নীর কাছে বলে দিল, আর আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে নবী করীম (সাঃ)-কে তা জানিয়ে দিলেন এবং কিছু কথা এড়িয়ে গেলেন। অতঃপর যখন তিনি সে স্ত্রীকে তা জানালেন, তখন সে বলল, কে আপনাকে একথা জানাল, তিনি বললেন, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে ওয়াকিফহাল, তিনিই আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন।" (তাহরীম)

তিক্ততা বৃদ্ধি পেতে থাকল। হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসা (রাঃ) পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হল। অর্থাৎ, উভয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এ ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এমর্মে আয়েশা (রাঃ) ও হাফসা (রাঃ) সম্পর্কে আয়াত নাযিল হল ঃ

—"হে নবীর স্ত্রীদ্বয়! যদি তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর, তবে (উত্তম কেননা,) তোমাদের অন্তর আকৃষ্ট হচ্ছে, আর যদি তোমরা রসূলের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা চালাতে থাক, তবে আল্লাহ, জিব্রীল এবং নেক মুসলমানগণ রসূলের সহায় আছেন, আর এতদ্ভিন্ন ফেরেশতাগণ তাঁর সাহায্যকারী রয়েছে।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হাফসা (রাঃ) যে সমস্ত ব্যাপারে জোটবদ্ধ হয়েছিলেন, তা তাঁদের মধ্যেই সীমিত ছিল। কিন্তু তাঁদের নফ্‌কা (খোরপোষ ভাতা) বাড়িয়ে দেবার দাবিতে সকল নবীপত্নীই সম্মিলিতভাবে শরীক ছিলেন।

হযরত (সাঃ)-এর শান্তিপ্রিয় মনে বিরক্তিকর এ দাবি বিশেষ রেখাপাত করল। তিনি কসম করলেন যে এক মাসকাল তিনি স্ত্রীগণের সঙ্গে মিলিত হবেন না। ঘটনাচক্রে সে সময়ই ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে হযরতের পায়ের নালায় যখম হয়। তাতে তিনি নির্জনবাস শুরু করলেন। ঘটনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে সাহাবিগণ মনে করলেন, হযরত রসলূল্লাহ (সাঃ) সম্ভবত সকল স্ত্রীকেই তালাক দিয়েছেন। অতঃপর যে সমস্ত ঘটনার অবতারণা হয়, তা আমরা হযরত ওমর (রাঃ)-এর ভাষায় বর্ণনা করব। তিনি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ঘটনা বিবৃত করেছেন। এ বর্ণনা প্রসঙ্গে কিছু আনুষঙ্গিক প্রাথমিক ঘটনাও এসে গেছে, যদ্দ্বারা আসল ব্যাপারটি আরও সুন্দরভাবে প্রতিভাত হয়।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, "আমি এবং আমার এক আনসার প্রতিবেশী (আওস ইবনে খাওলা অথবা মালেক) পালাক্রমে একদিন পর একদিন হযরতের (সাঃ) খেদমতে উপস্থিত হতাম। কোরাইশ সম্প্রদায়ের লোকেরা স্ত্রীলোকদের উপর প্রাধান্য রাখত এবং তাদের নিজেদের অধীন ও বশীভূত করে রাখত। কিন্তু তারা মদীনায় এসে দেখল, এখানকার আনসার মহিলারা পুরুষদের উপর প্রাধান্য করে। দেখাদেখি আমাদের স্ত্রীগণও তাদের অনুসরণ করতে শুরু করল। একদিন কোন কথা প্রসঙ্গে আমি আমার স্ত্রীকে ধমক দিল সে আমার কথার জওয়াবে কথা শুনিয়ে দিল। আমি বললাম, "তুমি আমার কথার প্রতি-উত্তর করছ?" সে বলল, "তুমি আর কোন্ মহারথী, স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্ত্রীগণ তাঁর কথার সমুত্তর দেন, এমন কি দিনভর তাঁর প্রতি রুষ্ট থাকেন!" আমি মনে মনে বললাম, "সর্বনাশ হয়েছে! তৎক্ষণাৎ উঠে হাফ্‌সা (রাঃ)-এর (হযরত ওমরের কন্যা ও রসূলুল্লাহর স্ত্রী) নিকট গেলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কি হযরত (সাঃ)-এর প্রতি রুষ্ট থাক?" হাফসা (রাঃ) স্বীকার করল। আমি তাকে বললাম, "তুমি কি জাননা যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অসন্তুষ্ট করার অর্থ আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করা। খোদার কসম! রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার প্রতি খেয়াল করেই তোমাকে কিছু বলেন না, নতুবা তোমাকে তালাক দিয়ে দিতেন"। অতঃপর আমি উম্মে সালমার কাছে গিয়ে একই বিষয়ের অবতারণা করলাম। উম্মে সালমা বললেন, "ওমর! তুমি সব ব্যাপারেই মাথা গলানো শুরু করছ; এমন কি, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যকার ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করছ।" আমি নিশ্চুপ হয়ে গেলাম এবং উঠে চলে এলাম।

বেশ খানিক রাত হয়েছে। আমার প্রতিবেশী আনসারী বাইরে থেকে ফিরে এল এবং অত্যন্ত জোরে দরজায় ধাক্কা দিল। আমি ব্যস্তসমস্তভাবে দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলাম,—"ভাল তো?" সে বলল,—"সর্বনাশ হয়েছে!" আমি বললাম, "গাস্‌সানীরা[১] মদীনা আক্রমণ করেছে?" সে বলল,—"তা অপেক্ষাও গুরুতর দুঃসংবাদ অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্ভবত তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন।"

আমি ভোরে মদীনায় পৌঁছে হযরত (সাঃ)-এর সঙ্গে ফজরের নামায আদায় করলাম। হযরত (সাঃ) ফজরের নামায শেষে নিজঘরে একাকী বসে রইলেন। আমি মসজিদেই বসে রইলাম, কিন্তু মনে শান্তি পাচ্ছিলাম না। উঠে ঘরের কাছে গেলাম। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত খাদেম রেবাহ্‌কে বললাম, "হযরত (সাঃ)-এর কাছে খবর বল!" কিন্তু হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন উত্তর দিলেন না। আমি পুনরায় মসজিদে চলে এলাম। আবার কিছুক্ষণ পর অধৈর্য হয়ে ঘরের নিচে গিয়ে দারওয়ানের নিকট পুনরায় অনুমতি প্রার্থনার অনুরোধ করলাম। যখন কোন জওয়াবই এল না, তখন আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, "রেবাহ্ আমার জন্য অনুমতি চাও! রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মনে করতে পারেন যে আমি হয়তো হাফসার জন্যে সুপারিশ করতে এসেছি। আল্লাহ্‌র কসম! রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যদি বলেন, তাহলে আমি হাফসার মস্তক উড়িয়ে দেব।" হযরত নবী করীম (সাঃ) অনুমতি দিলেন। আমি অন্দরে প্রবেশ করে দেখলাম, হযরত খালি খাটের উপর শুয়ে আছেন[২] আর তাঁর পবিত্র দেহে দড়ির দাগ পড়ে গেছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলাম,এক পাশে সামান্য যব রক্ষিত আছে এবং একটি খুঁটির উপরে একটা পশুর চামরা ঝুলান আছে। আমি অঝোর নয়নে কেঁদে ফেললাম। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমি আরয করলাম, "এটা ছাড়া আর কাঁদবার কারণ কি থাকতে পারে যে রোম সম্রাট (কাইসার) ও পারস্য সম্রাট (কিস্‌রা) পৃথিবীর প্রাচুর্য ভোগ করছে আর নবী হয়ে আপনার এ অবস্থা!" হযরত (সাঃ) বললেন, "তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে রোম ও পারস্য সম্রাট পৃথিবীর প্রাণপ্রাচুর্য ভোগ করুক আর আমি পরকালের ক্ষয়-লয়হীন অনাবিল শান্তি লাভ করি?"

১. গাস্‌সান আরবের এক বংশের নাম। তারা সিরিয়ার রোমানদের অধীনে বাদশাহী করত। তারা রোমানদের প্ররোচণায় মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

২. কোন কোন রেওয়ায়েতে 'হাসীর'(চাটাই) এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে 'সারীয়াহ্'র (খাটের) উল্লেখ আছে।হাফেয ইবনে হাজার আস্‌কালানী বৈপরীত্য খণ্ডন করে বলেছেন, সেটি খাটই ছিল, কিন্তু যদ্দারা চাটাই প্রস্তুত হয়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি আপনার পত্নীদেরকে তালাক দিয়ে ফেলেছেন?" হযরত (সাঃ) বললেন, "না।" আমি আল্লাহু আকবর বলে চিৎকার করে উঠলাম। অতঃপর আরয করলাম, "মসজিদে সকল সাহাবী চিন্তান্বিত হয়ে বসে আছেন। যদি অনুমতি দেন,তবে এ সংবাদটি তাদের পৌঁছে দেই যে ব্যাপার সত্য নয়!" যেহেতু কসমের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ, এক মাস অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল, তাই তিনি ঘর থেকে নেমে আসলেন[১] এবং সাধারণ সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিলেন। এরপর তাখায়্যুর বা শেষ প্রস্তাব সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ "হে নবী! আপনি আপনার পত্নীদের বলে দিন, যদি তোমরা পার্থিব জিন্দেগী ও এর জৌলুস কামনা কর, তবে এস তোমাদেরকে বিদায়ী পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়ে উৎকৃষ্ট ও মার্জিতভাবে বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং আখেরাত কামনা কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য থেকে সৎকর্মশীলদের জন্য বিরাট সওয়াবের (পুরস্কারের) ব্যবস্থা করে রেখেছেন।"— (আহযাব)

উপরোক্ত আয়াতে রসূলুল্লাহ্কে (সাঃ) নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে তিনি যেন তাঁর পত্নীগণকে জানিয়ে দেন যে "তোমাদের সম্মুখে দুটি বস্তু রয়েছে। দুনিয়া ও আখেরাত।" যদি তোমরা দুনিয়া চাও, তবে এসো আমি তোমাদের বিদায়ী পোশাক দিয়ে ইজ্জত-আব্রুর সঙ্গে বিদায় করে দিই। আর যদি আল্লাহ, রসূল ও পরকালের চিরস্থায়ী সুখ-সমৃদ্ধিময় জীবন কামনা কর, তবে আল্লাহ্ পুণ্যশীলদের জন্য মহাপুরস্কারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।"

পূর্ণ এক মাস অতিবাহিত হলে হযরত নবী করীম (সাঃ) ঘর থেকে বের হল। যেহেতু সব ব্যাপারেই হযরত আয়েশা (রাঃ) অগ্রণী ছিলেন, তাই হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বপ্রথম তাঁর নিকট গিয়ে শেষ প্রস্তাব শোনালেন। তিনি উত্তর করলেন, "আমি সবকিছুর বিনিময়ে আল্লাহ্ ও রসূল (সাঃ)-কে গ্রহণ করলাম।" অন্যান্য বিবিগণও একই জবাব দিলেন।

১. হযরত (সাঃ) ২৯ দিন নির্জন ঘরে অবস্থান করেছিলেন। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। হযরত ওমর (রাঃ)-এর এ কথোপকথন প্রথম দিনের, না শেষ দিনের, তা নিয়ে মতভেদ আছে। এ রেওয়ায়েত যত মাধ্যমেই বর্ণিত হয়েছে সব ক্ষেত্রেই তার প্রথম অংশ দ্বারা প্রতীয়মান-হয় যে— ঘটনা প্রথম দিনের এবং শেষের কথাগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এটা ২৯তম দিনের ঘটনা। গ্রন্থকার মহোদয় শেষের অংশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং বাহ্যতঃ তাকে ২৯তম দিনের ঘটনা মনে করেছেন। কিন্তু এ পরিপ্রেক্ষিতে একথা মেনে নিতে হয় যে ২৮ দিন ধরে হযরত ওমর ও সাহাবায়ে কেরাম ঈলার ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন। অথচ এটা কেউ সমর্থন করতে পারে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে মোহাদ্দিসগণ বর্ণনার সমন্বয় সাধন করে বলেছেন, আলোচ্য রেওয়ায়েতের কথোপকথনের বেশির ভাগই প্রথম দিনের, কেবলমাত্র হযরত (সাঃ)-এর নির্জন ঘর থেকে নেমে আসার ঘটনাটি শেষ দিনের। রাবী মধ্যবর্তী সময়ের আলোচনা করেছেন। বোখারী শরীফে কিতাবুন নিকাহ্ বাবু 'মাওইযাতুররাজুলে ইবনাতাহু লিহালি-যাওজিহা" শিরোনাম এবং কিতাবুল লিবাস অধ্যায়ে এ ঘটনা প্রসঙ্গে পরিষ্কার বর্ণনা রয়েছে। এ জন্য এ অংশ এভাবে পড়া দরকার যে যখন ঈলার মেয়াদ অর্থাৎ ১ মাস অতিবাহিত হল।

ঈলা, তাখায়্যুর (শেষ প্রস্তাব) ও হযরত হাফসা (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক হযরত (সাঃ)-এর গোপন বিষয় ফাঁস করা— এ তিনটি ঘটনা এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যাতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এগুলো বিভিন্ন সময়ের ঘটনা। এর দ্বারা প্রত্যক্ষদর্শীরা ধোঁকায় পড়তে পারে যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্ত্রীগণের সঙ্গে সর্বদাই রুক্ষ ব্যবহার করতেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে এ তিনটি ঘটনাই এক সময়ে সংঘটিত ও এক সূত্রে গাঁথা। সহীহ্ বোখারী গ্রন্থে 'কিতাবুন নেকাহ্' 'বাবু মাওইযাতুর রাজুলে ইবআনাতাহু' শিরোনামে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। সেখানে পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত আছে যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর গোপন কথা ফাঁস, নির্জনবাস ও শেষ প্রস্তাবের আয়াত একই প্রসঙ্গের এক সময়কার ঘটনা।

হাফেয ইবনে হাজার 'আসআকালানী (রহঃ) হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নির্জনবাসের কতিপয় কারণ বর্ণনা করার পর লিখেছেন,—

"—হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নির্মল চরিত্র, আর মন ও ক্ষমাসুন্দর মানসিকতার এটাই স্বাভাবিক গতি যে তিনি তাঁর পত্নীগণ কর্তৃক বার বার এ ধরনের আচরণ প্রকাশ না করা পর্যন্ত এ (নির্জন বাসের) ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি।"

হযরত রসূলুল্লাহ্র (সাঃ)-এর রহস্য প্রসঙ্গে যে আয়াত নাযিল হয়েছে বাহ্যতঃ তার দ্বারা বোঝা যায় যে সেটি কোন বড় রকমের ষড়যন্ত্র ছিল, যার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ্ ছিল। আলোচ্য আয়াত নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

—"আর যদি তোমরা উভয়েই রসূলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাক, তবে আল্লাহ্ ও জিবরাঈল এবং নেক মুসলনমানগণ রসূলের সহায়, আর তাছাড়া ফেরেশতাগণ তাঁর সাহায্যকারী।"

উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে যদি তাঁদের উভয়ের ঐক্যজোট ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকত, তবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাহায্যার্থে আল্লাহ্, জিব্রীল (আঃ) ও নেক মুসলমানগণ বর্তমান রয়েছেন। শুধু তাই শেষ নয়, বরং ফেরেশতাগণও সাহায্যার্থে প্রস্তুত।

রেওয়ায়েতসমূহ্ দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর গোপন কথা প্রকাশ ও উভয়ের ঐক্য প্রচেষ্টা সম্পর্কে যে কারণ জানা যায়, তা এই যে এ প্রচেষ্টার দ্বারা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল খোরপোশ ভাতা বাড়িয়ে নেয়া। আর যদি মারিয়া কিবৃতিয়ার রেওয়ায়েত মেনে নেয়া হয়, তাহলে উদ্দেশ্য ছিল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট থেকে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানো। কিন্তু এটা এমন কি, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়? আর হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হাফসা (রাঃ)-এর ষড়যন্ত্র এমন কি ভয়াবহ্ আকার ধারণ করতে পারে, যা প্রতিরোধের জন্য উর্ধ্বাকাশের সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে!

এ পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই অনুমান করেছেন যে এ প্রচেষ্টা কোন সাধারণ ব্যাপার ছিল না। মদীনা মনওয়ারায় মুনাফেকদের বিরাট একদল বাস করত। তাদের সংখ্যা চার শ' পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়। এ দুরাত্মারা যে কোন উপায়ে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরিবার এবং বিশিষ্ট বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সচেষ্ট থাকত। হাফেয ইবনে হাজার 'আস্‌কালানী' এসাবা নামক গ্রন্থে উম্মে জালদাহ্ নামক মহিলার পরিচিতি পর্বে লিখেছেন।

—"সে নবীপত্নীদের পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করত।" আয়েশা'(রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনার ('ঈফ্‌ক') ব্যাপারে তাদের মিথ্যা প্রচারণার আংশিক সফলতা দৃষ্ট হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি পনেরো দিন যাবৎ মনক্ষুণ্ন ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সভাকবি হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবেত এ অপবাদ প্রচারে জড়িয়ে পড়েন, হযরত (সাঃ)-এর শ্যালিকা (হযরত যয়নাব (রাঃ)-এর ভগ্নী) হাম্‌নাহ্ (রাঃ) এ চক্রান্তে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি এ অপবাদের কথা প্রকাশ্যে প্রচার করতেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাঁর এক নিকটাত্মীয় মেসতাহ্ (রাঃ)-এর আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেন। মোদ্দা কথা, যদি আয়েশা (রাঃ)-এর পবিত্রতা বর্ণনা করে ওহী নাযিল না হত, তাহলে এক মহাগোলযোগের সৃষ্টি হত।

জানা যায় যে যখন মুনাফেকরা নবীজায়াদের দুঃখ, অসন্তোষ ও ভাতা বৃদ্ধির দাবির কথা জানতে পারল, তখন তারা এ ছলনায় অন্যদেরকেও উত্তেজিত করতে চাইল। যেহেতু এ আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন হযরত আয়েশা ও হাফসা (রাঃ)। তাই, তাঁরা হয়তো মনে করেছিল যে এতদুভয়ের দ্বারা তাঁদের পিতৃদ্বয় আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-কে এ ষড়যন্ত্রে শরীক করে নেয়া সম্ভব হবে। কিন্তু তারা জানত না যে আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) আয়েশা (রাঃ) ও হাফসা (রাঃ)-কে হযরত (সাঃ)-এর পবিত্র চরণের ধূলিকণার পরিবর্তে উৎসর্গ করতে পারতেন। তাই হযরত ওমর (রাঃ) যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাক্ষাতের অনুমতি লাভে ব্যর্থ হলেন, তখন চিৎকার করে বললেন, "যদি হুকুম দেন তবে হাফসা (রাঃ)-এর মাথা নিয়ে আসি।"

আলোচ্য আয়াতের বাচনভঙ্গি মুনাফেকদের প্রতি অর্থাৎ যদি হযরত আয়েশা ও হাফসা (রাঃ) প্রচেষ্টা চালায়, এবং মুনাফেকরা এর দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ্ তাঁর রসূলের সাহায্যার্থে প্রস্তুত রয়েছেন আর আল্লাহ্‌র সঙ্গে জিব্রীল,ফেরেশতামণ্ডলী এবং সারা বিশ্ব রয়েছে।

মিথ্যা রেওয়ায়েতসমূহ

আলোচ্য ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীরা অনেক বানোয়াট ও মুখরোচক বর্ণনা দিয়েছে। বড় বড় ঐতিহাসিক ও জীবনচরিত লেখকগণ ঐ সমস্ত রেওয়ায়েত সনদসহ লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং আমরা এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব।

এ পর্যন্ত তো কোরআন মজীদের দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে হযরত (সাঃ) তাঁর বিবিদের মনোরঞ্জনের জন্যে কোন বস্তু নিজের প্রতি হারাম করে নিয়েছিলেন। মতভেদ শুধু এ নিয়ে যে সে বস্তুটি কি ছিল? অনেক রেওয়ায়েতেই আছে যে আযীয মিসর হযরত (সাঃ)-কে উপঢৌকন স্বরূপ মারিয়া কিবতিয়াহ্ নামক যে দাসী পাঠিয়েছিলেন তাই সে বস্তু। মারিয়া কিবতিয়াহ্ সম্পর্কিত রেওয়ায়েত বিভিন্ন সনদে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাতে উল্লেখ আছে যে হযরত (সাঃ)-এর যে গোপন কথা হাফসা (রাঃ) ফাঁস করে দিয়েছিলেন, তা এ মারিয়ো কিবতিয়া সম্পর্কিত গোপন কথা।

যদিও এ রেওয়ায়েতগুলো স্বকপোলকল্পিত মওযু' ও অনুল্লেখযোগ্য, তবুও যেহেতু অধিকাংশ পাশ্চাত্যদেশীয় ঐতিহাসিকগণ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চরিত্রের সমালোচনা করেছেন, তাদের সমালোচনা খণ্ডন করা প্রয়োজন।

সে সমস্ত রেওয়ায়েতের ঘটনার বিবরণে যদিও মতভেদ রয়েছে কিন্তু এ পর্যন্ত সবাই একমত যে মারিয়া কিবতিয়াহ্ হযরত (সাঃ)-এর শয্যাশায়িনী দাসী ছিলেন। হযরত (সাঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)-এর অসন্তোষের কারণে তাঁকে নিজের জন্যে হারাম করে দিয়েছিলেন।

বিখ্যাত হাদীস বাখ্যাতা হাফেয ইবনে হাজার আস্কালানী সহীহ্ বোখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে সূরা তাহ্রীমের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

—"এবং সায়ীদ ইবনে মানসুর মাস্রূক পর্যন্ত সহীহ্ সনদে রেওয়ায়েত করেছেন যে হযরত (সাঃ) হাফ্সা (রাঃ)-এর সামনে কসম খেয়ে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর দাসীর সংসর্গে যাবেন না।"

অতঃপর হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) মুসনাদে হুশাইম ও তিবরানী নামক গ্রন্থদ্বয় থেকে অনেকগুলো রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। তন্মধ্যে একটি নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

—"এবং তিবরানী যাহ্হাকের বর্ণনা ধারায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে হযরত হাফসা (রাঃ) তাঁর ঘরে প্রবেশ করে দেখেন, হযরত নবী করীম (সাঃ) মারিয়ার সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত রয়েছেন। এতে তিনি হযরত (সাঃ)-এর উপর রাগ করলেন।"

ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদ এবং ওয়াকেদী এ রেওয়ায়েতটি বিশেষ অশালীন ও অসৌজন্যমূলক ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা তা থেকে বিরত থাকলাম। কেননা, এটি সরাসরি মিথ্যা ও অপবাদ।

আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী, তাঁর সহীহ্ বোখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থের নবম খণ্ডের ৫৪৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

—"এবং আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে সহীহ্ বর্ণনা এই যে সেটি মধু সম্পর্কীয় ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, মারিয়া সম্পর্কিত ব্যাপারে নয়, যা সর্বশ্রেষ্ঠ সহীহ্ হাদীস গ্রন্থদ্বয়, সহীহ্ বোখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়নি। সহীহ্ মুসলিমের ব্যাখ্যাতা আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন, মারিয়া সম্পর্কিত কাহিনী কোন সহীহ্ সনদসংবলিত রেওয়ায়েতের মাধ্যমে বর্ণিত হয়নি।"

মারিয়া সম্পর্কিত আলোচ্য হাদীস তফসীরে ইবনে জারীর, তিবৃরানী ও মুসনাদে হুশাইম গ্রন্থে বিভিন্ন সনদযোগে বর্ণিত হয়েছে। উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে অনেক গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েত রয়েছে। তাই এ সমস্ত রেওয়ায়েতের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে যতক্ষণ কোন উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো গ্রহণ করা যায় না। হাফেয ইবনে হাজার 'আস্‌কালানী (রহঃ) সে সমস্ত রেওয়ায়েতের মধ্যে যে রেওয়ায়েতটির শেষ রাবী মাসরুক (রহঃ) সেটিরই নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ করেছেন।[১]

কিন্তু প্রথমত, সে রেওয়ায়েতে আদৌ মারিয়া কিবতিয়ার নাম উল্লেখ নেই। মাত্র এতটুকু আছে যে হযরত হাফসা (রাঃ)-এর সামনে কসম খেয়ে বলেছিলেন, আমি আমার দাসীর নিকট আর যাব না, সে আমার জন্যে হারাম। দ্বিতীয়ত, মাসৃরূক একজন তাবেয়ী। তিনি হযরত (সাঃ)-কে দেখেননি। কাজেই এ রেওয়ায়েত হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি (اصول حديث) মোতাবেক মুনকাতে বা কর্তিত এর সনদ কোন সাহাবী পর্যন্ত পৌছেনি।

এ হাদীসের অন্য এক সনদ হাফেয ইবনে কাসীর (রহ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সে সূত্রে আবদুল মালেক রাক্কাশী নামক আর একজন রাবী সম্পর্কে "দারে কুৎনী" নামক গ্রন্থে মন্তব্য আছে ঃ

—"তাঁর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতাহেতু তিনি হাদীসের মূল বচন ও সনদে অনেক ভুল করেন।"

---

১. ফতহুল বারী গ্রন্থে সূরা তাহরীমের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

একথা সর্ববাদীসম্মত যে মারিয়া (রাঃ) সম্পর্কিত রেওয়ায়েত সেহাহ্ সিত্তার[১] কোন কিতাবেই নেই।[২] একথাও সর্বজনসম্মত যে সহীহ্ বোখারী ও সহীহ্ মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে সূরা তাহ্রীমের শানে-নূযুল সম্পর্কিত (মধু পান সম্পর্কিত) ঘটনা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। মোহাদ্দেসকূল শিরোমণি ইমামুল মোহাদ্দেসীন ইমাম নববী (রহঃ) পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছেন যে মারিয়া সম্পর্কে কোন সহীহ্ রেওয়ায়েত নেই। হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) এবং ইবনে কাসীর (রহঃ) যে সূত্রদ্বয়কে সহীহ্ বলে ঘোষণা করেছেন তার মধ্যে একটা মুনকাতে বা কর্তিত সূত্রের এবং অপরটির রাবী স্মৃতিশক্তিহীন, অধিক ভ্রমশীল,— কাসীরুল খাতা।' এতসব ত্রুটি-বিচ্যুতির পর কে বলতে পারে যে এ রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য? উপরোক্ত পর্যালোচনা হাদীস বর্ণনার মূলনীতি অনুসারে করা হয়েছে আর যদি বিবেকের বিচারে যাচাই করা যায়, তবে এতসব ঝামেলার আদৌ কোনই প্রয়োজন নেই। কারণ, যে সমস্ত অশালীন কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, বিশেষ করে তাবারী ইত্যাদি গ্রন্থে যে সমস্ত আনুষঙ্গিক কাহিনী বর্ণিত আছে তা একজন মামুলী ব্যক্তির প্রতিও আরোপ করা চলে না। আর বিনয়, নম্রতা ও পবিত্রতার জীবন্ত প্রতীক হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি তা আরোপ করা কিভাবে সম্ভব?

তাবুকের যুদ্ধ

তাবুক একটি বিখ্যাত জায়গার নাম। মদীনা ও দামেস্কের মধ্যবর্তী স্থানে— মদীনা থেকে চৌদ্দ মন্যিল দূরে এটি অবস্থিত।

মুতার যুদ্ধের পর রোমানগণ আরব আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল। গাস্সানী গোত্র সিরিয়ায় রোমান সাম্রাজের অধীনে শাসন চালিয়ে যাচ্ছিল। তারা বহু পূর্ব থেকেই খৃষ্টধর্মমত গ্রহণ করেছিল। এ কারণে রোম সম্রাট কাইসার তাদেরই এ দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। গাস্সানীদের আক্রমণের সংবাদ ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছিল। এ জন্যেই হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নির্জনবাসের ঘটনাপ্রসঙ্গে 'উৎবান ইবনে মালেক (রাঃ) যখন হযরত ওমরকে (রাঃ) বললেন, "সর্বনাশ হয়ে গেছে!" তখন হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন "খবর ভাল তো, গাস্সানীরা কি আক্রমণ করে বসেছে?"

---

১. বোখারী , মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্। এই ছয়খানা হাদীস গ্রন্থ সমুদয় হাদীস গ্রন্থে মধ্যে সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ বলে স্বীকৃত। এ ছয়খানা সহীহ্ হাদীস গ্রন্থকে সমষ্টিগত ভবে সেহাহ্ সিত্তা বলে।

২. অর্থাৎ মারিয়ার নামে কথিত অমূলক কাহিনী নেই নতুবা নাসায়ী গ্রন্থে বাবুল গাইরাতু (আত্মমর্যাদাবোধ) অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে আয়েশা (রাঃ) এক দাসীকে তাঁর জন্য হারাম করে নিয়েছিল কিন্তু ঐ হাদীসের এক রাবী 'মাজরূহ'।

সিরিয়ার নাবতী গোত্রের সওদাগরেরা মদীনায় যায়তুন তেল বিক্রি করতে আসত। তারা সংবাদ দিল যে রোমানরা সিরয়ায় বিরাট সেনাবাহিনী জমায়েত করেছে এবং তাদের এক বছরের আগাম বেতন বন্টন করে দিয়ে দেয়া হয়েছে। ঐ সেনাবাহিনীতে লখম, জুয়াম ও গাস্‌সান গোত্রের আরব শামিল রয়েছে। তাদের অগ্রবর্তী বাহিনীর বলকা পর্যন্ত পৌছে গেছে। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে নিবৃরানীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে "আরবের খৃষ্টানেরা রোম সম্রাট হিরাক্‌লাসকে লিখে পাঠিয়েছিল যে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছে, আরব ভীষণ দুর্ভিক্ষ কবলিত, সেখানকার জনগণ খাদ্যাভাবে মারা যাচ্ছে।" এ সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে হিরাকল চল্লিশ হাজার সৈন্য পাঠাল। যাহোক, এ সংবাদ সমস্ত আরব এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। সংবাদের পটভূমিকা এত দৃঢ় ছিল যে সংবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় মিথ্যা হবার কোনই কারণ ছিল না। এরই প্রেক্ষিতে হযরত (সাঃ) সেনাবাহিনী গঠনের নির্দেশ দিলেন। ঘটনাচক্রে তখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ এবং তীব্র গরম ছিল। তাই তখন কারও কার ও পক্ষে বাড়ির বের হওয়াও কষ্টকর ছিল।[১] মোনাফেকরা নিজেদেরকে প্রকাশ্যে মুসলমান বলে ঘোষণা করত। এ সময় তাদের মুখোশ উন্মোচিত হতে লাগল। তারা নিজেরাও যুদ্ধে না যাবার জন্য নানা প্রকার বাহানা খুঁজতে[২] লাগল এবং অন্যদেরও প্ররোচিত করতে লাগল, "এ গরমের মধ্যে যাত্রা করো না।"

সুয়াইলম নাম জনৈক ইহুদীর বাড়িতে মুনাফেকরা সমবেত হয়ে লোকদের যুদ্ধ যাত্রা থেকে নিরস্ত করত। যেহেতু রোমানগণ কর্তৃক স্বদেশ আক্রমণের ভয় ছিল, সেহেতু হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সমস্ত আরব গোত্রসমূহের নিকট সৈন্য এবং আর্থিক সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) মধ্যে হযরত 'ওসমান (রাঃ) তিনশ' উট দান করলেন। অধিকাংশ সাহাবী মোটা অংকের সাহায্য হাযির করলেন। অনেক মুসলমানই যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় রসদ ও সরঞ্জামের অভাবে এ অভিযানে অংশগ্রহণে অসমর্থ হলেন। এ সমস্ত লোক হযরত (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে এমনভাবে রোদন করতে লাগল যে তাদের প্রতি হযরত (সাঃ)-এর বিশেষ করুণার উদ্রেক হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের অভিযানের জন্যে কোন রসদপত্র ও যুদ্ধসম্ভারের ব্যবস্থা হল না। তাঁদের এ উৎসর্গীকৃত অন্তরের প্রশংসা করে সূরা আত্তাওবার নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হল ঃ

১. মার্গোলিয়থ সাহেব লিখেছেন, যেহেতু মদীনার আনসারগণ হুনাইনের যুদ্ধে গনীমতের মাল থেকে বঞ্চিত হয়েছিল সেহেতু তারা মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিল যে যুদ্ধের ফায়দা যখন অন্যেরা লুটবে তখন তারা যুদ্ধ করে কি করবে? এটা মার্গোলিয়থ সাহেবের অনুমান মাত্র। স্বয়ং কোরআন মজীদ যেখানে বাঙময় সেখানে অনুমানের কি প্রয়োজন?

২. ইবনে হিশাম।

"আর সে লোকদের উপর কোন গোনাহ্ নেই, যখন তারা আপনার নিকট এ উদ্দেশ্যে আসে যে আপনি তাদের বাহ্ন দান করেন, আর আপনি বলে দিন, আমার কাছে তো কোন কিছুই নেই যার উপর আমি তোমাদের আরোহণ করাব, তখন তারা এমনি অবস্থায় ফিরে যায় যে তাদের চক্ষুসমূহ থেকে অশ্রুধারা বইতে থাকে, এ অনুতাপে যে তাদের ব্যয় করার কোন সম্বলই নেই।" (৯ ঃ ৯১)

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অভ্যাস ছিল যে যখনই তিনি মদীনা থেকে বাইরে কোথাও যাত্রা করতেন তখন মদীনাতে একজন অস্থায়ী প্রশাসক নিযুক্ত করে যেতেন। যেহেতু অন্যান্য যুদ্ধের মত এ যুদ্ধেও হ্যরত (সাঃ) তাঁর সহধর্মিনীদেরকে সঙ্গে নেননি, তাই নবী হেরেমের হেফাযতকল্পে কোন বিশেষ অনুগত আপনজনকে রেখে যাবার প্রয়োজন ছিল। এ দায়িত্ব অস্থায়ী নগর প্রশাসকের ওপর ন্যস্ত হ্ল। তিনি এ বলে আপত্তি তুললেন যে আমাকে আপনি নারী ও শিশুদের মাঝে রেখে যাচ্ছেন? হ্যরত (সাঃ) বললেন, "তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে আমার সঙ্গে তোমার এমন সম্পর্ক হ্উক যা মূসার সঙ্গে হারুনের ছিল।"[১]

হ্যরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ত্রিশ হাজার সৈন্যসহ্ যাত্রা শুরু করলেন। এ সেনাদলে দশ হাজার অশ্ব ছিল।[২] পথিমধ্যে আল্লাহ্র গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত সামুদ জাতির জনপদ দেখা গেল। তারা পাহাড় কেটে এ সমস্ত বাড়িঘর নির্মাণ করেছিল। যেহেতু সে স্থানে আল্লাহ্র আযাব আপতিত হয়েছিল, তাই হ্যরত (সাঃ) নির্দেশ দিলেন যে কেউ যেন এখানে অবস্থান, পানি পান অথবা অন্য কোন কাজ না করে।

তাঁবুকে পৌছে জানা গেল, প্রাপ্ত সংবাদ সম্পূর্ণ সত্য নয়, কিন্তু মূলত মিথ্যাও নয়। গাস্সানী গোত্রপ্রধান আরবদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির নানারূপ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। সহীহ্ বোখারীর 'গয্ওয়াতুত তাবুক' কা'আব ইবনে মালেকের ঘটনা প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে যে সিরিয়া থেকে একজন দূত এসে কা'আব ইবনে মালেককে গাস্সানী গোত্রপ্রধানের একখানা পত্র দেয়। তাতে লেখা ছিল-"আমি শুনেছি, মোহাম্মদ (সাঃ) তোমাকে যথাযথ মূল্যায়ন করেন না।" কাজেই তুমি আমার এখানে চলে এসো। আমি তোমাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করব। কা'আব (রাঃ)-এর প্রতি তখন হ্যরত নবী করীম (সাঃ) কোন কারণে কিছুটা অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনি গাস্সানী গোত্রপ্রধানের এ পত্র চুলায় নিক্ষেপ করলেন।

---

১. সহীহ্ বোখারী, 'গাযওয়াতুত্ তাবুক'।
২. তাবাকাতে ইবনে সা'আদ।

তাবুকে পৌঁছে হযরত নবী করীম (সাঃ) বিশ দিন অবস্থান করলেন। ঈলা শহরের সর্দার হযরত (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে 'জিযিয়া' প্রদানে সম্মত হলেন। শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ তিনি হযরত (সাঃ)-কে একটি শ্বেতবর্ণের খচ্চরও উপঢৌকন দেন। হযরত (সাঃ)-এর প্রতিদানস্বরূপ স্বীয় চাদর মোবারক উপঢৌকন দেন। 'জুররাহ্' ও 'আযরাহ্' এলাকার খৃষ্টানরাও উপস্থিত হয়ে জিযিয়া প্রদানের সম্মতি প্রকাশ করে।

দামেস্ক থেকে মদীনার পথে পাঁচ মন্‌যিল দূরত্বে দুমাতুল জান্‌দল্ নামক স্থানে রোম সম্রাটের অধীনস্থ একিদর নামক এক আরব দলপতি ছিলেন। হযরত নবী করীম (সাঃ) তাকে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে চারশ' সৈন্যসহ্ হযরত খালেদ (রাঃ)-কে পাঠালেন। খালেদ (রাঃ) তাকে পরাজিত ও বন্দী করলেন এবং এ শর্তে মুক্তিদান করলেন যে সে স্বয়ং হযরত (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে সন্ধিশর্ত পেশ করবে। পরে সে তার ভাইকে সঙ্গে করে মদীনায় পৌঁছালে হযরত নবী করীম (সাঃ) তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন।

তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করে মদীনার নিকটবর্তী হলে শহরবাসীরা আনন্দাতিশয্যে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে স্বাগত জানাবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এলেন। এমন কি, পর্দার অন্তরাল থেকে পর্দানশীন মহিলারা পর্যন্ত বেরিয়ে পড়লেন। বালিকারা গীত গাইতে গাইতে বের হল ঃ

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا - مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا - مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعٍ

অর্থাৎ, "বেদার সুড়ঙ্গ পথ থেকে আমাদের উপর চন্দ্রোদয় হল, যে পর্যন্ত দুনিয়াতে খোদার নাম উচ্চারণকারী একটি প্রাণীও বিদ্যমান থাকবে, সে পর্যন্ত আমাদের প্রতি আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা অবশ্যকর্তব্য হবে।"

'মসজিদে যেরার' বা ক্ষতিকর মসজিদ

মুনাফেকরা সর্বদাই চেষ্টা করত মুসলমানদের ঐক্যে ভাঙন সৃষ্টি করতে। অনেক দিন যাবৎ তারা এ খেয়ালে ছিল যে কুবার মসজিদ ভেঙে দিলে তারা সেখানে এ বাহানায় একটা মসজিদ নির্মাণ করবে যে যারা দুর্বলতা বা অন্য কোন কারণে মসজিদে নববীর জামাআতে হাযির হতে সক্ষম নয়, তারা এখানে এসে নামায আদায় করবে। মদীনার আবু আমের নামে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। সে মুনাফেকদের বলল, তোমরা যুদ্ধসম্ভার সংগ্রহ কর,

আমি রোম সম্রাটের কাছ থেকে সৈন্য এনে এদেশটিকে ইসলাম থেকে মুক্ত করব।

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন তাবুক অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন মুনাফেকেরা হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এসে আবেদন জানাল ঃ "আমরা রুগ্ন ও অসুস্থ অক্ষমদের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি। আপনি অনুগ্রহপূর্বক তাতে একবার নামায পড়ে সেটি উদ্বোধন করে দিন।" হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রত্যুত্তরে বললেন, "এখন আমি যুদ্ধাভিযানে যাত্রা করছি।" হযরত (সাঃ) তাবুক থেকে ফিরে এলে মালেক (রাঃ) ও মা'আন ইবনে আদী নামক দুজন সাহাবীকে এ মসজিদটি জ্বালিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। এরই সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হল।

"যারা ক্ষতিসাধনের মানসে, কুফরীর প্রসার আকাঙ্ক্ষায় ও মোমেনদের বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে। উদ্দেশ্য যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তাদের জন্যে সেটি মন্ত্রণা-কক্ষ হবে। আর তারা কসম করে বলে যে আমরা নেক উদ্দেশ্যে এটি নির্মাণ করেছি। আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তারা মিথ্যাবাদী, আপনি কখনও সে মসজিদে গিয়ে দাঁড়াবেন না। যে মসজিদের ভিত্তিস্থাপনের প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত, সেটিই হল আপনার দাঁড়ানোর অধিক উপযোগী। সেখানে এমন সব লোক রয়েছে, যারা অত্যধিক পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করে। আর আল্লাহ্ পরিচ্ছন্নতাপ্রিয় লোকদের বেশি ভালবাসেন।"

হজব্রত, কুফর ও শিরক থেকে হরমের পবিত্রকরণ

হিজরী অষ্টম সালে মক্কা বিজিত হয়। কিন্তু যেহেতু তখনও দেশে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েম হয়নি, তাই সে বছর মুশরেকদের ব্যবস্থাপনায়ই হজব্রত পালিত হয়। মুসলমানগণ 'ইতাব ইবনে উসাইদের নেতৃত্বে সে বছর হজ আদায় করেন। তিনি মক্কার প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। হিজরী নবম সনে প্রথমবারের মত কাবাগৃহ শিরক ও কুফরের অন্ধকারমুক্ত হয়ে পুনরায় ইব্রাহীমী এবাদতের কেন্দ্রে পরিণত হল। তাবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে হিজরী নবম সালের জিলকদ অথবা জিলহজ মাসে হযরত নবী করীম (সাঃ) তিনশ' মুসলমানের এক কাফেলাকে মদীনা থেকে হজ আদায়ের জন্য পাঠালেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রাঃ) আমীরে হজ, হযরত আলী (রাঃ) ঘোষক এবং হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ), জাবের (রাঃ) ও আবু হুরাইরা (রাঃ) প্রমুখ মো'আল্লেম বা শিক্ষক ছিলেন। কোরবানীর জন্য সঙ্গে বিশটি উটও নেয়া হয়েছিল।

কোরআন এ হজকে হজে আকবার বলে অভিহিত করেছে। দীর্ঘ বিরতির পর এ প্রথমবারের মত পুনরায় ইবরাহীম (আঃ)-এর সুন্নত মোতাবেক হজের অনুষ্ঠানাদি পালিত হল। এ হজের মাকসুদ ছিল, অন্ধকার ও জাহেলিয়াতের যুগের অবসান ঘটিয়ে ইসলামী হুকুমতের শুভ উদ্বোধনের ঘোষণা দেয়া, হজের অনুষ্ঠানাদি সর্বসাধারণকে শিক্ষা দেয়া এবং জাহেলিয়াতের নিয়মপদ্ধতি ও আচার-অনুষ্ঠান বাতিল ঘোষণা করা।

হযরত আবু বকর (রাঃ) হজের সমস্ত নিয়মপদ্ধতি জনগণকে শিক্ষা দিলেন। 'ইয়াওমুন্নাহর' বা কোরবানীর দিনের ভাষণে তিনি হজের মাস'আলা মাসায়েল বর্ণনা করলেন। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) দাঁড়িয়ে সূরা বারা'আতের চল্লিশটি আয়াত পড়ে শোনালেন এবং ঘোষণা করলেন যে এখন থেকে কোন মুশরেক কাবা শরীফে প্রবেশ করতে পারবে না এবং মুশরেকদের সঙ্গে ইতিপূর্বে স্বাক্ষরিত সমুদয় চুক্তি তাদের চুক্তিভঙের কারণে আজ থেকে চার মাসের মধ্যে বাতিল হবে। হযরত আবু হুরাইরা প্রমুখ এমনি সুউচ্চকণ্ঠে এসব ঘোষণা লোকদের শুনিয়েছিলেন যে তাঁদের গলা পর্যন্ত ভেঙে গিয়েছিল।[১]

সূরা বারা'আতের প্রথম আয়াতগুলো যাতে আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত ঘোষণার নির্দেশ দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে— হে মুসলমানগণ! যে সমস্ত মুশরেকের সঙ্গে তোমরা চুক্তি সম্পাদিত করেছিলে (এবং তারা সে চুক্তিভঙ্গ করেছে) আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে তাদের প্রতি কোন দায়িত্ব নেই। এখন (হে চুক্তিভঙ্গকারী মুশরেকরা) চার মাস তোমাদের সময় দেয়া হল। এ চার মাস তোমরা দেশে চলাফেরা কর এবং জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহ্কে অক্ষম করতে পারবে না। আল্লাহ্ কাফেরদের অপদস্থ করবেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে হজে আকবরের দিন জনসাধারণের মধ্য ঘোষণা করা হচ্ছে যে নিশ্চয়ই এখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল মুশরেকদের যিম্মাদার নন। হে, মুশরেকরা! তোমরা যদি তওবা কর, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম, আর যদি এখনও তোমরা বিমুখ হও, তবে জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহ্কে অক্ষম করতে পারবে না। আর হে রসূল! আপনি কাফেরদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির দুঃসংবাদ শুনিয়ে দিন! কিন্তু যে সমস্ত মুশরেকের সঙ্গে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছ এবং তারা সে সন্ধিচুক্তি একটুও ভঙ্গ করেনি এবং তোমাদের বিপক্ষে তোমাদের শত্রুদের কাউকেও সাহায্য করেনি, সে ক্ষেত্রে তোমরা তাদের সঙ্গে কৃত তোমাদের সন্ধির মেয়াদ পূর্ণ কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সংযমশীলদেরকে পছন্দ করেন। (৯ ঃ ১-৪)

---

১. মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, ২য় খণ্ড, ২৯৯ পৃঃ বিস্তারিত বিবরণের জন্য যারকানী প্রভৃতি।

—"হে মুসলামনগণ! মুশরেকেরা (তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের দরুন) একেবারেই অপবিত্র। অতএব, তারা যেন এ বছরের পর থেকে মসজিদে হারামের (হরম শরীফের) কাছেও আসতে না পারে।" (৯ ঃ ২৮)

সুদাই (রাঃ)-এর বরাত দিয়ে তাবারী রেওয়ায়েত করেছেন যে এ ঘোষণার পর কাফেররা স্বভাবতই ভীত হয়ে পড়ল। হিজরতের নয় বছর অতিক্রান্ত হবার পর এখন শান্তি ও নিরাপত্তার যুগ আসল! এখন হালাল পথে সম্পদ অর্জন ও তা সংরক্ষণ করার মত সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হল। এ কারণে এ বৎসরই যাকাতের হুকুম নাযিল হল এবং গোত্রসমূহের কাছ থেকে যাকাৎ আদায়ের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করা হল। ইতিমধ্যে অনেক অমুসলিম গোত্র ও জনগোষ্ঠী ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করায় জিযিয়া সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হল ঃ

حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ

"যে পর্যন্ত তারা বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া দানে সম্মত না হয়।"

সুদ হারাম হবার হুকুমও এ বছরেই নাযিল এবং এর এক বছর পর দশ হিজরীতে বিদায় হজের সময় হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ ঘোষণা দিলেন।"

আবিসিনিয়ার বাদশাহ এ বছরই পরলোকগমন করেন। তাঁর ছত্রচ্ছায়ায় মুসলমানগণ কয়েক বছর হাবশায় (আবিসিনিয়ায়) বসবাস করেছিলেন। হযরত নবী করীম (সাঃ) নিজে তাঁর মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করেন যে "হে মুসলামনগণ! আজ তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ভাই আসহেমার মৃত্যু হয়েছে, তার জন্য মাগফিরাত কামনা কর।" অতঃপর হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) নাজ্জাশীর গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করেন।

গাযওয়াত বা হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুদ্ধসমূহের পর্যালোচনা

এই পুস্তকের এ খণ্ড একান্ত জীবনবৃত্তান্তেই সীমাবদ্ধ। আলোচনা, পর্যালোচনা, তত্ত্বানুসন্ধান ও সন্দেহভঞ্জনের জন্য অন্যান্য খণ্ড রয়েছে। তাই বর্তমানে বিষয়টি যুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনার সঙ্গেই সংযোজিত করা উচিত ছিল। কিন্তু হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনচরিত সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহে যে সমস্ত ঘটনাপঞ্জি অধিক স্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ তা হল গযওয়াত (যুদ্ধসমূহ) সম্পর্কিত আলোচনা যদি গ্রন্থগুলির প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তবে দেখা যায়, প্রাথমিক পর্যায়ে সীরাত

সম্পর্কিত যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেগুলোর অধিকাংশ সীরাত গ্রন্থ নয় বরং মাগাযী গ্রন্থে (যুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনা গ্রন্থে) পরিণত হয়েছে। যথা— ইবনে ওকাবার মাগাযী, ইবনে ইসহাকের মাগাযী ও ওয়াকেদীর মাগাযী গ্রন্থ। এ রচনাধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। তাই যদি এখন এ রীতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করা যায়, তবে যে ব্যক্তি পূর্বসূরীদের লেখা কোন গ্রন্থ প্রথমেই পাঠ করে থাকবেন তিনি এ নতুন গ্রন্থ পাঠ করে মনে করবেন, তিনি সীরাত গ্রন্থ পাঠ না করে অন্য কোন গ্রন্থ পাঠ করছেন হয়ত।

এ সমস্ত কারণেই আমরাও যুদ্ধসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু যুদ্ধসমূহের বর্ণনা পাঠ করে যে সমস্ত জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয়, তা অন্যত্র আলোচনার জন্য সংরক্ষিত থাকলে পাঠকদের মনে নানা জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক।

বিধর্মীরা হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর যুদ্ধসমূহের উদ্দেশ্য ও কারণ বুঝতে মারাত্মক ভুল করেছে। কেবল কুমতলবীরাই নয়, বরং নিরপেক্ষ ও সৎ মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তিরাও এ ভুল শিকার হয়েছে।

কিন্তু এতে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই। কারণ, এমনসব উপাদান ও অজুহাত বিদ্যমান রয়েছে যে এ ধরনের ভুল শত্রু কেন মিত্ররাও করতে পারেন।

আরববাসী বনাম যুদ্ধ ও লুণ্ঠন

এ অধ্যায়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে যুদ্ধ ও লুট-তরাজের সঙ্গে আরবজাতির কি সম্পর্ক তা অবগত হওয়া। প্রত্যেক জাতির স্বভাব-চরিত্র, রীতিনীতি, কাজকর্ম ও দোষত্রুটি এক কথায় তাদের জাতীয় জীবনের একটা বিশেষ বুনিয়াদ ও ভিত্তি থাকে। এ বুনিয়াদের উপর ভিত্তি করেই সে জাতির সাধারণ সংস্কৃতি গড়ে ওঠে এবং সবকিছু লালিত হয়। আরবদের জীবনের এ বুনিয়াদ ছিল যুদ্ধ ও লুণ্ঠন। এর সূচনার মূল উৎস ছিল এই যে আরব ছিল এক উষর মরুর দেশ। কোন কৃষিজাত দ্রব্য সেখানে তেমন একটা উৎপন্ন হত না। জনগণ ছিল নিরক্ষর মূর্খ, প্রাকৃতিক সম্পদ বলতেও কিছু ছিল না। অন্নবস্ত্রের সংস্থানের জন্য একমাত্র সম্বল ছিল, ছাগ-মেষ ও উট। তারা এ সমস্ত পশুর দুধ পান করত, মাংস ভক্ষণ করত ও পশম দ্বারা কম্বল বয়ন করত। কিন্তু এ সম্পত্তিও সবার ভাগ্যে জুটত না। জুটলেও তা জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনের তুলনায় ছিল অপ্রতুল। এ জন্য আক্রমণ ও লুট-তরাজের প্রচলন হল এবং তা-ই এক সময় জীবিকা নির্বাহের একটা বড় মাধ্যমে পরিণত হল। আবু 'আলী কালী 'কিতাবুল আমালী" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

—"আর তা হল এ জন্য যে তারা এ বিষয়টি নাপছন্দ করত যে একাদিক্রমে তিন মাস এমনভাবে অতিবাহিত হোক যে সময়ে তারা লুটতরাজ করতে পারেনি। কারণ, তাদের জীবিকা নির্বাহের একটা প্রধান উৎস ছিল এ লুটতরাজ!" যেহেতু লুণ্ঠন দ্বারা অধিকন্তু ছাগল-ভেড়া হস্তগত হত এবং এগুলোকে আরবীতে 'গনম' বলা হয়, তাই লুণ্ঠনের দ্রব্যকে আরবীতে গনীমত বলা শুরু হয়। এ নামটি পরবর্তীকালে এত ব্যাপকতা লাভ করেছিল যে কায়সার ও কিসরার (রোম ও পারস্য সম্রাটের) মুকুট-সিংহাসন লুণ্ঠিত হলেও এ নামেই খ্যাত হত।

কালক্রমে এ শব্দই আরবজাতির, আরবী ভাষার ও আরব্য ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা প্রিয়, সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও সর্বাধিক দীর্ঘ প্রতিক্রিয়াশীল শব্দে রূপান্তরিত হল। আজ অবধি আরবের কোন সুলতান কোন রইস বা কোন গোত্রপ্রধান শেখ নিজের আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবকে বিদেশে বিদায় দিতে গিয়ে বলে থাকে سَالِمًا غَانِمًا অর্থাৎ, "শান্তির সঙ্গে নিরাপদে ফিরে এসো এবং লুণ্ঠন করে নিয়ে এসো।" উর্দু ভাষায়ও সর্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে গনীমত বলা হয়।

যাহোক, জীবিকা অন্বেষায় সমগ্র আরবে লুটতরাজের ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল। আরবের সমস্ত গোত্রই একে অন্যের উপর হানা দিয়ে হত্যা ও লুণ্ঠন চালাত। কেবলমাত্র ধর্মীয় মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে হজের মৌসুমে নির্ধারিত চার মাসকে 'আশহুরে-হারাম' বা সম্মানিত মাসরূপে আখ্যায়িত করা হত এবং নিষিদ্ধ এ মাসে যুদ্ধবিগ্রহ লুটতরাজ বন্ধ থাকত। কিন্তু একাধারে তিন মাস (জিলকদ, জিলহজ ও মহররম ধারাবাহিক তিন মাস এবং রমজান মাস এককভাবে হারাম) জীবিকা অন্বেষণের পথ বন্ধ থাকা তাদের পক্ষে বিশেষ দুঃসহ ব্যাপার ছিল। তাই তারা 'নাসঈ' নামক এক প্রথার প্রচলন করেছিল। এ প্রথাবলে তারা প্রয়োজন পড়লে এ মাসগুলোও হালাল করে নিত এবং এর পরিবর্তে নিজেদের সুবিধাজনক যেকোন মাস হারাম করে নিত।

হাফেয ইবনে হাজার (রাহঃ) সহীহ বোখারীর শরাহ গ্রন্থে সূরা তওবা'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

"তারা মহররম মাসকে সফরে ও সফর মাসকে মহররম মাসে রূপান্তরিত করত, যাতে একাধারে তিন মাস যাবৎ যুদ্ধ হতে বঞ্চিত থাকতে না হয়।"

ছার নামক ভ্রান্ত বিশ্বাস

যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হওয়ার মূল কারণ হত জীবিকা। কিন্তু যখন এটি পরিত্যক্ত হল, তখন অন্যান্য কারণের উদ্ভব হল। আর এসব কারণও গুরুত্ব ও ব্যাপকতার দিক দিয়ে কোন অংশে কম ছিল না। এগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল এবং অগ্রগণ্য ছিল 'ছার বিধি'। অর্থাৎ, যখন কোন গোত্রের কোন ব্যক্তি কোন ঘটনাচক্রে নিহত হত, তখন তার স্বগোত্রীয়দের জন্য তার প্রতিশোধ গ্রহণ ফরয হয়ে পড়ত। শত শত বছর অতীত হয়ে গেলে এবং ঘাতকের গোত্রের নাম-নিশানা মিটে গেলেও অন্তত ঘাতকের গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা না করা পর্যন্ত তাদের গোত্রীয় ফরয আদায় হত না। একেই 'ছার' বলা হয়। এ 'ছারে'র পরিণতি স্বরূপ একটি মামুলী হত্যাকাণ্ডের ফলে শত শত এমন কি, হাজার বছর ধরে যুদ্ধ চলত। বিদায় হজের সময় হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ প্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা করেন, নিজের গোত্রের ঘাতকদের খুনের দাবি মাফ করে দেন। কিন্তু মরুবাসী আরবদের মধ্যে আজও এ পদ্ধতি চালু আছে এবং এটা তাদের গোত্রীয় বৈশিষ্ট্যের অন্যতম অঙ্গ।

'ছার' সম্পর্কে আরবদের মধ্যে অদ্ভুত এক সংস্কারের সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের একটি ধারণা ছিল যে যখন কোন আরব ঘাতকের হাতে নিহত হয়, তখন তার আত্মা পাখিতে রূপান্তরিত হয়। যে পর্যন্ত তার হত্যার প্রতিশোধ নেয়া না হয় সে পর্যন্ত সে তার বধ্যভূমিতে চিৎকার করতে থাকে, "আমাকে পান করাও আমি তৃষ্ণার্ত।" এ কল্পিত পাখির আওয়াযকে তারা 'ইয়াহামা' বলে।

পরবর্তীকালে এ রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ না করাই দোষের বিষয় মনে করা হত।

সম্মান ও সম্ভ্রমবোধের ভিত্তিতে তারা নিহত ব্যক্তির শোকে কান্নাকাটি করা দূষণীয় মনে করত ঃ

নিহত ব্যক্তির প্রতি শোক প্রকাশ ও কান্নাকাটি তারা তখনই করত, যখন তার হত্যার প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হত।

তাদের ধারণা ছিল, যে ব্যক্তি আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করে তার রূহ আহত স্থান দিয়ে বের হয়। নতুবা নাকের ছিদ্রপথে বের হয়। এ ধরনের মৃত্যুকে তারা দোষের বিষয় মনে করত। এ পরিপ্রেক্ষিতে রোগ-ব্যাধিতে মৃত্যু হলে তাকে "হতফে আনেফা" বা "নাসিকা মৃত্যু" বলত। এরূপ মৃত্যুকে লজ্জাজনক মনে করত।

কালক্রমে জাতীয় মর্যাদাবোধ এবং গোত্রীয় গর্বাহঙ্কার, রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান যুদ্ধবিগ্রহের মূল কারণে রূপান্তরিত হয়। অন্য কথায় তাদের স্বভাব-চরিত্রের মূল উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যায় যে এটাই একমাত্র কারণ ছিল যা দীর্ঘদিন যাবৎ আরব গোত্রসমূহকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছিল। আমর ইবনে মালেক যখন হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণপূর্বক স্বগোত্রীয়দের কাছে প্রত্যাবর্তন করে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, তখন তারা বলল, "বনূ আকীলের প্রতি আমাদের 'ছার' বাকি রয়েছে। যদি সে 'ছার' (হত্যার প্রতিশোধ) গ্রহণ কর, তবে ইসলাম গ্রহণ করব।" সুতরাং তখন নও-মুসলিম বনূ আকিল গোত্রের উপর হামলা হল এবং স্বয়ং 'আমর ইবনে মালেক তাতে অংশগ্রহণ করলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে তিনি এ বলে অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন যে তার হাতে একজন মুসলমান নিহত হয়েছিলেন।

লুণ্ঠনের মাল

আমরা পূর্বেই বলেছি, যুদ্ধের মূল বুনিয়াদ শুরু হয় জীবিকা অন্বেষণের তাগিদে। এজন্য আরবদের নিকট গনীমতের মাল অপেক্ষা প্রিয় কোন বস্তু ছিল না এবং জীবিকার সমস্ত উপকরণের মধ্যে এ লুণ্ঠিত সম্পদকেই (গনীমতের মাল) তারা সর্বাপেক্ষা হালাল, পবিত্র ও উপাদেয় মনে করত। এ ধারণা তাদের হৃদয়-মনে এমন বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে ইসলামের অভ্যুদয়ের পরও অনেকদিন যাবৎ তা সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল। শরীয়তের বিধানদাতা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যেভাবে শরীয়তে নিষিদ্ধ অন্যান্য বস্তুসমূহ ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, গনীমতের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল।

শরীয়তের বিধানদাতা যখন মদ হারাম করতে চাইলেন, তখন প্রথমে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

—"মানুষ আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করছে, আপনি বলে দিন, এতদুভয়ের মধ্যে মহাপাপ রয়েছে।"

এ আয়াত শুনে হযরত ওমর (রাঃ) বলে উঠলেন ঃ

— "আয় আল্লাহ্, মদ্যপান সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার হুকুম শুনিয়ে দিন।" অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হল ঃ

—"মদ্যপান করে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায আদায় করো না।"

সুতরাং এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর নামাযের ওয়াক্ত হলে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশে একজন ঘোষক উচ্চকণ্ঠে বলতে থাকতেন, "নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কেউ নামাযে এসো না।" সর্বশেষে কোরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়ে মদ্যপান চিরতরে নিষিদ্ধ করে দিল ঃ

—"হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া ও মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর, এ সমস্ত নাপাক ও শয়তানী কর্ম; তোমরা এসব থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে থাক, তা হলে অবশ্যই তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হবে। শয়তান তো এটাই চায় যে মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদের বিরত রাখে। এখনও কি তোমরা তা পরিত্যাগ করবে না?" (মায়েদাহ্)

উপরোক্ত আয়াতে মদ সম্পর্কে প্রকাশ্য নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে এত তাকিদ ও কড়াকড়ির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন যে যে-ধরনের পাত্রে মদ্যপান করা হত, সেগুলোও ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন। সাহাবায়ে-কোরাম মদ দ্বারা সিরকা তৈরির অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাও নিষেধ করেন। এতদসত্ত্বেও হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে কতিপয় লোক মদ্যপান করে বসে। তাদের নিকট কৈফিয়ত তলব করলে তাঁরা সৎ মনোভাবসহ বলেন. সৎ ও পুণ্যবান লোকদের জন্য মদ হারাম হল কবে? খোদ কোরআন মজীদে মদ হারাম ঘোষণার পর এ সম্পর্কে পরিষ্কার বর্ণনা আছে ঃ

—"যারা ঈমান এনেছে এবং নেককর্ম করেছে তারা যা কিছু খেয়েছে (অর্থাৎ মদ্যপান করেছে) তাতে তাদের কোন অপরাধ নেই।" (মায়েদাহ্)

ঘটনাস্থলে অনেক সাহাবী (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। খলীফা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালেন যে আয়াতের মর্ম কি? তিনি বললেন, এটি সে সমস্ত সাহাবীর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যাঁরা মদ হারাম হওয়ার পূর্বেই ওফাত পেয়েছেন। হযরত ওমর (রাঃ)-এর সত্যতা ঘোষণা করলেন এবং সে লোকগুলোকে শাস্তি প্রদান করলেন। এ ঘটনা তাবারী রচিত ইতিহাস গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণিত আছে।

এখানে মদ সম্পর্কিত উপরোক্ত আলোচনার উদ্দেশ্য হল এই যে যখন কোন কিছু দীর্ঘদিন যাবৎ 'রসম' ও অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও অন্তর্নিহিত পরিণতি বহুদিন যাবৎ প্রতিষ্ঠিত থাকে। গনীমতেরও একই অবস্থা।

সর্বপ্রথম বদরের যুদ্ধে সময় যখন গনীমতের মাল একত্রিত করার পূর্বেই সাহাবাগণ (রাঃ) গনীমতের মাল সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তখন এ আয়াত নাযিল হল ঃ

—"যদি আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রথমেই নির্দেশ দেয়া না থাকত, তবে তোমরা যা কিছু নিয়েছ তার জন্যে তোমাদের শাস্তি হত।"

সহীহ্ তিরমিযী গ্রন্থে এ ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত আছে। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ঘোষণা করেছিলেন, "যে ব্যক্তি কোন কাফেরকে হত্যা করবে তার মাল-আসবাব হত্যাকারী পাবে।" এ ঘোষণার ভিত্তিতে সাহাবিগণ (রাঃ) যিনি যাকে হত্যা করলেন তিনি তার মাল-আসবাব দাবি করলেন। এতে যে সমস্ত সাহাবী (রাঃ) নিজে যুদ্ধ করেনি কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাণ্ডা বহন প্রভৃতি মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁরাও দাবি করলেন যে এতে আমাদেরও 'হক' রয়েছে[১] এ পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হল ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ - ٥(انفال)

—"হে রসূল! লোকেরা আপনাকে গনীমত সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। আপনি বলে দিন, গনীমত আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের।"

এ আয়াতের উদ্দেশ্য হল এই যে মুজাহিদগণ নিজেরা গনীমতের মালের কোন দাবি করতে পারবে না। এটি হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এখতিয়ারভুক্ত। তিনি তাঁর ইচ্ছামত তা বন্টন করবেন। এতে লাভ হল এই যে পূর্বে যুদ্ধের ময়দানে যার যা ইচ্ছা লুট করে নিত, এখন তা বন্ধ হল। কিন্তু যুদ্ধের ময়দান ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে লুণ্ঠন অনেকদিন যাবৎ চলতে থাকল। সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে এক আনসারী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, "আমরা হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে এক সফরে গমন করেছিলাম। তীব্র ক্ষুধায় পেট জ্বলছিল। ঘটনাচক্রে সামনে কিছু ছাগ-ছাগী দেখা গেল তা লুণ্ঠন করে এনে যবেহ্ করে হাঁড়িতে চড়ালাম। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সংবাদ পেয়ে চলে এলেন এবং হস্তস্থিত তীর দ্বারা সমস্ত ডেকচি উল্টে দিলেন এবং বললেন,"লুটের মাল মৃত লাশ অপেক্ষা নিকৃষ্ট; তা হালাল নয়।"

হিজরী ৭ম সনে খয়বরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় পর্যন্ত অবস্থা এ ছিল যে যুদ্ধোত্তর শান্তি অবস্থায় লোকেরা ইহুদীদের পশু এবং ফলমূল লুণ্ঠন করে নিয়ে এল। এতে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। তিনি সকল সাহাবীকে একত্রিত করে ভাষণ দিলেন ঃ

১. সুনানে আবু দাউদ, 'আনফাল'।

—"আহ্‌লে কেতাবগণ (কেতাবপ্রাপ্ত ইহুদীরা) যদি তাদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি পালন করে, তবে তোমাদের জন্য এমনটা জায়েয নয় যে তোমরা বিনানুমতিতে তাদের ঘরে প্রবেশ কর, তাদের স্ত্রীলোকদের প্রহার কর এবং তাদের ফলমূল ভক্ষণ কর।"

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) চাইলেন, গনীমতের প্রতি লোকের যে মোহ্ ছিল তা কমে যাক। কিন্তু অনেকদিন যাবৎ লোকদের মধ্য থেকে গনীমতের আকর্ষণ ও লোভ দূর হল না। ওহুদের যুদ্ধে পরাজয়ের একমাত্র কারণ ছিল যে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যদিও তীরন্দাজদের বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে যুদ্ধের অবস্থা যাই হোক তোমরা এ স্থান ত্যাগ করবে না। তবুও যেই মাত্র মুসলমানরা বিজয় লাভ করল, অমনি সবাই লুণ্ঠনের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তীরন্দাযগণ স্বস্থান ত্যাগ করা মাত্রই শক্ররা পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে বসল। হুনাইনের যুদ্ধে পরাজয়ের কারণও তাই ছিল যে পূর্বাহ্ণেই সৈন্যরা গনীমতের মাল কুড়াতে শুরু করেছিল।

গনীমত তাদের কাছে এতই প্রিয় বস্তু ছিল যে কোন এক কাফেরের ইসলাম গ্রহণে কেউ কেউ কেবলমাত্র এ কারণে মন ক্ষুণ্ন হয়েছিল যে ইসলাম গ্রহণের কারণে তার মাল-সম্পদ পাওয়া যাবে না। সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে আছে যে এক সাহাবী এক গোত্রের উপর হামলা করতে চাইলে গোত্রের লোকেরা কাঁদতে কাঁদতে বের হয়ে এল। তিনি বললেন, "তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ কর, তোমাদের জানমাল রক্ষা পাবে।" তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করলে তাদের নিরাপত্তা দান করা হল। এ সাহাবী যখন তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে এলেন, তখন সঙ্গীরা তাঁকে এ বলে গালমন্দ করল যে "তুমি আমাদের গনীমত থেকে বঞ্চিত করলে!"

পরে লোকেরা হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এসে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলে তিনি সে সাহাবীকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, "তুমি সে গোত্রের যে সমস্ত লোককে ছেড়ে দিয়েছ তাদের প্রত্যেকের পরিবর্তে তুমি সাওয়াব পাবে।"[১]

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে বহুদিন যাবৎ লোকদের মধ্যে এ ধারণা বিরাজমান ছিল যে গনীমত লাভ করা সওয়াবের কাজ। সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে আছে, এক সাহাবী হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে

১. আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু মা ইয়াকুলু ইযা আসবাহ।

আল্লাহ্র রসূল! এক ব্যক্তি যুদ্ধে গমন করতে চায় এবং সে আশা করে যে এ যুদ্ধে কিছু সম্পদ তার হাতে আসুক। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, "তাঁর কোন পুণ্যই অর্জিত হবে না।" সে ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দরবার থেকে ফিরে এসে লোকদের কাছে একথা বললে সবাই আশ্চর্যবোধ করলেন এবং তাঁকে বললেন যে তুমি গিয়ে জিজ্ঞেস কর। তিনি দ্বিতীয়বার গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন এবং একই জওয়াব লাভ করলেন। লোকেরা পুনরায় তাকে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে পাঠালেন এবং সেবারও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একই জবাব দিলেন যে তার কোন সওয়াব মিলবে না।[১] এ ধরনের বহু ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে।

পশুসুলভ আচরণ

ব্যাপকভাবে ও চরম আকারে যুদ্ধবিগ্রহের প্রসারতা লাভের কারণে আরবদের মধ্যে বহু রকম পশুসুলভ আচার-আচরণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

(১) যুদ্ধে পরাজিত ব্যক্তিদের যখন হত্যা করা হত, তখন তাদের নারী ও শিশুদেরও হত্যা করা হত, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে তাদের পুড়িয়ে মারা হত।

(২) অসতর্ক মুহূর্তে অথবা নিদ্রাবস্থায় অতর্কিতে শত্রুর উপর হানা দিত এবং লুণ্ঠন শুরু করত। এটা ছিল আক্রমণের সাধারণ ও বহুল প্রচলিত রীতি। অনেক বড় বড় বীরপুরুষ এ ধরনের আক্রমণে বিশেষ পারদর্শী ও নিপুণ ছিল। এসব বীরপুরুষদের ফাতিক বা ফাত্তাক বলা হত। তাব্বিত্ শারা সালিক ইবনে আস্সালাকা এ শ্রেণীর বীর ছিলেন।

(৩) তারা জীবন্ত মানুষকে অগ্নিদগ্ধ করত। আমর ইবনে হিন্দা নামক জনৈক আরব বাদশাহের ভাইকে যখন বনূ তামীম গোত্রের লোকেরা হত্যা করল, তখন সে মানত করল যে একের পরিবর্তে আমি তাদের একশ' জনকে হত্যা করব। অতএব, সে বনূ তামীমের উপর আক্রমণ চালাল, হামরা নাম্নী এক বৃদ্ধা ছাড়া গোত্রের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই পালিয়ে গেল। বৃদ্ধাকে বন্দী করে জীবন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হল। ঘটনাচক্রে আম্মারা নামক এক অশ্বারোহী এসে উপস্থিত হল। আমর জিজ্ঞেস করল, তুমি কেন এসেছ? আগন্তুক বলল, "আমি কয়েকদিন থেকে অনাহারে আছি। ধোঁয়া উঠতে দেখে ভাবলাম এখানে হয়তবা খাবার ব্যবস্থা আছে।" আমর তাকেও আগুনে নিক্ষেপ করতে আদেশ দিল। তারহুকুম তামিল হল। বিখ্যাত কবি জরীর তার কবিতায় এ ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন ঃ

১. সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাবু মাঁই ইয়াগযু ওয়া ইয়ালতামিসুদ্দুনিয়া।

—"যেমন তোমরা তাদের পরাজিত, লাঞ্ছিত করেছিলে, আমরাও তোমাদের তেমনি অপদস্ত ও লাঞ্ছিত করে সমুচিত জওয়াব দিয়েছি। আর দুর্ভাগ্যক্রমেই আম্মার আগুনে নিক্ষিপ্ত হল।"

(৪) তারা শিশুদের দ্বারা তীরের লক্ষ্যভেদ ঠিক করত। "ওয়াহিস্ ও 'গাবরা'র যুদ্ধে জনৈক কায়েস তার শিশুদের বনূ যুনিয়ান গোত্রের কাছে বন্ধক রেখেছিল। বনূ যুনিয়ান গোত্রপতি হুযাইফা সে শিশুদের ময়দানে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিত এবং তাদের উপর তীরের লক্ষ্যভেদ ঠিক করত। ঘটনাচক্রে কোন শিশু না মরলে তাকে পরদিন লক্ষ্য ঠিক করার জন্য তুলে আনা হত। দ্বিতীয় দিন আবার এ উল্লাসজনক চাঁদমারী শুরু হত এবং সবাই বন্য-উল্লাসে মেতে উঠত।[১]

(৫) নরহত্যার আর এক পদ্ধতি ছিল—হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গচ্ছেদন করে ছেড়ে দেয়া হত, যাতে লোকটি চরম যন্ত্রণায় ছটফট করে মরে যায়। বনূ গাতফান ও বনূ আমের গোত্রদ্বয়ের যুদ্ধে হাকাম ইবনে আত্তোফাইল এমনি শাস্তিমূলক মৃত্যুর ভয়ে খোদ নিজের গলা নিচে চেপে ধরে আত্মহত্যা করে। ইকদুল ফরীদ গ্রন্থে এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

ওরাইনা গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক যখন হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে কপটতাপূর্ণভাবে ইসলাম গ্রহণ করে এবং হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দাসকে ধরে নিয়ে যায় তখন তার হাত-পা কেটে ফেলে, চোখে ও জিহ্বায় কাঁটা বিধিয়ে দেয়, এতে ছটফট করে অবশেষে মৃত্যুবরণ করে।[২]

(৬) মৃত্যুর পরও নানাপ্রকার অমানুষিক উপায়ে প্রতিশোধ গ্রহণের আগ্রহ দেখা যেত। মৃতের হাত, পা, নাক, কান প্রভৃতি কেটে নেয়া হত। এ প্রথানুযায়ী ওহুদের যুদ্ধে হিন্দা হযরত হাম্যা (রাঃ) ও অন্যান্য কতিপয় শহীদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে নিয়ে হার বানিয়ে গলায় পরেছিল।

(৭) তারা মানত করত যে শত্রুর উপর জয়ী হতে পারলে শত্রুর মাথার খুলিতে মদ্যপান করবে। সালাফার দু'পুত্র ওহুদের যুদ্ধে আসেমের হাতে নিহত হয়। এরই প্রেক্ষিতে সালাফা মানত করল যে সে আসেমের মাথার খুলিতে মদ্যপান করবে। প্রচলিত ছিল যে নিহত ব্যক্তির কলিজা বের করে চিবানো হত। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে ওহুদের যুদ্ধে হিন্দা হাম্যা (রাঃ)-এর কলজে চিবিয়েছিল।

(৮) গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের পেট কেটে ফেলা হত এবং তা নিয়ে গর্ব করা হত।

---

১. মাজমা'উল আমছাল, ৪৭৭ পৃঃ।

২. এ ঘটনা হাদীস গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু তাবাকাতে ইবনে সা'আদ গ্রন্থের ৬৭ পৃষ্ঠা হতে বিস্তারিত বিবরণ নেয়া হয়েছে। মুসলিম শরীফে কেবলমাত্র চক্ষু অন্ধ করে দেয়ার কথা উল্লেখ আছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুদ্ধের কারণ ও প্রকারভেদ

উপরোক্ত আলোচনার পর আমরা এ বিষয়ে পর্যালোচনা করব যে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুদ্ধের কারণ কি এবং খোদ শরীয়ত প্রবর্তক হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) পুরাতন যুদ্ধবিধির কি কি সংস্কার করেছেন। ইতিহাসবিদগণ 'গয্ওয়াহ' শব্দটিকে এত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন যে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য কোথাও যদি দু'চার ব্যক্তিকেও পাঠান হয়েছে, তবে সেটিকেও তাঁরা 'গয্ওয়াহ' বলে উল্লেখ করেছেন। এ মর্মে গযওয়াহ্ ছাড়াও 'সারিয়াহ্' নামক আর একটি শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইতিহাসবিদগণের মতে খোদ হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন শুধু সেগুলোই গয্ওয়াহ্।

প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিকগণ যে সমস্ত ঘটনাকে সারিয়াহ্ বলে উল্লেখ করেছেন তা নিম্নে বর্ণিত কয়েক প্রকার ঘটনার বিভক্ত ঃ

(১) অনুসন্ধান বিভাগ অর্থাৎ শত্রুর গমনাগমন ও গতিবিধির অনুসন্ধান লওয়া।

(২) শত্রুর আক্রমণের সংবাদ পেলে তার প্রতিরোধকল্পে এগুনো।

(৩) কোরাইশদের ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা ও অচলাবস্থার সৃষ্টি করা, যাতে তারা অনন্যোপায় হয়ে মুসলমানদের হজ ও ওমরাহের অনুমতি দেয়।

(৪) দুর্নীতি দমন ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশাসক বাহিনী পাঠানো।

(৫) ইসলাম প্রচারের জন্য লোক পাঠানো হত, তাঁদের হেফাযতের জন্য সঙ্গে কিছু সৈন্যও থাকত। এ ক্ষেত্রে তরবারির সাহায্য গ্রহণ না করার জন্য বিশেষ তাকিদ দেয়া হত।

প্রকৃত প্রস্তাবে গযওয়াহ্ ছিল শুধুমাত্র—

(১) ইসলামী রাষ্ট্রে শত্রু হামলা করলে তার মোকাবিলা করা।

(২) শত্রুদল কর্তৃক মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণের সংবাদ পেয়ে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য অগ্রসর হওয়া।

হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যামানায় যে সমস্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয় সেগুলোর বিভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল।

হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কা থেকে চলে আসেন, তখন কোরাইশরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে দুনিয়ার বুক থেকে ইসলামকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। কেননা, তারা জানত, যদি ইসলামী আন্দোলন অব্যাহত থাকে তবে

একদিকে তাদের ধর্মের অনিষ্ট হবে, অন্যদিকে সমগ্র আরব বিশ্বে তাদের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি, মর্যাদা-সম্মান ও প্রাধান্য রয়েছে তা তিরোহিত হবে। এজন্য একদিকে স্বয়ং কোরাইশরা মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে এবং অন্যদিকে সমস্ত আরব গোত্রগুলোকে এ মর্মে উত্তেজিত করতে থাকে যে এ নতুন দলটি যদি কৃতকার্য হতে পারে, তবে আরব গোত্রগুলোর স্বাতন্ত্র্য আযাদী এমন কি, অস্তিত্বই বিলুপ্ত হবে।

বাইয়াতে 'আকাবার সময় যখন আনসারগণ হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাতে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করছিলেন, তখন এক আনসার বললেন, "ভ্রাতৃগণ ; আপনারা কি সঠিকভাবে জানেন, কোন্ বিষয়ের উপর শপথ (বাইয়াত) গ্রহণ করছেন? এটি আরব ও আযমের (অনারবের) বিপক্ষে যুদ্ধের ঘোষণা।" পূর্বে আমরা মুসনাদে দারেমীর উদ্ধৃতিসহ বর্ণনা করে এসেছি যে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মদীনায় শুভাগমন করলেন, তখন সমগ্র আরব জাহান মদীনা আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। অবস্থা এমন চরমে পৌছায় যে মদীনাতে আনসার ও মুহাজেরগণ রাত্রিবেলা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শয়ন করতেন। পূর্বেই আমরা আবু দাউদ গ্রন্থের উদ্ধৃতিসহ[১] উল্লেখ করেছি যে কোরাইশরা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল যে "মোহাম্মদ (সাঃ)-কে মদীনা থেকে বের করে দাও। নতুবা আমরা নিজেরাই মদীনায় এসে তোমাদের ও মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

অনুসন্ধান বিভাগ

এ সমস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম ও দারুল ইসলামকে (তথা ইসলামী রাষ্ট্রকে) রক্ষাকল্পে জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল, সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান গঠন এবং গুপ্তচর বাহিনীর ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ। কাজেই প্রথম থেকেই হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দিলেন। ক্রমান্বয়ে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন করে বিভিন্ন জায়গায় পাঠাতে লাগলেন। এ সমস্ত ক্ষুদ্র দলগুলো যদিও কেবলমাত্র সংবাদ সংগ্রহ করার জন্যেই গমন করতেন, তবুও আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে সদলবলে গমন করতেন।

১. সুনানে আবু দাউদ, "বাবু ফী খাবরিন্নাযীর" শিরোনামা।

এ সমস্ত সংবাদ সরবরাহ অভিযানকেই ঐতিহাসিকগণ সারিয়াহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে এর উদ্দেশ্য নাকি মরুচারী কাফেলার উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের যথাসর্বস্ব লুট করা এবং অতর্কিতে কোন দলের উপর হানা দেয়াও ছিল।

এ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের লুট করা যে উদ্দেশ্য ছিল না, তার পক্ষে বড় যুক্তি এই যে এসব অনুসন্ধানী দলগুলো অধিকাংশই দশ-বার ব্যক্তির বেশি নিয়ে গঠিত হত না। আর এটা অতি স্পষ্ট ব্যাপার যে এত অল্পসংখ্যক সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রেরিত হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হিজরী দ্বিতীয় সনে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বার ব্যক্তিকে আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশের নেতৃত্বে মক্কা অভিমুখে পাঠান এবং তাঁদের নিকট একখানা মোহর আঁটা বদ্ধ (সীল গালা দ্বারা আবদ্ধ) খামে চিঠি দিয়ে বললেন, দু'দিন পর এ চিঠি খুলবে। দু'দিন পর তাঁরা এ চিঠি খুলে দেখলেন, তাতে নিম্নোক্ত নির্দেশ রয়েছে ঃ

—"সোজাপথে চলে যাও, মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী না'খলা' নামক স্থানে অবস্থান কর ও কোরাইশদের পর্যবেক্ষণ কর এবং তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কর।" (তারাবী ১২৭৪ পৃঃ)

আক্রমণ প্রতিরোধ

এ ব্যবস্থাপনায় এ লাভ হয়েছিল যে যখনই কেউ মদীনায় আক্রমণ করতে চাইত, অমনি সে সংবাদ পৌঁছে যেত এবং সঙ্গে সঙ্গে অতি দ্রুত তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করা হত। অধিকাংশ সারিয়াই এ শ্রেণীভুক্ত ছিল। আমরা যেহেতু 'সারিয়াহ্'সমূহের আলোচনা এড়িয়ে এসেছি তাই শুধু উদাহরণস্বরূপ কতকগুলো সারিয়া'র আলোচনা করব। আমরা প্রচীন জীবনচরিতকারদের উদ্ধৃতিসহ প্রমাণ করব যে এ সমস্ত সারিয়া'র মূল উদ্দেশ্য ছিল শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরোধ ও প্রতিহত করা।

গাত্ফানের সারিয়াহ্

—"এ অভিযানের কারণ ছিল এই যে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) সংবাদ পেলেন যে তাঁর প্রতি হামলার উদ্দেশ্যে বনূ সালাবাহ্ ও মাহারেব গোত্রদ্বয় যু-আমর নামক স্থানে সমবেত হয়েছে। দা'সুর ইবনে আল হারেস নামক এক ব্যক্তি এ বাহিনী গঠন করেছিল।" এটা হিজরী দ্বিতীয় সনের ঘটনা।

(তাবাকাতে ইবনে সা'আদ ২৩ পৃঃ)

আবু সালমা'র সারিয়া (হিজরী ২য় সন)

—"এ অভিযানের কারণ ছিল এই যে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট খবর যে খুয়াইলাদের দু'পুত্র তাল্হা ও সালামাহ্ তাদের সহগোত্রীয় ও অন্যান্য গোত্রের অনুগত লোকদের নিয়ে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাত্রা করেছে।" (ইবনে সা'আদ—৩৫)

সুফিয়ান ইবনে খালেদের হত্যার উদ্দেশ্যে—আবদুল্লাহ্ ইবনে উনাইসের সারিয়া (হিজরী ৩য় সন)

—"আবদুল্লাহ্ ইবনে উনাইসের অভিযান এ জন্যে প্রেরিত হয় যে হযরত রসূল (সাঃ) সংবাদ পান যে সুফিয়ান ইবনে খালেদ হযরত রসূল (সাঃ)-এর বিপক্ষে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য নিজের গোত্রের ও বাইরের লোকদের সমবেত করেছে।"

গযওয়াহ্ যাতুর—রুকা ঃ (হিজরী ৫ম সন)

—"এক গুপ্তচর এসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাহাবীদের (রাঃ) সংবাদ দিল যে আন্মার ও সালাবাহ্ গোত্রদ্বয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য সমবেত করেছে।"

গযওয়াহ্ দুমাতুল যনদল ঃ (হিজরী ৫ম সন)

—"বর্ণনাকারিগণ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছাল যে দুমাতুল যন্দল নামক স্থানে এক বিরাট শত্রুসেনা সমবেত হয়েছে। তারা মদীনা অভিমুখে এগুবার পরিকল্পনা করছে।" (তাবাকাতে ইবনে সা'আদ, ৪৪ পৃঃ)।

গযওয়াতু মোরাইসী ঃ (হিজরী ৫ম সন)

—"বনূ মুসতালাক গোত্র ছিল বনূ খুযা'আহ্ গোত্রের শাখা-গোত্র। এরা বনূ মুদলাজের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। তাদের নেতা ও গোত্রপ্রধান ছিল হারেস ইবনে আবু যেরার। সে তার স্বগোত্রীয় লোকদের নিয়ে রওয়ানা হল এবং অন্যান্য গোত্রকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার জন্য আহ্বান করল। তারা তার আহবানে সাড়া দিল।" (ইবনে সা'আদ ৪৫ পৃষ্ঠা)

ফিদক অভিমুখে সারিয়া অভিযান ঃ (হিজরী ৬ষ্ঠ সন)

—"রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সংবাদ পেলেন যে বনূ সা'আদ গোত্রের লোকেরা খয়বরের ইহুদীদের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ফিদক নামক স্থানে সমবেত হয়েছে।" এ জমায়েত বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে একটি সারিয়া প্রেরণ করা হয়।

বাসীর ইবনে সা'আদের সারিয়া

(হিজরী ৭ম সন, শাওয়াল মাস)

"হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) সংবাদ পেলেন যে গাতফান গোত্রের একদল লোক জেনাব নামক স্থানে সমবেত হয়েছে এবং ওয়াইনাহ্ ইবনে হাসান কসম করেছে যে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর হামলা করবে।" এদের ছত্রভঙ্গ করার লক্ষ্যেও একটি সারিয়া বা অভিযানকারী দল প্রেরণ করা হয়েছিল।

আমর ইবনে আসের সারিয়া

(হিজরী ৮ম সন)

"রসূলুল্লাহ (সাঃ) সংবাদ পেলেন যে খুযা'আহ্ গোত্রের একদল লোক তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে আট মনযিল দূরে অবস্থিত যাতু-সালাসিল নামক স্থানে সমবেত হয়েছে।" এদের বিরুদ্ধে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আমর ইবনুল আসাকে একটি সৈন্যবাহিনীসহ প্রেরণ করা হয়েছিল।

কোরাইশদের ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

সহীহ্ বোখারী গ্রন্থের বরাত দিয়ে আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে কোরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের সূচনা হবার পূর্বে আবু জাহ্ল হযরত মা'আয আনসারীকে বলেছে, "তোমরা যদি মোহাম্মদ (সাঃ)-কে বিতাড়িত না কর, তবে তোমরা কাবাগৃহ্ প্রদক্ষিণ করতে পারবে না।" মা'আয (রাঃ) তদুত্তরে বলেছিলেন, "তোমরা যদি আমাদের কাবাগৃহে আসতে বাধা দাও, তবে আমরা তোমাদের সিরিয়ার বাণিজ্যপথ বন্ধ করে দেব।" কেননা, মক্কা থেকে সিরয়াভিমুখী কাফেলার যাতায়াতের পথেই মদীনা অবস্থিত।

কাবাগৃহ্ মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী উপাসনাকেন্দ্র। কেননা, কাবাগৃহ্ যিনি নির্মাণ করেছিলেন মুসলমানরা তাঁর দ্বীনের (ইবরাহীমী দ্বীনের) অনুসারী। এতদ্‌সত্ত্বেও কোরাইশরা মুসলমানদের হজ ও ওমরা পালনে সম্পূর্ণরূপে বিরত রেখেছিল। এমতাবস্থায় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ বন্ধ করে দেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না, যাতে তারা অনন্যোপায় হয়ে মুসলমানদের কাবাগৃহে গমনের অনুমতি দিতে বাধ্য হয়। সারিয়াসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে অধিকাংশ জীবনচরিতকার লিখেছেন, এজন্য সৈন্য প্রেরণ করা হয়েছিল অথবা স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) অভিযানে গিয়েছিলেন, যাতে কোরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে বাধা প্রদান করা যায়। এ সমস্ত অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল তাই। কিন্তু যেহেতু কেরাইশরা বাণিজ্য যাত্রার সময়েও সশস্ত্র অবস্থায় যাত্রা করত এবং

কমপক্ষে দু'একশ' লোকের একটি দল রওয়ানা হত, তাই তাদের বাধা দিতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে সংঘর্ষও বেধে যেত এবং যখন কোরাইশরা পরাজিত হয়ে পলিয়ে যেত, তখন তাদের তেজারতী অর্থ-সম্পদ গনীমতের মাল হিসাবে মুসলমানদের হস্তগত হত। জীবনচরিতকারগণ ভুলক্রমে এ সমস্ত ঘটনাকে এমন ধাঁচে লিখেছেন, যাতে মনে হয় যে এ সমস্ত অভিযানের আসল উদ্দেশ্যই ছিল বাণিজ্যিক কাফেলার ব্যবসাজাত দ্রব্যসামগ্রী লুট করা।

এ সমস্ত বাধা-প্রতিবন্ধকতার ফলেই শেষ পর্যন্ত কোরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। যার ফলে, কতকগুলো বিধিনিষেধসহ মুসলমানগণ হজের অনুমতি লাভ করেন।

বাণিজ্যিক কাফেলার গতিপথ রুদ্ধ করায় কোরাইশদের উপর এমন সকল প্রতিক্রিয়া হয় যে হযরত আবুযর গিফারী মক্কায় যখন তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন এবং কোরাইশরা এ অপরাধে[১] তাঁকে নির্যাতন করতে শুরু করে তখন হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন, গিফারী গোত্র তোমাদের বাণিজ্যপথে বসবাস করে। তোমাদের এ আচরণে রুষ্ট হয়ে তোমাদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে তারা বাধা দান করতে পারে। তার একথায় খুব কাজ হয়। তারা ভীত হয়ে আবুযর (রাঃ)-কে ছেড়ে দেয়। হুদায়ইবিয়ার সন্ধির পর কোরাইশদের ইচ্ছা-মাফিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে মক্কার নও-মুসলিমদের কেউ মদীনায় গেলে তাকে ফেরত দিতে হবে। তখন মক্কার নও-মুসলিমগণ মক্কা থেকে পালিয়ে সিরিয়ার বাণিজ্যপথে এক স্থানে তাঁদের আশ্রয়স্থল করে নিলেন। তাঁরা কোরাইশদের বাণিজ্যপথের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করলেন। শেষ পর্যন্ত কোরাইশরা মেনে নিল যে নও-মুসলিমরা মক্কা থেকে মদীনায় গেলে তাদের কোন আপত্তি নেই। এরপর পরবর্তী বছর তারা মুসলমানদের জন্য হজ ও ওমরাহ্ পালনের অনুমতিও দিয়ে দিল। অতঃপর আর কোনদিন মুসলমানরা কোরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলার উপর হামলা চালাননি। বরং মুসলমানরা নিজেরাই তার রক্ষাকল্পে সৈন্য প্রেরণ করতেন।

শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে আরবের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কোথাও শান্তি ও নিরাপত্তা ছিল না। গোত্রপরম্পরায় যুদ্ধ লেগেই থাকত। এমন কি, সম্মানিত (হারাম) মাসগুলোতেও আরবেরা নানা রকম ছল-ছুতায় অন্য মাসের সঙ্গে নাম পরিবর্তন করে যুদ্ধ অব্যাহত রাখত। ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন নিরাপত্তা ছিল না। বাণিজ্যিক কাফেলা লুট করা অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল।

---

১. ফতহুল বারী, ৮ম খণ্ড ৭৬১ পৃঃ।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা কেবলমাত্র ওয়ায-নসীহত দ্বারা নয় বরং তাঁর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ দ্বারা সমগ্র আরবে তথা সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পাঠিয়েছিলেন। কারণ, আল্লাহ্র নিকট হত্যা ও রক্তপাত অপেক্ষা অপ্রিয় কোনকিছু নেই। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

—"এ জন্য আমি বনী ইসরাঈলকে লিখে দিয়েছিলাম, যে ব্যক্তি কোন জীবনের বিনিময়ে অথবা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির শাস্তি ছাড়া কাউকেও হত্যা করল, সে যেন বিশ্বের সমস্ত মানুষকেই হত্যা করল।" (মায়েদা)

—"এবং যখন সে ফিরে যায়, তখন সে দেশে অশান্তি সৃষ্টির প্রয়াস পায় এবং কৃষিখামার ও বংশ ধ্বংস করে। আর আল্লাহ্ ফাসাদ পছন্দ করেন না।" (বাকারাহ্)

—"যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের শাস্তি এই যে তাদের হত্যা করা হোক, ফাঁসি দেয়া হোক, এক দিকের হাত ও বিপরীত দিকের পা কেটে দেয়া হোক অথবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা হোক।"

হাদীস শরীফে আছে, যখন হাতেম তাঈর পুত্র আদী ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন হযরত রসূল (সাঃ) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, "আল্লাহ্ তা'আলা এ কর্মকে এমনভাবে পূর্ণ করবেন যে একজন উষ্ট্র-আরোহী সান্‌আ থেকে রওয়ানা হয়ে হাজরামাউত্ পর্যন্ত ভ্রমণ করবে এবং তার মনে আল্লাহ্র ভয় ছাড়া আর কারও ভয় থাকবে না।" হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, "আমি স্বচক্ষে দেখেছি যে একজন মহিলা কাদেসিয়া থেকে (মক্কায়) হরম পর্যন্ত ভ্রমণ করত কিন্তু তার মনে কোন ভয়ভীতির সঞ্চার হত না।" এ হল সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থের ভাষ্য। সহীহ্ বোখারী গ্রন্থে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা এ কাজকে এমনভাবে পূর্ণ করবেন যে একজন স্ত্রীলোক কাদেসিয়া থেকে রওয়ানা হবে এবং এসে কাবা যেয়ারত করবে অথচ তার মনে আল্লাহ্ ছাড়া কারও প্রতি ভয়ের উদ্রেক হবে না। হযরত আদী (রাঃ) বলেন, আমি নিজ চোখে দেখেছি যে একজন স্ত্রীলোক কাদেসিয়া থেকে রওয়ানা হয়ে হরম শরীফ পর্যন্ত সফর করত এবং তার মনে কোন ভীতির সঞ্চার হত না।

অনেক ঘটনা রয়েছে যা জীবনচরিতকারগণ সারিয়াহ্ অভিযান বলে গণ্য করেছেন। সবগুলো কেবলমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা ও সার্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্যে ছিল। আমরা এখানে তার, দু'তিনটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি।

সারিয়া যায়েদ ইবনে হারেসা

হিজরী ৬ষ্ঠ সনে হযরত যায়েদ (রাঃ) বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে সিরিয়া গমন করেন। যখন তিনি 'ওয়াদীয়ে কুরা'র নিকটে পৌছালেন, তখন বনু ফাযারাহ্ গোত্রের লোকেরা তাঁকে মারধর করে মাল-আসবাব ছিনিয়ে নিয়ে গেল। হযরত রসূল (সাঃ) বিষয়টি তদারকের জন্যে এক ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করলেন। তাঁরা তাদের সমুচিত শাস্তি দিলেন।[১]

এ বছরেই হযরত রসূল (সাঃ) দাহিয়া কলবীকে (রাঃ) পত্রসহ রোম সম্রাট কাইসারের নিকট পাঠালেন। সিরিয়া থেকে ফেরার পথে যখন তিনি 'হুমা' নামক স্থানে পৌছলেন, তখন জনৈক হুনাইদ কয়েক ব্যক্তি সহযোগে তাঁকে আক্রমণ করে যথাসর্বস্ব ছিনিয়ে নিল। এমন কি, তাঁর পরিধেয় জীর্ণ-পুরাতন বস্ত্রখণ্ড ছাড়া সবই কেড়ে নিল। হযরত রসূল (সাঃ) এ ঘটনা তদারকের জন্যে যায়েদ (রাঃ)-কে প্রেরণ করলেন।

সারিয়্যাহ্ দুমাতুল জন্দল্

চতুর্থ হিজরীতে হযরত রসূল (সাঃ)-এর নিকট সংবাদ এল যে মদীনা থেকে পনর মন্যিল দূরে দুমাতুল জন্দল নামক স্থানে এক বড় দস্যুদল সমবেত হয়েছে। তারা ব্যবসায়ীদের উপর অত্যাচার করে। তাদের শায়েস্তা করার জন্যে খোদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখানে পৌছালেন। হযরতের অভিযানের সংবাদ পেয়ে দুষ্কৃতকারীরা বিক্ষিপ্ত হয়ে আত্মগোপন করল। তিনি কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করলেন এবং এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চারদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করলেন।

'খবতে'র বা 'সাইফুল বাহ্‌রের' সারিয়্যা অভিযান

শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্যে হযরত রসূল (সাঃ)-এর এ শুদ্ধি অভিযান যে কেবলমাত্র মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তির পর কোরইশ-কাফেরদের বাণিজ্যিক কাফেলাকেও এমনিভাবে হেফাযত করা হত। হিজরী অষ্টম সালে কোরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া হতে প্রত্যাবর্তন করছিল। পথে 'জুহাইনা' গোত্র সম্পর্কে তাদের ভয় ছিল। হযরত রসূল (সাঃ) আবু 'ওবায়দা ইবনে আলজাররাহের নেতৃত্বে তিনশ' মুসলমানের এক বাহিনীকে তাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য পাঠালেন। এ বাহিনীতে হযরত ওমরও (রাঃ)

১. তাবাকাতে ইবনে সা'আদ মাগাযী খণ্ডে সারিয়া খবত।

অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুসলমানেরা মদীনা থেকে ৫ দিনের দূরত্ব সফর করলেন। তাঁরা এত স্বল্প রসদযোগে এ অভিযান পরিচালনা করেছিলেন যে এক-একটি খোরমা দ্বারা এক-একটি দিন কাটাতে হয়েছিল।[১]

সহীহ্ মুসলিম গ্রন্থে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন রাবী এ সারিয়্যা'র উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। এ রেওয়াতের মূল রাবী হযরত জাবের (রাঃ) খোদ এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এক বর্ণনায় আছে জুহাইনা গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে এ দল প্রেরণ করা হয়েছিল। মাগাযী গ্রন্থসমূহেও তাই উল্লেখ রয়েছে। অন্যান্য রেওয়ায়েতের ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ

(١) نتلقى عير قريش

(১) কোরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য।

(٢) نرصد عير قريش

(২) "কোরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলার প্রতি নজর রাখার জন্যে।"

এতে দৃশ্যতঃ বোঝা যেতে পারে যে এ বাহিনী প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল কোরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলা লুট করা। কিন্তু তা গুরুতর ভুল। কারণ, এটি ছিল হুদাইয়াবিয়ার সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের পরবর্তী সময়। তাই উপরোক্ত উদ্ধৃতির মর্ম হবে এই যে এ অভিযান কোরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলার হেফাযতকল্পে এবং জুহাইনা গোত্রের আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে প্রেরিত হয়। হাফেয ইবনে হাজার (রাহঃ)-ও এ মতই প্রকাশ করেছেন।[২]

গযওয়ায়ে গাবা

আরবদের দুর্ধর্ষতা, লুটতরাজ ও রাহাজানির অভ্যাস এমনি বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে বার বার কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি ভোগ করা সত্ত্বেও এ সমস্ত অপরাধমূলক কাজ ত্যাগ করত না। এমন কি, তারা মদীনার চারণভূমি 'গাবাতেও আক্রমণ চালাত। হিজরী চতুর্থ সনে ফুযারাহ্ গোত্র দুর্ভিক্ষের পড়ে। তাদের গোত্রপ্রধান ছিল উয়াইনা ইবনে হাসান। হযরত রসূল (সাঃ) দয়াপরবশ হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের এলাকাধীন চারণভূমিতে তাদের পশুচারণের অনুমতি দিলেন। কিন্তু হিজরী ৬ষ্ঠ সনে এ উয়াইনা গোত্রই মদীনার চারণভূমি 'গাবা'

---

১. ফতহুলবারী ৮ম খণ্ড ৬১ ও ৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আক্রমণ করে হযরত রসূল (সাঃ)-এর ২০টি উট লুট করে নিয়ে যায় এবং চারণভূমির তত্ত্বাবধায়ক হযরত আবুযর (রাঃ)-এর পুত্রকে হত্যা করে। জীবনচরিতকারগণ এ যুদ্ধকে 'গাবার যুদ্ধ' বলে আখ্যায়িত করেন।

গোটা আরবই যে ইসলামের শত্রুতে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং মক্কা বিজয়ের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কাফেরদের সঙ্গে যে যুদ্ধধারা জারি ছিল তার একটা প্রধান কারণ ছিল আরবদের জীবিকা অর্জনের লক্ষ্যে কৃত ডাকাতি, রাহাজানি ও হত্যা-লুণ্ঠন। ইসলাম যেহেতু এ সমস্ত দুষ্কৃতি নির্মূল করছিল, তাই আরবরা অন্য কিছুকেই ইসলাম অপেক্ষা বড় শত্রু ভাবত না।

অতর্কিত আক্রমণের কারণ

আরবের গোত্রসমূহের দু'রকম প্রকৃতি ছিল। একদল কোন বিশেষ স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করত, অন্যেরা ছিল তাঁবুতে জীবনযাপনকারী মরুচারী বেদুইন। বেদুইনদের কোন স্থায়ী বসতি ছিল না। যেখানেই তারা পানির কূপ বা ঝর্ণা পেত ও সবুজ ঘাসের সন্ধান লাভ করত সেখানেই তাঁবু খাটিয়ে বসবাস করত। সেখানকার পানি ফুরিয়ে গেলে সংবাদবাহক অন্য কোন স্থানের সংবাদ বহন করে নিয়ে আসত এবং তারা সেখানে চলে যেত। এ সমস্ত গোত্রকে আরবীতে "আস্‌হাবুল ওয়াবর্" বলা হয়। যেসব গোত্র লুটতরাজ, ডাকাতি ও রাহাজানিতে অধিকাংশ সময় লিপ্ত থাকত তারাই ছিল এ যাযাবর শ্রেণীভুক্ত। তাদের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করা ছিল অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তাদের দমন করতে সৈন্য পাঠালে তারা পাহাড়-পর্বতে আত্মগোপন করত। কোন মতেই তারা বশে আসত না। কাজেই বাধ্য হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যখন সৈন্য প্রেরণ করা হত, তখন তাদের অসতর্ক মুহূর্তে অতর্কিত আক্রমণের জন্য সৈন্য প্রেরিত হত, যাতে তারা পালিয়ে যেতে না পারে।

জীবনচরিতকারগণ অধিকাংশ সারিয়্যাহ্ অভিযানের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন যে হযরত রসূল (সাঃ) কিছু সৈন্য প্রেরণ করতেন, যারা রাত্রিবেলা যাত্রা করতেন এবং তাদের অসতর্ক মুহূর্তে অতর্কিত আক্রমণ করতেন এবং গোত্রসমূহে লুণ্ঠন করতেন। এ ধরনের বহু ঘটনা সমস্ত জীবনচরিত গ্রন্থে লিখিত আছে। আর এ সমস্ত ঘটনাপঞ্জী হতে ইউরোপীয় লেখকগণ ধারণা করে নেন যে ইসলাম শত্রুর উপর অতর্কিত আক্রমণ করা এবং লুটতরাজ করা জায়েয ঘোষণা করে। এর উপর ভিত্তি করে মার্গোলিয়থ সাহেব লিখেছেন, যেহেতু বহু দিন যাবৎ মুসলমানদের জন্য আয়-রোজগারের কোন পথ ছিল না, তাই হযরত রসূল (সাঃ) এ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন যে অসতর্ক মুহূর্তে আরব গোত্রসমূহের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাদের ধনসম্পদ লুট করে নিতেন।

কিন্তু যখন অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে যাচাই করা যায় এবং সমস্ত ঘটনাপঞ্জীকে একত্রিক করে পর্যালোচনা করা যায়, তখন প্রমাণিত হয় যে অতর্কিত হামলা সেসব গোত্রের উপরই করা হত যাদের সম্পর্কে এ সন্দেহ হত যে যদি তারা জানতে পারে, তবে পর্বতচূড়ায় অথবা অন্য কোথাও পালিয়ে যাবে। তাই কার্যত দেখা যায়, যেসব ক্ষেত্রে তারা আক্রমণের খবর পেয়েছে সে সমস্ত ক্ষেত্রে এসব লোক পালিয়ে গেছে এবং গেরিলা কায়দায় যুদ্ধবিগ্রহ অব্যাহত রেখেছে।

ইসলাম প্রচার

উপরোক্ত উদ্দেশ্য ছাড়া আর যে সমস্ত সারিয়্যাহ অভিযান প্রেরিত হয়েছিল সেগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম প্রচার। কিন্তু যেহেতু দেশে শান্তি, নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বলতে কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না এবং শত্রুরা দেশময় বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল, তাই ইসলাম প্রচারের জন্য যারা সারিয়্যায় প্রেরিত হতেন তাঁদের জীবন আশংকার সম্মুখীন থাকত।

বীরে মা'উনার সারিয়্যাহ

হিজরী ৩য় সনের সফর মাসে কেলাব গোত্রপ্রধানের আমন্ত্রণক্রমে ৭০ জন ইসলাম প্রচারককে পাঠানো হয়। কিন্তু মা'উনা নামক কূপপ্রান্তে রা'আল ও যাকওয়ান গোত্রের হাতে তাঁরা সবাই শহীদ হন। কেবলমাত্র একব্যক্তি রক্ষা পান এবং মদীনায় এসে দুর্ঘটনার সংবাদ পৌছাতে সক্ষম হন।

সারিয়্যাহয়ে, মুরসাদ

এ একই সময়ে আদল ও কারাহ্ নামক গোত্রদ্বয় তাদের ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান শিক্ষা দেয়ার জন্যে কিছু লোক পাঠানোর আবেদন জানায়। মহানবী (সাঃ) হযরত আসেম, খুবাইব, মুরসাদ ইবনে আবু মুরসাদ প্রমুখ দশজন সাহাবী (রাঃ)-কে এতদুদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলেন। রাজী নামক স্থানে পৌছলে বনূ লেহ্ইয়ানের লোকেরা তাঁদের একজন ব্যতীত সবাইকে শহীদ করে দিল। হিজরী ৬ষ্ঠ সনে বনূ লেহইয়ান গোত্রকে শাস্তি প্রদানের জন্য অভিযাত্রীদল গিয়ে বিফল হলেন। আভাস পেয়ে তারা পূর্বেই পালিয়ে যায়।

ইবনে আবু'ল আওজার অভিযান

হিজরী ৭ম সনে হযরত রসূল (সাঃ) পঞ্চাশ সদস্যবিশিষ্ট এক ইসলাম প্রচারকদলকে বনূ সুলাইম গোত্রের প্রতি পাঠালেন। তাঁরা বনূ সুলাইম গোত্রকে

ইসলাম গ্রহণে আহ্বান জানান। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রচারকদলের প্রতি তীরবর্ষণ শুরু করে। তাঁরাও যুদ্ধ করলেন। কিন্তু এ অসম যুদ্ধে দলপতি আবু'ল 'আওজা' ছাড়া সবাই শাহাদতবরণ করলেন।

কা'আব ইবনে 'উমাইরের অভিযান

হিজরী অষ্টম সনের রবিউল আউয়াল মাসে হযরত রসূল (সাঃ) কা'ব ইবনে 'উমাইর গিফারী (রাঃ) সহ পনেরজনের এক দলকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্যে যাতুল আতলাহ্ অভিমুখে প্রেরণ করলেন। এ জায়গাটি সিরিয়া সীমান্তে ওয়াদীয়ে কুরা'র নিকটে অবস্থিত। তাঁরা সেখানে পৌঁছে স্থানীয় অধিবাসীদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা তীর ও তলোয়ার দ্বারা এর জওয়াব দিল। শেষ পর্যন্ত এ দলেরও এক ব্যক্তি ছাড়া সবাই শহীদ হলেন। যিনি আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হলেন তিনি মদীনায় এসে এ দুঃসংবাদ জানান। এসব কারণেই ইসলাম প্রচারের জন্য যে সমস্ত সারিয়্যাহ বা অভিযান পাঠানো হত তার অধিকাংশের সঙ্গেই ইসলাম প্রচারকদের হেফাযতকল্পে কিছু সৈন্য পাঠানো হত। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সেনানায়কদের পরিষ্কার বলে দেয়া হত, যে তোমাদের কেবলমাত্র ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যেই পাঠানো হচ্ছে, যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে নয়। উদাহরণত মক্কা বিজয়ের পর যখন হযরত রসূল (সাঃ) খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ)-কে ৩০ ব্যক্তি সহকারে বনূ জুযাইমা অভিমুখে পাঠালেন, তখন পরিষ্কার বলে দিলেন যে "ইসলাম প্রচারই একমাত্র উদ্দেশ্য, যুদ্ধ করা নয়।" জগদ্বরেণ্য ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদ তাঁর তাবাকাত্ গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"হযরত রসূল (সাঃ) খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ)-কে বনূ জুযাইমা অভিমুখে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্যে পাঠিয়েছিলেন, যুদ্ধ করার জন্যে নয়।"

আল্লামা তাবারী এ মর্মে তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

—"রসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলামের দাওয়াত দেয়ার লক্ষ্যে সারিয়্যাসমূহ পাঠিয়েছিলেন। তাদের যুদ্ধ করার নির্দেশ দেননি।"

এতদসত্ত্বেও হযরত খালেদ (রাঃ) তরবারী ব্যবহার করেন। হযরত (সাঃ) এ সংবাদ শোনামাত্র দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং কেবলামুখী হয়ে তিন-তিনবার উচ্চারণ করলেন, "হে আল্লাহ্! খালেদ যা কিছু করেছে আমি তার জিম্মাদার নই।" অতঃপর তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে পাঠালেন। তিনি সেখানে গিয়ে প্রতিটি শিশু এমন কি, কুকুরের পর্যন্ত রক্তপণ পরিশোধ করলেন এবং এজন্য অতিরিক্ত অর্থ দান করলেন[১]। এ ঘটনা বিভিন্ন ভাষায় হাদীসের কেতাবসমূহে বর্ণিত রয়েছে।

---

১. তারীখে তাবারী ৩য় খণ্ড ১৬৫১ পৃঃ।

অনুরূপভাবে হযরত (সাঃ) যখন ১০ম হিজরীতে তিনশ' অশ্বারোহী সৈন্যসহ হযরত আলীকে (রাঃ) ইয়ামন অভিমুখে পাঠান তখন বলেন ঃ

—"তোমরা সেখানে পৌঁছালে তারা তোমাদের উপর আক্রমণ না করা পর্যন্ত তাদের উপর আক্রমণ করবে না। ("ইবনে সা'আদ, মাগাযী, পৃঃ ১২২)

মক্কা বিজয়ের পর মূর্তি উৎখাতের উদ্দেশে যে সমস্ত অভিযান পাঠানো হয়েছিল সেগুলো এ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ, সমস্ত আরব জাহানে ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেবমন্দির নির্মিত ছিল। মক্কা বিজয়ের পর যখন সাধারণভাবে সমস্ত গোত্র ইসলাম গ্রহণ করল, তখন সেসব মন্দিরে অবস্থিত মূর্তিসমূহের প্রতি তাদের মধ্যে যে অজ্ঞতাসুলভ ভয়, ভক্তি, সম্মানবোধ ও পূজার মনোভাব বিদ্যমান ছিল না, তা কোন কোন গোত্র থেকে সঙ্গে সঙ্গেই দূরীভূত হল না। তখন যদিও তাঁরা সেসব মূর্তিকে এবাদতের যোগ্য মনে করত না, তবুও সে সমস্ত মূর্তির প্রতি উত্তরাধিকারসূত্রে তাদের মনে যে ভীতি ও শ্রদ্ধাবোধ বদ্ধমূল ছিল, তাতে তাদের এতখানি সাহস হত না যে নিজ হাতে সেসব মিথ্যা উপাসনা কেন্দ্রকে ধ্বংস করে। কোন কোন মূর্খের ধারণা ছিল যে এসব পবিত্র প্রস্তরমূর্তির এক কণাও যদি অপসারণ করা হয়, তবে আকাশ ভেঙে পড়বে, ধরণী দ্বিধাবিভক্ত হবে, বালামুসিবতের বন্যা বয়ে যাবে।

তায়েফবাসীরা হযরত রসূল (সাঃ)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণের সময় শর্ত আরোপ করেছিল যাতে তাদের দেবমন্দিরগুলো এক বছর পর্যন্ত ধ্বংস না করা হয়। হযরত রসূল (সাঃ) তা অগ্রাহ্য করলে তারা দ্বিতীয় শর্ত পেশ করল যে অন্তত নিজ হাতে তারা সেগুলো ধ্বংস করতে পারবে না। অন্যান্য আরও অনেক নও-মুসলিম গোত্রই এ দায়িত্বপালনে শংকাবোধ করত। সুতরাং এসব স্থানে কিছুসংখ্যক দৃঢ় আকীদা, সুস্থ বিবেক ও সঠিক বোধসম্পন্ন মুসলমানকে তাদের তরফ থেকে এ দায়িত্ব পালনের জন্য পাঠানো হত। সেমতে 'উয্যার মন্দির ভাঙার জন্য খালেদ ইবনে ওয়ালিদের সারিয়্যা, সু'আ মন্দির ভাঙার জন্য আমর ইবনে আসের সারিয়্যা, মানাত মন্দির ধ্বংসের জন্য সা'আদ ইবনে যায়েদ আশ্‌হালীর সারিয়্যা, লাতের মন্দির ধ্বংসের জন্য আবু সুফিয়ান ও মুগিরাহ্ ইবনে শাইবার সারিয়্যা, যিল্‌-খালসার মন্দির ভাঙ্গার জন্য জারীরের সারিয়্যা[১] যিল-কাফফাইন নামক মন্দির ধ্বংসের জন্য তুফাইল ইবনে আমর দাওসীর সারিয়্যা এবং ফাল্‌স্ মন্দির ধ্বংসের জন্য "আলী ইবনে আবু তালিবের সারিয়্যা প্রেরিত হয়।[২]

১. সহীহ্ বোখারী গযওয়াহ্ যিলখালসাহ্।
২. এ অধ্যায়ের সমস্ত ঘটনা ইবনে সা'আদের মাগাযী অধ্যায় হতে গৃহীত।

সমর সংস্কার

মানুষের সমস্ত কর্মের নিকৃষ্ট প্রতিবিম্ব হল যুদ্ধ। আরবের যুদ্ধ তো ছিল অন্যায়-অত্যাচার, পশুত্ব, নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীনতা ও হিংস্রতার বন্য উল্লাস। কিন্তু হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অলৌকিক ক্ষমতাবলে এ যুদ্ধই তার সমস্ত দোষত্রুটি মুক্ত হয়ে মানবিক কর্তব্যে পরিণত হল।

কোন দেশে যখন হাজার হাজার বছর ধরে উত্তরাধিকারসূত্রে জুলুম-নিপীড়ন ও হত্যা-লুটের প্রথা চলে আসে, তখন সভ্য হতে সভ্যতর দেশের পক্ষেও সাময়িকভাবে আদিম নিয়মরীতি ও পুরাতন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকে এ পদ্ধতিটিকে "যার মাধ্যমে রোগ সৃষ্টি তারই মাধ্যমে চিকিৎসা"— অন্য কথায় "কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা" বলা যেতে পারে। ইসলামের সূচনালগ্নে কয়েকটি আক্রমণাত্মক যুদ্ধ প্রসংগে পূর্ব প্রচলিত রীতিপদ্ধতির ব্যবহার দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ জাহেলিয়াত যুগের নিয়ম ছিল যে শত্রুর অসতর্ক মুহূর্তে অতর্কিত হামলা করা এবং হত্যা ও বন্দী করা। পরে ইসলাম এ প্রথা তুলে দেয়। কিন্তু প্রথম থেকেই যদি এ পন্থা অবলম্বন করা হত, তাহলে ফল দাঁড়াত এই যে শত্রু সর্বদাই আকস্মিক ও অতর্কিত আক্রমণ করে মুসলমানদের হত্যা করত, কিন্তু মুসলমানরা এর প্রতিকারস্বরূপ তাদের কিছুই করতে পারতেন না। কোন প্রতিকার করতে চাইলেও প্রথমেই শত্রুকে যদি সংবাদ দিতেন, সংবাদ পেয়ে তারা কোথাও সরে পড়ত অথবা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে নিত। কিন্তু ইসলাম যতই শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে ততই পুরাতন পদ্ধতি অবলুপ্ত হতে থাকে। পরিশেষে একে একে প্রাচীন সব রীতিনীতি অবলুপ্ত হয়ে যায়।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে যুদ্ধের যে সমস্ত নিয়মপদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং যে ধরনের হিংস্র আচরণ করা হত উপরে তার বিস্তারিত বিরবণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সেসব বিবরণের আলোকে তুলনামূলকভাবে যাচাই করে দেখা যেতে পারে যে ইসলাম কি কি সংস্কার সাধন করেছে! ইসলাম যুদ্ধে বৃদ্ধ নারী শিশু অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকবালিকা, চাকর ও সেবকদের হত্যা করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। হযরত রসূল (সাঃ)-এর নিয়ম ছিল যে তিনি যখন কোন অভিযানে সৈন্য পাঠাতেন তখন সেনাবাহিনীর অধিনায়ককে যে সমস্ত নির্দেশ প্রদান করতেন তন্মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় নির্দেশ এটাও থাকত। সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে এ আদেশ নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

—"কোন অথর্ব বৃদ্ধকে, কোন শিশুকে, কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকবালিকাকে এবং কোন স্ত্রীলোককে হত্যা করো না।"

গয্ওয়াহ্সমূহে কদাচিৎ হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর চোখে কখনো কোন নারীর লাশ পড়লে তিনি অতি কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। সহীহ্ মুসলিম গ্রন্থে এ মর্মে বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে নিয়ম ছিল যে শত্রুকে বন্দী করতে পারলে তাকে কোনকিছু দ্বারা বেঁধে তীরের নিশানা বানানো হত অথবা তরবারির আঘাতে হত্যা কর হত। আরবী ভাষায় এ পদ্ধতিকে 'সবর' বলা হত। হযরত রসূল (সাঃ) কঠোরভাবে এ প্রথার উচ্ছেদ সাধন করেন।

একদিন হযরত খালেদ (রাঃ)-এর পুত্র আবদুর রহমান (রাঃ) এক যুদ্ধে কতিপয় লোককে বন্দী করে এনে অনুরূপভাবে হত্যা করেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) শুনে বললেন, "আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এরূপ আচরণ সম্বন্ধে নিষেধ করতে শুনেছি। আল্লাহ্র কসম এভাবে একটি মোরগ মারাও আমি নাজায়েয মনে করি।" আবদুর রহমান (রাঃ) তৎক্ষণাৎ গুনাহের কাফফারাস্বরূপ চারজন ক্রীতদাস মুক্ত করে দিলেন।

যুদ্ধে চুক্তি ও কসমের কোন মূল্য ছিল না। মা'উনা প্রভৃতি যুদ্ধে কাফেররা মুসলমানদের সঙ্গে এমনি আচরণ করেছিল। অর্থাৎ, কসম করে কথা দিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যায় এবং হত্যা করে। কোরআন মজীদে এ সমস্ত ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

—"ওরা মুসলমানদের সম্পর্কে কোন কসম বা যিম্মাদারীর গুরুত্ব দেয়নি। প্রকৃতপক্ষে তাদের কসম কোন কসমই নয়।"

হযরত রসূল (সাঃ) চুক্তি রক্ষার জন্য সর্বদা কঠোর তাগিদ দিতেন। কোরআন মজীদেও এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ও পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যামানায় চুক্তি রক্ষার অনেক চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

হযরত রসূল (সাঃ) যখন হিজরত করে মদীনায় চলে যান, তখন অনেক সাহাবীকেই নিরুপায় অবস্থায় মক্কাতে অবস্থান করতে হয়। তাদের মধ্যে হুযাইফা ইবনে ইয়ামান ও তাঁর পিতাও ছিলেন। বদরের যুদ্ধের সময় হুযাইফা ইবনে ইয়ামান ও তাঁর পিতা মদীনার পথে রওয়ানা হয়েছিলেন। কাফেররা তাঁদের ধরে ফেলে এবং বলে, "তোমরা মদীনায় গিয়ে আবার আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসবে!" তাঁরা বললেন, "আমাদের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মদীনা গমন।" কাফেররা তাঁদের কাছ থেকে কসম নিয়ে ছেড়ে দিল। তাঁরা বদর প্রান্তরে হযরত রসূল (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলেন এবং তাঁকে কাফেরদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে ব্যস্ত দেখে নিজেরাও তাতে যোগদানের আকাঙ্খা প্রকাশ করলেন। হযরত রসূল (সাঃ) তাদের এ বলে বিরত রাখলেন যে "তোমরা যুদ্ধ না করার কসম করেছ। সুতরাং এ যুদ্ধে শরীক হওয়া তোমাদের পক্ষে ঠিক হবে না।

আবু রাফে' (রাঃ)-কে কোরাইশরা হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে দূত হিসাবে পাঠিয়েছিল। হযরতের খেদমতে হাযির হলে তাঁর উপর এমন প্রভাব পড়ল যে তিনি মুসলমানই হয়ে গেলেন। নিবেদন করলেন, "এখন আর আমি কাফেরদের কাছে ফিরে যাব না।" হযরত (সাঃ) বললেন, "তুমি দূত। দূতকে আটকে রাখা চুক্তির খেলাফ। এখন ফিরে যাও, পুনরায় এসো।"[১]

হুদাইবিয়ার সন্ধিলগ্নে যখন আবু জন্দল (রাঃ) পায়ে শেকল বাঁধা অবস্থায় হাযির হয়ে দেহে কোরাইশদের পৈশাচিক অত্যাচারের চিহ্নগুলো মহানবীর সামনে তুলে ধরলেন, তখন তিনি বললেন, "কিন্তু কোরাইশদের সঙ্গে আমার চুক্তি হয়েছে যে কোন মুসলমান মক্কা থেকে পালিয়ে এলে আমরা তাকে কোরাইশদের কাছে ফিরিয়ে দেব।" একথা শুনে আবু জন্দল (রাঃ) সমস্ত মুসলমানকে উদ্দেশ্য করে কাঁদতে লাগলেন। সাহাবায়ে কেরাম উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়লেন। দৃশ্যটি সবার জন্যই অসহনীয় হয়ে উঠল। হযরত ওমর (রাঃ) অস্থির হয়ে পড়লেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত রসূল (সাঃ)–এর খেদমতে বার বার উপস্থিত হতে লাগলেন। এসব কিছুই হযরত (সাঃ) লক্ষ্য করছিলেন। কিন্তু চুক্তির মূল্য সর্বপ্রকার ভয়ভীতি ও সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে। কাজেই পায়ে শেকল রেখেই আবু জন্দলকে ফিরে যেতে হল।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে দূতকে হত্যা করা নিষিদ্ধ ছিল না। হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তির পূর্বে হযরত (সাঃ) কোরাইশদের প্রতি যে দূত পাঠিয়েছিলেন কোরাইশরা তাঁর বাহন উটটিকে মেরে ফেলল এবং তাঁকেও হত্যা করতে উদ্যত হল। কিন্তু বহিরাগতরা তাঁর জীবন রক্ষা করলেন।

হযরত নবী-করীম (সাঃ) নির্দেশ দিলেন যে দূতকে যেন কখনো হত্যা করা না হয়। মুসাইলামা যখন দূত পাঠায় এবং সে এসে ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করে তখনো হযরত (সাঃ) একথাই বললেন যে "দূতকে হত্যা করা বিধিসম্মত নয়, নতুবা তোমাকে হত্যা করা হত।" ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে সেদিন থেকে এটা আইনে পরিণত হল দূতকে হত্যা করা যাবে না।

---

১. সুনানে আবু দাউদ, ২য় খণ্ড ২৩ পৃঃ।

যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে আরবরা অত্যন্ত নৃশংস আচরণ করত। শুধু আরবরাই কেন সমস্ত জাতিই যুদ্ধবন্দীদের প্রতি অনুরূপ নির্মম আচরণ করত। ক্রুসেডের যুদ্ধসমূহে ইউরোপীয় খৃষ্টানরা যখন মুসলমানদের বন্দী করত তখন তাঁদের দ্বারা পশুদের ন্যায় কাজ করিয়ে নিত।

'আল্লামা' ইবনে জুবাইর (রাহঃ) একটি ক্রুসেড যুদ্ধ চলাকালে সিসিলি গিয়েছিলেন। তিনি যুদ্ধবন্দীদের প্রতি এমন নির্মম আচরণ দেখে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। এ মর্মে তিনি লিখেছেন ঃ

— "এ সমস্ত শহরে সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক যে অবস্থা দৃষ্ট হয়, তা মুসলমান যুদ্ধবন্দীদের দুরবস্থা তাদের হাতে-পায়ে বেড়ি দেয়া অবস্থায় দেখা যায়। তাদের দ্বারা কঠোর পরিশ্রমের কাজ করানো হয়। অনুরূপভাবে মুসলমান মহিলা যুদ্ধবন্দীদের দ্বারা পায়ে লোহার কড়া পরিহিত অবস্থায় কঠোর পরিশ্রম করানো হয়। এ মর্মবিদারক দৃশ্য দেখে অন্তর ফেটে যায়।"[১]

হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে তাকিদ দিয়েছেন, যেন তাদের কোনরূপ কষ্ট না হয়! বদরের যুদ্ধবন্দীদের যখন হযরত (সাঃ) সাহাবাদের হাতে সমর্পণ করেন, তখন যাতে তাদের পানাহারের কোনরূপ কষ্ট না হয় সে সম্পর্কে তাঁদের কড়া হুকম দিয়েছিলেন। অতএব, সাহাবায়ে কেরাম নিজেরা খেজুর খেয়ে জীবনযাপন করতেন, কিন্তু বন্দীদের উপযুক্ত খাদ্য প্রদান করতেন। হুনাইনের যুদ্ধে ছয় হাজার যুদ্ধবন্দী ছিল, সবাইকে মুক্তি দেয়া হয়। হযরত (সাঃ) তাদের পরার জন্য মিসরে প্রস্তুত ছয় হাজার প্রস্থ কাপড় দান করেন। ইবনে সা'আদ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

হাতেম তাঈর কন্যা যখন বন্দী হয়ে আসে, তখন হযরত নবী করীম (সাঃ) তাঁকে অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে মসজিদের একপাশে স্থান করে দিয়ে বললেন, "তোমাদের শহরের কোন লোক এলে আমি তাদের সঙ্গে তোমাকে বিদায় দেব।"

অতএব, কয়েকদিন পর সফরের পাথেয় সংগ্রহ করে এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁকে ইয়ামনে পাঠিয়ে দিলেন।

কোরআন মজীদে যেখানে আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাদের কথা উল্লেখ রয়েছে, সেখানে তাঁদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

—"আর এ সমস্ত লোক আল্লাহর মহব্বতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মিসকীন, এতীম ও বন্দীদের খাদ্য দান করে।"

---

১. রেহ্লাহ্-বিন-জুবাইব (লিডন প্রকাশনী ১৯০৭ পৃঃ)৩০৭ পৃঃ।

জাহেলিয়াত যুগে নিয়ম ছিল যে কোন সেনাবাহিনী যখন কোন কওমের উপর আক্রমণ করত, তখন চারদিকে বহু দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সৈন্য ছড়িয়ে পড়ত। ফলে লোকদের বাড়ি যাতায়াত কষ্টকর হয়ে পড়ত এবং পথচারীদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠিত হত। এক যুদ্ধে পূর্ব প্রথানুযায়ী সৈন্যগণ অনুরূপ আচরণ করল। হযরত নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করে দিলেন, যে ব্যক্তি এ ধরনের আচরণ করবে তার জেহাদ জেহাদ নয়।

সুদানে আবু দাউদে হযরত মা'আয্ ইবনে আনাস্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

—"আমি হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে অমুক যুদ্ধে গিয়েছিলাম, সৈন্যরা শত্রুপক্ষের লোকদের বাসস্থানে গিয়ে তাদের উত্ত্যক্ত করল এবং লুট-তরাজ করল, হযরত নবী করীম (সাঃ) এক ব্যক্তিকে পাঠালেন। সে ঘোষণা করল, যে ব্যক্তি লোকদের উত্ত্যক্ত করবে এবং লুটতরাজ করবে তার জেহাদ কবুল হবে না।[১]

সুনানে আবু দাউদে আছে, যখন হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ নির্দেশ দিলেন যে সৈন্যরা যেন এদিক-সেদিক ছড়িয়ে না পড়ে, তখন অভিযাত্রীদল এমনভাবে গুটিয়ে আসল যে যদি একটা চাদর টাঙিয়ে দেয়া হত, তবে সমস্ত লোক চাদরের নিচেই এসে যেতে পারত।[২]

সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাপার ছিল এই যে গনীমতের মালের প্রতি মানুষের এমন মোহ্ ছিল যে যুদ্ধবিগ্রহের সর্বাপেক্ষা বড় কারণ ছিল এটাই। এর সংস্কার সাধনের জন্যে অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে এগুতে হয়েছিল। জাহেলিয়াতের যুগে গনীমত অত্যন্ত প্রিয় বস্তু ছিল। আশ্চর্যের বিষয় যে ইসলামী আমলেও অনেকদিন একে সওয়াবের বিষয় বলে গণ্য করা হত। সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে আছে, এক ব্যক্তি হযরত নবী করীম(সাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ

—"এক ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদ করতে চায়, কিন্তু একই সঙ্গে কিছু পার্থিব সুবিধা লাভের আকাঙ্ক্ষাও পোষণ করে।" হযরত (সাঃ) বললেন, "তার কোন সওয়াব মিলবে না।" লোকেরা এতে আশ্চর্যবোধ করলেন এবং সে ব্যক্তিকে বললেন, ফিরে গিয়ে পুনরায় আপনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করুন। আপনি সম্ভবত হযরত (সাঃ)-এর কথার অর্থ বুঝতে পারেননি।

সাহাবায়ে কেরাম বার বার লোকটিকে হযরত নবী করীমের (সাঃ) নিকট পাঠাচ্ছিলেন তাঁদের বিশ্বাস হচ্ছিল না যে হযরত (সাঃ) এমন কথা বলতে পারেন! অবশেষে তৃতীয়বার যখন হযরত (সাঃ) বললেন, তার কোন সওয়াব মিলবে না; তখন তাঁদের বিশ্বাস হল।

১. সুনানে আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, কিতাবুল জিহাদ, ৩৬০ পৃষ্ঠা।
২. সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ।

একবার হযরত (সাঃ) কয়েকজন সাহাবী (রাঃ)-কে এক গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে পাঠালেন। তাঁদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি সামনে এগিয়ে গেলেন, লোকেরা কাঁদতে কাঁদতে, তাঁর নিকট হাযির হল। তিনি বললেন, লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্ বল, বেঁচে যাবে। গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে আক্রমণ থেকে রক্ষা পেল। এতে তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে এ বলে তিরস্কার করলেন যে তুমি আমাদের গনীমত থেকে বঞ্চিত করলে। সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে উক্ত সাহাবী (রাঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

—"আমাকে আমার সঙ্গীরা এ বলে ধমকাল যে তুমি আমাদের গনীমত থেকে বঞ্চিত করলে।"

অভিযাত্রীদল ফিরে এসে যখন হযরত রসূল (সাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করলেন, তখন হযরত (সাঃ) সে সাহাবী (রাঃ)-এর প্রশংসা করে বললেন, সে গোত্রের এক-একটি লোককে মুক্তিদানের জন্য তুমি অনেক সওয়াব পাবে। (আবু দাউদ)

কোরআন মজীদে গনীমতকে মাতাউদ্দুন্ইয়া বা 'পার্থিব সম্পদ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ও তা নিয়ে ব্যাপৃত থাকার নিন্দা করা হয়েছে। ওহুদের যুদ্ধে যখন কিছুসংখ্যক লোক যুদ্ধ ছেড়ে গনীমত সংগ্রহে ব্যস্ত হওয়ার কারণে মুসলমানদের পরাজয় ঘটল, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

"তোমাদের মধ্যে কিছু লোক পার্থিব সম্পদ চায়, আর কিছু লোক পারলৌকিক শান্তি ও সম্পদ চায়।"

বদরের যুদ্ধে যখন সাহাবায়ে কেরাম অনুমতি লাভের পূর্বেই গনীমত সংগ্রহ শুরু করলেন অথবা (কোন কোন মুফাস্সেরের মতে) ফিদিয়া লাভের আশায় শত্রুবাহিনীর লোকদের বন্দী করলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হল ঃ

"তোমরা পার্থিব সম্পদ চাও, আর আল্লাহ্ চান আখেরাত।"

এ সমস্ত আদেশ-নির্দেশদান ও সতর্কীকরণসত্ত্বেও হিজরী অষ্টম সনে হুনাইনের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রধান কারণ ছিল এই যে সৈন্যরা গনীমতের মাল সংগ্রহে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিলেন। সহীহ্ বোখারীতে হুনাইনের যুদ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে ঃ

—"অতঃপর মুসলমানগণ গনীমত সংগ্রহে ঝুঁকে পড়ল আর কাফেররা আমাদের তীর বর্ষণে অস্থির করে তুলল।"

এ জন্য হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ঘটনাপরম্পরায় এ প্রসঙ্গটি অতি পরিষ্কার ভাষায় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করতেন। একদিন এক ব্যক্তি হযরত

(সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কেউ গনীমত লাভের আশায়, কেউ সুনাম— সুযশের আকাঙ্ক্ষায় এবং কেউ বীরত্ব প্রদর্শনের নেশায় জেহাদ করে; কার জেহাদ আল্লাহ্র রাস্তায় গণ্য হবে? উত্তরে হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ

—"যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে জেহাদ করে।" সব শেষে হযরত (সাঃ) বলে দিলেন, যে নিয়তেই জেহাদ করা হোক না কেন, মুজাহিদ যদি গনীমতের মাল গ্রহণ করে, তবে দু-তৃতীয়াংশ সওয়াব হ্রাস পাবে। পূর্ণ সওয়াব তখনই পাবে, যখন গনীমতের মাল আদৌ স্পর্শ করবে না। সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হযরত নবী করীমের (সাঃ) বিশেষ বাণী নিম্নে উদ্ধৃত হল ঃ

—"যে গাযী (যোদ্ধা) আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে এবং গনীমতের মাল গ্রহণ করে, সে আখেরাতের সওয়াবের দু-তৃতীয়াংশ এখানেই নিয়ে নেয়। আখেরাতে তার কেবল এক-তৃতীয়াংশ সওয়াব বাকি থাকে। অবশ্য সে যদি মোটেই গনীমতের মাল গ্রহণ না করে, তবে আখেরাতে সে জেহাদের পূর্ণ সওয়াব পাবে।"

এ সমস্ত শিক্ষার প্রভাবে এক সময় আরবদের কাছে যে গনীমত সর্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু ছিল মুসলমানদের অন্তর থেকে তা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়ে গেল এবং একমাত্র আল্লাহ্র বাণীকে উন্নত করাই জেহাদের একমাত্র উদ্দেশ্যে পরিণত হল। নিম্নোক্ত ঘটনা দ্বারা বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হবে।

ওয়ালেসা ইবনে আসকা নামক একজন সাহাবী ছিলেন। হযরত রসূল (সাঃ) যখন তবুক অভিযানে যাত্রা করেন তখন তাঁর নিকট যুদ্ধের সরঞ্জাম ছিল না। তিনি মদীনা নগরীর রাস্তায় রাস্তায় চিৎকার করে বলে বেড়াতে লাগলেন, "কে আছেন যিনি এমন ব্যক্তিকে একটা বাহন দিতে পারেন, যে যুদ্ধে কোন গনীমতের মাল লাভ করলে বাহনদাতাকে তার অংশ দান করবে?" এক আনসার বাহন এবং অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এ অভিযানে ওয়ালেসা গনীমতস্বরূপ কয়েকটি উট লাভ করলেন। তিনি ফিরে এসে সে আনসারের নিকট উটগুলোসহ হাযির হয়ে বললেন, এগুলো সেই উট, যার সম্পর্কে আমি শর্তারোপ করেছিলাম যে আপনিও এর অংশীদার হবেন।" আনসার বললেন, "এগুলো তুমিই নিয়ে নাও। আমার অংশগ্রহণের অন্য উদ্দেশ্য ছিল।" (অর্থাৎ গনীমতের উটে নয়, বরং জেহাদের সওয়াবে অংশ গ্রহণই উদ্দেশ্য ছিল)।

যুদ্ধকালে শত্রুর ধনসম্পদ লুট করাও সাধারণ নিয়ম ছিল। বিশেষত যখন যুদ্ধে রসদ শেষ হয়ে যেত এবং খাদ্য-পানীয়ের অভাব দেখা দিত, তখন তো আর কথাই ছিল না; যে কোন অবস্থায়ই রসদ সংগ্রহ বৈধ মনে করা হত। হযরত নবী

করীম (সাঃ) তাও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দেন এবং সম্পূর্ণরূপে এ পন্থা রোধ করেন। সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে এক আনসার থেকে বর্ণিত আছে— আমরা এক অভিযানে অত্যন্ত দুরবস্থা ও মুসিবতে পতিত হয়েছিলাম। ঘটনাচক্রে একটি ছাগলের পাল দেখা গেল। সবাই ছুটে গিয়ে ছাগপাল লুট করলাম! হযরত (সাঃ) সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, গোশ্‌ত পাকানো হচ্ছে— তাতে বলক উঠছে। হযরত (সাঃ)-এর হাতে ধনুক ছিল। তিনি তদ্দ্বারা গোশ্‌তের হাঁড়ি উলটে দিলেন, সমস্ত গোশ্‌ত মাটিতে পড়ে গেল। অতঃপর হযরত (সাঃ) বললেন, —"লুটের মাল মৃত পশুর গোশ্‌ত সমতুল্য।"

যুদ্ধ এবাদতে পরিণত হয়েছিল

যে জেহাদ বাহ্যত অত্যাচার ও উৎপীড়নমূলক কার্য বলে মনে হয়, তাকেই ইসলাম এমন শুদ্ধ ও পবিত্র করে দিল যে সেটি শ্রেষ্ঠতর এবাদতে পরিণত হল। মযলুমকে যালেমের হাত থেকে উদ্ধার করাকেই ইসলাম জেহাদের মকসুদ ধার্য করেছে, যাতে যালেম ও অত্যাচারী দুর্বলের উপর হস্ত প্রসারিত করতে না পারে। বলা হয়েছে ঃ

—"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, তারা অত্যাচারিত বলে তাদের যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হল। আর এটা নিশ্চিত যে আল্লাহ্ তাদের সাহায্য (দ্বারা জয়যুক্ত) করতে পূর্ণ ক্ষমতাশীল। (অত্যাচারিত তারাই) যাদের শুধু একথা বলার অপরাধে স্বদেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে যে "আমাদের রব আল্লাহ্!"

দেশে ফেতনা-ফ্যাসাদ, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা লেগেই থাকত। জনগণ শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাস করতে পারত না। দেশ থেকে এসব ফেতনা-ফ্যাসাদ, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দূর করে আইন-শৃঙ্খলা, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য জেহাদ করা হত। বলা হয়েছে ঃ

—"তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যাতে ফেতনা-ফ্যাসাদ বিদ্যমান না থাকে।" (আনফাল)

যারা আল্লাহ্ এবং পরকালের শাস্তি বা পুরস্কারে বিশ্বাস করত না এবং এ কারণে সর্বপ্রকার অন্যায়-অত্যাচার ও যুলম-নিপীড়ন যাদের কাছে বৈধ ছিল, ন্যায়-অন্যায়, জায়েয-নাজায়েযের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করার জ্ঞান যাদের ছিল না, ইসলামে জেহাদের উদ্দেশ্য ছিল এ সমস্ত লোককে পরাভূত করে মযলুম ও অত্যাচারিতকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করা। এক কথায় দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। বলা হয়েছে ঃ

—"যারা আল্লাহ্ ও শেষ বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে না এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যা হারাম ঘোষণা করেন তা হারাম বলে মনে করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।" (বারাআত)

জেহাদে জয়যুক্ত হয়ে দেশ দখলের লক্ষ্যবস্তু এতে নির্ধারিত করা হয়নি যে বিজয়ী বীর ধন-সম্পদ ও রাজ্য ভোগের আনন্দ লুফে নেবে। বরং এ লক্ষ্য নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে যে বিজিত জনপদে লোকদের এবাদত-বন্দেগী, খোদা-ভক্তি ও খোদা-ভীতি এবং দরিদ্র পালনের শিক্ষা দেবে। সৎকর্মের প্রসার ঘটাবে এবং অসৎকর্ম থেকে লোকদের বাধা দান করবে। বলা হয়েছে ঃ

—"তাদের আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা প্রদান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাৎ দান করবে, সৎকাজে আদেশ দেবে ও অসৎ কাজে বাধা দান করবে।"

তখন কোন দেশ বিজিত হলে যে ধনসম্পদ হস্তগত হত তা বিজয়ী বীরের আরাম-আয়েশ ও আমোদ-ফুর্তির জন্য ব্যয়িত হত এবং তার দরবারের আমীর ওমরাগণ পর্যায়ক্রমে তদ্দারা লাভবান হত। কিন্তু ইসলাম যুদ্ধে প্রাপ্ত ধনসম্পদের ব্যয় খাত নিম্নরূপ নির্ধারিত করে দেয় ঃ

"—এবং জেনে রেখ, তোমরা যে গনীমতের মাল লাভ কর, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ তাঁর রসূল,. রসূলের আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম, দরিদ্র ও প্রবাসীর জন্য নির্ধারিত।"

এ এক-পঞ্চমাংশ ব্যতীত সমস্ত গনীমতের মাল সৈন্যদের প্রাপ্য।

কেবলমাত্র মূলগত দিক দিয়েই নয় বাহ্যদর্শনেও জেহাদ এবাদতে রূপান্তরিত হয়েছিল। সম্মুখ-যুদ্ধের সময়ও মুজাহিদদের আল্লাহ্র নাম স্মরণে উদ্বুদ্ধ করা হত। বলা হয়েছে ঃ

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন শত্রুবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ-সমরে লিপ্ত হও, তখন স্থিরপদ থেকো এবং বার বার আল্লাহ্র নাম স্মরণ করো, তাহলে তোমরা কৃতকার্য হবে।" (আন্ফাল)

নামাযের মধ্যে যেমন আল্লাহ্র মহত্ত্ব ও পবিত্রতা বর্ণনা করা হয়— 'আল্লাহু আকবার', 'সুবহানা রাব্বি আল-আলা' বলা হয়, জেহাদের সময় অনুরূপ আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহত্ত্ব বর্ণনার নির্দেশ ছিল। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, "আমরা যখন কোন উচ্চস্থানে আরোহণ করতাম, তখন সুবহানাল্লাহ বলতাম।" সহীহ্ বোখারীতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন যুদ্ধের সময় কোন উচ্চস্থানে উঠতেন, তখন তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন। একবার হযরত (সাঃ) কোন এক যুদ্ধাভিযানে যাচ্ছিলেন। সাহাবীদণ (রাঃ) খুব উচ্চৈঃস্বরে

আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করছিলেন, তা শুনে হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন, "এত উচ্চৈঃস্বরে বলার প্রয়োজন নেই। কারণ, তোমরা যে আল্লাহ্কে ডাকছ তিনি বধির নন।"[১] অনুরূপভাবে একবার হযরত নবী করীম (সাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-কে নামাযের মধ্যে উচ্চরবে কোরআন পড়তে নিষেধ করেছিলেন।

তত্ত্বকথা

সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে জেহাদে[২] নিয়ম ছিল যে উচ্চভূমিতে আরোহণের সময় আল্লাহু আকবার এবং নিম্নভূমির দিকে অবরোহণের সময় সুবহানাল্লাহ্ বলা হত। নামাযেও এ রীতি অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ, মস্তকোত্তোলনের সময় আল্লাহু আকবার এবং মস্তক অবনত করে রুকু ও সেজদার সময় সুবনাল্লাহ্ বলা হয়। এ বর্ণনায় মন্তব্য প্রকাশে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। জেহাদের মূলনীতির উপর নামায প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি বরং জেহাদের মধ্যেই নামাযের পদ্ধতি বজায় রাখা হয়েছে। কারণ, এটা অতি পরিষ্কার কথা যে ইসলামের শুরু থেকেই নামাযের উদ্ভব হয় আর জেহাদের সূচনা হয় হিজরতের পর থেকে। মোদ্দাকথা, এ রেওয়ায়েতের দ্বারা একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে নামায ও জেহাদের মধ্যে এমন সামঞ্জস্য ছিল যে তার একটিকে মূল ও অন্যটিকে তার অনুকরণ মনে করা হত।

মোদ্দাকথা এই যে যুদ্ধ ছিল সর্বপ্রকার অন্যায়-অত্যাচার, নৃশংসতা-বর্বরতা ও পাশব আচরণের সমষ্টি। ইসলামের ঐশী শিক্ষা, তাকে আল্লাহ্র বাণীকে উন্নতকরণ, শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েম, অন্যায়-অত্যাচার উৎখাত, অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত মানবতাকে রক্ষা ও আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহত্ত্ব বর্ণনার একটি উপায়ে রূপান্তরিত করে দেয়।

বিজয়ী বীর ও নবীর মধ্যে পার্থক্য

যুদ্ধের ময়দানে হযরত রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) হাতে ঢাল-তলোয়ার, শরীরে লৌহবর্ম ও মস্তকে শিরস্ত্রাণ থাকত। কিন্তু এমতাবস্থায়ও একজন সেনাপতি ও নবীর মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হত।

ঠিক যে সময় তুমুল যুদ্ধ চলত, তীরের বৃষ্টি বর্ষিত হত, সমস্ত ময়দান রক্তে রঞ্জিত, শীতের প্রারম্ভে যেমন গাছের পাতা ঝরে পড়ে, তেমনি সৈন্যদের হাত-পা

১. জেহাদ অধ্যায়ে বাবু তাকবীর 'ইন্দাল হবর' শিরোনামা।
২. সুনানে আবু দাউদ, জেহাদ অধ্যায়।

কেটে পড়তে থাকত, শত্রুসৈন্য বন্যার মত ছুটে আসত, ঠিক তখনও হযরত নবী করীম (সাঃ) আকাশের দিকে দুই হাত প্রসারিত করে দোয়া করতেন। যুদ্ধবাজ সেনাপতিরা যে সময় পরস্পর শক্তি পরীক্ষায় উন্মত্ত, ঠিক সে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) সিজদায় রত থাকতেন। বদরের যুদ্ধের সময় যখন তুমুল যুদ্ধ চলছিল, তখন হযরত আলী (রাঃ) তিন-তিনবার সংবাদ নিতে এসে দেখলেন, তিনি সিজদাবনত অবস্থায় পড়ে আছেন। শত্রুসৈন্যরা প্রবল তীরবৃষ্টি করছে,যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের ফয়সালা হচ্ছে না, অস্ত্রবিহীন সেনাপতি মাটি থেকে এক মুষ্টি ধুলি নিয়ে শত্রুর দিকে নিক্ষেপ করলেন; মুহূর্তের মধ্যে শত্রুসৈন্যের আক্রমণের ঘনঘটা কেটে ময়দান সাফ হয়ে গেল।

হুনাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুরা একযোগে এমন প্রবল আক্রমণ করল যে সমস্ত সৈন্য হতবল হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। বারো হাজার সৈন্যের সবাই নবীজীর পাশ থেকে সরে গেল। সামনের দিক থেকে আনুমানিক দশ হাজার তীরন্দাজ তীর বর্ষণ করতে করতে এগুতে লাগল, কিন্তু সত্যের মূর্ত প্রতীক স্বস্থানে অটল থেকে দৃঢ়কণ্ঠে বলে চলেছেন ঃ

"আমি পয়গম্বর এবং মিথ্যা পয়গম্বর নই।"

ঠিক উভয় সৈন্যদল যখন সম্মুখসমরে ব্যাপৃত, সর্বদিকে তরবারির আঘাত-প্রতিঘাত চলছে, হাত-পা কেটে কেটে মাটিতে পড়ছে, চারদিকে মৃত্যুর বিভীষিকা, ঠিক সে-সময়ে ঘটনাচক্রে যদি নামাযের ওয়াক্ত এসে যেত তবে মুহূর্তের মধ্যে সবাই নামাযের কাতারে দাঁড়িয়ে পড়তেন; সেনাপতি নামাযের ইমাম, সেনাদল নামাযের কাতারে কাতারবদ্ধ মুক্তাদী! উত্তেজনামূলক সমর-সঙ্গীতের পরিবর্তে আল্লাহু আকবার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত! উৎসাহ-উদ্দীপনা, শৌর্য-বীর্য এবং ক্রোধ ও আক্রোশ তখন বিনয়-নম্রতা, আর্জি-নিবেদন, ভয়-ভক্তি ও একাগ্রতায় রূপান্তরিত হয়। কাতারবদ্ধ সৈন্যগণ দু' দু' রাকআত নামায আদায় করে শত্রুর মোকাবিলার জন্যে চলে যান, যুদ্ধরত সেনাদল এসে স্থান পূরণ করেন; তাঁরা দু'রাকআত নামায আদায় করে পুনরায় তাঁদের নির্ধারিত স্থানে চলে যান এবং যুদ্ধরত সৈন্যদল এসে তাঁদের বাকি নামায সমাপ্ত করেন, কিন্তু এ সমস্ত পার্শ্ব-পরিবর্তন সেনাদলের মধ্যে ঘটে, নামাযের ইমাম, যুদ্ধের সেনাপতি ও আল্লাহ্র প্রেরিত রসূল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র এবাদতেই ব্যস্ত থাকতেন।

শিক্ষা-দীক্ষা, বক্তৃতা-নসীহত, শিষ্টাচার ও পবিত্রতা শিক্ষাদানের কাজ সর্বক্ষণ চলতে থাকত। বিজয় মুহূর্তে যখন সৈন্যগণ বিজয় আনন্দে আত্মহারা, গনীমতের মালে অংশগ্রহণ করতেন, একেকজন হাজার হাজার টাকার অর্থসম্পদ লাভ

করতেন, তখন এক সাহাবী আনন্দিতচিত্তে আসতেন এবং উল্লাসভরে বলতেন, আয় আল্লাহ্র রসূল (সাঃ), আজ আমি গনীমতের মাল দ্বারা যেরূপ লাভবান হলাম, অনুরূপ আর কখনও হইনি—আমি তিন শত উকিয়া লাভ করেছি। হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন,—"আমি কি তোমাকে তদপেক্ষা লাভজনক বস্তুর সন্ধান দেব?" তিনি আগ্রহাতিশয্যে প্রশ্ন করেন, তা কি? হযরত (সাঃ) বলেন, —"ফরয নামাযের পর দু'রাকআত নামায।"[১]

ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা

শান্তি স্থাপন

ব্যক্তিগত মেধা, কর্মদক্ষতা, বীরত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধের দিক দিয়ে আরবের প্রত্যেকটি লোকই ছিল অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ইসলামের আলোতে তাদের সে যোগ্যতা আরও বহুগুণ বেড়ে যায়। কিন্তু এ সমস্ত গুণের সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও ইসলামপূর্ব যুগের আরবগণের মধ্যে সাধারণ জাতীয়তার কোন ভিত্তি বা নাগরিক জীবনের কোন বন্ধনই ছিল না। সমগ্র আরবভূমি ছিল একটি দেশ এবং রক্তধারার দিক দিয়ে একটি অখণ্ড জাতির আবাসস্থল। কিন্তু ইতিহাসে কখনও তাদের দেশগত ও গোত্রগত ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক দিক দিয়েও কখনও সমগ্র আরব একই পতাকাতলে সমবেত হয়নি। প্রতিটি ঘরের জন্য যেমন পৃথক পৃথক উপাস্য ছিল, তেমনি প্রত্যেক গোত্রেরই ছিল আলাদা আলাদা নেতা। দক্ষিণ আরবে হেমইয়ারী, আযওয়া এবং আক্বইয়ালদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। উত্তর আরবে বকর, তাগ্লিব, শায়বান, ইযদ, ফুযায়া, কেন্দা, লখম, জুযাম, বনূ হানীফা, তাঈ, আসাদ, হাওয়াযেন, গাত্ফান, আউস, খাযরাজ, সকীফ, কোরাইশ প্রভৃতি গোত্রের পৃথক পৃথক দল ছিল। তারা দিবারাত্র কেবল গৃহযুদ্ধেই লিপ্ত থাকত। বকর ও তাগলির গোত্রের চল্লিশ বৎসরকালীন যুদ্ধ সবেমাত্র সমাপ্ত হয়েছিল। কেন্দা, হাযরাসা ও তের উপজাতিগুলো পারস্পরিক হানাহানিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। আউস ও খাযরায গোত্রদ্বয়ও লড়ে লড়ে নেতৃত্বহীন হয়ে পড়েছিল। কাবাগৃহের পবিত্র আঙ্গিনায় পবিত্র মাসসমূহের মধ্যে কায়স ও কোরাইশ গোত্রের মধ্যে "হরবে ফুজ্জার" (অন্যায় যুদ্ধ) তখনও চলছিল, এমনিভাবে সমগ্র দেশে যুদ্ধের লেলিহান শিখা বিস্তৃত ছিল।

---

১. সুনানে আবু দাউদ, বাবুত্তেজারাতু ফীল্ গায্ওয়াহ।

আরবের পার্বত্য এলাকা ও মরুভূমিগুলোতে বাধাবন্ধনহীন অপরাধপ্রবণ উপজাতিদের বসতি ছিল। সমগ্র দেশ হত্যা, লুণ্ঠন ও রক্তারক্তির বিভীষিকায় পূর্ণ ছিল এবং সমস্ত গোত্রই ছিল সীমাহীন যুদ্ধের ভয়াবহ শেকলে আবদ্ধ। প্রতিশোধ, পাল্টা হত্যা এবং রক্ত বিনিময়ের তৃষ্ণা শত শত এমন কি, হাজার হাজার হত্যাকাণ্ডের পরেও নিবৃত্ত হত না। লুটতরাজের পরেই ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। কিন্তু বাণিজ্যিক কাফেলার একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত প্রায় অসম্ভব ছিল। উত্তর আরবের উপর হীরা প্রদেশের আরব বাদশাহর যদিও অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, তথাপি তাঁর পণ্যসামগ্রীও ওকাযের বাজারসমূহে সহজে পৌছাতে পারত না। হজের মাসগুলো কার্যত আরবদের কাছে পবিত্র মাস হিসাবে গণ্য ছিল। এতদসত্ত্বেও যুদ্ধবিগ্রহের বৈধতা প্রমাণের জন্য পবিত্র মাসগুলোকে কখনও বাড়িয়ে কখনও কমিয়ে নেয়া হত। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আবু আলী কালী 'কিতাবুল আমালী' নামক গ্রন্থে লেখেন ঃ "এর কারণ ছিল এই যে উপর্যুপরি তিনটি মাস লুটতরাজ বন্ধ থাকা তারা পছন্দ করত না। কেননা, লুটতরাজই ছিল তাদের জীবিকার অন্যতম প্রধান অবলম্বন।"

বহু অপরাধপ্রবণ উপজাতির জীবিকার জন্য হজের মওসুমটিও ছিল উত্তম মওসুম। মক্কার আশপাশে অবস্থিত আসলাম, গেফার প্রভৃতি গোত্র হাজীদের আসবাপত্র অপহরণের ব্যাপারে কুখ্যাত ছিল। তাঈ আরবের একটি বিশিষ্ট খ্যাতনামা গোত্র। কিন্তু এ গোত্রের তস্করেরাও অন্যান্য গোত্রের চাইতে কম কুখ্যাত ছিল না। সুলায়ক ইবনুস্ সালাকা এবং তাবেত শারা ছিল আরবের প্রখ্যাত কবিদের অন্যতম। কিন্তু তাদের কাব্যের গোটা উপজীব্যই ছিল তস্করবৃত্তি ও প্রতারণার গৌরবাত্মক কাহিনী।

দেশে অস্থিরতা এবং অশান্তিও চরমে পৌছেছিল। বাহ্রাইনের শক্তিশালী গোত্র আবদুল কায়স পঞ্চম হিজরী পর্যন্ত মুযার গোত্রসমূহের ভয়ে পবিত্র মাসসমূহ ছাড়া অপর কোন মাসে হেজাযের দিকে মুখ ফেরাতে পারত না। মক্কা বিজয়ের পর দেশে শান্তির সূচনা হয়; কিন্তু তখনও মদীনা থেকে মক্কা পর্যন্ত ভ্রমণ নিরাপদ ছিল না। প্রায়ই ডাকাতি হত। হিজরতের পাঁচ-ছয় বছর পর পর্যন্তও সিরিয়ার বাণিজ্যিক কাফেলা প্রকাশ্যে লুট করা হত। এমন কি, মাঝে-মধ্যে স্বয়ং দারুল ইসলামের চারণভূমিতেও হানা দেয়া হত। মহানবী (সাঃ) দেশে শান্তি আসবে বলে সুসংবাদ দিয়ে বলতেন, অচিরেই এমন দিন আসবে, যখন সান্‌আ থেকে একজন মহিলা একাকিনী উটের পিঠে সওয়ার হয়ে সফর করবে, তার মনে এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও ভয় থাকবে না। মহানবীর (সাঃ)-এ সুসংবাদ শুনে তখন সবাই যুগপৎ বিস্ময়বোধ করত। নবম হিজরীতে

এক ব্যক্তি এসে অভিযোগ করল যে তার টাকা-পয়সা ডাকাতেরা নিয়ে গেছে। মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ সত্বরই এমন দিন আসবে, যখন কোন রকম প্রতিরক্ষা ছাড়াই মক্কায় কাফেলা যেতে পারবে। বিরাট আরবভূমিতে একমাত্র কাবা আঙ্গিনাতেই (হরম শরীফে) শান্তি সহজলভ্য ছিল। এটাই ছিল মক্কাবাসীদের উপর সচাইতে বড় অনুগ্রহ। পবিত্র কোরআনে আছে ঃ

—"তাদের উচিত এ ঘরের প্রভুর এবাদত করা, যিনি তাদের ক্ষুধার অন্ন দিয়েছেন এবং অশান্তি দূর করে দিয়েছেন।"— (সূরা ঈলাফ)

—"তারা কি দেখে না যে একটি শান্তিময় হরম তাদের জন্য নির্মাণ করেছি। এর বাইরে এত অশান্তি যে চারদিক থেকে লোকজনকে ছিনিয়ে নেয়া হয়।"

— (সূরা আনকাবুত)

স্বয়ং ইসলামের অবস্থা কি ছিল? মহানবী (সাঃ) "আ'মুল হুযন" তথা বিষাদের বছরের পর তিন বছর পর্যন্ত একাদিক্রমে সব গোত্রের সামনে নিজেকে পেশ করতে থাকেন। মহানবী (সাঃ) তাদের বলতেন ঃ আমাকে নিজের নিরাপত্তায় নিয়ে শুধু এতটুকু সুযোগ দাও, যাতে আমি আল্লাহ্র আহ্বান মানুষের কাছে পৌছে দিতে পারি। কিন্তু কেউই তাঁর কথায় সাড়া দিল না। সাধারণ মুসলমানদের জন্য আরবের মাটিতে স্বস্তির নিশ্বাস গ্রহণ করাও সম্ভবপর ছিল না। তাঁরা শান্তির অন্বেষায় সুদূর আফ্রিকা ও আবিসিনিয়ার মরুপ্রান্তরে ইতস্তত ছুটাছুটি করতেন। যারা আরবে থেকে গিয়েছিলেন তাঁরা বিভিন্ন রকম উৎপীড়নের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। কোরআন মজীদের আয়াতে মুসলমানদের এ নিদারুণ সঙ্কটময় অবস্থা বর্ণিত হয়েছে ঃ

"স্মরণ কর, স্বদেশে যখন তোমরা সংখ্যালঘু ও দুর্বল ছিলে; তোমাদের ভয় ছিল; না জানি লোকেরা তোমাদের ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।"— (সূরা আনফাল)

এ বিশৃঙ্খল পরিবেশ ও অশান্তির ফলে কোন আন্দোলনই আত্মরক্ষামূলক সামরিক কলাকৌশল ছাড়া অগ্রসর হতে পারত না। মহানবী (সাঃ)-এর মৌল কর্তব্য ছিল ইসলাম প্রচার। এ জন্য তরবারি ও সেনাবাহিনীর মোটেই প্রয়োজন ছিল না।' কিন্তু একদিকে শত্রুরা আক্রমণের পর আক্রমণ চালাচ্ছিল, অপরদিকে সর্বত্র ইসলাম প্রচারকদের জীবন ছিল বিপন্ন। বাণিজ্যিক কাফেলার অবাধ যাতায়াতের উপরই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ভরশীল ছিল; কিন্তু তাও নিরাপদ ছিল না। যুদ্ধবিগ্রহে হুযুর (সাঃ)-এর অংশগ্রহণ ও তার কারণ অধ্যায়ে এসব ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

মোটকথা, এই ছিল দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা। বৈদেশিক বিপদ-আশঙ্কাও কম ছিল না। দেশের সমস্ত শস্য-শ্যামল ও উর্বরা প্রদেশগুলো রোম ও ইরান এ দু'পরাশক্তির অধিকারে ছিল। প্রায় ষাট বছর থেকে ইরানীরা ইয়ামন, আম্মান ও বাহ্‌রাইনের মালিক সেজে বসেছিল। তাদের অধীনে আরব সরদারগণ ছিলেন নামেমাত্র শাসনকর্তা। ইরাক সীমানায় মুনযের বংশের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত করে ইরানীরা দেশের অভ্যন্তরেও অগ্রাভিযান শুরু করেছিল। হেজায ভূখণ্ডে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনকেও তারা নিজেদের অন্যায় প্রাধান্যের আওতাধীন গণ্য করত। সেমতে ষষ্ঠ হিজরীতে পারস্য সম্রাট ইয়ামেনের পারসিক গবর্ণরকে ফরমান পাঠান ঃ "আমার যে দাসটি হেজাযে নবুয়ত দাবি করেছে, তাকে গ্রেফতার করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

রোমকরা সিরিয়ার সীমান্ত দখল করে নিয়েছিল। গাস্‌সান বংশ এবং অন্যান্য ছোট ছোট আরব সরদারগণ বেশ কিছুকাল পূর্ব থেকে খৃষ্টানধর্মে দীক্ষিত ছিল। তারা রোমকদের আধিপত্যও স্বীকার করে নিয়েছিল। অষ্টম হিজরীতে রোমকরা এসব খৃষ্টান আরব সরদারদের সহায়তায় মদীনা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয়—যা তবুক ও মূতা প্রভৃতি যুদ্ধের আকারে প্রকাশ লাভ করে।

রোমকরা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইহুদীদের কাছ থেকে সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের নামেমাত্র শাসনক্ষমতাও ছিনিয়ে নেয়। ফলে, ইহুদীরা সিরিয়া থেকে হেজাযের অভ্যন্তরে সরে আসতে বাধ্য হয়। তারা নিজেদের স্বার্থে মদীনা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত একের পর এক দুর্গ নির্মাণ করেছিল। এসব অঞ্চল ছিল একাধারে তাদের সামরিক শক্তিকেন্দ্র এবং অপরদিকে এগুলো বাণিজ্যিক কুঠি হিসাবেও গণ্য হত। কুরাইযা, কাইনুকা, খায়বর, ফেদাক, তাইমা, ওয়াদিউল কুরা প্রভৃতি স্থানে তাদের বড় বড় সেনানিবাসও ছিল। কোরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনাসমূহে ইহুদীদের এসব দুর্গের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

"তারা দুর্গ পরিবেষ্টিত জনপদ অথবা প্রাচীর অভ্যন্তরে না লুকিয়ে সংঘবদ্ধভাবে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে না।"—(সূরা হাশর)

"যেসব ইহুদী তাদের সাহায্য করেছিল, আল্লাহ্ তাদের তাদের দুর্গ থেকে নিচে নামিয়েছেন"—(সূরা আহযাব)

প্রাচীনকালে ইহুদীরা আর্থিক কারবারে উন্নতির ফলে স্পেন ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে যেরূপ বিপজ্জনক উপাদানে পরিণত হয়েছিল, আরবেও তাদের অবস্থা ছিল হুবহু তেমনি। এ কতিপয় দুর্গের বলে বলীয়ান হয়ে তারা ইসলামী শক্তিকে কোন কিছুই মনে করত না। মহানবী (সাঃ)-কে বেশ

কয়েকটি যুদ্ধ শুধু তাদের দুষ্কৃতির কারণেই করতে হয়েছিল। বদর যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করলে ইহুদীরা গর্বভরে বলতে লাগল ঃ মক্কার কোরাইশরা যুদ্ধবিদ্যার কি জানে? মুসলমানরা আমাদের দুর্গের সম্মুখীন হলে বুঝতে পারত, যুদ্ধ কাকে বলে!

মোটকথা, আরবদেশ তখন বহু ও বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক আশংকায় জর্জরিত ছিল। দেশকে এসব বিপদের কবল থেকে উদ্ধার করে সুষ্ঠু শাসন পরিচালনার পক্ষে স্বাভাবিক মানবীয় শক্তি যথেষ্ট ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলার অদৃশ্য সাহায্যের হাত মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আস্তিনের নিচে লুক্কায়িত ছিল। কোরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

"আপনি যখন শত্রুর প্রতি ধূলিকণা নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন আপনি তা নিক্ষেপ করেননি— আল্লাহ্ নিজেই নিক্ষেপ করেছিলেন।"

হিজরতের পর আট বছরের অবিরাম চেষ্টা ও অনবরত সংস্কারের প্রচেষ্টার ফল এই দাঁড়াল যে অসম্ভব বিষয়বস্তু সম্ভাব্যতার রূপ পরিগ্রহ করল। আরবের রাজনৈতিক দুর্বলতার সামগ্রিক কারণ অনৈক্য এবং পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে নিহিত ছিল। এ অনৈক্য ও গৃহযুদ্ধের মূল কারণ ছিল এই যে সমগ্র আরব তখন বিভিন্ন পরিবার ও গোত্রে বিভক্ত ছিল। পরস্পরের মধ্যে এমন কোন শক্তিশালী সম্পর্ক ছিল না, যা সমগ্র দেশকে সংঘবদ্ধ করে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) গোটা আরবজাতিকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করার জন্য পরস্পরের মধ্যে ঈমান এবং ইসলাম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করলেন। কোরআনের ভাষায় ঃ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ "ইসলাম বিশ্বাসীরা পরস্পর ভাই ভাই" এ আধ্যাত্মিক সম্পর্কের ফলে, রক্ত, আত্মীয়তা ও গোত্রের বিভেদ নিমেষের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। কলেমা লা-ইলামা ইল্লাল্লাহুর বিদ্যুৎপ্রবাহই সমগ্র আরবের ঐক্যবদ্ধ প্রাণস্পন্দনে পরিণত হল।

আল্লাহ্ পাক কোরআন মজীদে মুসলমানদের এ সংঘবদ্ধতা ও একাত্মতার অস্তিত্বকে একটি বিশেষ নেয়ামত আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

—"আল্লাহ্র সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অনন্তর আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরকে মিলিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর তাঁরই কৃপায় তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছ।" — সূরা আলে ইমরান)

আল্লাহ্ পাক মহানবী (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ "মোহাম্মদ! এটা আপনার কাজ ছিল না। এর আড়ালে-অন্তরে পরিবর্তন সাধনকারী আল্লাহ্ তা'আলার অদৃশ্য হাতই কাজ করছিল।"

—"তিনিই তো সেই আল্লাহ, যিনি নিজের সাহায্যে ও মুসলমানদের মাধ্যমে আপনাকে শক্তি দান করেছেন। তিনিই মুসলমানদের অন্তরকে জুড়ে দিয়েছেন। যদি আপনি জগতের যাবথীয় ধনভাণ্ডারও ব্যয় করে দিতেন, তবুও তাদের অন্তর জুড়তে পারতেন না। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের অন্তর পরস্পর মিলিয়ে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।"—(সূরা আনফাল)

হিজরতের পর মহানবী (সাঃ) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। বলাবাহুল্য , এটা ছিল আত্মিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ এবং এ প্রসঙ্গের শেষ পদক্ষেপ ছিল সেই ভাষণ, যা তিনি মক্কা বিজয়ের সময় দিয়েছিলেন।

কোরআন মজীদের উপর্যুপরি বাণীসমূহে ভূপৃষ্ঠে গোলযোগ ও অনর্থ সৃষ্টি করাকে মানুষের সবচাইতে ঘৃণিত ও নিন্দনীয় কাজ বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে এবং এ দোষে দোষী ব্যক্তিদের জন্য কঠোরতম শাস্তি নির্ধারিত করা হয়েছে। চুরির জন্য হাত কাটার শাস্তি নির্ধারিত করা হয়েছে। দস্যুবৃত্তির জন্য মৃত্যুদণ্ড, ফাঁসি, হাত কাটা এবং নির্বাসনের বিধান দেয়া হয়েছে। সূরা মায়েদায় হত্যা এবং রক্তপাতজনিত অপরাধ দমনের উদ্দেশে পাল্টা হত্যার (কেসাস) ব্যবস্থা নাযিল হয়েছে। কার্যক্ষেত্রে দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য মহানবী (সাঃ) একাধিকবার সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং উপজাতীয় যাযাবর দস্যুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেন। হেজাযের যেসব গোত্রে পেশাদার তস্কর ছিল, তারা তওবা করে মুসলমান হয়ে যায়। এছাড়া ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারের জন্য আইনকানুন প্রণয়ন করা হয় এবং স্থানে স্থানে কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়।

এ সমস্ত কার্যক্রম গৃহীত হয় একান্তভাবেই মানুষের বাহ্যিক স্বভাবকে নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্দেশে। নতুবা একজন পয়গম্বরের দায়িত্ব একজন সাধারণ আইন রচয়িতা বা একজন বিচক্ষণ শাসকের দায়িত্ব অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে। ইসলামের দণ্ডবিধি সংক্রান্ত আইনকানুন যে কাজ করেছে তার অনেক আগেই কোরআনের আধ্যাত্মিক এবং মহানবী (সাঃ)-এর অনুপম শিক্ষার কল্যাণে অপরাধ তালিকার সকল দফা মিটে গিয়েছিল। আইন এবং শাস্তির ভয় মানুষকে শুধু বাজারে এবং সমাবেশে অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারে। কিন্তু ইসলামী দাওয়াতের কল্যাণমুখী প্রভাব মানুষের অন্তরকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল—যিনি রাত্রির অন্ধকারেও দেখেন এবং তালাবদ্ধ ঘরের ছিদ্রপথেও উঁকি মারতে পারেন। ফলে, তখন দেশময় শান্তি বিরাজ করতে থাকে। সাহাবী হযরত আদী ইবনে হাতেম সাক্ষ্য দেন যে তিনি নিজের চোখে দেখেছেন, মহানবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মানুষ সানআ থেকে হেজায পর্যন্ত একা একা

সফর করত এবং খোদাভীতি ছাড়া পথিমধ্যে তাদের আর কোন ভয়ভীতি ছিল না। জনৈক ইউরোপীয় ইতিহাসবিদ যিনি মহানবী (সাঃ)-এর প্রশংসায় খুব কমই লেখনী সঞ্চালন করেছেন, (অর্থাৎ, মার্গোলিয়থ) তিনিও নিম্নোদ্ধৃত ভাষায় এ সত্যকে স্বীকার করেছেন ঃ

—"মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বেই রাজনৈতিক কর্ম সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তিনি এমন একটি সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনের কাজ সমাধা করেছিলেন—যার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় রাজধানীও নির্ধারিত ছিল। আরবের বিচ্ছিন্ন গোত্রগুলোকে তিনি এক জাতিতে পরিণত করে দেন; আরবদেশকে একটি সম্মিলিত ধর্ম দান করেন এবং তাদের মধ্যে এমন সম্পর্ক স্থাপন করেন—যা ছিল পারিবারিক সম্পর্ক অপেক্ষাও অধিক মজবুত ও সুদৃঢ়।"—(লাইফ অব মোহাম্মদ, ৪৭৯পৃঃ)

আরবভূমিকে বৈদেশিক বিপদাপদ হতে মুক্ত করার জন্য আল্লাহ্ পাক অভাবনীয় ব্যবস্থার সৃষ্টি করে দেন। কোরাইশ এবং মদীনাবাসী মুনাফেকদের প্ররোচনায় ইহুদীরা ইসলামকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়; কিন্তু পরিণামে তারাই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তৃতীয় হিজরী থেকে সপ্তম হিজরী পর্যন্ত উপর্যুপরি যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকে। অবশেষে খায়বর বিজয়ের মধ্য দিয়ে ইহুদীদের রাজনৈতিক শক্তির অবসান ঘটে। রোমকরা এবং সিরিয়ার খৃষ্টান আরবরা ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্যে ওঠে-পড়ে লেগে যায়। খৃষ্টান আরব সরদারদের মধ্যে গাসসানীরাই ছিল সর্বাধিক শক্তিশালী। তারা রোমকদের হাতে ক্রীড়নকের মত কাজ করত। বাহ্রা, ওয়ায়েল, বকর, লখম, জুযাম, আমেলা ইত্যাদি আরব গোত্রসমূহ্ তাদের অধীন ছিল। এছাড়া দুমাতুল-জন্দল, আইলা, জরবা, আযরাহ্, তাবালা, জারাশ প্রভৃতির জন্যে ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খৃষ্টান ও ইহুদী সরদার। গাস্সানীরা যেভাবে আক্রমণের সূচনা করে, তা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। সাহাবী হারেস ইবনে ওমায়ের বসরা শাহী দরবারে ইসলামের দাওয়াত সংবলিত পত্র নিয়ে গিয়েছিলেন। গাসসানীরা পথিমধ্যেই তাঁকে হত্যা করে ফেলে। মহানবী (সাঃ) প্রতিশোধ গ্রহণ ও তাদের সমুচিত শিক্ষাদানের উদ্দেশে তিন হাজার মুসলিম সৈন্যের একটি দল প্রেরণ করেন। অপরপক্ষে, গাস্সানীরা এক লক্ষের বাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করে। এমন সংবাদও শোনা যাচ্ছিল যে রোমকরাও প্রায় সমপরিমাণ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের কাছেই মওয়াব নামক স্থানে অবস্থান করছে। এতদসত্ত্বেও মুষ্টিমেয় মুসলিম বাহিনী শত্রুপক্ষের উত্তাল সমুদ্রসম সেনাদলকে দেখে ভীত হননি এবং কিছুসংখ্যক মূল্যবান প্রাণ নষ্ট হওয়ার পর তাঁরা সেনাবাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে আনতে সক্ষম হন। এ যুদ্ধের নাম মূতা যুদ্ধ।

অতঃপর নবম হিজরীতে তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রতি মুহূর্তেই সংবাদ আসত যে রোমকরা মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে আরব খৃষ্টানদের এক বিরাট বাহিনী তৈরি করছে। তারা সৈন্যদের বছরের অগ্রিম বেতনও দিয়ে দিয়েছে। গাস্‌সানীরাও সামরিক সাজ-সজ্জায় লিপ্ত রয়েছে বলে খবর আসছিল। এসব সংবাদের ভিত্তিতে মহানবী (সাঃ) ত্রিশ হাজার সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রাভিযান করলেন। তিনি বিশ দিন ধরে শত্রুসৈন্যের অপেক্ষায় রইলেন, কিন্তু কেউই সামনে উপস্থিত হল না। এ অগ্রাভিযানের উপকার এই হল যে গাস্‌সানীদের ছাড়া সকল গোত্রপতিই রোমকদেরকে ত্যাগ করে ইসলামের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে নিল। একাদশ হিজরীতে যখন মহানবী (সাঃ) মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন উসামা ইবনে যায়েদের নেতৃত্বে পুনরায় রোমকদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। হযরত আবু বকরের (রাঃ) খেলাফতকালে এ অভিযান আরও বিস্তৃতি লাভ করে। পারসিক সাম্রাজ্যের আয়ু তখন শেষ পর্যায়ে। ইসলাম প্রচার দশম হিজরীতে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোনরূপ সংঘর্ষ ব্যতিরেকেই ইয়ামন, আম্মান এবং বাহ্‌রাইনে তাদের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়।

মোটকথা, নয়-দশ বছরের উপর্যুপরি ও অবিরাম এবং অলৌকিক সাহায্য ও সমর্থনের ফলে এখন সমগ্র দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। কোরাইশ ও ইহুদীদের চক্রান্তের জাদু নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল। উপজাতিদের গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটল। দস্যু ও তস্করের দল আনুগত্য মেনে নিল। বৈদেশিক বিপদাশঙ্কারও অবসান ঘটল। ফলে, এখন পূর্ণ শান্তি ও স্বস্তির মনোভাব নিয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী আসল উদ্দেশ্যের প্রতি মনোনিবেশ করার সুযোগ উপস্থিত হল।

ইসলাম প্রচার

মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আসল কাজ ছিল ইসলামের দাওয়াত ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া। শুধু পৌঁছে দেয়াই নয়; বরং সর্ব প্রযত্নে, বৈধ ও বিশুদ্ধ উপায়ে জগদ্বাসীকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত করাই ছিল তাঁর প্রকৃত দায়িত্ব। বলাবাহুল্য, এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অস্ত্রশস্ত্র বা সেনাবাহিনীর মোটেই প্রয়োজন ছিল না, বরং কোনক্রমে সত্যের আহ্বান জগতের কোণে কোণে পৌঁছে যাওয়াই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু মক্কায় তের বছর পর্যন্ত ইসলামের শত্রুরা এ পথেই কাঁটা বিছাতে থাকে। হজ্জের সময় আরবের সমস্ত গোত্রের লোকজনই দূর-দূরান্ত থেকে মক্কায় এসে সমবেত হত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রত্যেকের কাছে গিয়ে শুধু এ আবেদন জানাতেন ঃ "কোরাইশরা আমাকে সত্য প্রচারে বাধা দান করে। তোমরা

এর সুযোগ করে দাও এবং নিজেরাও সত্যের আহ্বান গ্রহণ কর।" কিন্তু কোরাইশদের ভয়ে কেউ এ আবেদনে সাড়া দিতে সাহস করত না।

এতদসত্ত্বেও সত্যরবির প্রখর কিরণ বাধার ঘন কাল মেঘের ভেতর থেকেই উছলে উছলে মানুষের অন্তরে পতিত হত এবং চারদিক আলোকিত করত। ইসলামের জন্য প্রয়োজন ছিল শুধু ঘোষণার। আর, একাজ ইসলামের শত্রুরাই সম্পন্ন করল। হজের মওসুম এলে কোরাইশ সরদাররা প্রতিটি রাস্তায় তাঁবু স্থাপন করে অবস্থান গ্রহণ করত। বহিরাগত লোকজন তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসত। যেহেতু ইসলামের চর্চা ছড়িয়ে পড়ছিল, তাই সবাই এ সম্পর্কেও কোরাইশদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করত। কেউ জিজ্ঞেস না করলেও তারা পূর্ব থেকে সতর্ক করার জন্য তাদের বলত ঃ আমাদের শহরে একজন মন্দবিশ্বাসী লোক দেখা দিয়েছে। সে আমাদের উপাস্যদের গালিগালাজ করে। এমন কি, লাত ও ওয্যাকেও মন্দ বলে।

মন্দবিশ্বাসীকে আরবীতে 'সাবী' বলা হয়। ইসলামের কোন কোন ফরয কর্ম যেমন নামায, নক্ষত্র পূজারী সাবী সম্প্রদায়ের উপাসনার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল বিধায় হয়ত কোরাইশরা মহানবী (সাঃ)-কে সাবী উপাধি দিয়েছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এ উপাধিতেই সারা আরবে খ্যাত হয়ে যান। সহীহ্ বোখারী শরীফের 'কিতাবুল মাগাযী' নামক অধ্যায়ে জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেন, "যখন আমি বালক ছিলাম, তখন মক্কায় যাতায়াতকারী লোকজনের মুখে শুনতাম মক্কায় একজন নবুওতের দাবিদার পয়দা হয়েছে।"

যখন দেশময় মহানবী (সাঃ)-এর নাম বিখ্যাত হয়ে গেল, তখন জনসাধারণের মধ্যে অবশ্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। তাদের মধ্য থেকে অনেকেই রসূলে করীম (সাঃ)-এর দিকে ফিরেও তাকাল না। কিন্তু এটা কেমন করে সম্ভব যে এত বড় একটি দেশে প্রকৃত ঘটনা জানতে আগ্রহী লোক কেউই থাকবে না! আরবে বেশ কিছুসংখ্যক লোকের একটি দল সৃষ্টি হয়েছিল, যারা পৌত্তলিকতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত ছিল। কেউ কেউ আরও কিছুদূর এগিয়ে "হানীফী" হয়ে গিয়েছিল। এ গ্রন্থের শুরুভাগে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজর "এসাবা" নামক গ্রন্থে কতিপয় সাহাবীর নামোল্লেখ করেছেন। তাঁরা ইয়ামন ও অন্যান্য সুদূর এলাকা থেকে মহানবী (সাঃ)-এর অবস্থা শোনার জন্য মক্কায় এসেছিলেন এবং গোপনে ইসলাম গ্রহণ করে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। হযরত আবু মূসা আশ্আরী ইয়ামনী এবং তোফায়েল ইবনে আমর দওসী ইয়ামনীর পরিবারে ইসলাম প্রবেশের সূচনা মহানবী (সাঃ)-এর মক্কায় অবস্থানকালেই ঘটে।

তোফায়েল ইবনে আমর দওসী আরবের প্রখ্যাত কবি ছিলেন। আরবে কবিদের প্রভাব ছিল অসাধারণ। তাঁরা কবিতার জোরে গোটা গোত্রকে যেদিকে ইচ্ছা ধাবিত করতে পারতেন। এ কারণে কোরাইশদের চেষ্টা ছিল, যাতে তোফায়েল ইবনে আমর কিছুতেই মহানবী (সাঃ)-এর কাছে পৌঁছাতে না পারে। কিন্তু ঘটনাচক্রে একবার যখন তিনি মহানবী (সাঃ)-কে কোরআন মজীদ পাঠ করতে শুনলেন, তখন কাল-বিলম্ব না করে মুসলমান হয়ে গেলেন। তাঁরই প্রভাবে তখন দওস গোত্রে ইসলাম বিস্তার লাভ করতে থাকে। প্রথমত, গোত্রের লোকজন সাধারণভাবে তোফায়েলের আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তিনি মনঃক্ষুণ্ন হয়ে মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে নিবেদন করলেন ঃ "ইয়া রসূলাল্লাহ্! দওস গোত্র নাফরমানী করেছে, তাদের জন্য বদদোয়া করুন।" মহানবী (সাঃ) হাত তুলে দোয়া করলেন ঃ "আল্লাহ্! দওস গোত্রকে সুপথ দেখাও এবং তাদের পাঠাও।" এর পরই সমগ্র গোত্র মুসলমান হয়ে যায়।

"—মক্কায় এক ব্যক্তি পয়দা হয়েছেন। যিনি অনেক কথাবার্তা বলেন" লোকমুখে একথা শুনে যারা অধীর আগ্রহে মক্কায় উপস্থিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে আমর ইবনে আবসা সলমী অন্যতম। মহানবী (সাঃ) তখন শত্রুর ভয়ে অনেকসময় আত্মগোপন করে থাকতেন। আমর ইবনে আবসা কোনক্রমে তাঁর নিকট পৌঁছাতে সক্ষম হলেন এবং আরয করেন ঃ আপনি কে? মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ আমি আল্লাহর রসূল। আমর বললেন ঃ রসূল কাকে বলে? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ আমাকে পাঠিয়েছেন। আমর জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি পয়গাম দিয়ে পাঠিয়েছেন? উত্তর হল ঃ আল্লাহ্র পয়গাম এই যে আত্মীয়তার হক আদায় করবে, মূর্তি ভেঙে ফেলবে, আল্লাহ্কে এক জানবে এবং কাউকেও তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করবে না। আমর জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ ধর্মের অনুসারী কতজন? উত্তর হল ঃ একজন মুক্ত ব্যক্তি (আবু বকর) এবং একজন ক্রীতদাস (বেলাল)। আমর বললেন ঃ আমিও আপনার অনুসরণ করছি। মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ আপাতত এটা সম্ভবপর নয়। তুমি নিজেও দেখছ, আমি কি অবস্থায় আছি এবং অন্যদেরই বা কি অবস্থা! যখন আমার সাফল্যের সংবাদ শুনবে, তখন আমার কাছে এসো। সেমতে আমর দেশে ফিরে গেলেন এবং হিজরতের পর কামিয়াবীর সংবাদ পেয়ে মদীনায় উপনীত হলেন এবং ইসলাম কবুল করলেন।

ইবনে সানওয়া গোত্রের সরদার যেমাদ ইবনে সা'লাবা জাহেলী যুগে মহানবী (সাঃ)-এর বন্ধু ছিলেন। তিনি মক্কায় এসে শুনতে পেলেন, মোহাম্মদ পাগল হয়ে গেছেন। তিনি ঝাড়-ফুঁকও জানতেন। সেমতে মহানবী (সাঃ)-এর কাছে এসে বললেন ঃ আসুন, আমি আপনার চিকিৎসা করব। তিনি বললেন ঃ

—"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। আমরা তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। যাকে তিনি সৎপথ দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ সৎপথে আনতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিই যে মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও প্রেরিত পুরুষ।"

এ বাক্যগুলো শোনা মাত্রই যেমাদের ভাবান্তর শুরু হয়। তিনি আরয করলেন, পুনরায় বলুন। তিনি কথাগুলো আবার বললেন। যেমাদ তৃতীয়বার বললেন। ততক্ষণে তাঁর অবস্থা সম্পূর্ণ মন্ত্রমুগ্ধের মত হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ আমি অতীন্দ্রিয়বাদীদের কথাবার্তা, যাদুকরের তন্ত্রমন্ত্র এবং কবিদের প্রশস্তি-গীতি শুনেছি; কিন্তু এমন বাক্য কখনও শুনিনি এটা সমুদ্রের অতল গভীরেও প্রভাব বিস্তার করবে। হাত বাড়ান, আমি ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন। অতঃপর বললেন, আপন গোত্রের পক্ষ থেকেও ইসলামের শপথ নিন। যেমাদ তাই করলেন। পরে গোত্রের সবাই তাঁর কথায় মুসলমান হয়ে যায়। একবার এক যুদ্ধ উপলক্ষ্যে মুসলমান সৈন্যরা এ গোত্রের কাছ দিয়ে গমন করার সময় অধিনায়ক সবাই জিজ্ঞেস করলেন, কেউ এ গোত্রের কোন বস্তু এনেছ কি? জনৈক সিপাহী বললেন, আমার নিকট একটি লোটা আছে। নির্দেশ হল ঃ এখনই ফিরিয়ে দাও।

এ প্রসঙ্গে হযরত আবু যরের (রাঃ) ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

গেফার গোত্র কোরাইশদের সিরিয়ার বাণিজ্যপথে অবস্থিত ছিল। সেখানেও ইসলামের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। হযরত আবুযর গেফারী পূর্ব থেকেই পৌত্তলিকতায় বীতশ্রদ্ধ এবং সত্যের অনুসন্ধিৎসায় ছিলেন। একদিন তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা আনিসকে বললেন, তুমি মক্কায় যাও। সেখানে যে ব্যক্তি নবুওত দাবি করেন, তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি যাচাই করে এসো। আনীস মক্কা থেকে ফিরে ভাইকে বললেন, তিনি উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেন এবং যে কালাম পেশ করেন,তা কাব্য হতে ভিন্ন। হযরত আবুযর এ সংক্ষিপ্ত উত্তর শুনে তৃপ্ত হতে পারলেন না। স্বয়ং রওয়ানা হলেন। পাথেয় হিসাবে এক মশক পানি ও যৎসামান্য খাদ্য সঙ্গে নিলেন। মক্কায় ভয়ে ভয়ে কারও কাছে মহানবী (সাঃ)-এর নাম জিজ্ঞেস করলেন না। হরম শরীফে হযরত আলীর (রাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল। তিনি তাঁকে ঘরে এনে মেহমান রাখলেন। তিনদিন পর্যন্ত তাঁকেও কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হল না। অবশেষে স্বয়ং হযরত আলী তাঁকে মক্কায় আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলেনে। তিনি ভয়ে ভয়ে বললেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গীকারও নিলেন যাতে বিষয়টি প্রকাশ না করেন। হযরত আলী তাঁকে মহানবী (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি তাঁকে ইসলামের দীক্ষা দিয়ে বললেন ঃ আপাতত বাড়ি ফিরে

যাও। আমি যা কিছু বলে পাঠাই, তা পালন করো। কিন্তু আবুযরের অন্তরে ইসলামের প্রচণ্ড জোশ ছিল। তিনি আরয করলেন ঃ আমি ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা না করে ক্ষান্ত হব না। সেমতে হরম শরীফে এসে সজোরে চীৎকার করে বললেন ঃ "আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।' এ কলেমা শোনা মাত্রই চারদিক থেকে লোকজন ছুটে এল এবং আবু যরকে বেদম প্রহার করতে লাগল। হযরত আব্বাস (রাঃ) এসে তাঁকে রক্ষা করলেন এবং প্রহারকারীদের বললেন ঃ তোমাদের কি জানা নেই যে তোমাদের বাণিজ্যপথ গেফার গোত্রের নিকট দিয়েই গিয়েছে? এ ব্যক্তি গেফার গোত্রেরই একজন। একথা শুনে তখনকার মত আবুযরকে ছেড়ে দেয়া হল। কিন্তু পরের দিন হযরত আবুযর হরম শরীফে গিয়ে পুনরায় সদর্পে ইসলামের কথা ঘোষণা করলেন এবং ফলও আগের দিনের মতই ভোগ করলেন। এ দিনও ঘটনাক্রমে হযরত আব্বাস (রাঃ) সেখানে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর প্রাণ রক্ষা করলেন।

হযরত আবুযর (রাঃ) নিজেদের গোত্রে প্রত্যাবর্তন করে তাদের ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। গোত্রের অর্ধেক লোক সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়ে গেলেন। অবশিষ্ট লোকজন এ বলে আশ্বাস দিল যে মহানবী (সাঃ) মদীনায় এলে তারাও মুসলমান হয়ে যাবে। পরবর্তীকালে তাই হয়। মহানবী (সাঃ) মদীনায় হিজরত করতেই গেফার গোত্রের অবশিষ্ট লোকজনও মুসলমান হয়ে গেলেন। গেফার গোত্রের নিকটেই ছিল আসলাম গোত্র। উভয় গোত্রের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই সুসম্পর্ক ছিল। ফলে, গেফার গোত্রের প্রভাবে আসলাম গোত্রও মুসলমান হয়ে গেল। (অথচ ইসলামপূর্বকালে এ দুটি গোত্রই চৌর্যবৃত্তির কারণে কুখ্যাত ছিল। তারা একথাও জানত যে ইসলাম চৌর্যবৃত্তির ঘোর বিরোধী)।

হজের মওসুমে মক্কায় অধিকাংশ গোত্রের সমাবেশ হত। এ সময় মহানবী (সাঃ) প্রতিটি গোত্রের বাসস্থানে যেতেন এবং তাদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন। মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দল এ সময়েই ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর হযরত মুসআব ইবনে ওমায়র যখন ইসলাম প্রচারকরূপে মদীনায় প্রেরিত হন, তখন তাঁর তবলীগের ফলে কয়েক মাসের মধ্যেই দুটি গোত্র ব্যতীত সবাই মুসলমান হয়ে যায়। গেফার ও আসলাম গোত্রের মুসলমান হবার কিছুদিন পরই বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে কোরাইশরা পরাজিত হয় ও তাদের সত্তর জন যোদ্ধা মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। এসব বন্দীকে মুক্ত করার জন্য কোরাইশরা মদীনায় যাতায়াত শুরু করে। ফলে, মুসলমানদের সঙ্গে তাদের মেলামেশার সুযোগ হয়। এ মেলামেশার প্রভাবে বেশ কিছু সংখ্যক কোরাইশ ইসলাম গ্রহণ করে।

এদের মধ্যে বহু লোক ছিল ঘটনাক্রমে যাদের কানে কোরআন মজীদের আওয়াজ এসে পৌছায়। এর পর আর কি! কঠোর শত্রুতা সত্ত্বেও তাদের পাষাণ হৃদয় মোমের মত গলে গেল। যুবাইর ইবনে মুতইম বদরের বন্দীদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত করতে এসে নিজেও বন্দী হয়ে পড়েন। একদিন মহানবী (সাঃ) নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করছিলেন ঃ

"—তারা কি আপনা আপনিই পয়দা হয়ে গেছে, না তারা নিজেরা নিজেদেরই পয়দা করেছে, না তারা আসমান ও যমিনকে পয়দা করেছে? বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে তাদের বিশ্বাস নেই।"—(সূরা তুর)

যুবাইর ইবনে মুতইম এ আয়াতগুলো শুনে ফেললেন। নিজেই বর্ণনা করেন, "আয়াতগুলো শোনার পর আমার মনে হল যেন প্রাণ উড়ে গেছে।"—(বোখারী)

রোম ও পারস্যের মধ্যে অনুষ্ঠিত যুদ্ধ সম্পর্কে রসূলে মকবুল (সাঃ) মক্কায় যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা বদর যুদ্ধের সময় বাস্তবে পরিণত হয় এবং কোরআন মজীদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সাত বছর পর রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ বিজয় লাভ করে। এ বিরাট মোজেযার ফলে বহুলোক ইসলামের সত্যতা স্বীকার করে নেয়।

মোটকথা, এভাবে সত্যের প্রভায় অত্যন্ত শ্লথগতিতে ইসলাম চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করতে লাগল। পঞ্চম হিজরীতে কোরাইশ, কেনানা, গাতফান, আসাদ ও অন্যান্য গোত্র সম্মিলিতভাবে মদীনা আক্রমণ করল এবং পরাজয় বরণ করল। এ যুদ্ধের নাম আযহাব। এর বিবরণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এ পরাজয়ের ফলে কোরাইশদের প্রভাব বহুল পরিমাণে হ্রাস পেল। পূর্বে যে সব গোত্র ইসলাম গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল; কিন্তু কোরাইশদের ভয়ে তা মুখে প্রকাশ করার সাহস পেত না, তারা এখন মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে প্রতিনিধিদল পাঠাতে লাগল। সর্বপ্রথম মুযাইনা গোত্রের চারশ' সদস্য সংবলিত একটি প্রতিনিধিদল এল। তারা ইসলাম গ্রহণ করার পর মদীনায় হিজরত করারও আগ্রহ প্রকাশ করল এবং মহানবী (সাঃ)-এর অনুমতি প্রার্থনা করল। কিন্তু তিনি বললেন ঃ তোমরা যেখানেই থাকবে মুহাজির বলেই গণ্য হবে।

এ সময়েই আশ্জা গোত্রের পক্ষ থেকে একশ' জনের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় এসে মহানবী (সাঃ)-কে বললঃ আমরা আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই না; বরং শান্তি চুক্তি চাই। মহানবী (সাঃ) তাদের এ আবেদন কবুল করলেন। তখনও তারা কাফের ছিল; কিন্তু শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হবার পর সবাই স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়ে গেল।

জুহাইনা গোত্রও এসব গোত্রের আশপাশেই বাস করত। মহানবী (সাঃ) তাদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা তৎক্ষণাৎ এক হাজার লোকের একটি দল নিয়ে মদীনায় এল এবং মুসলমান হয়ে গেল। এর পর অধিকাংশ যুদ্ধে তারা মুসলমানদের পক্ষে অংশগ্রহণ করেন।

গেফার, আসলাম, মুযাইনা, আশজা, এবং জুহাইনা গোত্রের এ আনুগত্য ও প্রথমে ইসলাম গ্রহণের কারণেই মহানবী (সাঃ) তাদের পক্ষে নেক দোয়া করেন।

পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে যে হোদায়বিয়ার সন্ধির পরবর্তী সময়ে কাফের ও মুসলমানগণ পরস্পর অত্যন্ত স্বাধীন পরিবেশে মেলামেশা করত। এ কারণে অবিশ্বাসীরা প্রকাশ্যে ও নির্জনে মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষার বিষয় শোনার ও দেখার সুযোগ পায়। ফলে, ইতিপূর্বে যুদ্ধ ও সংঘর্ষ সত্ত্বেও যে পরিমাণ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল, মেলামেশার সুযোগে দু'বছরে তাদের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেল। সে মতে হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর মহানবী (সাঃ) যখন ওমরা আদায়ের উদ্দেশে মদীনা থেকে রওয়ানা হন, তখন মাত্র দেড় হাজার মুসলমান তাঁর সঙ্গে ছিল। কিন্তু দু'বছর পর মক্কা বিজয়ে রওয়ানা হওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে ছিল দশ হাজার মুসলমানের একটি বিরাট বাহিনী।

হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রভাব সমগ্র আরবের ওপর পড়েনি। কেননা, এ চুক্তিতে শুধু কোরাইশ ও কেনানা গোত্রই শরীক ছিল। এ কারণে যেসব গোত্র সরাসরি কোরাইশদের প্রভাবাধীন অথবা তাদের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল না, তারা তখনও মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। ফলে, প্রতিরক্ষার উদ্দেশে মহানবী (সাঃ)-কে কিছু সৈন্য পাঠাতে হত। সেসব ক্ষেত্রে অবস্থা কিছুটা অনুকূল বলে মনে হত, সেখানে লোকদের ইসলামের প্রতি আহ্বান করার জন্য প্রচারক পাঠানো হত। তবে যেহেতু আত্মরক্ষার খাতিরে এসব প্রচারকের সঙ্গে স্বল্প সংখ্যক সৈন্যও থাকত, এজন্য ঐতিহাসিকগণ এ জাতীয় প্রচারকদলকেও অভিযানরূপেই বর্ণনা করেছেন।

সমগ্র আরব কাবাগৃহের রক্ষণাবেক্ষণের কারণে কোরাইশদেরকে ধর্মীয় নেতা মনে করত। এ কারণে তারা কোরাইশদের পরিণতি দেখার জন্য অপেক্ষা করছিল। সাহাবী আমর ইবনে সালমা মদীনা থেকে অনেক দূরে একটি সাধারণ রাস্তার ধারে বসবাস করতেন। বুখারী শরীফে তাঁর নিম্নোদ্ধৃত উক্তি বর্ণিত হয়েছে ঃ

—"সমগ্র আরব কোরাইশদের ইসলাম গ্রহণের অপেক্ষা করছিল। তারা বলত, মোহাম্মদ (সাঃ)-কে তার স্বগোত্রের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে দাও। যদি তিনি জয়ী হন, তবে নিঃসন্দেহে তিনি সত্য নবী। সুতরাং যখন মক্কা বিজিত হল, তখন প্রত্যেক গোত্রই একে একে ইসলাম গ্রহণ করল।"

ইবনে হিশাম পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন ঃ আরবরা ইসলামের ব্যাপারে শুধু কোরাইশদের অপেক্ষায় ছিল। কারণ, কোরাইশরাই ছিল দেশের নেতা, ধর্মগুরু, কাবা ও হরমের তত্ত্বাবধায়ক, হযরত ইসমাঈলের (আঃ) বংশধর এবং আরবের সে রাজগোষ্ঠী। এছাড়া তারাই মহানবী (সাঃ)-এর বিরোধিতায় যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল। কাজেই যখন মক্কা বিজিত হল, কোরাইশরা পরাজয় বরণ করল এবং ইসলাম গোটা মক্কায় ছেয়ে গেল। তখন সমগ্র আরব সন্দেহাতীতভাবে বুঝতে পারল যে মহানবী (সাঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধ অথবা শত্রুতা পোষণ করার শক্তি কোরাইশদের নেই। কাজেই তারা আল্লাহ্র ধর্মে দাখিল হয়ে গেল। যেমন, আল্লাহ্ কোরআনে বলেন ঃ

"যখন আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় উপস্থিত হল এবং তুমি দেখলে যে লোকেরা দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে দাখিল হচ্ছে ..... ।"

মোটকথা, ইসলামের সত্যতা, বুদ্ধিগ্রাহ্যতা এবং আরবদের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার দিক দিয়ে ইসলামের প্রসার লাভে যে সময় লেগেছিল, তা প্রধানত গোত্রগত ও পারিবারিক বিরোধিতার কারণেই ছিল। এখন যখন যাত্রাপথ থেকে মিথ্যার পাথর সরে গেল, তখন সত্যের অগ্রাভিযানে দেরি না হবারই কথা।

মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এরূপ কোন ভয় থাকল না যে ইসলাম প্রচারকগণ যেখানেই যাবেন, তাদের বিনাদ্বিধায় হত্যা করা হতে পারে। তাই মহানবী (সাঃ) আরবের কোণে কোণে প্রচারকদল পাঠিয়ে দিলেন—যাতে তাঁরা মানুষের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য ও গুণাবলী বর্ণনা করেন এবং ইসলামের প্রতি উৎসাহিত করেন।

নিম্নবর্ণিত পন্থায় প্রচারকদল নিযুক্ত করা হয় ঃ

(১) কোন কোন প্রচারকদের সঙ্গে আত্মরক্ষার স্বল্প পরিমাণ সৈন্যও দেয়া হয়—যাতে কেউ তাঁদের ক্ষতিসাধন করতে না পারে এবং তাঁরা স্বাধীনভাবে ইসলাম প্রচার করতে পারেন। হযরত খালেদকে যখন মহানবী (সাঃ) ইয়ামনে প্রেরণ করেন, তখন তাঁর সঙ্গে কিছু সৈন্যও দেন কিন্তু কারও সঙ্গে জোর-জুলুম না করার জন্য কঠোর ভাষায় তাকিদ করে দেন। হযরত খালেদ পূর্ণ ছয় মাস চেষ্টা করেও কিছু করতে পারলেন না। একটি লোকও তাঁর হাতে মুসলমান হল

না। তিনি ছিলেন বিজয়ী সেনানায়ক—উপদেশদাতা বা পথপ্রদর্শক ছিলেন না। এ কারণে মহানবী (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) পাঠালেন। তিনি যখন উপজাতীয়দের সামনে প্রচারকার্য আরম্ভ করলেন, তখন গোটা দেশ একযোগে মুসলমান হয়ে গেল।

এ শ্রেণীর প্রচারক দল সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লামা তাবারী বলেন ঃ মহানবী (সাঃ) মক্কার আশপাশে কয়েকটি দল পাঠিয়েছিলেন—যাতে তারা মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করে; কিন্তু তাদের যুদ্ধ করার নির্দেশ দেননি।

হযরত খালেদকে বনী জুযাইমা গোত্রে ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠানো হয়। তিনি সেখানে কিছু রক্তপাত ঘটান। মহানবী (সাঃ) এ সংবাদ শোনা মাত্রই সোজা দাঁড়িয়ে পড়েন এবং কেবলার দিকে দু'হাত তুলে বলতে থাকেন ঃ আয় আল্লাহ্! আমি খালেদের এই কৃতকর্মের জন্য দায়ী নই। এর পরই হযরত আলীকে (রাঃ) সেখানে পাঠান। তিনি প্রতিটি নিহত ব্যক্তির এমন কি, প্রতিটি নিহত কুকুরেরও রক্ত বিনিময় প্রদান করেন।

ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে যে সমস্ত সশস্ত্র দল দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হত, মহানবী (সাঃ) মাঝে মাঝে প্রত্যেকের পরীক্ষা নিতেন। তাঁদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোরআনের বেশি হাফেয হতেন, তিনিই দলের আমীর নিযুক্ত হতেন। মহানবী (সাঃ) এ রকম একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করতে চাইলে প্রত্যেকেরই কোরআন পাঠ শোনেন।[১] তাদের মধ্যে একজন ছিল অল্পবয়স্ক যুবক। মহানবী (সাঃ) তাকে বললেন ঃ তোমার কতটুকু মুখস্থ আছে? যুবক বলল ঃ আমার সূরা বাকারা এবং অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে। তিনি বললেন ঃ তবে তুমিই সবার আমীর।—(তরগীব ও তরহীব —প্রথম খণ্ড ২৫৯ পৃঃ)

(২) অধিকারভুক্ত দেশসমূহে যাকাৎ জিযিয়া আদায় করার জন্যে কর্মচারী পাঠানো হত। এসব কর্মচারীর অধিকাংশ এমন হতেন যাদের ধার্মিকতা, সংসারের প্রতি অনাসক্তি এবং পবিত্রতা সর্বজনস্বীকৃত হত। ফলে, তাঁরা আলেম ও ওয়ায়েয (উপদেশদাতা) হতেন। তাঁরা অর্থ আদায়ে সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম প্রচারের দায়িত্বও সম্পাদন করতে পারতেন। তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজনের নাম নিচে দেয়া গেল ঃ

১. এ রেওয়ায়েতে অবশ্য এ বিষয়ের পরিষ্কার উল্লেখ নেই যে এ সেনাবাহিনী ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছিল। শুধু এতটুকু উল্লেখ আছে যে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একটি বিরাট দল প্রেরণ করলেন; তবুও লক্ষণাদি দৃষ্টে জানা যায় যে ইসলাম প্রচারই এর উদ্দেশ্য ছিল। কেননা, যুদ্ধ উদ্দেশ্য হলে কোরআন মুখস্থ থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না এবং তিনি প্রত্যেকের কোরআন পাঠ শুনতেন না।

নাম	কর্মস্থল	পরিচয়
মুহাজির ইবনে আবী উমাইয়্যা	ইয়ামনের সানআ	মহানবী (সাঃ)-এর পত্নী হযরত উম্মে সালমার ভাই।
যিয়াদ ইবনে ওলীদ	হাযরামাউত	বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারিগণের অন্যতম।
খালেদ ইবনে সায়ীদ	ইয়ামনের সানআ	প্রথম সুনো ইসলাম গ্রহণকারী, আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী, তিনিই প্রথম কাগজে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখেন।
আদী ইবনে হাতেম	ইয়ামনের তাঈ গোত্রগত	প্রসিদ্ধ দাতা হাতেম তাঈ-এর পুত্র।
আলী ইবনে হাযরামী	বাহ্রায়েন	হাযরা মওতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব
হযরত আবু মূসা আশআরী	যুবাইদ ও আদন	তাঁর প্রচারকার্যে প্রায় সবাই মুসলমান হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ আলেম সাহাবী।
হযরত মুআয ইবনে জবল	জুন্দ	বিখ্যাত আলেম সাহাবী

জরীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী, যুলকেলা, হেমইয়ারী, হযরত জরীর খ্যাতনামা সাহাবী ছিলেন। যুলকেলা হেমইয়ারী ইয়ামনের রাজবংশের লোক ছিলেন। একবার এক লক্ষ মানুষ মিলে তাঁকে সেজদা করেছিল। হযরত জরীরের আহ্বানে তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন এ আনন্দে চার হাজার ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেন।

(৩) কিছুসংখ্যক লোক বিশেষভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশেই প্রেরিত হন। এ শ্রেণীর প্রচারকের নাম অনুসন্ধানের পর নিম্নরূপ পাওয়া যায় ঃ

নাম	কর্মস্থল	নাম	কর্মস্থল
আলী ইবনে আবী তালেব	হামদান জুমায়মা ও মাযহাজ গোত্র	খালেদ ইবনে ওলীদ	মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকা
মুগীরা ইবনে শো'বা	নাজরান	আমর ইবনুল আস	আম্মান
ওবর ইবনে এয়াখনাস	পারস্য	মুহাজির ইবনে আবী উমাইয়া	ইয়ামনের যুবরাজ হারেস ইবনে আবদে কেলাল।
মুহীসা ইবনে মসউদ	ফদক		
আহনাফ	সুলাইম গোত্র		

(মুসনাদ, ৫ খণ্ড, ৩১২ পৃঃ)

(৪) কোন কোন গোত্রপতি মহানবী (সাঃ)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করতেন এবং কিছুকাল ওখানে অবস্থান করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন। অতঃপর ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ গোত্রে প্রত্যাবর্তন করতেন। তাঁদের নাম নিম্নরূপ ঃ

নাম	কর্মস্থল	নাম	কর্মস্থল
তোফায়েল ইবনে আমর দওসী	দওস গোত্র	যেমাম ইবনে সা'লাবা	বনু সা'আদ গোত্র
ওরওয়া ইবনে মসউদ	সকীফ গোত্র	মানযার ইবনে হাব্বান	বাহুরায়েন
আমের ইবনে শহর	হামদান গোত্র	সুমামা ইবনে আসাল	নজদের পার্শ্ববর্তী এলাকা

এসব মুবাল্লিগ ও প্রচারকদের চেষ্টায় ইসলাম দ্রুতগতিএসর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করেছিল। পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে, মক্কা বিজয়ের পর মক্কার চারদিকে প্রচারক দল প্রেরণ করা হয় এবং সকলেই আনন্দিত মনে মুসলমান হতে থাকে। কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ এ দিকেই ইঙ্গিত করে ঃ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

"আল্লাহর সাহায্য আসার পর আপনি দেখেছেন, লোকেরা দলে দলে আল্লাহর ধর্মে প্রবেশ করছে।"

মক্কা বিজয়ের তিন মাস পর নবম হিজরীর জিলহজ মাসে হজের সময় কাফেরদের সঙ্গে সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি ঘোষণা করা হয়। এ ঘটনার পর হেজাযের সমস্ত লোক সাধারণভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হেজাযের বাইরে নবুওতের একুশ বছরে শুধু কোরাইশ ও ইহুদীদের বাধা প্রদানের কারণে ইসলাম অগ্রসর হতে পারেনি; খুব নগণ্যসংখ্যক মুসলমানই দেখা যেত। কিন্তু বাধার প্রাচীর অপসারিত হওয়ার পরই মাত্র তিন বছরে (৭,৯ ও ১০ হিজরীতে) ইসলামের প্রভাব একদিকে ইয়ামন, বাহুরায়েন, ইয়ামামা, আম্মান এবং অপরদিকে ইরাক ও সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেল। এগুলো আরবেরই প্রদেশ। ইসলামপূর্বকালে এসব প্রদেশে আরবদের বিরাট বিরাট রাষ্ট্র ছিল এবং তখনকার সময়ে এগুলো বিশ্বর দুটি বৃহৎ শক্তি—রোম ও পারস্যের অধীনে ছিল। এতদসত্ত্বেও ইসলাম তরবারির সাহায্য ছাড়াই—সন্ধি ও শান্তির ছায়াতলে আওয়াজ তুলে যেতে থাকে এবং চারদিক থেকে স্বেচ্ছায় সে আওয়াজের প্রতি লাব্বায়কা ধ্বনি আসতে থাকে।

ইয়ামন

আরবের প্রদেশসমূহের মধ্যে ইয়ামন ছিল সব চাইতে উর্বর ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল। প্রাচীনকাল থেকেই এটি ছিল একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্র। সাবা ও হেমইয়ারীদের বিশাল সাম্রাজ্য এখানেই অবস্থিত ছিল। মহানবী (সাঃ)-এর জন্মের প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে ৫২৫ খৃষ্টাব্দে আবিসিনিয়ার খৃষ্টানরা ইয়ামন দখল করে নেয় এবং মহানবী (সাঃ)-এর জন্মের কয়েক বছর পর পারসিকদের হস্তগত হয়। তাদের পক্ষ হতে একজন প্রশাসক ইয়ামনের শাসনকার্য পরিচালনা করত।

ইয়ামনে ইসলামী আন্দোলনের পথে কয়েকটি বাধা ছিল। উদাহরণত জাতিগত পার্থক্য। ইয়ামনবাসীদের জাতীয়তা ছিল কাহ্‌তানী এবং ইসলাম প্রচারক মহানবী (সাঃ) জাতীয়তায় ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর রক্তধারার অন্তর্গত। ইয়ামনবাসীরা নিজেদের প্রাচীনত্ব, জাঁকজমক, তমদ্দুন ও রাজ্য শাসন নিয়ে গর্ববোধ করত এবং সমগ্র আরব যথার্থভাবেই তাদের অগ্রগামিতা স্বীকার করত। গোটা আরবে ইয়ামনীরাই রাজ্য শাসনের যোগ্য বলে বিবেচিত হত। দেশের বুকে যেখানেই নিয়মতান্ত্রিক সরকার ছিল, তা বংশগত দিক দিয়ে ইয়ামনী বংশের বলেই গণ্য হত। এ কারণেই ইয়ামনের রাজবংশোদ্ভূত কেন্দা গোত্রের প্রতিনিধিদল যখন মক্কায় আগমন করে, তখন মহানবী (সাঃ) কে একজন আরব শাসনকর্তা মনে করে প্রতিনিধি দলের নেতা জিজ্ঞেস করে ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি এবং আমরা কি একই বংশোদ্ভূত নই? তিনি উত্তরে বললেনঃ না, আমরা নযর ইবনে কেনানার বংশের লোক। আমরা না আপন মায়ের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করতে পারি, না নিজের পিতাকে অস্বীকার করতে পারি।—(ইবনে হাম্বল, আশআস ইবনে কায়েসের হাদীস, যাদুল মা'আদ, প্রথম খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা)।

ইয়ামনে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সব চাইতে বড় বাধা হতে পারত, তা এই যে ইয়ামন রাজনৈতিক দিক দিয়ে পারসিকদের অধীন ছিল এবং বাশিন্দারা ধর্মের দিক দিয়ে সাধারণত ইহুদী অথবা খৃষ্টান ছিল। কিন্তু সত্য গ্রহণের ক্ষেত্রে এগুলো কোন বাধাই সৃষ্টি করতে পারল না।

হিজরতের অনেক পূর্বেই ইয়ামনে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গিয়েছিল। ইয়ামনে দওস একটি বিশিষ্ট গোত্র ছিল। এ গোত্রের সরদার তোফায়েল ইবনে আমর ঘটনাক্রমে মক্কায় এসে মুসলমান হয়ে যান। একই সময় কেন্দা গোত্রের কিছু লোক হজ উপলক্ষে মক্কায় আসে। মহানবী (সাঃ) তাদের ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা অস্বীকার করে— (ইবনে হিশাম) সপ্তম হিজরীতে যখন হুযুর (সাঃ) খায়বরে অবস্থান করছিলেন, তখন দওস গোত্র মুসলমান হয়ে মদীনায় স্থানান্তরিত হয়। ইয়ামনের আর একটি প্রসিদ্ধ গোত্র ছিল আশআর। তারাও আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেএবং মহানবী

(সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। আবু হোরায়রা দওসী এবং আবু মূসা আশআরী (রাঃ) এসব গোত্রের সঙ্গেই হুযুরের খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

ইয়ামনে হামদান ছিল সবচাইতে অধিক জনবহুল ও প্রভাবশালী পরিবার। মহানবী (সাঃ) অষ্টম হিজরীতে তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছাবার জন্য হযরত খালেদকে পাঠান। হযরত খালেদ ছয় মাস ধরে তাদের ইসলামের প্রতি আহ্বান করতে থাকেন। কিন্তু কেউই কবুল করল না। অবশেষে মহানবী (সাঃ) খালেদকে ডেকে পাঠান এবং তদস্থলে হযরত আলীকে (রাঃ) পাঠিয়ে দেন। হযরত আলী (রাঃ) হামদান পরিবারকে একত্রিত করে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পত্র পাঠ করে শোনান। দেখতে দেখতে সারা গোত্র মুসলমান হয়ে যায়। হযরত আলী (রাঃ) মহানবী (সাঃ)-এর নিকট এ সংবাদ প্রেরণ করলে তিনি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সেজদা করেন এবং দুবার এই দোয়া উচ্চারণ করেন ঃ

"হামদানের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।"[১]

কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে— হামদান গোত্র ইসলামের জয়-জয়কার শুনে আমের ইবনে শহরকে মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দেয় এবং একথা বলে দেয় ঃ "যদি এ ধর্ম তোমার পছন্দ হয়, তবে আমরাও এটি গ্রহণ করতে প্রস্তুত। পক্ষান্তরে, যদি তুমি পছন্দ না কর, তবে আমরাও তোমার সঙ্গে আছি।" আমের ইবনে শহর ইসলামের আলোকে আলোকিত হয়ে মহানবী (সাঃ)-এর খেদমত থেকে প্রত্যাবর্তন করে। অতঃপর সঙ্গে সঙ্গে সবাই মুসলমান হয়ে যায়। সম্ভবত উপরোক্ত দুটি রেওয়ায়েতেই বাস্তব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং হযরত আলী ও আমের ইবনে শহর উভয়ের চেষ্টায়ই এই সাফল্য অর্জিত হয়েছিল।

ইয়ামনের অধিবাসীরা হযরত আলীর (রাঃ) সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। দশম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মহানবী (সাঃ) তিনশ' অশ্বারোহী সৈন্যের হেফাযতে পুনরায় হযরত আলীকে (রাঃ) ইয়ামনের মাযহাজ গোত্রে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ আক্রমণ না করা পর্যন্ত তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করে দেন। হযরত আলী (রাঃ) মাযহাজ গোত্রে পৌছে রাজস্ব আদায় করার জন্য এদিক-সেদিক লোক নিযুক্ত করলেন। ইতিমধ্যে মাযহাজ গোত্রের একটি দল দেখা গেল। হযরত আলী (রাঃ) তাদের ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। কিন্তু ওরা এ দয়া ও অনুগ্রহের উত্তরে তীর ও পাথর বর্ষণ আরম্ভ করে দিল। এ অবস্থা দেখে হযরত আলীও সঙ্গীদিগকে সারিবদ্ধ হতে নির্দেশ দিলেন। কিছুক্ষণ পরই বিশটি মৃতদেহ ফেলে রেখে

---

১. যারকানী— আসল ঘটনা, বুখারী শরীফের গযওয়াত অংশে বর্ণিত; কিন্তু তাতে বিশেষভাবে হামাদানের কথা বলা হয়নি এবং তাদের ইসলাম গ্রহণেরও উল্লেখ নেই। এ ঘটনা সম্পর্কে আরও অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে।

মাযহাজীরা পালিয়ে যায়। মুসলমান সৈন্যরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল না। কারণ, তাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু আত্মরক্ষা করা। এর পর গোত্রের সরদারগণ উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল এবং অপরাপর লোকদের পক্ষ থেকেও ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করল।— (ইবনে সা'দ, মাগাযী অংশ)

ইয়ামনে পারস্যের কিছুসংখ্যক সরদার বসবাস করত। তাদের বলা হত আবনা। দশম হিজরীতে রসূল (সাঃ) ওবর ইবনে এয়াখনাসকে ইসলাম প্রচারের জন্য তাদের নিকট পাঠান। তিনি নোমান ইবনে বুযুর্জের ঘরে মেহমান হন এবং ফিরোজ দায়লমী, মারকাবুদ ও ওহাব ইবনে মুনাব্বেহের নিকট ইসলামের আহ্বান জানিয়ে পত্র পাঠান। অতঃপর সবাই নির্বিবাদে ইসলাম গ্রহণ করলেন। সান্আয় সর্বপ্রথম যারা কোরআন মজীদ হেফ্য করেন, তারা হলেন মারকাবুদের দুই পুত্র আতা এবং ওহাব ইবনে মুনাব্বেহ্। —(তাবারী ১৭৬৩ পৃঃ)

সাধারণভাবে ইয়ামনে ইসলাম প্রচারের জন্য মহানবী (সাঃ) মা'আয ইবনে জবল এবং আবু মূসা আশআরীকে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁরা উভয়েই এক-একটি অঞ্চলের দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত হন। রওয়ানা হওয়ার সময় মহানবী (সাঃ) প্রচারকার্যের যে মূলনীতি বাতলে দিলেন তা হল এই ঃ সহজ পন্থায় কাজ করবে। কঠোরতা করবে না। জনসাধারণকে সুসংবাদ দেবে— ঘৃণা সৃষ্টি করবে না। উভয়ে মিলেমিশে কাজ করবে। তোমরা সেখানে এমন লোক পাবে যারা পূর্ব থেকে একটি ধর্মে বিশ্বাস করে, তাদের কাছে গিয়ে প্রথমে তাদের তওহীদ (আল্লাহ্র একত্ববাদ) এবং রসূলের রেসালতের প্রতি আহ্বান জানাবে। তারা তা মেনে নিলে বলবে আল্লাহ্-তা'আলা দিবারাত্র পাঁচ ওয়াক্তের নামাযও ফরয করেছেন। যখন তাও মেনে নেবে তখন যাকাৎ ফরয হওয়ার কথা বলবে এবং একথাও বলবে যে তোমাদের মধ্যে যারা ধনী, তাদের কাছে থেকে এই যাকাৎ আদায় করে তোমাদেরই দরিদ্র লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। যখন তারা যাকাৎ দিতে সম্মত হবে, তখন বেছে বেছে কেবল ভাল জিনিসগুলোই যাকাৎ হিসাবে আদায় করবে না। উৎপীড়িতদের বদ-দোয়াকে সর্বদা ভয় করে চলবে। কারণ, উৎপীড়িতের অভিশাপ এবং আল্লাহ্র মধ্যে কোন অন্তরাল নেই। সাহাবী প্রশ্ন করলেন, ইয়ামনে যব এবং মধু দ্বারা এক প্রকার শরাব তৈরি করা হয়, তাও কি হারাম? তিনি বললেনঃ যে সব পানীয় নেশা সৃষ্টি করে তাই হারাম।— (বোখারী গযওয়াত অংশ)

নাজরান

ইয়ামনের সন্নিকটেই নাজরান অবস্থিত। আরবে এটি ছিল খৃষ্টানদের প্রধান কেন্দ্র। মহানবী (সাঃ) মুগীরা ইবনে শো'বাকে ইসলাম প্রচারের জন্যে নাজরানে পাঠালেন। তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর অর্থাৎ, সপ্তম হিজরীর পূর্বেই মুসলমান হয়েছিলেন। নাজরানের খৃষ্টানরা কোরআন মজীদের উপর বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন

করতে লাগল। তিনি উত্তর দিতে অসমর্থ হয়ে ফিরে এলেন,—(তিরমিযী)। এরপর মহানবী (সাঃ) ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে খৃষ্টানদের কাছে পত্র পাঠালেন। পত্রে লিখিত ছিল ঃ যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ না কর, তবে ইসলামের রাজনৈতিক আনুগত্য স্বীকার করে নাও এবং জিযিয়া দান কার—(যারকানী)। নাজরানবাসীরা সরেজমিনে অবস্থা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশে পাদ্রী এবং ধর্মীয় নেতাদের একটি দল মদীনায় পাঠাল। এ প্রতিনিধিদলের বিবরণ পরে বর্ণিত হবে।

নাজরানে খৃষ্টানদের ছাড়া কিছুসংখ্যক মুশরিকও বসবাস করত। তাদের মধ্যে একটি গোত্র ছিল বনু হারেস ইবনে যিয়াদ। মদান নামক একটি মূর্তির পূজা করার কারণে তারা আবদুল মদান (মদানের দাস) নামে খ্যাত ছিল। দশম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মহানবী (সাঃ) খালেদ ইবনে ওলীদকে সেখানে ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠালেন। তিনি সেখানে পৌছাতেই সমস্ত গোত্র মুসলমান হয়ে গেল। হযরত খালেদ এখানে কিছুদিন অবস্থান করে মুসলমানদের কোরআন ও ইসলামের আহকাম শিক্ষা দেন। (যারকানী তৃতীয় খণ্ড, ১১৬ পৃঃ)

ইয়ামনবাসীদের কোনরূপ উৎসাহ প্রদান অথবা ভীতি প্রদর্শন ব্যতিরেকেই ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনাটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র বিশেষ রহমত লাভের কারণ ছিল। এ কারণেই যখন আশআরী গোত্রের আগমনের সংবাদ প্রচারিত হল, তখন মহানবী (সাঃ) মুসলমানদের সুসংবাদ দিলেন ঃ আগামী কাল ইয়ামনবাসীরা আগমন করছে। তারা কোমল প্রাণ, (বোখারী)। হাসান গোত্র মুসলমান হলে মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক সেজদা করেন এবং তাদের জন্য শান্তির দোয়া করেন—(যারকানী)। হেমইয়ার ও তামীম গোত্রের প্রতিনিধিদল আগমন করলে প্রথমে তিনি তামীম গোত্রকে সম্বোধন করেন ঃ তামীম গোত্রীয়গণ! সুসংবাদ গ্রহণ কর। তামীম গোত্রের লোকেরা বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমরা সুসংবাদ কবুল করলাম বটে, কিন্তু আমাদের কিছু দান করতে আদেশ করুন। হুযুর (সাঃ) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, সুসংবাদের চাইতে উত্তম দানের বস্তু আর কি হতে পারে? অতঃপর ইয়ামনবাসীদের দিকে মুখ করে বললেন ঃ ইয়ামনবাসিগণ, তামীম গোত্র সুসংবাদ কবুল করেনি, তোমরা কবুল করে নাও। ইয়ামনবাসীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠল ঃ হে আল্লাহ্র রসূল! আমরা কবুল করলাম,—(বোখারী)। অতঃপর তিনি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ "ইয়ামনের ঈমানই প্রকৃত ঈমান এবং ইয়ামনের জ্ঞানগরিমাই প্রকৃত জ্ঞানগরিমা!"

ইয়ামনে ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে শুধু হযরত আলী ও আবু মুসাই (রাঃ) বিদায় হজের সময় ইয়ামন থেকে ফিরে এসে মহানবী (সাঃ)-এর সঙ্গে হজব্রত পালন করেন। তাঁদের সঙ্গে ইয়ামনের বহুসংখ্যক নওমুসলিমও হজ ও যিয়ারতের উদ্দেশে আগমন করেছিলেন।

বাহ্‌রাইন ঃ ৮ম হিজরী

বাহ্‌রাইন ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। আরবের উপজাতীয়রা উপত্যকা ও মরূদ্যানে বসবাস করত। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী পরিবার ছিল কায়েস, বকর ইবনে ওয়ায়েল এবং তামীম। একবার আবদুল কায়েস গোত্রের মানকায ইবনে হাব্বান ব্যবসায়ের উদ্দেশে গৃহত্যাগ করেন। পথিমধ্যে মদীনায় উপস্থিত হয়ে কিছু সময় সেখানে অবস্থান করেন। তখন মহানবী (সাঃ) জানতে পেরে তাঁর নিকট গেলেন এবং ইসলামের দাওয়াত দিলেন। মানকায ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং সূরা ফাতেহা ও সূরা ইক্‌রা শিখে নিলেন। মহানবী (সাঃ) তাঁকে একটি ফরমান দিলেন। তিনি সফর থেকে গোত্রে ফিরে কিছুদিন পর্যন্ত তা প্রকাশ করলেন না। একদিন তাঁর পত্নী তাঁকে নামায পড়তে দেখে পিতা মুনযের ইবনে আয়েযের কাছে অভিযোগ করল। মুনযের মানকাযকে জিজ্ঞাসাবাদ করল। কিছুক্ষণ তর্কবিতর্কের পর মুনযেরও মুসলমান হয়ে গেলেন এবং হুযুর (সাঃ)-এর ফরমান অন্যান্য সবাইকে পড়ে শোনালেন। এভাবে সমগ্র গোত্রটিই মুসলমান হয়ে গেল।[1]

সহীহ্ বোখারী (কিতাবুল জুমা)-তে বর্ণিত আছে, মসজিদে নববীর পরেই যে মসজিদে সর্বপ্রথম জুমার নামায আদায় করা হয়, তা বাহ্‌রায়েনের জাওয়াসী নামক স্থানে অবস্থিত মসজিদ। এতে প্রমাণিত হয় যে প্রাথমিক যুগেই বাহ্‌রায়েনে ইসলাম প্রসার লাভ করেছিল।

ইসলাম গ্রহণ করার পর আবদুল কায়েস গোত্রীয়গণ চৌদ্দ ব্যক্তির একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে পাঠান। এ দলের নেতা ছিলে মুনযের ইবনে হারেস। এ কাফেলাটি মহানবী (সাঃ)-এর বাসগৃহের নিকটে পৌঁছালে সবাই ব্যাকুলচিত্তে উট থেকে লাফিয়ে পড়েন এবং দৌড়ে গিয়ে মহানবী (সাঃ)-এর হস্ত চুম্বন করেন। কিন্তু দলের নেতা শিষ্টাচার রক্ষার তাকিদে এরূপ করলেন না। তিনি বাসস্থানে গিয়ে প্রথমে পোশাক পরিবর্তন করেন এবং পরে এসে মহানবী (সাঃ)-এর হস্ত চুম্বন করেন। দলপতির এ শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণ নবী করীমের (সমাঃ) প্রশংসা অর্জন করেছিল।—(যারকানী)

অষ্টম হিজরীতে হুযুর (সাঃ) হাযরামীকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে বাহ্‌রায়েন প্রেরণ করেন। তখন সেখানে পারস্য সম্রাটের পক্ষ থেকে মুনযের ইবনে সাওয়া শাসক ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আরব এবং সেখা বসবাসকারী কিছুসংখ্যক অনারবও মুসলমান হয়ে গেলেন। (ফুতুহুল বুলদান)

১. যারকানী—সহীহ্ বোখারীতে আবদুল কাযেস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের উল্লেখ আছে। এটি পরবর্তী ঘটনা। বোখারীর রেওয়ায়েত হতেও জানা যায় যে আবদুল কায়েস গোত্র এ প্রতিনিধিদল প্রেরণের পূর্বেই মুসলমান হয়েছিল। এসাবা গ্রন্থে ইবনে শাহীন বর্ণিত রেওয়ায়েত যারকানীর রেওয়ায়েত থেকে ভিন্ন। তাতে প্রতিনিধিদলের নেতার নামও অন্যরকম। এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন রেওয়ায়েতে প্রমাণিত হয় যে ষষ্ঠ হিজরীর পূর্বেই প্রথম প্রতিনিধি দল আগমন করেছিল।

বাহ্‌রায়েনের কিছু নিম্নদিকে একটি স্থানের নাম ছিল হিজ্‌র। এখানে পারস্য সম্রাটের পক্ষ থেকে সিবখত নায়ক এক ব্যক্তি শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। মহানবী (সাঃ) তাঁর কাছে পত্র পাঠালে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন।

—(ফুতুহুল বুলদান)।

আম্মান ঃ ৮ম হিজরী

আম্মান শহরটি ছিল ইযদ গোত্রের অধীন। এর সরদার ছিলেন ওবায়দ ও জা'ফর। অষ্টম হিজরীতে মহানবী (সাঃ) কোরআনের হাফেয আবু যায়েদ আনসারী এবং আমর ইবনুল আসকে (রাঃ) ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে পত্রসহ সেখানে পাঠান। তাঁদের দাওয়াতে উভয় সরদারই মুসলমান হয়ে যান এবং তাঁদের প্রচেষ্টায় সেখানকার সমস্ত আরব ইসলামে দীক্ষিত হন।(ফুতুহুল বুলদান)

সিরীয় আরব ঃ ৯ম হিজরী

সিরিয়ার আশপাশে যেসব আরব গোত্র বসবাস করত, তাদের কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। এদের মধ্যে মাআন ও তার অধীনস্থ অঞ্চলসমূহ ফরওয়া ইবনে আমেরের শাসনাধীন ছিল। ফরওয়া অবশ্য রোম সম্রাটের একজন করদ শাসকের মত কাজ করতেন। তিনি ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে মুসলমান হয়ে যান এবং আনুগত্য স্বীকার করে মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে একটি খচ্চর উপঢৌকন হিসাবে পাঠিয়ে দেন। খৃষ্টান রোমকরা তাঁর ইসলাম কবুল করার কথা জানতে পেরে তাঁকে গ্রেফতার করে এবং শূলীতে চড়িয়ে দেয়। শূলীতে আরোহণের সময় তাঁর মুখে এই কবিতাংশটি উচ্চারিত হচ্ছিল ঃ

بلغ سراة المسلمين بانني - مسلم لربي اعظمي ومقامي

"মুসলমান সরদারকে এ পয়গাম পৌঁছিয়ে দাও যে আমার দেহ এবং আমার মান-ইজ্জত সমস্তই পরওয়ারদেগারের নামে উৎসর্গিত।" (ইবনে হিশাম)

সিরিয়া ও আরবের মধ্যবর্তী এলাকায় বসবাস করত আযরা, বিল্লি, জুযাম ইত্যাদি গোত্র। বিল্লি গোত্রে হযরত আমর ইবনুল আসের মাতুলালয় ছিল। এ কারণে একটি দলের সঙ্গে তাঁকে সেখানে পাঠানো হয়। তিনি যখন জুযাম গোত্রের জলাশয়ের নিকট পৌঁছলেন, তখন প্রতিপক্ষের আক্রমণের আশঙ্কা দেখা গেল। তিনি মহানবী (সাঃ)-এর কাছে সংবাদ পাঠালেন। এখান থেকে হযরত আবু ওবায়দার নেতৃত্বে কিছু সৈন্য পাঠিয়ে দেয়া হল। সীরাত লেখকগণ এ অভিযানকে গাযওয়ায়ে যাতুস্‌সালাসেল বলে অভিহিত করেছেন।

আরবের প্রতিনিধিদল

(যারা প্রথমে ইসলাম প্রচারকদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুসলমান হন, অতঃপর মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন সীরাত লেখকগণ সাধারণত "প্রতিনিধিদল" বলতে তাঁদেরই বুঝিয়েছেন। এ ধরনের প্রতিনিধিদলের সংখ্যা অনেক। ইবনে ইসহাক মাত্র পনেরটি প্রতিনিধিদলের কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনে সা'আদের গ্রন্থে সত্তরটির উল্লেখ আছে। দিমইয়াতী, মুগলতায়ী, যয়নুদ্দীন ইরাকীও এ পরিমাণ সংখ্যাই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু "সীরাতে শামী" গ্রন্থের লেখক আরও বেশি তথ্যানুসন্ধান করেছেন। তিনি ১০৪টি প্রনিধিদলের বিবরণ দিয়েছেন। এতে যদিও কোথাও কোথাও দুর্বল রেওয়ায়েতের আশ্রয় নেয়া হয়েছে এবং অধিকাংশ প্রতিনিধিদলের নামই অস্পষ্ট, তবুও একথা স্বীকৃত যে প্রকৃত সংখ্যা ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত অপেক্ষা অনেক বেশি। হাফেয ইবনে কাইয়্যেম ও কস্তুলানী অত্যধিক খোঁজাখুঁজি ও সাবধানতা সহকারে এদের মধ্য থেকে আরও ৩৪টি প্রতিনিধিদলের বিবরণ দিয়েছেন)।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে সমগ্র আরব মক্কার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করছিল। মক্কা বিজিত হওয়ার পর সে অপেক্ষারও সমাপ্তি ঘটল। ফলে, প্রত্যেকটি গোত্রই দারুল ইসলাম মদীনায় গিয়ে একটা কিছু করার জন্য অধীর হয়ে উঠল। আরবদের আর বুঝতে বাকি রইল না যে এখন তারা ইসলামের মোকাবিলায় ঔদ্ধত্য দেখাতে পারবে না। তবে খায়বরের ঘটনাদৃষ্টে তারা একথাও জানত যে ইসলাম গ্রহণ করা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। বরং জিযিয়া কিংবা অন্য কোন পন্থায় শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করলে তাদের বর্তমান অবস্থাই বহাল থাকতে পারে।

মক্কা বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে প্রতিনিধিদলের আগমন আরম্ভ হয়ে যায়। কয়েকটি ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত প্রতিনিধিদলই মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে এম অবস্থা প্রত্যক্ষ করে যে তারা ঈমানের আলোকে আলোকিত হয়েই ফিরে আসে।

বনূ তামীম, বনূ সা'আদ, বনূ হানিফা, বনূ আসাদ, কেন্দা, হেমইয়ার সরদারগণ, হামদান, ইযৃদ, তাঈ প্রভৃতি আরবের সব চাইতে শক্তিশালী সুদূরপ্রসারী প্রভাবসম্পন্ন গোত্র ছিল। এসব গোত্রের প্রতিনিধিদল মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে আগমন করেছিল। এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক এসেছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল একজন বিজয়ী হিসাবে মহানবী (সাঃ)-এর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করা। কিন্তু অধিকাংশ প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের স্বরূপ অবগত হয়ে তাতে দীক্ষিত হওয়া।

এ সমস্ত প্রতিনিধিদলের অধিকাংশই মক্কা বিজয়ের পর ৮, ৯ ও ১০ হিজরীতে আগমন করে। কিন্তু ধারাবাহিকতার খাতিরে এর আগের কয়েকটি প্রতিনিধিদলের উল্লেখ করাও অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

মুযাইনা ঃ এটি একটি বড় গোত্র। মুযার পর্যন্ত পৌঁছে এ গোত্রটি কোরাইশ বংশের সঙ্গে মিলে যায়। মক্কা বিজয়ের সময় মুযাইনা গোত্রের পতাকাবাহী, প্রসিদ্ধ সাহাবী নুমান ইবনে মুকরেন এ গোত্রেরই একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। পরবর্তীকালে তিনি ইস্পাহান জয় করেন। পঞ্চম হিজরীতে এ গোত্রের চারশ' লোক মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইরাকী পদ্যে লিখিত সীরাত গ্রন্থে আছে ঃ

اول وفد وفد المدينة ـ سنة خمس وفدوا مزينة

"মদীনায় সর্বপ্রথম প্রতিনিধিদল আগমন করে, তা ছিল মুযাইনা গোত্রের প্রতিনিধিদল। এরা পঞ্চম হিজরীতে আগমন করেন।"

বনূ তামীম ঃ বনূ তামীমের প্রতিনিধিদল অত্যন্ত জাকজমকের সঙ্গে আগমন করে। গোত্রের প্রধান প্রধান সরদার যথাঃ আক্বরা ইবনে হাবেস, যবরকান, আমর ইবনুল আহ্তাম, নাইম ইবনে ইয়াজিদ প্রমুখ সবাই এ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দুর্ধর্ষ দরকার ওয়াইনা ইবনে হিসন ফেযারী, যে একদা মদীনা পর্যন্ত আক্রমণ পরিচালনা করত—সেও ছিল এ প্রতিনিধিদলের অন্যতম।

এরা যদিও ইসলাম গ্রহণ করার উদ্দেশেই এসেছিল, তবুও আরবের স্বভাবজাত গর্ব ও অহঙ্কারের নেশা তখনও তাদের অন্তরে বিদ্যমান ছিল। তারা যে সময় মহানবী (সাঃ)-এর দরবার অর্থাৎ, মসজিদে নববীতে উপস্থিত হয়, তখন তিনি বাসগৃহে ছিলেন। তারা পবিত্র বাসগৃহে গিয়ে ডাক দিল ঃ মোহাম্মদ (সাঃ) বাইরে আসুন। তিনি বাইরে এলে তারা বলল ঃ মোহাম্মদ (সাঃ)! আমরা আপনার নিকট বংশ গৌরব বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে এসেছি। তিনি অনুমতি দিলেন। আতারেদ ইবনে হাজেব উঠে দাঁড়াল। সে ইতিপূর্বে নওশেরওয়ান বাদশাহর দরবার হএসবন্দর বক্তৃতায় পুরস্কারস্বরূপ কিংখাবের মূল্যবান বস্ত্রজোড়া লাভ করেছিল। সে দাঁড়িয়ে নিজের বংশ গৌরব সম্পর্কে এক ভাষণ দিল। তার ভাষণের সারমর্ম ছিল এই ঃ

"আল্লাহুর অশেষ শোকর। তাঁর কৃপায় আমরা মুকুট, সিংহাসন ও অগণিত ধনভাণ্ডারের মালিক এবং প্রাচ্যের জাতিসমূহের মধ্যে সবচাইতে বেশি সম্মানিত। বর্তমান যুগে কেউ আমাদের সমকক্ষতার দাবি করতে পারে না। কেউ আমাদের সমমর্যাদার দাবিদার হলে সে এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও গুণ উল্লেখ করুক, যা আমরা উল্লেখ করলাম।

আতারেদ ভাষণ সমাপ্ত করে বসে গেল। মহানবী (সাঃ) সাবেত ইবনে কায়েসকে উত্তর দেয়ার জন্যে ইঙ্গিত করলেন তিনি যে বক্তৃতা দেন, তার সারমর্ম এই ঃ

"সমস্ত প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য, যিনি আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের রাজত্ব দান করেছেন এবং আপন বান্দাদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে মনোনীত করেছেন। ইনি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত, সর্বাধিক সত্যবাদী এবং সব চাইতে বেশি চরিত্রবান। তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্যই মনোনীত। এ কারণে আল্লাহ্ তাঁর উপর ঐশীগ্রন্থ নাযিল করেছেন। ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালে সর্বপ্রথম মুহাজিরগণ এবং পরে আমরা (আনসারগণ) এ আহ্বানে সাড়া দিয়েছি। আমরাই আল্লাহ্র আনসার (সাহায্যকারী) ও রাসূলে করীম (সাঃ)-এর পারিষদ।"

বক্তৃতা শেষ হবার পর কবিতা পাঠ আরম্ভ হল। প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে তামীম গোত্রের প্রসিদ্ধ কবি যবরকান ইবনে বদর নিম্নোক্ত স্তুতিবাদ উচ্চারণ করল ঃ

نحن الكرام فلاحى يعادلنا - منا الملوك وفينا ينصب البيع

অর্থাৎ "আমরা কওমের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। কোন গোত্রই আমাদের সমকক্ষ নয়। আমাদের মধ্যেই সিংহাসনারোহী রয়েছে এবং আমরা গির্জার প্রতিষ্ঠাতা।"

বর্ণিত আছে যে এক ব্যক্তি মদীনায় এসে এমন আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা দেয় যে উপস্থিত শ্রোতারা বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে। তখন মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

ان من البيان لسحرا

অর্থাৎ, "কোন কোন বক্তৃতা যাদুর মতই ক্রিয়া করে।" এসাবা গ্রন্থের "আহওয়ালে সাহাবা" অধ্যায় পাঠ করলে জানা যায় যে মহানবী (সাঃ) যবরকানের বক্তৃতা শুনেই এ উক্তি করেছিলেন। মোটকথা, যবরকান বক্তৃতা শেষ করতেই মহানবী (সাঃ) স্বীয় দরবারের কবি হাস্সান ইবনে সাবেতের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তিনি উঠে তাৎক্ষণিক কবিতাংশ আবৃত্তি করলেন।

ان الذوائب من فهر واخوانهم - قد بينوا سنة للناس تتبعوا

অর্থাৎ "ফেহের গোত্রের সম্ভ্রান্ত লোকেরা এবং তাদের ভ্রাতৃবর্গ মানবজাতিকে অনুসরণীয় পথ বলে দিয়েছেন।"

প্রতিনিধিদলের মধ্যে আক্‌রা ইবনে হাবেস আরবের প্রখ্যাত বিচারক ছিলেন। বহু জটিল মামলা-মোকাদ্দমা তাঁর সামনে পেশ করা হত এবং তাঁর মীমাংসা সবাই অবনত মস্তকে মেনে নিত। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি অগ্নি উপাসক ছিলেন। তিনি মহানবী (সাঃ)-এর উদ্দেশে বললেন ঃ

"আমি যার প্রশংসা করি, সে চমৎকৃত হয়ে যায়, আর যার নিন্দা করি, সে কলঙ্কযুক্ত হয়ে পড়ে।"—(এসাবা)

পদ্য ও গদ্যের প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পর প্রতিনিধিদল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করল যে মহানবী (সাঃ)-এর দরবারের বক্তা ও কবিগণ তাদের বক্তা ও কবিদের অনেক উন্নত মানের। অতঃপর সবাই ইসলাম গ্রহণ করলেন।

বনূ সাআদ ঃ বনূ সাআদ যেমাম ইবনে সা'লাবাকে দূত বানিয়ে পাঠান। তিনি মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে যেভাবে আগমন করেন এবং যেভাবে দৌত্যকার্য সম্পন্ন করেন, তাতে আরবদের স্বভাবসিদ্ধ সরলতা ও স্বাধীনচিত্ততার অনুমান করা যায়। সহীহ্ বোখারীর একাধিক জায়গায় এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। কিতাবুল এলম-এ যে রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে তা এরূপ ঃ

হযরত আনাস ইবনে মালেক বলেন ঃ আমরা মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি উষ্ট্রীর উপর সওয়ার হয়ে এল এবং মসজিদের বারান্দায় উষ্ট্রী থেকে নেমে উপস্থিত লোকদের বলল ঃ মোহাম্মদ (সাঃ) কার নাম? লোকেরা হুযূর (সাঃ)-এর দিকে ইশারা করে বলল ঃ ঐ যে গৌরবর্ণ লোকটি বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছেন। তিনি কাছে এসে বললেন ঃ হে আবদুল মোত্তালিবতনয়! মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ আমি উত্তর দিচ্ছি। আগন্তুক বললঃ আমি আপনাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করব; কিন্তু কঠোরভাবে জিজ্ঞেস করব। অসন্তুষ্ট হবেন না। মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস কর। বললঃ আপনার আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলুন, আল্লাহ্ কি আপনাকে সারা বিশ্বের জন্য পয়গম্বর বানিয়ে পাঠিয়েছেন? মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ হাঁ! আগন্তুক আবার কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ আল্লাহ্ আপনাকে পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করার আদেশ দিয়েছেন কি? এভাবে যাকাৎ, রোযা ও হজ সম্বন্ধেও জিজ্ঞেস করল। মহানবী (সাঃ) উত্তরে হ্যাঁ, হ্যাঁ বলে গেলেন। আগন্তুক ইসলামের যাবতীয় আহকাম শোনার পর বলল ঃ আমার নাম যেমাম ইবনে সা'লাবা। আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে পাঠিয়েছে। আমি এখন যাই। আপনি যা বলেছেন তা থেকে বিন্দু পরিমাণও কম-বেশি করব না। যেমাম চলে গেলে মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ যদি সে সত্য বলে থাকে, তবে মুক্তি পাবে।

যেমাম ফিরে গিয়ে গোত্রের লোকদেরকে বলল ঃ লাত ও উয্‌যা কিছুই নয়। তারা বলল ঃ হায়, হায় এ কি বলছ? তুমি পাগল কিংবা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়ে যাবে। যেমাম বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম, এরা কারো ক্ষতি বা উপকার কিছুই করতে পারে না। আমি আল্লাহ্ এবং মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া এই দেখা গেল যে সন্ধ্যা হতে না হতেই গোত্রের আবালবৃদ্ধবণিতা সবাই মুসলমান হয়ে গেল।—(ইবনে হিশাম)

আশআরী গোত্র ঃ আশআরী গোত্র ইয়ামনের একটি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত গোত্র। হযরত আবু মূসা এ গোত্রেরই একজন। মহানবী (সাঃ)-এর নবুওতের সংবাদ পেয়ে এ গোত্রের তিপ্পান্ন ব্যক্তি মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। এ কাফেলায় হযরত আবু মূসা আশআরীও ছিলেন। তাঁরা একটি জাহাজে আরোহণ করেন। কিন্তু বিপরীত বাতাসের কারণে জাহাজটি আবিসিনিয়ায় পৌঁছে যায়। সেখানে হযরত জা'ফর তাইয়ার (রাঃ) পূর্ব থেকেই অবস্থান করছিলেন। তিনি তাঁদের নিয়ে আরব অভিমুখে রওয়ানা হলেন। এ সময়ে খায়বর বিজিত হয়ে গিয়েছিল এবং মহানবী (সাঃ) সেখানেই অবস্থান করছিলেন। ফলে, আশআরী গোত্রের কাফেলা খায়বরেই মহানবী (সাঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন।

এটি সহীহ্ মুসলিমের (ফাযায়েল আশআরিয়ীন) রওয়ায়েত। সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত আছে, আশআরী গোত্রের প্রতিনিধিদল আগমন করলে হুযূর (সাঃ) সাহাবীদের বললেন ঃ তোমাদের কাছে ইয়ামন থেকে লোক আসছে। তারা অত্যন্ত কোমল প্রাণ।

মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল গ্রন্থে হযরত আনাস থেকে বর্ণিত আছে, আশআরীদের প্রতিনিধিদল আগমন করার সময় তারা আনন্দের আতিশয্যে এ সংগীতটি আবৃত্তি করছিল ঃ

"আগামীকাল আমরা বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হব—অর্থাৎ, মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে।"

মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে পৌঁছে তারা আরয করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, আমরা ধর্মের বিধান শিক্ষা করার উদ্দেশ্যে আগমন করেছি। আমরা সৃষ্টির প্রারম্ভ কালের কিছু অবস্থাও জানতে চাই। তিনি বললেন ঃ প্রথমে এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউই ছিল না। তাঁর ক্ষমতার রাজ্য অবশ্য পানির উপর অবস্থিত ছিল।—(বোখারী)

দওস গোত্র, ৭ম হিজরী ঃ দওস আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এ গোত্রেরই একজন। এ গোত্রের প্রসিদ্ধ কবি ও সরদার ছিলেন তোফায়েল ইবনে আমর। তিনি হিজরতের পূর্বেই মক্কায় যান। কোরাইশরা তাঁকে মহানবী (সাঃ)-এর কাছে যেতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে একবার তিনি হরম শরীফে গমন করেন। তখন মহানবী (সাঃ) নামায পড়ছিলেন। কোরআন মজীদ শুনে তাঁর মনে ভাবান্তর হয় এবং মহানবী (সাঃ)-এর কাছে গিয়ে নিবেদন করেন ঃ আপনি আমাকে ইসলামের স্বরূপ খুলে বলুন। তিনি তাঁর নিকট ইসলামের স্বরূপ তুলে ধরলেন এবং কোরআনের আয়াত পাঠ করে শোনালেন। তোফায়েল অত্যন্ত খাঁটি মনে ইসলাম গ্রহণ করলেন। দেশে ফিরে গোত্রের অন্যান্য লোককেও ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তাঁর গোত্রে যিনা বা ব্যভিচারের প্রাচুর্য ছিল। তারা মনে করল, ইসলাম গ্রহণ করার পর এ

স্বাধীনতা থাকবে না। ফলে, তারা ইসলাম গ্রহণ করতে দ্বিধা প্রকাশ করল। তোফায়েল (রাঃ) মহানবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ পরিস্থিতি জানালেন। তিনি দোয়া করলেন ঃ আল্লাহ্, দওস গোত্রকে সৎপথ দেখাও। অতঃপর তোফায়েলকে (রাঃ) বললেন, এবার গিয়ে নম্রতা ও সৌজন্যের সঙ্গে লোকদের ইসলামের দাওয়াত দাও। শেষ পর্যন্ত মহানবী (সাঃ)-এর দোয়ার বরকতে ও তোফায়েলের চেষ্টায় গোত্রের সবই ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং হযরত আবু হোরায়রাসহ আশিটি পরিবার হিজরত করে মদীনায় চলে এলেন।

বনূ হারস ইবনে কা'ব, ৯ম হিজরী ঃ বনূ হারস ইবনে কা'ব-নাজরানের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার। মহানবী (সাঃ) হযরত খালেদকে ইসলাম প্রচারের জন্য তাদের নিকট পাঠালেন। তারা খাঁটি মনে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে মহানবী (সাঃ) তাঁদেরকে মদীনায় ডেকে পাঠান। সেমতে কায়েস ইবনে হাসান, ইয়াজীদ ইবনে আবদুল মাদান প্রমুখ মহানবী (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হন। ইতিপূর্বে তারা অন্যান্য আরব গোত্রের বিরুদ্ধে অধিকাংশ যুদ্ধে জয়লাভ করে। এ কারণে মহানবী (সাঃ) তাদের এসব জয়লাভের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল ঃ আমরা সর্বদাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতাম এবং কারও উপর যুলুম করতাম না। মহানবী (সাঃ) কায়েসকে গোত্রের সরদার নিযুক্ত করলেন।

তাঈ গোত্র, ৯ম হিজরী ঃ তাঈ ইয়ামনের একটি বিখ্যাত গোত্রের নাম। গোত্রের সরদার ছিলেন যায়েদুল খায়ল এবং আদী ইবনে হাতেম তাঈ। তাদের রাজ্যসীমানা বিস্তৃত ছিল।

যায়েদ জাহেলিয়াত যুগের প্রসিদ্ধ কবি, বক্তা, সুশ্রী, উদারপ্রাণ ও বীর পুরুষ ছিলেন। নবম হিজরীতে তিনি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোককে সঙ্গে নিয়ে মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। মহানবী (সাঃ) তাঁকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালে তিনি সঙ্গিগণ সহ খাঁটি মনে ইসলাম গ্রহণ করেন। অশ্বারোহণে দক্ষতার কারণে তিনি "যায়েদুল-খায়ল" (অশ্বের যায়েদ) উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। মহানবী (সাঃ) নামটি "যায়েদুল খায়র" (মঙ্গলের যায়েদ) দ্বারা বদলে দেন।

আদী ইবনে হাতেম, ৯ম হিজরী ঃ আদী বিখ্যাত হাতেম তাঈর পুত্র তাঈ গোত্রের সরদার এবং ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে খৃষ্টান ছিলেন। আরব বাদশাহদের মত তিনি প্রজাসাধারণের আয়ের এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব পেতেন। ইসলামী সৈন্যবাহিনী ইয়ামন পৌঁছলে তিনি পালিয়ে সিরিয়ায় চলে যান। তাঁর পত্নী গ্রেফতার হয়ে মদীনায় আসেন। মহানবী (সাঃ) তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা সহকারে বিদায় দান করেন। তিনি ভাইয়ের নিকট গিয়ে বললেন ঃ যত শীঘ্র সম্ভব আপনি মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে যান। তিনি পয়গম্বরই হোন কিংবা বাদশাহই হোন, সর্বাবস্থায় তাঁর কাছে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। অতঃপর আদী

মদীনায় আসেন। মহানবী (সাঃ) তখন মসজিদে ছিলেন। আদী মসজিদে গিয়ে সালাম করলেন। হযরত (সাঃ) সালামের উত্তর দিয়ে নাম জিজ্ঞেস করলেন। এরপর তাঁকে নিয়ে ঘরের দিকে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে এক বৃদ্ধা এসে মহানবী (সাঃ)-কে থামিয়ে দিল এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোন কাজ সম্বন্ধে কথাবার্তা বলল। আদী স্বয়ং একজন সরদার ছিলেন এবং সিরিয়ায় রোমকদের দরবার তাঁর দেখা ছিল। তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না যে আরবের শাহানশাহ্ একজন দরিদ্র বৃদ্ধার সঙ্গে এমন অকপটভাবে কথাবার্তা বলতে পারেন। তিনি তখনই মনে মনে ধারণা করলেন, এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই বাদশাহ্ নন। মহানবী (সাঃ) ঘরে আগমন করলেন। চামড়ার একটি গদি ছিল, তিনি সেটিই আদীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আদী কিছুক্ষণ পীড়াপীড়ির পর তাতে বসলেন। মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ আদী, তুমি নাকি নিজ গোত্রের কাছ থেকে আয়ের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ কর? কিন্তু এটা তো তোমার ধর্মমতে (খৃষ্টানধর্মে) বৈধ নয়। —(ইবনে হিশাম) এরপর বললেন ঃ এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য আছে কি? আদী উত্তর দিলেন ঃ না। আবার প্রশ্ন হল ঃ আল্লাহ্র চেয়ে বড় কেউ আছে কি? উত্তর হল ঃ না। মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ ইহুদীদের উপর আল্লাহ্র গযব নাযিল হয়েছে এবং খৃষ্টানরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।—(মুসনাদে ইমাম আহমদ ও তিরযিমী)

মোটকথা, আদী ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি ইসলামের উপর এমন অটল ও অবিচল ছিলেন যে পরবর্তীকালে তাঁর আশপাশের কিছুসংখ্যক লোকের ধর্মত্যাগের সময়ও বিন্দুমাত্র প্রভাব গ্রহণ করেননি।

আদীও পিতার মতই দানবীর ছিলেন। একবার কোন এক ব্যক্তি একশ টাকা চাইলে তিনি বললেন ঃ তুমি হাতেমের পুত্রের কাছে এ সামান্য টাকা চাইলে? আল্লাহ্র কসম! তোমাকে কিছুই দেব না।—(এসাবা)

সকীফের প্রতিনিধিদল ঃ পাঠকগণের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে মহানবী (সাঃ) যখন তায়েফের অবরোধ তুলে দিয়ে রওয়ানা হন, তখন ভক্তগণ আরয করেছিলেন ঃ হুযুর এদের জন্য বদ দোয়া করুন। মহানবী (সাঃ) এ-ভাষায় দোয়া করেছিলেন।

اللهم اهد ثقيفا وائت بهم

“আয় আল্লাহ্,সকীফ গোত্রকে হেদায়েতের পথ দেখাও এবং তাদের আমার কাছে পাঠাও।” এ দোয়ার ফলে প্রকাশিত হল আল্লাহ্র মহিমার এক অলৌকিক ঘটনা। পূর্বে যে গোত্র তরবারির সামনে মাথা নত করেনি ; এখন সত্যের প্রতাপ ইসলামের দুয়ারে তাদের আভূমি নত করিয়ে ছাড়ল।

তায়েফ ছিল দুজন সরদারের অধীনে। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ওরওয়া ইবনে মসউদ। মক্কায় কাফেররা তাঁর সম্বন্ধেই বলাবলি করত যে আল্লাহ্র

কালাম অবতীর্ণ হলে ওরওয়ার প্রতিই অবতীর্ণ হত। ওরওয়া যদিও তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি, তবুও বলা যায়, ইসলাম গ্রহণ করার মত যোগ্যতা তাঁর ছিল। হুদাইবিয়ার সন্ধি তাঁরই দৌত্য কার্যে সম্পাদিত হয়। মহানবী (সাঃ) যখন তায়েফ থেকে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ওরওয়াকে ইসলামের তওফীক দান করেন। মহানবী (সাঃ) মদীনায় পৌছাতে না পৌছাতেই ওরওয়া তাঁর খেদমতে হাযির হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে এলেন। তিনি জনসমক্ষে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করলেন এবং সবাইকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। প্রত্যুত্তরে সবাই তাকে গালাগালি করল। প্রত্যুষে যখন তিনি নিজের ঘরে দ্বিতল থেকে আযান দিলেন, তখন চারদিক থেকে বৃষ্টির মত তীর বর্ষিত হতে শুরু করল। এতে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। মৃত্যুর সময় তিনি অছিয়ত করলেন যে তায়েফ অবরোধের সময় শহীদ মুসলমানদের পাশেই যেন তাঁকে দাফন করা হয়।

ওরওয়ার রক্ত বৃথা যাবার ছিল না। আহ্মাস গোত্রের সরদার সখর ইবনে ঈলা যখন শুনতে পেল যে মহানবী (সাঃ) তায়েফ অবরোধ করে রেখেছেন, তখন তিনি কিছুসংখ্যক অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলেন। ঘটনাচক্রে তিনি যখন পৌছলেন, তখন মহানবী (সাঃ) অবরোধ তুলে মদীনার পথে রওয়ানা হয়ে গেছেন। সখর প্রতিজ্ঞা করলেন, যতদিন পর্যন্ত তায়েফবাসীরা মহানবী (সাঃ)-এর বশ্যতা স্বীকার না করবে, ততদিন পর্যন্ত আমি অবরোধ ওঠাব না। অবশেষে তায়েফবাসীরা বশ্যতা স্বীকার করল। সখর এ সংবাদ মদীনায় পাঠালে মহানবী (সাঃ) সকল মুসলমানকে মসজিদে নববীতে একত্রিত করলেন এবং আহ্মাস গোত্রের জন্য দশবার দোয়া করলেন।—(আবু দাউদ) কিছুকাল পর তায়েফবাসীরা একটি পরামর্শ সভায় বসল। সমগ্র আরব ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে, একা তারা বিরুদ্ধাচরণ করে কি করতে পারবে?—এরূপ চিন্তা করে অবশেষে সিদ্ধান্ত হল যে কিছু লোককে দূত নিযুক্ত করে মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে পাঠানো হবে।

এ দূতবর্গকে মদীনায় আগমন করতে দেখে মুসলমানদের আনন্দের সীমা রইল না। সর্বপ্রথম মুগীরা ইবনে শো'বা দৌড়ে হুযুর (সাঃ) -কে সংবাদ দিতে গেলেন। পথে হযরত আবু বকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনিও জানেত পেরে মুগীরাকে কসম দিলেন যাএেসবসংবাদ তিনি যথাসম্ভব শীঘ্র মহানবী (সাঃ)-এর গোচরীভূত করেন।

মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে পৌছে কিরূপে সালাম করতে হবে, মুগীরা প্রতিনিধিদলকে তা শিখিয়ে দিলেন। কিন্তু তারা প্রাচীন পদ্ধতিতেই সম্ভাষণ জানাল।

প্রতিনিধি দলের নেতা, তায়েফের প্রসিদ্ধ সরদার আবদে ইয়ালীলকে (অথচ সে তখনও কাফের ছিল) মহানবী (সাঃ) মসজিদে নববীতেই বসালেন (যাতে সে মুসলমানদের একাগ্রতা দেখে প্রভাবান্বিত হয়)।—(আবু দাউদ) প্রতিনিধিদলকে মসজিদের বারান্দায় তাঁবু পেতে থাকতে দেয়া হল। নামায ও খোতবার সময় তারাও উপস্থিত থাকত যদিও অংশগ্রহণ করত না। মহানবী (সাঃ) সাধারণত খোতবায় নিজের নাম উচ্চারণ করতেন না। ফলে, তারা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল ঃ মোহাম্মদ (সাঃ) আমাদের কাছ থেকে নিজের পয়গম্বরীর স্বীকৃতি নিতে চান; কিন্তু খোতবায় নিজের পয়গম্বরী স্বীকার করেন না। মহানবী (সাঃ) একথা জানতে পেরে বললেন ঃ আমি সর্বাগ্রে সাক্ষ্য দেই যে আমি আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ।

প্রতিনিধিদলের মধ্যে ওসমান ইবনে আবুল আস ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। দলের লোকেরা যখন মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে আসত, তখন তাকে ছেলেমানুষ মনে করে ঘরেই রেখে আসত। ওসমান অল্পবয়স্ক হলেও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং অনুসন্ধিৎসু প্রকৃতির ছিল। দলের লোকগণ দুপুরে ঘুমোতে গেলে সে চুপি চুপি হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হত এবং কোরআন মজীদ ও ইসলামী আহকাম শিক্ষা করত। এভাবে সে ইতিমধ্যেই কতিপয় জরুরী মাসআলা শিখে ফেলল।

মহানবী (সাঃ) সর্বদাই প্রতিনিধিদলের সামনে ইসলাম প্রচার করতেন। এশার নাযাযের পর তারে কাছে চলে যেতেন এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথাবার্তা বলতেন। এসব কথাবার্তার বেশিরভাগ মক্কায় অবস্থানকালে কোরাইশদের হাতে যে সব নির্যাতন ভোগ করেছিলেন তা বর্ণনা করতেন। মদীনায় যে সব যুদ্ধ হয়েছিল তাও উল্লেখ করতেন—(আবু দাউদ)। অবশেষে তারা ইসলাম গ্রহণ করতে সম্মত হল; কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি শর্তও উপস্থিত করল।

(১) আমাদের জন্য যিনা বা ব্যভিচার বৈধ রাখতে হবে ; কেননা, আমাদের অধিকাংশ লোকই অবিবাহিত থাকে। এ জন্য ব্যভিচার ব্যতীত তাদের গত্যন্তর নেই।

(২) আমাদের গোত্রের একমাত্র জীবিকা সুদের কারবার। কাজেই সুদ গ্রহণ জায়েয রাখতে হবে।

(৩) শরাব নিষিদ্ধ হতে পারবে না। আমাদের শহরে প্রচুর পরিমাণে আঙ্গুর উৎপন্ন হয় এবং আঙ্গুরের রস থেকে মদ তৈরি করাই আমাদের প্রধান ব্যবসা।

কিন্তু এই তিনটি অনুরোধই নামঞ্জুর হল। অবশেষে তারা বলল ঃ আচ্ছা আমরা এ শর্তগুলো প্রত্যাহার করে নিচ্ছি; কিন্তু আমাদের উপাস্য (তায়েফের মানাত নামক সর্ববৃহৎ মূর্তি) সম্বন্ধে কি বলেন? মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ সেটি ভেঙে ফেলা হবে। একথা শুনে তারা যুগপৎ বিস্ময় প্রকাশ করল যে কেউ তাদের

প্রধান উপাস্য দেবতার গায়ে হাত তুলতে পারে! তারা বলল ঃ যদি আমাদের মাবুদ আপনার ইচ্ছা জানতে পারে তবে সমগ্র শহর ধ্বংস করে দেবে। একথা শুনে হযরত ওমর স্থির থাকতে পারলেন না। বলে উঠলেন ঃ তোমরা কেমম মূর্খ হে! মানাত শুধু একটি পাথর বই তো নয়। তারা বলল ঃ ওমর আমরা তোমার কাছে আসিনি। তুমি চুপ থাক। অতঃপর মহানবী (সাঃ)-কে বলল ঃ আমরা মানাতের গায়ে হাত লাগাতে পারব না। আপনার যা ইচ্ছা হয় করুন। আমাদের দ্বারা এমন ধৃষ্টতা সম্ভবপর নয়। মহানবী (সাঃ) তাদের এ অনুরোধ মঞ্জুর করলেন। (যাদুল মাআদ)

তারা নামায, যাকাৎ এবং জেহাদের নির্দেশ সম্বন্ধেও ক্ষমাপ্রার্থনা করে দরখাস্ত করল। নামায ক্ষমা করা কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর ছিল না। এটা প্রত্যহ পাঁচবার আদায় করতে হয়, কিন্তু যাকাৎ এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর ওয়াজেব হয়। জেহাদও ফরযে কেফায়া। প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ওয়াজেব নয়। ওয়াজেব হলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে—প্রত্যহ ওয়াজেব নয়। এ কারণে তখনকার মত এ দুটি বিষয়ের উপর জোর দেয়া হল না। কেননা, একথা জানা যে একবার মুসলমান হয়ে গেলে আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে এ ধরনের কুসংস্কার আর অবশিষ্ট থাকবে না। হযরত জাবের বর্ণনা করেন, এ ঘটনার পর আমি মহানবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যখন তারা ঈমান আনবে, তখন যাকাৎও দেবে, জেহাদও করবে—(আবু দাউদ)। সেমতে দু'বছর পরই বিদায় হজের সময় দেয়া গেল, সকীফ গোত্রের প্রত্যেকটি লোকই সর্বান্তঃকরণে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে।—এসাবা)

প্রতিনিধিদল স্বদেশ অভিমুখে রওয়ানা হলে মহানবী (সাঃ) শর্ত অনুযায়ী তায়েফের প্রধান মূর্তি মানাতকে ভাঙার জন্য আবু সুফিয়ান ও মুগীরা ইবনে শো'বাকে পাঠালেন। মুগীরা তায়েফ পৌছে মূর্তিটি ভাঙতে চাইলে মহিলারা মাথার কাপড় ফেলে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল। তারা মুখে এ কবিতা আবৃত্তি করছিল ঃ

الا ابكين دفاع   اسلمها الرضاع   لم يحسنوا المصارع

—গোত্রের লোকদের জন্য ক্রন্দন কর। কেননা, কাপুরুষেরা নিজেদের ইষ্ট দেবতাদের শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছে। তারা যুদ্ধ করতে সক্ষম হল না। (তারীখে তাবারী)।

আরবের মধ্যে বহু বিবাহের ব্যাপক প্রচলন ছিল। সকীফ গোত্রের প্রখ্যাত সরদার গায়লান ইবনে সালামার দশজন পত্নী ছিল। মুসলমান হওয়ার পর ইসলামী বিধান অনুযায়ী তাকে চার পত্নী ব্যতীত সকল পত্নীকেই ত্যাগ করতে হল। —(তিরমিযী, আবু দাউদ)

নাজরানের প্রতিনিধিদল, ৯ম হিজরী ঃ মক্কা মোয়ায্যমা থেকে ইয়ামনের দিকে সাত মঞ্জিল দূরে অবস্থিত একটি বিস্তীর্ণ এলাকার নাম নাজরান। সেখানে আরব খৃষ্টানরা বসবাস করত এবং খৃষ্টানদের একটি বিরাট গির্জাও ছিল। এটিকে তারা কা'বা বলত এবং মুসলমানদের কা'বার সমপর্যায়ের বলে মনে করত। এ গির্জায় খৃষ্টানদের অনেক প্রখ্যাত ধর্মীয় নেতা অবস্থান করত। তাদের উপাধি ছিল সাইয়েদ ও আকেব। আরবের বুকে এর সমকক্ষ খৃষ্টানদের অপর কোন ধর্মীয় কেন্দ্র ছিল না। কবি আ'শা এ কেন্দ্র সম্পর্কেই বলেছেন ঃ

"তিনশ' চর্ম দ্বারা গম্বুজের আকৃতিতে এ উপাসনা মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। এর সীমানায় যে কেউ প্রবেশ করত, সে নিরাপদ হয়ে যেত। এ মন্দিরের বরাবরে ওয়াকফকৃত সম্পত্তির আয় ছিল বার্ষিক দু'লক্ষ টাকা।"

মহানবী (সাঃ) নাজরানের অধিবাসীদের ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে পত্র লিখলে এ মন্দিরের সেবায়েত এবং ধর্মীয় নেতাগণ আটজন লোক সঙ্গে নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হয়। মহানবী (সাঃ) তাদের মসজিদে স্থান দিলেন। কিছুক্ষণ পর নামাযের সময় হলে তারাও নামায পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। সাহাবিগণ বাধা দিলেন; কিন্তু মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ পড়তে দাও। সেমতে তারা পূর্বদিকে মুখ করে নামায আদায় করল। প্রধান বিশপ আবু হারেসা অত্যন্ত সম্মানিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। রোম সম্রাট স্বয়ং তাকে এ পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করেন এবং তার জন্য গির্জা ও এবাদতগৃহ নির্মাণ করিয়ে দেন।—(যাদুল মাআদ)

এ প্রতিনিধিদল মহানবী (সাঃ)-কে বিভিন্ন প্রশ্ন করে। তিনি ওহীর আলোতে সে সব প্রশ্নের উত্তর দান করেন।

তাদের অবস্থানকালেই সূরা আলে এমরানের প্রথম আশিটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াতে তাদের প্রশ্নের জওয়াব নিহিত আছে। যে আয়াতে ইসলামী দাওয়াতের ব্যাখ্যা করা হয় তা হল এভাবে ঃ

"বলে দিন, হে আহলে কিতাবরা, এসো এমন একটি বিষয় মেনে নেই—যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান। তা এই যে আমরা এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারও এবাদত করব না, কাউকেও তাঁর অংশীদার জ্ঞান করব না এবং আমাদের মধ্যে কেউ কাউকেও আল্লাহ্ ব্যতীত প্রভু সাব্যস্ত করব না। অতঃপর যদি তারা না মানে, তবে বলে দিন ঃ সাক্ষী থাক, আমরা মুসলমান"।

—(সূরা আলে ইমরান)

মহানবী (সাঃ) ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা বলল ঃ আমরা পূর্ব থেকেই মুসলমান। মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা ক্রুশের পূজা কর এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে খোদার পুত্র মনে কর, এমতাবস্থায় কেমন করে তোমরা মুসলমান হতে পার? তারা এতে সম্মত না হওয়ায় মহানবী (সাঃ) ওহীর নির্দেশ অনুযায়ী বলে দিলেন ঃ তবে মুবাহালা কর। অর্থাৎ, আমরা উভয়দল আপন আপন সন্তান-সন্ততি নিয়ে আসব এবং দোয়া করব যে যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাৎ বর্ষিত হোক। বলা হয়েছে ঃ

"যে ব্যক্তি জ্ঞানলাভের পরও আপনার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাকে বলে দিন ঃ আপন সন্তান-সন্ততি, আপন স্ত্রী এবং আপনজনদের ডেকে আনি, অতঃপর মুবাহালা করি—আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি যে আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, তার উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাৎ বর্ষিত হোক"—(সূরা আলে এমরান)

কিন্তু মহানবী (সাঃ) যখন হযরত ফাতেমা এবং ইমাম হাসান হোসাইনকে নিয়ে মুবাহালার জন্য বের হয়ে এলেন, তখন তাদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি মত প্রকাশ করল যে মুবাহালা করা সমীচীন হবে না। এ ব্যক্তি যদি সত্য সত্যই পয়গম্বর হয়ে থাকেন, তবে আমরা চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাব। মোটকথা, তারা বার্ষিক করদানে সম্মত হয়ে সন্ধি করে নিল।

বনূ আসাদ, ৯ম হিজরী ঃ বনূ আসাদ গোত্র ছিল বিভিন্ন রণাঙ্গনে কোরাইশদের দক্ষিণ হস্ত। এ গোত্রেরই এক ব্যক্তি তোলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ হযরত আবু বকরের খেলাফতকালে নবুয়ত দাবি করেছিল। নবম হিজরীতে তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। কিন্তু তখনও তাদের মন-মস্তিষ্কে জাহেলিয়াএসবলভ অহঙ্কারের নেশা ছিল। প্রতিনিধিদলটি মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে এসে অনুগ্রহের ভঙ্গিতে বলতে লাগল ঃ আপনি আমাদের কাছে কোন অভিযান প্রেরণ করেন নি; বরং আমরা নিজেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। এতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হল ঃ

"এরা আপনার প্রতি অনুগ্রহের কথা উপস্থাপন করে যে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। বলে দিন, ইসলাম গ্রহণ করে তোমরা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ এমন বলো না, বরং আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহের কথা বলছেন যে তিনি তোমাদের ঈমানের পথ দেখিয়েছেন—যদি তোমরা সত্যবাদী হও।—(সূরা হুজুরাত)

বনূ ফেযারা, ৯ম হিজরী ঃ এ গোত্রটি অত্যন্ত উদ্ধত ও শক্তিশালী ছিল। ওয়াইনা ইবনে হিসন ছিলেন এ গোত্রেরই একজন। নবম হিজরীর রমযান মাসে যখন মহানবী (সাঃ) তবুক অভিযান থেকে ফিরে আসেন, তখন তারা প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।—(যারকানী)

কেন্দা, ১০ম হিজরী ঃ হাযরামওতের (ইয়ামনের) অন্তর্গত একটি শহরের নাম কেন্দা। এখানে কেন্দী পরিবারের রাজত্ব ছিল। তখন এ পরিবারের শাসনকর্তা ছিলেন আশআস ইবনে কায়েস। ১০ম হিজরীতে তিনি ৮০ জন অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত জাঁকজকমের সঙ্গে মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হন। তাঁরা হীরা প্রদেশের রেশমী আঁচল বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট চাদর কাঁধে করে নিয়ে আসেন। এরা পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মহানবী (সাঃ) তাদের দেখে বললেন ঃ তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করনি? তারা বলল, জী হাঁ, গ্রহণ করেছি। হুজুর (সাঃ) বললেন ঃ তবে এ রেশম কেন? তারা তৎক্ষণাৎ চাদরগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিলেন।—ইবনে হিশাম)

হযরত আবু বকর খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর নিজের বোন উম্মে ফরওয়াকে আশআসের সঙ্গে বিয়ে দেন। বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পরমুহূর্তেই তিনি উটের বাজারে পৌছেন এবং যে উটটি সামনে পড়ল তরবারি দ্বারা তার গর্দান উড়িয়ে দেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিশ-ত্রিশটি উট ধরাশারী হয়ে যায়। তাঁর এ কাণ্ড দেখে সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে যায়। তিনি বললেন ঃ আমি আমার রাজধানীতে থাকলে অন্য রকম আয়োজন করতাম। অতঃপর তিনি সবগুলো উটের মূল্য পরিশোধ করলেন এবং বললেন ঃ এগুলো আপনাদের নিমন্ত্রণের জন্য।—(এসাবা)

এই আশআস ইবনে কায়স কাদেসিয়া ও ইয়ারমুক যুদ্ধে শরীক ছিলেন এবং সিফ্‌ফনের যুদ্ধে হযরত আলীর পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন।

আবদুল কায়েস ঃ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, এ গোত্রটি বাহ্‌রাইনের অধিবাসী ছিল। এখানে বহু পূর্বেই ইসলামের প্রভাব পৌছেছিল। সর্বপ্রথম এ গোত্রের ১৩ জন লোক পঞ্চম হিজরীতে কিংবা তারও আগে মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়।

মহানবী (সাঃ) তাদের জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমরা কারা? তারা বলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা রবিয়া পরিবারের লোক। তিনি তাদের স্বাগত জানালেন। অতঃপর তারা আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের দেশ বাহ্‌রাইন অনেক দূরে। মাঝে মুযার গোত্রের কাফেরদের বসতি। ফলে, আমরা নিষিদ্ধ মাস ছাড়া অন্য সময় আসতে পারি না। আপনি আমাদের এমন কিছু উপদেশ দিন, যা সর্বদা পালন করতে পারি এবং দেশের অন্যান্য লোকদের শিক্ষা দিতে পারি। মহানবী (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ আমি তোমাদের চারটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি;—আল্লাহ্‌কে এক জানবে, নামায পড়বে, রোযা রাখবে এবং যুদ্ধলব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশ বায়তুলমালে দেবে। এছাড়া আরও চারটি বিষয় সম্বন্ধে নিষেধ করছি ঃ —দুব্ব, হানতুম, নকীর ও মোযাফ্‌ফাত।

এগুলো আরবের চার প্রকার পাত্রের নাম। এসব পাত্রে শরাব প্রস্তুত করা হত। মহানবী (সাঃ)-এর অভ্যাস ছিল, যে সব গোত্রের মধ্যে বিশেষ বিশেষ দোষ দেখতেন, উপদেশ দেবার সময় সেসব দোষের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতেন। শ্রোতাদের বিস্ময়ের অবধি ছিল না যে হুযুর (সাঃ) বিশেষভাবে এ পাত্রগুলোর উল্লেখ করলেন কেন? তারা জিজ্ঞেস করল ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্! নকীর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? এরশাদ হল ঃ হ্যাঁ, খেজুরের মোটা কাণ্ড ভেতরে গর্ত করে তাতে তোমরা পানি ভরে দাও। যখন পানির স্ফুটন কমে যায়, তখন তা পান করে আপন ভাইদের উপর তরবারি চালাও। ঘটনাক্রমে প্রতিনিধিদলের এক ব্যক্তি এ বিষয়ের ভুক্তভোগী ছিল। তার কপালে তরবারির আঘাতের একটি ক্ষতচিহ্নও ছিল। সে তখন লজ্জায় সেটি ঢেকে রাখল।—(সহীহ্ বোখারী, সহীহ্ মুসলিম)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, আবদুল কায়েস গোত্র নিজেরাই জিজ্ঞেস করে ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ, আমাদের কি বস্তু পান করা উচিত? এরই উত্তরে মহানবী (সাঃ) উপরোক্ত পাত্র সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।[১]

বনূ আমের, ৯ম হিজরী ঃ বনূ আমের ছিল আরবের প্রসিদ্ধ গোত্র কায়সে আয়লানের একটি শাখা। তখন এ গোত্রে তিনজন সরদার ছিল। আমের ইবনে তোফায়েল, আরবাদ ইবনে কায়েস এবং জব্বার ইবনে সালমা। আমের ও আরবাদ ছিল জাগতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের অভিলাষী। আমের ইতিপূর্বেও কয়েকটি অঘটনের নায়ক ছিল এবং তখনও কুমতলব নিয়ে এসেছিল।. জব্বার এবং গোত্রের অন্যান্য লোক খাঁটি মনে সত্যের অন্বেষণে আগমন করেছিল।

আমের মদীনায় পৌঁছে সলুল পরিবারের একজন মহিলার ঘরে মেহমান হল। জব্বার এবং খ্যাতনামা সাহাবী কা'ব ইবনে মালেকের মধ্যে পূর্ব থেকে জানাশোনা ছিল। এ কারণে তিনি তেরজন সঙ্গীসহ তাঁরই অতিথি হলেন। সাহাবী কা'ব (রাঃ) তাঁদের নিয়ে হুযুর (সাঃ)-এর দরবারে এলেন। বনূ আমের কথা প্রসঙ্গে একবার মহানবী (সাঃ)-কে 'আপনি আমাদের প্রভু' বলে সম্বোধন করলেন। তিনি বললেন ঃ প্রভু আল্লাহ্। তারা আবার বলল ঃ হুযুর আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সবচাইতে উদারপ্রাণ। এরশাদ হল ঃ কথা বলার সময় শয়তান যাতে বশীভূত করে না ফেলে, সেদিকেও লক্ষ্য রেখো। অর্থাৎ,কারও প্রতি লৌকিকতা আরোপ ও তোষামোদ করাও মিথ্যা ভাষণের অন্তর্ভুক্ত। —(মেশকাত)

আমের ইবনে তোফায়েল বলল ঃ মোহাম্মদ (সাঃ), তিনটি বিষয় উত্থাপন করতে চাই—মরুভূমি এলাকা আপনার শাসনাধীনে থাকবে আর শহরাঞ্চল থাকবে আমার অধিকারে। তা না হলে আপনি আমাকে আপনার স্থলবর্তী নিযুক্ত করে যান। যদি তাও মঞ্জুর না করেন, তবে আমি গাতফান গোত্রকে সঙ্গে নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাব। আমের পূর্ব থেকেই আরবাদকে বলে রেখেছিল ঃ আমি মোহাম্মদকে (সাঃ) কথায় মশগুল রাখব। এসবযোগে তুমি তার জীবনলীলা সাঙ্গ করে দেবে। কিন্তু কথা শুরু হওয়ার পর আমের দেখল, আরবাদ নিশ্চুপ অভিভূতের মত বসে আছে। নবুয়তের অদৃশ্য শক্তির বলে তার চোখের সামনে অন্ধকার ছেয়ে গেছে। আমের ও আরবাদ উভয়েই দরবার ত্যাগ করে চলে এল। মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ আয় আল্লাহ্! এদের অনিষ্ট থেকে বাঁচাও। আমের প্লেগ রোগে আক্রান্ত হলে আরবে শয্যাগত হওয়া একটি লজ্জাজনক ব্যাপার। তাই আমের সঙ্গীদের বলল ঃ আমাকে ঘোড়ার উপর বসিয়ে দাও। সেমতে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দেয়ার পর সে অবস্থায়ই সে প্রাণ ত্যাগ করল।

---

১. মুসলিম ও সেহাহসিত্তার অন্যান্য গ্রন্থে আবদুল কায়েস গোত্রের এ প্রতিনিধিদলটিরই উল্লেখ আছে। ইবনে মান্দা ও দুলাবী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এ গোত্রের আরও প্রতিনিধিদলের উল্লেখ করেছেন। এ কারণে আল্লামা কুস্তুলানী এ গোত্রেরই দু'টি দল গণনা করেছেন। প্রথম দল পঞ্চম হিজরীর কাছাকাছি সময়ে এবং দ্বিতীয় দল দশ হিজরীতে আসে। হাফেজ ইবনে হাজার কিতাবুল মাগাযীতে হুবহু এ তথ্যই উদ্‌ঘাটিত করেছেন। কিন্তু কিতাবুল ঈমানের ব্যাখ্যায় উভয় রেওয়ায়েতকে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন।

জব্বার এবং অন্যান্য লোকগণ ঈমানের ধনে ধনী হয়ে মদীনা থেকে দেশে ফিরে গেলেন।[১]

হেমইয়ার প্রমুখের প্রতিনিধিদল ঃ হেমইয়ার গোত্রের শক্তিশালী রাষ্ট্র আর অবশিষ্ট ছিল না। হেমইয়ার সম্রাটদের বংশধরেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তারা নামে মাত্র সম্রাট ছিলেন। আরবী ভাষায় তাদের উপাধি ছিল কীল। তারা স্বয়ং মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে আসেননি; কিন্তু দূত পাঠিয়ে সংবাদ দেন যে তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

এ সময়েই বাহ্‌রা; বনূবাক্কা প্রমুখ গোত্রের প্রতিনিধিদলও মদীনায় আগমন করেন।

খেলাফতের ভিত্তি স্থাপন

তিমির রাত্রির অবসান হলে প্রভাত রশ্মিতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়। ঘন কৃষ্ণ মেঘ সরে গিয়ে উজ্জ্বল ভাস্কর আলো বিকিরণ করতে থাকে। মানব জগৎ পাপ-তাপ, যুলুম ও অন্যায়ের অন্ধকারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। অকস্মাৎ সৌভাগ্যের প্রভাতরশ্মি বিকশিত হল এবং ন্যায় ও সততার চেহারা দেদীপ্যমান হয়ে উঠল। আরবরা যেভাবে বহু উপাস্য ত্যাগ করে এক আল্লাহ্‌র আরাধনায় আত্মনিয়োগ করল তেমনিভাবে তারা একটি মাত্র রাষ্ট্রের পতাকাতলে সমবেত হল।

আল্লাহ্‌পাক ওয়াদা করেছিলেন ঃ

"আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য থেকে ঈমানদার ও সৎকর্মীদের সঙ্গে ওয়াদা করেছেন যে তাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের ন্যায় অবশ্যই খেলাফত দান করবেন, তাদের জন্য মনোনীত ধর্মকে অবশ্যই শক্তিশালী করবেন এবং তাদের বর্তমান অস্বস্তিকর অবস্থাকে শান্তিতে পরিবর্তিত করে দেবেন,—যাতে তারা শুধু আমারই এবাদত এবং কাউকেও আমার অংশীদার না বানায়।"—(সূরা নূর)

খোদায়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং ভূপৃষ্ঠে খলিফা মনোনয়ন করা নবুয়তের জরুরী অঙ্গ নয়। কিন্তু যখন খোদায়ী আহ্বান দেশীয় রাজনীতির প্রাচীরের সঙ্গে ধাক্কা খেতে থাকে অথবা যখন পয়গম্বরের সংস্কার অভিযানের পথ দেশে বিরাজমান অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার দ্বারা কন্টকাকীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন পরগম্বর বাধ্য হয়ে ইবরাহীম ও মূসা (আঃ)-এর বেশে এগিয়ে গিয়েছেন।[২] দেশ ও জাতিকে নমরূদ ও ফেরাউনদের কবল থেকে মুক্ত করেছেন। হ্যরত ঈসা এবং হ্যরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-ও পয়গম্বর ছিলেন। তাঁরা রাজত্বের কোন অংশ পাননি।

১. সাধারণ ঘটনাবলী ইবনে ইসহাক গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। আমেরের উক্তি ও মৃত্যুর ঘটনা বোখারীতে উল্লিখিত হয়েছে।

২. হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) আপন গোত্রের সম্মানিত সরদার ছিলেন। সর্বদাই চার শত ক্রীতদাসের একটি সেনাদল তাঁর সঙ্গে থাকত। সিরিয়া ও বাবেলের পার্শ্ববর্তী কয়েকজন বাদশাহ্র সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়। আল্লাহ্ তাঁর সঙ্গে ওয়াদা করেন যে তাঁর বংশধরকে পবিত্রভূমির রাজত্ব দান করবেন। (তওরাত)

অপরপক্ষে, পয়গম্বর মূসা, দাউদ ও সুলায়মান (আঃ) দেশ ও জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন। কিন্তু মোহাম্মদ (সাঃ) একাধারে যেমন ছিলেন, ঈসা ও ইয়াহ্ইয়া (আঃ) তেমনি ছিলেন মূসা ও দাউদ (আঃ)। আরবের ধনভাণ্ডার তাঁর করায়ত্ত ছিল; কিন্তু তাঁর বাসগৃহে না ছিল নরম বিছানা, না ছিল উপাদেয় খাদ্য, না ছিল পবিত্র দেহে বাদশাহ্সুলভ পোশাক-পরিচ্ছদ এবং না ছিল পকেটে দিরহাম বা দীনার। ঠিক যে সময় তিনি পারস্য রোম সম্রাটদের সমতুল্য শক্তি অর্জন করে নেন, তখনও তিনি সাধারণ চাদর পরিবৃত মক্কায় সেই পিতৃমাতৃহীন এতীম এবং আকাশের নিষ্পাপ ফেরেস্তার ন্যায়ই নিজের অনন্য স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং ইসলামী যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করেছেন, তা এই ঃ

"মুসলমানদের সঙ্গে (বিনা কারণে) যুদ্ধ করা হয়, এখন তাদেরও যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হল। কেননা, তারা অত্যাচারিত। আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। যাদের অন্যায়ভাবে নিজেদের জনপদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এছাড়া তাদের আর কোন দোষ ছিল না। তারা বলত ঃ আল্লাহ্ আমাদের পালনকর্তা। দুনিয়াতে যদি এক জাতিকে অন্য জাতির দ্বারা প্রতিহত করা না হত, তবে বহু আস্তানা, গির্জা, এবাদতগৃহ এবং মসজিদ যাতে আল্লাহ্র নাম নেয়া হয় ধ্বংস করে দেয়া হত। যে আল্লাহ্কে সাহায্য করে, আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, জয়ী। মুসলমান তারা, যাদের আমি যদি ভূপৃষ্ঠে ক্ষমতা দান করি, তবে তারা আল্লাহ্র এবাদত করে, হকদার ব্যক্তিদের আর্থিক সাহায্য করে, মানুষ সৎকাজের আদেশ দেয়, মন্দকাজ করতে নিষেধ করে। প্রত্যেক বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্র হাতেই নিহিত।"—(সূরা হজ)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে ইসলামে যুদ্ধের সূচনা কেন এবং কিভাবে হল, ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য কি, ভূপৃষ্ঠে খলিফা মনোনয়নের দায়িত্ব কি এবং বিশ্বের সাধারণ রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্রের কোন্ কোন্ বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। এ সমস্ত আলোচ্য বিষয়ের নীতিগত ও বিস্তারিত বর্ণনা গ্রন্থের অন্যান্য অংশে আসবে। এখানে আরবের আইন-শৃঙ্খলা সম্বন্ধে সারারণ ও খুঁটিনাটি দু'একটি বিষয় বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।

পূর্বের পৃষ্ঠাসমূহ পাঠ করার পর পাঠক নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন, এখন আরবের সর্বত্রই শান্তির পরিবেশ বিরাজমান এবং রাজনৈতিক কোন্দলের কোন অস্তিত্ব নেই। দেশের কোণে কোণে ইসলাম প্রচারকগণ ছড়িয়ে পড়েছেন। বিভিন্ন গোত্র দূর-দূরান্ত থেকে মহানবী (সাঃ)-এর দরবারের দিকে ছুটে আসছে। মক্কা বিজয় ছিল ইসলামী সালতানাত সুসংহত হওয়ার প্রথম সোপান। এটা অষ্টম হিজরীর ঘটনা। এর পর মহানবী (সাঃ) বিভিন্ন গোত্রে যাকাৎ আদায়কারী দল নিযুক্ত করেন। কিন্তু প্রকৃত ইসলামী খেলাফতের সকল অঙ্গ দশম হিজরীর শেষভাগে বিদায় হজের অব্যবহিত পরে পূর্ণতা লাভ করে।

ইউরোপীয় লেখকগণ খেলাফতের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত নয় বলেই তাদের দৃষ্টিতে মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের এ নতুন যুগটি এশিয়ার একটি আনন্দোজ্জ্বল বাদশাহী জীবনের মতই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু যারা খেলাফত ও নবুওতের প্রকৃত স্বরূপ জানেন, তারা আরবের এ শাহানশাহকে ছিন্নবস্ত্র পরিহিত অবস্থায় মদীনার অলিগলিতে ক্রীতদাস ও ছিন্নমূল লোকদের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগকারী দেখতে পান। তিনি মুকুট ও সিংহাসনের মোহ থেকে মুক্ত, রাজপ্রাসাদ ও অট্টালিকার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনকারী, দারোয়ান বা দেহরক্ষী হতে বেপরওয়া, রিক্তহস্ত এবং খাদেম ও জাঁকজমক ছাড়াই লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয় রাজ্যে রাজত্ব করছিলেন। তাঁর রাজত্বে না ছিল পুলিশ, না ছিল বড় বড় অফিস কক্ষ, না ছিল বহুসংখ্যক পদাধিকারী ব্যক্তি, না ছিল মন্ত্রিপরিষদ, না ছিল রাজনৈতিক নেতৃবর্গ এবং না ছিল পৃথক পৃথক প্রশাসনযন্ত্র ও বিচারক দল। একাই তিনি সকল দায়িত্ব ও কাজকর্মের যিম্মাদার ছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি নিজেকে সাধারণ মুসলমানদের চাইতে একটি কানাকড়িরও বেশি হকদার মনে করতেন না, —(আবু দাউদ)। হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ন্যায়বিচারের সম্মুখে নবী-দুহিতা ফাতেমাও একজন সাধারণ অপরাধীর মর্যাদার সমান ছিল—(বোখারী)।

মহানবী (সাঃ)-এর আবির্ভাবের আসল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপ্রচার, চরিত্র সংশোধন এবং মানবাত্মার সংস্কার সাধন। এছাড়া অন্যান্য দায়িত্ব ছিল কেবল আনুষঙ্গিক। এ কারণে দেশ শাসন সংক্রান্ত শৃঙ্খলা বিধানে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) ততটুকুই সচেষ্ট হন, যতটুকু তৌহীদ প্রচারের ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে বিদ্যমান ছিল। এতদসত্ত্বেও এ কাজটি কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

দেশ শাসন সংক্রান্ত শৃঙ্খলা বিধান

মহানবী (সাঃ)-এর বয়স তখন ষাট বছর। এ বয়সেও রাষ্ট্রের সকল গুরুদায়িত্ব নিজেই সম্পাদন করতেন। প্রশাসক ও রাজকর্মচারী নিয়োগ, মুয়াযযিন ও ইমাম নির্দিষ্টকরণ, যাকাৎ ও জিযিয়া আদায়কারীদের নিযুক্তি, বিজাতীয়দের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন, মুসলমান গোত্রসমূহের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন, সেনাবাহিনীর অস্ত্রসজ্জা, মামলা-মোকদ্দমায় রায় প্রদান, উপজাতীয়দের গৃহযুদ্ধ দমন, প্রতিনিধিদলের জন্য ভাতা নির্ধারণ, রাষ্ট্রীয় আদেশ জারিকরণ, নওমুসলিমদের ব্যবস্থা, শরীয়তের মাসআলাসমূহে ফতোয়া দান, অপরাধের জন্য দণ্ডাদেশ কার্যকরীকরণ, দেশের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যাপারে শৃঙ্খলা স্থাপন, কর্মচারীদের দেখাশোনা এবং তাদের কাজের হিসাব গ্রহণ প্রভৃতি ছিল এ রাষ্ট্রের দায়িত্ব। দূরবর্তী প্রদেশসমূহে কয়েকজন সাহাবীকে প্রশাসক নিযুক্ত করে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু মদীনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের দায়িত্ব মহানবী (সাঃ) নিজেই সম্পন্ন করতেন।

ইসলামী খেলাফতের এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য মহানবী (সাঃ)-এর উপর বিরাট চাপ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে, তাঁর দৈহিক কর্মশক্তিতেও দারুণ ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে তিনি শেষ জীবনে শারীরিক দুর্বলতার কারণে অনেক সময় বসে বসে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। এ শারীরিক দুর্বলতার কারণ কি ছিল, তা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মুখে শোনা দরকার। কারণ, মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের কর্মধারা সম্বন্ধে তিনিই সঠিক বর্ণনা দিতে পারেন।

"আব্দুল্লাহ্ ইবনে শফীক বলেন ঃ আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মহানবী (সাঃ) বসে বসে নামায পড়তেন কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তবে তখন যখন জনগণ তাঁর স্বাস্থ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল।"

সেনাপতিত্ব ঃ ছোটখাট যুদ্ধ ও সামরিক অভিযানে সেনাপতি নির্বাচিত হতেন বিশিষ্ট সাহাবিগণ; কিন্তু যে কোন বড় সংঘর্ষ দেখা দিলে তাতে মহানবী (সাঃ) নিজেই নেতৃত্ব দিতেন। বদর, ওহুদ, খায়বর, মক্কা বিজয়, তবুক ইত্যাদিতে তিনিই সেনাপতি ছিলেন। এর উদ্দেশ্য শুধু সৈন্য পরিচালনা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনই ছিল না, বরং সৈন্যদের সাধারণ চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদি দেখাশোনা করাই ছিল অন্যতম লক্ষ্য। সেমতে মহানবী (সাঃ) ইসলামী সৈন্যদের যেসব খুঁটিনাটি সীমা লঙ্ঘনেরও হিসাব দিতেন, তা হাদীস গ্রন্থসমূহে স্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত রয়েছে। বলা বাহুল্য, এ কঠোর নিয়ন্ত্রণের কারণেই ইসলামী যুদ্ধনীতি অস্তিত্বলাভ করেছিল।

ফতোয়া দান ঃ মহানবী (সাঃ)-এর যুগে কয়েকজন সাহাবীও ফতোয়া দানের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু বেশিরভাগ সময় তিনিই এ দায়িত্ব পালন করতেন। ফতোয়া দেয়ার জন্য তিনি কোন সময় নির্দিষ্ট করেননি বরং উঠতে-বসতে চলতে ফিরতে কেউ প্রশ্ন করলে তিনি ইসলামী আহকাম সম্পর্কিত প্রশ্নাবলীর উত্তর দান করতেন। ইমাম বোখারী "কিতাবুল ইলম"-এ এসব ফতোয়াকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। খেলাফতের এ দায়িত্বকে হযরত ওমর (রাঃ) নিজের খেলাফতকালে অত্যন্ত উন্নতিসাধন করেন এবং এর জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ কায়েম করেন।

মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ঃ মহানবী (সাঃ)-এর আমলেই বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। হযরত আলী ও হযরত মুআয ইবনে জবলকে হুযুর (সাঃ) নিজেই বিচারক (কাযী) নিযুক্ত করে ইয়ামনে পাঠিয়েছিলেন। মদীনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি মহানবী (সাঃ) নিজেই করতেন। তাঁর নিকট বিচার চাওয়ার পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ছিল না। ইমাম বোখারী তাঁর গ্রন্থে একটি বিশেষ অধ্যায় সংযোজিত করেছে যার শিরোনামা এরূপ ঃ

"মহানবী (সাঃ)-এর দরজায় কোন দারোয়ান না থাকা প্রসঙ্গে।"

এ কারণে মহানবী (সাঃ) ঘরের ভেতরেও নিশ্চিন্ত মনে বসতে পারতেন না। মহিলাদের অভাব অভিযোগ সাধারণত অন্দর মহলেই শুনতেন। মহানবী (সাঃ)-এর ফয়সালাসমূহের এত বিরাট সম্ভার হাদীস গ্রন্থে রক্ষিত আছে যে সেগুলো সংগ্রহ করলে একটি বিরাট গ্রন্থে পরিণত হবে। সাধারণত হাদীসের কিতাবুল বুয়ূতে দেওয়ানী মোকাদ্দমা এবং "কিতাবুল কেসাস ওয়াদ্দিয়াত" এ ফৌজদারী মোকদ্দমাসমূহ উল্লিখিত হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় ফরমান ঃ এ কাজটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহানবী (সাঃ)-এর আমলে অন্যান্য বিভাগের জন্য কোন স্বতন্ত্র দফতর ছিল না; কিন্তু ফরমান বিভাগের ক্ষেত্রে দফতরের প্রাথমিক রূপরেখা কায়েম হয়েছিল। এ কাজের জন্য প্রথমে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত এবং শেষ দিকে হযরত মোয়াবিয়া আদিষ্ট হন। এছাড়া অন্যান্য সাহাবীও মাঝে মাঝে এ দায়িত্ব পালন করতেন। মহানবী (সাঃ) সমকালীন সম্রাট ও বাদশাহদের নামে ইসলামের আহ্বান জানিয়ে যে সব চিঠিপত্র প্রেরণ করেন, বিজাতীয়দের সঙ্গে যে সব চুক্তি সম্পাদন করেন, মুসলমান গোত্রসমূহের নামে যে সব নির্দেশ জারি করেন, প্রশাসক ও যাকাৎ আদায়কারিগণের হাতে যে সমস্ত ফরমান সমর্পণ করেন, সেনাবাহিনীর যে রেজিস্টার প্রস্তুত করান, কোন কোন সাহাবীর দ্বারা যে সব হাদীস লেখান, তা সবই এ শ্রেণীভুক্ত। যারকানী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ নিজ নিজ গ্রন্থে মহানবী (সাঃ)-এর লিখিত নির্দেশ ও ফরমানসমূহের জন্য একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

অতিথি সেবা ঃ নবুওত প্রাপ্তির পর মহানবী (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। ফলে, যারা তাঁর খেদমতে আগমন করত, তারা খেলাফত ও নবুওতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হত। তিনিও এ হিসাবেই তাদের মেহমানদারী করতেন। অতিথিদের মধ্যে বেশিরভাগ লোকই ইসলাম গ্রহণের জন্যে আসত। তাদের আতিথ্যের জন্য মহানবী (সাঃ) প্রথম থেকেই বিশেষভাবে বেলালকে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। কোন অভাবগ্রস্ত মুসলমান যখন মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে আসত এবং তিনি তাকে খালি গায়ে দেখতেন, তখন হযরত বেলালকে টাকা ধার করে হলেও তার জন্য অন্ন ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে আদেশ দিতেন। পরে কোনখান থেকে তাঁর কাছে অর্থকড়ি এলে তা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা হত। কেউ তাঁকে ব্যক্তিগত উপঢৌকন দিলে তাও এ খাতে ব্যয় করা হত। মহানবী (সাঃ) মাঝে মাঝে সাহাবিগণকে সদকা ও খয়রাত দানের প্রতি উৎসাহ দিতেন। এ পথে যে অর্থ আসত, তা সহায়-সম্বলহীন মুহাজিরদের সাহায্যার্থে ব্যয়িত হত। একবার মুহাজিরদের একটি ছিন্নমূল দল মহানবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়। প্রত্যেকের দেহে একটি করে চাদর ও কোমরে তরবারি ঝুলছিল। মহানবী (সাঃ) তাদের এহেন দুরবস্থা দেখে স্থির থাকতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ বেলালকে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। নামায সমাপনান্তে মহানবী (সাঃ) একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে সাহাবীদেরকে এই ছিন্নমূলদের

সাহায্যের প্রতি উৎসাহ দিলেন। এর সুফল দেখা গেল। জনৈক আনসারি বাড়ি থেকে খুব ভারী একটি থলে-যা বহন করা তাঁর পক্ষে কষ্টকর ছিল—এনে হযরতের সামনে রেখে দিলেন। এতে অন্যান্য সবার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সহায়-সম্বলহীন মুহাজিরদের সামনে অন্ন ও বস্ত্রের স্তূপ লেগে গেল। (মুসনাদে আহমদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা)

মক্কা বিজয়ের পর চারদিক থেকে প্রচুর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিনিধিদল আগমন করতে থাকে। মহানবী (সাঃ) স্বয়ং তাদের আতিথ্য করতেন এবং প্রয়োজন মত ভাতা ও পথ খরচ দান করতেন। প্রতিনিধি দলের উপর এর ভাল প্রভাব দেখা যেত। তিনি এদিকে এত বেশি লক্ষ্য রাখতেন যে ওফাতের সময় অন্যান্য ওছিয়তের মধ্যে একথাও বলেছিলেন ঃ

"আমি যেভাবে আগন্তুকদের উপঢৌকন দিতাম, তোমরাও সেভাবে দিও" —(বোখারী)।

রোগী দেখা ঃ রোগীদের দেখাশোনা করা এবং কেউ মারা গেলে তাদের দাফনকার্যে শরীক হওয়া একটি ধর্মীয় কর্তব্য। মহানবী (সাঃ)-এর মদীনা আগমনের পর এটা একটি সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়। তখন থেকে কারও মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে আত্মীয়রা মহানবী (সাঃ)-কে সংবাদ দিত। তিনি তাদের কাছে গিয়ে মাগফেরাতের দোয়া করতেন,—(মুসনাদ তৃতীয় খণ্ড, ৬৬ পৃঃ) কোন কোন দিক দিয়ে রোগী দেখার বিষয়টি খেলাফতের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়েছিল। কেননা, কোন কোন সাহাবী মৃত্যুর সময় আপন বিষয়-সম্পত্তি ওয়াক্ফ কিংবা সদকা করতে চাইতেন। মহানবী (সাঃ) এ সময়ে উপস্থিত থেকে তাঁদের ওয়াক্ফ সম্পর্কিত সহীহ নিয়মকানুন বলে দিতেন। যারা ঋণ রেখে মারা যেত মহানবী (সাঃ) তাদের জানাযায় শরীক হতেন না। এ কারণে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসরা কিংবা অন্যান্য সাহাবীরা বাধ্য হয়ে সে ঋণ পরিশোধ করে দিতেন। হাদীস গ্রন্থসমূহে এ ধরনের উদাহরণ বিদ্যমান আছে।

ধরপাকড় ঃ ইসলামী তমদ্দুনের উন্নতির যুগে এটা একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। এ বিভাগটি ব্যাপক ভিত্তিতে সমগ্র জাতির চরিত্র, অভ্যাস, কেনাবেচা, লেনদেন ইত্যাদির প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখত। কিন্তু মহানবী (সাঃ)-এর আমলে এরূপ কোন স্বতন্ত্র বিভাগ কায়েম ছিল না। তিনি নিজেই এ দায়িত্ব পালন করতেন। প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্রের খুঁটিনাটি বিষয় এবং ধর্মীয় কর্তব্য সম্পর্কে মাঝে মাঝে ধরপাকড় করতেন। তদানীন্তন আরবে ব্যয়সায়ের রীতিনীতি বহুল পরিমাণে ত্রুটিপূর্ণ ছিল। মহানবী (সাঃ) মদীনায় আগমন করার পর পরই ব্যবসাক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কারমূলক আদেশ জারি করেন। কিন্তু সবাইকে সংস্কার পালনে বাধ্য করাও ধরপাকড় বিভাগেরই কাজ ছিল। মহানবী (সাঃ) অতি কঠোরতার সঙ্গে এসব বিষয়ের দেখাশুনা করতেন এবং সবাইকে সংস্কার পালনে বাধ্য করতেন। যারা পূর্ব অভ্যাস ত্যাগ করত না, তাদের শাস্তি দিতেন। সহীহ বোখারী কিতাবুল বুয়ুতে বর্ণিত আছে ঃ

"হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-এর আমলে অনুমান করে খাদ্যশস্য ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখেছি। ক্রেতারা যেখানে খাদ্যশস্য ক্রয় করত, কোথাও স্থানান্তরিত না করে সেখানেই তা বিক্রয় করে দিত। এ ফটকাবাজারি ধরনের ব্যবসায়ের জন্য তাদের সাজা দেয়া হ্ত।"

মাঝে মাঝে সরেজমিনে অবস্থা দেখার জন্য মহানবী (সাঃ) বাজারে যেতেন। একবার বাজারে খাদ্যশস্যের একটি স্তূপ দেখে তিনি তার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিতেই ভেতরের দিকে আর্দ্রতা অনুভব করলেন। দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলেনঃ ব্যাপার কি? দোকানদার বলল ঃ হুযুর, বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেছে। এরশাদ হল ঃ তবে ভিজা শস্যগুলো উপরে রাখ নাই কেন, যাতে প্রত্যেকেই দেখতে পেত? জেনে রাখ, যারা প্রতারণা করে, তারা আমার দলভুক্ত নয়। (মুসলিম, ১ম খণ্ড, ৫৩ পৃঃ)।

ধরপাকড় সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে মহানবী (সাঃ)-এর প্রধান কাজ ছিল কর্মচারীদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। অর্থাৎ, কর্মচারিগণ যখন যাকাৎ ও সদকা আদায় করে আনতেন, তখন তাঁরা কোন অবৈধ পন্থা অবলম্বন করেছেন কিনা, তা দেখার উদ্দেশে তিনি তাদের পরীক্ষা নিতেন। একবার মহানবী (সাঃ) ইবনুল্লাতাইবাকে সাদকা আদায় করার নির্দেশ দেন। তিনি কর্তব্য সম্পন্ন করে ফিরে এলে মহানবী (সাঃ) তাঁর পরীক্ষা নিলেন। ইবনুল্লাতাইবাহ্ বললেন ঃ এ অর্থ মুসলিম জনগণের এবং এগুলো আমি উপঢৌকন হিসাবে পেয়েছি। মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ তুমি যখন ঘরে অবস্থান করেছিলে তখন এ উপঢৌকন পাওনি কেন? অতঃপর এক বক্তৃতায় এ বিষয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। (বোখারী, প্রথম খণ্ড, ১৬৮ পৃঃ)

ঝগড়া-বিবাদ নিষ্পত্তি ঃ ইসলাম সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বের ভেদাভেদ মেটানোর উদ্দেশে আগমন করেছে। এ কারণে মহানবী (সাঃ) প্রাথমিক পর্যায়ে আরবদের মধ্যকার সর্বপ্রকার ভেদাভেদ ও মতবিরোধের অবসান ঘটিয়ে স্থায়ী সৌহার্দ্য স্থাপন করাকে একটি অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্যরূপে গণ্য করতেন। যখন কোন ঝগড়া-বিবাদের সংবাদ আসত, তখন তিনি তার নিষ্পত্তিকে সমস্ত ধর্মীয় কর্তব্যের উপর অগ্রাধিকার দিতেন। একবার আমর ইবনে আওফ গোত্রের কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া দেখা দিল। মহানবী (সাঃ) এ সংবাদ পেয়ে কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে করে ঝগড়া নিষ্পত্তি করার জন্যে চলে গেলেন। এ কাজে অনেক বিলম্ব হয় এবং নামাযের সময় হয়ে গেলে হযরত বেলাল আযান দিলেন; কিন্তু আযানের পর মহানবী (সাঃ) এলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সবাই হযরত আবু বকরকে ইমাম বানিয়ে নামায আরম্ভ করলেন। এমন

সময় মহানবী (সাঃ) এসে উপস্থিত হলেন এবং কাতার ভেদ করে প্রথম সারিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) হুযুর (সাঃ)-এর উপস্থিতি লক্ষ্য করতে পারলেন না। কিন্তু পেছনের মোক্তাদিগণ যখন জোরে জোরে তালি বাজাতে লাগল, তখন তিনি পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে তাঁকে দেখলেন। প্রত্যেকেই আপন আপন স্থানে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য মহানবী (সাঃ) হাতে ইশারা করা সত্ত্বেও হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর উপস্থিতিতে নামাযের ইমামতকে ধৃষ্টতা জ্ঞান করলেন এবং পেছনে সরে এলেন। অতঃপর মহানবী (সাঃ) এগিয়ে গিয়ে ঈমানের জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলেন। (বোখারী, ১ম খণ্ড, ৩৭ পৃঃ)।

একবার কো'বাবাসীদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হয় এবং একদল অন্যদলের প্রতি ইটপাটকেল বর্ষণ করে। সংবাদ পেয়ে মহানবী (সাঃ) কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে নিষ্পত্তির উদ্দেশে চলে গেলেন। (বোখারী)। এ দুটি ঘটনাকে ইমাম বোখারী পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু হাদীসের টীকাকারগণ একে একই ঘটনার দুটি অংশ হিসাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বোখারীর অন্যান্য রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে মহানবী (সাঃ) পায়ে হেঁটে ঐ পর্যন্ত গিয়েছিলেন।

ইবনে আবী হদরদের কাছে হযরত কা'ব ইবনে মালেকের কিছু পাওনা ছিল। তিনি মসজিদে তার তাগাদা দিলেন। হদরদ পাওনার কিছু অংশ মাফ করাতে চাইলেন; কিন্তু কা'ব তাতে সম্মত হলেন না। কথা কাটাকাটির ফলে কিছু শোরগোল হল। মহানবী (সাঃ) ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। ঘর থেকে বাইরে এসে কা'বকে ডাকলেন। কা'ব উত্তর দিলে বললেন ঃ অর্ধেক পাওনা মাফ করে দাও। এতে কা'ব রাযী হয়ে গেলেন। অতঃপর মহানবী (সাঃ) হদরদকে বললেনঃ যাও; এখন অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধ করে দাও।

এমন শত শত ঘটনা প্রত্যহই মহানবী (সাঃ)-এর সামনে আসত।

মহানবী (সাঃ) মদীনা এবং মদীনার বাইরে অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রধান প্রধান সাহাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত করেন। ওহী লিপিবদ্ধকরণ, চিঠিপত্র এবং নির্দেশ ও ফরমান জারি করার জন্যে কয়েকজন লেখকের প্রয়োজন ছিল সর্বাগ্রে। ইসলামের পূর্বে আরবে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না। কিন্তু ইসলাম আরবের জন্য বিভিন্নমুখী কল্যাণের যে বিরাট ভাণ্ডার বয়ে এনেছিল তার মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা ছিল অন্যতম।

বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে যারা নিঃস্ব ছিল, তাদের মুক্তিপণ শুধু এটাই ধার্য করা হয় যে তারা মদীনার বালকদের লেখাপড়া শিখিয়ে দেবে। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত যিনি ওহী লেখার মত পবিত্র দায়িত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন —এ ভাবেই শিক্ষালাভ করেছিলেন। আবু দাউদের এক রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে আসহাবে সুফ্ফাকে যে সব বিষয় শিক্ষা দেয়া হত, তার মধ্যে লিখন শিক্ষাও ছিল।

লেখকগণের জামাত ঃ লেখকের পদ যেন একদিক দিয়ে মহানবী (সাঃ)-এর প্রতিনিধিত্ব ছিল। এ কারণে বিভিন্ন সময়ে প্রধান প্রধান সাহাবীকে এ কার্যে নিযুক্ত করা হয়। সাহাবীদের মধ্যে শুরাহবিল ইবনে হাসানা কেন্দী সর্বপ্রথম এ গৌরবে ভূষিত হন। তিনি প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কায় তিনিই সর্বপ্রথম ওহী লিপিবদ্ধ করেন। কোরাইশদের মধ্যে সর্বপ্রথম লেখক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন আবদুল্লাহ্, ইবনে আবী সারাহ্। মদীনায় সর্বপ্রথম এ গৌরব উবাই ইবনে কা'ব অর্জন করেন।

হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত আলী, হযরত ওসমান, হযরত যুবায়র, হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা, হযরত আমর ইবনুল আস, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আরকাম, হযরত সাবেত ইবনে কায়েস, ইবনে শাম্মাস, হযরত হানযালাহ্ ইবনে রবিউল আসাদী, হযরত মুগীরাহ্ ইবনে শো'বা, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ, হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস, হযরত আলা ইবনে হাযরামী, হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামন, হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত প্রমুখ সাহাবিগণ বিভিন্ন সময়ে এ পদে নিযুক্ত হন।

উপরোক্ত সমস্ত সাহাবীকেই মাঝে মাঝে এ কর্তব্য সম্পাদন করতে হত। হুদাইবিয়ার সন্ধির মুসাবিদা হযরত আলী নিজ হাতে লিখেছিলেন। বাদশাহের নামে চিঠিপত্র হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা লিখতেন। আরব সরদারদের নামে মহানবী (সাঃ) যেসব পত্র পাঠিয়েছিলেন তা হযরত উবাই ইবনে কা'বের হাতে লিখিত ছিল। কুত্ ইবনে হারেসার নামে যে চিঠি প্রেরণ করা হয়, তা ছিল হযরত সাবেত ইবনে কায়েসের হাতে লেখা। কিন্তু সাধারণভাবে এ দায়িত্বটি হযরত যায়েদ ইবনে সাবিতের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত ছিল। সাহাবীদের মধ্যে তাঁর নাম এ দিক দিয়েই অধিক খ্যাত। —(যারকানী)

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত মহানবী (সাঃ)-এর নির্দেশে সকল সাহাবীর উপর আরও একটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেন। তা হল হিব্রু ভাষা শিক্ষা করা। এর প্রয়োজন এভাবে দেখা দেয় যে মদীনায় মহানবী (সাঃ)-কে ইহুদীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হত। ইহুদীদের ধর্মীয় ভাষা ছিল হিব্রু। এ কারণে তিনি হযরত যায়েদ ইবনে সাবেতকে হিব্রু ভাষা শেখার নির্দেশ দেন। তিনি পনের দিনের চেষ্টায় এ ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম হন।

শাসনকর্তা ও প্রশাসক ঃ মোকদ্দমার বিচার, সুবিচার প্রতিষ্ঠা, শান্তি স্থাপন ও ছোটবড় মতভেদ নিষ্পত্তির জন্য একাধিক শাসনকর্তা ও প্রশাসকের প্রয়োজন ছিল। এ উদ্দেশে মহানবী (সাঃ) কয়েকজন সাহাবীকে বিভিন্ন স্থানে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাদের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

নাম	বিবরণ
বাযান ইবনে সামান	ইনি বাহ্রাম গোত্রের বংশধর। অনারব বাদশাহ্গণের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে মহানবী (সাঃ) তাঁকে ইয়ামনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।
শহ্র ইবনে বাযান	বাযান ইবনে সামানের পর মহানবী (সাঃ) তাঁকে সানআর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।
খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস	শহ্র ইবনে বাযান নিহত হওয়ার পর হুযূর (সাঃ) তাঁকে সানআর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।
মুহাজির ইবনে উমাইয়া	তাঁকে কেন্দা ও সদক এলাকায় শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তাঁর কর্মস্থলে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই মহানবী (সাঃ) ইন্তেকাল করেন।
যিয়াদ ইবনে লবীদুল আনসারী	তিনি হাযরামাওতের প্রশাসক ছিলেন।
আবু মূসা আশআরী	তিনি যুবায়দ, আদন, যামআ ইত্যাদি অঞ্চলে প্রশাসক ছিলেন।
মুআয ইবনে জবল	জুন্দের প্রশাসক।
আমর ইবনে হাযম	নাজরানের প্রশাসক।
ইয়াযিদ ইবনে ও আবু সুফিয়ান	তাইমার প্রশাসক।
এত্তাব ইবনে সাইদ	মক্কার প্রশাসক।
আলী ইবনে আবু তালেব	ইয়ামনের রাজস্বের মুতওয়াল্লী।
আমর ইবনুল আস	আম্মানের প্রশাসক।
আলা ইবনে হাযরামী	বাহ্রায়েনের প্রশাসক।

সংশ্লিষ্ট এলাকার বিস্তৃতি ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে এসব শাসক নিযুক্ত করা হত। মহানবী (সাঃ)-এর আমলে ইসলাম অধিকৃত আরব এলাকাসমূহের মধ্যে ইয়ামন সবচাইতে বেশি বিস্তৃত ও তাহ্যীব-তমদ্দুনে উন্নত ছিল। এ দেশটি দীর্ঘদিন হতেই একটি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধীন ছিল। এ কারণে মহানবী (সাঃ) একে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক ভাগের জন্য পৃথক পৃথক প্রশাসক নিযুক্ত করেন। খালেদ ইবনে সাঈদকে সানআর, মুহাজির ইবনে উমাইয়াকে কেন্দার, যিয়াদ ইবনে লবীদকে হাযরামাওতের, মুয়ায ইবনে জবলকে জুন্দের এবং আবু মূসা আশআরীকে যুবায়দ, যামআ, আদন ও সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলের প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। (এস্তিআব)

সাধারণত যখন কোন মুহাজিরকে কোন অঞ্চলের প্রশাসক নিযুক্ত করা হত, তখন সঙ্গে একজন আনসারীকেও নিয়োগ করা হত;—(মুসনাদে ইবনে হাম্বল ৫ম খণ্ড ও ১৮৬ পৃঃ)। রাজনৈতিক শৃঙ্খলা স্থাপন, মোকদ্দমার বিচার, রাজস্ব আদায় ইত্যাদি ছাড়াও প্রশাসকগণের প্রধান কর্তব্য ছিল ইসলাম প্রচার করা এবং সুন্নত ও ফরয শিক্ষা দেয়া। এদিক দিয়ে তাঁরা দেশের শাসনকর্তা এবং প্রদেশের প্রশাসক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম প্রচারক এবং চরিত্রের শিক্ষাদাতার মর্যাদাও রাখতেন। এস্তিয়াব গ্রন্থে মুয়ায ইবনে জবল সম্পর্কিত আলোচনায় বলা হয়েছে ঃ

"মহানবী (সাঃ) তাঁকে ইয়ামনের এক অংশ জুন্দের বিচারক নিযুক্ত করে পাঠান, যাতে তিনি লোকদের কোরআন ও ইসলামী শরীয়তের শিক্ষা দেন। ইয়ামনে যে সব কর্মচারী ছিল, তাঁদের সংগৃহীত রাজস্ব একত্রিত করার দায়িত্ব তাঁকে দেয়া হয়।

প্রশাসকগণ যখন কর্মস্থলে রওয়ানা হতেন, তখন মহানবী (সাঃ) কর্তব্য কাজ নির্দিষ্ট করে দিতেন। মুয়ায ইবনে জবলকে পাঠাবার সময় মহানবী (সাঃ) এরূপ উপদেশ দেন ঃ

"তুমি আহ্‌লে কিতাবদের কাছে যাচ্ছ। প্রথম তাদের তওহীদের প্রতি আহ্বান জানাবে। তারা তা মেনে নিলে বলবে যে আল্লাহ্ দিবারাত্রে পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছেন। যখন তাও মেনে নেবে তখন তাদের যাকাৎ ফরয হবার কথা বলবে। এটা ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে তাদেরই দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। তারা এতেও সম্মত হলে বেছে বেছে উত্তম মাল গ্রহণ করতে বিরত থাকবে। মযলুমের বদদোয়াকে ভয় করবে। কারণ, তার ও আল্লাহ্‌র মধ্যে অন্তরাল নেই।"

এসব কর্তব্য পালনের জন্য গভীর জ্ঞান, প্রশস্ত দৃষ্টি এবং ইজতিহাদ তথা উদ্ভাবনীশক্তির প্রয়োজন সর্বাধিক। তাই মহানবী (সাঃ) শাসনকর্তাদের গভীর জ্ঞান ও কর্মপদ্ধতির পরীক্ষা নিতেন। সেমতে হযরত মুয়াযকে পাঠানোর পূর্বে তাঁর ইজতিহাদী যোগ্যতা তথা উদ্ভাবনীশক্তি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা লাভ করেন। তিরমিযীতে বলা হয়েছে ঃ

"মুয়ায ইবনে জবলকে ইয়ামনে পাঠাবার সময় মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ তুমি কিসের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করবে? তিনি বললেন ঃ কোরআন মজীদের ভিত্তিতে। মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ যদি তুমি কোরআনে সে ফয়সালা খুঁজে না পাও? তিনি বললেন ঃ তবে হাদীসের ভিত্তিতে। মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ যদি হাদীসেও না পাও? তিনি বললেন ঃ তবে আমি নিজস্ব রায় দ্বারা ফয়সালা উদ্ভাবন করব। এতে মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র শুকরিয়া যিনি রসূলের প্রেরিত ব্যক্তিকে এমন বিষয়ের তওফীক দিয়েছেন, যা রসূল পছন্দ করেন।"

কিন্তু আরবদের অন্তর জয় করার জন্য এ সমস্ত বিষয়ের চাইতেও নম্রতা, দয়ার্দ্রতা, সহনশীলতা ও সদ্ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। অথচ রাজনীতি ও শাসনক্ষমতার ক্ষেত্রে এসব গুণ ছিল প্রায় দুর্লভ। এ কারণে মহানবী (সাঃ) প্রশাসকগণের মনোযোগ বার বার এসব গুণের প্রতি আকৃষ্ট করতেন। হ্যরত মুয়াযকে জনৈক সাহাবীর সঙ্গে ইয়ামনে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠাবার সময় প্রথমে উভয়কেই সাধারণভাবে উপদেশ দেন ঃ

- "সহজভাবে শাসন পরিচালনা করো, জটিলতা সৃষ্টি করো না। মানুষকে সুসংবাদ দিবে, তাদের মনে বিতৃষ্ণা জাগাবে না, পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকবে—মতভেদ করবে না।"—(মুসলিম, ২য় খণ্ড, ৬৩ পৃঃ)।

এ পর্যন্ত বলেও মহানবী (সাঃ) নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। মুয়ায ইবনে জবল (রাঃ) ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে রেকাবে পা রাখার পরও মহানবী (সাঃ) বিশেষভাবে একথাগুলো বলে দিলেন ঃ "মানুষের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করবে।"

কোন রাষ্ট্রক্ষমতা যতই দয়ার্দ্র হোক না কেন, 'কোন দেশ' অধিকারভুক্ত করার পর প্রাথমিক অবস্থায় উদ্ধত লোকদের বশে আনবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য হয়েই কঠোরতার আশ্রয় নিতে হয়—এ নীতি নির্ভুল হলে আরবরা সবচাইতে বেশি কঠোরতার যোগ্য ছিল। কিন্তু মহানবী (সাঃ) এ উপরোক্ত পবিত্র শিক্ষার ফলস্বরূপ বালুকাময় আরবের একটি বালুকণাও নবীজীর শাসকগণের নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়নি। এমন কি, পরবর্তীকালে সাহাবিগণ তৎকালীন শাসকদের সামান্যতম একটু ব্যতিক্রম করতে দেখলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তেন এবং মহানবী (সাঃ)-এর শিক্ষার আলোকে তাদের বাধা দান করতেন। একবার সাহাবী হেশাম ইবনে হাকীম ইবনে হেশাম দেখতে পান যে সিরিয়ার কিছুসংখ্যক নিবতী বংশোদ্ভূত লোককে রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি অন্যান্য লোককে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলল ঃ জিযিয়া আদায় করার জন্য এদের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি একথা শুনে বললেন ঃ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মহানবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ যারা মানুষকে দুনিয়াতে শাস্তি দেয়, আল্লাহ্ তাদের কঠোর সাজা দেবেন। (মুসলিম)

যাকাৎ ও জিযিয়া আদায়কারী দল ঃ আরবদের আন্তরিকতা ও ঈমানী জোশ তাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যাকাৎ দানে উৎসাহিত করত। সেমতে ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক গোত্র নিজেদের যাকাৎ নিজেরাই মহানবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত করত এবং তাঁরা দোয়া নিয়ে কৃতার্থ হত। কিন্তু একটি বিশাল দেশ ও একটি বিরাট রাষ্ট্রের জন্য এ নীতি যথেষ্ট হতে পারে না। তাই প্রশাসক নিয়োগ ছাড়াও নবম হিজরীর পহেলা মহররম মহানবী (সাঃ) যাকাৎ ও অন্যান্য রাজস্ব আদায় করার নিমিত্ত প্রত্যেক গোত্রের জন্য পৃথক পৃথক আদায়কারী দল নিযুক্ত করেন। তারা গোত্রে গোত্রে ঘুরে লোকদের কাছ থেকে যাকাৎ ও খেরাজ আদায় করতেন এবং মহানবী (সাঃ)-এর কাছে পেশ করতেন। সাধারণত গোত্রের সরদারগণই আপন আপন গোত্রের আদায়কারী নিযুক্ত হতেন। হাদীস পাঠে জানা যায়, তাদের সাধারণত সাময়িকভাবেই নিয়োগ করা হত।

মোটকথা, এ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য মহানবী (সাঃ) নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে বিভিন্ন গোত্রে ও শহরে নিযুক্ত করেন—[১]

নাম	নিয়োগস্থল
আদী ইবনে হাতেম	তাঈ ও বনী আসাদ
সাফওয়ান ইবনে সফয়ান	বনী আমের
মালেক ইবনে ওয়াইনা	বনূ হান্যালাহ্
বরিদা ইবনে হাসীব	গেফার ও আসলাম
ওব্বাদ ইবনে বিশর আশহালী	মুলায়ম ও মুযায়না
রাফে' ইবনে মুকাইল জুহানী	জুহায়না
যবরকান ইবনে বদর	বনূ সাদ
কায়স ইবনে আসেম	"
আমর ইবনুল আস	বনূ ফেযারা
যাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান	বনূ কেলাব
বুশর ইবনে সুফিয়ান কা'বী	বনূ কা'ব
আবদুল্লা ইবনুল্লাতাইবাহ্	বনূ যুবাইর
আবু জহম ইবনে হুযায়ফা	বনূ লায়ম
হুযায়মী	হুযায়মী গোত্র
ওমর ফারুক	মদীনা শহর
ওবায়দা ইবনে জাররাহ্	নাজরান শহর
আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা	খায়বর শহর
যিয়া ইবনে লবীদ	হামরামাওত
আবু মূসা আশআরী	ইয়ামন প্রদেশ
খালেদ	
আবান ইবনে সাঈদ	বাহ্রায়েন
আমর ইবনে সাঈদ	তায়মা
ইবনুল আস	"
মাহ্মা ইবনে জুযউল	এক-পঞ্চমাংশ
আসাদী	আদায়
ওয়াইনা ইবনে হিসন	বনূ তামীম
ফেযারী	

১. এ তালিকায় অধিকাংশ নাম ইবনে সাআদ গ্রন্থের ১১৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে। ওমর ফারুক, মাহ্সা ও ওবায়দা ইবনে জাররাহ্র উল্লেখ বোখারীতে এবং আরও কয়েকজনের উল্লেখ আবু দাউদে আছে। অবশিষ্টদের নাম যাদুল মাআ এবং ফুতুহুল বুলদান ও বালাযুরী গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

এসব আদায়কারিগণের নিয়োগের ব্যাপারে মহানবী (সাঃ) নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অত্যাবশ্যকীয় মনে করতেন।

(১) তাঁদেরকে একটি ফরমান দেয়া হত। তাএসবস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হত যে কি শ্রেণীর মাল কত সংখ্যক হলে তাতে কি পরিমাণ যাকাৎ ওয়াজেব। বেছে বেছে মাল নেয়ার অথবা প্রাপ্য অপেক্ষা বেশি মাল নেয়ার অনুমতি ছিল না। সাধারণ নির্দেশ ঃ "বেছে বেছে উৎকৃষ্ট মাল নেবে না।" কর্মচারিগণ কঠোরভাবে এ ফরমান পালন করতেন এবং এক চুল পরিমাণও সীমা লঙ্ঘন করতেন না। কেউ কেউ প্রাপ্য অপেক্ষা বেশি দিতে চাইতেন ঃ কিন্তু আদায়কারীরা তা গ্রহণ করতেন না। সুয়াইদ ইবনে গাফলাহ্ বর্ণনা করেন ঃ আমাদের গোত্রে মহানবী (সাঃ)-এর একজন আদায়কারী আগমন করলে আমি তাঁর নিকট গিয়ে বসলাম। তিনি প্রথমে সেসব জন্তুর নাম উল্লেখ করলেন, যেগুলো গ্রহণ করার অনুমতি ফরমানে ছিল না। ঠিক তখনই কুঁজ বিশিষ্ট উট এনে আদায়কারীর সামনে পেশ করা হল। তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন (নাসারী, ৩৯০ পৃঃ)। তেমনি জনৈক ব্যক্তি এক আদায়কারীকে বাচ্চাওয়ালী বকরী দিতে চাইলে তিনি বললেন ঃ এটা নিতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে (নাসারী, ৩৯৩ পৃঃ)।

(২) আবরদের অর্থকড়ি ছাগল ও উটের পালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এসব ছাগল ও উট জনশূন্য প্রান্তর ও পাহাড়ের পাদদেশে ঘাস খেয়ে বেড়াত। সাধারণ কোন রাষ্ট্রের কড়া নির্দেশ বলে মালিকদের স্বয়ং জন্তু নিয়ে আদায়কারীদের সামনে হাযির হতে বাধ্য করাই হয়ত স্বাভাবিক ছিল ; কিন্তু তা না করে আদায়কারীদের স্বয়ং এসব গিরিপথে গিয়ে যাকাৎ আদায় করতে হত। জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেন ঃ আমি একটি গিরিপথে ছাগল চরাচ্ছিলাম। দুজন উষ্ট্রারোহী ব্যক্তি এসে বলল ঃ আমরা রসূলে খোদার প্রেরিত দূত। এখানে আপনার ছাগলের যাকাৎ নিতে এসেছি। আমি একটি বাচ্চাওয়ালা ও দুগ্ধবতী বকরী পেশ করলাম। তাঁরা বললেন ঃ আমাদের প্রতি এটা নেয়ার নির্দেশ নেই। আমি অন্য একটি ছাগল দিলে তাঁরা তাকে উটের পিঠে তুলে নিয়ে চলে গেলেন। —(নাসায়ী)

(৩) অন্তরের পবিত্রতা ও শুচিতার কারণে সাহাবিগণ যাবতীয় অবৈধ অর্থ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন। একবার মহানবী (সাঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহাকে খায়বরের ইহুদীদের নিকট প্রেরণ করেন—যাতে তিনি চুক্তি মোতাবেক সেখানকার কৃষি উৎপাদনের অর্ধাংশ ভাগ করিয়ে আনেন। ইহুদীরা তাঁকে উৎকোচ দিতে চাইলে তিনি বললেন ঃ খোদার দুশমনরা, তোমরা আমাকে হারাম অর্থ খাওয়াতে চাও—(ফুতুহুল বুলদান)। কিন্তু সাহাবিগণর এ রকম পবিত্রতা ও হারাম অর্থের প্রতি উদাসীনতা সত্ত্বেও যখন কোন আদায়কারী সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন স্বয়ং হুজুর (সাঃ) তাঁর কৃতকর্মের দোষগুণ বিচার করতেন। একবার সাহাবী ইবনুল্লাতাইবাকে যাকাৎ আদায়ের জন্য প্রেরণ করা

হয়। তিনি ফিরে এলে মহানবী (সাঃ) তাঁর কর্মের দোষ গুণ যাচাই করলেন। হিসাবে দিতে গিয়ে তিনি বললেন ঃ এটা আপনার অর্থ এবং এটা আমি উপঢৌকন হিসাবে লাভ করেছি। একথা শুনে মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ তুমি গৃহে বসে বসে এ উপঢৌকন পেলে না কেন? এতে সান্ত্বনা না হওয়ায় তিনি এক ভাষণ দিলেন এবং সকলকেই এ রকম অর্থ গ্রহণ করতে নিষেধ করে দিলেন। (মুসলিম, ২য় খণ্ড, ১১৩ পৃঃ)।

(৪) মহানবী (সাঃ) আপন পরিবারের লোকজনের জন্য সদকা ও যাকাৎ হারাম করে দিয়েছিলেন। এ কারণে তাঁর পরিবারের কাউকেও যাকাৎ আদায়কারী নিযুক্ত করা হয়নি। একবার মহানবী (সাঃ)-এর চাচাত ভাই ও ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল মোত্তালেব ইবনে যামআ ইবনে হারেস ও ফযল ইবনে আব্বাস উভয়ে মহানবী (সাঃ)-এর কাছে আবেদন জানালেন যে এখন আমরা পরিণত বয়সে পৌঁছেছি। সুতরাং অন্যান্য লোকের ন্যায় আমাদেরও যাকাৎ আদায়কারী নিযুক্ত করুন, যাতে পারিশ্রমিক হিসাবে যে অর্থ পাব তা বিয়ের জন্য সঞ্চয় করতে পারি। উত্তরে মহানবী (সাঃ) বলে দিলেন ঃ আমার পরিবারের জন্য সদকা ও যাকাৎ জায়েয নয়। কারণ, এটা জনগণের সঞ্চিত সম্পদের ময়লা —(সেহাহ্)

(৫) মহানবী (সাঃ) স্বয়ং প্রশাসক নির্বাচন করতেন। এ পদের জন্য যারা নিজেরাই দরখাস্ত করত, তিনি তাদের দরখাস্ত নামঞ্জুর করতেন। একবার আবু মূসা আশআরীর সঙ্গে দু ব্যক্তি এসে প্রশাসকের পদলাভের জন্য দরখাস্ত করল। মহানবী (সাঃ) আবু মূসাকে বললেন ঃ তুমি কি বল? তিনি বললেন ঃ আমার আগে জানা ছিল না যে তারা এ উদ্দেশ্যে এসেছে। মহানবী (সাঃ) উভয়ের প্রার্থনা নামঞ্জুর করে বললেন ঃ যারা নিজে প্রার্থনা করে, আমি তাদের প্রশাসক নিযুক্ত করি না। কিন্তু পরক্ষণেই আবু মূসা আশআরীকে প্রার্থনা ব্যতিরেকেই ইয়ামনের প্রশাসক নিযুক্ত করে পাঠিয়ে দেয়া হল। (মুসলিম, ২য় খণ্ড, ১০৯ পৃঃ)।

(৬) কর্মচারী ও প্রশাসকগণ প্রয়োজন পরিমাণে পারিশ্রমিক পেতেন। মহানবী (সাঃ) সাধারণ ঘোষণা প্রচার করিয়ে রেখেছিলেন যে কেউ নির্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা বেশি পারিশ্রমিক গ্রহণ করলে, তা আর্থিক খেয়ানত বলে গণ্য হবে। প্রয়োজনের পরিমাণ কতটুকু, তা মহানবী (সাঃ) নিজেই পরিষ্কার বলে দেন ঃ

"যে ব্যক্তি আমাদের প্রশাসক হবে, সে একজন স্ত্রীর খরচ গ্রহণ করবে। তার কাছে চাকর না থাকলে চাকরের এবং বাসস্থান না থাকলে বাসস্থানের খরচও পাবে। কেউ এর চাইতে বেশি গ্রহণ করলে সে আত্মসাৎকারী বলে বিবেচিত হবে।" —(আবু দাউদ, ২য় খণ্ড)।

মহানবী (সাঃ)-এর আমলে হযরত ওমরও এ রকম পারিশ্রমিক পেতেন। তাঁর খেলাফতকালে একবার যখন সাহাবিদের কেউ কেউ সংসারের অনাসক্তির

কারণে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, তখন তিনি মহানবী (সাঃ)-এর এ কর্মপন্থাকেই প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করেন।

বিচারক দল ঃ উপরোক্ত পদ ছাড়া আরও কতিপয় পদ সাদাসিধাভাবে কায়েম ছিল। উদাহরণবশত মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য বিচারকের পদ। যদিও মহানবী (সাঃ) নিজেই বেশিরভাগ সময় এ দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন, তবুও মাঝে মাঝে তাঁর নির্দেশে নিম্নোদ্ধৃত সাহাবিগণও এ কর্তব্য পালন করেছেন। হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ, উবাই ইবনে কা'ব, মায়ায ইবনে জবল (রাঃ)।

পুলিশ ঃ খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও নিয়মিত পুলিশ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বনূ উমাইয়ার রাজত্বকালেই স্বতন্ত্রভাবে এ বিভাগটির সূচনা হয়। (ফতহুল বারী) তবে মহানবী (সাঃ)-এর আমলেই এর প্রাথমিক সূচনা হয়। তাঁর আমলে কায়স ইবনে সা'দ এ দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। এ উদ্দেশে তিনি সর্বদাই প্রিয় নবীজীর (সাঃ) সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন।

মৃত্যুদণ্ড ঃ অপরাধীদেরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার দায়িত্ব হযরত যুবায়র, হযরত আলী, মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ, মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা, আসেম ইবনে সাবেত এবং যাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান কেলাবী নিযুক্ত ছিলেন। —(যাদুল মাআদ)

বিজাতীয়দের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন ঃ ইসলামী রাষ্ট্র পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আরবের বুকে সরাসরি মূর্তি পূজার আর কোন অস্তিত্ব ছিল না। কোথাও কোথাও শুধু অগ্নি উপাসক, খৃষ্টান ও ইহুদীদের বসতি ছিল। তাদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক লোকের অন্তর ঈমানের নূরে আলোকিত হলেও সমষ্টিগতভাবে তারা তখনও বিভ্রান্তির মধ্যেই নিমজ্জিত ছিল। এতদসত্ত্বেও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রবল প্রতাপান্বিত শক্তির সামনে তারা মাথা উঁচু করতে সক্ষম ছিল না। হেজাযের ইহুদীরা ব্যতীত আরবের সকল জাতি সানন্দে ইসলামের আনুগত্য স্বীকার করে। তাই ইসলামও তাদের জানমাল, ইয্যত-হুরমত ও ধর্মের হেফাযতের সকল দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়। এর বিনিময়ে ইসলাম তাদের যিম্মায় সামান্য পরিমাণে জিযিয়া কর (অর্থাৎ, প্রত্যেক সামর্থ্যবান, বুদ্ধিমান, পরিণত বয়স্ক পুরুষদের উপর বার্ষিক এক দীনার) ধার্য করে। এ কর নগদ টাকায় আদায় হওয়া জরুরী ছিল না; বরং সাধারণত যে জায়গায় যে বস্তু উৎপন্ন হত, কিংবা যে বস্তু প্রস্তুত হত, তাও জিযিয়া হিসাবে দেয়া যেত। (যাদুল মাআদ, ১ম খণ্ড)।

বিজাতীয়দের মধ্য থেকে মহানবী (সাঃ) সর্বপ্রথম সপ্তম হিজরীতে খায়বর, ফদক, ওয়াদিউল কুরা ও তায়মার ইহুদীদের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করেন। তখনও জিযিয়ার আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। এ কারণে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যে সব শর্তাদি নির্ধারিত হয়, জিযিয়ার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও তা বলবৎ রাখা

হয়।—(যাদুল মাআদ, ১ম খণ্ড) আসল শর্ত ছিল এই যে তারা প্রজা হিসাবে বসবাস করবে এবং উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক নিজেরা নেবে এবং অর্ধেক মালিকদের দেবে। —(বোখারী, মুসলিম, আবুদ দাউদ, ফুতুহুল বুলদান)।

নবম হিজরীতে জিযিয়ার আয়াত নাযিল হলে পর সমস্ত চুক্তি তারই ধারা অনুযায়ী সম্পাদিত হয়। নাজরানের ইহুদীরা মদীনায় এসে শান্তিচুক্তির আবেদন জানালে মহানবী (সাঃ) তা মঞ্জুর করেন। চুক্তির শর্ত ছিল এরূপ ঃ তারা মুসলমানদের প্রতি বছর দু'হাজার প্রস্ত বস্ত্র দেবে এবং তা দু' কিস্তিতে অর্থাৎ, অর্ধেক সফর মাসে এবং বাকি অর্ধেক রজব মাসে প্রদান করবে। ইয়ামনে কোন সময় বিদ্রোহ দেখা দিলে তার ধার হিসাবে ত্রিশটি লৌহবর্ম, ত্রিশটি ঘোড়া, ত্রিশটি উট এবং ত্রিশ-ত্রিশটি প্রত্যেক প্রকারের অস্ত্র দিবে। মুসলমানগণ তা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। এর বিনিময়ে যতদিন পর্যন্ত তারা সুদের কারবার অথবা বিদ্রোহ না করবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের গির্জা ধ্বংস করা হবে না, পাদ্রীদের বহিষ্কার করা হবে না এবং তাদের নিজ নিজ ধর্মকর্ম পালনে কোনরকম বাধার সৃষ্টি করা হবে না।—(আবু দাউদ)।

সিরিয়ায় খৃষ্টান ও ইহুদীদের বহু গ্রাম ছিল। দুমাতুল জান্দাল, ঈলা, মুক্না, জাররা, আযরাহ, তাবালা ও জাবাশের যেসব খৃষ্টান ও ইহুদী ভূস্বামী ইসলাম গ্রহণ না করে জিযিয়া দিতে সম্মত হয়, নবম হিজরীর রজব মাসে তাবুক যুদ্ধের সময় তাদের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের উপর বার্ষিক এক দীনার হিসাবে জিযিয়া ধার্য করা হয়। এছাড়া তাদের এলাকা দিয়ে গমনকারী মুসলমানদের খাদ্য সরবরাহ করাও তাদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ধার্য করা হয়।

ইয়ামনের যেসব ইহুদী ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাদের উপরও উপরোক্ত পরিমাণে জিযিয়া ধার্য করা হয়। তাদের এমন একটি সুবিধাও দেয়া হয় যে নগদ মুদ্রা দিতে না পারলে সমমূল্যের গৃহনির্মিত বস্ত্রও দিতে পারবে। —(আবু দাউদ) বাহরায়েনের অগ্নি উপাসকদের সঙ্গেও এ পরিমাণ জিযিয়া করের বিনিময়েই চুক্তি সম্পাদন করা হয়। - (আবু দাউদ, বালাযুরী)।

খাজানা ও শুল্কের প্রকারভেদ ঃ বিভিন্ন উদ্দেশ্য বশত ইসলামে তখন আয়ের উৎস ছিলমাত্র পাঁচটি – গনীমত (যুদ্ধলব্ধ মাল), ফায়, যাকাৎ, জিযিয়া ও খেরাজ। প্রথম ও দ্বিতীয়টি ছাড়া অবশিষ্ট উৎসগুলো ছিল বার্ষিক।

গনীমতের মালসম্পদ শুধু যুদ্ধে জয়লাভের সময়ই পাওয়া যেত। আরবে এ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে সেনাবাহিনীর সরদার গনীমতের এক-চতুর্থাংশ নিজে গ্রহণ করত ; তাদের পরিভাষায় একে মেরবা বলা হত। অবশিষ্ট অর্থ যে যেভাবে পারত নিয়ে যেত। কোনরূপ সুষ্ঠু বন্টনপদ্ধতি ছিল না। বদর যুদ্ধের পর আল্লাহ্ গনীমতের অর্থ নিজের মালিকানা আখ্যা দেন। তন্মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ ও রসূলের নামে ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন খাতের জন্য নির্দিষ্ট করে দেন। বলা হয় ঃ

"হে রসূল, তারা আপনাকে গনীমতের অর্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন, এটা খোদা ও রসূলের মালিকানা।"—(সূরা আন্‌ফাল)

আল্লাহ্ ও রসূলের মালিকানার উদ্দেশ্য এই যে এটা সৈনিকদের মালিকানা নয়; বরং কল্যাণের ভিত্তিতে খলীফা যেভাবে সমীচীন মনে করবেন, ব্যয় করতে পারবেন। তদ্রূপ এক-পঞ্চমাংশ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"মুসলমানগণ, জেনে নাও, তোমরা গনীমতের যে অর্থ পাও তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্, রসূল, ইসলামী সমাজের পোষ্যবর্গ, এতীম ও মিস্‌কীনদের জন্য নির্দিষ্ট।' — (সূরা আন্‌ফাল)

দু'একটি ঘটনায় মহানবী (সাঃ) গনীমতের অর্থ বিশেষভাবে মুহাজিদের অথবা মক্কার নওমুসলিমদের দান করেছেন। এছাড়া অন্যান্য সবক্ষেত্রেই এক পঞ্চমাংশ পৃথক করার পর সমুদয় অর্থ পাইপাই হিসাব করে সৈনিকদের সমভাবে বন্টন করেছেন। অশ্বারোহী সৈনিক হলে তিন অংশ এবং পদাতিক হলে এক অংশ দেয়া হত। কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে অশ্বারোহী সৈনিকগণ দুই অংশ পেত।—(আবু দাউদ) এক-পঞ্চমাংশ থেকে সামান্যই মহানবী (সাঃ) ব্যক্তিগত খরচের জন্য গ্রহণ করতেন। উল্লিখিত আয়াতে ব্যয়ের যেসব খাত বর্ণিত হয়েছে, তাতেই বেশিরভাগ ব্যয় করা হত।

যাকাৎ ঃ যাকাৎ শুধু মুসলমানদের উপর ফরয ছিল এবং দু-চারটি খাতে আমদানি হত— নগদ টাকা, ফলমূল, উৎপন্ন ফসল, জীবজন্তু (ঘোড়া ব্যতীত) এবং পণ্যসামগ্রী—(আবু দাউদ)। দু'শ' দেহরাম রৌপ্য, বিশ মেস্‌কাল স্বর্ণ এবং পাঁচটি উটের কম হলে তার উপর যাকাৎ ফরয নয়। উৎপন্ন ফসলের ক্ষেত্রে পাঁচ ওসক (ইমাম তিরমিযীর মতে তিন শ' সা') অথবা পাঁচ ওসক থেকে বেশি হলেই যাকাৎ নেয়া হত, নতুবা নয়।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাৎ হিসাবে নেয়া হত। জীবজন্তুর যাকাতের হারও বিভিন্ন প্রকার জন্তুর বিভিন্ন সংখ্যার ভিত্তিতে ধার্য করা হয়েছিল। হাদীস ও ফেকাহ্‌র গ্রন্থসমূহে এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত রয়েছে। যমীনকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম প্রকার যা বৃষ্টি অথবা প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত হত। এ ধরনের যমীনের উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ (ওশর) নেয়া হত। দ্বিতীয় প্রকার যা পানি সেচের মাধ্যমে সিক্ত করা হত। এ ধরনের যমীন থেকে ওশরের অর্ধেক অর্থাৎ, উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ নেয়া হত। - (বোখারী) তরিতরকারি ও শাক-সবজির উপর কোন যাকাৎ ছিল না।

স্বয়ং কোরআন মজীদের বর্ণনানুযায়ী যাকাৎ ব্যয় করার খাত ছিল আটটি- (১) ফকীর, (২) মিস্‌কীন, (৩) নওমুসলিম, (৪) ক্রীতদাস, (ক্রয় করে মুক্ত করা জন্যে), (৫) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, (৬) মুসাফির, (৭) যাকাৎ আদায়কারীর বেতন, (৮) অন্যান্য জনহিতকর কাজ। সাধারণত যে এলাকা থেকে যাকাতের অর্থ আদায় করা হত, সেখানকার হকদার ব্যক্তিদের মধ্যেই তা বন্টন করা হত।

সাহাবিগণ এ নির্দেশের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। একবার প্রশাসক যিয়াদ জনৈক সাহাবীকে যাকাৎ আদায় করার জন্য এক জায়গায় প্রেরণ করেন। সাহাবী ফিরে এলে যিয়াদ তাঁর কাছে টাকা চাইলেন। তিনি বললেন— মহানবী (সাঃ)-এর আমল থেকে আমরা যা করতাম তাই করে এসেছি।—(আবু দাউদ)। মুয়ায ইবনে জবল প্রশাসকরূপে ইয়ামনে প্রেরিত হলে মহানবী (সাঃ) যাকাৎ সম্পর্কে তাকে বলেন ঃ

"যাকাৎ গোত্রের ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে সে গোত্রের গরীবদেরকে ফিরিয়ে দেবে।"

জিযিয়া ঃ এটা অমুসলিম প্রজাদের কাছ থেকে তাদের হেফাযত ও দায়িত্বের বিনিময়ে নেয়া হত। এর কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ ছিল না। মহানবী (সাঃ)-এর আমলে প্রত্যেক সামর্থ্যবান প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের কাছ থেকে বার্ষিক এক দীনার আদায় করার নির্দেশ ছিল। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও মহিলা এ নির্দেশের আওতাভুক্ত ছিল না। ঈলা অঞ্চলের জিযিয়ার পরিমাণ ছিল তিন শ' দীনার। মহানবী (সাঃ)-এর আমলে সব চাইতে বেশি পরিমাণ জিযিয়া বাহ্রায়েন থেকে আদায় হত।

খেরাজ ঃ অমুসলিম কৃষকদের নিকট থেকে মালিকানা স্বত্বের বিনিময়ে যমীনের উৎপন্ন ফসলের একটি বিশেষ অংশ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নির্ধারিত হত। একে খেরাজ বলা হয়। খায়বর, ফদক, ওয়াদিউল কুরা, তায়মা ইত্যাদি স্থান থেকে খেরাজই আদায় হত। ফলমূল অথবা উৎপন্ন ফসল পাকার সময় হলে মহানবী (সাঃ) কোন সাহাবীকে সেখানে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি বাগান ও ক্ষেত দেখে ফসলে অনুমান করতেন। সন্দেহ ভঞ্জনার্থে আন্দাজকৃত পরিমাণ থেকে এক-তৃতীয়াংশ বাদ দেয়া হত। অবশিষ্ট পরিমাণ থেকে শর্ত অনুযায়ী খেরাজ আদায় হত। খায়বর ইত্যাদি স্থানে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক বায়তুলমালে জমা দেয়ার শর্তে চুক্তি হয়েছিল।

জিযিয়া ও খেরাজের অর্থ সৈনিকদের বেতন ও অন্যান্য সামরিক খাতে ব্যয় করা হত। সমস্ত সাহাবীই প্রয়োজনের মুহূর্তে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করতে প্রস্তুত থাকতেন। এ কারণে জিযিয়া ও খেরাজ বাবত যা আদায় হয়ে আসত, মহানবী (সাঃ) তৎক্ষণাৎ তা বন্টন করতে দিতেন। যারা এককালে ক্রীতদাস ছিলেন, মহানবী (সাঃ) প্রথমে তাঁদের দিতেন। একটি খাতায় সবার নাম লেখা থাকত এবং ঐ ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী নাম ডাকা হত। যাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন থাকত তাদের দুই অংশ, অবিবাহিত ব্যক্তিকে এক অংশ দেয়া হত। - (আবু দাউদ)

জায়গীর ও পতিত ভূমি আবাদ ঃ আরবদেশের অধিকাংশ ভূমি ছিল বালুকাময়, প্রস্তরময়, লবণাক্ত ও অনুর্বর। সবুজ ও শস্যশ্যামল ভূমি যতটুকু ছিল, তা সমস্তই বহিঃশক্তির অধিকারে ছিল। অবশিষ্ট সবই ছিল পতিত ভূমি। মদীনা

ও তায়েফে অবশ্য কৃষিকাজে হত। অন্যান্য এলাকার আরবরা ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা লুট-তরাজের অর্থে জীবিকা নির্বাহ্ করত। আরবদের নৈরাজ্যময় জীবনের প্রকৃত কারণ এটাই ছিল যে তাদের স্থায়ী কোন পেশা ছিল না। এ কারণে শান্তি স্থাপনের জন্য ভূমির নতুনভাবে বন্দোবস্ত করা অত্যাবশ্যকীয় ছিল। হেজায ও ইয়ামনে বিজাতীয়দের বাস্তুত্যাগের ফলে এবং এমনিতেও অনেক ভূমি খালি পড়েছিল। এ সবের বন্দোবস্ত ছিল অপরিহার্য।

মহানবী (সাঃ) সাধারণভাবে সাহাবিগণকে এসব পতিত জমি আবাদ করার প্রতি উৎসাহ্ দেন ঃ

"যে ব্যক্তি পতিত ভূমিকে আবাদ করবে, সে-ই তার মালিক হবে। যে ব্যক্তি কোন ভূমিকে প্রাচীর বেষ্টিত করে নেবে তা তার মালিকানায় চলে যাবে।"

সাধারণ উৎসাহ্দানের সঙ্গে মহানবী (সাঃ) বিশেষ বিশেষ বন্দোবস্তও করেন। বনূ নাযীর ও বনূ কোরাইযার খেজুর বাগান বিশেষভাবে মহানবী (সাঃ)-এর মালিকানায় আসে। তিনি তা নিজের পক্ষ থেকে মুহাজির ও কতিপয় আনসারীকে বন্টন করে দেন। খায়বরের ভূমিও কিছু পরিমাণে মহানবী (সাঃ)-এর মালিকানায় আসে এবং অবশিষ্ট ভূমি সেসব মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়, যারা হুদাইবিয়ার যুদ্ধে শরীক ছিলেন। কিন্তু কার্যত ইহুদীদের সঙ্গে এসব ভূমির বন্দোবস্ত রইল। উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তারা নিত এবং অর্ধেক মালিকদের দিত। এছাড়া যেসব ভূমি আবাদ ছিল কতিপয় শর্তসহ্ তা আসল মালিকদের হাতে রাখা হয়। আর, যুখাইওয়ান, ঈলা, আযরাহ্, নাজরান প্রভৃতি এলাকার ভূমি সম্পর্কেও এ ব্যবস্থাই গৃহীত হয়। মহানবী (সাঃ) পতিত ভূমিও সাহাবিগণকে জায়গীর হিসাবে দান করেন। হযরত ওয়ায়েলকে হাযরামউতে একখণ্ড ভূমি দেন এবং বেলাল ইবনে হারেস মুযনীকে চাষাবাদযোগ্য ভূমির একটি বিরাট অংশ এবং কিছু খনি দান করেন। হযরত যুবায়রকে মদীনার নিকটবর্তী এবং হযরত ওমরকে খায়বরে জায়গীর দেন। বনূ রেফায়াকে দুমাতুল জন্দলের নিকটে ভূমি দান করেন।

এসব জায়গীর অত্যন্ত উদার ভিত্তিতে দেয়া হত। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন সামর্থ্য অনুযায়ী তা বেছে নিতেন এবং তার সীমানা নির্ধারণ করতে পারত না। একবার মহানবী (সাঃ) হযরত যুবায়রকে নির্দেশ দিলেন-যতদূর পর্যন্ত তোমার ঘোড়া দৌড়াতে পারবে, ততদূর পর্যন্ত ভূমি তোমাকে জায়গীর হিসাবে দেয়া হবে। হযরত যুবায়র ঘোড়া ছোটালেন, একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে যখন ঘোড়া থেমে গেল, তখন তিনি চাবুক ফেলে দিলেন। চাবুক যেস্থানে পড়ল সে পর্যন্ত তাঁর জায়গীরের সীমা নির্ধারিত হল। আরবের শুষ্ক মাটিতে পানির ঝর্ণা প্রয়োজন ছিল অত্যধিক। একবার মহানবী (সাঃ) নির্দেশ দিলেন ঃ

"কোন মুসলমানের অধিকারভুক্ত নয়—এমন ঝর্ণা যে কেউ অধিকার করে নেবে, সে-ই তার মালিক বলে গণ্য হবে। এতে দৌড়ে সবাই নিজ নিজ ঝর্ণার সীমা নির্ধারিত করে নিলেন।"

মহানবী (সাঃ)-এর এমন উদারতার সংবাদ দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। ফলে, দূর-দূরান্ত থেকে লোক এসে মহানবী (সাঃ)-এর নিকট জায়গীরের প্রার্থনা জানাতে লাগল। ইয়ামন থেকে আবইয়াস ইবনে হাম্মাল এসে একটি লবণের খনির জন্য আবেদন করলে মহানবী (সাঃ) তা মঞ্জুর করলেন। কিন্তু জনৈক সাহাবী বললেন-আপনি তাকে জায়গীর হিসাবে যা দান করছেন, তা পানির একটি বড় ঝর্ণা। যেহেতু সেটি জনসাধারণের কাজে লাগত, তাই মহানবী (সাঃ) নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিলেন।

জনগণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয়, শুধু এমন বিষয়-সম্পত্তির ক্ষেত্রেই মহানবী (সাঃ) উপরোক্তরূপ উদারতা প্রদর্শন করতেন। কিন্তু যে সব বিষয়-সম্পত্তি জনহিতকর কাজে লাগতে পারত, সেগুলো পুরানো অবস্থায়ই রেখে দেন। আরবদের প্রাচীন রীতি ছিল যে তারা নিজেদের জীবজন্তুর জন্য চারণভূমি নির্দিষ্ট করে নিত। এসব চারণভূমিকে "হেমা" বলা হত। আরবের পীলু বৃক্ষ ছিল উটের সাধারণ খাদ্য। ফলে, এ বৃক্ষ সম্বন্ধে কোনরূপ বাধা-নিষেধ ছিল না। আবইয়াস ইবনে হাম্মাল যখন এ বৃক্ষকে নিজের ব্যক্তিগত হেমার অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলেন, তখন মহানবী (সাঃ) তাকে এ বলে নিষেধ করে দিলেন—"পীলু বৃক্ষের ব্যাপারে কোন হেমা নেই।"

আরবে এমন রীতিও প্রচলিত ছিল যে জন্তুজানোয়ার চরাবার জন্য সরদার ও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা চারণভূমি নির্দিষ্ট করে নিত। তাতে অন্য কাউকেও আসতে দিত না। যেহেতু এ ব্যবস্থায় জনসাধারণের জন্য অসুবিধার কারণ ঘটত, তাই মহানবী (সাঃ) তা রহিত করে দেন।—(আবু দাউদ)

আরবের একটি জায়গার নাম দাহ্না। এরই এক পাশে বকর ইবনে ওয়ায়েল গোত্র এবং অপর পাশে বনূ-তামীম গোত্র বসবাস করত। হোরায়স ইবনে হাস্‌সান বকর গোত্রের জন্য এ ভূমি চেয়ে দরখাস্ত করলেন। মহানবী (সাঃ) ফরমান লেখার নির্দেশ দিলেন। ঘটনাক্রমে এ সময় বনূতামীমের এক মহিলা সেখানে উপস্থিত ছিল। মহানবী (সাঃ) তার দিকে দেখলেন। মহিলা আরয করল, ইয়া রসূলাল্লাহ্! সেটি উট ও ছাগলের চারণভূমি এবং তার নিকটে তামীম গোত্রের মহিলা ও শিশুরা বসবাস করে। মহানবী (সাঃ) বললেন,—বেচারি বলছে, ফরমান লিখো না। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সুতরাং একটি ঝর্ণা ও একটি চারণভূমি সকলের জন্যই ব্যবহার করার অধিকার আছে।

ধর্মীয় শৃঙ্খলা বিধান

দেশে শান্তি অব্যাহত রাখার উদ্দেশে কতিপয় জরুরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। মুসলমানদের ধর্মীয় শৃঙ্খলা বিধানের প্রশ্নটি বিশেষ জরুরী ছিল। ইহুদীদের মধ্যে ধর্মীয় আচারাদি পালনের জন্য একটি বিশেষ পরিবার নির্দিষ্ট ছিল। তাদের ছাড়া অন্য কারও সেসব দায়িত্ব পালনের অধিকার ছিল না। খৃষ্টানদের মধ্যে কোন পরিবারের বিশেষত্ব ছিল না; কিন্তু তাদের মধ্যে এমন একটি ভুঁইফোঁড় শ্রেণী ছিল, যারা ধর্মীয় কর্তব্য পালনকে নিজেদের একচেটিয়া অধিকাররূপে সাব্যস্ত করে নেয়। হিন্দুদের ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কেউ ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনার অধিকারী নয়। জগতের অপরাপর জাতির অবস্থাও তেমনি ছিল। কিন্তু মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাতে বিশেষ ব্যক্তি, বিশেষ পরিবার ও বিশেষ শ্রেণীর মোটেই প্রয়োজন ছিল না। বরং ইসলামের কলেমা উচ্চারণ করে—এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই এ মর্যাদার অধিকারী হতে পারত।

ইসলাম প্রচারক ও শিক্ষাদাতা ঃ জনৈক খ্যাতনামা পশ্চিমা ইতিহাসবিদ লেখেন ঃ মদীনায় পৌঁছাবার পর ইসলাম নবুওতের পদ ছেড়ে সাম্রাজ্যের রূপ ধারণ করে। এখনই ইসলামের অর্থ, আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পরিবর্তে শুধু এতটুকু অবশিষ্ট থাকে যে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আধিপত্য স্বীকার করতে হবে। (এনসাইক্লোপেডিয়া, উইলী হোসেনের ইসলাম সম্বন্ধে প্রবন্ধ) অপরদিকে ইসলামের উদ্দেশ্য কি ছিল, তা আল্লাহ্ কোরআন মজীদে বর্ণনা এভাবে করেছেনঃ

"তারা ঐ সমস্ত লোক যাদেরকে আমি ভূপৃষ্ঠে শক্তি দিলে নামায কায়েম করে, যাকাৎ দেয়, সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে বিরত রাখে।" —(সূরা হজ)।

এ কারণে প্রত্যেক মুসলমান একাধারে উপদেশদাতা, বিচারক, ধর্ম প্রচারক এবং শরীয়ত বিশেষজ্ঞ হতেন। ইসলামের পূর্বে সীমাহীন মূর্খতা বিরাজমান ছিল, সম্ভ্রান্ত পরিবারে লেখাপড়া দোষ হিসাবে বিবেচিত হত, ইসলামের পর সেখানে প্রতিটি ঘর ফেকা, হাদীস ও তফসীরের বিদ্যালয়ে পরিণত হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে ফেকা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ও শিক্ষাদানের উপযোগী সময় করে নেয়া খুব কঠিন ছিল। তাই প্রত্যেক দল ও প্রত্যেক গোত্রের কিছুসংখ্যক লোককে দায়িত্ব দেয়া হল—যাতে তারা শিক্ষাদান ও উপদেশদানের কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে। কোরআন মজীদে নির্দেশ দেয়া হল ঃ

"এবং সকল মুসলমানই সফর করে (মদীনায়) আসতে পারে না। কাজেই প্রত্যেক গোত্র থেকে একটি দল আসা উচিত—যাতে তারা শরীয়ত (ধর্ম) সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং ফিরে গিয়ে আপন গোত্রকে দ্বীন সম্পর্কে অবহিত ও সতর্ক করতে পারে। বস্তুত এ কর্মপদ্ধতির দ্বারাই তারা মন্দকাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। (সূরা তওবা—১৪)

তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ঃ এমন একটি দল সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য ছিল, যারা শুধু শরীয়তের আদেশ-নিষেধ সম্পর্কেই অবহিত হবেন না, বরং দিবারাত্র মহানবী (সাঃ)-এর কাছে থেকে পুরোপুরি ইসলামী রঙে রঞ্জিত হয়ে যাবে, যাদের কথাবার্তা, ক্রিয়াকর্ম, ওঠাবসা, কথা ও কাজ সমস্তই তাঁর শিক্ষার আলোকে আলোকিত হবে—যাতে তারা সমগ্র দেশের জন্য আদর্শ ও নমুনাস্বরূপ হতে পারে। এ কারণে আরবের প্রত্যেক গোত্র থেকে এক-একটি দল আসত এবং মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে থেকে শিক্ষালাভ করত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

"আরবের প্রত্যেক গোত্রের একটি দল মহানবী (সাঃ)-এর নিকট যেত এবং তাঁর নিকট ধর্মীয় বিষয়াদি জিজ্ঞেস করে ধর্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অর্জন করত।" —(তফসীরে খাযেন ঃ সূরা তওবা)।

আরবের কোণে কোণে প্রেরিত ইসলাম প্রচারকদের নির্দেশ দেয়া হত, তাঁরা যেন মুসলমানদের দেশত্যাগ করে মদীনায় এসে বসবাস করতে সম্মত করায়। এরই নাম ছিল হিজরত। এ কারণে "বয়আত" (আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার শপথ) ছিল দু'প্রকার। একটি বয়আতে আ'রাবী, অপরটি বয়আতে হিজরত। যে সব বেদুইনকে কিছুদিন মদীনায় রেখে শিক্ষাদান করার উদ্দেশ্য থাকত, তাদের জন্য আ'রাবী বয়আত গ্রহণ করা হত।

'মুখতাসার মুশকিলুল আসার' নাম গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে ওকবা জুহানী ইসলাম গ্রহণ করলে মহানবী (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, বয়আতে আ'রাবী করছ, না বয়আতে হিজরত? অতঃপর গ্রন্থকার লেখেন ঃ

"বয়আতে হিজরত করার পর মহানবী (সাঃ)-এর কাছে বসবাস করা জরুরী হয়ে পড়ত। যাতে মহানবী (সাঃ) তাকে ইসলামের কাজে লাগাতে পারেন। কিন্তু বয়আতে আ'রাবীতে এমনটা জরুরী ছিল না।"

এ কারণে আরবের বহু পরিবার নিজের বাসস্থান থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছিল। হযরত আবু মূসা আশআরী আশিজনকে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। 'খুলাসাতুল ওফা' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে মদীনায় জুহাইনা ইত্যাদি গোত্রের পৃথক পৃথক মসজিদ ছিল। এরা হিজরত করে মদীনায় এসেছিল। মসজিদে নববী থেকে অপেক্ষাকৃত দূরে তাঁদের বাসস্থান ছিল। ফলে মসজিদে নববীএসবসময় হাজির হওয়া কষ্টকর ছিল বলে পৃথক পৃথক মসজিদ নির্মিত হয়।

শিক্ষা ও উপদেশ দানের বিভিন্ন নিয়মপদ্ধতি ছিল। একটি এই যে দশ-বিশ দিন কিংবা এক-দু'মাস মহানবীর সংস্পর্শে অবস্থান করে, আকায়েদ ও ফেকার জরুরী মাসআলা শিখে নিতেন। অতঃপর আপন গোত্রে প্রত্যাবর্তন করে তা শিক্ষা দিতেন। উদাহরণত মালেক ইবনে হুওয়াইরেস প্রতিনিধিদল নিয়ে আগমন

করলে বিশ দিন অবস্থান করলেন এবং জরুরী মাসআলা শিখে নিলেন। ফেরত যাবার সময় মহানবী (সাঃ) তাকে বললেন ঃ

"আপন পরিবারে ফিরে যাও। তাদের মধ্যে অবস্থানকালে তাদের শরীয়তের বিষয়াদি শিক্ষা দেবে এবং যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখলে সেভাবে নামায পড়বে।"—(বোখারী)

দ্বিতীয় পদ্ধতি পাঠদান। এটা ছিল স্থায়ী। অর্থাৎ, মুসলমানগণ স্থায়ীভাবে মদীনায় বাস করতেন এবং ইসলামী জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতেন। তাঁদের জন্য 'সুফ্ফা' নামক বিশেষ বিদ্যাপীঠ ছিল। এতে বেশিরভাগ সেসব মুসলমান অবস্থান করতেন, যারা যাবতীয় পার্থিব সম্পর্ক থেকে সরে এসে দিবারাত্র এবাদত ও জ্ঞানার্জনে নিয়োজিত থাকতেন।

মেশকাত 'কিতাবুল ইল্ম'-এ বর্ণিত আছে যে একবার মহানবী (সাঃ) মসজিদে গেলেন। মসজিদে তখন দু'টি মজলিস চলছিল। একটি যিকরের মজলিস ও অপরটি পাঠদানের মসলিস। মহানবী (সাঃ) পাঠদানের মজলিসে গিয়ে বসলেন।

তখনকার পরিভাষায় এসব ছাত্রকে 'কুররা' বলা হত। বোখারী প্রভৃতি গ্রন্থে এ নামই ব্যবহৃত হয়েছে। যেসব সাহাবী 'ওয়াইনা' নামক স্থানে শিক্ষাদান ও উপদেশ দানের উদ্দেশে গিয়েছিলেন, যাঁদের কাফেররা প্রতারণাপূর্বক শহীদ করে দিয়েছিল তাঁরা এ বিদ্যালয়েরই শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন। হাদীস গ্রন্থসমূহে তাঁদের এ (কুররা) নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। সীরাত লেখকগণ উল্লেখ করেছেন যে তাঁদের মধ্যে থেকে কেউ বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেলে তিনি এ দল ত্যাগ করে আসতেন এবং তদস্থলে অন্য লোক ভর্তি হতেন।

সুফফায় অবস্থানকারীরা যারপর নাই নিঃস্ব ও সহায়সম্বলহীন ছিলেন। একটির বেশি কাপড় কারও থাকত না। এটিই ঘাড়ে বেঁধে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিতেন—যাতে চাদর ও লুঙ্গি উভয়েরই কাজ দেয়। এতদসত্ত্বেও তাঁরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতেন না, জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কুড়িয়ে আনতেন, তা বিক্রি করে অর্ধেক মূল্য খয়রাত করে দিতেন এবং সহপাঠী ভাইদের মধ্যে বিতরণ করতেন। এ কারণে শিক্ষাদান কার্য রাত্রি বেলায় চলত। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে হযরত ওবাদা ইবনে সামেত এ বিদ্যাপীঠের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ। হযরত ওমর নিজের খেলাফতকালে তাঁকে ফেকা ও কোরআন শিক্ষা দেবার জন্য ফিলিস্তিনে পাঠিয়েছিলেন। আবু দাউদ শরীফে হযরত ওবাদা ইবনে সামেত থেকে বর্ণিত আছে ঃ

علمت ناسا من اهل الصفة القران والكتاب فاهدى الى رجل منهم قوسا—

"আমি সুফ্ফাবাসীদের কয়েকজনকে কোরআন ও লেখা শিখিয়েছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ তাদের একজন আমাকে একটি ধনুক উপহার দিয়েছিল।"

অন্য এক রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে মহানবী (সাঃ) ওবাদাকে এ উপহার গ্রহণ করার অনুমতি দেননি। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে সুফ্‌ফার পাঠাগার ছাড়া আরও একটি স্থান ছিল, যেখানে সুফ্‌ফার শিক্ষার্থীরা রাত্রিবেলায় শিক্ষালাভ করতেন। মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলে বলা হয়েছে ঃ

"হযরত আনাস বলেন, সুফ্‌ফার শিক্ষার্থীদের থেকে সত্তর জন রাত্রিবেলায় জনৈক শিক্ষকের কাছে যেতেন এবং ভোর পর্যন্ত শিক্ষালাভে মশগুল থাকতেন।" —(৩য় খণ্ড, ১৩৭ পৃঃ)।

আরবে লেখাপড়ার প্রচলন খুব অল্পই ছিল। কিন্তু যখন ইসলামের আবির্ভাব হল, তখন সে যেন লিখনপদ্ধতিও নিয়ে এল। কোরআন মজীদকে লিপিবদ্ধ ও সুসংহত করার প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। এ কারণে মহানবী (সাঃ) প্রথম থেকেই লিখনপদ্ধতি প্রচলনের প্রতি মনোযোগ দেন। বদর যুদ্ধের আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে যে যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যারা মুক্তিপণ দিতে অসমর্থ হয়, তাদের মদীনার মানুষকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেয়ার শর্তে মুক্তি দেয়া হয়। আবু দাউদে উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সুফ্‌ফার বসবাসকারীদের যেসব শিক্ষা দেয়া হত, তার মধ্যে লেখা শিক্ষা ছিল অন্যতম। হযরত ওবাদা কোরান মজীদের সঙ্গে সঙ্গে লিখনপদ্ধতিও শিক্ষা দিতেন।

মসজিদ নির্মাণ ঃ মহানবী (সাঃ) স্বভাবগত কারণেই বিলাস-ব্যসন ও জাঁকজমক পছন্দ করতেন না। এ কারণে ইট ও মাটিতে অর্থ ব্যয় করাও তাঁর পছন্দনীয় ছিল না। এতদসত্ত্বেও ইসলামের সকল প্রাণচাঞ্চল্যের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র যিকর ও তাঁর প্রশংসা কীর্তন হওয়ার কারণে প্রত্যেক গোত্রের পক্ষেই ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিত। এর আরও একটি কারণ ছিল এই যে এসব মসজিদ শুধু নামায পড়ারই কাজে আসত না; বরং প্রকৃতপক্ষে এগুলো সমস্ত গ্রামবাসী কিংবা মহল্লাবাসীকে দিনে পাঁচবার এক জায়গায় সমবেত করে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিকে অধিকতর উন্নতিদানে সহায়ক হত। এ জন্যই মহানবী (সাঃ) জামাতে নামায পড়ার জন্য কঠোর ভাষায় তাকীদ দিতেন।

মদীনা শহরেই অনেকগুলো গোত্র বসবাস করত। প্রত্যেক গোত্রেরই পৃথক পৃথক মহল্লা ছিল এবং প্রত্যেক মহল্লায় একটি করে মসজিদ ছিল।

ইমাম আবু দাউদ কিতাবুল মারাসীলে সনদসহ্‌ লেখেন যে মহানবী (সাঃ)-এর যামানায় শুধু মদীনা শহরেই নয়টি মসজিদ ছিল। এগুলোতে পৃথক পৃথক জামাত হত। মসজিদগুলোর নাম এই—(১) মসজিদে বনী আমার, (২) মসজিদে বনী সায়েদা, (৩) মসজিদে বনী ওয়াবদ, (৪) মসজিদে বনী সালামা, (৫) মসজিদে বনী রায়েহ, (৬) মসজিদে বনী যুরায়ক, (৭) মসজিদে গেফার,

(৮) মসজিদে আসলাম ও (৯) মসজিদে জুহাইনা। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে বিভিন্ন গোত্রের নিম্নলিখিত মসজিদসমূহের সন্ধান পাওয়া যায়, (১০) মসজিদে বনী হেযারাহ, (১১) মসজিদে বনী উমাইয়্যা, (আনসারদের একটি গোত্র), (১২) মসজিদে বনী বায়াজা, (১৩) মসজিদে বনী হুধলা, (১৪) মসজিদে বনী উমাইয়্যা, (১৫) মসজিদে আবী ফয়সালা, (১৬) মসজিদে বনী দীনার, (১৭) মসজিদে উবাই ইবনে কা'ব, (১৮) মসজিদে আন্নাবেগা, (১৯) মসজিদে ইবনে আদী, (২০) মসজিদে বালজারেজ ইবনে খাযরাজ, (২১) মসজিদে বনী হাতমা, (২২) মসজিদে আল ফযীহ, (২৩) মসজিদে বনী হারেস, (২৪) মসজিদে বনী যুকর, (২৫) মসজিদে বনী আবদুল আশহাল, (২৬) মসজিদে ওয়াকেস, (২৭) মসজিদে বনী মুয়াবিয়া, (২৮) মসজিদে বনী আতেকা, (২৯) মসজিদে বনী কোরায়যা, (৩০) মসজিদে বনী ওয়ায়েল ও (৩১) মসজিদে আশ্‌শাজরাহ্‌। (আইনী, ২য় খণ্ড, ৪৬৮ পৃঃ)।

বিভিন্ন রেওয়ায়েত দৃষ্টে একথাও প্রমাণিত হয় যে ইসলামের বিস্তৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে মদীনার বাইরে আরবের কোণে কোণে বহুসংখ্যক মসজিদ নির্মিত হতে থাকে। এসব মসজিদে দিনে পাঁচবার করে আল্লাহ্‌র নাম ডাকা হত। যুদ্ধাভিযানকালে মহানবী (সাঃ)-এর অভ্যাস ছিল যে সারা রাত অপেক্ষা করে দেখতেন, ভোরে কোনখান থেকে আযানের আওয়ায আসে কিনা। আযানের শব্দ এলে সেখানে আক্রমণ চালাতেন না। একবার এক যুদ্ধাভিযানকালে মহানবী (সাঃ)-এর কানে একদিক থেকে আল্লাহু আকবর শব্দ এলে তিনি বললেন—এটা স্বভাবজাত সাক্ষ্য। অতঃপর আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ শুনে বললেন, জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে। সাহাবিগণ চারদিকে দৃষ্টিপাত করে জানতে পারলেন, এটা ছাগল রাখালের আওয়ায,—(মুসলিম, ১ম খণ্ড)। সকল মুসলিম সৈন্যদের প্রতিও এ নির্দেশ দেয়া ছিল। একবার একটি সৈন্যদল প্রেরণ করে মহানবী (সাঃ) এরূপ উপদেশ দেন ঃ

"কোথাও মসজিদ দেখলে বা আযানের শব্দ শুনলে সেখানে কারও উপর আক্রমণ করবে না।" (আবু দাউদ)

এসব রেওয়ায়েত দ্বারা একদিকে যেমন মহানবীর (সাঃ) শিক্ষা ও আদর্শের ব্যাপক প্রসারলাভের কথা অনুমান করা যায়, অপরদিকে তেমনি প্রমাণিত হয়, যেসব গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারা নিজ নিজ এলাকায় মসজিদও নির্মাণ করে ফেলেছিল এবং এসব মসজিদে দৈনিক পাঁচবার তকবীর ও আযানের ধ্বনি উচ্চারিত হত।

তখনকার দিনের ব্যাপক দারিদ্র্য ও আড়ম্বরহীনতার কারণে নির্মিত মসজিদসমূহ দীর্ঘদিন স্থায়ী হবার মত ছিল না। তাই এসব মসজিদের বেশিরভাগই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মসজিদসমূহের নামও কালের

অতল গর্ভে তলিয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও যেসব মসজিদ দীর্ঘদিন কায়েম ছিল, সেগুলোর ইতিহাস পাঠে জানা যায়, আরবের কোন এলাকা এ ধর্মীয় পুরাকীর্তি বিবর্জিত ছিল না।—(নাসায়ী, ১১৮ পৃঃ)।

আরবের সাধারণ গোত্রসমূহের মধ্যে বাহ্‌রায়েনের আবদুল কায়স গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে একটি মসজিদ নির্মাণ করে। ইসলামের ইতিহাসে মসজিদে নববীর পর সর্বপ্রথম এ মসজিদেই জুমআর নামায আদায় করা হয়। বোখারীর কিতাবুল জুমুআয় বর্ণিত আছে ঃ

"হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন—মসজিদে নববীর পর প্রথম জুমার নামায আবদুল কায়স গোত্রের মসজিদে পড়া হয়। এটা বাহ্‌রায়েনের জারাসা নামক একটি প্রত্যন্ত জনপদে অবস্থিত।"

তায়েফবাসীদের দেবমূর্তি যে স্থানে রক্ষিত ছিল, ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (সাঃ) তাদের ঠিক সে স্থানে মসজিদ নির্মাণ করার নির্দেশ দেন। (যাদুল মাআদ) হযরত তালেক ইবনে আলী বর্ণনা করেন, আমাদের গোত্রের লোকজন মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে পৌঁছে আরজ করে যে তাদের দেশে একটি গির্জা আছে। মহানবী (সাঃ) তাদের ওযুর পানি দিয়ে বললেন, গীর্জা ভেঙে ফেল এবং সেখানে এ পানি ছিটিয়ে মসজিদ নির্মাণ কর। সে মতে তারা দেশে ফিরে মহানবী (সাঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী মসজিদ নির্মাণ করেন। (নাসায়ী, ১১৮ পৃঃ)।

এ ধরনের মসজিদ যদিও আরবের কোণে কোণে নির্মিত হয়ে থাকবে ; কিন্তু হাদীসের গ্রন্থসমূহ থেকে শুধু মদীনা ও মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার মসজিদসমূহের অবস্থা জানা যায়। সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে, মদীনার পার্শ্ববর্তী আনসারদের গ্রামে মহানবী (সাঃ) আশুরার কোন একদিনে ঘোষণা দেন যে যারা রোজাদার তারা রোযা পূর্ণ করবে। আর যারা রোযা ভেঙে ফেলেছে তারা অবশিষ্ট দিন রোযা রাখবে। এ ঘোষণার পর সাহাবিগণ কঠোরভাবে এ নির্দেশ পালন করেন। তাঁরা নিজেরা রোযা রাখতেন এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকাদেরও রোযা রাখতে বাধ্য করতেন। এমন কি, তাদের ঘরে না রেখে মসজিদে রাখতেন। তারা যখন খাওয়ার জন্য কান্নাকাটি জুড়ে দিত, তখন তাদের বিভিন্ন খেলনা দ্বারা ভুলিয়ে রাখতেন।

"মসজিদকে ব্যক্তি-বিশেষের দিকে সম্বন্ধ করা যায় কি-না"—এ শিরোনামায় ইমাম বোখারী সহীহ্ বোখারীতে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাএেসবস্পষ্টভাবে "মসজিদে বনী যুরায়ক"-এর নাম নেয়া হয়েছে। হযরত আনাস ইবনে মালেক মহানবী (সাঃ)-এর পেছনে আসরের নামায পড়ে আপন মহল্লায় আসতেন। এখানে সবাই অপেক্ষায় থাকত। তিনি এসে মসজিদে নববীতে নামায হয়েছে বলে সংবাদ দিলে সবাই নামায

পড়ত। (মুসনাদে ইবনে হাম্বল, ৩য় খণ্ড, ২৩২ পৃঃ) এসব রেওয়ায়েত দ্বারা স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে এসব মসজিদ পৃথক পৃথক ছিল। সেহাহ্সিত্তার রেওয়ায়েত হতে জানা যায় যে কিছুসংখ্যক সাহাবী মহানবী (সাঃ)-এর পেছনে জামাতে শরীক হতেন ; অতঃপর আপন মহল্লার মসজিদে গিয়ে আবার গোত্রের লোকদের নামাযে ইমামতি করতেন। হযরত মুয়ায ইবনে জবলের এমনি অভ্যাস ছিল।[১] মদীনায় বসবাসকারী গোত্রদের ছাড়াও যেসব গোত্র হিজরত করে সেখানে আসত, তারাও নিজেদের মসজিদ নির্মাণ করে নিত। ইবনে সা'দের তবকাত গ্রন্থে বলা হয়েছে মদীনায় জুহাইনা গোত্রের একটি মসজিদ আছে।

বিভিন্ন গোত্রের প্রয়োজন ছাড়াও মসজিদ নির্মাণের আরও একটি বড় কারণ ছিল এই যে সফরকালে মহানবী (সাঃ) পথিমধ্যে যেখানেই নামায পড়তেন, সাহাবিগণ সেখানেই বরকতের জন্য মসজিদ নির্মাণ করে ফেলতেন। ইমাম বোখারী সহীহ্ বোখারীতে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রেখেছেন। তার শিরোনামা এরূপ ঃ

যেসব মসজিদ যা মদীনার রাস্তায় এমন স্থানে অবস্থিত যেখানে মহানবী (সাঃ) নামায পড়েছেন। এ অধ্যায়ে এ ধরনের কয়েকটি মসজিদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার এসব মসজিদের নিম্নলিখিত নাম বর্ণনা করেছেন ঃ

মসজিদে কুবা, মসজিদে আলফসীহ্, মসজিদে বনী কোরাইয়া, মাশরাবা উম্মে ইব্রাহীম, মসজিদে বনী যুফর অথবা মসজিদে বাগলাহ্, মসজিদে বনী মুয়াবিয়া, মসজিদে ফাতাহ, মসজিদে কেবলাতাইন। হাফেয ইবনে হাজার আরও লেখেন, মদীনা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় যেসব মসজিদ কারুকার্য খচিত প্রস্তর দ্বারা নির্মিত হয়, মহানবী (সাঃ) যে সবগুলোতেই নামায পড়েছেন। কেননা, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয যখন এসব মসজিদ পুনর্নির্মাণ করেন তখন মদীনাবাসীদের নিকট থেকে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে নেন। (ফতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, ৪৭১ পৃঃ)।

ইমাম নিয়োগ ঃ মসজিদ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন গোত্রের জন্য পৃথক পৃথক ইমাম নিয়োগ করাও জরুরী হয়ে পড়ে। মহানবী (সাঃ)-এর সাধারণ নীতি ছিল এই যে কোন গোত্র মুসলমান হলে তাদের মধ্যে যার সবচেয়ে বেশি কোরআন মুখস্থ থাকত, তাকেই ইমাম নিযুক্ত করা হত। এ মর্যাদালাভের ক্ষেত্রে ছোট-বড়, ক্রীতদাস-মালিক সবার সমান অধিকার ছিল। মহানবী (সাঃ)-এর আগমনের পূর্বে মদীনায় যেসব মুহাজির ছিলেন, তাঁদের ইমাম ছিলেন হযরত আবু হোযায়ফার মুক্ত করা গোলাম সালেম। জায়স গোত্র মুসলমান হলে তাদের সাত বছর বয়স্ক বালক আমর ইবনে সালামা জায়াসী শুধু বেশি কোরআন মুখস্থ থাকার কারণে প্রাথমিক অবস্থায় ইমাম নিযুক্ত হন।

১. এটা প্রাথমিক যুগের ঘটনা। পরবর্তীতে একবার নামায আদায় করে পুনরায় ইমামতি করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

ইমাম মনোনয়নের জন্য মহানবী (সাঃ) কয়েকটি মূলনীতি নির্ধারণ করে দেন ঃ

"আবু মসউদ আনসারী থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব বেশি পাঠ করেছে সে জামাতের ইমাম হবে। এএেসবাই সমান হলে, যে সুন্নত সম্পর্কে বেশি জ্ঞাত সে ইমাম হবে। যদি এতেও সমান হয়, তবে যে ব্যক্তি আগে হিজরত করেছে সে ইমাম হবে। এতেও বরাবর হলে যার বয়স বেশি হবে, সে-ই ইমামতি করবে।"—(মুসলিম)

ইমাম নেই—এমন কোন গোত্র মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক কোরআন মুখস্থকারী কে? এমন কেহ থাকলে উত্তরে তার নাম বলা হত। তখন তিনি নিজেই তাকে এ পদে নিযুক্ত করে দিতেন। তায়েফবাসীদের ইমাম ওসমান ইবনে আবুল আস এভাবেই নিযুক্ত হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে, সবাই সমান হাফেয হলে মহানবী (সাঃ) বলতেন, তোমাদের মধ্যে যে বেশি বয়স্ক সে-ই ইমাম হবে। মালেক ইবনে হুয়াইরিস নিজ গোত্রের পক্ষ থেকে মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে পৌছলে তাঁকে একথাই বলা হয়।

মদীনা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকা এবং আরবের বিভিন্ন প্রদেশে যেখানেই মসজিদ নির্মিত হয়, স্বভাবতই সেসব জায়গায় পৃথক পৃথক ইমাম নিযুক্ত হয়ে থাকবে। যেসব গোত্রে প্রশাসক নিযুক্ত হতেন, তিনি তাদের ইমামও হতেন। বড় বড় এলাকায় এ দুটি পদের জন্য পৃথক পৃথক লোক নিযুক্ত হতেন। যেমন, আম্মানে হযরত আমর ইবনুল আস প্রশাসক ছিলেন এবং আবু যায়েদ আনসারী ছিলেন ইমাম। (ফুতুহুল বুলদান-বালাযুরী), কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে হাদীস ও সীরাতগ্রন্থসমূহে স্বতন্ত্রভাবে ইমামদের নাম উল্লিখিত নেই। প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলীর বর্ণনায় যতদূর সন্ধান পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ ঃ

নাম	কর্মস্থল	বিবরণ
মুসআব ইবনে ওমায়ের	মদীনা মুনাওয়ারা	মহানবী (সাঃ)-এর হিজরতের পূর্বে আনসারদের ইমাম ছিলেন—(ইবনে হেশাম)
সালেম (আবু হোযায়ফার ক্রীতদাস)	"	মহানবী (সাঃ)-এর আগমনের পূর্বে মুহাজিরদের ইমাম ছিলেন—(বোখারী, আবু দাউদ)।
ইবনে উম্মে মকতুম	"	মহানবী (সাঃ) যুদ্ধোপলক্ষে মদীনার বাইরে গেলে অধিকাংশ সাহাবীও সঙ্গে থাকতেন। ইনি যেহেতু অন্ধ ছিলেন, এ জন্য মদীনাতেই থেকে যেতেন। মহানবী (সাঃ) এ সময় তাঁকেই ইমাম নিযুক্ত করে যেতেন। (আবু দাউদ)

নাম	কর্মস্থল	বিবরণ
আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)	"	মহানবী (সাঃ) মসজিদে তশরীফ না আনলে তিনিই মসজিদে নববীর ইমাম হতেন। (বোখারী)
ওতবান ইবনে মালেক	বনূ সালেম	আপন গোত্রের ইমাম ছিলেন। (আবু দাউদ, নাসায়ী)
মুয়ায ইবনে জবল	বনূ সালামা	আপন গোত্রের ইমাম (বোখারী ইত্যাদি)।
জনৈক আনসারী	মসজিদে কুবা	" (বোখারী
আমর ইবনে সালমা	বনূ জারম	" (আবু দাউদ নাসায়ী)
উসাইদ ইবনে হুযাইর	"	" (আবু দাউদ)
আনাস ইবনে মালেক	বনূ নাজ্জার	(ইমামের নাম সন্দেহযুক্ত)
একজন সাহাবী	"	" (মুসনাদ, ৩য় খণ্ড, ২৩২ পৃঃ)
মালেক ইবনে হুয়াইরিস	"	" (আবু দাউদ)
ইতাব ইবনে উসাইদ	মক্কা মোয়াজ্জমা	" (নাসায়ী)
ওসমান ইবনে আবিল আস	তায়েফ	আপন গোত্রের ইমাম।
আবু যায়েদ আনসারী	আম্মান	" (বালাযুরী)

মুয়াযযিন ঃ সাধারণত আযান দেয়ার জন্য কাউকেও মনোনীত করা হত না। এতদসত্ত্বেও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুমান করা যায় যে বড় বড় মসজিদের বেলায় মহানবী (সাঃ) মুয়াযযিন পদটি পৃথকভাবে কায়েম করেছিলেন। মক্কা ও মদীনায় হুযুর (সাঃ) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের নিযুক্ত করেন ঃ

নাম	কর্মস্থল	বিবরণ
বেলাল ইবনে রাবাহ্	মদীনা মুনাওয়ারা	মসজিদে নববীর মুয়ায্যিন
আমর ইবনে উম্মে মকতুম	"	"
সাদুল কুরত	আওয়ালী মদীনা	মসজিদে কুবার মুয়ায্যিন
আবু মাহ্যুরা জাহমী	মক্কা মোকাররমা	মসজিদে হারামের মুয়ায্যিন (নাসায়ী ১৮০ পৃঃ)

শরীয়তের ভিত্তিস্থাপন ও পূর্ণতাদান

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ

الْاِسْلَامَ دِيْنًا- (المائده)

"অদ্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর নিজের নেয়ামত নিঃশেষ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসাবে পছন্দ করলাম।" (সূরায়ে মায়েদা)

উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহ ও আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ইসলামের সত্যিকার লক্ষ্য ছিল না। বরং পূর্বেই বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে যে এসবের উদ্দেশ্য ছিল, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং একটি সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো গঠন করা—যাতে মুসলমানগণ কোনরূপ বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন না হয়ে নিজের ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে। সহীহ্ বোখারীতে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের নিকট নিম্নোদ্ধৃত আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করল ঃ

"এ কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর—যতক্ষণ না ফেতনা অবশিষ্ট থাকে এবং ধর্ম সম্পূর্ণত আল্লাহ্র নিমিত্ত হয়ে যায়।" (সূরা আনফাল)

তিনি বললেন—এ নির্দেশ মহানবী (সাঃ)-এর যমানায় কার্যকরী ছিল। তখন ইসলামের শক্তি কম ছিল এবং মুসলমানগণ ধর্মের কারণে বিপদাপদের সম্মুখীন হত। বিধর্মীরা তাদের হত্যা করত। বর্তমানে ইসলাম অনেক উন্নতিলাভ করেছে। ফলে, কোনরূপ ফেতনা বা বিপদাপদ নেই।

হিজরতের পর দীর্ঘ আট বছরকাল সম্পূর্ণত ফেতনার মোকাবিলা, শত্রুদের উপদ্রব ও উপর্যুপরি আগ্রাসনের প্রতিরোধ এবং শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কাজেই অতিবাহিত হয়। এ কারণেই আট বছরের সুদীর্ঘ যমানায় ইসলামী ফরযসমূহের মধ্যে একমাত্র জেহাদই সর্বক্ষেত্রে সুস্পষ্টরূপে প্রযোজ্য হতে দেখা যায়। তাই ইসলামের ইতিহাসে এক-একটি যুদ্ধের বিবরণ শত শত পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে ; কিন্তু নামায, রোযা ও যাকাৎ সম্বন্ধে দু'চার লাইনের বেশি বিরবণ পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায়, তাও এভাবে যে কোন একটি বৎসরের ঘটনাবলী বর্ণনা করার পর উপসংহারে শুধু এতটুকু বলে দেয়া হয় যে "এ বৎসর ফরয নামাযের রাকআত দু'থেকে চারে উন্নীত হয়।"

এর কারণ এ নয় যে খোদা না করুন, সীরাত লেখকগণ অন্যান্য ফরযের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না ; বরং বাস্তব ঘটনা এই যে যুদ্ধে ব্যস্ততা ও দেশে বিরাজমান অশান্তির কারণে অধিকাংশ ফরয কর্ম দেরিতে হয়েছিল। যেসব কর্ম পূর্বে ফরয হয়েছিল তাও এমন যমনায় ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করে, যার অধিকাংশ দিবা-রাত্রি শত্রুপক্ষের বিরামহীন প্রতিরোধ সংগ্রামেই অতিবাহিত হয়ে যায়।

প্রথম অবস্থায় আইনকানুন সংক্রান্ত বিধানাবলী অবতীর্ণ না হওয়ার কারণ ছিল এই যে ইসলাম তখনও পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রীয় শক্তিতে পরিণত হয়নি। খাঁটি ধর্মীয় ফরয ও বিধানাবলীও ধীরে ধীরে এ সময়েই অবতীর্ণ হতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণতা লাভ করতে থাকে। ইসলামী বিধানাবলী ধীরগতিতে অবতীর্ণ হওয়ার পিছনে রহস্য ছিল এই যে শুধু আরবদের এসব বিধান বলে দেয়া উদ্দেশ্য ছিল না, বরং কার্যক্ষেত্রে তাদের জীবনধারায় এগুলোকে রূপায়িত করাই ছিল লক্ষ্য। সুতরাং অত্যন্ত ধীরগতিতে ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিকভাবে বিধানসমূহকে সামনে আনা হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) এ রহস্যটি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, প্রথমে আযাব ও সওয়াবের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এতে যখন অন্তরে যোগ্যতা ও নম্রতা সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন বিধানাবলী অবতীর্ণ হয়। নতুবা প্রথম দিনই যদি নির্দেশ নাযিল হত যে মদ্যপান করবে না, তবে তা একবাক্যে মেনে নেয়া অনেকের পক্ষেই হয়ত সম্ভব হত না।—(বোখারী)

মোটকথা, উপরোক্ত বিভিন্ন কারণ বশত ইসলামের অধিকাংশ ফরযকর্ম ও বিধান সমগ্র দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পূর্ণতালাভ করে। মক্কায় অবস্থান পর্যন্ত রোযা মোটেই ফরয ছিল না—মদীনায় রোযা ফরয হয়।

কিন্তু যাকাৎ আরও সাত-আট বছর পর ফরয হয়। কারণ, রাত-দিন যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে যাকাৎ ফরয হওয়ার মত আর্থিক সচ্ছলতাই বিদ্যমান ছিল না। মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমানগণ এ পবিত্র ভূমিতে পা রাখতে পারতেন না। এ কারণে তখনো পর্যন্ত হজও ফরয ছিল না। নামায একটি প্রাত্যহিক ফরয। এ নির্দেশ ইসলামের সঙ্গে সঙ্গেই আগমন করে ; কিন্তু তাও ক্রমান্বয়ে হিজরতের ছয়-সাত বছর পরে পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হয়। পঞ্চম হিজরী পর্যন্ত নামাযে কথাবার্তা বলা জায়েয ছিল এবং বাইরের কোন ব্যক্তি সালাম দিলে নামাযী নামাযের মধ্যে থেকেই উত্তর দিতে পারত। আবু দাউদ ইত্যাদি গ্রন্থে এ সম্পর্কে কয়েকটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে।

মোটকথা, মক্কা বিজয়ের পর যখন কাফেরদের শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং সমগ্র দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ধর্মীয় বিধানাবলীর সম্প্রসারণ ও শরীয়তবিধির পূর্ণতা লাভের সময় উপস্থিত হয়। বহু বিধান এমন ছিল, যা তখনো সূচনাই হয়নি। যেমন, যাকাৎ, হজ, সুদের অবৈধতা ইত্যাদি। কতিপয় বিধান এমনও ছিল, যার প্রাথমিক অবয়ব কায়েম ছিল ; কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় তা পূর্ণতা লাভ করেনি।[১]

---

১. ইসলামে কতিপয় বিধানের অবতরণ ও ক্রমিক পূর্ণতালাভের তারিখ প্রথম খণ্ডে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে ও আনুষঙ্গিকভাবে উল্লিখিত হয়েছে। পাঠকগণ দু'–এক জায়গায় বিধানাবলীর তারিখ ও সনের মধ্যে এখানকার বর্ণনার সঙ্গে বিভিন্নতা পাবেন। এ সম্বন্ধে আরয এই যে প্রথম সাধারণ ইতিহাসবিদ ও সীরাত লেখকদের অনুসরণ করা হয়েছে এবং এখানে হাদীস ও শানেনুযূলের গ্রন্থসমূহ থেকে তন্নতন্ন করে খুঁজে যা অধিকতর প্রমাণিত মনে করা হয়েছে, তাই বিবৃত হয়েছে। ঘটনা এই যে বিধানাবলীর সন-তারিখ হাদীস গ্রন্থসমূহে সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হয়নি। যা উল্লিখিত হয়েছে তা হাদীসবিদ ও রেওয়ায়েতকারীদের উদ্ভাবনী মাত্র। তাই এতে পারস্পরিক বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। আমরা বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদির আলোকে এ পথ অতিক্রম করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি।

ইসলামের প্রথম ভিত্তি
(আকায়েদ)

ইসলামের সর্বপ্রথম বুনিয়াদি ফরয হচ্ছে—আকায়েদ বা বিশ্বাসের ভিত্তি মজবুত করা। আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশ একত্ব, রসূলগণ, ফেরেশতা, কেয়ামত এবং হাশর ও শেষ বিচারের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাই আকায়েদ বা বিশ্বাসের মৌল বিষয়। মহানবী (সাঃ)-এর প্রত্রিসর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত হল—"পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।" এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব ব্যতীত আর কোন বিশেষ আকীদার শিক্ষা ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয়বার যে ওহী নাযিল হয়, তাতে বলা হয় ঃ[১]

"ওহে বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি, উঠুন, মানবজাতিকে সতর্ক করুন, আপনার পালনকর্তার মহত্ত্ব প্রকাশ করুন, আপনার কাপড় পবিত্র করুন এবং মূর্তিসমূহকে পরিহার করুন।"—(সূরায়ে মুদ্দাচ্ছির)

এরপর থেকে মক্কায় অবস্থানকাল পর্যন্ত যে সমস্ত আয়াত নাযিল হয়েছে তার অধিকাংশই ছিল আকায়েদ সম্পর্কিত। এছাড়াও শিরক ও মূর্তিপূজার অপকারিতা, আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় ও মাহাত্ম্যের প্রকাশ, কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য, বেহেশ্‌ত ও দোযখের বাস্তব বর্ণনা, রেসালতের বৈশিষ্ট্য এবং তার আবশ্যকতার প্রমাণাদি, প্রভৃতি ছিল মক্কার তের বছরের নবুওতী যিন্দেগীতে অবতীর্ণ আয়াতসমূহের প্রধানতম বক্তব্য।[২]

সারকথা, আকায়েদের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় পর্যন্ত যদিও ইসলামের সূচনাতেই লোকদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছিল, তবুও মক্কায় অবতীর্ণ আয়াতসমূহের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে আকায়েদ সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয় পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হত। সূরায়ে বাকারা ও সূরায়ে নেসায় আকায়েদ সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ দুটি সূরা অবশ্য মদীনায় অবতীর্ণ। মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহে তওহীদ, কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস এবং রসূলের সত্যতা বর্ণনার প্রতি অধিক জোর দেয়া হয়েছে। কিন্তু মদীনায় এসে ইসলামের সার্বিক আকায়েদ ও ধ্যান-ধারণা এবং আমলের মূলনীতিসমূহের বিস্তারিত শিক্ষা প্রদান শুরু হয়।

ঈমান ও ইসলামের প্রাথমিক মূলনীতি সম্পর্কে সূরায়ে বাকারার সর্বপ্রথম আয়াত এই ঃ

"যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে আর আমি যা দান করেছি তা থেকে ব[illegible] করে এবং যারা বিশ্বাস করে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আর যা [illegible]ার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে, আর তারা আখেরাত বা পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।"—(সূরায়ে বাকারা)

১. সহীহ বোখারী সূরায়ে মুদ্দাসসিরের ব্যাখ্যা
২. সহীহ্ বোখারী কোরআন সংকলন অধ্যায়।

সূরার মাঝে এ মূলনীতি পুনরুল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

"কিন্তু প্রকৃত নেকী বা পুণ্যের হকদার সে ব্যক্তি যে আল্লাহ্ তা'আলা, পরকাল, ফেরেশ্তাগণ, আল্লাহ্র কিতাব এবং নবিগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে।"—(সূরায়ে বাকারা-১৭৭)

আকায়েদের মৌলিক শিক্ষার পরই নামায, রোযা, যাকাৎ এবং আখলাক বা চরিত্র সম্পর্কিত আহ্কাম বর্ণনা করা হয়েছে। এ আয়াতসমূহ্ কেবলা পরিবর্তনের আয়াতের সঙ্গে প্রথম হিজরীতেই অবতীর্ণ হয়। সূরার শেষাংশে পেশ করা হয়েছে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত ব্যাখ্যা। হযরত আয়েশা (রাঃ)[১] ও ইবনে আব্বাস[২] (রাঃ)-এর বর্ণনানুযায়ী নিম্নোদ্ধৃত সেসব আয়াত হিজরতের কয়েক বছর পরে অবতীর্ণ হয়।

"পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে রসূল তৎপ্রতি দৃঢ় প্রত্যয় রাখেন, আর মুমেনগণও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। এদের, প্রত্যেকেই আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশ্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর প্রেরিত রসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছেন।"—(সূরায়ে বাকারা-২৮৫)

সূরায়ে নেসার এ আয়াতে মুসলমানদের আকীদা কিরূপ হওয়া উচিত তা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

"মুমেনগণ! তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রসূল, তাঁর রসূলের উপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং পূর্বে যে সমস্ত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর (দৃঢ়) বিশ্বাস স্থাপন কর। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশ্তাগণ, তাঁর রসূলগণ ও কেয়ামতের দিনকে অস্বীকার করেছে যে প্রকাশ্য গোমরাহীতে পতিত হয়েছে।—(সূরায়ে নেসা-১৩৬)

ঈমান অধ্যায়ের হাদীসসমূহে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে, যাতে লোকেরা মহানবী (সাঃ)-কে ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। আর তিনি জিজ্ঞাসাকারীর মেধা এবং স্থান-কালের উপযোগিতা অনুযায়ী এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ "যে পর্যন্ত মানুষ এ সাক্ষ্য না দেয় যে আল্লাহ্ এক, মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র রসূল, এবং নামায কায়েম না করে ও যাকাৎ না দেয় সে পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে আদিষ্ট হয়েছি।"

একবার কোন দূরবর্তী এলাকা থেকে একজন মুসলমান হুযূর (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে ইসলামের হাকীকত (মূলতত্ত্ব) কি? জবাবে তিনি তিনটি বিষয় বর্ণনা করলেন। (১) দিবারাত্র পাঁচবার নামায পড়া। (২) রমযান মাসে রোযা রাখা এবং (৩) যাকাৎ দেয়া।

---

১. সহীহ্ বোখারী শরীফ يمحق الله الربوا-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ।

২. আল্লামা সুয়ূতী রচিত—আসবাবুন্নুযূল"-এর সহীহ্ মুসলিম ও মুসনাদে আহ্মদ থেকে সংকলিত।

পঞ্চম হিজরীতে আবদুল কায়েসের প্রতিনিধিদল হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন যে শত্রুদের প্রতিবন্ধকতার কারণে আমরা সব সময় খেদমতে হাযির হতে অক্ষম, সুতরাং আমাদের এমন কিছু আহ্‌কাম শিক্ষা দিন, যা আমরা গিয়ে যারা উপস্থিত হতে পারেনি তাদের যেন শোনাতে পারি। জবাবে হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ

"আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই, মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসূল—এ সাক্ষ্য দান করা, নামায কায়েম করা, যাকাৎ দেয়া এবং রমযান মাসের রোযা রাখা" (ইসলামের মূল ভিত্তি),—অধিকন্তু তোমরা তোমাদের যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ থেকে এক-পঞ্চমাংশ বায়তুলমালে জমা করবে।"

একবার তিনি সাহাবিগণের সঙ্গে বসে আছেন, এমনি সময় এক লোক এসে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কাকে বলে? হুযুর (সাঃ) উত্তরে বললেন, "আল্লাহ্‌র প্রতি, ফেরেশ্‌তাগণের প্রতি, আল্লাহ্‌র সামনে একদিন হাজির হতে হবে, এ সত্যের প্রতি, তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করার নামই ঈমান।" আগন্তুক জিজ্ঞেস করল ঃ "ইসলাম কাকে বলে?" তিনি বললেন, "ইসলাম হল, তুমি শুধু এক আল্লাহ্‌র এবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে আর কাউকেও শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাৎ আদায় করবে এবং রমযান মাসের রোযা রাখবে।" লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, "এহ্‌সান কাকে বলে?" জবাব দিলেন, "এমন নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহ্‌র এবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ, অগত্যা তুমি তাঁকে দেখতে না পেলেও প্রত্যয় রাখবে যে তিনি তোমাকে দেখছেন।"

উপরোক্ত প্রশ্নোত্তরের মধ্যে ইসলামী মূলনীতির প্রায় পূর্ণ চিত্রই প্রকাশিত হয়েছে। সম্ভবত এ প্রশ্নোত্তর মক্কা বিজয় অর্থাৎ ৮ম হিজরীর পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়, সেহেতু এতে হজের কথা উল্লেখ নেই। তবুও এতটুকু অনুধাবন করা যায় যে এবাদতের পরিপূর্ণতার জন্য একাগ্রচিত্ততার শর্তটুকুও এর সঙ্গে আরোপ করা হয়েছে।

ইসলামী মূলনীতি সম্পর্কে হুযুর (সাঃ)-এর সর্বশেষ ঘোষণাটি এই ঃ

"ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। (১) এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসূল। (২) নামায কায়েম করা। (৩) যাকাৎ দান করা। (৪) হজ করা এবং (৫) রমযান মাসের রোযা রাখা।"

ইসলামের মৌল বিশ্বাস ও মূলনীতিসমূহ ক্রমান্বয়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হওয়ার পর ঈমানের আনুষঙ্গিক কার্যাবলী এবং এতদসম্পর্কিত আরও করণীয় বিষয়াদির শিক্ষা পেশ করা হল। মহানবী (সাঃ) এরশাদ করলেন, ঈমানের সত্তরেরও অধিক শাখা আছে, তার মধ্যে লজ্জাও একটি শাখা। ঈমানের মাধুর্য সম্পর্কে এক সময়

তিনি এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তির হাত ও যবানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে, তার ঈমানই সর্বোত্তম। অপর এক ব্যক্তির জবাবে বললেন, "উত্তম ইসলাম হল এই যে অভাবীকে খাদ্য দান করবে এবং পরিচিত ও অপরিচিএসবাইকে সালাম করবে।" মহানবী (সাঃ) এমনও এরশাদ করেছেন যে "তোমরা সে পর্যন্ত পূর্ণ মুমেন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তোমার নিজের জন্য যা ভালবাস তা তোমার অপর (মুসলিম) ভাইয়ের জন্যও ভাল না বাসবে।[১]

মোদ্দাকথা, ইসলামের মূলনীতিসমূহ ও বিভিন্ন বিধি-বিধানের শাখা-প্রশাখাগুলো এভাবেই ধীরে ধীরে পরিপূর্ণতায় পৌঁছেছিল।

পরিশেষে ১০ম হিজরীর ৯ই যিলহজ শুক্রবারের যেস স্মরণীয় মুহূর্তটি যখন উপস্থিত হল, তখন আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করলেন।[২]

"আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমারে উপর আমার নেয়ামত পূর্ণ করলাম। দ্বীন হিসাবে ইসলামের প্রতি আমার সন্তুষ্টির সনদ প্রদান করলাম।"

এবাদত ঃ উপরোক্ত হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে ইসলামের মূলভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলোর মধ্যে তওহীদ ও রেসালতের উপর ঈমান আনা ব্যতীত বাকি চারটি অর্থাৎ (১) নামায, (২) রোযা, (৩) হজ, (৪) যাকাৎ এবাদতের অন্তর্ভুক্ত। এবাদত চতুষ্টয়ের মধ্যে নামাযই সর্বশ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য। নামায সহীহ্ ও শুদ্ধ হওয়ার জন্য অনেকগুলো শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তার মধ্যে সর্বপ্রধান ও আবশ্যকীয় শর্ত হল, 'তাহারাত' বা পবিত্রতা অর্জন।

তাহারাত ঃ শরীর ও পোশাক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়ার নামই তাহারাত। ইসলামে পবিত্রতার গুরুত্ব কতটুকু তা এর দ্বারাই উপলব্ধি করা যায় যে দ্বিতীয়বারের ওহীতে যখন আহ্কাম ও অবশ্যকরণীয় বিষয়সমূহের বর্ণনা আরম্ভ করা হয়, তখন তওহীদের পরই যে বিষয়ের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়, তা হচ্ছে তাহারাত বা পবিত্রতা সম্পর্কিত। যথা,

"হে বস্ত্রাবৃত! উঠুন (আপনার জাতিকে) সতর্ক করুন, আপনার প্রভুর মহত্ত্ব প্রচার করুন, আপনার পোশাক পবিত্র করুন এবং মূর্তিপূজার অপবিত্রতা পরিত্যাগ করুন।"-(সূরায়ে মুদ্দাস্সির)

যদিও ব্যাখ্যাকারিগণ সাধারণত কাপড়ের পবিত্রতা দ্বারা অন্তরের পবিত্রতা আর অপবিত্রতা দ্বারা মূর্তিপূজা অর্থগ্রহণ করেছেন, তবুও এ নির্দেশ দ্বারা প্রকাশ্য পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার গুরুত্বও উপলব্ধি করা যায়। নামাযের আগে ওযু করা ফরয। এর ফরয হওয়ার প্রমাণ ইসলামের সূচনা থেকেই প্রমাণিত। ইতিহাস, সীরাত এবং কোন কোন হাদীসের রেওয়ায়েত অনুযায়ী ওহীর শুরুতেই

১. ইতিপূর্বে যে সব হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে তার সবগুলোই বোখারী শরীফের ঈমান অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।
২. বোখারী শরীফে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা।

জিবরাইল (আঃ) মহানবী (সাঃ)-কে ওযুর নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছিলেন[১] মোস্‌তাদারাক কিতাবে হযরত হাকেম (রঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে একটি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। যাতে প্রতীয়মান হয় যে হিজরতের পূর্বেও হুযুর (সাঃ) ওযু করতেন।[২] তবে হাদীসশাস্ত্রবিদগণ এতে একমত যে কোরআনে ওযুর আদেশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে।[৩] আয়াতটি এই ঃ

"মুমিনগণ! যখন নামায় কায়েম করতে যাও, তখন মুখমণ্ডল ও দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত কর। তোমাদের মাথা মাসেহ্ কর এবং পা টাখ্‌নুর গিরা পর্যন্ত ধৌত কর।" (সূরায়ে মায়েদা)

এ আয়াতটি সূরায়ে 'মায়েদার' অন্তর্ভুক্ত যার অধিকাংশ আয়াত হিজরতের চার-পাঁচ বছর পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ আয়াত সম্বন্ধে বোখারী শরীফে উল্লেখ আছে যে উক্ত আয়াত তায়াম্মুমের আয়াতের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। অধিকাংশ আলেমের মত এই যে অযূর উপর আমল পূর্ব থেকেই ছিল, কিন্তু কোরআনে এর ফরয হওয়া সম্পর্কিত আয়াত হিজরতের চার-পাঁচ বছর পর অবতীর্ণ হয়েছে। এমনও জানা যায় যে প্রথমাবস্থায় মানুষ খুব তাড়াতাড়ি ওযূ করত, যার ফলে ক্ষেত্রবিশেষে হয়ত কিছু অংশ ভিজত অপর কোন অংশ ভিজত না। ষষ্ঠ হিজরীতে অথবা তৎপরবর্তী কোন সফরে হুযুর (সাঃ) মক্কা থেকে ফিরে আসছিলেন, এমতাবস্থায় সাহাবিগণের কতিপয় লোক দ্রুত কূপের কাছে পৌছে তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুলেন, তাড়াহুড়ার মধ্যে পায়ের গোঁড়ালির কিছু অংশ ভিজল কিছু অংশ শুকনো রইল। তখন হুযুর (সাঃ) সবাইকে ডেকে বললেন ঃ

"সে সকল গোঁড়ালিতে আগুন লাগুক, তোমরা ওযু পূর্ণ কর।"

এ সময় থেকে ধীরস্থিরভাবে ওযুর ফরযসমূহ আদায় করা আবশ্যক বলে স্থিরীকৃত হল এবং ওযু পরিপূর্ণ করা ফাযায়েলও বর্ণনা করা হল। ওযু থাকুক না থাকুক, প্রত্যেক নামাযের পূর্বেই হুযূর (সাঃ) নতুন ওযূ করতেন।[৪] কিন্তু পরবর্তীকালে সাধারণ মুসলমানদের পক্ষে কষ্টকর হবে মনে করে প্রত্যেক (নামাযের) সময় (ওযু থাকলে নতুন) ওযু করা আবশ্যক থাকল না। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি কার্যত তাই ঘোষণা করেন।[৫]

তায়াম্মুম ঃ ওযুর জন্য পানি অত্যাবশ্যক। সফর অবস্থায় পানি পাওয়া অনেক সময় দুষ্কর হয়ে পড়ে। আবার রুগ্নাবস্থায় কোন কোন সময় পানি ব্যবহার করা ক্ষতিকর হয়। তাই ৫ম হিজরী সনে তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হয়।

১. ইবনে হিশাম, ফতহুল বারী (ইবনুল হাইসান রচিত মাগাযী থেকে সঙ্কলিত), মুয়াত্তা ইমাম আহমদ ৪র্থ খণ্ড ১৬১ পৃঃ ও ইবনে মাজা।
২. ফতহুল বারী ১ম খণ্ড ২০৫ পৃঃ তিবরানী রচিত "আওসাত," গ্রন্থ।
৩. সহীহ্ মুসলিমঃ উভয় পা ধৌত করা ওয়াজিব অধ্যায়।
৪. ফতহুলবারী ঃ আবু ঊদ ও আহমদ থেকে সঙ্কলিত।
৫. সহীহ্ মুসলিম।

"তোমাদের কেউ যদি রুগ্ন হয় বা সফরে থাকে, (এ অবস্থায়) যদি কেউ প্রস্রাব-পায়খানা থেকে ফিরে আসে, অথবা স্ত্রী-সহবাস করে আর পাক হওয়ার জন্যে পানি পাওয়া না যায়, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তোমরা তায়াম্মুম করবে। মাটি দ্বারাই তোমার মুখমণ্ডল ও দু'হাত কনুই পর্যন্ত মসেহ্ করবে। আল্লাহ্ পাক তোমাদের কোন রকম বিপাকে ফেলতে চান না। বরং তিনি চান যেন তোমরা পাক-পবিত্র থাকতে পার। আর এভাবে তিনি তাঁর নেয়ামত রাশি তোমাদের প্রতি পরিপূর্ণ করতে চান, যেন তোমরা শুকরিয়া আদায় করতে পার।" –(আল্ মায়েদা)

এ আয়াতের শানে-নুযুল বা অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে হুযুর (সাঃ) ৫ম হিজরীতে বনী মুসতালেক অভিযান থেকে ফিরে এলেন, উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) সঙ্গে ছিলেন। মদীনার নিকটবর্তী হলে ঘটনাক্রমে উম্মুল মোমেনীনের গলার হার খোয়া গেল। সমস্ত কাফেলা সেখানেই থেমে গেল। নামাযের সময় হলে পানি পাওয়া না যাওয়ায় সাহাবিগণ অস্থির হয়ে পড়লেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেও ব্যাপারটি জানতে পারলেন। ইত্যবসরে এ আয়াত নাযিল হল। পানির বদলে মাটি দ্বারা জরুরী অবস্থায় পবিত্রতা হাসিলের এ অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে মুসলমানগণ বড়ই খুশী হলেন। উসাইদ ইবনে হুযাইর নামক এক সাহাবী আনন্দাতিশয্যে বলে উঠলেন, "হে আবু বকরের বংশধর! আপনি মানুষের জন্য বরকতের উৎস।"

নামায ঃ নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম লগ্ন থেকেই মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি নামায[১] ফরয হয়। দ্বিতীয় ওহীতেই আদেশ হল ঃ "আপনার প্রভুর মহত্ত্ব বর্ণনা করুন।" এ 'মহত্ত্ব' বর্ণনার দ্বারা নামায ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য হতে পারে? কিন্তু যেহেতু তিন বছর পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত গোপনীয়ভাবে দিতে হত এবং কাফেরদের ভয়ে প্রকাশ্যে নামায পড়া সম্ভব ছিল না, তাই শুধু রাত্রে অধিক রাত্র পর্যন্ত নামায পড়ার আদেশ ছিল। দিনে কোন নামায ফরয ছিল না। প্রাথমিক সূরাসমূহের মধ্যে সূরায়ে মুজ্জাম্মিলে এ আদেশ পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে ঃ

"হে কম্বলাবৃত শয়নকারী! রাতের সামান্য অংশ ব্যতীত সারা রাত দাঁড়িয়ে থাক, অর্ধেক রাত্রি অথবা তা থেকে কিছু কম অথবা তা থেকে বেশি ; কোরআন

১. নামায ফরয হওয়ার ইতিহাস বর্ণনায় মোহাদ্দেসগণ মতভেদ করেছেন। ইবনে হাজার (রহঃ) ফতহুল বারীতে (১ম খণ্ড ২৬৯ পৃঃ) যে পরিষ্কার বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন তার হুবহু অনুবাদ নিম্নরূপ - (মোহাদ্দেসগণের) "এক দলের মত এই যে মেরাজের পূর্বে নির্ধারিত সময়ে কোন নামায ফরয ছিল না। "হরবী" (রাহঃ)-এর মতে সকাল ও সন্ধ্যায় দু'-দু রাকআত ফরয ছিল। ইমাম শাফেয়ী (রাহঃ) বিভিন্ন আলেম থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে রাত্রির প্রথম ভাগের (অনেকক্ষণ পর্যন্ত) নামায ফরয ছিল। (অতঃপর এর আয়াত দ্বারা তা রহিত হয়ে যায়" এবং অল্প রাত্র পর্যন্ত শুধু নামায ফরয থাকে। তৎপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হলে উক্ত আদেশও রহিত হয়ে যায়।" নামাযের ইতিহাস বর্ণনা সম্পর্কিত এ ব্যাখ্যা সম্বলিত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্বারাই তা স্পষ্ট হয়ে যায় যে কোরআন মজীদে নামাযের সময় সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা কেন?

ধীরলয়ে পাঠ কর, আমি নিশ্চয় অদূর ভবিষ্যতে তোমার উপর কঠিন দায়িত্ব অবতীর্ণ করব। নিশ্চয় রাত্রি জাগরণ খুবই কষ্টকর। আর এ সময় কথা বলারও উপযুক্ত সময়। দিনে তোমার অনেক কাজ, তোমার নিজের প্রভুর নাম স্মরণ কর। এবং সবকিছু পরিহার করে তাঁরই দিকে রত হও।"–(সূরায়ে মুজ্জাম্মিল)

তারপর সকাল ও সন্ধ্যার দু-দু'রাকাত নামায ফরয হল।

"ভোর ও সন্ধ্যায় তোমার প্রভুর নাম স্মরণ কর, রাতে তাঁকে সেজদা কর এবং অধিক রাত পর্যন্ত তাঁর তাসবীহ্ পাঠ কর।"–(সূরায়ে দাহ্‌র)

অধিক রাত পর্যন্ত নামায পড়ার আদেশ একবছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন "খোদ হুযুর (সাঃ) এবং অধিকাংশ সাহাবীর একবছর পর্যন্ত এর উপর আমল ছিল। নামায পড়তে পড়তে তাঁদের পা ফুলে যেত। একবছর পর দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত নামায ফরযের আদেশ রহিত হল।[১] বলা হল ঃ

"নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা জানেন যে আপনি একাংশ বা তিন ভাগের দু ভাগ রাত্রি পর্যন্ত নামায পড়েন এবং আপনার সঙ্গে যে একদল লোক আছে, তাঁরাও আপনাকে অনুসরণ করে। আল্লাহ্‌ই দিবা-রাত্রির পরিমাণ করে থাকেন, তিনি জানেন, আপনি তাতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম নন। সুতরাং তিনি আপনার এ ত্রুটি ক্ষমা করে থাকেন। অতঃপর এখন থেকে আপনি যতটুকু সম্ভব, (নামাযের মাধ্যমে) কোরআন পাঠ করতে থাকুন। তিনি জানেন আপনার সঙ্গীদের অনেকেই হয়ত অসুস্থ হয়ে পড়বে, অপর দল হয়ত জীবিকান্বেষণে বিদেশ সফরে যেতে পারে। অন্যদল হয়ত আবার আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের সফরে যেতে পারে এমতাবস্থায় যতটুকু সম্ভব কোরআন পাঠ করুন।"–(সূরায়ে মুজ্জাম্মিল)

রাতের এ নামাযের নাম তাহাজ্জুদ, তাহাজ্জুদের নামায নফল হওয়ার পর ফযর, মাগরিব এবং এশার নামায ফরয হয়।

"দিনের উভয় (শুরু ও শেষ) প্রান্তে (অর্থাৎ, ফযর ও মাগরিব) এবং রাত্রি কিছু অতিবাহিত হওয়ার পর (অর্থাৎ, এশার) নামায পড়।"–(সূরায়ে হূদ)

নবুওতের ৫ম সনে মে'রাজের[২] রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়।[৩] মে'রাজের ঘটনা সংবলিত সূরায়ে ইস্‌রায় এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

"নামায কায়েম কর মধ্যাহ্নের সূর্য হেলে পড়ার সময় এবং সূর্যাস্তের পর আর ফযরে কেননা, ফযরের পাঠ বিশেষভাবে লক্ষণীয় ব্যাপার। আর রাতে তাহাজ্জুদ পড়া তোমার জন্য নফল করে দেয়া হল।"–(সূরায়ে বনী ইসরাঈল)

---

১. আবু দাউদ রাত্রিকালীন নামাযের অধ্যায়, আহমদ (রাহঃ) এটাকে উত্তম বলেছেন, মুসনাদে আহমদ ৬ষ্ঠ খণ্ড ৫৪ পৃঃ।

২. আমাদের অনুসন্ধান মতে 'মে'রাজ' নবুওতের নবম সালে হয়েছে।

৩. ফতহুল বারী মিসরী ছাপা ঃ ৭ম খণ্ড ৫৫ পৃঃ।

প্রথমাবস্থায় প্রত্যেক ফরয নামায ছিল দু দু রাকাত। মদীনায় হিজরতের পর যখন কিছুটা শান্তি লাভ হল, তখন ফরযও কিছুটা প্রশস্ত হল, দু-এর স্থলে চার রাক্‌আত ফরয হল।[১]

এতদসত্ত্বেও নামাযে আল্লাহ্‌ভীতি, একাগ্রচিত্ততা, ধীরতা ও মনোযোগের জন্য যে শান্তির পরিবেশ প্রয়োজন ছিল, তা এক যুগ পর্যন্ত ভাগ্যে জুটেনি। এ কারণেই সেসব আরকান এবং আদাত হঠাৎ আবশ্যকীয় বলে স্থিরীকৃত হয়নি। বরং ধীরে ধীরে তার পরিপূর্ণতা লাভ হয়। আগে মানুষ নামাযের অবস্থায় আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারত। এ অবস্থা লক্ষ্য করে একদিন মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ

"এরা কেমন লোক যে নামাযের অবস্থায়ও আকাশের দিকে চোখে তুলে থাকে?"[২]

এ সময় পর্যন্ত এমন অবস্থা ছিল যে লোকে নামায পড়া অবস্থায় কোন কাজের কথা মনে পড়লে কাকেও ডেকে তা বলে দিত, অথবা কেউ সালাম করলে নামাযের অবস্থায়ই তার উত্তর দিয়ে দিত, পাশাপাশি লোকেরা নামাযের অবস্থায় কথাবার্তাও বলত।

ষষ্ঠ হিজরীতে মুহাজিরগণ যখন হাবশা থেকে ফিরে এলেন, তখন মহানবী (সাঃ) নামায পড়ছিলেন। এ অবস্থাতেই পূর্ব প্রথানুযায়ী তাঁরা সালাম করলেন, কিন্তু উত্তর পেলেন না। নামাযের পর মহানবী (সাঃ) বললেন,—"আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন, যেন নামাযে থাকা অবস্থায় কথাবার্তা বলা না হয়। সুতরাং তোমরা নামাযে থাকা অবস্থায় কথাবার্তা বলো না"[৩] সালামের উত্তর দেয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল।

মুআবিয়া ইবনে হাকাম (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার আমি মহানবী (সাঃ)-এর সঙ্গে নামায আদায় করলাম এক সাহাবীর হাঁচি এলে আমি "ইয়ারহামুকাল্লাহ অর্থাৎ, তোমার উপর আল্লাহ্‌র রহমত হোক"—বললাম। লোকেরা আমার দিকে কটাক্ষপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। আমি বললাম, আপনারা কি দেখছেন? তারা হাঁটুতে করাঘাত করল। এতে আমি বুঝতে পারলাম যে তাঁরা আমাকে কথাবার্তা থেকে নিবৃত্ত করতে চাইছেন, তাই আমি চুপ হয়ে গেলাম। মহানবী (সাঃ) নামায শেষে এ জন্য আমাকে কোন শাস্তি প্রদান করেননি। শুধু এতটুকু বললেন যে "নামায-তাস্‌বীহ্, তাক্‌বীর ও কোরআন পাঠকে বলে, এ সময় কথাবার্তা বলা জায়েয নয়।"[৪]

১. সহী বোখারী হিজরতের অধ্যায়।
২. বোখারী নামায অধ্যায়ের "নামাযে আকাশের দিকে চক্ষু উত্তোলন" অধ্যায়।
৩. আবু দাউদ নামায অধ্যায়।
৪. আবু দাউদ নামায অধ্যায়।

তাশাহ্হুদের যে পদ্ধতি বর্তমানে চালু আছে তা পূর্বে ছিল না। বিভিন্ন ব্যক্তির নাম ধরে বলা হত, অমুকের উপর সালাম। অবশেষে বর্তমানে প্রচলিত আত্তাহিয়্যাতুর বিশেষ শব্দাবলী শিক্ষা দেয়া হয়।[১]

হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে যে মহানবী (সাঃ) অনেক সময় নামাযের অবস্থায় ছোট ছোট শিশুদেরকে কাঁধে চড়ার সুযোগ দিতেন, সেজদায় যেতে নামিয়ে দিতেন, আবার দ্বিতীয় রাকআতে উঠে দাঁড়াবার সময কাঁধে তুলে নিতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বাইরে থেকে এসে দরজায় টোকা দিতেন, আর মহানবী (সাঃ) নামায পড়া অবস্থায়ই গিয়ে দরজা খুলে দিতেন।[২] এসব হাদীসের উপর ভিত্তি করে অনেক ফেকাহ্শাস্ত্রবিদে মত এই যে নফল নামাযে এই জাতীয় কাজ করা জায়েয, কেননা, যেসব নামাযে মহানবী (সাঃ) এ সমস্ত কাজ করেছেন সেগুলো ফরয নামায ছিল; বরং নফলই ছিল। কিন্তু আমাদের নিকট এ জাতীয় ব্যাখ্যা ঠিক নয়। কারণ এক হাদীসে পরিষ্কার বর্ণিত আছে যে মহানবী (সাঃ) উমামা বিন্তে আবুল আস (রাঃ)-কে কাঁধে করে মসজিদে আসেন এবং নামায আদায় করেন।[৩]

আমার নিকট এ সকল রেওয়ায়েত তখনকার, যখন নামাযের মধ্যে কথাবার্তা বলা এবং এ জাতীয় কাজকর্ম করা নিষিদ্ধ ছিল না। ক্রমান্বয়ে নামায পরিপূর্ণতা লাভ করে একাগ্রচিত্ততা, আল্লাহ্ভীতি, ধ্যান ও তন্ময়তায় পরিণত হল।

কোরআন পাকে আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

"যারা আল্লাহ্ভীতির সঙ্গে নামায আদায় করে, তারাই সফলতা লাভ করেছে।"–(সূরায়ে মুমেনূন)

এ আয়াত অনুসারে নামাযের মধ্যে এদিক-সেদিক দেখা এবং একাগ্রচিত্ততা বিনষ্ট হতে পারে এমন যেকোন কাজ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। নামাযের প্রতিটি রোকন ধীরস্থিরতার সঙ্গে আদায় করা সাব্যস্ত হল। এমন কি, কোন এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে নামায আদায় করল। কিন্তু সে নামাযের সকল রোকন স্থিরতার সঙ্গে আদায় করল না। তখন তিনি তাকে বললেন, "তুমি নামায পড়নি।" সে ব্যক্তি দ্বিতীয়বার একইভাবে নামায পড়ল। তিনি বললেন, "নামায হয়নি।" তৃতীয়বার সে জিজ্ঞেস করল, "কিভাবে পড়ব?" তিনি রুকু, সেজদা ও কেয়াম সবকিছু সম্পর্কে হেদায়েত করলেন যে "খুব ধীরস্থিরতার সঙ্গে এগুলো আদায় করবে।"

১. আবু দাউদ নামায অধ্যায়ে তাশাহহুদ পরিচ্ছেদ।
২. আবু দাউদ নামায অধ্যায়, "নামাযে কাজ করা" পরিচ্ছেদ।
৩. ঐ

সহীহ্ বোখারী ইত্যাদিতে এ রেওয়ায়েত খুব বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে।[১]

একদিন সিরিয়া থেকে একদল বণিক এলে শুধুমাত্র ১২ জন ছাড়া আর সবাই নামায ছেড়ে কাফেলার দিকে ধাবিত হল; এরপর আয়াত অবতীর্ণ হয়।[২]

"তারা কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা তামাশার বস্তু দেখেই আপনাকে নামাযে দাঁড় করিয়ে রেখে সেদিকে ছুটে গেল। আপনি বলুন, আল্লাহ্র নিকট যা আছে, খেল্-তামাশা এবং তেজারতের চাইতে তা উত্তম।"– (সূরায়ে জুমআ)

পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য মহানবী (সাঃ)-এর শিক্ষা ও সাহচর্যের গুণে এ সাহাবায়ে কেরামেরই এমন এক অবস্থা হয় যে নামাযে রত অবস্থায় তিন তিনটি তীরের আঘাত খেলেও জনৈক সাহাবীর তন্ময়তায় কোন প্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়নি। কোরআনের যে সূরা তিনি পাঠ করছিলেন তার মাধুর্য তাঁকে এমনি তন্ময় করে রেখেছিল যে বিষাক্ত তীরের আঘাতও তাঁর মনোযোগে ব্যাঘাতের সৃষ্টি করতে পারেনি।

হযরত ওমর ফারুকের মত মহান নেতা নামাযের মধ্যে আততায়ীর খঞ্জরের আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে রক্তাপ্লুত হয়ে পড়েন। আঘাতের তীব্র বেদনায় তিনি ছটফট করতে থাকেন, কিন্তু এমন একটি মারাত্মক ঘটনাও পার্শ্ববর্তী নামাযীদের নামাযে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারেনি। আল্লাহ্র সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার অনুভূতি তাঁদের দুনিয়ার সকল কিছু থেকে এমনিভাবে সরিয়ে নিত।

জুমআ ও দুই ঈদের নামায ঃ মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে একাধিক ব্যক্তির একত্রিত নামায পড়া সম্ভব ছিল না, তাই সেখানে জুমআর নামাযও ফরয ছিল না। কেননা, জুমআর নামায সহীহ্ হওয়ার প্রথম শর্তই হল জামায়াত। যেহেতু মদীনায় আনসারদের একটি বিরাট জামাত ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানে কারও দ্বারা নামাযে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ারও আশঙ্কা ছিল না, ফলে মহানবী (সাঃ)-এর আগমনের পূর্বেই যেসব মুসলমান মদীনায় আসেন, তাঁরা আসআদ ইবনে যুরারার উৎসাহে বনী বিয়াযার মহল্লায় সর্বপ্রথম জুমআর নামায আদায় করেন।[৩] এ জামায়াতে মোসআব ইবনে ওমায়র ইমামতি করেন [৪] এবং মোট চল্লিশ জন নামাযী শামিল হন।[৫] এরপর মহানবী (সাঃ) মদীনায় আগমন করে সর্বপ্রথম কোবা নামক মহল্লায় অবস্থান করেন। সেখান থেকে এগিয়ে যাবার তারিখটি তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই শুক্রবার দিন নির্ধারণ করেন। বনী সালেমের মহল্লায় পৌছলে নামাযের সময় হয়। ফলে, সর্বপ্রথম জুমআর নামায মহানবী

১. সহীহ্ বোখারী যে ব্যক্তি নামায পূর্ণভাবে আদায় করেনি তার নামায দোহরাবার বিবরণ অধ্যায়।
২. সহীহ্ বোখারী ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়; উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা।
৩. আবু দাউদ, ইবনু মাজা ও দারেকুতনী ঃ জুমআর অধ্যায়, আবদুর রাজ্জাক, আহমদ, খুযাইমা ও ফত্হুল বারী।
৪. ইবনু ইসহাক।
৫. আবু দাউদ, ইবনু মাজা ইত্যাদি জুমআর অধ্যায়।

(সাঃ) এখানেই আদায় করেন। এটা প্রথম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের শেষার্ধের ঘটনা[১] মদীনার বাইরে আরবের অন্যান্য অংশের মধ্যে বাহ্‌রাইনে অবস্থিত জাওয়াসী নামক স্থানে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল সবচাইতে বেশি। ইবনে আব্বাসের বর্ণনানুযায়ী মদীনার বাইরে সর্বপ্রথম জুমআর নামায এখানে প্রচলিত হয়।[২]

প্রথমাবস্থায় মুসলমানদের মধ্যে জুমআর মর্যাদা যতটুকু হওয়া উচিত ছিল, কার্যক্ষেত্রে ততটুকু ছিল না। উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে একবার মহানবী (সাঃ) জুমআর নামায পড়াচ্ছিলেন। (অন্য রেওয়ায়েত মতে খুতবা পাঠ করছিলেন)। এমতাবস্থায় সিরিয়া থেকে একদল ব্যবসায়ী শস্য নিয়ে আগমন করল। কেবলমাত্র ১২ জন অন্য রেওয়ায়েত মতে ৪০ জন লোক ব্যতীত আর সবাই চলে গেল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

"হে মুমিনগণ! যখন জুমআর দিন (জুমআর) নামাযের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন আল্লাহ্‌র স্মরণে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা পরিহার কর; এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জ্ঞান রাখ। তারপর যখন নামায শেষ হয়ে যাবে তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকির কর–যাতে তোমরা সাফল্যলাভে সক্ষম হও। আর তারা যখন কোন ব্যবসায়ের কাজ কিংবা খেলাধুলা দেখতে পায়, তখন তারা আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় ফেলে সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আপনি বলুন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে যা কিছু আছে তা খেলাধুলা এবং যেকোন ব্যবসা-বাণিজ্য অপেক্ষা উত্তম, আর আল্লাহ্ তা'আলাই উত্তম রিযিকদাতা।"—(সূরায়ে যুমআহ্)

কিন্তু পরবর্তী সময়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হল যে, নামাযের মোকাবিলায় সারা দুনিয়ার ধন-সম্পদও তাঁদের দৃষ্টিতে ছিল নিতান্তই তুচ্ছ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের প্রশংসায় বলেন ঃ

"এরা সেসব লোক, যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা কিছুই আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে অমনোযোগী করতে পারে না।"—(সূরায়ে নূর)

ঈদের নামাযও মহানবী (সাঃ)-এর মদীনায় পদার্পণ করার পর প্রবর্তিত হয়। তবে, যে বছর তিনি মদীনায় পদার্পণ করেন, সে বছরই অর্থাৎ, প্রথম হিজরীতে ঈদের নামায ওয়াজেব হয়নি। দ্বিতীয় হিজরীতে এর প্রচলন হয়।[৩] কেননা, ঈদের নামায রমযানের রোযার অনুবর্ত্তী , আর রমযানের রোযা ফরয হয় দ্বিতীয় হিজরীতে।

---

১. তাবারী, পৃষ্ঠা ১২৮১ ইউরোপে মুদ্রিত।
২. ঐ
৩. হাদীস গ্রন্থসমূহে সালাতুল খাওফ্ অধ্যায়, তাবারী ৩য় খণ্ড ৪৫ পৃঃ ও ইবনু সা'দ ২য় খণ্ড ৪৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ভয়ের অবস্থার নামায ঃ নামায কোন অবস্থাতেই কাযা করা যায় না। ভয়ের অবস্থায় এমন কি, যুদ্ধের ময়দানে দুশমনের সামনাসামনি দাঁড়িয়েও ফরয নামায আদায় করতে হবে। যেকোন মুহূর্তে আক্রমণের ভয় থাকলে সমগ্র সৈন্যদলকে দু'ভাগে ভাগ করে দিতে হবে। প্রথম এক ভাগ সশস্ত্র অবস্থায় ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে কছরের নামায আদায় করবে। অতঃপর শৃঙ্খলা মোতাবেক তারা (যুদ্ধের মাঠে) এগিয়ে যাবে, আর দ্বিতীয় দল এসে প্রথম ইমামের সঙ্গে কছর নামায পড়বে। ইমাম যথাস্থানে দাঁড়িয়ে থাকবেন। এখানে বর্ণনাকারীদের মধ্যে মতভেদ আছে যে এমতাবস্থায় প্রত্যেক দল ইমামের সঙ্গে দু'রাকাত করে নামায আদায় করবে, না ইমামের সঙ্গে এক রাকাত করে নামায আদায় করবে। আর এক রাকাত নিজে নিজে পড়বে কিংবা এমতাবস্থায় এক রাকাত নামাযই ফরয। আবু দাউদে সালাতুল খাওফ্ (ভয়ের অবস্থায় নামায) সম্বন্ধে সাহাবাদের থেকে বর্ণিত প্রতিটি রেওয়ায়েত পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন। আমাদের ধারণায় রেওয়ায়েত বিভিন্ন ধরনের হলেও মতভেদের অবকাশ নেই। কেননা, এটা যুদ্ধের অবস্থার উপর নির্ভরশীল। ইমাম সে সময় যা সমীচীন মনে করবেন, তাই করবেন। যুদ্ধের অবস্থা যদি গুরুতর হয়, তবে প্রত্যেক সৈনিক স্ব-স্ব স্থানে ইশারার দ্বারা নামায আদায় করবে। সুরায়ে নেসায় সালাতুল খাওফ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত যাতুররেকা নামক স্থানে যুদ্ধে সালাতুল-খাওফের হুকুম অবতীর্ণ হয়। কোন কোন বর্ণনাকারী উক্ত যুদ্ধের নাম 'নজদের যুদ্ধ' বলে উল্লেখ করেছেন। আবু দাউদে আবু আব্বাস যারকী থেকে বর্ণিত আছে যে ষষ্ঠ জরীতে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় আস্ফান' নামক স্থানে সালাতুল খাওফের আয়াত অবতীর্ণ হয়। কিন্তু অধিকাংশ হাদীস বর্ণনাকারী এবং সীরাত লেখক যাতুররেকার যুদ্ধকেই এ আয়াত অবতরণের সময় বলে মনে করেন।[১]

রোযা ঃ ইসলামপূর্ব যুগে কোরাইশরা আশুরার রোযা রাখত। এদিনে কাবা ঘরে নতুন গেলাফ পরান হত।[২] মহানবী (সাঃ)-ও এদিনে রোযা রাখতেন। হয়ত তাঁর অনুসরণে কোন কোন সাহাবীও রোযা রাখতেন। পঞ্চম নববী অর্থাৎ, হিজরতের ৮ বছর পূর্বে হাবশায় নাজ্জাশী বাদশাহ্র সামনে হযরত জাফর (রাঃ) যে জবানবন্দী পেশ করেন, তাতে রোযার কথা উল্লেখ আছে; সম্ভবত সেটি আশুরার রোযাই হবে। অতঃপর মহানবী (সাঃ) যখন মদীনায় পদার্পণ করলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন, ইহুদীরাও এদিনে রোযা রাখে। তিনি তাদের রোযা রাখার কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, এদিন হযরত মূসা (আঃ) ফেরআউনের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন। তিনি বললেন ঃ "মূসা (আঃ)-কে অনুসরণ করার অধিকার আমাদের বেশি।"

১. মুসনাদে ইবনে হাম্বল ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৪৪ পৃঃ।
২. আবু দাউদ শরীফ রোযার অধ্যায়।

সুতরাং তিনি মদীনার জীবনেও আশুরার রোযা রাখেন এবং সাহাবিদেরকেও রাখতে নির্দেশ দেন। দ্বিতীয় হিজরীতে রমযানের রোযা ফরয হলে আশুরার রোযা নফল হয়ে যায়। অর্থাৎ, যার ইচ্ছা সে রাখত আর না রাখলে কোন তাম্বীহ্ ছিল না। তবে হুযুর (সাঃ) আশুরার রোযা সব সময় রাখতেন। ১১ হিজরীতে সাহাবিগণ আরয করলেন ঃ "ইয়া রসূলুল্লাহ্! সেদিনকে ইহুদীরা বেশি সম্মান করে।" জবাবে হুযুর (সাঃ) বললেন ঃ "আগামী বছর দশ তারিখের স্থলে নবম তারিখে রোযা রাখব।" কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে তিনি সে বছরই ওফাত পান।[১]

ইহুদীরা এভাবে রোযা রাখত যে এশার নামাযের পর আর পানাহার করত না। অতঃপর কোন কিছু খাওয়া বা পান করাকে হারাম মনে করত, স্ত্রী সহবাসও নিষিদ্ধ ছিল। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমানরাও এভাবে রোযার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। ইসলামের প্রতিটি আহ্কামেই এ নীতি অনুসৃত হত।

—"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য সহজ ও সরলতা চান, তিনি তোমাদের কঠোরতা বা কষ্ট চান না।"— (সূরায়ে বাকারা)

"ইসলামে সন্ন্যাস নেই।"—(আবু দাউদ) এ মর্মে নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ

"তোমাদের জন্য রোযার (মাসের) রাত্রিতে স্ত্রী-সহবাস হালাল করা হল।[২] তোমরা রাত্রের কাল সুতা থেকে ভোরের সাদা সুতা দেখা যাওয়া পর্যন্ত পানাহার করবে।— (সূরায়ে বাকারা)

আবরবাসীরা রোযায় তেমন অভ্যস্ত ছিল না। প্রাথমিক অবস্থায় রোযা তাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর মনে হত।[৩] তাই রোযা অত্যন্ত ধীরে পরিপূর্ণতা লাভ করে। মহানবী (সাঃ) মদীনায় আগমনের পর প্রাথমিক অবস্থায় সারা বছরে মাত্র তিনটি রোযা রাখার নির্দেশ দেন। তারপর রোযা ফরয হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হলে এমন সুযোগ দেয়া হয় যে যার ইচ্ছা রোযা রাখবে আর রোযা রাখা সম্ভব না হলে একজন মিস্কীনকে খানা খাওয়াবে। ধীরে ধীরে মানুষ রোযায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (بقره)

"যে ব্যক্তি রোযার মাস প্রত্যক্ষ করে সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে।" (সূরায়ে বাকারা)

১. এ সব ঘটনা সহীহ্ বোখারী, সহীহ্ মুসলিম ও আবু দাউদে রোযার অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণিত আছে
২. আবু দাউদ রোযা রাখার অধ্যায়ে রোযা ফরয হওয়ার প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কিত বর্ণনা ও আল্লাম-সুয়ূতী রচিত আস্বাবুনুনুযূল পৃঃ ২৭।
৩. সহীহ্ বোখরীতে উল্লেখ আছে, "রমযান উপস্থিত হলে তা তাদের উপর কষ্টকর মনে হল।"

এরপর এতেই সুনির্দিষ্টভাবে রোযা ফরয হয়ে গেল এবং ফিদইয়ার আদেশ রহিত হল। যে ব্যক্তি অসুস্থ বা সফররত অবস্থায় আছে, তার জন্য এ আদেশ অবতীর্ণ হল যে সে এমতাবস্থায় রোযা ভাঙতে পারবে, কিন্তু অন্য সময় পূরণ করতে হবে। যেহেতু অন্য সব জাতির মধ্যে বিশেষত খৃষ্টানদের মধ্যে বৈরাগ্য নিতান্তই মর্যাদার ব্যাপার, সেহেতু কিছুসংখ্যক লোক অস্বাভাবিক কষ্ট স্বীকার করেও রোযা রাখাকে অধিকতর তাকওয়া-পরহেযগারী বিবেচনা করত। কিন্তু মহানবী (সাঃ) এমন প্রবণতা কোন অবস্থাতেই প্রশ্রয় দিতেন না।[১] একদিন মহানবী (সাঃ) সফররত অবস্থায় দেখতে পেলেন, একটি লোককে কেন্দ্র করে কিছু লোক ভিড় করে আছে, এবং তাকে ছায়া করে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে লোকটি এ প্রচণ্ড গরমেও রোযা রেখে কাতর হয়ে পড়েছে। একথা শুনে তিনি বললেন ঃ "সফররত অবস্থায় রোযা রাখাতে কোন সওয়াব নেই।"[২]

কিছুসংখ্যক সাহাবী একাদিক্রমে নফল রোযা রাখার অনুমতি প্রার্থনা করলে মহানবী (সাঃ) নিষেধ করলেন। রোযার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাধারণ ধারণা ছিল যে ইচ্ছা করে অধিকতর কষ্ট স্বীকার করার মাধ্যমেই অধিক পুণ্য নিহিত। মহানবী (সাঃ) এ ধারণা দূর করার জন্যই সহজ এবং সহনীয় অবস্থায় রোযা রাখার নির্দেশ দান করেন। সফর ও রুগ্নাবস্থায় রোযা রাখা ফরয ছিল না। রাতে সুবহে সাদেক পর্যন্ত পানাহার ও সর্বপ্রকার ভোগের অনুমোদন ছিল। সেহ্‌রী খাওয়ার ফযীলত বর্ণনা করা হল এবং ঘোষণা করা হল যে সুব্‌হে সাদেকের কাছাকাছি সময়ে সেহ্‌রী খাবে, তাহলে সারাদিন শরীরে শক্তি থাকবে।

পাপকার্য থেকে প্রবৃত্তিকে বিরত রাখাই রোযার একমাত্র উদ্দেশ্য। রোযা সে পথের সহযোগী বা সাহায্যকারী মাত্র। এ জন্যেই মহানবী (সাঃ) বলেছেন,—"যে ব্যক্তি রোযার মধ্যে মিথ্যা ও প্রতারণা ছাড়তে পারে না, তার উপবাসে আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন আবশ্যকতা নেই।"[৩]

যাকাৎ ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই খয়রাত ও যাকাৎ সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান করা হত। মক্কায় যেসব সূরা অবতীর্ণ হয় সেগুলোতেও যাকাৎ শব্দ পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে। উপরন্তু যারা খয়রাত দেয় না তাদের সম্বন্ধে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে। যথা ঃ

"আপনি কি সে ব্যক্তিকে দেখেছেন, যে কেয়ামতকে অস্বীকার করে, ইয়াতীমকে বিতাড়িত করে এবং মিস্‌কীনকে খানা খাওয়াবার জন্য লোকদের উদ্বুদ্ধ করে না।"— (সূরায়ে মাউন)

১. আবু দাউদ নামাযের অধ্যায় আযান পরিচ্ছেদ।
২. সহীহ্‌ বোখারী রোযার অধ্যায়।
৩. সহীহ্‌ বোখারী।

মদীনা মুনাওয়ারায় এ সম্পর্কে অধিকতর গুরুত্ব সংবলিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। দ্বিতীয় হিজরীর ঈদের দিন সদকায়ে ফিত্‌র দেয়া ওয়াজিব বলে সিদ্ধান্ত হল।[১] হিজরতের প্রথমাবস্থায় মুসলমানগণ বিশেষত মোহাজেরগণ অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত ছিলেন। হাদীসে সাহাবিদের অভাব-অনটনের যে সমস্ত করুণচিত্র উল্লেখিত হয়েছে, তা এ সময়েরই কথা। এ জন্য সে সময় এ হুকুম দেয়া হয়েছিল যে জরুরী খরচাদির পর যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তার সবটাই খয়রাত করে দিতে হবে, নতুবা আযাব ভোগ করতে হবে। এ সম্পর্কে বিশেষভাবে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ[২]

"যারা সোনা ও রূপা সঞ্চয় করে, আর তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে না, তাদের ভীষণ আযাবের সংবাদ দান করুন।" (সূরায়ে তওবা)

উপরোক্ত একই উদ্দেশ্যে এ আয়াতটিও অবতীর্ণ হয় ঃ

"তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করবে, কতটুকু আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করবে? আপনি বলে দিন যে যা কিছু উদ্বৃত্ত, সবটুকুই।" (সূরায়ে বাকারা)

অনেকেই দান করতেন সত্য, কিন্তু দান করার সময় উত্তম মালগুলো রেখে নিকৃষ্ট বস্তু দান করতেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আদেশ অবতীর্ণ হয় ঃ

"মুসলমানগণ! তোমরা যা কিছু উপার্জন কর, আর আমি যা কিছু মাটি থেকে উৎপন্ন করে দিই, তা থেকে উত্তম বস্তুগুলো (খয়রাতে) খরচ কর। (সূরায়ে বাকারা)

এ বিষয়ের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করার জন্য এ আদেশ অবতীর্ণ হল যে প্রিয় বস্তু দান না করলে সওয়াব পাবে না।

"তোমরা যে পর্যন্ত প্রিয়তম বস্তু দান না করবে, সে পর্যন্ত সওয়াব পাবে না। (সূরায়ে আলে এমরান)

অতঃপর সদকা ও খয়রাতের প্রতি মানুষের এত আগ্রহ বেড়ে গেল যে গরীব লোকেরাও বাজারে ও বাইরে মোট বহন করে রোযগার করতেন এবং সে অর্থ খয়রাত করে দিতেন।[৩]

এতদসত্ত্বেও অষ্টম হিজরী পর্যন্ত যাকাৎ ফরয হয়নি। মক্কা বিজয়ের পর যাকাৎ ফরয হলে তার ব্যয়ের খাতসমূহও নির্ধারিত করে দেয়া হল। মহানবী (সঃ) অধীনস্থ সমগ্র দেশে যাকাৎ আদায়ের জন্যে (মহররম ৯ম হিজরী) তহসীলদার নিযুক্ত করলেন।[৪] যাকাতের অর্থ ব্যয়ের খাতসমূহ ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. তাবারী, ১২৮০ পৃঃ ইউরোপে মুদ্রিত।
২. সহীহ বোখারী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনা।
৩. বোখারী, যাকাৎ অধ্যায়।
৪. তাবারী, ইউরোপে মুদ্রিত ৪র্থ খণ্ড ১৭২১ পৃঃ ইবনু সা'আদ মাগাযী অংশ পৃঃ ১১৫।

"সদকাসমূহ্ ফকীর, মিস্কীন, সদকা আদায়কারী, নওমুসলিম, গোলাম আযাদে, ঋণগ্রস্ত আল্লাহ্‌র পথে এবং অসহায় পথিকদের জন্য। এটা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত; আল্লাহ্ তা'আলা প্রজ্ঞাময়।"— (সূরায়ে তওবা)

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দেশের বিভিন্ন এলাকার জনগণ এবং শাসকবৃন্দের বরাবরে যে সমস্ত পত্র এবং ফরমান প্রেরণ করেন, সেগুলোর মধ্যে যাকাৎ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী রয়েছে। ফেকাহ্শাস্ত্রের যাকাৎ অধ্যায় সেসব নির্দেশ থেকেই সংকলিত।

হজ ঃ দুনিয়ার বুকে সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আঃ)-ই সার্বজনীন উপাসনাগার নির্মাণ করে সারা দুনিয়ার মানুষকে সেখানে এসে এবাদত করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

কোরআন এরশাদ করে ঃ

"আর আমি যখন ইবরাহীম (আঃ)-কে কাবা ঘরের স্থান নির্ধারিত করে দিলাম এবং নির্দেশ দিলাম যে আমার সঙ্গে কাউকেও শরীক করো না, আমার ঘরকে তওয়াফকারীদের জন্য, অবস্থানকারীদের জন্য, রুকূ সেজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর। আর লোকদের মধ্যে হজের আহ্বান কর (তাহলে) লোক পদব্রজে এবং দূরদূরান্ত থেকে দুর্বল উটে চড়ে পুণ্যের আশায় নির্ধারিত কতিপয় দিবস আল্লাহ্‌র যিকরের জন্যে আসবে।"—(সূরায়ে হজ)

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এ সার্বজনীন আহ্বানে সমগ্র দুনিয়ার লোক সাড়া দিল। প্রতি বছর দূরদূরান্ত থেকে লোকেরা হজ করতে আসত। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, যে ঘর এককালে নির্ভেজাল তওহীদের প্রচারার্থে নির্মিত হয়েছিল, তা-ই ৩৬০টি দেব-দেবীর অর্চনাগারে পরিণত হল। তদুপরি এ ঘরের তদারক করার অধিকার সবচাইতে বেশি ছিল যাঁর তিনিই সেখান থেকে এমনভাবে বহিষ্কৃত হলেন যে সুদীর্ঘ আটটি বছর পর্যন্ত সেদিকে চোখ তুলে দেখাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সর্বশেষ সত্য প্রকাশের সময় এল, মক্কা বিজিত হল। হযরত ইবরাহীম(আঃ)-এর উত্তরাধিকারী এবং অনুসরণকারীদের জন্য তাঁর নির্দেশাবলীকে পুনর্জীবিত করার সুযোগ এল। তাই নবম হিজরী সনে হজ ফরয হল।[১] তবুও মহানবী (সাঃ) সঙ্গে সঙ্গেই এ ফরয আদায় করলেন না। কেননা, জাহেলী যুগে আরবরা উলঙ্গ অবস্থায় কাবাঘরের তওয়াফ করত। মহানবী (সাঃ) নিজের চোখে এসব দেখতে পছন্দ করতেন না। তাই সে বছর হজের মওসুমে হযরত আবু বকরের নেতৃত্বে মুসলমানদের প্রথম হজের কাফেলা পাঠিয়ে ঘোষণা করে দিলেন যে আগামী বছর কেউ উলঙ্গাবস্থায় কাবা ঘর তওয়াফ করতে পারবে না।[২]

১. যাদুর মা'আদ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৮০।
২. সহীহ্ মুসলিম হজ্জের অধ্যায়।

প্রথম বছর হুযুর (সাঃ)-এর হজে যোগদান না করার জন্য একটি কারণ ছিল এই যে প্রাচীনকাল থেকেই কাবার ব্যবস্থাপকগণ নিজেদের সুযোগ-সুবিধামত বছরের হিসাবে হেরফের করে ফেলত। এ হেরফেরের প্রতিবিধান করা সম্ভব ছিল না বলে এ বছর হুযুর (সাঃ) শামিল হলেন না। বরং এক বছর অপেক্ষা করে পরবর্তী বছর হজের প্রকৃত সময়ে যিলহজ মাসেই আদায় করেন।[১]

হজের সংস্কার ঃ প্রাচীন আরবের প্রায় প্রত্যেকটি গোত্রই ছিল হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর। ধর্মবিশ্বাস এবং ঐতিহ্যের দিক দিয়েও তারা নিজেদেরকে ইবরাহীমী মিল্লাতের অনুসারী দাবি করত। কিন্তু দীর্ঘকালের কুসংস্কার এবং নানা স্খলন-পতনের মধ্যে পতিত হয়ে তাদের মধ্যে ইবরাহীমী মিল্লাতের প্রায় কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

হজ ছিল ইবরাহীমী মিল্লাতের অনুসারিগণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মানুষ্ঠান। তাই আরবের লোকেরা প্রতিবছর ধুমধামের সঙ্গে হজব্রত পালন করার জন্য মক্কায় সমবেত হত। কিন্তু স্খলন-পতনের যে কলুষ বিষ তাদের সামগ্রিক জীবনের স্তরে স্তরে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল, হজ অনুষ্ঠানও তা থেকে বিমুক্ত ছিল না। জাহেলিয়াত যুগের ধর্মনেতাগণ হজ অনুষ্ঠানের মধ্যেও নানা প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন এবং নতুন নতুন কুসংস্কার সংযোজিত করে নিয়েছিল। ফলে এবাদতের বদলে তা আযাবের কারণে পরিণত হয়েছিল।

হজের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্‌কে একান্তভাবে স্মরণ ও তাঁর প্রতি পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা। কিন্তু আরববাসীরা যখন হজের মওসুমে একত্রিত হত, তখন আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত বাদ দিয়ে নিজেদের পিতৃ-পিতামহের গৌরবগাথা বর্ণনা করেই সময় অতিবাহিত করত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নিম্নোক্ত নির্দেশ নাযিল হল ঃ

"হজের আরকানসমূহ্ পূর্ণরূপে আদায় করার পর তোমরা যেভাবে তোমাদের পিতৃ-পিতামহের গৌরব-গান করে থাক ঠিক সেভাবে, বরং তা অপেক্ষা আরও বেশি করে আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করো।"[২]

হজের সময় মদীনাবাসীরা বিশেষভাবে মানাত মূর্তির তওয়াফ করত। সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের সায়ীকে তারা মোটেও গুরুত্ব দিত না। প্রকৃতপক্ষে হজের একটি মহান উদ্দেশ্যই হল হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এবাদতপদ্ধতির স্মৃতিমালাকে পুনর্জীবিত করে তোলা। সাফা-মারওয়ার তওয়াফও হযরত ইবরাহীমেরই মহান এবাদতের স্মৃতি বই কিছু নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক নিম্নোক্ত নির্দেশ নাযিল করেন ঃ

---

১. হযরত (সাঃ) বিদায় হজের দিন একথা বলেছিলেন।
২. ওয়াদেহী রচিত আসবাবুন্নুযুল।

"সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণচিহ্নের মধ্যে গণ্য; সুতরাং যে ব্যক্তি হজ ও ওমরা সম্পাদন করে, তার জন্য সে দু'টি স্থানের তওয়াফ করতে কোন দোষ নেই।"(সূরায়ে বাকারা ১৫৮ আয়াত)[১]

এক শ্রেণীর লোক কোন পাথেয় সংগ্রহ না করেই হজের সফরে বেরিয়ে পড়ত এবং লোকের প্রশ্নের জবাবে বলত, আমরা আল্লাহ্র উপর ভরসা বা তাওয়াক্কুল করে এসেছি। এ ধরনের লোকেরা পথে পথে ভিক্ষা করত অথবা সঙ্গী-সাথীদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ত। এ ভুল সংশোধনের নিমিত্ত কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হল ঃ

"(হজের সফরে) তোমরা পাথেয় নিয়ে বাইর হয়ো। অবশ্য আল্লাহ্ভীতিই সর্বোত্তম পাথেয়।" (সূরায়ে বাকারা)

হজের এহ্রামের মধ্যে মাথার চুল কাটা বা মুড়ানো নিষিদ্ধ। তবে জাহেলিয়াতের যুগে এ নির্দেশটাকেই যেরূপ কঠিন এবং সাধ্যের অতীত করে তোলা হয়েছিল যে জন্য অনেক সময় তা মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করত। দূরদূরান্ত থেকে দীর্ঘ সময়ের জন্য আসা যাত্রীদের অনেকেরই মাথায় জট ধরে উকুনের বাসা বেঁধে দৃষ্টিশক্তির উপর পর্যন্ত প্রভাব পড়ত। এতদসত্ত্বেও কোন অবস্থাতেই মাথা মুণ্ডন করার অনুমতি দেয়া হত না। ইসলামে যেহেতু সর্বপ্রথম এদিকেই দৃষ্টি দেয়া হয়েছিল যে কোন এবাদত বা নির্দেশই যেন মানুষের সাধ্যাতীত কষ্টে পরিণত না হয়। সুতরাং এ ব্যাপারেও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় নিম্নোক্ত আয়ত নাযিল হল ঃ[২]

"যদি তোমাদের মধ্যে কেউ রুগ্ন হয় অথবা মাথায় কোন অসুবিধা দেখা দেয়, তবে সে (মাথা মুণ্ডন করবে এবং) রোযা, সদকা অথবা কোরবানী দ্বারা ফিদইয়া আদায় করবে।" (সূরায়ে বাকারা)

কোরবানী করার পর সে পশুর রক্ত পুণ্য জ্ঞান করে কাবাঘরের দরজা ও দেয়ালে মাখিয়ে দেয়া হত। এ কুসংস্কারের প্রতিকারকল্পে নিম্নোদ্ধৃত আয়াত নাযিল হল ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কোরবানীর রক্ত ও মাংস গিয়ে পৌছায় না, বরং তোমাদের খোদাভীতিই শুধু তাঁর নিকট পৌছায়।" (সূরায়ে হজ)

উক্ত আয়াতে শুধু এ জাতীয় নিষ্ফল আনুষ্ঠানিকতাই বারণ করা হয়নি বরং এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে পশু কোরবানী করা কোন মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; বরং খোদাভীতি ও পরহেযগারী অর্জনই হল আসল লক্ষ্য।

---

১. কোরআন পাকে "جناح" শব্দ ব্যবহার করেছেন, তার সাধারণ অর্থ ঃ অসুবিধা ও ক্ষতি সুতরাং এরূপ হবে, "সাফা ও মারওয়ার তওয়াফে কোন অসুবিধা নেই।" অবশ্য جناح لاওয়াজিব ও মোস্তাহাবের অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

২. তাফসীরে বাইযাবী (এ প্রথা ইহুদীদের থেকে অনুকরণ)।

হজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জাহেলিয়াতের আরবরা যে সমস্ত কুসংস্কার ঢুকিয়ে দিয়েছিল তন্মধ্যে মক্কার অধিবাসী কোরাইশরা হজের সর্বপ্রধান অনুষ্ঠান আরাফাতে অবস্থান করতে যাওয়া কৌলীন্যের পরিপন্থী বলে মনে করত। আরবের সমস্ত লোক যখন আরাফাতে গিয়ে সমবেত হত, তখন তারা মুযদালেফা পর্যন্ত গিয়ে অবস্থান করত। বাকি আরববাসীরা আরাফাতের ময়দান থেকে মুযদালেফা পর্যন্ত ও মিনায় আসত। যেহেতু ইসলামের প্রধান মূলনীতি হল, সার্বজনীন সমতা এবং এবাদতের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার কৌলীন্যবোধের উৎখাত, তাই এ কুসংস্কারের মূলেও আঘাত করে আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ[১]

"অতঃপর তোমরা যখন আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন "মাশআ'রে-হারাম" (মুযদালেফা)-এর নিকট তাঁরই নির্দেশিত পদ্ধতিতে যিকর করবে। ইতিপূর্বে নিশ্চয়ই তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে। অতঃপর মানুষ যে স্থান থেকে রওয়ানা হয়, তোমরাও সেখান থেকেই রওয়ানা হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করবে। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।" (সূরায়ে বাকারা)

কোরবানীর পশু আল্লাহ্র নামে উৎসর্গীকৃত—এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা এ সমস্ত পশুর উপর কোনপ্রকার বোঝা চাপানো অবৈধ মনে করত। দূরদূরান্ত থেকে হজের সফরে আগত লোকেরা যে সমস্ত উট কোরবানীর জন্যে সঙ্গে আনত, সেগুলোর সঙ্গে সঙ্গে তারাও পায়ে হেঁটে আসত। পথকষ্টে শ্রান্ত হয়েও কোরবানীর উটে আরোহণ করা বৈধ মনে করত না। ইসলামী যুগ শুরু হওয়ার পরও অনেকের এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল। একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দেখলেন, এক ব্যক্তির সঙ্গে কোরবানীর উট থাকা সত্ত্বেও সে পায়ে হেঁটেই চলছে। তিনি তাকে বললেন, "আরোহণ কর।", সে বলল, "এটি কোরবানীর উট।" তিনি দ্বিতীয়বার বললেন। সেও পূর্ববৎ আপত্তি করল। শেষবার তিনি ধমক দিয়ে বললেন, "বস।"[২]

আরবরা হজ আদায় করার এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল, যাকে 'হজে মুসমেত' বলা হত। অর্থাৎ, হজ আদায়কারী ব্যক্তি হজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কারও সঙ্গে কথা বলত না। ইসলাম এমন অস্বাভাবিক ও সাধ্যাতীত কষ্টকর অনুষ্ঠানাদি নিষিদ্ধ করে। বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) আখমাছ-এর অধিবাসী যয়নাব নাম্নী এক স্ত্রীলোককে দেখতে পেলেন যে সে কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। তিনি জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে সে যবান বন্ধ অবস্থায় হজ আদায় করার নিয়ত করেছে। হযরত আবু বকর (রাঃ)

---

১. সহীহ্ বোখারী, ১ম খণ্ড হজ অধ্যায়, ২২৬ পৃষ্ঠা।
২. বোখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, হজের অধ্যায়।

তাকে বললেন, হজের এ রূপ রীতিসিদ্ধ নয়; এটা অন্ধকার যুগের একটি কুসংস্কার মাত্র।[১]

সর্বাপেক্ষা জঘন্য কুসংস্কার বাসা বেঁধেছিল কাবা শরীফ তওয়াফের অনুষ্ঠানে। একমাত্র কোরাইশরা ব্যতীত অবশিষ্ট আরবের নারী-পুরুষ সবাই সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করত। হরম শরীফের সীমানায় এসে সবাই নিজ নিজ কাপড় খুলে ফেলত এবং কোরাইশদের নিকট থেকে একখণ্ড কাপড় ধার করে নিত। যে সমস্ত নারী-পুরুষ কাপড় ধার পেত না, তারা সম্পূর্ণ উলঙ্গাবস্থায় কাবাঘরের চতুর্দিকে ঘুরত এবং এ কবিতা পাঠ করত ঃ

"আজ তার কিছু অংশ অথবা পূর্ণাংশ প্রকাশ পাবে, তার যে অংশ প্রকাশ পাবে তা আমি বৈধ (ভোগ) করব না।"

এ কুৎসিত প্রথা উচ্ছেদ করার জন্য এ আয়াত নাযিল হল ঃ[২]

"হে আদম সন্তানগণ! তোমরা প্রত্যেকে মসজিদে পোশাক পরে আস।" (সূরায়ে আ'রাফ)

উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর মহানবী (সাঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-কে পাঠালেন তিনি ঠিক হজের মওসুমে ঘোষণা করলেন, কেউ উলঙ্গ হয়ে হজ করতে পারবে না।[৩]

লেনদেন

যে ক্রমবিকাশের ধারায় শরীয়ত পূর্ণতা-প্রাপ্ত হয়েছিল, তন্মধ্যে উত্তরাধিকার আইন, বিবাহ, তালাক, কেসাস বা রক্তঋণ পরিশোধ ও অপরাধের শাস্তিবিধান প্রভৃতির নির্দেশ সংবলিত আয়াত অনেক পরে নাযিল হয়। কারণ, এ সমস্ত আইন-কানুন প্রয়োগ করার জন্য এমন একটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজন ছিল, যা বদর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের আওতাভুক্ত ছিল না। বদর যুদ্ধের পরই ইসলামের রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। তাই হিজরতের প্রথম ও দ্বিতীয় বছর থেকে এ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী নাযিল হতে শুরু হয়।

এ সময়ে অবতীর্ণ নির্দেশাবলীর মধ্যে ছিল কেবলা পরিবর্তন, রোযা ফরয হওয়া, যাকাৎ-ফেতরা ঈদের নামায ও কোরবানী। হিজরী তৃতীয় সন থেকে যখন ইসলামী সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং লেনদেন বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখনই উত্তরাধিকার আইন সংবলিত কোরআনের আয়াত নাযিল হয়।

---

১. বোখারী, ১ম খণ্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা।
২. বিস্তারিত বিবরণ এবং আয়াতের শানে নুযূল নাসায়ী শরীফ হজের আচার-অনুষ্ঠান অধ্যায়।
৩. সহীহ্ মুসলিম, সহীহ্ বোখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে " উলঙ্গাবস্থায় কাবা তওয়াফ করা যাবে না।" পরিচ্ছেদ।

উত্তরাধিকার আইন ঃ মুসলমানগণ প্রথমাবস্থায় যখন মদীনায় আসেন তখন তাঁদের অবস্থা এই ছিল যে পিতা মুসলমান, পুত্র কাফের, এক ভাই কাফের অপর ভাই মুসলমান। এমতাবস্থায় আত্মীয়স্বজনের মধ্যে উত্তরাধিকার আইন প্রয়োগ করা সম্ভব ছিল না। তাই মহানবী (সাঃ) যখন মদীনায় পদার্পণ করলেন তখন তিনি মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করলেন। ফলে, একজন আনসার মৃত্যুবরণ করলে তাঁর মুহাজির ভাই তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতেন।[১]

আরবে প্রাক-ইসলামী যুগেও এ প্রথা প্রচলিত ছিল যে দুজন পরস্পরে এ মর্মে চুক্তি হত যে তাদের একজন মৃত্যুবরণ করলে অপরজন তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। এ চুক্তিবলে একজনের মৃত্যু হলে অপরজন তার (মৃতের) সম্পত্তির ওয়ারিশ হত। কিন্তু হিজরী তৃতীয় সনে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত এ প্রথাকে বাতিল ঘোষণা করে ঃ

"আত্মীয়-স্বজনেরা একে অপর অপেক্ষা উত্তম।" - (সূরায়ে আন্‌ফাল)

ফলে, ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের মাধ্যমে উত্তরাধিকারী হওয়ার প্রথা রহিত হয়ে তদস্থলে রক্ত-সম্পর্ক এবং আত্মীয়তাসূত্রে উত্তরাধিকারী হওয়া নির্ধারিত হল।

উত্তরাধিকার আইনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কোরআনে অসীয়তের প্রথা জারি ছিল। অর্থাৎ, যে কেউ মৃত্যুকালে এরূপ অসীয়ত করত যে আমার মৃত্যুর পর অমুক এ অংশ পাবে, অমুক এত অংশ পাবে। মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি উক্ত অসীয়ত মোতাবেক বন্টন করা হত। এরূপ অসীয়ত করে যাওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয ছিল। যথা ঃ

"হে মুসলমানগণ! তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যে তোমাদের কারও যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং তার কিছু সম্পত্তি থাকে, তাহলে সে মাতা-পিতা এবং আত্মীয়স্বজনের জন্য উত্তম প্রথায় অসীয়ত করে যাবে ; এটা খোদা-ভীরুদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।"(সূরায়ে বাকারা)

যারা সফরে যেত তাদের জন্য সাক্ষী এবং সাক্ষ্যের কানুন কোরআনে নির্ধারিত করা হল। সাক্ষ্য গোপন করা অথবা পরিবর্তন করা আইনত অন্যায় ছিল। সূরায়ে বাকারা ও সূরায়ে মায়েদায় এ সম্পর্কিত পূর্ণ বিবরণ বিধৃত হয়েছে। বদর যুদ্ধের পর মুসলমানদের সংখ্যায় যথেষ্ট উন্নতি হতে থাকে। গোত্রের পর গোত্র ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। তাই উত্তরাধিকার ও বন্টনের জন্য বিশেষ আইনের প্রয়োজন দেখা দিল। অসীয়ত প্রথা বলবৎ থাকাকালে আকস্মিক মৃত্যুতে

---

১. এটা মুফাস্‌সিরগণের মত। কিন্তু সহীহ্‌ বোখারী ইত্যাদিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে এ আদেশ নিম্নের আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে – وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا ।الاية

নানাপ্রকার জটিলতার মোকাবিলা করতে হত। ত্যাজ্য সম্পত্তি সুষ্ঠুভাবে বন্টন করা সম্ভব হত না। উদাহরণস্বরূপ, জেহাদে শত শত মুসলমান অংশগ্রহণ করতেন। এমতাবস্থায় কে জানে কার মৃত্যু আগে আসবে? এ পরিস্থিতিতে অসীয়ত না করে যাওয়ার ফলে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যার ক্ষমতা বেশি, সে-ই সমস্ত সম্পত্তি দখল করে বসত। ওহুদের যুদ্ধে এমনি সমস্যার সৃষ্টি হল। সা'আদ ইবনে রবী একজন সম্পদশালী সাহাবী ছিলেন। তিনি এ যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর স্ত্রী মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে এসে নিবেদন করেন যে "সা'আদ আপনার সামনেই শহীদ হয়েছেন। তিনি দুটি মেয়ে রেখে গেছেন, কিন্তু সা'আদের ভাই তার সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে।" মহানবী (সাঃ) বললেন, "আল্লাহ্ মীমাংসা করবেন।" তারপর (খুব সম্ভব চতুর্থ হিজরীতে) এ আয়াত অবতীর্ণ হল, যাতে উত্তরাধিকার সম্পর্কিত যাবতীয় আইন বর্ণনা করা হয়েছে। যথা ঃ [১]

'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন যে পুরুষ সন্তান দু'মেয়ের সমান অংশ পাবে।......।"

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মহানবী (সাঃ) সা'আদের ভাইকে ডেকে বললেন, "সা'আদের পরিত্যক্ত সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ তার মেয়েদেরকে এবং এক-অষ্টমাংশ তার স্ত্রীকে দিয়ে দাও; তারপর যা বাকি থাকবে তা তোমাদের অংশ।"

প্রাচীন আরবে নারীরা কোনরূপ সম্পত্তির অধিকার পেত না। তাদের ধারণায় যারা তরবারি ধরতে জানে না, উত্তরাধিকারী স্বত্বে তাদের অংশ থাকার প্রশ্নই আসত না। দুনিয়ার অন্যান্য প্রায় প্রত্যেক জাতির মধ্যেও এই একই প্রথা বিদ্যমান ছিল। পবিত্র কোরআনই সর্বপ্রথম নারী জাতিকে পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে আইনসঙ্গত উত্তরাধিকার দান করল। হযরত সা'আদের স্ত্রী-কন্যাগণই সম্ভবত এ পৃথিবীর প্রথম ভাগ্যবান নারী।

---

১. উত্তরাধিকার আইনে শানে-নুযূল সম্বন্ধে হাদীসে তিন প্রকারের ঘটনা বর্ণিত আছে। (ক) দশম হিজরীতে হযরত জাবের (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়লে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ রেওয়ায়েত সেহাহ্‌সিত্তার প্রত্যেক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। কিন্তু এ বর্ণনায় বর্ণনাকারীদের একটু অমনোযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। কেননা, উত্তরাধিকার আইন দশম হিজরীর আগেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। দ্বিতীয়ত, তখন পর্যন্তও হযরত জাবের (রাঃ) অপুত্রক ছিলেন। সুতরাং এটাই বিশুদ্ধ হবে যে হযরত জাবেরের উত্তরাধিকার আইনের একটি বিশেষ ধরন অর্থাৎ অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুবরণ সম্পর্কিত সহীহ মুসলিমের (ফাযায়েয অধ্যায়ে) অন্যান্য রেওয়ায়েতে তা বর্ণিত হয়েছে। (খ) দ্বিতীয় শানে নুযুলে এরূপ বর্ণনা করা হয় যে হাস্‌মান (রাঃ)-এর ভাই আবদুর রহমান (রাঃ)-এর স্ত্রী উম্মে বাজ্জার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। তাবারী প্রমুখ এমনি রেওয়ায়েত করেছেন। যদিও দুর্বল তবুও এটা সম্ভব যে সা'দ ইবনে রবী' ব্যতীত এমন আরো ঘটনার উদ্ভব হয়ে থাকবে। (গ) তৃতীয় শানে নুযুল এ সা'দ ইবনে রবীর-ই ঘটনা যা আবু দাউদ, তিরমিযী ও মুস্তাদরাক হাকেমে উল্লেখ আছে।

অসীয়ত ঃ উত্তরাধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পরও অসীয়তের অনুমতি ছিল। কিন্তু যেহেতু এর দ্বারা ওয়ারিসদের অধিকার খর্ব হওয়ার আশংকা ছিল তাই অসীয়তের সীমা নির্ধারণ আবশ্যক ছিল। দশম হিজরীতে হযরত সা'আদ (আদের পিতা) রুগ্ন হয়ে পড়েন। মহানবী (সাঃ) তাঁকে দেখতে গেলে তিনি বললেন, "আমার মৃত্যু নিকটবর্তী। আমার একটি মাত্র মেয়ে, তাই আমি চাই যে দুই-তৃতীয়াংশ সম্পদ তাকে দান করে যাব।" মহানবী (সাঃ) এমন করার অনুমতি দিলেন না। তখন তিনি বললেন, "অর্ধেক"? হুযুর (সাঃ) তাও অনুমোদন করলেন না। অতঃপর সাহাবী বললেন, "এক-তৃতীয়াংশ?" জবাবে হুযুর (সাঃ) বললেন, এক-তৃতীয়াংশই যথেষ্ট। উত্তরাধিকারিগণকে সচ্ছল রেখে মরা, ভিক্ষুক করে যাওয়ার চাইতে উত্তম।"[১] এ ঘটনার পর থেকে এক-তৃতীয়াংশের বেশি অসীয়ত করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

ওয়াক্‌ফ ঃ ওয়াক্‌ফ ইসলামের একটি মহান ব্যবস্থা। ইসলাম এ ব্যবস্থাটিকে যতটুকু পরিষ্কার করেছে অন্য কোন ধর্মের আইনকানুনে তার লেশমাত্রও পাওয়া যায় না। তাই শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা" গ্রন্থে দাবি করেছেন যে ইসলাম ওয়াক্‌ফ-নীতির প্রবর্তক। ইসলামে ওয়াক্‌ফের ইতিহাস অতি প্রাচীন। মহানবী (সাঃ) হিজরতের প্রথম বছরই মদীনায় মসজিদে নববীর ভিত্তি স্থাপন করলেন। জমিটুকু ছিল দুজন এতীমের মালিকানাধীন। তিনি জমির মূল্য দিতে চাইলে তারা বলল, "আল্লাহ্‌র কসম, আমরা এর মূল্য নেব না। আমরা এর মূল্য একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই পাওয়ার প্রত্যাশা করি।" এটাই ছিল ইসলামের প্রথম ওয়াক্‌ফ এবং অতি সাদাসিধাভাবে এ মহান কাজটি সম্পাদিত হয়েছিল। ইমাম বোখরী এ ঘটনাকে 'অংশীদারী সম্পত্তির ওয়াক্‌ফ হওয়া' সম্পর্কে প্রমাণস্বরূপ উত্থাপন করেছেন। অতঃপর পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ হিজরীতে যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

"যে পর্যন্ত তোমরা যা ভালবাস তা দান না করবে, সে পর্যন্ত (যথার্থ) পুণ্য লাভ করতে পারবে না।"(সূরায়ে আলে-এমরান)

তখন আবু তালহা নামক এক সাহাবী মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে আরয করলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ), 'বাইরুহা' নামক ভূখণ্ডটি আমার অতি প্রিয়। আমি তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করছি এবং তার সওয়াব ও পুরস্কার আল্লাহ্‌র কাছেই প্রার্থনা করি। আপনি যে খাতে ইচ্ছা রেখে দিন।" শেষ পর্যন্ত হুযুর (সাঃ)-এর পরামর্শক্রমে তিনি উক্ত ভূখণ্ডটির আয় নিজের আত্মীয়স্বজনদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিলেন।

১. বোখারী, প্রথম খণ্ড, অসীয়ত অধ্যায়।

এ পর্যন্ত ওয়াক্‌ফের জন্য যে সব শব্দ ব্যবহৃত হত, তা ছিল "তা ব্যক্তিগত অধিকার থেকে আল্লাহ্‌র মালিকানায় দেয়া হল।" কিন্তু সপ্তম হিজরীতে খায়বর যুদ্ধের পর তার মূল তাৎপর্য ও লক্ষ্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়। খায়বর যুদ্ধে হযরত ওমর (রাঃ)-এর মালিকানায় একখণ্ড জমি এসেছিল। তিনি তা ওয়াক্‌ফ করার বাসনা নিয়ে মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। হুযুর (সাঃ) বললেন ঃ

"যদি ইচ্ছা কর তবে মূল সম্পত্তি অধিকারে রেখে তার আয় সদকা করতে পার।" সেমতে আয়ের অংশ সদকা করার শর্তে সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করার প্রথাও প্রবর্তিত হল।[১] ফলে ওয়াক্‌ফ আইনে এমন একটি ধারা সংযোজিত হল যে

"মূল সম্পত্তি বিক্রি করা যাবে না, দান করাও যাবে না এবং উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করাও যাবে না।"

বিবাহ্ ও তালাক ঃ বিবাহ্ সম্পর্কিত যে সব সংস্কারমূলক নির্দেশাবলী অবতীর্ণ হয়েছে, সেসবের বিস্তারিত বর্ণনা সংস্কার অধ্যায়ে বর্ণিত হবে। এখানে শুধু এতটুকু ব্যক্ত হচ্ছে যে ইসলামপূর্ব যুগে আরবে কত প্রকারের বিবাহ্প্রথা প্রচলিত ছিল। একটিমাত্র নিয়ম ব্যতীত এ সমস্ত বিবাহ্প্রথার সবগুলোই ছিল নানা ছদ্মাবরণে ব্যভিচারেরই নামান্তর। ইসলাম সর্বপ্রথম এ ধরনের সমস্ত বিবাহ্পদ্ধতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। মুতআ' বা নির্ধারিত সময়ের জন্য বিবাহ্ করার প্রথা জাহেলিয়াতের যুগ থেকেই চলে আসছিল। এ প্রথাটি একাধিকবার হারাম ও হালাল হওয়ার পর খায়বরের যুদ্ধের পর সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করা হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যদিও তারপরও এ ধরনের বিয়ের আবশ্যকতা বিদ্যমান ছিল, সেহেতু হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর খেলাফত আমলে মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, "আমি মুতআ'কে হারাম ঘোষণা করছি।" অর্থাৎ, মুতআ'র হারাম হওয়া সম্পর্কে তখনও পর্যন্ত যে অস্পষ্টতা বিদ্যমান ছিল, সুস্পষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে তাই তিনি দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করে দিলেন।

বিয়ে ও তালাক সম্পর্কিত অন্যান্য আহ্কাম— যথা ঃ শরীয়ত অনুযায়ী যাদের বিয়ে করা হারাম তার বর্ণনা, পালক পুত্রের স্ত্রী হারাম না হওয়া, একাধিক বিয়ের সীমা নির্ধারণ, তালাকের সংখ্যা নির্ধারণ, ইদ্দতের সময়ের বর্ণনা, মোহর আবশ্যক হওয়া, যেহার অর্থাৎ, তালাকের এমন একটি ধরন যাতে স্ত্রীকে মুহাররামাতের সঙ্গে তুলনা করা এবং লেআ'ন (অভিসম্পাৎ করা) অর্থাৎ, স্বামী নিজ স্ত্রীর চরিত্রের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা এবং পরস্পর নিজের সত্যবাদিতা এবং প্রতিপক্ষের বক্তব্য মিথ্যা বলে দাবি করা। এ সকল বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা সংশোধন অধ্যায়ে বর্ণিত হবে। এখানে শুধু এতটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট মনে করি যে এ সকল আহ্কাম কোরআন মজীদে উল্লেখ আছে এবং এ সমস্ত নির্দেশের অবতরণ-কাল চতুর্থ থেকে পঞ্চম হিজরী।

১. এ সকল হাদীস বোখারীর ওয়াকফ অধ্যায়ে।

হুদুদ ও তা'যীর

এ জড়জগতে মানুষের জীবনই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। এহেন জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তার যিম্মাদার হল সর্বপ্রকার অপরাধের সঠিক শাস্তির বিধান ও তার সফল প্রয়োগ। ইসলামে এ সম্পর্কিত সমস্ত আইনকানুন হিজরতের কয়েক বছর পর অবতীর্ণ হয়। তবে মানুষের জীবনের মূল্য ও তার মান নির্ধারণ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ মক্কা শরীফেই অবতীর্ণ হয়েছিল। মে'রাজের বর্ণনা ধারার সঙ্গে চরিত্র সংশোধন সম্পর্কিত যেসব আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, নিম্নোক্ত আয়াতটিও তারই অন্তর্ভুক্ত।

"আল্লাহ্ তা'আলা যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, তাকে হত্যা করো না, কিন্তু ন্যায়বিচারে (দোষী প্রমাণিত ব্যক্তিকে হত্যা করতে পার)। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নির্যাতিত হয়ে নিহত হয়েছে, আমি তার উত্তরাধিকারিদের অধিকার দান করেছি। এক্ষেত্রেও তার উচিত, সে যেন হত্যার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে। কেননা, তাকে তো (আইনের মাধ্যমেই) সাহায্য করা হচ্ছে।"— (সূরায়ে বনী ইসরাঈল)

আরবদেশে ইসলামপূর্ব যুগেও খুনের শাস্তি-বিধানের প্রচলন ছিল। ইহুদীরা— যারা আরবের বিশিষ্ট সম্প্রদায় হিসাবে পরিগণিত হত, তাদের নিকটও অপরাধের শাস্তিবিধান সম্পর্কিত তওরাতের নির্দেশাবলী বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আরবে যেহেতু সুনিয়ন্ত্রিত সরকার এবং চারিত্রিক মর্যাদা সম্পর্কিত নীতিমালা সর্বোপরি তা কার্যকর করার মত ব্যক্তিত্বের যথেষ্ট অভাব ছিল, তাই এ সমস্ত বিধানাবলীও কার্যকর ছিল না। মহানবী (সাঃ) মদীনায় পদার্পণ করলে ইহুদীরাও তাদের মোকদ্দমাসমূহ তাঁর খেদমতে পেশ করত। তিনি সাধারণত তওরাতের নির্দেশ মোতাবেক সেসব মোকদ্দমার রায় প্রদান করতেন।

আরবদেশে এক ব্যক্তির খুনের কারণে শত শত গোত্রের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হত। বদর যুদ্ধের পর মুসলমানদের যখন শাসনতান্ত্রিক শক্তি কিছুটা সুদৃঢ় হয়ে উঠল, তখন "কেসাস" বা রক্ত-বিনিময় সম্পর্কিত নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। স্মরণ থাকতে পারে যে মদীনায় বনূ কোরাইযা ও বনূ নাযীর নামক দুটি গোত্র বাস করত। তাদের মধ্যে বনূ নাযীর ছিল মর্যাদাসম্পন্ন গোত্র। সুতরাং কোরাইযা গোত্রের কেউ নাযীর গোত্রের কাউকেও হত্যা করলে বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করেই নিহতের রক্তপণ শোধ করা হত। অপরপক্ষে, বনূ নাযীর গোত্রের কেউ কোন কোরাইযীকে হত্যা করলে তার বিনিময়ে এক শত 'ওসক' খেজুর প্রদান করলেই চলত। মহানবী (সাঃ) মদীনায় আসার পর একটি ঘটনা সংঘটিত হয়। তারা এ মোকদ্দমাটি হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে পেশ করল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরায়ে মায়েদার কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয় ঃ

"তন্মধ্যে আমি তাদের নির্দেশ দিয়েছিলাম যে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং আঘাতের বিনিময়ে আঘাত দ্বারা ক্বেসাস গ্রহণ করবে।" (সূরায়ে মায়েদা)

যদিও এ নির্দেশ ছিল প্রথমত ইহুদীদের জন্য, কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত আয়াতের মাধ্যমে বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে ঃ

"হে মুসলমানগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের প্রতিশোধ গ্রহণের বিধান বিধিবদ্ধ করা হল।" (সূরায়ে বাকারা)

মহাগ্রন্থ আল্-কোরআনের এ আদেশ ন্যায়দণ্ড ও ইনসাফের পাল্লাকে পৃথিবীর বুকে চিরদিনের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। ইহুদীদের মধ্যে রক্তবিনিময়ের আইন ছিল না। তবে মিল্লাতে ইবরাহীমীর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাচীন আরবদের মধ্যে এমন কিছু বিধান বিদ্যমান ছিল। ইসলাম কয়েকটি সংশোধনীসহ তাই প্রচলিত করে দেয়। যথা ঃ

"তার ভাই অর্থাৎ, নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদের পক্ষ থেকে কিছু ক্ষমা করা হলে সদ্ভাবে তার অনুসরণ করবে এবং সুন্দরভাবে তা আদায় করে দেবে।"
(সূরায়ে বাকারা)

তখন পর্যন্ত ইচ্ছাকৃত খুন ও ভুলবশত খুনের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। ষষ্ঠ হিজরীতে জনৈক মুসলমানের হাতে ভুলক্রমে অপর একজন মুসলমান নিহত হন। ঘটনাক্রমে নিহত ব্যক্তি ছিলেন একজন মোহাজের কোরাইশী এবং যার হাতে এ ঘটনা ঘটেছিল তিনি ছিলেন আনসারী। মহানবী (সাঃ) নিহত ব্যক্তির ভাইকে রক্ত বিনিময় দিয়ে রাজী করে নিলেন। অতঃপর সে মুনাফেকী করে উক্ত আনসারীকে খুন করে কোরাইশদের সঙ্গে গিয়ে মিশে গেল। এ ঘটনার ভিত্তিতে ভুলবশত খুন সম্পর্কে কয়েকটি আদেশ অবতীর্ণ হয় ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَاً - وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيْرُ
رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ اِلَّا اَنْ يَّصَّدَّقُوْا - فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ - فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ - وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا - وَمَنْ يَّقْتُلْ
مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ
وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا - (نساء)

"কোন মুসলমানের পক্ষে অপর মুসলমানকে ভুল ব্যতীত খুন করা সম্ভব নয়। কেউ কোন মুসলমানকে ভুলবশত হত্যা করে ফেললে, সে একজন মুসলমান গোলাম আযাদ করবে এবং নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণকে ন্যায্য রক্ত-বিনিময় দেবে। কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয়, তাই উত্তম। আর নিহত ব্যক্তি যদি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও গোত্রের দিক দিয়ে কোন শত্রু গোত্রের সদস্য হয়, তাহলে একটি গোলাম আযাদ করে দেবে। নিহত ব্যক্তি যদি এমন গোত্রের হয়, যাদের সঙ্গে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ, তাহলে তার ওয়ারিসদের সঠিক রক্ত-বিনিময় দেবে এবং একটি মুসলমান গোলাম আযাদ করে দিতে হবে। আর যে এতটা করতে অক্ষম, সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে দু'মাস উপর্যুপরি রোযা রাখবে এবং আল্লাহ্ তাআ'লা অধিক জ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে খুন করে তার প্রতিফল জাহান্নাম, সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার উপর আল্লাহ্র গযব ও অভিসম্পাৎ; আর তার জন্য অত্যন্ত কঠোর আযাব প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।"— (সূরায়ে নেসা)

হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা মতে, খুন ও প্রতিশোধ গ্রহণের নির্দেশাবলীর মধ্যে এটা সর্বশেষ নির্দেশ। মক্কা বিজয়ের সময় পূর্ববর্তী সমস্ত রক্তঋণ বাতিল করা হয়। হুযুর (সাঃ) মক্কা বিজয়ের পর ঘোষণা করেন "অন্ধকার যুগের সমস্ত রক্তঋণ আমি পদদলিত করে বাতিল করে দিলাম।"

এরপর স্বেচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তির অনুরূপ ভুলক্রমে অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবিধান সম্পর্কিত নির্দেশ জারি করেন।[১] শহরের বাইরে অবস্থানকারীদের বেলায় রক্ত বিনিময় মূল্য চার'শ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) নির্ধারিত হল।[২] ষষ্ঠ হিজরী পর্যন্ত লুণ্ঠন এবং তস্করবৃত্তির জন্য সুনির্দিষ্ট শাস্তির ব্যবস্থা সংবলিত কোন আইন ছিল না। ষষ্ঠ হিজরীতেই ওকাল ও ওরাইনার কতিপয় লোক মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে। এখানকার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় মহানবী (সাঃ) তাদের শহরের বাইরে চারণভূমি এলাকায় অবস্থান করার ব্যবস্থা করে দিলেন। এক সুযোগে তারা মুসলমান রাখালদের নৃশংসভাবে হত্যা করে তাদের পশুগুলো লুট করে নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তারা ধরা পড়লে মহানবী (সাঃ)-ও তাদের এমনি শাস্তি দিয়ে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। যদিও এ শাস্তিবিধান ছিল তাদের কৃতকর্মের যোগ্য প্রতিশোধ, তবুও এতে কিছুটা নির্দয়ভাব প্রকাশ পায়। সে মতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেল এবং তাদের শাস্তিবিধান সম্পর্কিত নির্দেশ অবতীর্ণ হল।[৩]

১. আবু দাউদ 'রক্ত বিনিময়' অধ্যায়ের 'ইচ্ছার অনুরূপ ভুলের রক্ত বিনিময়' পরিচ্ছেদ।
২. আবু দাউদ— অঙ্গাদির রক্ত বিনিময় অধ্যায়।
৩. আবু দাউদ— শাস্তি অধ্যায়।

"যারা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসূলের (দলের) সঙ্গে লড়াই করে এবং ধরাপৃষ্ঠে নানা বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের প্রাণে বধ করা অথবা ফাঁসি দেয়া যেতে পারে, অথবা বিপরীতভাবে হাত-পা কেটে দেয়া যেতে পারে, অথবা দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেয়া যেতে পারে।" (সূরায়ে মায়েদা)

জীবনের পরেই ধনের স্থান। ইসলামপূর্ব যুগে আরবে চুরির শাস্তি হিসাবে হাত কেটে দেয়ার প্রচলন ছিল। ইসলাম সে শাস্তিই বলবৎ রাখে।

"তস্কর বৃত্তিতে অভিযুক্ত পুরুষ ও নারী উভয়েরই হাত কেটে দাও।" (সূরায়ে মায়েদা) অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় মাখযুম গোত্রের এক মহিলা এমনি অপরাধ করে ধরা পড়ে। যেহেতু মহিলাটি ছিল সম্ভ্রান্ত বংশীয়া, তাই চারদিকে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়ে যায়। একটি মানী গোত্রের মান রক্ষার অজুহাতে কোন রকমে ব্যাপারটা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলল। হযরত ওসামা ইবনে যায়েদ মহানবী (সাঃ)-এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর মাধ্যমে সুপারিশ করা হলে হুযুর (সাঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। লোকদের সমবেত করে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। তাতে বললেন— তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ কারণে ধ্বংস হয়েছে যে তারা নিম্নশ্রেণীর লোকদের উপর আহকাম ঠিকমতই প্রয়োগ করত, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর লোকদের কেউ অন্যায় করলে তাকে কোন না কোন ছলে অব্যাহতি দেয়া হত। আল্লাহ্র কসম, মোহাম্মদ (সাঃ)-এর কন্যা ফাতেমা (রাঃ)-ও যদি চুরি করত, তবে আমি তারও হাত কাটার নির্দেশ দিতাম।" এ ভাষণের এমন প্রভাব হল যে লোকেরা বিনা বাক্যব্যয়ে এ আদেশ কার্যকর করলেন।[১]

আরবদের মধ্যে ব্যভিচারের কোন শাস্তি নির্ধারিত ছিল না! ইহুদীদের মধ্যে 'রজম' অর্থাৎ প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করার শাস্তি নির্ধারিত ছিল। কিন্তু চারিত্রিক দুর্বলতাহেতু তারাও এ নির্দেশ প্রয়োগ করতে পারত না। মদীনার আশপাশে যে-সব ইহুদী বসবাস করত, তারা প্রস্তর নিক্ষেপের পরিবর্তে এ শাস্তির ব্যবস্থা করেছিল যে দোষী ব্যক্তির মুখে কালি মাখিয়ে বাজারের অলি-গলিতে ঘুরিয়ে তার দোষের কথা প্রকাশ করত। মহানবী (সাঃ) মদীনায় আসার পর তারা এক ব্যভিচারীর মোকদ্দমা হুযুর (সাঃ)-এর দরবারে পেশ করল। সম্ভবত এটা তৃতীয় হিজরীর ঘটনা। হুযুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন যে তোমাদের ধর্মে এ ধরনের অপরাধের কিরূপ শাস্তির বিধান রয়েছে? তারা নিজেদের প্রবর্তিত বিধানের কথা বলল। হুযুর (সাঃ) তওরাত আনিয়ে তা পাঠ করালেন। তারা প্রস্তর নিক্ষেপের আয়াতের উপর আঙ্গুল রেখে তা ঢেকে রাখতে চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত ইসলাম

১. সহীহ্ বোখারী, যুদ্ধ বিজয় অধ্যায়।

গ্রহণকারী একজন ইহুদী উক্ত আয়াত শোনালেন। হুযুর (সাঃ) বললেন, "হে আল্লাহ্! এটা তোমার আদেশ, যা এ সকল ব্যক্তিরা মুর্দা করে দিয়েছে। আমিই তোমার এ মৃতপ্রায় আদেশকে প্রথম পুনর্জীবনদান করছি।"[১] সে মতে হুযুর (সাঃ) উক্ত ব্যক্তির প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপের আদেশ দিলেন এবং তাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হল।

পঞ্চম হিজরীতে সূরায়ে নূর অবতীর্ণ হয়। এ সূরায় ব্যভিচারের শাস্তি একশ' বেত্রাঘাত (দোররা) নির্ধারিত করা হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে কোরআন প্রস্তর নিক্ষেপের নির্দেশও বহাল রেখেছে, তার তেলাওয়াত রহিত হয়েছে মাত্র।[২] যাহোক, হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে অবিবাহিত ব্যভিচারীকে একশ' দোররা (বেত্রাঘাত) এবং বিবাহিতকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৩] সপ্তম হিজরীতে একজন মুসলমান ব্যভিচারের অপরাধ করে ফেলেন। অবশ্য দুনিয়ার কোন মানুষ এ ঘটনার কথা জানতে না পারলেও কিন্তু আখেরাতের শাস্তির তুলনায় দুনিয়াতে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুবরণ করার শাস্তি অনেক লঘুদণ্ড এবং দুনিয়াতে শাস্তি গ্রহণ করলে আখেরাতে মুক্তি পাওয়া যাবে, এ ভরসায় তিনি সরাসরি হুযুর (সাঃ)-এর দরবারে হাযির হলেন এবং এ বলে আবেদন জানালেন যে "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি পাপ করেছি। আমাকে পবিত্র করার ব্যবস্থা করুন।" হুযুর (সাঃ)-খোঁজ নিয়ে তার কথিত অপরাধের লক্ষণ পেলেন এবং তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করার দণ্ড প্রদান করলেন।[৪]

মদ হারাম হয় চতুর্থ হিজরীতে। মহানবী (সাঃ)-এর যুগে মদ্যপানের জন্য কোন নির্ধারিত শাস্তি ছিল না। এ অপরাধের জন্য চল্লিশ দোররা পর্যন্ত মারা হয়েছিল বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর খেলাফত আমলে আশি দোররা নির্ধারণ করেছিলেন।[৫]

'কাযফ' অর্থাৎ মহিলাদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপের শাস্তি পঞ্চম হিজরীতে অবতীর্ণ হয়।[৬]

"যারা সতী-সাধ্বী মহিলাদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে এবং এ অপবাদের সপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়, তাদের আশি দোররা মার, অতঃপর কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না।"(সূরা নূর)

১. আবু দাউদ— ইহুদীদের প্রস্তর নিক্ষেপ অধ্যায়।
২. সহীহ্ বোখারী—রজমুল মোহসান অধ্যায়।
৩. প্রত্যের হাদীস গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে।
৪. সপ্তম হিজরীর কথা কোথাও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ নেই। এ সনকে হাদীসবেত্তাগণ এ জন্য নির্ধারণ করেছেন যে এ সময় হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) মদীনায় উপস্থিত ছিলেন এবং প্রমাণ আছে যে তিনি খায়বর বিজয়ের সময় মদীনায় এসেছিলেন।
৫. আবু দাউদ— বার বার মদ্যপান অধ্যায়।
৬. মিথ্যা অপবাদের ঘটনা এ বছর সংঘটিত হয়। আর এ আয়াত ঐ ঘটনা উপলক্ষে অবতীর্ণ হয়। তাই ঘটনার সন পঞ্চম হিজরী নির্ধারণ করা হয়েছে।

মানুষের জীবন, তার সম্পদ ও ইজ্জত— এ তিনটি বিষয়ই দুনিয়ার জীবনে মানুষের নিকট সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। উপরে যে সমস্ত দণ্ডবিধির কথা উল্লেখ করা হল সেগুলো প্রধানত, এ তিন বিষয়ে নিরাপত্তা বিধানের সঙ্গে সংযুক্ত। তিনটি মৌলিক বিষয়ের সঠিক নিরাপত্তা সংবলিত দণ্ডবিধির কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পর মহানবী (সাঃ) দশম হিজরীতে বিদায় হজের সময় হরম শরীফের পবিত্র পরিবেশে পবিত্র মাসের পবিত্র তারিখসমূহে ঘোষণা করলেন, "হে মুসলমানগণ! প্রত্যেক মুসলিমের প্রাণ, ধর্ম ও ইজ্জত এমনি পবিত্র, যেমন পবিত্র এ শহর, এ হরমের বেষ্টনী এবং আজকের এ পবিত্র দিন।"

হালাল হারাম

আরবে কোন খাদ্য বা পানীয় বস্তুতে কোন প্রকার বিধি-নিষেধ ছিল না। কোন জিনিসই হালাল বা হারাম বলে বিবেচিত হত না। যে কোন মৃত জন্তু এমন কি, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত আহার্যরূপে ব্যবহৃত হত। অবশ্য যে সব পশু দেবতার নামে ছেড়ে দেয়া হত, সেগুলো খাওয়া তারা পাপ মনে করত। কোন কোন পশুকে এমন মান্নত করা হত যে এগুলো শুধু পুরুষেরা খেতে পারবে, নারীরা খেতে পারবে না। কোন পশু যদি মৃত বাচ্চা প্রসব করত তাহলে তা পুরুষ ও নারী উভয়ে খেতে পারত। আর জীবিত প্রসব করলে শুধু পুরুষেরা খেত, নারীদের পক্ষে তা স্পর্শ করা বৈধ ছিল না। এমনি আরও অনেক রীতিনীতি তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মক্কায় অবতীর্ণ সূরায়ে আন্-আমে এসব রীতিনীতির বিস্তৃত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ইসলামের অধিকাংশ আহকাম যদিও মদীনায় অবতীর্ণ হয়, কিন্তু হালাল ও হারাম বিষয়ক আহকামসমূহ মক্কাতেই অবতরণ শুরু হয়েছিল। সূরায়ে আন্-আমে মুশরিকদের এসব রীতিনীতি খণ্ডন করার পর নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

"আপনি বলে দিন যে আমার উপর যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে তাতে খাদ্য ভক্ষণকারীর পক্ষে কোন নিষিদ্ধ বস্তু পাইনি, কিন্তু মৃত পশু, প্রবাহিত রক্ত এবং শূকরের মাংস, কেননা সেগুলো অপবিত্র; এগুলো ভক্ষণ করা পাপ। তাছাড়া সে সমস্ত পশু, যা গায়রুল্লাহর নামে বলি দেয়া হয়েছে; কিন্তু যদি কেউ ক্ষুধার তাড়নায় নিরুপায় হয়ে সীমা অতিক্রম না করে তা ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়, তবে নিশ্চয়ই তোমার প্রভু ক্ষমাশীল ও দয়াবান।" (সূরায়ে আন্-আম)

এ নির্দেশ শুনে মুশরিকরা বিস্মিত হয়ে বলাবলি করতে লাগল, যবেহ করা জন্তু এবং মৃত জন্তুতে তফাৎ কোথায়? যবাই করলেও তো তা মারা-ই-যায়। সুতরাং জবাই করা জন্তু খাওয়া হালাল হলে মৃত জানোয়ার হারাম হবে কেন? এ ধারণা খণ্ডন করার জন্যই নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

"তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতের উপর বিশ্বাসী হও, তাহলে যে সমস্ত পশু আল্লাহ্ তা'আলার নাম নিয়ে যবেহ্ করা হয় সেগুলোই ভক্ষণ কর। যা আল্লাহ্ তা'আলার নাম নিয়ে যবেহ করা হয়েছে তা কেন খাবে না? আল্লাহ্ তা'আলা যা হারাম করেছে তা তো পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে।" (সূরায়ে আন-আম)

অতঃপর মক্কা মোয়ায্যমাতেই সূরা নাহ্লের فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ الخ আয়াত অবতীর্ণ হয়। যাতে হালাল হারাম সম্পর্কিত পূর্ববর্তী আয়াতেরই পুনরাবৃত্তি করা হয়। এবং এ চারটি জিনিস— মৃত, প্রবাহিত রক্ত, শূকরও দেবদেবীর নামে প্রাণী হারাম বলে ঘোষণা করা হয়। মদীনায় এসে সূরায়ে বাকারার اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ الخ আয়াতে এ চতুষ্টয়ের হারাম হওয়া সম্পর্কে পুনরায় বর্ণনা করা হয়। আরবে হালাল ও হারামের পার্থক্য বড় একটা ছিল না। পশুসুলভ চরিত্র এবং ব্যাপক মূর্খতা ছাড়াও এর অন্য একটা প্রধান কারণ ছিল— ব্যাপক দরিদ্রতা ও খাদ্যবস্তুর দুষ্প্রাপ্যতা। এ জন্য একই সঙ্গে হালাল-হারামের কঠোর নির্দেশ না দিয়ে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হালাল ও হারামের পরিধি বর্ধিত করা হয়। সাধারণত যে সমস্ত জন্তু অসুস্থ হয়ে মারা যায়, সেগুলোকেই লোকেরা মৃত মনে করত। সুতরাং অন্য কোন ভাবে মরে গেলে সেগুলোকে লোকেরা মৃত মনে করত না। হিজরতের চার-পাঁচ বছর পর সূরায়ে মায়েদায় মৃতের বিশেষ সংজ্ঞাও নির্ধারণ করে দেয়া হয়। অর্থাৎ, দমবন্ধ হয়ে মৃত, আঘাতে ঘাড় ভেঙে মৃত, উপর থেকে পড়ে মৃত, কোন পশুর শিঙের আঘাতে মৃত, অথবা অন্য কোন হিংস্র পশুতে ছিঁড়ে ফেলায় মৃত, এগুলোর মধ্যেও শুধুমাত্র যা তোমরা যবেহ্ করেছ, তাই হালাল।

সপ্তম হিজরীতে যখন খায়বরের বিজয় ও জায়গীরসমূহ্ মুসলমানদের হাতে আসে, তখন প্রাণীর মধ্যে হালাল ও হারামের পার্থক্য আরও সুস্পষ্ট বর্ণনা করা হল। ঘোষণা করা হল যে আজ থেকে গাধা ও হিংস্র জন্তু এবং থাবাবিশিষ্ট পাখি হারাম। অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর 'তাঈ' নামক গোত্রের কিছু খৃষ্টান ইসলামধর্ম গ্রহণ করল। সিরিয়ার কিছু খৃষ্টানও একই সময় ইসলামধর্মে দীক্ষিত হল। এরা শিকারী কুকুর পুষত এবং কুকুর দ্বারা শিকার করত। ইসলাম গ্রহণের পর তারা জানতে পারল যে মৃত প্রাণী হারাম। তারা মহানবী (সাঃ)-এর নিকট নিজেদের অবস্থা বর্ণনা করলে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

"তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করেছে যে তাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে। আপনি বলে দিন, তোমাদের জন্যে সমস্ত পবিত্র জিনিসই হালাল করা হয়েছে।" (সূরায়ে মায়েদা)

অতঃপর বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হল যে পোষা ও প্রশিক্ষিত শিকারী প্রাণীকে আল্লাহ্র নাম নিয়ে ছেড়ে দিলে সে জন্তুতে ধরে আনা পশু খাওয়া হালাল।[১]

মদ্যপানের নিষিদ্ধতা ঃ বিরুদ্ধবাদীদের ধারণা, ইসলামের প্রসারতার প্রধান কারণ হল, তার অধিকাংশ আহকাম (একাধিক বিবাহ প্রথা ইত্যাদি) ভোগবাদের পরিপোষক ছিল। সুতরাং আরবদের পক্ষে তা গ্রহণ করতে কোন বড় রকমের ত্যাগ স্বীকারের সম্মুখীন হতে হয়নি। বরং ইসলাম তাই বলত, তারা যা নিজেরাই চাইত। এ বিষয় পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মদ্যপান নিষিদ্ধতা বর্ণনা করাই মূল উদ্দেশ্য।

আরবদের নিকট মদ্যপানের চাইতে অধিক প্রিয় আর কোন কিছুই ছিল না। সারাদেশ এ রোগে আক্রান্ত ছিল। আরবের কাব্য-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্যই ছিল মদ্যপান সম্পর্কিত বর্ণনায় ভরপুর। মানবীয় চরিত্রের গ্রহণযোগ্যতার কথা বিবেচনা করে ইসলামের যাবতীয় আহকামই ক্রমান্বয়ে পরিণতি লাভ করেছে। মদ্যপানও ক্রমিক ধারায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। মদীনাতেই মদ্যপানের প্রচলন ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ প্রকাশ্যে মদ্যপান করত। অবশ্য আরবে এমনও পুণ্যবান লোক ছিলেন, যারা মদ্যপান ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং মদ্যপানকে সংযম ও পবিত্রতার অন্তরায় মনে করতেন। এ কদাচারের বিষয়ে ইসলাম কোন নির্দেশ জারি করার পূর্বেই লোকেরা জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করল যে মদ্যপান সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ কি? হযরত ওমর(রাঃ) বললেন ঃ

"হে আল্লাহ্! মদ্যপান সম্পর্কে আমাদেরকে সুষ্ঠু বর্ণনা দান করুন।" অতঃপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

"লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, আপনি বলে দিন, উভয়টিই বড় গোনাহের কাজ, অবশ্য এতে সামান্য উপকারও রয়েছে, কিন্তু তাতে উপকারের চাইতে অপকারের (পাপের) ভাগই বেশি।" (সূরায়ে বাকারা)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও কিছু লোক মদ্যপান করত। একবার এক আনসারী হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফকে দাওয়াত দিলেন। দাওয়াতে অন্যান্য খাবারের সঙ্গে মদও পরিবেশন করা হল। খাওয়ার পর মাগরিবের সময় উপস্থিত হলে হযরত আলী (রাঃ) নামায পড়ালেন। কিন্তু নেশার ঘোরে কেরাআত ঠিক করতে পারলেন না। এ সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করে হযরত ওমর (রাঃ) আবার দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! শরাব সম্পর্কে পরিষ্কার বর্ণনা দান করুন। অতঃপর এ আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

---

১. হাওয়ালার জন্য তফসীরের কেতাবসমূহে উক্ত আয়াতসমূহের শানে নুযূল।

"নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের ধারে-কাছেও যেয়ো না, যে পর্যন্ত না তোমরা যা পড় তা বোঝ।" (সূরায়ে নেসা)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর যখন নামাযের সময় নিকটবর্তী হত, তখন মহানবী (সাঃ)-এর ঘোষণাকারী ঘোষণা করত, কোন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি নামাযে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।[১] কিন্তু যেহেতু সাধারণভাবে হারামের নির্দেশ ছিল না, তাই নামাযের সময় ছাড়া অন্যান্য সময় লোকেরা বিনাদ্বিধায় নেশা পান করত এবং অন্যকেও পান করাত। কিন্তু মদ্যপানের স্বাভাবিক পরিণতি সমাজদেহে ক্ষতের সৃষ্টি করেই যাচ্ছিল। অনেক সময় নেশাগ্রস্ত হয়ে পরস্পর মারামারি হানাহানিরও সৃষ্টি হয়ে যেত।[২] এ অবস্থা দেখে হযরত ওমর(রাঃ) আবারও দোয়া করলেন। পূর্ববর্তী দুটি আয়াতের দ্বারা অবশ্য মদ্যপানের প্রতি অনেকেরই বিতৃষ্ণা জমে গিয়েছিল। এবার চূড়ান্ত নির্দেশ নাযিল হল ঃ[৩]

"হে মুসলমানগণ! নিঃসন্দেহে মদ, জুয়া, জুয়ার তীর প্রভৃতি অপবিত্র এবং শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা থেকে বিরত হও; তাহলেই তোমরা সফলকাম হবে। নিশ্চয়ই শয়তান মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং তোমাদের আল্লাহ্ তা'আলার যিকির ও নামায থেকে গাফেল করে রাখতে চায়; তবুও কি তোমরা ফিরে আসবে না?" (সূরায়ে মায়েদা)

উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর পরিষ্কারভাবে মদ হারাম হয়ে গেল। এ সময় মহানবী (সাঃ) মদীনার অলি-গলিতে ঘোষণা করিয়ে দিলেন যে আজ থেকে মদ হারাম। এতদসত্ত্বেও মদের ব্যবসা, বেচাকেনা প্রচলিত ছিল। অষ্টম হিজরীতে তাও নিষিদ্ধ হল। হুযুর (সাঃ) তখন লোকদেরকে মসজিদে নববীতে একত্রিত করে ঘোষণা করলেন ঃ[৪]

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) মদ, মৃত পশু, শূকর এবং মূর্তির ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।"[৫]

লক্ষ্য করুন, মদ হারাম হওয়ার বিষয় কিভাবে সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে কার্যকরী করা হল। তবুও এটা সুনির্দিষ্ট হয়নি যে এটা কোন্ সময়ের ঘটনা। মোহাদ্দেসীন ও বর্ণনাকারিগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।[৬]

---

১. এ সম্পর্কিত ঘটনা আবু দাউদ কিতাবুল আশ্রুবা অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

২. সহীহ্ মুসলিম— ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৮ 'যিকরু সা'দ ওক্কাস'(রাঃ)।

৩. আবু দাউদে পূর্ণ আয়াত উল্লেখ করা হয়নি।

৪. সহীহ্ বোখারী, মুসলিম 'বাবু তাহরীমে বাইয়িল খুমুরে ওয়াল মাইতাতে ওয়াল আসনাম।'

৫. সহীহ বোখারী, মসলিম 'বাবু তাহরীমে বাইয়িল খুমুরে ওয়াল মাইতাতে ওয়াল আসনাম।'

৬. সীরাতুন নবীর প্রথম খণ্ডে মদ হারাম হওয়া সম্বন্ধে দু'টি তারিখ বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। ২৮৮ পৃঃ ৪র্থ হিজরী এবং ৩৯৭ পৃঃ ৮ম হিজরী লেখা রয়েছে। প্রথমটি সাধারণত ঐতিহাসিকদের মত। দ্বিতীয়টি আল্লামা ইবনে হাজারের গবেষণার ফল। কিন্তু সীরাতুন্নবীর প্রণেতাদের সঠিক অনুসন্ধান এখানে উল্লেখ করা হল; যা প্রায় মোহাদ্দেসীনের মতের অনুরূপ(যা পরে জানা যাবে)।

হাফেয ইবনে হাজার ফতহুল বারীর কিতাবুত্তাফসীর সূরায়ে মায়েদা 'বাবু লাইসা আলাল্লাযীনা আ-মানু' অধ্যায়ে লিখেছেন ঃ

"সাধারণত মনে হচ্ছে যে মক্কা বিজয়ের সময় অষ্টম হিজরীতে মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তার প্রমাণ এই যে ইমাম আহ্মদ (রহঃ) আবদুর রহ্মান ইবনে ওয়াইনার সনদে বর্ণনা করেছেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছি যে মদ বিক্রি করা কি? তখন তিনি বললেন, সক্বীফ অথবা দাওস গোত্রের একজন লোক মহানবী (সাঃ)-এর বন্ধু ছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং এক মশক মদ উপহার দিলেন। এ উপহার দেখে মহানবী (সাঃ) বললেন, তুমি জান না যে মদ আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করে দিয়েছেন?"

আমাদের মতে হাফেয ইবনে হাজারের অনুমান এবং উপরোক্ত ঘটনা থেকে তার স্বপক্ষে দলীল গ্রহণ বিশুদ্ধ নয়। রেওয়ায়েতের দ্বারা শুধু এতটুকু প্রমাণ হয় যে মক্কা বিজয়ের সময় পর্যন্ত এসব লোক মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। কিন্তু তাহলে এ ঘটনার দ্বারা একথা কিভাবে প্রমাণিত হয় যে তখন পর্যন্তও মদ হারাম হওয়া সম্বন্ধে আদেশ অবতীর্ণ হয়নি। এরূপ অনেক আহ্কাম ছিল যেগুলো সম্পর্কে দূরবর্তিগণ অনেক পরে জানতে পেরেছেন।

এতদ্ব্যতীত কোন কোন রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদ হারাম হওয়ায় নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছিল। এটা কখনও সম্ভব নয় যে মদের মত অপবিত্র বস্তু অষ্টম হিজরী পর্যন্ত হালাল থাকবে! আর মহানবী (সাঃ)-এর ওফাতের মাত্র দু'বছর পূর্বে তা হারাম ঘোষণা করা হবে! প্রকৃতপক্ষে মদ হিজরতের তৃতীয় অথবা চতুর্থ সালেই হারাম হয়েছিল।

সুদ হারাম হওয়া সম্পর্কে ঃ আরবদের দমনীয় প্রতিটি রক্তকণার সঙ্গে যে সমস্ত দুর্নীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গিয়েছিল সুদ ছিল তার অন্যতম। এ জন্যই বোধহয় সুদ হারাম হওয়া সম্পর্কিত আয়াতগুলো ক্রমানুপাতে নাযিল হয়।

কোরাইশরা ছিল সাধারণত ব্যবসায়ী। তাদের মধ্যে যারা ধনবান বা বড় ব্যবসায়ী ছিল, তারা গরীব এবং কৃষকদের ভারী সুদের হারে ঋণ দিত। ঋণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত প্রতি বছর চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের টাকা মূলধনের সঙ্গে যোগ হত।[১] ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মহানবী (সাঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাসও অনেক বড় সুদী কারবারের মালিক ছিলেন।[২] মহানবী (সাঃ) মদীনায় আগমনের পর সেখানে ইহুদীদের সৃষ্ট অনেক প্রকারের সুদের রেওয়াজ দেখতে পান— নির্মম অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ করার জন্য সর্বপ্রথম তিনি স্বর্ণ-রৌপ্যের বাকি ক্রয়-বিক্রয়কে হারাম ঘোষণা করলেন।[৩] এর কিছুদিন পরেই দ্বিগুণ চতুর্গুণ সুদ নেয়া হারাম হওয়া সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

---

১. মুয়াত্তা ইমাম মালেক 'সুদ অধ্যায়'।
২. তফসীরে ইবনে জারীর সুদের আয়াত।
৩. সহীহ্ মুসলিম 'সুদ অধ্যায়।'

'হে মুসলমানগণ! দ্বিগুণ-চতুর্গুণ সুদ খেও না,' আল্লাহ্‌র ভয় কর ; তাহলেই কামিয়াব হবে।" (সূরায়ে আলে এমরান)

দ্বিতীয় পর্যায়ে হুযুর (সাঃ) সময়ের ব্যবধানে বস্তুর বিনিময়ে বস্তু আদায় করার প্রথা নিষিদ্ধ করেন।[১] সপ্তম হিজরীতে খায়বর যুদ্ধের সুযোগে মুসলমানগণ ইহুদীদের সঙ্গে লেনদেন শুরু করেন। এ সময় মহানবী (সাঃ) ঘোষণা করলেন যে স্বর্ণকে আশরাফীর (স্বর্ণ মুদ্রার) বিনিময় হার বাড়িয়ে বা কমিয়ে বিক্রি করাও সুদ।[২] সুদ হারাম হওয়া সম্পর্কে বিস্তৃত বিরবণ অষ্টম হিজরীতে অবতীর্ণ হয়। আলে এমরানের পর সূরা বাকারায় সর্বপ্রথম এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

"যারা সুদ খায়, হাশরের দিন তারা এভাবে উত্থিত হবে, যেভাবে জিনগ্রস্ত ব্যক্তি উন্মাদের মত দাঁড়িয়ে থাকে। তা এ জন্য যে তারা বলে, বেচাকেনা এবং সুদ তো একই ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআ'লা বেচাকেনাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং যার নিকট আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নসীহত এসে পৌছায় এবং সে যেন (সুদ থেকে) ফিরে আসে ; সে তাই গ্রহণ করবে যা সে পূর্বে দিয়েছিল।"

সুদখোরদের যুক্তি ছিল এই যে সুদী কারবারও একপ্রকার ব্যবসা। ব্যবসা যখন হালাল, তখন সুদ কেন হারাম হবে? এ প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন প্রসঙ্গে সম্যক আলোচিত হবে। এখানে শুধু সুদ হারাম হওয়ার সময়কাল সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। উপরোক্ত আয়াতে সুদকে একেবারে হারাম ঘোষণা করা হয়নি। এর অল্প কিছুদিন পরই সম্ভবত অষ্টম হিজরীতে নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

"হে মুমেনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তোমরা যদি সত্যিকার মোমিন হও, তবে অবশিষ্ট সুদ ত্যাগ কর, আর যদি তোমরা তা না কর, তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তৈরি হও এবং তোমরা যদি তওবা কর, তবে তোমাদের জন্য মূলধন ফিরিয়ে নেবার অধিকার থাকবে, তাহলে তোমরা অত্যাচারী হবে না ; অত্যাচারিতও হবে না।" (সূরায়ে বাকারা)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর মহানবী (সাঃ) মুসলমানদের মসজিদে নববীতে একত্রিত করে এ নির্দেশ শোনালেন।[৩] নবম হিজরীতে নাজরানবাসীদের সঙ্গে যে সন্ধিপত্র সম্পাদিত হয় তাতে একটি শর্ত এও ছিল যে 'সুদ নিতে পারবে না।'[৪] দশম হিজরীর যিলহজ মাসে বিদায় হজের সময় উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সমগ্র আরবদেশে যত সুদী কারবার ছিল তৎসমুদয়কে হুযুর (সাঃ) বাতিল ঘোষণা করলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে সুদ হারাম হওয়া সম্পর্কিত নির্দেশটি ইসলামী নির্দেশ ধারার সর্বশেষ আয়াত।[৫]

---

১. সেহাহ্-সিত্তা—'ব্যসায় অধ্যায়।'
২. সহীহ্ মুসলিম—'বাবু বাইয়িল কেলাদাহ্ ফিহা খেরজুন।'
৩. সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম—'বাবু তাহ্রীমে বাইয়িল খুমুরে।'
৪. আবু দাউদ—বাবু আখযিল জিয্ইয়াহ্।
৫. সহীহ্ বোখারী— আয়াত وَاتَّقُوا يَوْمًا -

শেষ বছর, বিদায় হজ, নবুয়তের দায়িত্ব সমাধা

(দশম হিজরীর যিলহজ্জ মাস মোতাবেক ফেব্রুয়ারি ৬৩২ খৃঃ)

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ - وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي

دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ - إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (نصر)

"যখন আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য এবং বিজয় এলো এবং লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করতে দেখলেন ; সুতরাং আপনার প্রভুর প্রশংসার তসবীহ্ পাঠ করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী।"— (সূরায়ে নাস্র)

উপরোক্ত সূরার মর্মার্থ অনুধাবন করতে গেলে বাহ্যিকভাবে মনে হবে, এতে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় দানের পরিপ্রেক্ষিতে তসবীহ্ ও ক্ষমাপ্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতে বলা হয়েছে। সাহাবায়ে-কেরামের এক মজলিসে হযরত ওমর (রাঃ) এ সূরার মর্মার্থ জিজ্ঞেস করলে সাহাবিগণ বিভিন্ন উত্তর দান করলেন। শেষে হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তিনি অল্পবয়স্ক হওয়ায় উত্তর দিতে সংকোচবোধ করতেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে উৎসাহ্ দান করলে তিনি বললেন যে এই সূরাতে মহানবী (সাঃ)-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। কেননা ইস্তেগফার বা ক্ষমাপ্রার্থনা মৃত্যুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।[১]

এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর হুযুর (সাঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর বিদায়ের সময় নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছে।[২] সে মতে একটি বৃহত্তম গণসমাবেশের সামনে ইসলামের মৌল নীতিমালাগুলো একত্রিত করে দুনিয়ার সামনে পেশ করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হল। মহানবী (সাঃ) হিজরতের পর থেকে তখন পর্যন্তও হজ পালন করতে পারেননি। কারণ, মক্কার কোরাইশরা দীর্ঘদিন তাঁকে সে সুযোগ দেয়নি। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর সে সুযোগ উপস্থিত হলেও তখনকার অবস্থাধীনে এ কর্তব্য সর্বশেষে আদায় করাই যুক্তিযুক্ত ছিল।[৩]

---

১. সহীহ্ বোখারী—তফসীরে সূরায়ে ইযা জাঁআ।

২. বিখ্যাত তফসীরকার ওয়াহেদী স্বীয় গ্রন্থ 'আসবাবুন্নুযূলে' উল্লেখ করেছেন যে অত্র সূরা হযরতের (সাঃ) ওফাতের দু'বছর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু ইবনে কাইয়্যেম স্বীয় গ্রন্থ 'যাদুল মাআ'দে লিখেছেন যে দশম হিজরীর আইয়্যামে তাশরীকের সময় এ সূরা অবতীর্ণ হয়। এ দ্বিতীয় রেওয়ায়েতটি আসলে বায়হাকী হতে উদ্ধৃত। ইবনে হাজার এবং যারকানীর মতে শেষোক্ত বর্ণনাটির সনদ দুর্বল। সুতরাং ওয়াহেদীর বর্ণনাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়।

৩. সুনানে ইবনে মাজায় আছে (বাবু হাজ্জাতুন নবী (সাঃ)) যে হিজরতের পূর্বে হুযূর (সাঃ) দু'বার হজ করেছিলেন। কোন কোন হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে হুযুর (সাঃ) হিজরতের পর মাত্র একবার হজ করেছেন। (তিরমিযী বাবু কাম হাজ্জান্নাবীয়্যু এবং আবু দাউদ 'ওয়াকতুল এহ্রাম' প্রভৃতি দ্বারা হিজরতের পর হজ বোঝানো হয়েছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী যিলক্বদ মাসে ঘোষণা করা হল যে এবার মহানবী (সাঃ) হজ্জ করতে যাবেন।[১] এ সংবাদ মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল এবং সঙ্গ লাভের গৌরব অর্জনের জন্য সমগ্র আরবের দিকে দিকে সাড়া পড়ে গেল। ২৬শে যিকলদ (শনিবার) হুযুর (সাঃ) গোসল করে জামা-কাপড় পরে নিলেন এবং যোহরের নামাযের পর মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন।[২] উম্মাহাতুল-মু'মেনীনকেও সঙ্গে যেতে নির্দেশ দিলেন। মদীনা থেকে ছ'মাইল দূরে অবস্থিত যুলহুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছে সেখানে রাত্রি যাপন করলেন। দ্বিতীয় দিন পুনরায় গোসল করলেন।[৩] হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজ হাতে হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র শরীরে সুগন্ধি মাখিয়ে দিলেন। অতঃপর মহানবী (সাঃ) দু'রাকাত নামায আদায় করে কাসওয়া নামক উটনীর পিঠে আরোহণ করে এহ্‌রাম বাঁধলেন এবং উচ্চকণ্ঠে পাঠ করতে লাগলেন ঃ

"লাব্বাইকা, আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লা-শারীকালাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান্-নেমাতালাকা ওয়াল মুলক লা-শরীলাকালাকা।"

অর্থাৎ, "আমি হাযির, হে আল্লাহ্! আমি হাযির, হে আল্লাহ্! তোমার কোন শরীক নেই। নিশ্চয় প্রশংসা ও নেয়ামত একমাত্র তোমারই। সার্বভৌমত্ব তোমারই। এতে কেউ শরীক নেই।"

এ হাদীসের রাবী হযরত জাবের বর্ণনা করেন, আমি লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম, আগে-পিছে, ডানে-বামে যতটুকু দৃষ্টি যায়, শুধু মানুষের ঝাঁক দেখা যায়।[৪] মহানবী (সাঃ) 'লাব্বাইকা' বলতেন তখন চারদিক থেকে লাব্বাইকের যে রব উঠত, তার প্রতিধ্বনিতে মাঠঘাট, পাহাড়-পর্বত মুখরিত হয়ে উঠত।

মক্কা বিজয়ের সময় হুযুর (সাঃ) যেসব জায়গায় অবস্থান করেছিলেন লোকেরা বরকতের আশায় সেসব স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। মহানবী (সাঃ) সে সমস্ত মসজিদে নামায আদায় করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। 'সারফ' নামক স্থানে পৌঁছে গোসল করলেন। তার পরবর্তী দিন যিলহজের চার তারিখ রোববার ভোরে মক্কা মুয়ায্যমায় প্রবেশ করলেন। মদীনা থেকে মক্কা পর্যন্ত এ ভ্রমণ নয় দিনে সমাপ্ত হল। হাশেমী গোত্রের শিশুরা হযরতের আগমনবার্তা জানতে পেরে খুশীতে আত্মহারা হয়ে বাইরে ছুটে এল। হুযুর (সাঃ) স্নেহপরবশ হয়ে কাউকেও উটের সামনে আর কাকেও উটের পেছনে তুলে নিলেন।[৫] কাবা দেখা গেলে মহানবী (সাঃ) বলতে লাগলেন, আয় পরওয়ারদেগার! এ ঘরকে আরো ইয্যত ও

১. আবু দাউদে বিদায় হজ্জের ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে।
২. গোসলের আলোচনা তাবাকাতে ইবনে সাআদের 'হজ্জাতুলবেদা' অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে পৃঃ ১৩৪।
৩. সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম।
৪. প্রায় একলাখ সাহাবী শরীক ছিলেন।
৫. নাসায়ী—বাবু এস্তেকবালুল হজ্জ।

সম্মান দাও। অতঃপর কাবাঘর তাওয়াফ করলেন। তাওয়াফ সেরে মাকামে ইব্‌রাহীমে দু'রাকাত নামায পড়লেন এবং এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ

"মাকামে ইব্‌রাহীমকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ কর।" (সূরা বাকারাহ্)

সাফা পাহাড়ে পৌঁছে এ আয়াত পাঠ করলেন. "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত"(সূরা বাকারাহ) সেখান থেকে খানায়ে কাবা দৃষ্টিগোচর হলে এ বাক্যগুলো পাঠ করলেন ঃ

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই জন্য। জীবন-মৃত্যুর মালিক তিনিই এবং তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাহ্‌কে সাহায্যে করেছেন। আর একমাত্র তিনিই সকল আক্রমণকারী শক্তিকে পরাস্ত করেছেন।"[১]

সাফা থেকে নেমে এসে মারওয়ায় পদার্পণ করলেন। এখানেও দোয়া ও তাহ্‌লীল আদায় করলেন। আরবরা হজের মওসুমে ওমরা আদায় করা নাজায়েয মনে করত। সাফা ও মারওয়ার তওয়াফ এবং সায়ী থেকে অবসর হয়ে যাদের সঙ্গে কোরবানীর পশু ছিল না তাদের ওমরা আদায় করে এহ্‌রাম ভেঙে ফেলতে বললেন। কোন কোন সাহাবী অতীতের প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক এহ্‌রাম ভাঙতে আপত্তি জানালেন। মহানবী (সাঃ) বললেন, আমার সঙ্গে যদি কোরবানীর পশু না থাকত, তবে আমিও এমনি করতাম। হযরত আলী (রাঃ)-কে কিছুদিন পূর্বেই ইয়ামনে পাঠানো হয়েছিল। তখন তিনি ইয়ামন দেশীয় হাজীদের কাফেলাসহ্ মক্কায় পদার্পণ করলেন। তাঁর সঙ্গে কোরবানীর পশু ছিল, তাই তিনি এহ্‌রাম ভাঙলেন না। ৮ই যিলহজ বৃহস্পতিবার মহানবী (সাঃ) মুসলমানদের কাফেলাসহ্ মীনায় অবস্থান করলেন। পরবর্তী দিন ৯ই যিলহজ শুক্রবার ফজরের নামায পড়ে মীনা থেকে রওয়ানা হলেন।

কোরাইশদের প্রথা ছিল যে তারা মক্কা থেকে হজের নিয়তে বের হলে আরফার স্থলে হরমের সীমানার অন্তর্ভুক্ত মুযদালেফায় অবস্থান করত। তাদের ধারণা ছিল যে কোরাইশদের পক্ষে হরমের বাইরে গিয়ে হজের আনুষ্ঠানিকতা আদায় করা তাদের বিশেষ সম্মানের পক্ষে হানিকর। কিন্তু যে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের আগমন, তার দৃষ্টিতে এমন কৌলিন্যবোধ ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। তাই আল্লাহ্‌র তরফ হতে নির্দেশ এল ঃ

"অন্যান্য লোকেরা যেখানে অবস্থান করে তোমরাও সেখানে গিয়ে অবস্থান করবে।"[২] (সূরায়ে বাকারাহ্)

সঙ্গে সঙ্গেই হুযুর (সাঃ) এ নির্দেশ দিলেন—[৩]

---

১. আবু দাউদ।

২. সহীহ্ বোখারী—বাবুল ওকুফ বে-আরফা।

৩. আবু দাউদ—মওযাতুল ওকুফ আরফা।

"তোমরা পবিত্র স্থানসমূহে অবস্থান কর ; কেননা, তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের উত্তরাধিকারী।"

অর্থাৎ, আরফাতের ময়দানে হাজীদের অবস্থান হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর স্মৃতিচারণ বিশেষ। তিনিই এ স্থানটিকে এ বিশেষ উদ্দেশে চিহ্নিত করেন। আরফার ময়দানে নামেরা নামক স্থানে একটি কম্বলের তাঁবুতে হুযুর (সাঃ) অবস্থান করলেন। দুপুরের পর মহানবী (সাঃ) (কাসওয়া নামীয়) উটনীর উপর আরোহণ করে জনসমুদ্রের মধ্যে পদার্পণ করলেন এবং উটনীর উপর থেকেই বিদায় হজের সে স্মরণীয় ভাষণ দান করলেন। এ স্মরণীয় দিনটিতেই ইসলাম পূর্ণ মর্যাদা এবং শান-শওকতের সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে। এ দিনই জাহেলী যুগের সমস্ত কুসংস্কার, রীতিনীতি রহিত করে দেয়া হল। মহানবী (সাঃ) ঘোষণা করলেন ঃ

"সতর্ক হও! অন্ধকার যুগের সকল রীতিনীতি আজ আমি পদদলিত করে দিলাম।"[১]

১. এটা এবং এর পরবর্তী বাক্যগুলো মহানবী (সাঃ)-এর সে ভাষণের অংশবিশেষ। (এ বাক্যগুলো কোন হাদীসে একত্রিত নেই। সুতরাং বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত করে এখানে সঙ্কলন করা হয়েছে)। সহীহ্ বোখারী ও সহীহ্ মুসলিম (বাবু হাজ্জাতিন্নাবিয়্যে ওয়া বাবুদ্দিয়াত)। আবু দাউদ (বাবু আশহুরিল হুরুম ওয়া হজ্জাতিন্নাবিয়্যে) ইত্যাদি গ্রন্থে এ ভাষণ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হযরত আবু উমামা (রাঃ) হযরত জাবের (রাঃ), হযরত আবু বাকারা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ থেকে রেওয়ায়েত করা হয়েছে। কোন কোন অংশ এক যেমন فدماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة الخ আর কোন কোন অংশ ভাষায় কিছুটা বিভিন্নতা দেখা যায়। মাগাযী এবং সিয়ার গ্রন্থসমূহে আরও অনেক কথার উল্লেখ আছে। স্থূল কথা এই যে এটি একটি বিস্তৃত ভাষণ ছিল, প্রত্যেক রাবীর—যার যতটুকু স্মরণ ছিল তিনি ততটুকুই রেওয়ায়েত করেছেন। সুতরাং বিভিন্ন স্থান থেকে এ অংশগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে এবং স্থানবিশেষে এর বরাতও দেয়া হয়েছে। ভাষণের বিভিন্ন আনুষঙ্গিক কথাগুলো গ্রন্থপ্রণেতা পরিহার করেছেন। রেওয়ায়েতসমূহে আরও একটি বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। হযরত জাবের (রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) নিজ নিজ রেওয়ায়েত ভাষণের তারিখ ৯ই যিলহজ হযরত আবু বকর হযরত ইবনে আব্বাস অন্য রেওয়ায়েত এবং ভাষণে কোরবানীর দিন অর্থাৎ ১০ই যিলহজ্জ উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আইয়্যামে তাশরীকের ভাষণের কথা উল্লেখ আছে। ইবনে ইসহাক একে ধারাবাহিক ভাষণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ইবনে মাজা, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদে বিদায় হজের কয়েকটি বাক্য বর্ণিত আছে। তাতে পরিষ্কারভাবে একথা উল্লেখ করেছেন। ইবনে মাজা, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদে বিদায় হজের কয়েকটি বাক্য বর্ণিত আছে। তাতে পরিষ্কারভাবে একথা উল্লেখ করা হয়নি যে হুযুর (সাঃ) কোন তারিখের ভাষণে একথাগুলো বলেছিলেন। সেহাহ্-সিত্তা ও মুসনাদ গ্রন্থসমূহের সব রেওয়ায়েত একত্র করলে প্রতীয়মান হয় যে হুযুর (সাঃ) এ হজের সময় তিনবার ভাষণ দান করেছেন। প্রথম ভাষণ ৯ই যিলহজ্জ আরফাতের ময়দানে, ২য় ভাষণ ১০ই যিল-হজ্জ কোরবানীর দিন (মীনায়) এবং ৩য় ভাষণ আইয়্যামে তাশরীকের দিন ১১ অথবা ১২ই যিলহজ্জ তারিখে। এ ভাষণের মধ্যেই অনেকগুলো মৌলিক দিক দিয়ে একত্র একই কথা হয়ত ভাষার অদলবদল করে বলা হয়েছে মাত্র। আর কোন কোন বাক্য স্থান ও কালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যেমন, কোন কোন হাদীসবেত্তাগণ উল্লেখ করেছেন, যেহেতু সম্মেলন খুব বিরাট ছিল এবং এ সম্মেলনে হুযুর (সাঃ) উম্মতের সামনে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাই একটি কথা তিনি একাধিকবারও উচ্চারণ করে থাকলে বিভিন্ন ভাষণে ও ভাষায় কিছুটা পরিবর্তন করে একই কথা উত্তমরূপে বোঝানোর চেষ্টা করা

মানবসভ্যতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছার পথে সর্বাপেক্ষা বড় অন্তরায় হল শ্রেণীবিভেদ। এ বিভেদের প্রাচীর আবহমানকাল থেকেই সকল দেশ, সকল জাতি এবং ধর্মে সযত্নে লালিত হয়ে আসছিল। রাজ-রাজন্যগণ নিজেদের সৃষ্টিকর্তার প্রতিবিম্ব বলে মনে করত।

তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে কোন রকম আলোচনা-সমালোচনা করার কারও অধিকার ছিল না। ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে কেউ ধর্মীয় ব্যাপারে সামান্যতম আলোচনার অধিকার রাখত না। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নিম্নশ্রেণীর লোকদের অস্পৃশ্য মনে করত। ক্রীতদাসের পক্ষে মর্যাদার আসনলাভ করা তো দূরের কথা, মনুষ্যত্বের সাধারণ মর্যাদাটুকুও তারা আশা করতে পারত না। আজ বিদায় হজের দিন এ সব পার্থক্য ও শ্রেণী-মর্যাদা এবং শ্রেণীভেদের প্রাচীর যেন হঠাৎ ধসে পড়ল। মহানবী (সাঃ) জলদগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ

"হে লোকসকল! স্মরণ রেখো, তোমাদের রব এক, তোমাদের (আদি) পিতা এক। হুশিয়ার! কোন অনারবের উপর কোন আরবের প্রাধান্য নেই, তেমনি কোন আরবের উপরও কোন অনারবের প্রাধান্য নেই। কোন শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের প্রাধান্য নেই আর কোন কৃষ্ণাঙ্গেরও শ্বেতাঙ্গের উপর প্রাধান্য নেই। পরস্পরের প্রাধান্যের মাপকাঠি হল একমাত্র খোদাভীতি বা সুকৃতি।"[১]

"প্রত্যেক মুসলিম প্রত্যেক মুসলিমের ভাই।"

"তোমাদের ক্রীতদাস! তোমাদের ক্রীতদাস!! তোমরা যা খাবে তাদেরও তাই খাওয়াবে, তোমরা যা পরবে তাদেরও তাই পরাবে।"— (ইবনে সা'দ)

আরবে কোন গোত্রের কোন ব্যক্তি কারও হাতে খুন হলে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করা গোত্রীয় কর্তব্য হয়ে পড়ত। এমন কি, শত শত বছর অতীত হয়ে গেলেও এ কর্তব্য বহাল থাকত। এভাবে যুদ্ধের এক নিরবচ্ছিন্ন ধারা চলতে থাকত। আরবের মাটি সর্বদা রক্তে রঞ্জিত থাকত। আজ এ প্রাচীন রীতি, আরবের সর্বপ্রধান গৌরব ও গোত্রীয় সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্যরূপে প্রচলিত একটা বর্বর প্রথা চিরতরে ধ্বংস করে দেয়া হল। ঘোষণা করা হল ঃ

"অন্ধকার যুগের সব রক্ত (অর্থাৎ, প্রতিশোধ গ্রহণের রক্ত) বাতিল করা হল। আর সর্বপ্রথম আমি আমার বংশের রবিয়া ইবনে হারেসের রক্তের দাবি বাতিল ঘোষণা করলাম।"[২]

---

১. মুসনাদে ইমাম আহমদে আবু নুযরা নামক তাবেয়ী থেকে তিনি জনৈক সাহাবী থেকে যিনি মহানবী (সাঃ)-কে ভাষণ দিতে শুনেছিলেন তিনি একথাগুলো বর্ণনা করেছেন। (মুন্তাকাল আখ্বার—ইবনে তাইমিয়া, নাইলুল আওতার।)

২. রবীয়া কোরাইশ বংশীয় ছিল। তার রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করা গোত্রীয় কর্তব্য হিসাবে চলে আসছিল। রবিয়া ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মোত্তালেব হযরত (সাঃ)-এর চাচাত ভাই ছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে স্বয়ং তাহার খুনের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু এটা ঠিক নয়, রবীয়া খেলাফতে ফারুকী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং হিজরী ২৩ সালে এন্তেকাল করেন। সঠিক ঘটনা হল এই যে রবিয়ার ইয়াস নামীয় এক পুত্র ছিল, সে বনু সা'দ গোত্রে লালিত-পালিত হচ্ছিল। হোযাইল নামক এক ব্যক্তি তাকে খুন করে ফেলে। আবু দাউদ ও সহীহ্ মুসলিম 'বাবু হজ্জাতুন্নাবিয়্যে' (সাঃ) এবং যারকানী অষ্টম খণ্ডম ২০১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সারা আরবে সুদী ব্যবসায়ের জাল বিস্তৃত ছিল। কিছুসংখ্যক ধনী মহাজনের হাতে আরবের সাধারণ মানুষের অস্থি-মজ্জা পর্যন্ত নিষ্পেষিত হচ্ছিল। দরিদ্র জনগণকে তারা ঋণজালে আবদ্ধ করে এমন দাসে পরিণত করে দিয়েছিল যে সুদখোর ধনী মহাজনদের সামনে কথা বলার মত অবস্থাটাও বলতে গেলে কারো ছিল না।

বিদায় হজের সে স্মরণীয় মুহূর্তে একটিমাত্র ঘোষণার মাধ্যমে শোষণ-নির্যাতনের সে মহাদানবের বিষদাঁত ভেঙে দেয়া হল। মহানবী (সাঃ) ঘোষণা করলেন ঃ

"অন্ধকার যুগের সমস্ত সুদ বাতিল ঘোষণা করা হল। সবার আগে আমাদের গোত্রের আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালিবের সব সুদ আজ আমিই রহিত করে দিলাম।"[১]

জাহেলিয়াতের যুগে আরবদের সমাজে স্ত্রীজাতি অস্থাবর সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হয়ে আসছিল। জুয়ার আসরে পর্যন্ত স্ত্রীকে বাজি রাখার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। হেরে গেলে বাজি রাখা স্ত্রী অবলীলাক্রমে অন্যের হাতে চলে যেত। বিদায় হজের সে মহান দিনে মাতৃজাতির এ সীমাহীন অপমান-নির্যাতনের চির অবসান ঘোষিত হল। সে মহান ঘোষণায় স্ত্রী জাতিকে সমাজের শীর্ষদেশে স্থান করে দেয়া হল। মহানবী (সাঃ) ঘোষণা করলেন ঃ

"স্ত্রীজাতি সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে ভয় কর।"— (বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

"স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনি তোমাদের উপরও তাদের অধিকার রয়েছে।" (তাবারী, ইবনে হিশাম)[২]

আরবে জান ও মালের কোন নিরাপত্তা ছিল না। সুযোগ পেলেই যে কোন লোককে খুন করে তার সর্বস্ব কেড়ে নেয়া ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার। শান্তি ও নিরাপত্তার মহান সে ঐতিহাসিক ভাষণে হুযুর (সাঃ) কঠোরকণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ

"তোমাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ অন্যের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত তেমনি সংরক্ষিত করে দেয়া হচ্ছে, যেমন সংরক্ষিত (হারাম) আজকের এ দিন, এ মাস এবং এ কাবার প্রাঙ্গণ।"[৩]

---

১. মহানবী (সাঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সুদের কারবার করতেন। অনেক লোকের কাছে তাঁর সুদ বাকি ছিল। (সুদের আয়াতের ব্যাখ্যা।

২. এর পর হুযুর (সাঃ) স্বামী-স্ত্রীর অধিকার বর্ণনা করেন।

৩. সহীহ্ বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ।

ইসলামের পূর্বে পৃথিবীতে অনেক ধর্মেরই আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু কোন একটি ধর্মই স্বয়ং ধর্ম প্রচারক কর্তৃক নির্ধারিত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁদের নিকট যেসব উপদেশমালা অবতীর্ণ হয়েছিল মানুষের প্রবৃত্তিগত লালসার শিকার হয়ে তার মূল আবেদন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাই মহান ইসলামের বাণীবাহক মিল্লাতে ইসলামীয়ার প্রতিষ্ঠাতা উম্মতের সামনে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সে সম্ভাবনার দ্বার চিরতরে রুদ্ধ করে দিচ্ছেন। ঘোষণা করা হল ঃ

"আমি তোমাদের কাছে একটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা তা আঁকড়ে থাকবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; তাহল আল্লাহ্ তাআ'লার মহান গ্রন্থ কোরআন।"

অতঃপর মহানবী (সাঃ) কতিপয় মৌলিক আহ্কাম সম্পর্কেও ঘোষণা প্রদান করেন।[১]

إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ -

"আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক অধিকারীকে তার ন্যায্য হিস্যা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। অতএব, কোন উত্তরাধিকারীর জন্য আর অসীয়ত করতে হবে না।"

"সন্তান বিছানার মালিকেরই, ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে প্রস্তরাঘাতের শাস্তি, আর তাদের হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট।"

"যে সন্তান তার পিতা ছাড়া অন্যের ঔরসের দাবি করে এবং যে ক্রীতদাস তার মনিব ছাড়া অন্যের দাস বলে পরিচয় দেয়, তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার অভিসম্পাত।"

"সাবধান! স্ত্রী স্বামীর সম্পদের কোন অংশ তার অনুমতি ছাড়া দান করতে পারবে না। ঋণ পরিশোধ করতে হবে, ধার নিলে তা ফিরিয়ে দিতে হবে ; দানের প্রতিদান দিতে হবে ; যামিন যিম্মাদার হবে।"

এটুকু বলার পর মহানবী (সাঃ) সমবেত লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"তোমাদের আল্লাহ্ তা'আলা হাশরের ময়দানে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন, তখন তোমরা কি উত্তর দেবে?"

---

১. সুনানে ইবনে মাজা অসিয়ত অধ্যায়, তাইয়ালেছে আবু ওমামা বাহেলীর রেওয়ায়েত। আবু দাউদের অসিয়ত অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে আছে। ইবনে সা'দ ও ইবনে ইসহাকও তাঁদের সনদের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে হুযুর (সাঃ) আরফাতের ময়দানে প্রদত্ত ভাষণে উক্ত নির্দেশগুলো প্রদান করেছেন।

সাহাবিগণ আরয করলেন, "আমরা বলব যে আপনি আল্লাহ্ তা'আলার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন এবং আপনার কর্তব্য পালন করেছেন।" জবাব শুনে আল্লাহ্র নবী (সাঃ) আকাশের দিকে মুখ তুলে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলতে লাগলেন ঃ

"হে আল্লাহ্ তুমি সাক্ষী থাক।"— (আবু দাউদ, মুসলিম)

নবুয়তের কর্তব্য সমাপ্ত হওয়ার পর আল্লাহ্র তরফ থেকে চূড়ান্ত ঘোষণা এল ঃ[১]

"আজ তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকেই ধর্মরূপে মনোনীত করলাম।"

দ্বীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হল, ইসলাম আল্লাহ্র মনোনীত মিল্লাত হিসাবে অনুমোদিত হল। দ্বীন-দুনিয়ার শাহান্শাহ্ লক্ষাধিক ভক্ত উম্মতের সামনে এ পরম আনন্দ ও সাফল্যের খবর ঘোষণা করলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! উটের পিঠে যে আসনটিতে বসে সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেণীর মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের এ মহাসনদ ঘোষিত হল—সে আসনটির মূল্য তখন একটি রৌপ্য মুদ্রার সমমানের বেশি ছিল না।[২]

এ ঐতিহাসিক ভাষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহানবী (সাঃ) হযরত বেলালকে আযান দিতে বললেন। অতঃপর যোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করে উটে আরোহণ করে সে পশমের তাঁবুতে ফিরে গেলেন। সেখানেও আরামের ব্যবস্থা ছিল না, বরং দীর্ঘ সময় ধরে কেবলামুখী হয়ে দোয়ায় নিমগ্ন রইলেন। সূর্যাস্ত নিকটবর্তী হলে আরাফাতের ময়দান থেকে প্রস্থানের প্রস্তুতি নিলেন। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)-কে উটের উপর ঠিক পেছনে বসালেন। তিনি উটের বল্গা ধরলেন; অগণিত ভক্তের বিপুল ভিড়ে চারদিকে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। এ অবস্থায় লোকদের ডান হাতে (বোখারীর বর্ণনা মতে)— যষ্টির সাহায্যে ইঙ্গিত করে বলতে লাগলেন ঃ "হে লোক সকল! স্বস্তির সঙ্গে অগ্রসর হও! হে লোক সকল! আরামের সঙ্গে অগ্রসর হও!!"[৩]

পথে একস্থানে নেমে ওযূ করলেন। তখন হযরত উসামা (রাঃ) বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ্! নামাযের সময় সংকীর্ণ হয়ে এসেছে।" হুযুর (সাঃ) উত্তর দিলেন ; নামাযের সুযোগ এগিয়ে আসছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই কাফেলা এসে মুযদালেফায় পৌঁছালে এখানে প্রথম মাগরেবের নামায আদায় করলেন। অতঃপর

---

১. সহীহ্ বোখারী, সহীহ্ মুসলিম ও আবু দাউদ ইত্যাদি, ইবনে সা'দে তা উল্লেখ আছে।
২. তাবাকাতে ইবনে সা'দ ১২৭ পৃঃ, শামায়েলে তিরমিযী ও ইবনে মাজা।
৩. সহীহ্ বোখারী, সহীহ্ মুসলিম ও আবু দাউদ।

লোকেরা নিজ নিজ তাঁবুতে গিয়ে সওয়ারীগুলোকে বসালেন। কিন্তু হাওদা প্রভৃতি সরঞ্জামাদি খুলতে না খুলতেই এশার নামাযের তকবীর দেয়া হল। নামায শেষ করে হুযুর (সাঃ) শুয়ে পড়লেন এবং ভোর পর্যন্ত বিশ্রাম করলেন। প্রাত্যহিক নিয়ম ভঙ্গ করে এ রাত্রে তাহাজ্জুদের জন্য উঠলেন না। মোহাদ্দেসগণ বলেন যে এ একটিমাত্র রাত্রে হুযুর (সাঃ) তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেননি। ভোরে উঠে ফজরের নামায জামাতের সঙ্গে আদায় করেন। জাহেলী যুগের কোরাইশরা সূর্য পূর্ণভাবে উদিত হওয়ার পর মুযদালেফা থেকে ফিরে আসত আর আশপাশের পাহাড়ের টিলাসমূহে সূর্যের কিরণচ্ছটা এসে পড়লে উচ্চকণ্ঠে বলত, "সবীর পর্বত! রৌদ্রে আলোকময় হয়ে যাও।" মহানবী (সাঃ) এ রীতিকে রহিত করার জন্য সূর্যোদয়ের পূর্বেই এখান থেকে রওয়ানা হন[১] এ দিনটি ছিল যিল্‌হজের ১০ তারিখ শনিবার।

এবার উটের উপর সঙ্গে ছিলেন তাঁর চাচাত ভাই ফযল ইবনে আব্বাস (রাঃ)। ডানে বামে লোক এসে হজের মাসায়েল জিজ্ঞেস করলে হুযুর (সাঃ) ত্তর দান করতেন এবং হজের করণীয় কাজসমূহের তালীম দিতেন।[২]

এভাবে ওয়াদীয়ে মুহাসসারের রাস্তা হয়ে হুযুর (সাঃ) জামরার নিকটবর্তী হলেন। শিশু হযরত ইবনে আব্বাসকে বললেন, "কঙ্কর তালাশ করে দাও।" তারপর কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন, লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ [৩]

"সাবধান! দ্বীনের কাজে সীমা লঙ্ঘন করো না, তোমাদের পূর্ববর্তীরা সীমা লঙ ঘন করে ধ্বংস হয়ে গেছে।" সঙ্গে সঙ্গে বলতে থাকলেন ঃ

"হজের মাসায়েল জেনে নাও। হয়ত আমি এরপর আর হজ নাও করতে পারি।"

এখান থেকে অবসর হয়ে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মিনার ময়দানে পদার্পণ করলেন। ডানে-বামে, অগ্রে-পশ্চাতে প্রায় এক লক্ষ মুসলমানের সমাবেশ ছিল। মোহাজেরগণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ডান পার্শ্বে, আনসারগণ বামে এবং মাঝে অন্যান্য মুসলমানদের সারি ছিল। মহানবী (সাঃ) উটের উপরে ছিলেন। উটের বল্গা ছিল হযরত বেলালের হাতে। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) পেছনে পেছনে একটি কাপড় টাঙিয়ে ছায়া করছিলেন। এ অবস্থাতেই হুযুর (সাঃ) উম্মতের এ বিশাল কাফেলার দিকে চেয়ে দেখলেন। বিগত ২৩ বৎসরের নবুওতের কর্তব্য সম্পাদনের কঠোর সাধনাময় জীবন তাঁর মানসপটে ভেসে উঠল। যমীন থেকে আকাশ পর্যন্ত

১. সহীহ বোখারী ও আবু দাউদ।
২. আবু দাউদ।
৩. নাসায়ী।

কবুলিয়ত ও সাফল্যের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। কালের পাতায় পূর্ববর্তী নবীদের প্রচারকার্য সম্পাদনের ইতিহাসের উপর শেষ পয়গম্বরের মোহর স্থাপিত হচ্ছিল। দুনিয়া তার সৃষ্টির লক্ষ লক্ষ বছর পর আজ যেন তার স্বভাব-ধর্মের পরিপূর্ণতার সুসংবাদ সৃষ্টজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ভাষা থেকে শুনতে পাচ্ছিলেন। নতুন দ্বীন ও নতুন জীবনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠা লাভের এ মহালগ্নে মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখে উচ্চারিত হতে লাগল ঃ

ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات ، والارض (رواية ابو بكرة)

"আল্লাহ্ কর্তৃক আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি মুহূর্তে তারা যে বিন্দুতে অবস্থিত ছিল, আজ আবার সে বিন্দুতে এসে পৌছাল।"

হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত এবাদত হজের রীতিনীতি এমন কি—সময় পর্যন্ত নির্ধারিত সময় থেকে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। কারণ এ নির্ধারিত সময়ে খুনাখুনি ছিল নিষিদ্ধ।[১] সুতরাং আরবের রক্তপিপাসু গোত্রগুলো খুনোখুনি ও লুটপাটের সুবিধার্থে সময়ের সীমারেখাও হেরফের করে ফেলত। অতঃপর যাতে আর কখনও পবিত্র মাসে এরূপ অন্যায় হস্তক্ষেপের অবকাশ না থাকে, সে জন্য হুযুর (সাঃ) এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ঘোষণা জারি করলেন ঃ

"বছরে বার মাস; তার চার মাস সম্মানিত; তিনটি মাস পর পর সংযুক্ত যিলকদ, যিলহজ ও মহররম। আর রজব মোযারের মাস, যা জমাদিউল আউয়াল ও শাবান-এর মধ্যে অবস্থিত।"

মানুষের মধ্যে পারস্পরিক হানাহানি, কাটাকাটি, ন্যায়-অন্যায়, বিচার-অবিচার সবকিছুর কেন্দ্র হল ধন, প্রাণ ও মর্যাদা নামক তিনটি বিষয়। এ তিনটি বিষয়ের নিরাপত্তার উপরই যে কোন সুখী-সমৃদ্ধ ও সভ্য সমাজের ভিত্তি গড়ে ওঠে। কিন্তু জাহেলীয়াত যুগে আরবে এ তিনটির একটিও নিরাপদ ছিল না। তাই বিদায় হজের ভাষণে বার বার মহানবী (সাঃ) এ তিনটি বিষয়ের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করে প্রত্যেককে এ ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করার নির্দেশ জারি

---

১. হজের এ মাস সমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার রীতি আরবে অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছিল। জাতি-ধর্ম, গোত্র ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবাই সমভাবে এ মাসগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত। এ সকল মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও খুনাখুনি প্রভৃতি অন্যায় মনে করত। প্রাচীন আরবের কাব্য-সাহিত্যেও এ পবিত্র মাসগুলোর উল্লেখ পাওয়া যায়। রোমের প্রাচীন ইতিহাসেও আরবদের এ বিশ্বাসের কথা উল্লেখ আছে। ৫৪১ খৃঃ রোমকগণ সিরিয়া ও ফিলিস্তিন আক্রমণ করতে চাইল, আরবদের তরফ থেকে প্রতি আক্রমণের আশঙ্কাও ছিল। রোমের সেনাপতি আরবদের আচার-আচরণ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, এ সময় আরবদের পক্ষ থেকে ভয়ের কোন কারণ নেই। কেননা, অতি শীঘ্রই সে দুটি মাস সমাগত, সে মাসসমূহকে আরবরা খুব সম্মান করে, যে সময়ে তারা সাধারণত ধর্ম-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে, এ সময়ের মধ্যে তারা কখনও অস্ত্রধারণ করে না। — নাতায়েজুল আফহাম মাহমুদ পাশা কালবাকী পৃঃ ৩৫ ফ্র্যাঞ্চ এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল এপ্রিল ১৮৪৩ খৃঃ।

করলেন। প্রথম দিনের ভাষণে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ জারি করেও দ্বিতীয় দিনে সম্পূর্ণ নতুন ভাবধারায় পুনরায় প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলেন। লোকদেরকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা জান কি, আজকের এ দিনটি কোন দিন? সাহাবিগণ উত্তর করলেন, "আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই এ বিষয়ে অধিক অবগত।" অতঃপর হুযুর (সাঃ) কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইলেন। সাহাবিগণ ভাবলেন, হয়ত তিনি এ দিনটির অন্য কোন নাম রাখবেন। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন ঃ "আজ কি কোরবানীর সে পবিত্র দিন নয়?" সাহাবিগণ আরয করলেন, "নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!!" এরপর এরশাদ করলেন, "এটা কোন্ মাস?" সাহাবিগণ পূর্বের মতই উত্তর দিলেন। তিনি আবার দীর্ঘসময় চুপ থাকার পর বললেন ঃ "এটা কি যিলহজ্জের মাস নয়?" সাহাবিগণ আরয করলেন, "জী হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!" আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এটা কোন শহর?" সাহাবিগণ আগের মতই উত্তর দিলেন। এবারও বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন ঃ "এটা কি পবিত্র শহর নয়?" সাহাবিগণ উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!" যখন উপস্থিত সাহাবীদের অন্তরে এ ধারণা বদ্ধমূল হল যে আজকের দিন, মাস ও শহর সবই সম্মানিত অর্থাৎ, এ দিনে, এ মাসে এবং এ শহরে যুদ্ধ বা খুনোখুনি কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়, তখন বললেন ঃ

"সুতরাং স্মরণ রেখো! তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান পরস্পরের কাছে ততটুকুই সম্মানিত, যতটুকু এ সম্মানিত আজকের দিন, এ মাস ও এ পবিত্র শহর।"

পরস্পর হানাহানি ও খুন-খারাবীর দ্বারাই জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ সত্য সামনে রেখেই ইসলামী মিল্লাতের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (সাঃ) জলদগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ

"সাবধান! আমার পরে তোমরা পরস্পর রক্তারক্তি করে পথভ্রষ্ট হয়ো না। মনে রেখো, একদিন তোমাদের প্রভুর সমীপে হাযির হতে হবে। তখন তিনি তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।"

জাহেলিয়াতের যুগে অবিচার-অত্যাচারের যে সমস্ত রীতি প্রচলিত ছিল, তার সুদীর্ঘ তালিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ছিল এই যে কোন পরিবার এমন কি গোত্রের কোন এক ব্যক্তি অপরাধ করলে গোটা পরিবার বা গোত্রকেই সে অপরাধে অপরাধী মনে করা হত। প্রকৃত দোষী ব্যক্তি আত্মগোপন করলে পরিবারের যাকেই পাওয়া যেত তাকেই শাস্তি দেয়া হত। ভাইয়ের অপরাধে ভাইকে এবং পিতার অপরাধে পুত্রকে পর্যন্ত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করতে মোটেও দ্বিধাবোধ ছিল না। তখন এহেন একটি অমানবিক প্রথাও অনেক দেশেই আইন হিসাবে স্বীকৃত ছিল।

কিন্তু কোরআন ও অবিচার অনুমোদন করতে পারেনি। তাই সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা হল ঃ

"একের অপরাধের বোঝা অন্যে বহন করবে না।"

বিচারের মূলনীতি হিসাবে হুযুর (সাঃ) সুস্পষ্ট ঘোষণা দান করলেন ঃ

"স্মরণ রেখো, অপরাধের জন্য একমাত্র অপরাধী ব্যক্তিই দায়ী হবে, পিতার অপরাধের জন্য পুত্র এবং পুত্রের অপরাধের জন্য পিতা দায়ী হবে না।"— (ইবনে মাজাহ্-তিরমিযী)

আরবে কোন কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির শোচনীয় অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ ছিল অহঙ্কার ও আত্মগরিমা। প্রত্যেকেই নিজেকে অন্যের চাইতে যোগ্য এবং উত্তম মনে করত। এদের শিরা-উপশিরায় যেন সতত অবাধ্যতার উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত হতে থাকত। কারও আনুগত্য স্বীকার করে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন করাকে তারা আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর বিবেচনা করত।

মানসিকতার এ বিবৃতি চিরতরে রুদ্ধ করার জন্যে হুযুর (সাঃ) ঘোষণা করলেন ঃ

"দেখ! যদি তোমাদের মধ্যে কোন নাম-গোত্রহীন কৃষ্ণকায় গোলামও শাসক নির্বাচিত হয়, আর সে তোমাদের আল্লাহ্র কিতাবের আলোকে পরিচালিত করে, তবে তারই নির্দেশ মান্য করবে এবং অনুগত থাকবে। (সহীহ্ মুসলিম)

তখন পর্যন্ত আরব মরুর প্রতিটি প্রান্তর-জনপদ ইসলামের আলোকস্পর্শে আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। অনাচার সৃষ্টিকারী সকল শক্তি পর্যুদস্ত হয়ে আল্লাহ্র ঘর খানায়ে কাবা চিরদিনের জন্য মিল্লাতে ইব্রাহীমীর কেন্দ্রভূমির মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতেই হুযুর (সাঃ) নিম্নোক্ত নির্দেশের মাধ্যমে পরবর্তী কর্তব্য সম্পর্কে ইশারা করলেন ঃ

"স্মরণ রেখো, ভবিষ্যতে আর কোনদিন এ নগরীতে তার এবাদত হবে এরূপ সম্ভাবনা থেকে শয়তান চিরকালের জন্য নিরাশ হয়ে গেছে। তবে তোমরা এমন কিছু দুষ্কার্যে অবশ্যই জড়িত হবে যা দেখে শয়তান সন্তুষ্ট হতে থাকবে।"

— (ইবনে মাজাহ্-তিরমিযী)

ভাষণের শেষ পর্যায়ে মহানবী(সাঃ) ইসলামের মূল বুনিয়াদ সম্পর্কে পুনরায় বিশেষভাবে তাকিদ দিয়ে ঘোষণা করলেন ঃ

"তোমরা তোমাদের পরওয়ারদেগারের এবাদত করবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রমযান মাসের রোযা রাখবে এবং আমি যে নির্দেশ দিই তা পালন করতে থাকবে। এরই দ্বারা তোমরা তোমাদের পরওয়ারদেগারের জান্নাতে প্রবেশ করবে।"— (মুসনাদে আহমদ, ৫ম খণ্ড, মোসতাদ্রাকে হাকেম ১ম খণ্ড)

এ পর্যন্ত বলার পর হুযুর (সাঃ) প্রশান্ত নয়নে জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ দেখ! আমি কি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নির্দেশ পরিপূর্ণরূপে পৌঁছে দিয়েছি? জনতা সমবেত কণ্ঠে জবাব দিল, নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! আপনি আমাদের নিকট সব কথা পৌঁছে দিয়েছেন।

জনতার জবাব শুনে হুযুর (সাঃ)-এর চোখে-মুখে তৃপ্তির আভাস দেখা দিল। আকাশের দিকে মুখ তুলে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলে উঠলেন ঃ আয় আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাক!!

এ পর্ব শেষ হওয়ার পর তাঁর কণ্ঠ পুনরায় গম্ভীর হয়ে উঠল। সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

— "আমার এ বাণী আজ যারা উপস্থিত আছ তারা, যারা উপস্থিত নেই তাদের কাছে পৌঁছে দেবে।"

ভাষণ সমাপ্ত হল।[১] হুযুর (সাঃ) মমতামাখা দৃষ্টিতে উম্মতের এ বৃহত্তম জামাতকে শেষবারের মত বিদায় দিলেন।[২] তাঁর দারাজ কণ্ঠে 'আলবেদা' শব্দের করুণ কয়টি অক্ষর যেন আর্দ্র হয়ে বেজে উঠল!

এরপর হুযুর (সাঃ) কোরবানীর উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। কোরবানীর স্থান সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করতে গিয়ে এরশাদ করলেন, "কোরবানীর জন্য শুধু মিনাই নির্ধারিত স্থান নয়। বরং মিনা থেকে মক্কা পর্যন্ত প্রত্যেকটি গলিতেই কোরবানী চলতে পারে।"

হুযুর (সাঃ)-এর সঙ্গে একশ' উট ছিল। এগুলো কোরবানীর উদ্দেশেই সঙ্গে করে আনা হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি তিনি নিজের হাতে কোরবানী করে, অবশিষ্টগুলো হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে তুলে দিয়ে নির্দেশ দিলেন, কোরবানীর সমস্ত গোশ্‌ত যেন বন্টন করে দেয়া হয়। আর যারা চামড়া ছাড়ানো এবং গোশ্‌ত কাটা-ছেঁড়ার কাজ করবে তাদের পারিশ্রমিক যেন পৃথকভাবে দান করা হয়।

কোরবানী সমাপ্ত হওয়ার পর হুযুর (সাঃ) হযরত মা'মার ইবনে আবদুল্লাহ্‌কে ডেকে তাঁর হাতে মস্তক মুণ্ডন করালেন। মাথার কিছু পবিত্র চুল স্নেহভরে হযরত আবু তালহা আনসারী ও তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে সুলাইমকে দান করলেন। আশপাশে যে সমস্ত সাহাবী ছিলেন, তাঁদেরকেও কিছু কিছু দান করলেন। অবশিষ্ট চুল তালহার হাতে এক দুটি করে সাহাবিগণের মধ্যে বন্টন করিয়ে দিলেন।

---

১. মনে হয়, ভাষণটি আরও লম্বা ছিল, সহীহ্ মুসলিমের হজ্জ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি আরও অনেক কথা বললেন। সহীহ্ বোখারীর বিদায় হজ্জ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ ভাষণের মধ্যেও দজ্জালের আবির্ভাব সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন ; তবে কোন্ দিনের ভাষণে তা উল্লিখিত হয়েছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

২. সহীহ্ বোখারী মিনার খুৎবা অধ্যায়।

এরপর মক্কা মোয়াযযমায় ফিরে এসে আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ করে যমযমের কিনারায় এসে উপনীত হলেন।

যমযম থেকে পানি তুলে হাজিগণকে পান করানোর দায়িত্ব ছিল হযরত আবদুল মোত্তালিব পরিবারের জিম্মায়। এ সময় তাঁরা পানি তুলে হাজিদের পান করাচ্ছিলেন। হুযুর (সাঃ) এগিয়ে এলেন এবং কর্মরত বনী আবদুল মোত্তালিবকে উদ্দেশ করে বললেন, হে বনী আবদুল মোত্তালিব! যদি আমার ভয় না হত যে তোমাদের হাত থেকে বালতি নিয়ে নিজ হাতে পানি তুলে পান করলে লোকেরাও তোমাদের হাত থেকে বালতি ছিনিয়ে নেবে, তবে আমি নিজ হাতেই পানি তুলে পান করতাম।

হযরত আব্বাস বালতি ভরে সামনে পেশ করলে হুযুর (সাঃ) কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন এবং দাঁড়ানো অবস্থাতেই পানি পান করলেন। অতঃপর পুনরায় মিনায় ফিরে গিয়ে জোহরের নামায আদায় করলেন।[১]

মিনায় অবস্থানকালে দুপুরের কিছু পরে প্রস্তর নিক্ষেপের জন্য চলে যেতেন এবং রসম আদায় করে ফিরে আসতেন।

আবু দাউদের মিনার খুৎবা অধ্যায়ে বর্ণিত এক হাদীসে দেখা যায়, হুযুর (সাঃ) যিলহজ মাসের বার তারিখেও মিনায় একটি খুৎবা দিয়েছিলেন। এ খুৎবাতেও পূর্ববর্তী খুৎবার বক্তব্যই সংক্ষেপে বর্ণনা করেন।

তেরই যিলহজ মঙ্গলবার দুপুরের পর হুযুর (সাঃ) মিনা থেকে রওয়ানা হয়ে 'মাহসাব' নামক প্রান্তরে অবস্থান করেন এবং এখানেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে শেষ রাতের দিকে চলে আসেন এবং শেষবারের মত কাবা তওয়াফ করে ফযরের নামায আদায় করেন। ফযরের পরই হজের কাফেলা স্ব স্ব গৃহাভিমুখে রওয়ানা হয়ে যায়। হুযুর (সাঃ)-ও মোহাজের এবং আনসারদের সঙ্গে নিয়ে মদীনার পথে রওয়ানা হন।

পথে জোহ্‌ফা থেকে তিন মাইল দূরে 'খুম' নামক একটি স্থান রয়েছে। এখানে একটি ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। ক্ষুদ্র জলাশয়কে আরবীতে গাদীর বলা হয়। এ জন্য জায়গাটি সাধারণত গাদীরেখুম নামে পরিচিত। হুযুর (সাঃ) এখানে সঙ্গীয় সমস্ত সাহাবীকে একত্রিত করে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করলেন,— বললেন ঃ

১. বোখারী ও মুসলিম হযরত ইবনে আমর বর্ণিত হাদীসে দেখা যায়, সেদিন হুযুর (সাঃ) জোহরের নামায মিনায় আদায় করেন। অপরদিকে হযরত জাবের বর্ণিত বিদায় হজ্জ সম্পর্কিত সুদীর্ঘ হাদীসটিতে [illegible] যায় যে হুযুর (সাঃ) সেদিন জোহরের নামায মক্কায় আদায় করেন। হযরত আয়েশার [illegible] এ মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়।
মোহাদ্দেসগণ পরস্পর বিরোধী এ বর্ণনার বিভিন্নমুখী পর্যালোচনার পর দু'রকম মত পোষণ করেছেন। আল্লামা ইবনে হাযাম দ্বিতীয় বর্ণনাকে অধিকতর সহীহ্ বলে মত প্রকাশ করেছেন। আল্লামা ইবনে কাইয়েম যা'দুল মা'আদে প্রথম বর্ণনাকে অধিকতর শুদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। আমরা উভয়বিধ দলীল-প্রমাণ যাচাই করে প্রথম বর্ণনাটিকেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেছি।

"লোকসকল! আমিও একজন মানুষ! হতে পারে যে কোন মুহূর্তে আল্লাহ্র ফরমানসহ ফেরেশ্‌তা এসে হাযির হবেন এবং আমাকেও তা কবুল করতেই হবে! আমি তোমাদের মধ্যে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু রেখে যাচ্ছি, তার প্রথমটি হল আল্লাহ্র কিতাব। আল্লাহ্র কিতাব হেদায়াত ও নূরে পরিপূর্ণ। আল্লাহ্র কিতাবকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ধরে রাখবে। আর অপরটি হল আমার আহ্‌লে-বাইত। এদের সম্পর্কে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলবে।"

মুসলিম শরীফের হযরত আলী সম্পর্কিত অধ্যায়ে বর্ণিত এ হাদীসটিতে সর্বশেষ কথাটি তিনবার উল্লিখিত হয়েছে।

নাসায়ী, মুসনাদে আহ্‌মদ, তিরমিযী, তিবরানী, তাবারী প্রমুখের বর্ণনায় বক্তৃতার শেষাংশে হযরত আলীর গুণ বর্ণনা সম্পর্কিত আরও কিছু কথা অতিরিক্ত রয়েছে। তবে এসবগুলোর বর্ণনাতেই নিম্নোক্ত পংক্তিটি দেখা যায় ঃ

"আমাকে যারা ভালবাসে, তাদের পক্ষে আলীকেও ভালবাসা উচিত।" আয় আল্লাহ্! যে আলীর সঙ্গে মহব্বত রাখবে, তুমিও তাকে ভালবেসো। আর যে আলীর সঙ্গে শত্রুতা করবে, তুমিও তার সঙ্গে শত্রুতা করো।"

কি প্রসঙ্গে এ ভাষণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, হাদীসের বর্ণনায় সে সম্পর্কিত বিস্তারিত কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। বোখারী শরীফে আছে, তখন হযরত আলী (রাঃ)-কে ইয়ামন প্রদেশে পাঠানো হয়েছিল। ইয়ামন থেকে তিনি এসে হজ্জে শামিল হয়েছিলেন। ইয়ামনে অবস্থানকালেই কোন এক বিষয়ে কারও কারও সঙ্গে হযরত আলীর মত-পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এদেরই একজন এসে হুযুর (সাঃ)-এর নিকট হযরত আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। অভিযোগ শুনে হুযুর (সাঃ) মন্তব্য করলেন ঃ আলী তো মোটেও সীমালঙ্ঘন করেনি। তার আরও কিছু করার অধিকার ছিল। মনে হয়, এ সম্পর্কিত সন্দেহ-সংশয় দূর করার জন্যেই হুযুর (সাঃ) উপরোক্ত কথাগুলো বলে থাকবেন।

মদীনার নিকটে পৌঁছে যুল-হোলাইফা নামক স্থানে রাত্রি যাপন করলেন। পরদিন প্রত্যুষে কাফেলা পুনরায় এগিয়ে যেতে লাগল এবং সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাক মদীনায় প্রবেশ করলেন। প্রিয় মদীনার গাছপালা ও বাড়িঘর দেখার সঙ্গে হুযুর (সাঃ) ভাব গদগদ কণ্ঠে উচ্চারণ করতে লাগলেন ঃ

"আল্লাহ্ মহান। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। সকল আধিপত্য তাঁরই। তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি সবকিছুর উপরই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।"

"আমরা ফিরে এসেছি। তওবা করে, এবাদতরত অবস্থায়, তাঁরই উদ্দেশে সেজদা নিবেদন করে, পরওয়ারদেগারের প্রশংসাবলী উচ্চারণ করে।

মহান আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাকীই সকল আগ্রাসী শক্তিকে পর্যুদস্ত করেছেন।"[১]

---

১. হাজ্জাতুল বেদা সম্পর্কিত সব বর্ণনাই বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী প্রভৃতি সহীহ হাদীসগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কিতাবের হজ্জ অধ্যায়।

ওফাত

(রবিউল আউয়াল, ১১ হিজরী মে, ৬৩২ সাল)

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ-

"নিশ্চয়ই আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং তাদের জন্যও মৃত্যু অবধারিত।" (সূরায়ে যুমার)

আল্লাহ্র বিধান শরীয়তের পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য যতদিন এ জড়জগতে প্রয়োজন ছিল, ততদিনই মহানবী (সাঃ) দুনিয়াতে অবস্থান করেছেন। মানবজাতির হেদায়েত এবং সংশোধনের পূর্ণতা অর্জিত হওয়ার পর তাঁরও বিদায়ের মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে। কেননা, বিদায় হজের বিপুল জনসমুদ্রে হুযুর (সাঃ) উদাত্ত কণ্ঠে চরিত্র গঠন ও আল্লাহ্র বিধান সম্পর্কিত চূড়ান্ত মূলনীতিগুলো ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। এ স্মরণীয় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ্র তরফ থেকে ঘোষণা এল ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ-

"আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম, আর আমার নেয়ামতরাশির পরিপূর্ণতা দান করলাম।"

সূরা নস্র অবতীর্ণ হওয়ার সময়ই অবশ্য বিশিষ্ট সাহাবিগণ অনুভব করেছিলেন যে মহানবী (সাঃ)-এর বিদায় মুহূর্ত নিকটবর্তী হয়ে এসেছে।[১]

খোদ হুযুর (সাঃ)-ও

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ-

আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী আল্লাহ্র প্রশংসাসূচক তসবীহ্ এবং ইস্তেগফারে বিশেষভাবে বিদায় হজের সময় সমস্ত মুসলমানকে সাক্ষাৎদানে ধন্য করে শেষবারের মত আবেগবিজড়িত কণ্ঠে বিদায় জানালেন।

ওহুদের ময়দানে যাঁরা জীবনদান করে শাহাদাতের অমর জীবনলাভ করেছিলেন, যাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্পাক বলেছেন যে তাঁরা জীবিত, সাফল্যের চরম শিখরে উপনীত হয়ে, আজ দীর্ঘ আট বছর পর হুযুর (সাঃ) জীবনে শেষবারের মত তাঁদেরও সাক্ষাৎদান প্রয়োজন মনে করলেন। হজ থেকে ফিরে তাঁদের কবরপ্রান্তে গমন করলেন এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় তাদের জন্য দোয়া করলেন। তারপর এমনই এক করুণ দৃশ্যের মধ্য দিয়ে সে শহীদানের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন, যেভাবে একজন যাত্রী স্বীয় প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে থাকেন।[২]

১. সহীহ্ বোখারী 'ইযা' জাআ-র তফসীর অধ্যায়।
২. সহীহ্ বোখারী কিতাবুল জানায়েয, সহীহ্ মুসলিম বাবু এসবাতুল হাউজ।

অতঃপর সঙ্গিদের সম্বোধন করে এ মর্মে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণদান করলেনঃ "আমি তোমাদের পূর্বেই হাউজ কাওসারের প্রান্তে গিয়ে হাযির হচ্ছি। এর পরিধি এতদূর পর্যন্ত সুবিস্তৃত হবে, আয়েলা থেকে জোহ্ফার দূরত্ব যতটুকু।

"দেখ! আমাকে দুনিয়ার সকল ভাণ্ডারের চাবিকাঠি দান করা হয়েছে। আমি ভয় করি না যে আমার পর তোমরা পুনরায় শেরেকী করতে শুরু করবে, তবে ভয় হয় যে পার্থিব সম্পদের মোহে লিপ্ত হয়ে পরস্পর মারামারি কাটাকাটি শুরু করে না দাও। এমনটা করলে পূর্ববর্তী উম্মতগুলো যেমন ধ্বংস হয়ে গেছে, তোমরাও তেমনি ধ্বংস হয়ে যাবে।"

বর্ণনাকারী বলেন, আমার জানামতে এ ভাষণটিই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শেষ ভাষণ।

মাগাযী বা যুদ্ধাভিযান সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহে দেখা যায়, ইতিপূর্বে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসাকে সিরিয়া সীমান্তবর্তী আরবগণ হত্যা করেছিল। এ অন্যায় হত্যার কেসাস গ্রহণ করার জন্য হুযুর (সাঃ) ফরমান জারি করলেন এবং শেষ বিদায়ের একদিন পূর্বে উসামা ইবনে যায়েদকে সেনাপতি নিযুক্ত করে এক অভিযান প্রেরণ করার নির্দেশ দিলেন।[১]

একাদশ হিজরী সনের ১৮ অথবা ১৯শে সফর মধ্য রাত্রিতে হুযুর (সাঃ) মুসলিম জনগণের সাধারণ কবরস্তান 'জান্নাতুল বাকী'তে গমন করেন।[২] সেখান থেকে ফেরার পরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। দিনটি ছিল বুধবার এবং এ দিন

১. ওয়াকেদী এবং ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় দেখা যায়, এ অভিযানে নেতৃত্ব দান করার জন্য হুযুর (সাঃ) পর্যায়ক্রমে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু এ সমস্ত বর্ণনা ভিত্তিহীন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া এ বর্ণনার বিশুদ্ধতা অস্বীকার করে বলেছেন ঃ হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা না গেলেও হযরত আবু বকরকে (রাঃ) যে এরূপ কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি তা সন্দেহাতীতভাবে বলা চলে। কেননা, অসুস্থতা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হুযুর (সাঃ) তাঁকে নামাযের ইমামতের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। যুক্তিস্থলে যদি মেনেও নেয়া হয় যে প্রথমত, হয়ত তাঁকে এরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তবে পরে অতি অবশ্যই তা প্রত্যাহার করা হয়।

২. হুযুর (সাঃ)-এর অসুস্থতার সূচনা সময়কাল এবং ওফাতের দিন-তারিখ সম্পর্কিত বিভিন্ন বর্ণনায় কিছুটা মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সব ধরনের বর্ণনায় যে কয়টি তথ্য সম্পর্কে সবাই ঐকমত্যে পৌঁছেছেন সে বিষয়গুলো তুলে ধরা যুক্তিযুক্ত মনে করি। বিষয়গুলো হচ্ছে (ক) ওফাতের সন একাদশ হিজরী। (খ) মাসটি ছিল রবিউল আউয়াল। (গ) সময়টি ছিল মাসের প্রথম থেকে ১২ তারিখের মধ্যে কোন একদিন। (ঘ) দিনটি ছিল সোমবার। (সহীহ্ বোখারী ওফাত অধ্যায়)
অধিকাংশ বর্ণনার দ্বারা এ তথ্য প্রমাণিত হয়েছে যে হুযুর (সাঃ) সর্বমোট ১৩ দিন অসুস্থ ছিলেন। সে মতে যদি এ তথ্য সম্পর্কে ঐকমত্যে পৌঁছান যায় যে ওফাতের তারিখ ছিল কোনটি, তবেই রোগের সূচনা সম্পর্কে সঠিক তথ্যে পৌঁছানো যায়।
হযরত আয়েশার বর্ণনায় দেখা যায় যে হুযুর (সাঃ) এক সোমবারে অসুস্থাবস্থায় তাঁর ঘরে আগমন করেন এবং মোট আট দিন অবস্থান করে পরবর্তী সোমবার ইন্তেকাল করেন।
উপরোক্ত বর্ণনাকে শুদ্ধ ধরে অনুমান করা যায় যে রোগের প্রাথমিক পাঁচ দিন তিনি হয়ত অন্যান্য বিবিগণের ঘরে কাটিয়ে থাকবেন। এ হিসাবে রোগের সূচনা হয়েছিল বুধবার থেকে।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হযরত ময়মুনার (রাঃ) ঘরে হুযুর (সাঃ) অবস্থান করছিলেন। এরপরও পাঁচ দিন অসুস্থ অবস্থাতেই পালাক্রমে এক একদিন এক এক বিবির ঘরে অবস্থান করতে

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

ইন্তেকালের তারিখ নির্ণয়েও বর্ণনাকারীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। অনেক অনুসন্ধান করেও আমি হাদীসের কোন কিতাবেই ইন্তেকালের তারিখ সম্পর্কিত কোন বর্ণনা খুঁজে পাইনি। সীরাত লেখকদের যে সমস্ত বর্ণনা পাওয়া যায় তার মধ্যে তিনটি তারিখের উল্লেখ রয়েছে। তারিখগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ১লা রবিউল আউয়াল, ২রা রবিউল আউয়াল এবং ১২ই রবিউল আউয়াল।
২ তারিখের বর্ণনাটি হিশাম ইবনে মোহাম্মদ ইবনে সায়েব কালবীর মাধ্যমে প্রাপ্ত।— তাবারী ১৮০ পৃঃদ্রঃ।
প্রাচীন ইতিহাসবিদ ইয়াকুবী ও মাসউদী প্রমুখ এ বর্ণনাটিকেই শুদ্ধ বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মোহাদ্দেসগণের নিকট উপরোক্ত বর্ণনাকারী মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নন।
ওয়াকেদী থেকে ইবনে সা'আদ এবং তাবারী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, ওয়াকেদী অনেক যাচাই-বাছাই করে যে বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন তা হল, ইন্তেকালের তারিখ ১২ই রবিউল আউয়াল। অবশ্য আল্লামা বায়হাকী দালায়েল নামক গ্রন্থে মুসনাদে সোলায়মান তায়মী থেকে ২রা রবিউল আউয়াল গ্রহণ করেছেন—নূরুন নিবরাস ইবনে সাইয়েদুন নাস, ওফাত খণ্ড।
১লা রবিউল আউয়াল সম্পর্কিত বর্ণনাটি প্রখ্যাত সীরাত লেখক মুসা ইবনে আকাবা থেকে এবং মোহাদ্দেস ইমাম লাইস মিসরী থেকে বর্ণিত।—ফতহুল বারী ওফাত খণ্ড।
ইমাম সোহায়লী রওজুল আনফ গ্রন্থে এ বর্ণনাটিকেই সত্যের কাছাকাছি বলে উল্লেখ করেছেন।— (রওজুল আনফ ২য় খণ্ড, ওফাত অধ্যায়)
উপরোল্লিখিত ইমাম সাহেবান ১২ই রবিউল আউয়াল সম্পর্কিত বর্ণনাকে যুক্তি বিরুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের যুক্তি হল, প্রথমত ওফাতের দিন ছিল সোমবার—(সহীহ বোখারী ওফাত আলোচনা, সহীহ্ মুসলিম কিতাবুস সালাত)
সম্ভবত এর পূর্বে দশম হিজরীর যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ শুক্রবার ছিল। (সিহাহ্ সিত্তা। বিদায় হজ্জের বিরবণ বোখারী—আলইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম-এর তফসীর)
দশম হিজরীর ৯ই যিলহজ্জ শুক্রবার থেকে গণনা করলে পরবর্তী মোহররম, সফর ও রবিউল আউয়াল পর্যন্ত আসলে যিলহজ্জ, মোহররম, সফর এ তিনটি মাস ২৯ দিন, কোন মাস ২৯ দিন আবার কোন মাস ৩০ দিন অথবা সব কয়টি মাসই ৩০ দিন করে ধরলে রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখ কোন অবস্থাতেই সোমবার পড়ে না। সুতরাং হিসাব অনুযায়ী বারই রবিউল আউয়ালের বর্ণনা সম্পূর্ণ ভুল। যদি তিনটি মাসকেই ২৯ দিন ধরা হয়, তবে ২রা রবিউল আউয়াল সোমবার হতে পারে। কিন্তু এ দুটি বর্ণনায় যেহেতু আপত্তি দেখা যায়, তখন ৩য় আর একটা তারিখ তালাশ করা যেতে পারে। সে তারিখটি হল, দুটি মাস যদি ২৯ দিন আর একটিকে ৩০ দিন ধরা হয়, তবে ২৯শে রবিউল আউয়াল সোমবার পড়ে। অবশ্য ওফাতের দিন ২৯শে রবিউল আউয়াল বলেও অনেক বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন।
আমাদের মতে হুযুর (সাঃ)-এর ওফাতের তারিখ ১১ হিজরীর ১লা রবিউল আউয়াল সোমবার দিন।
আমাদের এ দাবির সত্যতা অনুধাবন করার জন্য নিম্নের নকশাটি পেশ করছি। নকশা দ্বারা অনুমান করা যাবে যে ৯ই যিলহজ্জ যদি শুক্রবার হয় তাহলে রবিউল আউয়ালের প্রথমদিকে এ হিসাব অনুসারে কোন কোন দিন সোমবার হবে।

ক্রমিক নং	কল্পিত অবস্থাসমূহ	সোমবার	সোমবার	সোমবার
১	যিলহজ্জ মহররম ও সফর ৩০ দিনের হলে	৬	১৩	
২	যিলহজ্জ মহররম ও সফর ২৯ হলে	২	৯	১৬
৩	যিলহজ্জ, ২৯ মহররম ২৯ এবং সফর ৩০ দিনের হলে	১	৮	১৫
৪	যিলহজ্জ ৩০, মহররম ২৯ এবং সফর ২৯ দিনের হলে	১	৮	১৫
৫	যিলহজ্জ ২৯, মহররম ৩০ এবং সফর ২৯ দিনের হলে	১	৮	১৫
৬	যিলহজ্জ ৩০, মহররম ২৯দিন এবং সফর ৩০দিনের হলে	৭	১৪	
৭	যিলহজ্জ ৩০, মহররম ৩০ এবং সফর ২৯ দিনের হলে	৭	১৪	.
৮	যিলহজ্জ ২৯ দিনের আর মহররম ও সফর ৩০ দিনের হলে	৭	১৪	

থাকেন। সোমবার অসুস্থতা বেড়ে যায়। তখন উম্মুল মোমেনীনদের সবার কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করে হযরত আয়েশা সিদ্দিকার (রাঃ) ঘরে চলে গেলেন। হুযুর (সাঃ)-এর সাধারণ অভ্যাস ছিল, পালাক্রমে তিনি এক একদিন এক এক বিবির ঘরে অবস্থান করতেন। পারিবারিক জীবনেও পূর্ণ ইনসাফ কায়েম করার জন্যই এ নিয়মের ব্যতিক্রম করতেন না। এ নিয়মের ভিত্তিতেই অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার পর উম্মুল মোমেনীনদের জিজ্ঞেস করলেন, আজ আমি কার ঘরে অবস্থান করব? মুসলিম জননীগণ আরয করলেন, হুযুরের যেখানে ইচ্ছা। এদিন ছিল হযরত আয়েশার ঘরে অবস্থানের পালা। হুযুর (সাঃ) হযরত আয়েশার ঘরেই চলে গেলেন।[১] শরীর এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে নিজের ক্ষমতায় উঠে দাঁড়ানো পর্যন্ত সম্ভব ছিল না। হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত আব্বাস (রাঃ) দুজনে ধরে অতিকষ্টে হযরত আয়েশার ঘরে নিয়ে এলেন।[২]

যতদিন চলাফেরা করার শক্তি ছিল, ততদিন হুযুর (সাঃ) মসজিদে গিয়ে নামায পড়াচ্ছিলেন। সর্বশেষ মাগরিবের নামায পড়িয়েছিলেন।[৩] তীব্র ব্যথা ছিল বলে

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

কল্পিত এ তারিখসমূহের মধ্যে ৬, ৭, ৮, ১৩, ১৯, ১৪, ১৫ তারিখগুলো আলোচনার বহির্ভূত। কেননা, কোন রেওয়ায়েতেই এ তারিখগুলো সম্পর্কে কোন ইশারা পর্যন্ত নেই। এখন থেকে গেল ১লা ও ২রা তারিখ, ২রা তারিখ শুধু এক অবস্থাতেই হতে পারে, তাও আবার নিয়মবহির্ভূত হয়, ১লা তারিখ তিন অবস্থায় হতে পারে এবং এ সম্পর্কে বহু বর্ণনার সমর্থনও পাওয়া যায়।

যে হিসাবের উপর ভিত্তি করে আমরা ওফাতের তারিখ ১লা রবিউল আউয়াল ধরছি, তা ইসলামী বর্ষগণনার মূল ভিত্তি চান্দ্রমাসের হিসাব অনুযায়ী ধরা হয়েছে। অবশ্য সৌরমাসের হিসাবে ধরলে আমাদের এ অভিমতও মতভেদের সম্মুখীন হবে। চান্দ্রমাসের হিসাব ছাড়াও তফসীরের বর্ণনার উপরও আমরা নির্ভর করেছি।—"আল-ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম" আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দিন ১০ম হিজরীর ৯ই যিলহজ্জ শুক্রবার থেকে ঠিক ৮১ দিনে হুযুর (সাঃ)-এর ওফাত হয়। (ইবনে জরীর, ইবনে কাসীর, বাগাভী)।

এখানে তিনটি মাসের দুটি ২৯ দিন এবং একটি ত্রিশ দিন ধরে ৯ই যিলহজ্জ শুক্রবার থেকে ১লা রবিউল আউয়াল সোমবার পর্যন্ত ৮১ দিন হয়। আল্লামা আবু নায়ীমও 'দালায়েল' গ্রন্থে বিশ্বস্ত সনদসহ ওফাত দিবস ১লা রবিউল আউয়াল সোমবার উল্লেখ করেছেন।

১. ইবনে সাআ'দ, আবদুর রাজ্জাক শুদ্ধ সনদের মাধ্যমে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সহীহ্ মুসলিম।

২. সহীহ্ বোখারী ; ওফাতের বর্ণনা, ইবনে সাআ'দ।

৩. এরূপ বিবরণ বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী এবং নাসায়ী শরীফের বাবুল কেরাআতে উল্লিখিত রয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত অন্য এক হাদীসে দেখা যায়, হুযুর (সাঃ) জীবনে শেষ যে নামায পড়িয়েছিলেন, তা ছিল জোহরের নামায।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী ফত্হুল বারীতে উপরোক্ত দুটি বর্ণনার সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে লিখেছিলেন, হুযুর (সাঃ) হযত আয়েশার কামরার মধ্যে থেকেই মাগরেব-এর নামায পড়ান। আর সাধারণভাবে সর্বশেষ নামায পড়িয়েছিলেন জোহরের ওয়াক্তে। অথচ তিরমিযীর বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবেই উল্লিখিত রয়েছে যে "হুযুর (সাঃ) বাইরে এসে নামায পড়লেন।" (৪র্থ খণ্ড ৩০৪ পৃঃ)

আমাদের বিবেচনায় এ বর্ণনা ঠিক নয়। কেননা, হুযুর (সাঃ)-এর ঘরে এতটুকু স্থান ছিল না, যেখানে সাহাবিরা জামাতের সঙ্গে নামায পড়তে পারেন। অথচ হাদীস শরীফে উল্লিখিত আছে যে "সাল্লা বেনা",—তিনি আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে নামায পড়লেন। কিন্তু হযরত আয়েশার কক্ষে তার সুযোগ ছিল কোথায়?

আমাদের বিবেচনায়, হুযুর (সাঃ) নিয়মিতভাবে শেষবারের মত যে নামায পড়ান তা মাগরেবের নামাযই ছিল। আর হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ইমামতিতে নামায চলাকালে হুযুর (সাঃ) অকস্মাৎ একদিন জোহরের ওয়াক্তে মসজিদে তশরীফ এনে শেষ বারের মত সকলের সঙ্গে নামায আদায় করেন। এ সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো একত্রে সাজালে আমাদের দাবির যথার্থতা প্রমাণিত হবে।

মাথায় রুমাল বেঁধে আসলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই নামায পাড়ালেন। এ নামাযে সুরা "ওয়াল মুরসালাতে ওরফান"এর কেরাআত পাঠ করেছিলেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এশার সময় হলে জিজ্ঞেস করলেন, নামায কি হয়ে গেছে? সাহাবিগণ আরয করলেন, সবাই হুযুরের অপেক্ষায় বসে আছেন। বালতিতে পানি ছিল, তদ্দারা গোসল করে উঠে বসার চেষ্টা করলেন, কিন্তু দুর্বলতার জন্য মাথা ঘুরে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে আসার পর পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, নামায কি হয়ে গেছে? সাবাহারা আরয করলেন ঃ হুযুর, সবাই আপনার অপেক্ষায় বসে আছেন। জ্বরের তীব্রতা কিছুটা হ্রাস করার উদ্দেশে এবারও গোসল করলেন এবং বসতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু এবারও মাথা ঘুরে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। জ্ঞান এলে পুনরায় একই প্রশ্ন করলেন। সাহাবিগণও আগের মতই জবাব দিলেন। তৃতীয় বারের মত শরীরে পানি দিয়ে উঠবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু এবারও বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। এবার যখন জ্ঞান ফিরল এরশাদ করলেন—"আবুবকর নামায পড়িয়ে দিন।" হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) মৃদু আপত্তি করে আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আবু বকরের হৃদয় অত্যন্ত কোমল, তিনি আপনার স্থানে দাঁড়িয়ে হয়ত স্থির থাকতে পারবেন না। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) পুনরায় এরশাদ করলেন—"আবু বকরই নামায পড়াবেন।" ফলে, সে ওয়াক্ত থেকে হযরত আবু বকর উম্মতের ইমাম হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।[১]

কাগজ-কলমের ঘটনা ঃ ওফাতের চারদিন পূর্ববর্তী শুক্রবার এক সময় হুযুর পার্শ্ববর্তী লোকজনকে বললেন, দোয়াত-কলম নিয়ে আস, আমি এমন কিছু কথা লিখে দিয়ে যাই, যেন পরে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে না যাও। এ সময় অসুখের তীব্রতা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তা দেখে কোন কোন সাহাবী মত প্রকাশ করলেন, "এ অবস্থায় তাঁকে কষ্ট দেয়া ঠিক হবে না। আমাদের কাছে তা আল্লাহ্র কিতাবই রয়েছে। পথ নির্দেশের জন্য কোরানই তো যথেষ্ট।" এ জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত সাহাবিগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। কেউ কেউ তৎক্ষণাৎ দোয়াত-কলম হাজির করার কথা বললেন, অন্যেরা হুযুর (সাঃ)-এর অসুখের তীব্রতার প্রতি লক্ষ্য করে বিরত থাকার পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। একথা কাটাকাটির মধ্যে কিছু গোলমালের সৃষ্টি হল। শেষ পর্যন্ত অন্য একদল

---

১. বোখারী ঃ ১ম খণ্ড ৯৪ পৃষ্ঠায় ইমামত অধ্যায়ে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে হুযুর (সাঃ) জীবনের শেষ তিন দিন আর নামায পড়াতে পারেননি। তাঁর স্থলে হযরত আবু বকর নামায পড়িয়েছেন। শুক্রবার দিবাগত রাত্রিতে এশার নামায থেকেই আবু বকরের এ ইমামত শুরু হয়।—(বোখারী ৬০ পৃঃ)
হুযুর (সাঃ)-এর হায়াতে হযরত আবু বকর মোট সতের ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি করেছেন। ইবনে সাআ'দ এবং ওয়াকেদী থেকেও এরূপ বর্ণনা করেছেন। এক বর্ণনায় তিন দিনের কথা এবং অন্য বর্ণনায় সতের ওয়াক্তের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

বিষয়টি খোদ হুযূর (সাঃ)-এর নিকট জেনে নেয়ার পক্ষে রায় দিলেন। কিন্তু লোকেরা যখন এ বিষয়ে প্রশ্ন করল, তখন হুযুর (সাঃ) বলতে লাগলেন ঃ আমাকে কিছুক্ষণ স্বস্তিতে থাকতে দাও। এ সময় যেখানে আমি আছি, তা তোমরা আমাকে যেখানে ডাকছ তা থেকে উত্তম।[১] এভাবেই এ আকস্মিক বিষয়টির যবনিকাপাত হয়।

একটু সুস্থতা বোধ করার পর তিনি তিনটি অসীয়ত করলেন ঃ

(এক) কোন মুশরেক যেন আরবে বসবাস করতে না পারে।

সহীহ্ বোখারী ঃ ওফাতের বর্ণনা। যে সমস্ত সাহাবী দোয়াত-কলম হাযির করার প্রশ্নে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, বোখারী শরীফে তাঁদের নামের উল্লেখ নেই। তবে সহীহ্ মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবে হযরত ওমরের নাম উল্লিখিত হয়েছে। মুসলিমে এ সম্পর্কে হযরত ওমরের ভাষ্যটি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ

قد غلب عليه الوجع وعندكم القران وحسبنا كتاب الله -

"অর্থাৎ, তাঁর রোগের তীব্রতা বেড়ে গেছে। (চিন্তা কি?) তোমাদের নিকট তো কোরআনই রয়েছে। আল্লাহ্র কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট।"

মুসলিম শরীফের অন্য বর্ণনার ভাষা যথাক্রমে এ রূপ ঃ

(১) فقالوا ان رسول الله صلعم يجهر -

"তারা বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বেহুঁশীর অবস্থায় কথা বলছেন।"

(২) فقالوا اهجر استفهموه -

"তাঁরা বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কি বেহুশীর অবস্থায় কথা বলছেন? তাঁর নিকট জেনে নাও।"

উপরোক্ত বর্ণনাটি শিয়া এবং সুন্নীদের মধ্যে বিরাট মতপার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। শিয়াদের দাবি হল, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দোয়াত-কলম আনিয়ে হযরত আলীর (রাঃ) জন্য খেলাফতের ফরমান লিখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। অপরপক্ষে সুন্নী পণ্ডিতদের অভিমত হল, ঐ সময় সত্য সত্যই হুযুর (সাঃ)-এর অস্বাভাবিক কষ্ট হচ্ছিল। শরীয়তের সমস্ত বিধান পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কোরআনে-অদ্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম,— এ সুসংবাদও নাযিল হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং হুযুর (সাঃ)-এর সে তকলীফের সময়টিতে তাঁকে কষ্ট দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া সত্য সত্যই যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা লেখানোর প্রয়োজনই দেখা দিত, তবে দু'একজন সাহাবীর আপত্তিতে তিনি কি তা থেকে বিরত হতেন? অধিকন্তু এ ঘটনার পর তিনি আরও চারদিন দুনিয়াতে ছিলেন। এর মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থাও ফিরে এসেছিল। প্রয়োজনীয় কোন ফরমান থেকে গেলে এ সময়ের মধ্যে তিনি অবশ্যই লিখিয়ে যেতেন।

তাছাড়া হুযুর (সাঃ) কি লেখাতে চেয়েছিলেন, তা জানা গেল কেমন করে? বোখারীর এক বর্ণনায় দেখা যায়, হুযুর (সাঃ) পীড়িত অবস্থায় একবার হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু বকরকে ডেকে হযরত আবু বকরের জন্য খেলাফতের ফরমান লেখাতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু পরে এই বলে বিরত হলেন যে "খোদ আল্লাহ্ এবং মুসলিম জনগণ আবু বকর ব্যতীত আর কারও খেলাফত পছন্দ করবে না, সুতরাং ফরমান লিখে দেয়ার কোনই প্রয়োজনীয়তা নেই।"

উপরোক্ত ঘটনার পর হুযুর (সাঃ) সাহাবিদের ডেকে মৌখিকভাবে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অসিয়ত করে গেলেন। এমনও তো হতে পারত যে যে গুরুত্বপূর্ণ কথা কয়টি তিনি লিখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, সে অসীয়তের মধ্যেই তা প্রকাশ করেছেন। পরবর্তী সময় সাধারণ্যেও কিছু বক্তব্য রেখেছিলেন, এগুলো ছাড়া যদি অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ থাকত, তবে সে বক্তব্যের সঙ্গেই তা প্রকাশ করতে বাধা ছিল কোথায়?

এ কিতাবে ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ তথ্য তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য, আক্বীদার বিষয় সম্পর্কে আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয় বিধায় এ সম্পর্কিত আলোচনা থেকে বিরত হলাম। তবে বিষয়টি সম্পর্কে আমি বিস্তারিত তথ্য ও যুক্তিপ্রামণ আল-ফারুক গ্রন্থে পরিবেশন করেছি।

(দুই) যেভাবে আমি বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং গোত্রের তরফ থেকে আগত দূতগণের যত্ন নিতাম, ঠিক সেভাবেই যেন তাদের যত্ন নেয়া হয়।

অসীয়তের তৃতীয় নির্দেশটি বর্ণনাকারী ভুলে গেছেন।[১]

এদিন জোহরের সময় শরীর কিছুটা সুস্থ বোধ হলে হুকুম দিলেন, যেন সাত মশক পানি দ্বারা তাঁকে গোসল করানো হয়। গোসল হয়ে গেলে হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত আব্বাস (রাঃ) ধরে মসজিদে নিয়ে আসেন। তখন জামাত শুরু হয়ে গিয়েছিল, হযরত আবু বকর নামায পড়াচ্ছিলেন। হুযুর (সাঃ)-এর আগমন অনুভব করে তিনি পেছনে সরে আসতে শুরু করলেন। কিন্তু তিনি (সাঃ) ইশারায় তাঁকে বারণ করে পাশে গিয়ে বসে পড়লেন এবং নামায পড়াতে শুরু করলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) দাঁড়ানো অবস্থায় হুযুর (সাঃ)-এর এক্তেদা করলেন আর মুসল্লিগণ হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে এক্তেদা করতে থাকলেন। এভাবে নামায শেষ হল।[২] নামায শেষ হওয়ার পর হুযুর (সাঃ) সমবেত সাহাবিদের সম্বোধন করে জীবনের শেষ খুৎবা প্রদান করলেন। এরশাদ হল ঃ

"আল্লাহ্ পাক তাঁর এক বান্দাকে এখতিয়ার দিয়েছিলেন, সে হয় দুনিয়ার যাবতীয় নেয়ামত এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কবুল করবে অথবা আখেরাতে যে নেয়ামতরাশি তাঁর নিকট রক্ষিত আছে, তা বেছে নেবেন। কিন্তু তিনি আল্লাহ্র নিকট রক্ষিত আখেরাতের নেয়ামতকেই কবুল করে নিয়েছেন।"

এতটুকু শোনার পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন। লোকেরা তাঁর দিকে সবিস্ময়ে দেখতে লাগল। তাদের ধারণা হল, হুযুর (সাঃ) তো কোন এক ব্যক্তির ঘটনা বলছেন, সুতরাং এর মধ্যে কাঁদার মত কি হল? কিন্তু যিনি নবুওতের যাবতীয় রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন, সেই আবু বকর সিদ্দিক একথা শোনামাত্রই অনুমান করতে পেরেছিলেন যে রসূলে মকবুল (সাঃ) আল্লাহ্র যে বান্দার কথা বলছেন, তিনি স্বয়ং মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছাড়া অন্য কেউ নন।

১. বোখারী ঃ ওফাতের বর্ণনা, মুসলিম ঃ অসীয়ত অধ্যায়।
২. বর্ণনায় সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি যে এ ঘটনা কোন দিনের জোহরের নামাযে সংঘটিত হয়েছিল। সহীহ মুসলিমে "কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ নিষিদ্ধ" এ সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত জুনদুব (রাঃ) বর্ণিত হুযুর (সাঃ) কর্তৃক হযরত আবু বকর-এর প্রশংসাবলী সম্বলিত যে হাদীস উল্লিখিত হয়েছে তা শেষ বিদায়ের পাঁচ দিন পূর্বেকার বলে জানা যায়। বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে হযরত আয়েশার বর্ণনাতেও এ তথ্যই প্রকাশ পেয়েছে যে এ ঘটনা ওফাতের পাঁচদিন পূর্বেকার বৃহস্পতিবার দিন জোহরের সময়কার। হাফেজ ইবনে হাজারও ফতহুল বারীতে বর্ণনা করেছেন যে অসুস্থতার মাঝে হুযুর (সাঃ) মসজিদে সর্বশেষ যে খুৎবা দিয়েছিলেন তা ছিল শেষ বিদায়ের পাঁচদিন পূর্বেকার বৃহস্পতিবার দিন জোহরের সময়।

বক্তৃতা অব্যাহত রেখে হুযুর (সাঃ) বলতে লাগলেন ঃ "যে ব্যক্তির সম্পদ এবং সাহচর্য দ্বারা আমি সর্বাপেক্ষা বেশি উপকৃত হয়েছি তিনি আবু বকর। দুনিয়াতে যদি আমার উম্মতের মধ্যে কাউকেও আমার বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম, তবে তিনি হতেন আবু বকর। কিন্তু ইসলামের সম্বন্ধই এমন এক সম্বন্ধ, যা সকল বন্ধুত্বের জন্য যথেষ্ট। মসজিদের সঙ্গে সংলগ্ন যাদের ঘরের দরজা রয়েছে, একমাত্র আবু বকরের দরজা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেবে।

দেখ! তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো তাদের পয়গম্বরদের কবরকে এবাদতগাহে পরিণত করেছিল। সাবধান! আমি নিষেধ করে যাচ্ছি, তোমরা কখনও এমন করো না।"[১]

হুযুর (সাঃ)-এর অসুস্থতার সময় আনসারগণ এখানে সেখানে বসে কাঁদতে থাকতেন। একদিন হযরত আব্বাস এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) কোথাও যাওয়ার সময় এ অবস্থা দেখতে পেয়ে এভাবে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে আনসারগণ বলতে লাগলেন, হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র সাহচর্যের কথা স্মরণ করে আর আমরা ধৈর্যধারণ করতে পারি না। উক্ত দুজনের মধ্য থেকে কেউ এসে একথা হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করেছিলেন। আনসারগণের এ মর্ম-বেদনার কথা স্মরণ করে হুযুর (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ

"লোকসকল! আমি আনসারদের সম্পর্কে তোমাদের অসিয়ত করছি, দিনে দিনে সাধারণ মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, কিন্তু আনসারদের সংখ্যা হ্রাস পেতে পেতে বৃহত্তর মুসলিম জনসংখ্যার মধ্যে এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়াবে যেমন খাদ্যবস্তুর মধ্যে নিমক সামান্য হয়ে থাকে।

"আনসারগণ তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন, এখন তাঁদের সম্পর্কে তোমাদের দায়িত্ব পালন করার পালা। এরা আমার দেহের মাঝে পাকস্থলীর মত। তোমাদের মধ্যে যে যখন উম্মতের ভাল-মন্দের দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে, সে যেন এঁদের মধ্যে যারা নেক হবেন তাঁদের পূর্ণ মর্যাদা দান করেন, আর কেউ যদি কোন ভুলত্রুটি করে ফেলেন, তবে তাকেও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন।"[২]

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে হুযুর (সাঃ) রোমকদের বিরুদ্ধে যে অভিযান পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, তার নেতৃত্ব দেয়া হয়েছিল হযরত উসামা ইবনে যায়েদকে। ইবনে সা'আদের বর্ণনামতে মুনাফেকরা হযরত উসামার এ নেতৃত্ব সম্পর্কে সমালোচনা করে বলাবলি শুরু করেছিল যে অভিজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠ লোককে বাদ দিয়ে একজন অল্পবয়স্ক তরুণকে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের নেতৃত্ব কেন দেয়া হল। হুযুর (সাঃ) এ ধরনের সমালোচনার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এরশাদ করলেন ঃ

১. সহীহ বোখারী,— সহীহ মুসলিম।
২. সহীহ বোখারী ঃ আনসারগণের মর্যাদা অধ্যায়।

"আজ তোমরা উসামার নেতৃত্ব সম্পর্কে কথা বলছ। কাল তোমরা তার পিতা যায়েদের নেতৃত্ব সম্পর্কেও আপত্তি তুলেছিলে। আল্লাহ্র কসম সে পদের জন্য নিঃসন্দেহে যোগ্যতম ব্যক্তি ছিল এবং আমার নিকট ছিল প্রিয় ব্যক্তি, আর আজ উসামাও আমার প্রিয়পাত্র এবং নেতৃত্বের যোগ্য।"[১]

ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মমতের মাঝে একটি সূক্ষ্ম এবং গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল এই যে ইসলাম শরীয়তের সকল আদেশ-নিষেধ এবং মূলনীতির নিয়ামক হিসাবে সার্বভৌম অধিকার সরাসরি একমাত্র আল্লাহ্র বলে মনে করে। পয়গম্বরের দায়িত্ব ছিল কওল ও আমলের (কথা ও কাজের) দ্বারা আল্লাহ্র নির্দেশসমূহ বান্দাদের কাছে পৌঁছে দেয়া। অন্যান্য পয়গম্বরের উম্মতের মধে নবী-রসূলের উপরোক্ত দায়িত্ব সম্পর্কে সৃষ্ট ভুল ধারণা শেষ পর্যন্ত কুফরী ও শেরেকীর স্তর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা আল্লাহ্র প্রেরিত রসূলদের মূল বিধানদাতা এমন কি, সৃষ্টিকর্তার অংশ পর্যন্ত সাব্যস্ত করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। পূর্ববর্তী জাতিগুলোর এ ধরনের ভ্রান্তিসমূহ সামনে রেখেই হুযুর (সাঃ) শেষবারের মত তাঁর উম্মতকে সতর্ক করে দিলেন। এরশাদ হল ঃ

"হালাল ও হারামের নিয়ামক যেন আমাকে সাব্যস্ত করা না হয়। আমি শুধুমাত্র সে সমস্ত বস্তু হালাল সাব্যস্ত করেছি, আল্লাহ্র কিতাবে যেগুলোকে হালাল করা হয়েছে এবং সে সমস্ত বস্তুকেই হারাম ঘোষণা করেছি, যেগুলোকে আল্লাহ্র কিতাবে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।"

ইসলামের ধারণামতে প্রত্যেক মানুষকেই তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে। এ ব্যাপারে ইতরবিশেষের কোন বৈশিষ্ট্য ইসলামের ধারণায় নেই। এ বিষয়টিই সুস্পষ্ট করে দেয়ার জন্য হুযুর (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ

"হে পয়গম্বর কন্যা ফাতেমা! হে পয়গম্বরের ফুফু সাফিয়্যা! আল্লাহ্র সামনে পেশ করার মত আমল করে নাও। আমি নিজেও তোমাদের আল্লাহ্র ক্রোধের কবল থেকে রক্ষা করতে পারব না।"[২]

এ খুৎবা শেষ করে হুযুর (সাঃ) হযরত আয়েশার ঘরে তশরীফ নিয়ে গেলেন।

হুযুর (সাঃ) সর্বাপেক্ষা বেশি স্নেহ করতেন হযরত ফাতেমাকে (রাঃ)। অসুস্থতা যখন বাড়তে শুরু করল, তখন হযরত ফাতেমাকে ডাকিয়ে আনলেন। স্নেহের দুলালীকে খুব কাছে ডেকে কানে কানে কিছু বললেন। কথা শুনেই হযরত ফাতেমা (রাঃ) কাঁদতে শুরু করলেন। আবারও কন্যাকে মুখের কাছে এনে কানে কানে কিছু বললেন। এবার কথা শুনে হযরত ফাতেমার ম্লান মুখ হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠল।

১. সহীহ্ বোখারী, উসামার অভিযান ও যায়েদের মর্যাদা অধ্যায়।
২. এ হাদীসটি এবং এর পূর্ববর্তী নির্দেশটি সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী মুসনাদে এবং ইবনে সা'আদ উল্লেখ করেছেন। উক্ত দু'টি অসীয়ত ওফাতের দিন ফযরের নামাযের পরের ঘটনা। কিন্তু সহীহ্ বোখারীর বর্ণনা হল, ওফাতের দিন ফযরের জামাতের সময় হুযুর (সাঃ) শুধুমাত্র হুজরার পর্দা তুলে তার প্রিয় উম্মতকে শেষ বারের মত এক নজর নামাযরত অবস্থায় দেখেছিলেন। বাইরে তশরিফ আনেন নি। নামাযেও শরীক হননি। এ খুৎবা উপরোক্ত জোহরের নামাযের পর দেয়া হয়েছিল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) এ যুগপৎ কান্না এবং হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে হযরত ফাতেমা এরশাদ করলন, প্রথমবার হুযুর (সাঃ) আমাকে বললেন, "ফাতেমা! এ রোগেই আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নেব। হুযুর (সাঃ)-এর এ এরশাদ শুনে আমার বুক ফেটে কান্না এল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পুনরায় যখন আমার কানে কানে বললেন, ফাতেমা, আমার পরিজনদের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সঙ্গে মিলিত হবে। তখন এ সুসংবাদ শুনে আমার চেহারা আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠল।"

ইহুদী ও খৃষ্টানরা তাদের পয়গম্বর এবং ধর্মনেতাদের কবল ও স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে এমনসব বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌছায় যে শেষ পর্যন্ত তা মূর্তিপূজায় পরিণত হয়ে যায়। ইসলামের প্রথম কর্তব্য ছিল মূর্তিপূজার উচ্ছেদ এবং এ মারাত্মক রোগটি মানবহৃদয়ে অনুপ্রবেশের সব কটি রন্ধ্র পথে সার্বিক প্রতিরোধ সৃষ্টি করা। শেষ বিদায়ের পূর্বে রোগশয্যায় হুযুর (সাঃ)-এর অন্তরে সদাসর্বদা পূর্ববর্তী নবিদের উম্মতদের সে বিভ্রান্তির কথা বড় বেশি করে জাগ্রত ছিল। ঘটনাক্রমে ঠিক এ সময়েই পবিত্রা বিবিগণের কেউ কেউ যাঁরা হিজরত উপলক্ষে হাবশা সফর করে এসেছিলেন, তাঁরা সেখানকার খৃষ্টানদের জাঁকজমকপূর্ণ গির্জাসমূহ এবং সেগুলোতে স্থাপিত মূর্তি ও ছবির কথা উল্লেখ করেছিলেন। এঁদের কথা শুনে হুযুর (সাঃ) এরশাদ করলেন, "এদের মধ্যে কোন সাধু পুরুষের মৃত্যু হলে তারা তার কবরকে ধর্মমন্দিরে পরিণত করে ফেলে এবং কবরের পার্শ্বে সে ব্যক্তির মূর্তি স্থাপন করে। কেয়ামতের দিন এরা আল্লাহর সামনে সর্বাপেক্ষা জঘন্য লোক হিসাবে গণ্য হবে।"[১]

রোগের যন্ত্রণা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার পর যখন ছটফট করতে করতে কখনও চাদর দ্বারা মুখ ঢেকে নিচ্ছিলেন এবং কখনওবা চাদর ফেলে দিচ্ছিলেন, তখনও হযরত আয়েশা (রাঃ) শুনতে পেলেন, হুযুর (সাঃ) এ বলে স্বগতোক্তি করছেন ঃ

"ইহুদী এবং নাসারাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ। এরা তাদের নবিদের কবরকে এবাদতগৃহে পরিণত করেছে।"[২]

রোগযন্ত্রণার এমন অস্বস্তির মাঝেই হঠাৎ স্মরণ হল, কিছুদিন পূর্বে হযরত আয়েশার কাছে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা রাখা হয়েছিল। জিজ্ঞেস করলেন, "আয়েশা! স্বর্ণমুদ্রাগুলো কোথায়! মোহাম্মদ (সাঃ) কি আল্লাহর সঙ্গে একটি ভুল ধারণার বোঝা মাথায় নিয়ে মিলিত হবে? যাও, এখনই সেগুলো আল্লাহর রাস্তায় খয়রাত করে দাও।"[৩]

---

১. বোখারী ওফাতের বর্ণনা।
২. সহীহ্ বোখারী ঃ ওফাতের বর্ণনা।
৩. মুসনাদে আহ্মদ ইবনে হাম্বল, ৬ষ্ঠ খণ্ড।

ওফাতের পূর্বদিন রবিবারে লোকেরা ওষুধ খাওয়াতে চেষ্টা করল। আর বুঝি সুস্থ হওয়ার আশা ছিল না, তাই ওষুধ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। এমন সময় হঠাৎ বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। সুশ্রুষাকারিগণ তখন মুখ ফাঁক করে ওষুধ ঢেলে দিলেন। বেহুঁশী দূর হওয়ার পর অনুভব করলেন, তাঁকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে। তখন হুকুম দিলেন, "যারা ওষুধ খাইয়েছে তাদের সবাইকে ওষুধ খাওয়ানো হোক।" হযরত আব্বাস (রাঃ) ওষুধ খাওয়ানোর কাজে শরীক ছিলেন না বলে একমাত্র তাঁকে ছাড়া সবাইকে ওষুধ খাওয়ানো হল।[১]

উপরোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করে মোহাদ্দেসগণ লিখেছেন যে এ ঘটনায় হুযুর (সাঃ)-এর মানবীয় চরিত্র ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ, অসুস্থ অবস্থায় সাধারণত মেজায কিছুটা উগ্র হয়ে যাওয়ার ফলেই এ ধরনের হুকুম দিয়েছিলেন।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, এ ঘটনার মাধ্যমে হুযুর (সাঃ)-এর স্বভাবসুলভ খোশমেজাযীরই প্রকাশ পেয়েছে মাত্র।

রোগের প্রকোপ কখনও তীব্র হচ্ছিল, কখনওবা কিছুটা হ্রাস পাচ্ছিল। ওফাতের দিন সোমবার শরীর অপেক্ষাকৃত শান্ত ছিল। হুজরা মসজিদের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল। সকালবেলায় দরজার পর্দা উঠিয়ে দেখলেন, তাঁর প্রিয় উম্মতেরা তখন ফযরের নামাযে মশগুল। নামাযের দৃশ্য দেখে চেহারা মোবারক হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠল। সাহাবিরা মনে করলেন, হুযুর (সাঃ) বোধহয় মসজিদে তশরীফ আনতে চান। এ অনুভূতিতেই সবাই যেন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) পর্যন্ত ইমামের জায়গা ছেড়ে পেছনে সরে আসার উপক্রম করলেন। এ অবস্থা দেখে হুযুর (সাঃ) হুজরার পর্দা ফেলে দিয়ে পিছিয়ে গেলেন। সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে দরজার পর্দাটি পর্যন্ত ঠিকমত ফেলতে পারলেন না।[২]

সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে চেহারা মোবারকের নূরানী আভা দর্শনে ধন্য হওয়ার এটিই ছিল শেষ মওকা,!

হযরত আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেন, শেষ মওকায় হুযুর (সাঃ)-এর মোবারক চেহারা কিতাবের পাতার মত হয়ে গিয়েছিল।[৩]

দিন বাড়তে লাগল। তারই সঙ্গে কিছুক্ষণ পর পরই হুযুর (সাঃ) বার বার সংজ্ঞা হারাতে লাগলেন। একটু সুস্থ থেকেই পুনরায় সংজ্ঞা লোপ পেতে শুরু করল। প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) শিয়রেই বসেছিলেন। এ কষ্ট দেখে সহ্য করতে পারলেন না; বলে ফেললেন, হায়রে আমার আব্বার কষ্ট। হযরত ফাতেমার বাক্যটি কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পবিত্র যবান থেকে উত্তর এল ঃ "ফাতেমা! তোমার আব্বা আজকের পর আর কখনও এমন কষ্টে পতিত হবেন না।"

---

১. সহীহ্ বোখারী ঃ ওফাতের বর্ণনা।
২. সহীহ্ মুসলিম ঃ নামায অধ্যায়।
৩. বোখারী ঃ সহীহ্ মুসলিম।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুযুর (সাঃ) সুস্থ অবস্থায় কয়েকবারই এরশাদ করেছেন "নবী-রসূলদের এমন এখতিয়ার দেয়া হয় যে তাঁরা দুনিয়ার জিন্দেগী অথবা ওফাত কবুল করে আখেরাতের জিন্দেগী বেছে নিতে পারেন।" এসব আলোচনার সময় তাঁর পাক যবান থেকে বের হত ঃ

"কিন্তু তাঁদের সঙ্গেই আমি থাকতে চাই, যাঁদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামত-রাশি বর্ষিত হয়েছে।"

কখনও কখনওবা বলতেন;

"হে আল্লাহ্‌! হে শ্রেষ্ঠ বন্ধু!"

এসব শুনে হযরত আয়েশাও অনুভব করতে পেরেছিলেন যে এখন শুধু পরম প্রিয় মওলার সান্নিধ্যই তাঁর সর্বাপেক্ষা বেশি কাম্য হয়ে উঠেছে।

ওফাতের অল্প কিছুক্ষণ পূর্বে হযরত আবদুর রহ্‌মান ইবনে আবু বকর খেদমতে হাযির হলেন। তখন হুযুর (সাঃ)-এর মাথা মোবারক হযরত আয়েশা কোলে নিয়ে বসেছিলেন। হযরত আবদুর রহ্‌মানের হাতে একটি মেসওয়াক ছিল। হুযুর (সাঃ)-এর দৃষ্টি সে মেসওয়াকের উপর গিয়ে স্থির হয়ে গেল। হযরত আয়েশা অনুভব করলেন,— হুযুর (সাঃ) মেসওয়াক করতে চান। তিনি হযরত আবদুর রহ্‌মানের হাত থেকে মেসওয়াকটি নিয়ে নিজের দাঁতে চিবিয়ে তা নরম করে হুযুর (সাঃ)-এর হাতে দিলেন। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের মত দাঁত পরিষ্কার করলেন।

শেষ বিদায়ের মুহূর্তটি ঘনিয়ে এল। বেলা দুপুর অতিক্রান্ত হয়ে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ল। বুকের ভেতর থেকে সামান্য গড়গড় আওয়ায উঠতে শুরু করল। এ সময়ে যবান মোবারক নড়ে উঠল। লোকেরা শুনতে পেলেন, পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে ঃ

"নামায! এবং তোমাদের দাস-দাসীগণ!"

পার্শ্বেই একটি পাত্রে পানি রাখা ছিল। মাঝে মাঝে সে পাত্রে হাত ভিজিয়ে পবিত্র চেহারা মুছে নিচ্ছিলেন। কখনওবা চাদর দ্বারা মুখ ঢেকে দিচ্ছিলেন আবার কখনও তা সরিয়ে নিচ্ছিলেন। এ অবস্থাতেই একবার উপর দিকে হাত এনে আঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করলেন এবং তিনবার উচ্চারণ করলেন ঃ

بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى-

"আর কিছু নয়! আর কিছু নয়!! কেবল সে শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সান্নিধ্য চাই!!!"

কথা কয়টি উচ্চারণ করতে করতেই হাত বিছানায় নেমে এল। চক্ষু স্থির হয়ে উপর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে গেল। রূহ্ মোবারক দুনিয়ার বন্ধন ছেড়ে উর্ধ্বজগতে উড়ে গেল![1]

اَللّٰهم صل عليه وعلى اله واصحابه صلوة كثيرا كثيرا -

দাফন-কাফন ঃ দাফন-কাফনের কাজ পরদিন মঙ্গলবার শুরু হল। দেরী হওয়ার যেসব কারণ ছিল তা হচ্ছে ঃ

(১) ওফাতের খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক স্তব্ধ হয়ে গেল। ভক্তগণ যেন প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে হুযুর (সাঃ) তাদের ছেড়ে চলে যেতে পারেন। হযরত ওমরের মত দৃঢ়চিত্ত সাহাবী পর্যন্ত নাঙ্গা তলোয়ার হাতে চিৎকার করে উঠলেন, যে বলবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওফাত হয়েছে, আমি তার মস্তক উড়িয়ে দেব।

শোকের এ তুফানের মধ্যেই হযরত আবু বকর এসে সাহাবিদের সমবেত করে এক ভাষণ দিলেন এবং পবিত্র কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে বুঝিয়ে দিলেন যে হুযুর (সাঃ) চিরদিন অবস্থান করার জন্যে এ দুনিয়ায় আগমন করেননি। দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়া তাঁর জন্যে অবধারিত সত্য। হযরত আবু বকরের এ ভাষণের পরই যেন সকলের চোখ খুলে গেল এবং বিহ্বলতা কাটতে শুরু করল। সাহাবিগণ যেন সে কঠিন বাস্তবতার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

(২) যখন সবার সংবিৎ ফিরে এল, তখন আর দাফন-কাফন সম্পন্ন করার মত সময় অবশিষ্ট ছিল না।

(৩) কবর খননের কাজ, গোসল এবং কাফন পরানোর পর শুরু করা হয়েছিল বলেও দেরি হয়ে যায়।

(৪) যে হুজরায় ওফাত হয়েছিল, লোকেরা কাতারবন্দী হয়ে সে ঘরে এসে শেষ দেখা এবং জানাযা আদায় করে যাচ্ছিলেন। এ জন্যেও অনেকটা দেরি হয়ে গেল এবং দাফন হতে হতে মঙ্গলবার দিন শেষ হয়ে রাত হয়ে গেল।[2]

গোসল ও দাফন-কাফনের কাজ প্রধানত নিকটাত্মীয়রাই আনজাম দিয়েছিলেন। হযরত ফযল ইবনে আব্বাস ও উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) পর্দা করে রাখলেন এবং হযরত আলী (রাঃ) গোসল দিলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) তাঁকে সাহায্য করলেন। কোন কোন বর্ণনামতে হযরত আব্বাস (রাঃ) পর্দা করে রেখেছিলেন।

---

১. ওফাতের সময় সম্পর্কে ইবনে ইসহাক এবং বোখারী-মুসলিমের বর্ণনায় কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে ওফাতের সময়টি ছিল দুপুর বেলা, বোখারী-মুসলিমের বর্ণনায় অপরাহ্ন। হাফেজ ইবনে হাজার-এ দু'ধরনের বর্ণনার পর্যালোচনা করে স্থির করেছেন যে বেলা তখন দুপুর অতিক্রম করে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছিল।

২. ইবনে ইসহাকের বর্ণনামতে বুধবার দিন হুযুর (সাঃ)-কে সমাহিত করা হয়। কিন্তু সহীহ্ বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনামতে মঙ্গলবার দিবাগত রাত।

হুযুর (সাঃ)-এর এ অন্তিম খেদমতে সবাই অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন। তাই ভিড় বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় হযরত আলী (রাঃ) ভেতর থেকে হুজরার দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এ সময় আনসারদের এক জামাত এসে আওয়ায দিলেন যে হুযুর (সাঃ)-এর এ অন্তিম খেদমতে আমাদের দাবি রয়েছে। আমাদেরও অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হোক। ওয়াকেদীর বর্ণনামতে হযরত আবু বকর (রাঃ) ভিড় বেশি হওয়ার আশঙ্কায় এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে বললেন, এভাবে প্রত্যেকেই অধিকার আদায়ের জন্য এগিয়ে এলে শেষ পর্যন্ত আসল কাজই থেকে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আনসারদের বিশেষ অনুরোধে হযরত আওস ইবনে খাওলা (রাঃ) আনসারীকে ডেকে নেয়া হল। ইনি বদর যুদ্ধে শরীক সাহাবিদের অন্তর্গত ছিলেন। ইনি কলস ভরে পানি এগিয়ে দিতে থাকলেন। লাশ মোবারক হযরত আলী বুকের সঙ্গে লাগিয়েছিলেন। হযরত আব্বাস এবং তাঁর দু'পুত্র কাসেম ও ফযল (রাঃ) লাশ মোবারকের পার্শ্ব পরিবর্তন করছিলেন এবং উসামা (রাঃ) উপর থেকে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন।[১]

কাফনের জন্য প্রথমত আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকরের (রাঃ) পক্ষ থেকে একটি ইয়ামনী চাদর নির্বাচন করা হয়েছিল, কিন্তু পরে তা বাদ দিয়ে তিন খণ্ড সাদা সুতি কাপড় দ্বারা কাফন দেয়া হল। কাফনের মধ্যে কামিস-টুপী ছিল না।[২]

গোসল শেষ করে কাফন পরানোর পর প্রশ্ন দেখা দিল, দাফন কোথায় করা হবে? হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, নবিগণ যেখানে ইন্তেকাল করেন, সেখানেই দাফন করা বিধেয়। সেমতে লাশ মোবারক সামান্য সরিয়ে হযরত আয়েশার কক্ষেই কবর খনন করা সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।[৩]

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুযুর (সাঃ) শেষ সময়ে এ ব্যাপারে বড় বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন যে লোকেরা শেষ পর্যন্ত ভক্তির আতিশয্যে তাঁর পবিত্র মাযারকে এবাদতের স্থানে পরিণত করে বিভ্রান্ত হয়ে না পড়ে। এ আশঙ্কার প্রেক্ষিতেই কোন ময়দানে তাঁর কবর রচনা করা হয়নি। কেননা, অরক্ষিত স্থানে লোকের সম্ভাব্য এ বাড়াবাড়ি প্রতিরোধ করার হয়ত কোন উপায় থাকত না। তাই শেষ পর্যন্ত হুজরার ভেতরেই কবর রচনা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[৪]

মদীনায় কবর খননের ব্যাপারে হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ এবং হযরত আবু তালহা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। হযরত আবু উবায়দা মক্কার রীতি অনুযায়ী সিন্দুক আকৃতির কবর রচনা করতেন এবং হযরত আবু তালহা মদীনার

---

১. তাবাকাতে ইবনে সা'আদ।
২. মুসলিম ঃ জানাযা অধ্যায়।
৩. তাবাকাতে ইবনে সা'আদ ঃ ওফাত অধ্যায়। তাবারী ও আবু দাউদ ওফাত অধ্যায়, ইবনে মাজাহ্।
৪. বোখারী ঃ জানাযা অধ্যায়।

রীতি মোতাবেক লাহ্‌দ বা বগলী কবর খনন করতে জানতেন। কবর কোন্ ধরনের হবে, এ প্রশ্নেও সাহাবিদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিল। হযরত ওমর বললেন, এ ব্যাপারে মতভেদ না করে বরং দু'জনের কাছেই লোক পাঠানো হোক। যিনি আগে আসবেন তাঁর ইচ্ছানুযায়ীই কবর তৈরি করা যাবে। এ পরামর্শ মোতাবেক হযরত আব্বাস (রাঃ) উভয়ের বাড়িতেই লোক পাঠালেন। ঘটনাক্রমে হযরত আবু উবায়দাকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। সুতরাং তালহার দ্বারাই 'লাহ্‌দ' ধরনের কবর খনন করানো হল। মাটি ভিজা থাকায় যে বিছানায় তিনি শায়িত ছিলেন, তাই কবরের তলায় বিছিয়ে দেয়া হল।

কবর তৈরি হওয়ার পর জানাযার জন্য হুজরার দরজা খুলে দেয়া হল। মুসলিম জনতা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে একে একে এসে জানাযা পড়ে যেতে লাগলেন। প্রথমে পুরুষেরা পরে স্ত্রীলোকেরা এবং সর্বশেষে শিশুরা কাতারবন্দী হয়ে প্রিয়নবী (সাঃ)-এর জানাযা পড়ে গেলেন। তবে দু'জাহানের ইমামের এ জানাযায় কেউ ইমাম ছিলেন না।[১]

জানাযা শেষ হওয়ার পর লাশ মোবারক হযরত আলী, ফযল ইবনে আব্বাস, উসামা ইবনে যায়েদ এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) কবরে নামলেন।[২]

১. ইবনে মাজাহ্ ঃ জানাযা অধ্যায়।
২. আবু দাউদ ঃ জানাযা অধ্যায়।

পরিত্যক্ত সম্পত্তি

ওফাতের সময় মহানবী (সাঃ) কি কি সম্পদ ছেড়ে গেছেন এ প্রশ্ন বিবেচনা করার আগে বলতে হয়, জীবিতকালে কিই বা তাঁর দখলে রাখতেন যে তা ওফাতের পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে রেখে যেতে পারতেন। কোন কিছু যদি থাকতো তবে সে সম্পর্কে পূর্বেই সুস্পষ্ট ঘোষণা করে রাখা হয়েছিল যে

لَا نُوْرِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

"আমাদের নবিদের কোন উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হয় না। কিছু যদি আমি ছেড়ে যাই, তবে তা ছদকা হিসাবে গণ্য হবে।"

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুযুর (সাঃ) এরশাদ করেছেন— "আমার কোন উত্তরাধিকারী ভাগে কিছু পাবে না।" অর্থাৎ, এমন কোন নগদ অর্থ আমি রেখে যাব না, যা উত্তরাধিকারিদের বণ্টন করে নিতে পারবে। প্রসঙ্গত স্মরণ থাকতে পারে যে ওফাতের পূর্বেই হযরত আয়েশার (রাঃ) কাছে গচ্ছিত কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা তৎক্ষণাৎ খয়রাত করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

উম্মুল মোমেনীন হযরত জুয়াইরিয়ার (রাঃ) ভ্রাতা হযরত আম্‌র ইবনুল হোয়াইরিস (রাঃ)-এর এ সম্পর্কিত একটি বর্ণনা বোখারী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে যে "ওফাতের সময় হুযুর (সাঃ) কোন কিছু রেখে যাননি, দীনার নয়, দেরহাম নয়, কোন গোলাম নয়, কোন বাঁদী নয়, শুধু মাত্র আরোহণের একটি সাদা রং-এর খচ্চর, ব্যবহারের কয়েকটি অস্ত্র এবং মুসলিম সাধারণের কল্যাণের জন্য ওয়াকফ করা কয়েক টুকরো ভূমি মাত্র পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল।[১]

এ মর্মে আবু দাউদে হযরত আয়েশার (রাঃ) একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ

"রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন দীনার-দেরহাম কিংবা উট-ছাগল রেখে যাননি।"

মোটকথা, শাহানশাহে দু'জাহান দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় যা কিছু রেখে গেছেন, তা ছিল মুসলিম জনগণের কল্যাণে ওয়াক্‌ফ করা কিছু ভূমি, আরোহণের জন্যে ব্যবহৃত একটি খচ্চর এবং কয়েকটি অস্ত্র।

ভূমি ঃ হযরত আমর ইবনুল হোয়াইরেস (রাঃ) তাঁর বর্ণনায় যে ভূমির কথা উল্লেখ করেছেন, তা ছিল মদীনার খায়বর এবং ফাদাকের কয়েকটি বাগান। মদীনার সম্পত্তি ছিল বনূ নাযীর গোত্রের পরিত্যক্ত বাগান ও হিজরী তিন সনে

---

১. বোখারী।

ওহুদ যুদ্ধের পর মুখাইরাতক নামক জনৈক ইহুদী কর্তৃক মৃত্যুর সময় হুযুর (সাঃ)-এর নামে অসীয়ত করা একটি বাগান। কিন্তু অত্যন্ত বিশ্বস্ত বর্ণনায় উল্লেখিত রয়েছে যে ইহুদী কর্তৃক প্রদত্ত সে বাগানটি সঙ্গে সঙ্গেই ছিন্নমূল লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়েছিল।[১]

ফাদাক এবং খায়বরের বাগানের প্রশ্নে আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাত এবং শিয়াদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। শিয়াদের দাবি হল, এ দু'টি সম্পত্তি হুযুর (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল। সুতরাং তা উত্তরাধিকারের নিয়ম মোতাবেক আত্মীয়স্বজনের প্রাপ্য ছিল। অপর পক্ষে আহ্‌লে সুন্নতের অভিমত হল, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে এ দু'টি সম্পত্তি মহানবী (সাঃ)-এর অধিকারভুক্ত ছিল। যদি তর্কের খাতিরে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবেও মেনে নেয়া হয় তবুও তা অসিয়ত মোতাবেক মুসলিম সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

এ মতভেদ অবশ্য খোদ সাহাবায়ে কেরামের সময়েই সৃষ্টি হয়েছিল। হুযুর (সাঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাস, কন্যা হযরত ফাতেমা এবং উম্মল মুমেনীনদের কেউ কেউ বাগান কয়টি আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারিদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়ার দাবি উত্থাপন করেছিলেন।[২] কিন্তু হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) প্রমুখ সাহাবিদের অভিমত ছিল যে এ সমস্ত সম্পত্তি মুসলিম জনগণের কল্যাণার্থে ওয়াক্‌ফকৃত। সুতরাং রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে হুযুর (সাঃ)-এর আমলদারীতে তিনি এ সম্পত্তির আয় যে সমস্ত খাতে ব্যয় করতেন, এ সমস্ত সম্পত্তির আয় খেলাফতের তত্ত্বাবধানে সে সমস্ত খাতেই ব্যয়িত হবে, এ নীতিতে কোন প্রকার রদবদল করা চলবে না।[৩]

হুযুর (সাঃ) জীবদ্দশায় এ সমস্ত সম্পত্তির আয় বিভিন্ন কয়েকটি খাতে ব্যয় করার ব্যবস্থা করেছিলেন। বনূ নযীরের বাগান থেকে যা আমদানী হত, তা যেকোন জরুরী পরিস্থিতির জন্য সঞ্চয় করে রাখা হত। ফাদাক-এর আমদানী আগন্তুকদের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। খায়বরের আমদানী তিন ভাগ করে দু'ভাগ গরীব মুসলমানদের জন্য ব্যয় হত এবং অবশিষ্ট এক ভাগ উম্মুল মোমেনীনদের ব্যয়ভার নির্বাহ্ করার জন্য তাঁদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হত। এর মধ্য থেকেও যা বেঁচে যেত তদ্দ্বারা ছিন্নমুল মোহাজেরগণের প্রয়োজন মিটানো হত।[৪] শেষ পর্যন্ত হযরত আলী এবং হযরত আব্বাসের (রাঃ) উপর্যুপরি দাবির পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ওমর (রাঃ) স্বীয় খেলাফত আমলে মদীনার বাগানটি তাঁদের দুজনের মাঝে ভাগ করে দিয়েছিলেন। তবে ফাদাক ও খায়বরের সম্পত্তি

১. বোখারী ঃ খুমুস-এর অধ্যায়।
২. বোখারী ঃ ফরায়েয অধ্যায়।
৩. বোখারী ঃ ফরায়েয অধ্যায়।
৪. আবু দাউদ।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের আমলদারী পর্যন্ত ইসলামী খেলাফতেরই তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছিল।[১]

পশুসম্পদ ঃ কোন কোন সীরাত লেখক হুযুর (সাঃ)-এর অশ্বাদি এবং অন্যান্য পশুসম্পদের যে সমস্ত চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন তা পাঠ করলে অবশ্য মনে হয় যে একজন বিরাট ভূস্বামীর আস্তাবলে অথবা পশুপালনের মালিকের বিবরণই পঠিত হচ্ছে।

তাবারী হুযুর (সাঃ)-এর সওয়ারীর অশ্বাদি, উটসমূহ এবং অন্যান্য পশুপালনের বিরাট তালিকা এমন কি, নাম-পরিচয় পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। তাবারীর এ সমস্ত বিবরণ সত্য হলে তা নিঃসন্দেহে কৌতুকোদ্দীপক হত। কিন্তু মুশকিল হল এই যে তাবারী এ ধরনের যতগুলো বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন তার সব কয়টির উৎসই ওয়াকেদীর বর্ণনা। ইয়ামারী, মোগলতাঈ ও হাফেয ইরাকীর মত প্রখ্যাত মোহাদ্দেসগণ পর্যন্ত ওয়াকেদীর এ সম্পর্কিত বর্ণনা উদ্ধৃত করার ফলে অনেকেই সরলভাবে তা বিশ্বাস করে থাকেন। কিন্তু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ সম্পর্কিত সবগুলো বর্ণনার উৎসই গল্পবিশারদ ওয়াকেদী থেকে গৃহীত। আর ওয়াকেদীর এ সমস্ত গাল-গল্পের ওজন কতটুকু তা কোন চিন্তাশীল পাঠকের অবিদিত থাকার কথা নয়।

বোখারী শরীফে উম্মুল মুমেনীন আয়েশা ও উম্মুল মুমেনীন হযরত জুয়াইরিয়ার ভাই হযরত আমর ইবনুল হোয়াইরিসের (রাঃ) যে দু'টি সহীহ বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় মাত্র একটি আরোহণের খচ্চর ছাড়া হুযুর (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত আর কোন পশুসম্পদই ছিল না। শুদ্ধমত সনদের মাধ্যমে বর্ণিত বোখারী শরীফের দু'দুটো হাদীসের মোকাবিলায় ওয়াকেদীর বর্ণনা কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা সহজেই অনুমেয়।

বিভিন্ন সহীহ হাদীস পর্যালোচনা করলে অবশ্য হযরত আমর ইবনুল হোয়াইরিস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত সংক্ষিপ্ত তালিকার বাইরে আরও কিছু পশু-সম্পদ হুযুর (সাঃ)-এর মালিকানাধীন ছিল বলে জানা যায়। তবে এ সমস্ত হাদীসের মোকাবিলায় আমরের বর্ণনা কোন মতপার্থক্য সৃষ্টি করে না। কেননা, বিভিন্ন সময় নিঃসন্দেহে হুযুর (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত মালিকানায় ও ব্যবহারের বিভিন্ন ধরনের পশু এসেছে। কিন্তু ওফাতের পূর্বেই হুযুর (সাঃ) বিভিন্ন সময়ে সেগুলো বিভিন্ন লোককে দিয়ে দেন। দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর যা তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদ হিসাবে গণ্য হয়েছিল, হযরত আমরের বর্ণনায় শুধুমাত্র সেগুলোই উল্লেখ করা হয়েছে।

---

১. আবু দাউদ ঃ হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয় ফাদাকের বাগান সৈয়দ বংশের লোকদেরকে দিয়েছিলেন।

বিভিন্ন সময়ে হুযুর (সাঃ) যে সমস্ত পশু ব্যবহার করেছেন, বিভিন্ন কিতাব থেকে সেগুলোর এ ধরনের বিবরণ সংগ্রহ করা যায় ঃ

(১) **নাহীফ** নামক একটি অশ্ব যা সাধারণত হযরত উবাই ইবনে আব্বাসের বাগানে রাখা হত। বোখারী শরীফের কিতাবুল জেহাদে এটির উল্লেখ রয়েছে।

(২) **আফীরা** নামক একটি গাধা ছিল। হযরত মোয়ায বর্ণনা করেন যে একবার হুযুর (সাঃ) আমাকে তাঁর সঙ্গে এ গাধায় বসিয়ে নিয়েছিলেন। (বোখারী, কিতাবুল জেহাদ)

আয্‌বা বা ক্বাসওয়া ঃ হুযুর (সাঃ)-এর একটি উষ্ট্রীর নাম। তাবারী-১৭৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে হিজরতের পূর্বে এ উষ্ট্রীটি হযরত আবু বকরের কাছ থেকে কেনা হয়েছিল এবং এ উষ্ট্রীর পিঠে আরোহণ করেই হুযুর (সাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। মদীনায় পৌছার পর এ উষ্ট্রীই তার মহান প্রভুকে বয়ে নিতে হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর ঘরের সামনে গিয়ে থেমেছিল।[১] বিদায় হজের সে স্মরণীয় ভাষণও তিনি এ উষ্ট্রীর পিঠে বসেই দিয়েছিলেন। এটি এত দ্রুতগামী ছিল যে সব সময় দৌড় প্রতিযোগিতায় সবাইকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেত।

একবার মরুভূমির জনৈক বেদুঈন একটি অল্প বয়স্কা উষ্ট্রী নিয়ে মদীনায় এলে সাহাবিদের মধ্যে কয়েকজন সেটির সঙ্গে বেদুঈনের উষ্টীটির বাজি ধরে বসেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন বেদুঈনের উষ্ট্রী কাসওয়াকে হারিয়ে দেয়, তখন সাহাবিগণ অন্তরে বড় কষ্ট পান। হুযুর (সাঃ) বিষয়টি জানতে পেরে মন্তব্য করলেন, দেখ! আল্লাহ্‌র নিয়ম হল, দুনিয়ায় যেকোন কিছু যখন সাফল্যের চরম শিখরে পৌছে অহঙ্কারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, তখন কুদরতের অমোঘ বিধান অনুযায়ী তার সে উদ্ধত মস্তক তিনি নত করে দেন। (বোখারী, জেহাদ অধ্যায়)

তাইয়া বা দুলদুল ঃ অধিকাংশ বর্ণনায় শাদা রং-এর এ খচ্চরটির উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আম্‌র ইবনে হোয়াইরিস-এর বর্ণনাতেও এ খচ্চরটির উল্লেখ করা হয়েছে। বোখারী শরীফের ভাষ্যকারদের মতে মিসরের রাজা মুকাওকিস সেটি হুযুর (সাঃ)-কে উপহার হিসাবে দিয়েছিলেন। বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে ঈলার শাসনকর্তা ইবনুল উল্‌মা তবুক যুদ্ধের সময় হুযুর (সাঃ)-কে আর একটি সাদা রং-এর খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন।

হুনাইনের যুদ্ধে হুযুর (সাঃ) শাদা রং-এর যে খচ্চরটিতে আরোহণ করেছিলেন, সেটি জুযাম গোত্রের সরদার ফারওয়া ইবনে নাফাসা কর্তৃক উপহার

---

১. বোখারী ঃ হিজরত অধ্যায়।

হিসাবে প্রদত্ত হয়েছিল।[১] অনেক সীরাত লেখকই এ খচ্চরটিকে দুলদুল বলে ভুল করেছেন। মুসলিম শরীফে এ সম্পর্কিত বিবরণ রয়েছে।[২]

অস্ত্রশস্ত্র ঃ জীবনকে সুখকর করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থেকে নিজেকে সযত্নে দূরে রাখলেও সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম থেকে সারওয়ারে কায়েনাত (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত ভাণ্ডার মোটেও শূন্য ছিল না। বিশ্বস্ত বর্ণনার মাধ্যমে সে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ ঃ আটটি তলোয়ার, নাম— মা'সুর , আসাব, যুলফিকার, ক্কালয়ী, তুবার, হাতাফ, মাখ্‌যাম ও ক্কাযীব।

মা'সুর নামক তলোয়ারটি তিনি পৈতৃক সম্পত্তি হিসাবে পেয়েছিলেন। যুলফিকার বদর যুদ্ধে পাওয়া। এর হাতল ছিল রৌপ্য নির্মিত। মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর হাতে যে তলোয়ারটি ছিল, তার হাতল ছিল স্বর্ণ নির্মিত।

সাতটি বর্ম ঃ নাম ঃ যাতুল ফযুল, যাতুল বেশাহ্‌, যাতুল হাওয়াশী, সাদীয়া ও ফিয্‌যা। এতদ্ব্যতীত ছিল তেরটি যরনক, (কুঠার জাতীয় অস্ত্র)। শেষ বিদায়ের সময় যাতুল ফযুল নামক বর্মটি ত্রিশ সা' পরিমাণ গমের পরিবর্তে এক বছরের জন্য জনৈক ইহুদীর কাছে বন্ধক ছিল।[৩] আরবে তখনকার দিনে চামড়ায় নির্মিত বর্মের প্রচলন থাকলেও হুযুর (সাঃ)-এর সব কখানি বর্মই ছিল লৌহ্‌ নির্মিত।

ছয়টি ধনুক ঃ নাম ঃ যাওরা, রাওহা, সাফরা, বাইযা, কাতুম ও শাদ্দাদ। কাতুম নামক ধনুকটি ওহুদ যুদ্ধের সময় ভেঙে যায়। ভগ্ন ধনুকটি হুযুর (সাঃ) হযরত কাতাদাহ্‌কে দিয়ে দিয়েছিলেন। তীর রাখার একটি তুণীর ছিল। তার নাম ছিল কাফুর। চামড়ায় নির্মিত একটি পেটী ছিল এবং তন্মধ্যে তিনটি রৌপ্য নির্মিত বলয় ছিল। কিন্তু ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন যে হাদীসের সমস্ত কিতাব খুঁজেও আমি এমন কোন প্রমাণ সংগ্রহ্‌ করতে পারিনি যে হুযুর (সাঃ) জীবনে কোন সময় কোমরে পেটী পরেছেন।

একটি ঢাল, নাম ছিল যালুক্ব।

পাঁচটি বর্শা ঃ লৌহ্‌ নির্মিত দু'টি শিরস্ত্রাণ, নাম— মোয়াশ্‌শাহ্‌ ও সাবুগ।

যুদ্ধের সময় পরার উপযোগী তিনটি জুব্বা ছিল। তন্মধ্যে একটি ছিল কাঁচা রেশমে নির্মিত সবুজ রং-এর।

দু'টি পতাকা ঃ একটি ছিল গাঢ় কালো রং-এর যার নাম ছিল উক্কাব এবং অপরটি শাদা ও জরদ রং-এর ডোরা বিশিষ্ট।

১. মুসলিম শরীফ ঃ কিতাবুল জেহাদ।
২. ফতহুল বারী ঃ হুনাইন যুদ্ধের বিবরণ।
৩. বোখারীঃ বিক্রয় ও রেহান অধ্যায়।

পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন ঃ উপরোক্ত বস্তুসামগ্রী ছাড়াও সাহাবিদের কাছে হুযুর (সাঃ)-এর কতিপয় স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত ছিল।

বিদায় হজের সময় হুযুর (সাঃ) মাথার কেশ মুণ্ডন করার পর মুণ্ডিত কেশরাজি ভক্তবৃন্দের মধ্যে বন্টন করেছিলেন। এর অধিকাংশই হযরত আবু তালহা আনসারী পেয়েছিলেন।[১] হযরত আনাস ইবনে মালেকের কাছে পবিত্র দাড়ির কয়েকখানা কেশ রক্ষিত ছিল। চিরুনি করার সময় দাড়ি মোবারকের দু'একখানা অংশ চলে এলে সেগুলো সাহাবিগণ পরম যত্নে সংরক্ষণ করতেন। এতদ্ব্যতীত হযরত আনাসের (রাঃ) কাছে পবিত্র পায়ে ব্যবহৃত একজোড়া জুতা ও ভাঙ্গা একটি কাঠের পেয়ালা ছিল। পেয়ালাটির দু'টি অংশ রুপার দ্বারা জোড়া লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল।

যুলফিক্কার নামক তলোয়ারটি হযরত আলী (রাঃ) পেয়েছিলেন। এটি পবিত্র স্মৃতি হিসাবে তাঁর খান্দানে রক্ষিত ছিল। কারবালা যুদ্ধের পর সেটি ইমাম আলী ইবনে হোসাইন যয়নুল আবেদীনের হাতে আসে। সাহাবিদের অনেকেই এ মহামূল্য স্মৃতিচিহ্নটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় হযরত ইমামের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়ার আবেদন করলেও তিনি তা কোন শর্তেই হাতছাড়া করেননি।[২]

যে কাপড় পরিহিত অবস্থায় হুযুর (সাঃ) দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, সেগুলো হযরত আয়েশা (রাঃ) সংরক্ষণ করেছিলেন।[৩]

ইসলামী খেলাফতের উত্তরাধিকার হিসাবে হুযুর (সাঃ)-এর লাঠি এবং আংটি পর্যায়ক্রমে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর এবং হযরত ওসমানের (রাঃ) কাছে হস্তান্তরিত হয়। তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমানের আমলদারীতেই এ পবিত্র দু'টি বস্তু বিনষ্ট হয়ে যায়। যে আংটি দ্বারা হুযুর (সাঃ) চিঠিপত্র এবং রাষ্ট্রীয় ফরমানসমূহে সীলমোহর লাগাতেন, সেটি হযরত ওসমানের হাত থেকে একটি কূপে পড়ে যায়, আর সে সুবিখ্যাত লাঠিটি জাহ্‌জাহ্ গেফারী ভেঙে ফেলে।[৪]

বাসস্থান ঃ অতি অল্প বয়সেই হুযুর (সাঃ) পিতৃমাতৃহীন হন। তারপর থেকে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত দাদা এবং চাচার সঙ্গে বসবাস করেন। বিয়ের পর হুযুর (সাঃ) পৈতৃক বাড়িতেই বসবাস করেছেন না হযরত খাদীজার বাড়িতে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন, এ সম্পর্কিত কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় না। পৈতৃক বাসস্থানের একটি অংশ অবশ্য উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু হিজরতের পর হযরত আলীর ভাই আকীল সে ঘরখানি দখল করে নেন। সে সময় পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি।

---

১. মুসলিম ঃ হাজ্জাতুলবেদা অধ্যায়।
২. বোখারী ঃ তাহারাত অধ্যায়।
৩. বোখারী ঃ কিতাবুল খুমুস।
৪. ফতহুল বারী— ২য় খণ্ড।

মক্কা বিজয়ের পর লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! (সাঃ), আপনি কি নিজের বাড়িতে অবস্থান করবেন? জবাব দিলেন, আমার বাড়ি তো আকীলের দখলে![১]

হিজরতের পর মদীনায় ছয় মাস পর্যন্ত হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর ঘরেই অবস্থান করতে থাকেন। তখন হুযুর (সাঃ) একা ছিলেন। পরিবার-পরিজনের কেউই তখনও মদীনায় এসে পৌছাননি।

মসজিদ নির্মাণ করার সময় মসজিদের পাশেই ছোট ছোট কুটির তৈরি করিয়ে হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর ঘর থেকে উঠে আসেন। কুটির কয়টিকে বাসোপযোগী করে মক্কা থেকে পরিবার পরিজনকে আনিয়ে নেন এবং সপরিবারে সেসব কুটিরেই বসবাস শুরু করেন।[২]

জীবনের শেষ দিনগুলোতে পবিত্রাত্মা বিবিগণ ছিলেন নয়জন। এঁদের প্রত্যেকেই মসজিদ পার্শ্বস্থ কুটিরগুলোর পৃথক পৃথক কামরায় বাস করতেন। শাহানশাহে মদীনার সে কুটিরগুলোতে কোন বারান্দা বা আঙ্গিনা ছিল না। ছয় থেকে সাত হাত প্রস্থ এ সমস্ত কুটিরের দেয়াল ছিল খেজুর শাখার মধ্যে কাদামাটি লাগিয়ে তৈরি করা। ছাদও খেজুর শাখা এবং নরম মাটি দ্বারাই তৈরি করা হয়েছিল। দেয়াল এবং ছাদে রোদবৃষ্টি কোনটাই আটকাতে পারত না। বৃষ্টির সময় পশমের কম্বল টাঙিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হত। ছাদের উচ্চতা এত অল্প ছিল যে সোজা হয়ে দাঁড়ালে অনায়াসে তা নাগাল পাওয়া যেত। প্রত্যেক কুটিরে একটি করে দরজা ছিল। এগুলো কোন কোনটিতে মোটা পর্দা ঝুলানো থাকত, আর কোন কোনটিতে এক পাল্লার ঝাঁপ লাগিয়ে রাখা হত।[৩]

হুযুর (সাঃ) পর্যায়ক্রমে এক এক রাত্রি এক এক বিবির কুটিরে যাপন করতেন। দিনের অধিকাংশ সময় সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে মসজিদেই কাটাতেন। মসজিদ ছিল তাঁর কুটির সংলগ্ন বসার ঘর এবং কার্য পরিচালনার প্রধান দফতর।

পরিবার-পরিজনদের কুটিরগুলো ছাড়াও হুযুর (সাঃ)-এর জন্য নিরিবিলি বিশ্রাম করার উপযোগী আরও একটি কুটির নির্মাণ করা হয়েছিল, যা মেহমানদের আপ্যায়নের জন্যও ব্যবহৃত হত। সাধারণত এ কামরাটি 'মাশরাবা' নামে অভিহিত হত। মাটির দেয়াল বিশিষ্ট খেজুর পাতায় ছাওয়া এ কুটিরেই হুযুর (সাঃ) দ্রুতগামী একটি ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আহত হওয়ার পর দীর্ঘ এক মাসকাল অবস্থান করেছিলেন।

১. বোখারী ঃ মক্কা বিজয় অধ্যায়।
২. ইবনে সা'আদ।
৩. ইমাম বোখারী সংকলিত আল-আবাদুল মুফরাদ।

সমগ্র আরবের একচ্ছত্র অধিপতি শাহানশাহে মদীনার এ বিশেষ বাসস্থানটিতে যে আসবাবপত্র ছিল, সীরাত লেখকগণ তার সঠিক বিবরণ উদ্ধার করেছেন। এতে দেখা যায়, বিছানার জন্য খেজুর পাতার চাটাই, খেজুর গাছের আঁশ ভর্তি চামড়ার একটি তাকিয়া এবং দেয়ালে কয়েকটি পশু চর্ম টাঙানো ছিল।[১]

মদীনার যে কুটির থেকে নূরের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়ে সারা দুনিয়া আলোকিত হয়েছিল, তেলের অভাবে অনেক সময় সেগুলোতে সন্ধ্যা প্রদীপও জলত না। ঘরের ভেতরে আসবাবপত্র বা সাজ-সজ্জাও অনেক সময় দেখা যেত না। একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) কয়েক টুকরো ডোরাদার ছাপানো কাপড় দ্বারা কুটিরের ভেতরকার দেয়াল সামান্য একটু সাজিয়েছিলেন। এটুকু 'বিলাসের' লক্ষণ দেখেই হুযুর (সাঃ) অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আয়েশা! ইট-পাথরকে পোশাক পরাবার জন্য আল্লাহ্ আমাদের অর্থ দেননি।[২]

হুযুর (সাঃ)-এর ওফাতের পর কুটিরগুলোতে মুসলিম জননীগণই অবস্থান করতেন। এঁদের ওফাতের পর তা তাঁদের উত্তরাধিকারিদের হাতে চলে যেতে থাকে। হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁর খেলাফত আমলে কয়েকটি কুটিরই সে সমস্ত উত্তরাধিকারিদের কাছ থেকে ক্রয় করে নিয়েছিলেন।[৩]

হযরত ওমরের (রাঃ) খেলাফতকাল পর্যন্ত কুটিরগুলো অটুট ছিল। হযরত ওসমান (রাঃ) কয়েকটি খরিদ করে নিয়ে ভেঙে মসজিদের সঙ্গে যুক্ত করে দেন। ওলী ইবনে আব্দুল মালেকের আমলদারী পর্যন্ত অনেকগুলো কুটীরই অবশিষ্ট ছিল। হিজরী ৮৮ সনে মদীনার তৎকালীন শাসনকর্তা ওমর ইবনে আবদুল আযীয রওজা মোবারক তথা হযরত আয়েশার কুটীরখানি ছাড়া সবগুলো ভেঙে মসজিদের সঙ্গে যুক্ত করে দেন। যেদিন এ কুটিরগুলো ভাঙা হয় সেদিন সারা মদীনায় এ বলে মাতম শুরু হয়ে গিয়েছিল যে আজ থেকে মদীনার বুক থেকে হুযুর (সাঃ)-এর আরও একটি স্মৃতিচিহ্ন মুছে গেল।[৪]

পরিচারিকা ঃ পিতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকার হিসাবে হুযুর (সাঃ) একজন কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসীও লাভ করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল উম্মে আয়মান। ইনিই ছিলেন হুযুর (সাঃ)-এর প্রথম ধাত্রী।[৫]

হুযুর (সাঃ) তাঁকে মা বলে সম্বোধন করতেন এবং যখনই দেখতেন বলে উঠতেন, আমার পিতামাতার শেষ স্মৃতি হিসাবে একমাত্র আপনিই এখনও জীবিত আছেন।

---

১. বোখারী ঃ হুযুর (সাঃ) পোশাক ও বিছানা সম্পর্কিত আলোচনা অধ্যায়।
২. বোখারী ঃ প্রথম খণ্ড।
৩. ইবনে সা'আদ।
৪. ইবনে সা'আদ।
৫. মুসলিম শরীফ।

হযরত খাদীজার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর হুযুর (সাঃ) তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে একান্ত প্রিয় খাদেম এবং পালক পুত্র হিসাবে পরিচিত হযরত যায়েদের সঙ্গে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ তারই গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন।

হুযুর (সাঃ) তাঁর সরলতার সুযোগে অনেক সময় মধুর রসিকতাও করতেন। সীরাতের কিতাবে বর্ণিত আছে, একবার একজন স্ত্রীলোক এসে নিবেদন করলেন, হুযুর, আমাকে একটি উট দান করুন, আমার বড় দরকার। হুযুর (সাঃ) বললেন, যাও, তোমাকে উটের বাচ্চা দেব। স্ত্রীলোকটি যখন নিরাশ হয়ে জানতে চাইলেন যে উটের বাচ্চা নিয়ে তিনি কি করবেন, তখন হেসে জবাব দিলেন, হায় হায় তুমি কি জান না যে ছোট-বড় সব উটই কোন কোন না উটের বাচ্চা। সীরাত লেখকগণ উল্লেখ করেছেন যে সে স্ত্রীলোকটি ছিলেন হযরত উম্মে আয়মান।

এ নিবেদিতপ্রাণ বীরাঙ্গনা মহিলা অধিকাংশ যুদ্ধেই হুযুর (সাঃ)-এর অনুগমন করতেন। ওহুদের ভয়াবহ যুদ্ধের ময়দানেও তাঁকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তৃষ্ণার্ত সৈন্যদের পানি পান করানো এবং আহতদের সেবা-শুশ্রুষার দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। খায়বরের যুদ্ধেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[১]

একান্ত খাদেমগণ ঃ সাহাবিদের মধ্যে অনেকেই দুনিয়াদারীর সকল কাজকর্ম পরিহার করে সর্বক্ষণ হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে নিজদিগকে নিয়োজিত রাখতেন। পতঙ্গের আকুলতা নিয়ে এঁরা নিজেদের পবিত্র সাহচর্যে বিলীন করে দিয়েছিলেন। এঁদের যোগ্যতানুযায়ী বিভিন্নমুখী দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছিল। নিম্নে এদের বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হল।

(১) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ঃ মশহুর সাহাবী, তাঁর বর্ণনা ও প্রজ্ঞার উপরই প্রধানত হানাফী মাযহাবের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) ফেকাহ্ শাস্ত্রের বিভিন্ন বিতর্কমূলক বিষয়ে তাঁর মতামতকেই সমধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। বর্ণনার ব্যাপারেও হানাফী দলীলের বর্ণনাধারা অধিকাংশই তাঁর মাধ্যমে প্রাপ্ত। মক্কার জীবনেই তিনি কোরআনের শিক্ষক ও প্রচারকরূপে নিযুক্ত হন। সত্তরটি সূরা খোদ হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র যবান থেকে শুনে তিনি হেফ্য করেছিলেন।

(১) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)ঃ জীবনের অধিকাংশ সময় হুযুর (সাঃ)-এর একান্ত সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। সফরের সময় হুযুর (সাঃ)-এর শয়ন, অজু-মেসওয়াক ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা তাঁর দায়িত্বে থাকত। হুযুর (সাঃ) যখন কোন মজলিস থেকে উঠতেন, তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ

[১] তাবাকাতে ইবনে সা'আদ, ৮ম খণ্ড, উম্মে আয়মন প্রসঙ্গে।

(রাঃ) তাঁর পায়ে জুতা পরিয়ে দিতেন। রাস্তায় চলার সময় হুযুরের লাঠি হাতে নিয়ে তিনি আগে আগে যেতেন। কোন মজলিসে বসার সময় নিজহাতে হুযুরের পবিত্র জুতা খুলে বগলে সংরক্ষণ করতেন এবং মজলিস থেকে ওঠার সময়ে সে জুতা সযত্নে সামনে এনে রেখে দিতেন। মজলিসে, বিশ্রামে, নিরালায় সর্বক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। ফলে, শেষ পর্যন্ত হুযুর (সাঃ)-এর প্রতিটি অভ্যাস অভিব্যক্তি পর্যন্ত তিনি রপ্ত করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। সাহাবিদের মধ্যে তাঁকেই সবাই হুযুর (সাঃ)-এর মহান চরিত্রের নিখুঁত প্রতিবিম্ব মনে করতেন।[১]

(২) হযরত বেলাল (রাঃ)ঃ হুযুর (সাঃ)-এর প্রিয় মোয়ায্যিন। আযানের সঙ্গেই তাঁর পবিত্র স্মৃতি অমর হয়ে আছে। তাঁরই পবিত্র কণ্ঠের সুমধুর আযান শুনে সাহাবায়ে কেরাম নামাযে হাযির হতেন। ইনি হাবসি ক্রীতদাস ছিলেন। মক্কার কঠিন দিনগুলোতেই ক্রীতদাস অবস্থায় ইসলাম কবুল করেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর যেরূপ কঠোর নির্যাতন ভোগ করেও ভক্তি-আবেগের মহা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তার যৎসামান্য বর্ণনা ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁকে কিনে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই তিনি হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করে দেন। হুযুর (সাঃ)-এর পারিবারিক খাদেমরূপে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। বাজার-সওদা, অতিথি-মেহমানের যত্ন এমন কি, ঋণ করে খরচপত্র করা এবং তা পরিশোধ ইত্যাদি সবকিছুই হযরত বেলালের দায়িত্বে অর্পিত ছিল।[২]

(৩) হযরত আনাস ইবনে মালেক ঃ হুযুর (সাঃ)-এর খাদেমদের অন্তর্গত ছিলেন। হিজরতের সময় তিনি নিতান্ত বালক ছিলেন। একদিন তাঁর মাতা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হযরতের দরবারে হাযির হলেন এবং নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ), এটি আমার সন্তান, একে খাদেম হিসাবে গ্রহণ করুন।[৩] এরপর থেকে হযরত আনাস (রাঃ) একাধারে দশ বছর পর্যন্ত হুযুরের খেদমত করেন। ছোট ছোট ফরমায়েশ, আযান দেয়া, পানি হাযির করা ইত্যাদি তাঁর দায়িত্ব ছিল। খুব ছোট ছিলেন বলে অনেক কাজই ঠিকমত করতে পারতেন না। এতদ্সত্ত্বেও হুযুর (সাঃ) কোন দিন তাঁর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেননি বা কেন এ কাজটি করা হল না, এমন কোন জিজ্ঞাসাবাদ করেননি।[৪]

১. তাবাকাতে ইবনে সা'আদ ঃ বোখারী শরীফ দ্রষ্টব্য।
২. আবু দাউদ ২য় খণ্ড, ২৭ পৃঃ।
৩. মুসলিম শরীফ ঃ আনাস অধ্যায়।
৪. আবু দাউদ শরীফ ঃ আদব অধ্যায়।

অবয়ব-আকৃতি ও রুচি প্রকৃতি

হুযুর (সাঃ) ছিলেন মধ্যম অবয়ব, উজ্জ্বল গৌরকান্তি, শাদা এবং লাল মিশ্রিত রং, প্রশস্ত ললাট, যুগল ভ্রূ, পটলচেরা চোখ, মাংসবিরল মার্জিত চেহারা-বিশিষ্ট। দাঁত খুব ঘন সন্নিবিষ্ট ছিল না। উচ্চ গ্রীবা, মাথা বড় এবং বক্ষস্থল ছিল সুপ্রশস্ত। মাথার চুল বেশি কোঁকড়ানো বা একেবারে সোজা ছিল না। ঘন দাড়ি সুরমা রং-এর গভীর কালো চোখ, ঘন লম্বা পলক, মাংসল বাহুমূল, সুলম্বিত বাহু, বক্ষদেশ থেকে নাভি পর্যন্ত হাল্কা চুলের রেখা এবং দু' বাহুতেও হাল্কা পশম ছিল। দু'হাত চৌড়া এবং মাংসপূর্ণ ছিল। সুগঠিত পদযুগলের গুচ্ছদেশ ছিল হাল্কা ধরনের। পায়ের মধ্যভাগে কিছুটা মাংসশূন্য ছিল। এমন কি, পায়ের নিচ দিয়ে এক দিকের পানি অন্যদিকে চলে যেতে পারত।[১]

হুযুর (সাঃ)-এর সুঠাম, অপূর্ব কান্তিময় দেহাবয়ব প্রথম দৃষ্টিতেই লোকের অন্তরে গভীর প্রভাব বিস্তার করত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইহুদী ছিলেন। হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র চেহারার দিকে দেখেই তিনি বলে উঠেছিলেন, "আল্লাহর কসম! এ চেহারা কোন মিথ্যাবাদীর হতে পারে না।"[২]

হযরত জাবের ইবনে সুমুরা নামক সাহাবীকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল, হুযুর (সাঃ)-এর চেহারা কি তরবারির মত চমকাত? সাহাবী জবাব দিলেন-না; বরং পূর্ণ চাঁদের মত।[৩]

এ সাহাবীই অন্যত্র বর্ণনা করেছেন, মেঘের লেশচিহ্নহীন এক শুক্লপক্ষের রাত্রিতে আমি হুযুর (সাঃ)-এর চেহারা মোবারকের দিকে একবার আর একবার আকাশের পূর্ণ চন্দ্রের দিকে তাকাচ্ছিলাম, আমার দৃষ্টিতে তাঁর পবিত্র চেহারা চাঁদ অপেক্ষা উজ্জ্বলতর প্রতিভাত হচ্ছিল।[৪]

সাহাবী হযরত বারা' বলেন, আমি উত্তম পোশাক পরিহিত বহু শৌখীন লোক দেখেছি, কিন্তু হুযুর (সাঃ)-এর চাইতে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক চেহারার কোন লোক আজ পর্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি।[৫]

---

১. শামায়েলে তিরমীযী, বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল প্রভৃতি গ্রন্থে এরূপ আকৃতির কথা উল্লিখিত হয়েছে।
২. তিরমিযী।
৩. মেশকাত শরীফ।
৪. মেশকাত শরীফ, তিরমিযী ও দারেমীর হাওয়ালায়।
৫. মুসলিম শরীফ।

হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র দেহ থেকে নির্গত ঘামের মধ্যেও একপ্রকার সুগন্ধ অনুভূত হত।[১] চেহারা মোবারকে ঘর্মবিন্দু মোতির মত জলমল করে উঠত।[২] শরীর অত্যন্ত মসৃণ এবং চামড়া খুব কোমল ছিল। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, তাঁর গায়ের রং অত্যন্ত সুন্দর এবং শরীর মসৃণ ছিল। গায়ের মধ্যে ঘর্মবিন্দু যেন মোতির ন্যায় চমকাতে থাকত। তাঁর পবিত্র বদন ছিল রেশমের চাইতেও মসৃণ এবং গন্ধ ছিল মেস্ক-আম্বরের চাইতেও সুগন্ধযুক্ত।[৩]

প্রচলিত বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র দেহের কোন ছায়া পড়ত না। অবশ্য কোন নির্ভরযোগ্য সনদে এমন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

মোহরে নবুওত ঃ পিঠে দু' বাহুমূলের মধ্যবর্তী স্থানে হুযুর (সাঃ)-এর মোহরে নবুওত ছিল। তা সাধারণত কবুতরের ডিমের আকৃতিবিশিষ্ট লাল রং-এর সামান্য উত্থিত এক টুকরো মাংস বলেই মনে হত।[৪]

শামায়েলে তিরমিযীতে হযরত জাবের ইবনে সামুরা থেকে বর্ণিত আছে যে "আমি হুযুর (সাঃ)-এর মোহরে নবুওত দেখেছি। সেটি তাঁর পিঠের উপরিভাগের দু' বাহুমূলের মধ্যস্থলে কবুতরের ডিম্বাকৃতিবিশিষ্ট একটি লাল রং-এর ভাসা মাংসপিণ্ডের মত ছিল।"

বিভিন্ন সহীহ্ বর্ণনা একত্রিত করে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে গর্দানের নিচে দু'বাহুমূলের মধ্যভাগে ঈষৎ লম্বা ডিম্বাকৃতির তিলের মত লাল রং-বিশিষ্ট একটু স্থান ছিল। এ বিশেষ চিহ্নটিকেই মোহরে নবুওতে বলে অভিহিত করা হয়েছে।

কেশ ঃ মাথার কেশ অধিকাংশ সময় গর্দান পর্যন্ত প্রলম্বিত থাকত। মক্কা বিজয়ের সময় যাঁরা তাঁকে লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা দেখেছেন, যে মাথার কেশ চার ভাগে বিভক্ত হয়ে গর্দান পর্যন্ত ঝুলে আছে।

আরবের মুশরেক পৌত্তলিকেরা মাথার চুলে সিঁথি কাটত। হুযুর (সাঃ) যেহেতু প্রথম থেকেই মুশরেকদের যাবতীয় আচার-আরচরণের বিরোধিতা করে আহ্লে-কিতাবদের মত আচার অবলম্বন করতেন, তাই প্রথম প্রথম তিনি চুলে সিঁথি কাটতেন না। মক্কা বিজয়ের পর যখন পৌত্তলিকদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রইল না, তখন থেকে তিনি সিঁথি কাটতে থাকেন।

মাঝে মাঝে তিনি চুলে তেল ব্যবহার করতেন, অন্তত একদিন অন্তর চিরুনি ব্যবহার করতেন। ইন্তেকালের সময় দাড়ির কয়েকখানা কেশ পেকে গিয়েছিল।

---

১. মুসলিম শরীফ।
২. বোখারী শরীফ ঃ অপবাদ অধ্যায়।
৩. মেশকাত ঃ বোখারী ও মুসলিম।
৪. মুসলিম শরীফ।

চলাফেরা ঃ পথ চলার সময় দ্রুত চলতেন। সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে হাঁটতেন, মনে হত যেন উঁচু ভূমি থেকে নিচের দিকে অবতরণ করছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রৌদ্রের মধ্যে চললেও তাঁর বদন মোবারকের ছায়া হত না। তবে মোহাদ্দেসগণের কোন সহীহ্ রেওয়ায়েতে এ বর্ণনার কোন সমর্থন দেখতে পাওয়া যায় না।

কথাবার্তা ঃ কথাবার্তা অত্যন্ত মধুর এবং হৃদয়গ্রাহী ছিল। মুচকি হাসির সঙ্গে প্রত্যেকটি শব্দ ও বাক্য পৃথক পৃথকভাবে সুস্পষ্ট উচ্চারণ করতেন। এত সহজ এবং সাবলীল ভাষায় কথা বলতেন যে শ্রোতামাত্রই তা অতি সহজে অনুধাবন করতে এবং স্মরণ রাখতে পারত। কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা হলে তা তিনবার পর্যন্ত উচ্চারণ করতেন। ভাষণ দান করার সময় সাধারণত আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গুরুগম্ভীর স্বরে বলতেন।

হযরত উম্মে হানী (রাঃ) বর্ণনা করেন, "রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কাবা শরীফে কোরআন পাঠ করতেন, তখন আমরা তা বাড়িতে শুয়ে শুয়ে সুস্পষ্ট শুনতে পেতাম।[১]

হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর পূর্ববর্তী স্বামীর পক্ষে এক পুত্র ছিলেন, তাঁর নাম ছিল হিন্দ। তিনি কথোপকথনে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। কথোপকথনের মাধ্যমেই তিনি যে কোন বিষয়ে জীবন্ত ছবি তুলে ধরতে সমর্থ ছিলেন। হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) একদিন তাঁকে হুযুর (সাঃ)-এর বক্তৃতারীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে, তিনি বলেছিলেন ঃ

"হুযুর (সাঃ) অধিকাংশ সময় চুপচাপ থাকতেন, প্রয়োজন ছাড়া সচরাচর কথা বলতেন না। দেখলে মনে হত যে যেন এক গভীর মর্মবেদনায় তিনি ডুবে আছেন। কথা বলার সময় প্রত্যেকটি শব্দ পৃথক পৃথক করে অত্যন্ত সুস্পষ্ট উচ্চারণে বলতেন। কথার মধ্যে কোন ইশারা করতে হলে সম্পূর্ণ হাত তুলে ইশারা করতেন। কোন বিস্ময়ের কথা বলার সময় হাত উল্টে নিতেন, বক্তৃতার সময় কখনও কখনও এক হাতের উপর আর এক হাত মারতেন। কথায় কথায় কোথাও হাসির কথা এসে গেলে দৃষ্টি নিচের দিকে নামিয়ে নিতেন। তিনি মৃদু হাসতেন। এটাই ছিল হুযুর (সাঃ)-এর হাসি।[২]

সাহাবী হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেন যে "যখনই আমি হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হতাম, তিনি আমাকে দেখেই মুচকি হাসতেন, কোনদিন এমন হয়নি, যখন তিনি আমাকে দেখে হাসেননি।"

১. ইবনে মাজাহ্, রাত্রিকালীন নামাযের কেরাত প্রসঙ্গ।
২. শামায়েলে তিরমিযী।

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে অধিক হাসি পেলে কখনও কখনও উপরিভাগের একপাটি দাঁত প্রকাশ হয়ে পড়ত। কিন্তু হযরত ইমাম ইবনে কাইয়্যেম (রাঃ)-এর মতে এ বর্ণনা ঠিক নয়। কেননা, দন্তপাটি প্রকাশ পেতে পারে এমন প্রবলভাবে তিনি কখনও হাসতেন না।

পোশাক-পরিচ্ছদ ঃ কোন বিশেষ পোশাকের প্রতি হুযুর (সাঃ)-এর বিশেষ কোন আকর্ষণ বা বাধ্যবাধকতা ছিল না। সাধারণত কামিজ, চাদর ও তহবন্দ পরিধান করতেন। কোনদিন পা'জামা ব্যবহার করেননি। অবশ্য ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বর্ণনা করেছেন যে একবার হুযুর (সাঃ)-কে মিনার বাজার থেকে পা'জামা খরিদ করতে দেখা গিয়েছে। হাফেয ইবনে কাইয়্যেম লিখেছেন, এর দ্বারা অনুমিত হয় যে হুযুর (সাঃ) হয়ত কখনও কখনও পাজামা পরিধান করেছেন।

সাধারণত মোজা পরতেন না। তবে বাদশাহ্ নাজ্জাশী উপহারস্বরূপ যে কোলো রং-এর এক জোড়া মোজা পাঠিয়েছিলেন, কখনও কখনও তাই পরতেন। সাধারণ বর্ণনায় দেখা যায়, এ মোজা জোড়া ছিল চর্ম নির্মিত।

পাগড়ি ঃ মাথায় আমামা বা পাগড়ি বাঁধতেন। পাগড়ির শেমলা (বর্ধিত অংশ) কোন কোন সময় কাঁধের উপর, আবার কোন কোন সময় গর্দান বরাবর পিছন দিকে ঝুলে থাকত। কোন কোন সময় তা গলাবন্ধের ন্যায় জড়িয়ে রাখতেন। অধিকাংশ সময়ই কালো রং-এর পাগড়ি ব্যবহার করতেন। পাগড়ির নীচে মাথার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা টুপিও পরিধান করতেন। কখনও উঁচু টুপি পরিধান করেননি। পাগড়ির নিচে অবশ্যই টুপি পরে রাখতেন এবং এরশাদ করতেন, "আমাদের আর পৌত্তলিকদের মধ্যে তফাৎ হল, তারা আমামার নিচে টুপি পরে না আর আমরা টুপি পরে তার উপর পাগড়ি বেঁধে থাকি।"[১]

চাদর ঃ পোশাকের মধ্যে মহানবী (সাঃ) ইয়ামনে নির্মিত চিকন পাড়বিশিষ্ট চাদর অত্যধিক পছন্দ করতেন। এ ধরনের চাদরকে "হেবরা" বলা হত।

আবা ঃ কোন কোন সময় সিবীয় আবাও ব্যবহার করেছেন। এ সমস্ত আবার কোনটির আস্তিন এত সরু ছিল যে ওযু করার সময় হাত বের করতে কষ্ট হত এবং শেষ পর্যন্ত তা খুলে রেখে ওযু করতে হত। আস্তিন এবং পকেটের মধ্যে রেশমী কাজ করা "নওশেরওয়ানী" আবাও পরতে দেখা গেছে।

কম্বল ঃ হুযুর (সাঃ) যে কম্বলটি ব্যবহার করতেন, ইন্তেকালের পর হযরত আয়েশা (রাঃ) তা এবং পরনের একটি তহবন্দ লোকদেরকে দেখাতেন। কম্বলটিতে কয়েকটি তালি লাগানো ছিল।

১. আবু দাউদ ঃ পোশাক অধ্যায়।

শাল ঃ কখনও কখনও হুযুর (সাঃ) ইয়ামনে নির্মিত লাল কাজ করা সুদৃশ্য চাদর ব্যবহার করেছেন। এ ধরনের চাদরকে "হুল্লায়ে হামরা" বলা হত। ইমাম ইবনে কাইয়্যেম লিখেছেন, হুযুর (সাঃ) লাল রং-এর পোশাক অপছন্দ করতেন এবং জীবনে কখনও তা ব্যবহার করেননি। পুরুষের জন্য লাল রং-এর কাপড় ব্যবহার জায়েযও রাখেননি। সুতরাং "হুল্লায়ে হামরা" বলতে যাঁরা লাল রং-এর চাদর অর্থ করেছেন, তা আদৌ ঠিক হয়নি।" যারকানীতে অবশ্য এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা স্থান লাভ করেছে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে আমরা যা জানতে পেরেছি, তাতে দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ে লাল, কালো, জাফরানী, শাদা নির্বিশেষে সব রং-এর কাপড়ই তিনি ব্যবহার করেছেন, তবে শাদা রং-ই তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি পছন্দ করতেন।[১]

কোন কোন সময় উটের হাওদার চাপযুক্ত কাপড়ের চাদরও পবিত্র অঙ্গে দেখা গেছে।[৩]

না'লাইন ঃ না'ল মোবারক ছিল আমাদের দেশে প্রচলিত চটির মত। এর মাঝে দু'টি ফিতা থাকত মাত্র।

বিছানা ঃ চামড়ার মধ্যে খেজুরের খোসা ভরে গদির মত করে মহানবীর (সাঃ) বিছানা তৈরি করা হয়েছিল। চামড়ার আস্তরণের ভেতর তুলা দেয়া হত না। দড়ির নির্মিত একটি চারপায়াও ব্যবহার করতেন। অনেক সময় রুক্ষ দড়ির বিছানায় শোয়ার ফলে শরীরের দাগ পড়ে যেত।

আংটি ঃ নাজ্জাশী এবং রোম সম্রাটসহ বিশিষ্ট নরপতিগণের নিকট ইসলামের দাওয়াত সংবলিত পত্র পাঠানোর সময় কোন কোন বিজ্ঞ সাহাবী আরয করলেন যে রাজা-বাদশাহদের দরবার দস্তুর মোতাবেক সীলমোহরহীন কোন পত্র সাধারণত তাঁরা গ্রহণ করেন না। এ পরামর্শের পরিপ্রেক্ষিতেই রৌপ্যের একটি আংটি তৈরি করানো হয়েছিল। এর উপরিভাগে তিন ছত্রে "মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ" কথাটি উৎকীর্ণ ছিল। কোথাও কোন পত্র বা ফরমান পাঠাতে হলে এ আংটি দ্বারা সীলমোহর করা হত। সাধারণত রসূলুল্লাহ (সাঃ) ডান হাতে এ আংটি ব্যবহার করতেন।

বর্ম ঃ যুদ্ধের সময় লৌহ-নির্মিত বর্ম এবং মাথায় শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করতেন। ওহুদের যুদ্ধে বদন মোবারকে দু'টি বর্ম পরিহিত ছিল। কখনও কখনও তরবারির মধ্যে রৌপ্য-নির্মিত বাঁটাও ব্যবহার করেছেন।

১. আবু দাউদ ঃ ২য় খণ্ড, লেবাস অধ্যায়।
২. আবু দাউদ ঃ ২য় খণ্ড, লেবাস অধ্যায়।

খানাপিনা ও লেবাস

হুযুর (সাঃ)-এর জীবন ছিল কঠোর কৃচ্ছ্রতার জীবন। সুস্বাদু কোন খাদ্য গ্রহণ করার মত পরিবেশ কোন সময়ই তিনি সৃষ্টি হতে দেননি। বোখারী শরীফের বর্ণনায় দেখা যায়, হুযুর (সাঃ) জীবনে কখনও চাপাতি রুটিও খাননি। এতদসত্ত্বেও কোন কোন খাদ্যবস্তু পছন্দ করতেন। এর মধ্যে সিরকা, মধু, হালুয়া, যয়তুন তেল এবং কদু উল্লেখযোগ্য। তরকারির মধ্যে কদুর তরকারি থাকলে আঙ্গুল ডুবিয়ে কদুর টুকরো বেছে তুলে নিতেন। একবার হযরত উম্মে হানীর ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিছু খাবার আছে কি? উম্মে হানী আরয করলেন, শুধু সিরকা আছে। এরশাদ করলেন, যে ঘরে সিরকা আছে যে ঘরকে খাদ্যশূন্য বলা চলে না। আরবে হাইশ নামীয় এক ধরনের খাদ্যবস্তু তৈরি হত। ঘিয়ের মধ্যে পানি ও খেজুর মিশিয়ে তা তৈরি করা হত। হুযুর (সাঃ) এ খাদ্য অত্যন্ত পছন্দ করতেন।

একবার হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত উম্মে সালমার কাছে গিয়ে এমর্মে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন যে হুযুর (সাঃ) যে খানা অত্যধিক পছন্দ করতেন, আমাদেরকে আজ তেমনি খানা তৈরি করে খাওয়াতে হবে। উম্মে সালমা বললেন, তোমরা কি সে খানা পছন্দ করবে? এ বলে তিনি যব পিষে গরম পানির সঙ্গে গুলে দিলেন এবং ফুটন্ত ডেগে সামান্য জিরা, গোলমরিচ ও যয়তুন তেল দিয়ে এক ধরনের খাদ্য প্রস্তুত করে পরিবেশন করলেন এবং বললেন, হুযুর (সাঃ) এ খানা অত্যধিক পছন্দ করতেন।

গোশ্ত-এর মধ্যে হুযুর (সাঃ) দুম্বা, মুরগী, বাবুই পাখি, উট এবং ছাগলের গোশ্ত ভক্ষণ করেছেন। সামনের রানের গোশ্ত তিনি বেশী পছন্দ করতেন। মাছও খেয়েছেন বলে বর্ণনা রয়েছে। হযরত আয়েশার (রাঃ) এক বর্ণনায় দেখা যায়, সামনের রানের গোশ্তই কেবল পছন্দ করতেন এমন কোন কথা নেই। যেহেতু, জানোয়ারের সামনের রানের গোশ্ত নরম হয়ে থাকে এবং অতি সহজে তা গলে যায়, তাই মাঝ-মধ্যে যখন গোশ্ত পাওয়া যেত, তখন এ অংশই তিনি গ্রহণ করতেন। অবশ্য সাধারণভাবে সামনের অংশের গোশ্তই হুযুর (সাঃ)-এর পছন্দ ছিল।

হযরত সাফিয়ার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর ওলীমার খানায় হুযুর (সাঃ) শুধুমাত্র খেজুর এবং ছাতু পরিবেশন করেছিলেন।

তরমুজ এবং খেজুর একত্রে মিলিয়েও খেয়েছেন, কাকড়ীও পছন্দ করতেন বলে বর্ণনা দেখা যায়। একবার সাহাবী হযরত মোয়াব্বেয ইবনে আফরার কন্যা খেজুর ও কচি কাকড়ী খেদমতে পেশ করেন। কোন কোন সময় রুটির সঙ্গেও খেজুর খেতেন।

পানি ও শরবত ঃ ঠাণ্ডা পানি সবচাইতে বেশি পছন্দ করতেন। কোন কোন সময় শুধু দুধ, আবার কখনওবা দুধের সঙ্গে পানি মিশিয়ে পান করতেন। কিশ্‌মিশ্‌, খেজুর ও আঙ্গুর ভিজানো পানিও পান করতেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। কাঠের তৈরী একটি ভাঙ্গা পেয়ালা ছিল, যা তারের সাহায্যে একত্রে জুড়ে রাখা হয়েছিল, খাওয়ার বরতন হিসাবে সাধারণত এটিই ব্যবহৃত হত। মনে হয়, কাঠের পেয়ালাটি ভেঙে যাওয়ার পর মেরামতের উদ্দেশ্যে তারের সাহায্যে তা একত্রে জুড়ে রাখা হয়েছিল।

খাওয়ার নিয়ম ঃ সাধারণত সামনের যা আসত তাই তৃপ্তির সঙ্গে খেতেন। কোন খাদ্যবস্তু পছন্দ না হলে তাতে হাত দিতেন না, তবে তুচ্ছও করতেন না। হাতের সামনে যা দেয়া হত তাই খেতে শুরু করতেন, এদিক সেদিকে হাত দিতেন না, অন্যকেও এমন করতে নিষেধ করতেন। কোন গদিতে বসে বা কোন কিছুতে হেলান দেয়া অবস্থায় কখনও খানা খেতেন না। এভাবে খাওয়া পছন্দও করতেন না। কখনও টেবিল কিংবা খাঞ্চার উপর খানা রেখে আহার করেননি। খানা রাখার জন্য তদানীন্তন অনারবদের মধ্যে ফরাসের চাইতে সামান্য উঁচু যে কাষ্ঠাসন ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল, তাকেই খাঞ্চা বলা হত। ধনী-আমীর এবং অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা আভিজাত্যের আলামত হিসাবে খাওয়া-দাওয়ার জন্য এ ধরনের কাঠের আসন ব্যবহার করত। হুযুর (সাঃ) এ সব অপছন্দ করতেন।

শুধু আঙ্গুল দ্বারা খানা খেতেন। গোশ্‌তের বড় টুকরো কোন কোন সময় ছুরির সাহায্যে কেটে খেয়েছেন বলেও বর্ণিত আছে।[১]

তবে খানার সময় ছুরি ব্যবহার সংক্রান্ত বর্ণনাটিকে ইমাম আবু দাউদ দুর্বল বর্ণনা বলে অভিহিত করেছেন। কেননা, এ বর্ণনার সনদ পরম্পরায় আবু মাশার নাজীহ্‌ নামক বর্ণনাকারীর কোন কোন বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয় বলে মোহাদ্দেসগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন।[২]

উত্তম পোশাক ঃ হুযুর (সাঃ) কোন কোন সময় অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ উত্তম লেবাসও পরেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস যখন হারূরিয়ার নিকট দূত হিসাবে গমন করেন, তখন তাঁর পরনে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক ছিল। হারূরিয়া কিছুটা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, "ইবনে আব্বাস! এমন পোশাক!" জবাবে হযরত ইবনে আব্বাস বলেছিলেন—"দোষ কি? আমি হুযুর (সাঃ)-কে একবার এমন জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরতেও দেখেছি।"[৩]

---

১. খানা সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো প্রধানত শামায়েলে তিরমিযী এবং ইবনে কাইয়্যেম-এর যাদুল মায়াদ থেকে গৃহীত।
২. বোখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ কুস্তলানী।
৩. আবু দাউদঃ লেবাস অধ্যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) অত্যন্ত সাধকপ্রকৃতির লোক ছিলেন। একবার তিনি বাজার থেকে একটি ইয়ামনী শাল খরিদ করলেন। বাড়ি এসে যখন দেখতে পেলেন,তাতে লাল রং-এর পাড় রয়েছে, তখন সেটি ফেরত দিয়ে দেন। এ ঘটনা হযরত আয়েশার বড় ভগ্নী হযরত আসমা জানতে পেরে হুযুর (সাঃ) এর ব্যবহৃত একটি জুব্বা আনিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, তাঁর পকেট ও আস্তিনের মধ্যে রেশমী কাজ করা সঞ্জাব লাগানো রয়েছে।[১]

বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ্ এবং আমীর ব্যক্তিগণ হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে উপহার স্বরূপ যে সমস্ত মূল্যবান পোশাকাদি পাঠিয়েছিলেন, সেগুলো এক দুবার পরে হুযুর (সাঃ) উপহারের মর্যাদা রক্ষা করেছেন।

পছন্দনীয় রং ঃ সমস্ত রং-এর মধ্যে ধূসর রং সর্বাপেক্ষা পছন্দ করতেন। হাদীসে বর্ণিত আছে যে কোন কোন সময় হুযুর (সাঃ) সমস্ত পোশাকাদি এমন কি পাগড়ি পর্যন্ত ধূসর রং-এ রাঙিয়ে পরতেন।[২]

শাদা রংও খুব পছন্দ করতেন। বলতেন, সমস্ত রং-এর মধ্যে শাদাই সর্বোত্তম।

অপছন্দনীয় রং ঃ লাল রং-এর পোশাক অপছন্দ করতেন। একবার হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) লাল কাপড় পরে দরবারে হাযির হলে এরশাদ করলেন, "এ আবার কোন্ ধরনের পোশাক?" হযরত আব্দুল্লাহ্ তৎক্ষণাৎ গিয়ে ঐ কাপড় আগুনে ফেলে দিলেন। হুযুর (সাঃ) এ সংবাদ জানতে পারলে মন্তব্য করলেন, জ্বালিয়ে ফেলার কি প্রয়োজন ছিল, কোন স্ত্রীলোককে দিয়ে দিলেই তো হত।[৩]

আরবদেশে একপ্রকার লাল মাটি পাওয়া যেত। এ মাটি পানিতে গুলে কাপড় রাঙ্গানোর রেওয়াজ ছিল। এ ধরনের মাটিকে মাগরা বলা হত। এ রং হুযুর (সাঃ) অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। একবার হযরত যয়নব (রাঃ) এ মাটির সাহায্যে কাপড় রং করছিলেন। হুযুর (সাঃ) তাঁর ঘরে পা দিয়েই বিরক্ত হয়ে ফিরে গেলেন। হযরত যয়নব বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ কাপড় ধুয়ে ফেললেন। পুনরায় হুযুর (সাঃ) ঘরে এসে যখন দেখলেন, লাল রং-এর কোনকাপড় নেই, তখন ঘরে প্রবেশ করলেন।[৪]

আরেকবার এক ব্যক্তি লাল রং-এর কাপড় পরে এসে হুযুর (সাঃ) কে সালাম আরয করলে তিনি তার সালামের জবাব দেননি।

১. আবু দাউদ, রেশমী কাজ ও লতাপাতা সম্পর্কিত মাসআলা প্রসঙ্গ।
২. আবু দাউদ ঃ কাপড় রঙ্গানো প্রসঙ্গা।
৩. আবু দাউদ ঃ লাল পোশাক প্রসঙ্গ।
৪. আবু দাউদ ঃ লেবাস অধ্যায়।

একবার সাহাবিগণ সওয়ারীর উটের উপর লাল কাপড় বিছিয়ে দিয়েছিলেন। সারি সারি উটের পিঠে লাল কাপড়ের ছড়াছড়ি দেখে হুযুর (সাঃ) মন্তব্য করলেন, "তোমাদের মধ্যে এ রং ছড়িয়ে পড়ুক, আমি তা দেখতে চাই না। সাহাবিগণ এ মন্তব্য শোনামাত্র ছুটে গিয়ে সমস্ত উটের পিঠ থেকে লাল কাপড় খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন [১]

সুগন্ধি ঃ সুগন্ধি অত্যন্ত পছন্দ করতেন। কোন সুগন্ধিদ্রব্য হাদিয়া স্বরূপ খেদমতে পেশ করলে তা কখনও ফিরিয়ে দিতেন না। আরবে 'সেকতা' নামীয় বিশেষ এক ধরনের আতর তৈরি হত। হুযুর (সাঃ) এ আতর ব্যবহার করতেন। সাহাবীরা বর্ণনা করেন যে যে-গলি বা পথ হুযুর (সাঃ) অতিক্রম করতেন,সে পথের চারদিক সুগন্ধে মোহিত হয়ে যেত। অধিকাংশ সময় বলতেন, "পুরুষ মানুষের প্রসাধন এমন হওয়া চাই যেন সুগন্ধি বিস্তার লাভ করে, কিন্তু রং ফুটে না ওঠে। আর স্ত্রীলোকের প্রসাধনে যেন রং দেখা যায়, কিন্তু সুগন্ধি যেন বিস্তার না হয়।[২]

পরিচ্ছন্ন রুচি ঃ হুযুর (সাঃ) ছিলেন অত্যন্ত পরিচ্ছন্নতাপ্রিয় এবং উন্নত রুচিসম্পন্ন। এক ব্যক্তিকে ময়লা কাপড় পরিহিত দেখে মন্তব্য করলেন, লোকটি কি নিজ হাতে তার কাপড়গুলো ধুয়ে নিতে পারে না?[৩]

এক ব্যক্তি নোংরা কাপড় পরে খেদমতে হাযির হলে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি কিছু সঙ্গতি নেই? লোকটি জবাব দিল, হাঁ হাঁ। জবাব শুনে এরশাদ করলেন, আল্লাহ্ পাক যে নেয়ামত দান করেছেন, বাহ্যিকভাবে তার কিছু প্রকাশ তো থাকা চাই।

রুচি ও সভ্যতায় আরবগণ মোটেও অভ্যস্ত ছিল না। অনেকে মসজিদে এসে নামাযের মধ্যেই সামনে বা ডানে বামে মসজিদের দেয়ালে নির্বিকার চিত্তে থুতু ফেলত।

হুযুর (সাঃ) এ বদভ্যাস অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। দেয়াল থেকে ছড়ির সাহায্যে থুথু-কাশির দাগ নিজ হাতে মুছে দিতেন। একবার মসজিদের দেয়ালে থুথুর দাগ দেখে এমন রুষ্ট হলেন যে পবিত্র চেহারা রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। জনৈক আনসার মহিলা নিজ হাতে দাগগুলো মুছে দিয়ে সে স্থলে সুগন্ধি মাখিয়ে দিলেন। হুযুর (রাঃ)এতে অত্যন্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করে উক্ত আনসার মহিলার প্রশংসা করেন।[৪]

১. শামায়েলে তিরমিযী।
২. আবু দাউদ।
৩. আবু দাউদঃ লবাস অধ্যায়; কাপড় ধৌত করার বিবরণ।
৪. নাসাঈঃ মসজিদ অধ্যায়।

কোন কোন সময় হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র মজলিসে কর্পূর জালিয়ে সুগন্ধি ধোঁয়া দেয়া হত।[১] একদা জনৈকা স্ত্রীলোক হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট জানতে চাইলেন—খেজাব লাগানো কেমন? জবাব দিলেন,কোন দোষ নেই, তবে আমি এ জন্য অপছন্দ করি যে আমার হাবীব হুযুর (সাঃ) মেহদীর গন্ধ পছন্দ করতেন না।"[২]

হুযুর (সাঃ) অনেক সময় মেশক এবং আম্বর ব্যবহার করতেন। এক ব্যক্তির মাথার চুল উস্‌কো-খুস্‌কো দেখে এরশাদ করলেন, লোকটি কি মাথার চুলগুলোও পরিপাটি করে রাখতে পারে না?[৩]

একবার পশমী চাদর গায়ে দেয়ার দরুন শরীর ঘেমে উঠল, তৎক্ষণাৎ সে চাদর খুলে রেখে দিলেন।[৪]

একদিন জুমার জামাতে লোকের ভিড় বেশি হলে বাজারের কাজকর্মে নিয়োজিত লোকদের অপরিষ্কার কাপড় ও ঘামের গন্ধে ক্ষুদ্রপরিসর মসজিদের বাতাস দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে ওঠে। হুযুর (সাঃ) এরশাদ করলেন, "যদি সবাই গোসল করে মসজিদে আসত, তবে কতই না ভাল হত।" সেদিন থেকে জুমার দিন গোসল করে মসজিদে আসা সুন্নত তারীকায় পরিণত হয়ে যায়।[৫]

মসজিদে নববীতে নিয়মিত ঝাড়ু দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। উম্মে মাহজান নাম্নী এক স্ত্রীলোক ঝাড়ু দেয়ার কাজ করতেন। ইবনে মাজায় বর্ণিত আছে, হুযুর (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন কোন অবোধ শিশু বা অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি যেন মসজিদে প্রবেশ করতে না পারে এবং ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্র হিসাবেও যেন মসজিদকে ব্যবহার করা না হয়। সর্বোপরি, জুমার দিন যেন মসজিদের মধ্যে সুগন্ধি বিশিষ্ট ধোঁয়া দেয়া হয়।

বেদুঈন জীবনের প্রভাবে আরববাসীরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বড় একটা ধার ধারত না।এ জন্য পরিচ্ছন্নতা শিক্ষাদান এবং রক্ষা করার ব্যাপারে হুযুর (সাঃ) কে বিশেষ যত্ন নিতে হয়।

বর্তমান কালের বেদুঈন প্রকৃতির লোকদের মত প্রাচীন আরবরাও সচরাচর পথেঘাটেই মলমূত্র ত্যাগ করতে অভ্যস্ত ছিল। হুযুর (সাঃ) এ বদ অভ্যাসকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন এবং লোকদের এ ধরনের কদাচার ত্যাগ করতে উপদেশ দিতেন। হাদীস শরীফের একাধিক বর্ণনায় দেখা যায়, পথেঘাটে বা ছায়াযুক্ত বৃক্ষতলে যারা মলমূত্র ত্যাগ করে, হুযুর তাদের (সাঃ) অভিশাপ দিয়েছেন। এক

১. নাসাঈ-৭৬৪ পৃঃ।
২. নাসাঈ-৭৫৯ পৃঃ।
৩. আবু দাউদ ঃ লেবাস অধ্যায়।
৪. আবু দাউদঃ লেবাস অধ্যায়।
৫. বোখারী, জুমার দিনের গোসল সম্পর্কিত সম্পর্কিত বর্ণনা।

শ্রেণীর আরামপ্রিয় লোক ঘরের ভেতরেই কোন পাত্রে প্রস্রাব করতে অভ্যস্ত ছিল। হুযুর (সাঃ) এরূপ করতে নিষেধ করতেন।[১]

প্রস্রাব করে পানি নেয়া বা প্রস্রাবের ছিটাফোঁটা থেকে কাপড় বাঁচিয়ে রাখার কোন দস্তুরই আরবদের মধ্যে ছিল না। একবার হুযুর (সাঃ) রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পথের পাশের দুটি কবরের দিকে ইশারা করে বললেন, এর মধ্য থেকে একটি কবরে শুধু এ জন্য আযাব হচ্ছে যে লোকটি প্রস্রাবের ছিটাফোঁটা থেকে কাপড় বাঁচাত না।[২]

একদিন মসজিদে এসে দেখলেন, দেয়ালের বিভিন্ন স্থানে থুথু ও দাগ লেগে আছে। হাতে খেজুরের একটি ডাল ছিল, তদ্বারা খুঁড়ে খুঁড়ে সমস্ত দাগ তুলে দিলেন। তারপর লোকজনকে সম্বোধন করে রাগতস্বরে বললেন, কোন লোক সামনে এসে তোমাদের মুখের উপর থুথু ফেললে তোমরা কি তা পছন্দ করবে? কোন লোক যখন নামায পড়ে, তখন আল্লাহ্ তার সামনে এবং ফেরেশতাগণ ডান দিকে থাকেন। সুতরাং কোন অবস্থাতেই সামনে বা ডানে থুথু ফেলা উচিত নয়।[৩]

একজন নামাযের ইমামত করছিলেন। নামাযের মধ্যেই তিনি থুথু ফেললেন। হুযুর (সাঃ) বিষয়টি লক্ষ্য করে নির্দেশ দিলেন, এ ব্যক্তি যেন আর কখনও নামাযের ইমামত না করে। নামাযের পর সাহাবী খেদমতে এসে জানতে চাইলেন যে এমন কোন হুকুম দেয়া হয়েছে কিনা? হুযুর (সাঃ) জবাব দিলেন, হ্যাঁ। কারণ, তুমি আল্লাহ্ এবং তার রসুলকে কষ্ট দিয়েছ।[৪]

পেঁয়াজ, রসুন, মূলা প্রভৃতির কটু গন্ধ হুযুর (সাঃ) অপছন্দ করতেন। হুকুম ছিল, এসব বস্তু খেয়ে যেন কেউ মসজিদে না আসে। বোখারী শরীফের এক বর্ণনায় দেখা যায়, এরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে কেউ পেঁয়াজ রসুন খাওয়ার পর পরই যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে না আসে অথবা আমাদের সঙ্গে নামাযে না দাঁড়ায়।

খেলাফতের যমানায় একদিন হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদে এ মর্মে খুৎবা দিলেন যে তোমরা পেঁয়াজ রসুন খেয়ে মসজিদে চলে আস, অথচ আমি দেখেছি, কোন লোক এ সমস্ত বস্তু খেয়ে মসজিদে এলে হুযুর (সাঃ) সে লোককে মসজিদ থেকে ‘বের করে বাকি' পর্যন্ত হাঁকিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিতেন।[৫]

১. তারগীব ও তারহীবঃতাহারাত অধ্যায়
২. বোখারীঃ কবর আযাবের বর্ণনা।
৩. তারগীব ও তারহীব।
৪. তারগীব ও তারহীব।
৫. মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

সওয়ারী ঃ ঘোড়ার সওয়ারী সর্বাপেক্ষা পছন্দ ছিল। বলতেন, "অশ্ব এমন এক সওয়ারী, যার ললাটদেশে কল্যাণের চিহ্ন লেগে থাকে।"[১] অশ্ব ব্যতীত গাধা, খচ্চর এবং উটও সওয়ারী হিসাবে ব্যবহার করেছেন। হুযুর (সাঃ) এর প্রিয় ঘোড়াটির নাম ছিল 'লুহাইফ' যে গাধা ব্যবহার করতেন সেটির নাম ছিল 'উসাইর' 'খচ্চরের নাম ছিল দুলদুল এবং তাইয়া। ব্যবহারের উট দুটির নাম ছিল কাছওয়া ও আযবা।

ঘোড়দৌড় ঃ মদীনার বাইরে হাসবা থেকে সানিয়াতুলবেদা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি ময়দান ছিল। এ ময়দানকে ঘোড়া দৌড়ানোর অনুশীলন ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করা হত। এক-একটি ঘোড়া তৈরি করার জন্যএকাদিক্রমে দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর্যন্ত অনুশীলন করানো হত। বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এ সমস্ত ঘোড়া অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন এবং যুদ্ধের ময়দানে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কৌশল আয়ত্ত করে ফেলত। প্রশিক্ষণের প্রথম স্তর ছিল ঘোড়াকে দ্রুতগতিসম্পন্ন করে তোলা। এ উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে ঘোড়ার দৌড়ের প্রতিযোগিতাও হত।'সানজা' নামে হুযুর (সাঃ)-এর একটি ঘোড়া ছিল। একবার সেটিকে দৌড়ের মোকাবিলায় দেয়া হল। সবগুলো ঘোড়াকে পেছনে ফেলে যখন সেটি চলে গেল, তখন হুযুর (সাঃ) বিশেষ আনন্দিত হলেন।[২]

অশ্বের প্রশিক্ষণ এবং তদসংক্রান্ত অনুশীলনাদি তদারক করার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল হযরত আলী (রাঃ)-এর উপর তিনি বিশেষ প্রশিক্ষণদাতা হিসাবে সূরাকা ইবনে মালেককে নিয়োজিত করে দৌড়ের মোকাবিলা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিশেষ কয়েকটি নিয়মকানুন ঠিক করে দিয়েছিলেন।

তকবীর ধ্বনির মাধ্যমে ঘোড়া দৌড়ানো শুরু করা হত। হযরত আলী (রাঃ) নিজে উপস্থিত থেকে তা তদারক করতেন।

ঘোড়ার মত উটের প্রশিক্ষণেরও বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। হুযুর (সাঃ) এর আযবা দৌড়ের মোকাবিলায় সব সময় এগিয়ে যেত।একবার জনৈক বেদুঈনের একটি অল্প বয়স্কা উষ্ট্রীর সঙ্গে দৌড়ে আযবা পেছনে পড়ে গেলে সাহাবীরা ব্যথিত হলেন। হুযুর (সাঃ) সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, দেখ,দুনিয়ার কোন জিনিসই যখন বেশি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তখন তাকে থামিয়ে দেয়াই আল্লাহর দস্তুর,এতে ব্যথা পাওয়ার কি আছে?[৩]

অশ্বাদির রং-এর মধ্যে ধূসর, হালকা কালো এবং কাজলা রং বেশি পছন্দ করতেন। মশা মাছি তাড়াতে অসুবিধা হতে পারে, এমনভাবে ঘোড়ার লেজ ছাঁটতে নিষেধ করতেন।[৪]

---

১. নাসাঈ।
২. দারে কুতনী-২য় খন্ড, মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী।
৩. বোখারী।
৪. নাসাঈ।

দৈনন্দিন কাজকর্ম

শামায়েলে তিরমিযীতে হযরত আলী (রাঃ)-এর বর্ণনায় দেখা যায়, হুযুর (সাঃ) সময়কে তিন ভাগে ভাগ করে এক ভাগ এবাদতের জন্য, এক ভাগ মানুষের কল্যাণের জন্য এবং অবশিষ্ট এক ভাগ নিজের জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছিলেন।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঃ ফযরের নামায পড়ার পর জায়নামাযের মধ্যেইএকটু ঘুরে বসতেন। সুর্যোদয়ের পর সাহাবীরা এসে সামনে বসতেন। হুযুর (সাঃ)এ সময় তাঁদের উপদেশ দিতেন, বিশেষ কোন বিষয় শিক্ষাদান করতে হলে এ সময়ই তা করতেন।[১]

অনেক সময় সাহাবীদের জিজ্ঞেস করতেন,রাত্রে তারা কোন স্বপ্ন দেখেছেন কিনা। কেউ কোন স্বপ্নের বৃত্তান্ত বললে তাবীর বর্ণনা করতেন। কখনও কখনও নিজের স্বপ্নের কথা সাহাবীদের শোনাতেন।[২]

এরপর সাধারণএকথাবার্তা শুরু হত। কোন কোন লোক হয়ত জাহেলিয়াত যুগের কোন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতেন। কোন হাস্যরসাত্মক কথার অবতারণা হলে দরবারের সবাই হয়ত হেসে উঠতেন। খোদ হুযুর (সাঃ) পর্যন্ত মুচকি হাসতেন।[৩] সাধারণত, এ সময়ই যুদ্ধলব্ধ মাল বা পারিশ্রমিক এবং বেতনাদিও বন্টন করা হত।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে বেলা একটু চড়ে যাওয়ার পর চার থেকে আট রাকাত পর্যন্ত চাশ্‌ত-এর নামায পড়ে ঘরে চলে যেতেন এবং সাধারণ গৃহস্থালী কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করতেন। নিজ হাতে ছেঁড়া-ফাটা কাপড়ে তালি দিতেন, জুতা সেলাই করতেন, দুধ দোহন করতেন।[৪]

আসরের নামায পড়ে অন্তঃপুরে চলে যেতেন।বিবিদের প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে গিয়ে তাঁদের খোঁজ-খবর নিতেন। যাঁর ঘরে যেদিন অবস্থান করার পালা হত, মাগরেব-এর পর থেকে সেখানেই অবস্থান করতেন। অন্যান্য বিবিগণ এসে সে ঘরেই সমবেত হতেন। এশা পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। তাঁদের কথা শুনতেন।[৫] এশার নামায শেষ করে শুয়ে পড়তেন।সাধারণত, এশার পর কথাবর্তা বলা পছন্দ করতেন না।[৬]

১. মুসলিম, তিরমিযী
২. বোখারী।
৩. নাসাঈ।
৪. বোখারী।
৫. বোখারী।
৬. বোখারী-এশার নামাযের বর্ণনা।

নিদ্রা ঃ সাধারণত, প্রথম ওয়াক্তে এশার নামায পড়ে বিছানায় চলে যেতেন। শোয়ার পূর্বে অবশ্যই কোরআন শরীফের সূরা বনী ইসরাইল, যুমার, হাদীদ, হাশর, সাফ,তাগাবুন, জুমআ প্রভৃতির অন্তত যেকোন একটি পাঠ করে শয়ন করতেন।

শামায়েলে তিরমিযীতে আছে, ঘুমানোর পূর্বে এ দোয়া পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى —

অর্থাৎ, আয় আল্লাহ্! তোমারই নামে মৃত এবং জীবিত হই। ঘুম থেকে উঠে বলতেন ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ —

অর্থাৎ, সেই আল্লাহ্র প্রশংসা করি, যিনি মৃত্যুর পর আমাকে পুনরায় জীবিত করেছেন এবং তার নিকট অবশ্যই ফিরে যেতে হবে।

অর্ধ রাত্রিতে অথবা কখনও কখনও এক প্রহর রাত্রি থাকতেই জেগে যেতেন, শিয়রের কাছেই মেসওয়াক রাখা থাকত। মেসওয়াক করে অযু করতেন এবং এবাদত-বন্দেগীতে ডুবে যেতেন। সব সময় পশ্চিমদিকে সেজদার স্থানে শিয়র দিয়ে শয়ন করতেন।

ডান হাত গন্ডদেশের নিচে দিয়ে ডাহিনে কাত হয়ে শুতেন।সফরের সময় অপরাহ্নে কোথাও অবস্থান করে আরাম করতে হলে ডান হাত উঁচু করে তার উপর মাথা রেখেই ঘুমিয়ে পড়তেন। নিদ্রার মধ্যে সামান্য গলার আওয়ায শোনা যেত।

বিছানার ব্যাপারে কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। কখনও সাধারণ বিছানার উপর, কখনও চামড়া,চাটাই, এমন কি, কখনও কখনও শুধু মাটির উপর শুয়েও আরামে ঘুমিয়ে পড়তেন।[১]

রাত্রির এবাদতঃ ঘরের ভেতরে হুযুর (সাঃ) এর জীবন কেমন ছিল, সে সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর চাইতে বেশি ওয়াকিফহাল আর কেউ ছিলেন না। তিনি বর্ণনা করেছেন, সূরা মোজ্জাম্মিল-এর প্রাথমিক আয়াতগুলোতে তাহাজ্জুদের হুকুম নাযিল হওয়ার পর থেকে হুযুর (সাঃ) সারা রাত জেগে নামায পড়তে শুরু করেন। রাত্রি জাগরণ এবং দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর দু'পা ফুলে গিয়েছিল। এক বছর পর এর সূরার শেষের আয়াতগুলো নাযিল হলে যখন তাহাজ্জুদ নফলে পরিণত হল, তখনই কেবল তিনি ক্রমাগত সারা রাত্রি জেগে নামায পড়া থেকে বিরত হয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেও গভীর রাত্রিতে একাদিক্রমে আট রাকাত নামায পড়ে সালাম ফেরাতেন। আরও এক রাকাত নামায পড়ে তাতেই বসে সালাম ফেরাতেন এবং সর্বশেষে আরও দু রাকাত নামায পড়ে নিতেন। এতে তাহাজ্জুদের সময় মোট এগার রাকাত নামায

১. যারকানীতে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থের হাওয়ালাসহ বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

পড়তেন। বার্ধক্য ঘনিয়ে আসার পর শরীর যখন একটু ভারী হয়ে এসেছিল, তখন মোট সাত রাকাত আদায় করতেন। কোনদিন যদি ঘটনাক্রমে গভীর রাত্রিতে উঠতে না পারতেন, তবে দিনের বেলায় কোন এক সময় বার রাকাত নামায আদায় করতেন।[১]

আবুদ দাউদ শরীফে হযরত আয়েশার (রাঃ) আরও একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে ঃ

"হুযুর (সাঃ) জামাতের সঙ্গে এশার নামায পড়ে ঘরে চলে আসতেন এবং চার রাকাত নামায পড়ে শুয়ে পড়তেন। মেসওয়াক এবং অযুর পানি মাথার কাছে রেখে দেয়া হত। শেষ রাতে উঠে প্রথমে মেসওয়াক করতেন এবং অযু করে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে আট রাকাত তাহাজ্জুদ পড়তেন।"

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, "হুযুর (সাঃ) রাত্রে কিভাবে নামায পড়েন,তা প্রত্যক্ষ করার জন্য আমি এক রাতে আমার খালা উম্মুল মোমেনীন হযরত মায়মুনার ঘরে রয়ে গেলাম। মাটিতে বিছানা পাতা ছিল,হুযুর (সাঃ) এশার পর ঘরে এসে তাতে শুয়ে পড়লেন। অর্ধ রাত্রি অতিক্রান্ত হওয়ার পর চোখ কচলাতে কচলাতে ঘুম থেকে উঠলেন এবং সূরা আলে-ইমরানের শেষ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। মশকে পানি ছিল, তার দ্বারা অযু করে নামায পড়তে দাঁড়ালেন। আমিও অযু করে তার বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে পড়লাম। হুযুর (সাঃ) আমার হাত ধরে তার ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর তের রাকাত নামায পড়ে পুনরায় শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর নাকের আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। ভোর হয়ে এলে হযরত বেলাল আযান দিলেন। আযান শুনেই হুযুর (সাঃ) উঠে পড়লেন এবং পুনরায় ফযরের দু'রাকাত ছুন্নত আদায় করে মসজিদে চলে গেলেন।"

নামাযের আনুষঙ্গিক ক্রিয়াঃ প্রথম প্রথম প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করতেন। শেষ বয়সে এক অযুতে একাধিক ওয়াক্তের নামায আদায় করেছেন।তবে পাঁচ ওয়াক্তেই নামাযের পূর্বে মেসওয়াক অবশ্যই করতেন। মক্কা বিজয়ের সময়এক অযুতে কয়েক ওয়াক্তের নামায আদায় করেছেন।[২] অবশ্য প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের জন্য নুতন নতুন অযু করাই ছিল তাঁর সাধারণ অভ্যাস।

অযুর নিয়ম ছিল—প্রথমে তিনবার করে দুহাত ধৌত করতেন, তারপর তিনবার কুলি করতেন, তিনবার নাকে পানি দিতেন, তিনবার মুখমণ্ডল ও দুহাত ধৌত করে মাথা মাসেহ্ করতেন এবং তিনবার করে দু'পা ধৌত করতেন।

---

১. আবু দাউদঃ রাত্রির নামায।
২. মুসলিম শরীফ।

অবশ্য কোন কোন সময় কোন অঙ্গ একবার, দুবার আবার কোন অঙ্গ তিনবার ধৌত করেছেন বলেও বর্ণনা পাওয়া যায়।[১]

নামায ঃ অধিকাংশ সুন্নত ও নফল নামায ঘরে আদায় করতেন। ভোরে আযান শোনার সঙ্গে সঙ্গেই শয্যাত্যাগ করে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে দুরাকাত সুন্নত পড়ে নিতেন। হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, কোন কোন সময় আমার মনে হত, ফযরের সুন্নতে হুযুর (সাঃ) সূরায়ে ফাতেহাই হয়ত পড়েননি।[২] তবে ফরযের মধ্যে সাধারণত লম্বা সূরা পাঠ করতেন।

হ্যরত আবুল্লাহ্ ইবনে সায়েব (রাঃ) বর্ণনা করেন, "একবার মক্কায় ফযরের নামাযে হুযুর (সাঃ) সূরায়ে মোমেনুন পড়েছিলেন।" কখনওবা সূরা ওয়াললা-ইলিইয়া আসআসা, কখনওবা সূরা ক্বাফ পড়েছেন। সাহাবিগণ অনুমান করেছেন, হুযুর (সাঃ) ফযরের নামাযে সাধারণত ষাট থেকে সত্তর আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন।

জোহ্র ও আসরের নামায ফযরের তুলনায় যদিও কিছুটা সংক্ষিপ্ত হত, তথাপি প্রথম দুরাকাতে সূরায়ে ফাতেহার পর অতটুকু লম্বা সূরা পাঠ করতেন, যে অবকাশটুকুর মধ্যে এক ব্যক্তি বাকি পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসে ঘরে অযু করে প্রথম রাকাতে শামিল হতে পারতেন। সাহাবীরা অনুমান করেছেন যে জোহরের প্রথম দুরাকাতে হুযুর (রাঃ) "আলিফ-লাম তানযীল আস্‌সাজদাহ্" পরিমাণ লম্বা সূরা পাঠ করতেন। শেষের দুরাকাতে প্রথম দুরাকাতের তুলনায় অর্ধেক সময় কেয়াম হত।

আসরের প্রথম দু'রাকাত জোহ্রের শেষ দুরাকাতের ন্যায় লম্বা এবং শেষের দুরাকাত তার অর্ধ পরিমাণ সময় হত।

হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুযুর (সাঃ) যোহরের প্রথম রাকাতে ত্রিশআয়াত পরিমাণ এবং দ্বিতীয় রাকাতে পনের আয়াত পরিমাণ কেরাআত পাঠ করতেন।

হ্যরত জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, জোহরের সময় হুযুর (সাঃ) সাধারণত "ছাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা" পাঠ করতেন।

মাগরেবের নামাযে "ওয়াল মুরসালাত"ও "সূরায়ে তুর" এবং এশার নামাযে 'ওয়াত্তীন' ও তার সমপর্যায়ের সূরা পড়তেন।[৩]

সর্বাপেক্ষা লম্বা সূরা পড়তেন তাহাজ্জুদের নামাযে। সাধারণত সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা পাঠ করতেন।

---

১. মুসলিম শরীফ।
২. মুসলি-১ম খন্ড।
৩. বর্ণনাগুলোর সব কয়টি মুসলিম শরীফের নামায ও দুই ঈদ অধ্যায় হতে সংগৃহীত হয়েছে।

জুমার প্রথম রাকাতে সূরায়ে জুমআ এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা মুনাফিকুন অথবা আলা বা গাশিয়া তেলাওয়াত করতেন।

দু'ঈদের নামাযে সাধারণত সাব্বেহিস্‌মা এবং হালআতা-কা পড়তেন। ঘটনাক্রমে যদি ঈদ এবং জুমা একই দিনে পড়ত,তখন ঐদিনের জুমার নামাযেও এ দুটি সূরাই পড়তেন।

জুমার দিন ফযরের নামাযে "আলিফ-লাম-তানযীল আস্‌সাজদাহ্‌" এবং হালআতাকা আলাল ইনসানে"পড়ার অভ্যাস ছিল।

খুত্‌বা ঃ উপদেশ এবং ওয়ায-নসীহতের জন্য হুযুর (সাঃ) বক্তৃতা বা খুত্‌বা প্রদান করতেন। জুমার নামাযের পূর্বে অতি অবশ্যই খুত্‌বা দেয়া হত।যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা বা সমস্যা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য খুত্‌বার আশ্রয় গ্রহণ করা হত। জুমার দিন লোকজন একত্রিত হলে হুজরা থেকে বের হয়ে লোকজনকে সালাম দিতেন। মিম্বরে আরোহণ করে পুনরায় সমবেত সকলকে সালাম দিতেন এবং দ্বিতীয় আযান হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খুত্‌বা শুরু করতেন। প্রথম প্রথম খুত্‌বা প্রদানের সময় হাতে একটি লাঠি রাখতেন। কিন্তু মিম্বর নির্মিত হয়ে যাওয়ার পর আর লাঠি নিতেন না।

হুযুর (সাঃ) এর প্রত্যেকটি খুত্‌বা বা ভাষণই হত সংক্ষিপ্ত,অর্থপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী। এরশাদ করতেন, দীর্ঘ নামায এবং সংক্ষিপ্ত খুত্‌বা মানুষের দ্বীনী এলেমের গভীরতা প্রমাণ করে।

জুমার খুত্‌বায় সাধারণত কোরআন শরীফের সূরায়ে ক্বাফ তেলাওয়াত করতেন, যার মধ্যে কেয়ামত এবং হাশর ও শেষবিচার সম্পর্কে সবিস্তার অলোচনা রয়েছে।

যে কোন ভাষণ আল্লাহ্‌র প্রশংসাবাদ দ্বারা শুরু করতেন। খুত্‌বা দানরত অবস্থায় যদি কোন জরুরী কাজ এসে পড়ত, তবে খুত্‌বা স্থগিত রেখে মিম্বর থেকে নেমে সে কাজটি সেরে পুনরায় মিম্বরে এসে খুত্‌বা খতম করতেন। একদিন ঠিক খুত্‌বার মাঝে এক ব্যক্তি এসে নিবেদন করল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি একজন দূরদেশী লোক। দ্বীনের জরুরী বিষয় সম্পর্কে এখনও কিছু ওয়াকিফহাল হতে পারিনি। তাই আপনার কাছে কিছু জেনে নিতে এসেছি। লোকটির কথা শোনা মাত্র হুযুর (সাঃ) মিম্বর থেকে নেমে এলেন, মসজিদের ফরাসেই তার জন্য জায়গা দেয়া হল। লোকটিকে সামনে বসিয়ে তার প্রশ্নের উত্তর দিলেন, দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো জানালেন, তারপর পুনরায় মিম্বরে উঠে অবশিষ্ট খুত্‌বা সমাপ্ত করলেন।[১]

১. আল-আদাবুল মুফরাদ-২১৮ পৃঃ।

আরেকবার খুত্‌বা দানরত অবস্থাতেই দেখলেন, শিশু ইমাম হোসাইন (রাঃ) লাল পোশাক পরিহিত অবস্থায় এক পা দু'পা করে মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করছেন। এ অবস্থা দেখে হুযুর (সাঃ) মিম্বর থেকে নেমে গেলেন এবং তোমাদের ধন-সম্পদ এবং আল-আওলাদ তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু—এ আয়াত পাঠ করতে করতে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন এবং পুনরায় মিম্বরে এসে খুত্‌বা সমাপ্ত করলেন।[১]

খুত্‌বা দানরত অবস্থায় লোকজনকে বসার জন্য এমন কি, নামায পড়ে নেয়ার জন্যও নির্দেশ প্রদান করতেন। একবার খুত্‌বা চলাকালে এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি নামায পড়েছ? লোকটি না-বাচক জবাব দিলে তাকে নির্দেশ দিলেন, ওঠ, নামায পড়ে নাও।[২]

যুদ্ধের ময়দানে খুত্‌বা দেয়ার সময় ধনুক হাতে নিয়ে তার উপর ভর দিয়ে খুত্‌বা দিতেন । কোন কোন লোক বর্ণনা করেছেন যে হুযুর (সাঃ) যুদ্ধের ময়দানে তরবারি হাতে খুত্‌বা দিতেন। কিন্তু ইমাম ইবনে তাইমিয়া এ মতের প্রতিবাদ করে লিখেছেন যে "খুত্‌বার সময় হুযুর (সাঃ) হাতে তরবারি রাখেননি।"[৩]

মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে ওয়ায করতেন, যেন শ্রোতাদের জন্য তা অনুধাবন করা অসুবিধাজনক না হয়।[৪]

সফরের রীতিনীতি ঃ হজ ও ওমরা এবং জেহাদের উদ্দেশে হুযুর (সাঃ) অনেক সফল করেছেন। সফরে যাওয়ার সময় উম্মুল মোমেনীনদের মধ্যে লটারী হত। যার নাম আসত তিনি সফরসঙ্গী হতেন।[৫] সাধারণত, বৃহস্পতিবার দিন যাত্রা করা পছন্দ করতেন এবং প্রত্যুষে বেরিয়ে পড়তেন। কোথাও কোন ফৌজ প্রেরণ করার প্রয়োজন হলেও প্রত্যুষেই প্রেরণ করতেন।[৬]

সওয়ারী সামনে আসার পর বিসমিল্লাহ্ বলে রেকাবে পা দিতেন। জিনের উপর ঠিকমত বসে তিনবার তকবীর উচ্চারণ করতেন। যাত্রা শুরু করার সময় নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করতেন ঃ

سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ -

অর্থাৎ, "পবিত্র সেই সত্তা, যিনি এ বাহনকে আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা কোন সময়ই একে অনুগত করে নিতে সমর্থ হতাম না।

১. তিরমিযীঃ হযরত হোসাইন প্রসঙ্গ।
২. বোখারী শরীফঃ খুত্‌বার অবস্থায় আগমনকারী এক ব্যক্তিকে দুরাকাত নামায পড়ে নেওয়ার নির্দেশ প্রসঙ্গ।
৩. যাদুল মা'আদঃ ১ম খন্ড-১২১ পৃঃ।
৪. বোখারীঃ ১ম খন্ড।
৫. বোখারী ২য় খন্ড।
৬. আবু দাউদঃ জেহাদ অধ্যায়।

আর আমরা সবাই আমাদের পরওয়ারদেগারের সকাশে ফিরে যাব"[১] অতঃপর এ দোয়া পাঠ করে মুনাজাত করতেন ঃ

"আয় আল্লাহ্! এ সফরে আমরা তোমার দরবারে নেকী-পরহেযগারী এবং এমন কর্ম করার তওফিক প্রার্থনা করি, যে সমস্ত কাজে তুমি সন্তুষ্ট হও। আয় আল্লাহ্! এ সফর আমাদের জন্য সহজ এবং এর দুরত্ব আমাদের জন্য আসান করে দাও।

আয় আল্লাহ্! সফরে তুমিই আমাদের সঙ্গী,ঘরে রেখে যাওয়া পরিবার পরিজনের তুমিই অভিভাবক।আয় আল্লাহ্! আমরা এ সফর ও ফিরে আসার পথে যাবতীয় কষ্ট ও বিপদাপদ, বাড়িঘর ও সহায়-সম্পদের যেকোন ক্ষতি থেকে তোমারই পানাহ্ চাই।

সফর থেকে ফিরে আসার পর উপরোক্ত দোয়ার সঙ্গে এটুকু সংযুক্ত করে দোয়া করতেন ঃ

"আল্লাহ্র এবাদতের মধ্যে সময় অতিবাহিত করে, তওবা ও পরওয়ারদেগারের প্রশংসা করতে করতে ফিরে আসছি।"

পথ চলতে চলতে উচ্চভূমিতে আরোহণ করার সময় তকবীর উচ্চারণ করতেন, আবার নিচের দিকে অবতরণের সময় গুনগুন করে তসবীহ্ পাঠ করতেন। সঙ্গী সাহাবিগণও হুযুর (সাঃ) এর কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়ে তকবীর ও তসবীহ্ পাঠে যোগ দিতেন। পথের কোন মনযিলে অবতরণ করতে হলে এ দোয়া করতেন ঃ

"হে যমীন, তোমার ও আমার পালনকর্তা ও মালিক আল্লাহ্। আমি তোমার এবং তোমার মধ্যে যা কিছু আছে এবং যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, তোমার উপর যা কিছু বিচরণ করে, সবকিছু থেকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পানাহ্ চাই। আয় আল্লাহ্! আমি তোমার পানাহ্ চাই, বাঘ-ভালুক, সাপ-বিচ্ছু এবং এ জনপদে যেসব লোক বাস করে তাদের সবার অনিষ্টতা থেকে।"[২]

কোন লোকালয়ে প্রবেশ করার পূর্ব মুহূর্তে এ দোয়া পাঠ করতেন ঃ

"সপ্ত আকাশ, সপ্ত যমীন এবং যা কিছু আমাদের উপর ছায়া বিস্তার করে আছে,এসব কিছুর পালনকর্তা হে আল্লাহ্! আমরা সকল প্রকার শয়তানও মন্দ বাতাস থেকে তোমার পানাহ্ চাই। তোমারই কাছে প্রার্থনা করি এ জনপদ ও

১. আবু দাউদের এক বর্ণনায় আছে, সওয়ারীতে আরোহণ করার পর হুযুর তিনবার তকবীর উচ্চারণ করতেন, আল্লাহ্র প্রশংসা করতেন এবং এ দোয়া ও পাঠ করতেন ঃ
"পবিত্রতম সে সত্তা। নিশ্চয় আমি আমার আত্মার উপর বিস্তর অনাচার করেছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর। নিশ্চিত, তুমি ছাড়া গোনাহ্ ক্ষমা করার আর কেউ নেই।

২. যা'দুল মা'আদঃ সফরের দোয়া অধ্যায়।

তার অধিবাসীদের যাবতীয় কল্যাণ আর তোমার পানাহ্ চাই এ বসতি ও তার অধিবাসীদের যাবতীয় অনিষ্ট থেকে।"[১]

মদীনায় ফিরে এসে সর্বপ্রথম মসজিদে গিয়ে উঠতেন এবং দুরাকাত নামায আদায় করে ঘরে প্রবেশ করতেন। সঙ্গী-সাথিদের প্রতি নির্দেশ ছিল, সফর থেকে ফিরে এসেই যেন কেউ সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে প্রবেশ না করে, বরং মসজিদে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে স্ত্রী-পরিজনকে ঘর-বাড়ি ও পোশাক -পরিচ্ছদ গোছানোর মত সময় দিয়ে যেন সবাই স্ব-স্ব ঘরে প্রবেশ করে।[২]

জেহাদের রীতি ঃ কোন অভিযানে ফৌজ প্রেরণ করার সময় দলপতিকে বিশেষভাবে উপদেশ দিতেন, যেমন তিনি সর্বাবস্থায় পরহেযগারী অবলম্বন করে চলেন,সঙ্গী-সাথিগণের সঙ্গে যেন সদ্ব্যবহার করা হয় এবং দলপতি যেমন সর্বাবস্থায় তাদের কল্যাণে সচেষ্ট থাকেন। বিদায় মুহূর্তে সৈন্যদের এ মর্মে উপদেশ দিতেন ঃ

"তোমরা আল্লাহ্র নাম নিয়ে আল্লাহ্র পথে জেহাদ করো। যেসব লোক আল্লাহ্র সঙ্গে কুফুরী করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। কোনরূপ খেয়ানত করো না। চুক্তি ভঙ্গ করো না। কোন লোকের নাক-কান কেটো না।কোন শিশুকে হত্যা করো না।"

অতঃপর জেহাদের শর্তাবলী শিক্ষা দিতেন।

ফৌজ রওয়ানা হওয়ার মুহূর্তে এ বলে বিদায় দিতেন ঃ

"তোমাদের দ্বীন,আমানত এবং আমলের প্রতিফলসমূহ আল্লাহ্র হাতে সমর্পণ করছি।"

যে সমস্ত যুদ্ধে হুযুর (সাঃ) নিজে শরীক হতেন,সেগুলোতে যুদ্ধক্ষেত্রে রাত্রের বেলায় পৌছলে আক্রমণ পরিচালনার জন্য ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। ভোর হলে পর আক্রমণ করতেন।[৩] ভোরে আক্রমণের সুযোগ না হলে দুপুরের পর পর্যন্ত অভিযান স্থগিত রাখতেন। কোন স্থান বিজিত হওয়ার পর শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য তিন দিন সেখানে অবস্থান করতেন।[৪]

বিজয়ের সংবাদ আসার সঙ্গে সঙ্গে শোকরানার সেজদা করতেন। তুমুল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এ ভাষায় দোয়া করতেন ঃ

اللهم انت عضدى ونصيرى بك احول وبك اصول وبك اقاتل -

অর্থাৎ, "আয় আল্লাহ্! তুমিই আমার বাহুবল। তুমিই আমার সাহায্যকারী, তোমারই ভরসায় আমি প্রতিরোধ করি, তোমারই ভরসায় আক্রমণ করি এবং তোমারই বলে বলীয়ান হয়ে আমি যুদ্ধ করে থাকি।"

---

১. আবু দাউদ: জেহাদ অধ্যায়।
২. আবু দাউদ ঃ জেহাদ অধ্যায়।
৩. মুসলিম শরীফ ঃ জেহাদ অধ্যায়।
৪. আবু দাউদঃ জেহাদ অধ্যায়।

রুগী দেখার রীতি ঃ কারও অসুস্থতার খবর পেলে হুযুর (সাঃ) তাকে দেখতে যেতেন, রোগীকে সান্ত্বনা দিতেন। সাহাবাদের বলতেন,—কারও অসুস্থতার সময় তার পাশে গিয়ে দাঁড়ানোও প্রত্যেক মুসলমানের একটি জরুরী দায়িত্ব।[১]

হিজরতের পর প্রাথমিক দিনগুলোতে হুযুর (সাঃ) কারও মুমূর্ষু অবস্থার খবর পেলে শয্যাপার্শ্বে চলে যেতেন। মৃত্যুপথযাত্রীর জন্য মাগফেরাতের দোয়া করতেন। দম বের হওয়া পর্যন্ত সেখানে বসে থাকতেন এবং মৃত্যুর পর তার দাফন-কাফন সেরে ঘরে ফিরতেন। এতে কোন কোন সময় এত দেরী হয়ে যেত যে হুযুর (সাঃ) খুবই কষ্ট পেতেন। সুতরাং এরপর থেকে সাহাবায়ে কেরাম কারও মৃত্যু হওয়ার পরই তাঁকে খবর দিতেন। খবর পেয়ে হুযুর (সাঃ) মৃত ব্যক্তির বাড়ি চলে যেতেন। তার আত্মীয়স্বজনকে সান্ত্বনা দিতেন। মৃতের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করতেন এবং নিজে জানাযার নামায পড়িয়ে তাকে কবরস্থ করতেন। অনেক সময় জানাযা পড়িয়ে চলে আসতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহাবীরা হুযুর (সাঃ)-কে এতটুকু কষ্ট দেয়াও সমীচীন মনে না করে নিয়মের পরিবর্তন করলেন এবং কারও মৃত্যু হলে গোসল ও কাফন পরানোর পর হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে নিয়ে এসে জানাযা পড়িয়ে নেয়ার নিয়ম প্রবর্তন করলেন। পরবর্তীতে এটাই সাধারণ নিয়মে পরিণত হল।[২]

কোন রোগীর শয্যাপার্শ্বে গেলে তার কপালে ও হাতের শিরায় হাত রাখতেন। তার অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তুমি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবে,ইত্যাকার সান্ত্বনা বাণী দ্বারা তাকে আশ্বস্ত করতেন।

রোগীর সামনে কেউ কোন অবাঞ্ছিতকথাবার্তা উচ্চারণ করলে হুযুর (সাঃ) তা অত্যন্ত নাপছন্দ করতেন। একবার এক বেদুঈন মদীনায় এসে কঠিন অসুখে পড়লে হুযুর (সাঃ) তাকে দেখতে গেলেন। কপালে ও নাড়িতে হাত রেখে সান্ত্বনার বাণী শোনালেন। কিন্তু রোগ-যন্ত্রণায় কাতর বেদুঈন বলতে লাগল, আপনি সান্ত্বনা দিলে কি হবে, আমার যে অসুখ,তাতে কবরে না নিয়ে ছাড়বে না। একথা শুনে হুযুর (সাঃ) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন।[৩]

দেখা-সাক্ষাতের রীতি ঃ কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় সর্বপ্রথম নিজেই সালাম করে মুসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিতেন। কোন লোক ঝুঁকে কানে কানে কোন কিছু বলতে থাকলে যে পর্যন্ত সে ব্যক্তি মুখ না সরাত, সে পর্যন্ত তার দিক থেকে মুখ ফেরাতেন না। মুসাফাহার সময়ও যে পর্যন্ত অন্যে হাত না ছাড়ত, সে পর্যন্ত নিজের হাত টেনে নিতেন না। মজলিসে বসার সময়ও তাঁর হাঁটু সঙ্গী-সাথীদের চাইতে এগিয়ে থাকত না।[৪]

---

১. বোখারী শরীফঃ রোগীর পরিচর্যা অধ্যায়।
২. মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বলঃ ৩য় খণ্ড,৬৬ পৃঃ।
৩. বোখারীঃ রোগীর শরীরে হাত বুলানো অধ্যায়।
৪. আবু দাউদ, তিরমিযী।

কোন লোক খেদমতে হাযির হতে চাইলে তাকে দরজায় দাঁড়িয়ে সালাম এবং ভেতরে আসার অনুমতি নিতে হত। নিজেও বাড়িতে গেলে অনুরূপভাবে সালাম দিয়ে অনুমতি গ্রহণ করে ভেতরে প্রবেশ করতেন। কোন লোক এ নিয়মের অন্যথা করলে তাকে ফিরিয়ে দিতেন।

একবার বনী আমের গোত্রের এক ব্যক্তি দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞেস করল, ভেতরে আসতে পারি কি? ডাক শুনে বললেন, কেউ গিয়ে লোকটিকে অনুমতি গ্রহণ করার তরীকা শিখিয়ে এস। অর্থাৎ সে যেন প্রথমে সালাম করে এবং পরে ভেতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করে।

একবার কোরাইশ গোত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা একটি হরিণের বাচ্চা, দুধ ও কিছু মূল্যবান কাঠ উপহারস্বরূপ তার ছোট ভাই কালদার মাধ্যমে হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিল। কালদা সে সমস্ত উপঢৌকন নিয়ে সোজা দরবারে হাযির হয়ে গেল। এরশাদ করলেন, ফিরে যাও এবং সালাম করে মজলিসে প্রবেশ কর।[১]

একদা হযরত জাবের (রাঃ) সাক্ষাৎ করতে এসে দরজায় করাঘাত করলেন। হুযুর (সাঃ) ভেতরে থেকে জিজ্ঞেস করলেন,কে? হযরত জাবের জবাব দিলেন ঃ আমি। এ জবাব শুনে হুযুর (সাঃ) বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, আমি, আমি আবার কি, নাম বলতে পার না?

কোন লোকের বাড়িতে গেলে মহানবী (সাঃ) দরজার ডান বা বাম দিকে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে সালাম জানাতেন এবং ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইতেন। দরজার ঠিক মুখোমুখি এ জন্য দাঁড়াতেন না যে তখনও পর্যন্ত বাড়ির দরজায় পর্দা লাগানোর রেওয়াজ ছিল না।

বাড়ির ভেতর থেকে যদি সালামের জবাব না আসত, তবে সেখান থেকে ফিরে আসতেন। একদা সাহাবী হযরত সা'দ ইবনে উবাদার (রাঃ) বাড়িতে গেলেন। দাঁড়িয়ে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ উচ্চারণ করে ভেতরে আসার অনুমতি চাইলেন। হযরত সা'দ এত আস্তে সালামের জবাব দিলেন যে হুযুর (সাঃ) তা শুনতেই পেলেন না। সা'দের পুত্র কায়স পিতাকে বলতে লাগল, হুযুর (সাঃ) স্বয়ং দরজায় দাঁড়িয়ে সালাম দিয়েছেন, আপনি তাঁকে ভেতরে ডেকে আনছেন না কেন? সাদ পুত্রকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, চুপ কর। হুযুর (সাঃ) এর পবিত্র যবান থেকে সালামের বাণী উচ্চারিত হলে তা আমাদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ হবে।

১. আবু দাউদ ঃ ২য় খণ্ড, ১৫৬ পৃঃ।

দ্বিতীয়বার হুযুর (সাঃ) সালাম জানালেন। এবারও সা'দ মৃদুস্বরে জবাব দিলেন। তৃতীয়বারও একইভাবে সালাম জানিয়ে ভেতরে আসার অনুমতি চাইলেন, কিন্তু তৃতীয়বারেও যখন কোন জবাব এল না, তখন ফিরে চললেন। হযরত সা'দ হুযুর (সাঃ) কে ফিরে যেতে দেখে সামনে ছুটে এলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমি মৃদুস্বরে সালামের জবাব দিয়ে বার বার আপনার সালাম শুনছিলাম।[১]

কারও বাড়িতে গেলে হুযুর (সাঃ) কোন বিশেষ আসনে গিয়ে বসতেন না। একবার হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের ঘরে তশরীফ আনলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ব্যস্ত হয়ে একটি চামড়ার গদি এগিয়ে দিলেন। কিন্তু হুযুর (সাঃ) চামড়ার সে গদি সামনে ঠেলে দিয়ে যমীনে বসে পড়লেন। গদিটি হুযুর (সাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের মাঝেই পড়ে রইল।[২]

সাধারণ অভ্যাস ঃ সাধারণত, ডানহাতে কাজ করা হুযুর (সাঃ)এর পছন্দ ছিল। জুতা পরিধান করার সময়ও প্রথম ডান পায়ে পরতেন। মসজিদে প্রবেশ করার সময় প্রথম ডান পা রাখতেন। মজলিসে কোন কিছু বণ্টন করতে হলে ডানদিক থেকে শুরু করতেন। যে কোন কাজ করার সময় বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করতেন।

মজলিস ও দরবারে নবুওত

দু'জাহানের শাহানশাহ হুযুর (রাঃ) এর দরবারে কোন রকম জাঁকজমক বা নকীব-নফরের বাহুল্য ছিল না। দরজায় কোন দ্বার-রক্ষীরও অস্তিত্ব ছিল না। সবার জন্যই ছিল সে দরবারের দ্বার অবারিত। এতদসত্ত্বেও হুযুর (সাঃ) এর ব্যক্তিত্বের এমনই প্রভাব ছিল যে মজলিসে উপবিষ্ট লোকগুলোকে দেখলে মনে হত, যেন আদব ও শিষ্টাচারের এক-একটি ছবি সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। হাদীস শরীফে এ দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, দরবারে উপবিষ্ট প্রত্যেকটি মানুষের মাথায় যেমন ভুলে পাখি এসেও বসতে পারত অর্থাৎ কেউ কোন অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া করে মজলিসের গাম্ভীর্যপূর্ণ নীরবতা ভঙ্গ করতেও সাহসী হতেন না।

কথাবার্তা বলার জন্য পর্যায়ক্রমিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হত। তবে এ পর্যায়ের নির্ধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধন-সম্পদ বা গোত্রীয় কৌলীন্যের ভিত্তিতে হত না। প্রয়োজন ও বক্তব্যের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেককে একের পর এক কথা বলার অনুমতি দেয়া হত। সর্বপ্রথম প্রার্থীদের আরজি শ্রবণ করতেন এবং সাধ্যমত প্রত্যেকের প্রয়োজন মেটাতেন।

---

১. আবু দাউদ ঃ আদব অধ্যায়।
২. আবু দাউদ ঃ আদব অধ্যায়।

উপস্থিত সবাই নতমস্তকে একান্ত আদবের সঙ্গে বসে থাকতেন। হুযুর (সাঃ) নিজেও বিনয় নম্রভাবে বসতেন। কোন কথা বলতে শুরু করলেই সমস্ত মাহ্ফিল গভীর নীরবতায় ডুবে যেত, অন্য কেউ কথা বলতেন না, কেউ কোন আরজি পেশ করার সময় যদি কোন কারণে শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রমও করে ফেলত, তথাপি অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে সে সীমালঙ্ঘন বরদাশ্ত করতেন।

কারও কথা কেটে নিজে কিছু বলতেন না। কোন কথা অপ্রিয় মনে হলে অন্যমনস্কতাচ্ছলে তা এড়িয়ে যেতেন। কোন লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে বা ওজরখাজী করলে তা গ্রহণ করতেন। মজলিসে যে ধরনের আলোচনাই শুরু হত, তিনি তাতে শরীক হতেন, নির্মল হাসিঠাট্টার মধ্যেও শামিল হতেন।

কোন সম্মানিত ব্যক্তি বা গোত্রপতির আগমন হলে মর্যাদা অনুযায়ী তার সম্মান করা হত। বলতেন, "গোত্র নির্বিশেষে প্রত্যেক মানী ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।" যে কেউ উপস্থিত হলে কুশল জিজ্ঞাসার পর জানতে চাইতেন, কোন প্রয়োজন আছে কিনা! নিকটবর্তীদের প্রতি নির্দেশ ছিল, "যে সমস্ত লোক তাদের অভাব-অভিযোগের কথা আমার কাছে পৌছাতে পারে না, তাদের অসুবিধার কথা আমাকে জানাবে।"

ইরানের দস্তুর ছিল, কোন সম্মানিত ব্যক্তির আগমন ঘটলে সবাই দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত; আমীর-ওমরা বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দরবারে সাধারণ লোকেরা বুকের উপর দুহাত জড়িয়ে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থাকত। হুযুর (সাঃ) মনুষ্যত্বের এহেন অবমাননা করতে নিষেধ করতেন। এরশাদ হত "যদি কেউ এমন দৃশ্য পছন্দ করে যে মানুষ তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুক, তবে সে যেন তার ঠিকানা দোযখে ঠিক করে রাখে।[১]

অবশ্য মহব্বতের তাগিদে কোন কোন আগন্তুককে হুযুর (সাঃ) দাঁড়িয়ে ও অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। কন্যা হযরত ফাতেমা কখনও হাযির হলে হুযুর (সাঃ) তাঁর মমতায় উদ্বেলিত হয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দু'এক পা এগিয়ে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতেন। কপালে চুমু খেয়ে স্নেহের আবেগ প্রকাশ করতেন। একবার ধাত্রীমাতা হযরত হালিমার আগমন ঘটলে দাঁড়িয়ে তাঁকে চাদর বিছিয়ে দিয়েছিলেন। অন্য একবার তাঁ দুধ ভাই হাযির হলে তাঁকেও দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এবং সামনে এনে বসিয়েছিলেন।[২]

হুযুর (সাঃ) এর দরবারে প্রত্যেক লোকই স্ব-স্ব প্রতিভার যোগ্য মর্যাদা লাভ করত। কোন লোকই এমন অনুভব করার সযোগ পেত না যে এ দরবারে তাকে

১. আবু দাউদ শরীফঃ আদব অধ্যায়ঃ কোন ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে নিমিত্ত দাঁড়ানো প্রসঙ্গ।
২. আবু দাউদঃ আদব অধ্যায়।

যোগ্য মর্যাদা দেয়া হয়নি। যে কেউ কোন ভাল কথা বললে সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রশংসা করতেন। কেউ কোন অবান্তর কথার অবতারণা করলে তৎক্ষণাৎ তাকে সংশোধন করে দিতেন।[১]

একবার দু'ব্যক্তি মজলিসে হাযির ছিলেন। এক ব্যক্তি ছিলেন প্রভাবশালী এবং অন্যজন অতি সাধারণ লোক। এক সময় প্রথম ব্যক্তি হাঁচি দিলেন, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ্ বললেন না। কিছুক্ষণ পর অপর ব্যক্তি যখন হাঁচি দিয়ে আলহামদু লিল্লাহ্ বললেন, তখন তা শুনে হুযুর (সাঃ) ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বলে তার জবাব দিলেন। প্রথম লোকটি এতে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে অভিযোগ করলে জবাব দিলেন—এ ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করেছে, আমিও সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করেছি। তুমি আল্লাহকে ভুলে গেছ, আমিও তোমাকে ভুলে গেছি।[২]

কোন লোকের দোষত্রুটি এবং গীবত শেকায়েত যেন তার সামনে করা না হয়, এ ব্যাপারে সাহাবীদের কঠোরভাবে সাবধান করতেন। বলতেন, আমি চাই,দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় আমার উপর যেন কারও কোন অভিযোগ না থাকে।[৩]

উপদেশের মজলিস ঃ চলাফেরা, ওঠাবসা এমন কি, জীবনযাত্রার সর্বাবস্থায়ই হুযুর (সাঃ) সবাইকে শিক্ষামূলক উপদেশ দিতেন। তবে সেসব উপদেশ শোনার সৌভাগ্য শুধুমাত্র তাদেরই হত, যারা সর্বক্ষণ কাছে কাছে থাকতেন। এজন্য ওয়ায ও উপদেশের জন্য বিশেষ কয়েকটি সময় নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। এ শ্রেণীর নির্ধারিত ওয়ায-উপদেশের মজলিস সাধারণত, মসজিদে নববীতেই অনুষ্ঠিত হত। সময় নির্ধারিত করে দেয়া হত এ জন্য যেসকল শ্রেণীর লোকই যেন সময় করে মজলিসে হাযির হতে পারেন।

মসজিদ সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ ছিল । কোন কোন সময় এখানেও মজলিস বসত। প্রথম প্রথম হুযুর (সাঃ) এর বসবার জন্য কোন বিশেষ আসন ছিল না। বাইরে থেকে কোন অপরিচিত লোক এলে তার পক্ষে হুযুর (সাঃ)-কে চেনাও কঠিন হত। তাই সাহাবীরা মাটির একটি ছোট চবুতরা তৈরি করে দিয়েছিলেন। হুযুর (সাঃ) তার উপর বসে তালীম দিতেন। সাহাবীরা তিনদিকে গোল হয়ে বসে তা শোনতেন।[৪]

মজলিসের আদব ঃ এ ধরনের মজলিসে যোগদানকারীদের জন্য কোন বাঁধাধরা নিয়ম বা কারও প্রবেশাধিকারে কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ বা বাঁধা ছিল না।

১. শামায়েলে তিরমিযী।
২. আদাবুল মুফরাদঃ ইমাম বোখারী।
৩. আবু দাউদ।
৪. আবু দাউদ

অনেক সময় মরুভূমির বেদুঈনরাও অমার্জিত ভঙ্গিতে এসে উপস্থিত হত এবং ইচ্ছাকৃত যে কোন প্রশ্ন করে জবাব আদায় করে ফিরত।

এ সমস্ত মজলিসে কখনও কখনও নবী-চরিত্রের এমন মহত্তর একটি দিক ফুটে উঠত, তা প্রত্যক্ষদর্শীদের বিস্ময়বিমূঢ় করে ফেলত। কোন সময় দেখা যেত, হুযুর (সাঃ) মজলিসে বসে কথাবার্তা বলছেন। উৎসর্গিত প্রাণ সাহাবায়ে কেরাম দাসানুদাসের বিনয়নম্রতাসহকারে অবনত মস্তকে তা শ্রবণ করছেন। ঠিক এমনি সময়ে কোন রুক্ষভাষী বেদুঈন এসে হয়ত জিজ্ঞেস করে বসত, তোমাদের মধ্যে মোহাম্মদ (সাঃ) কার নাম? সাহাবিরা হুযুরকে দেখিয়ে বলতেন, ঐ যে গৌরকান্তিময় লোকটি হেলান দিয়ে বসে আছেন, ইনিই। বেদুঈন এগিয়ে গিয়ে শিষ্টাচারবিবর্জিতভাবে সরাসরি প্রশ্ন করে বসত ঃ "হে আবদুল মোত্তালেব তনয়! আমি তোমাকে কয়েকটি শক্ত কথা জিজ্ঞেস করব, কিন্তু রাগ করতে পারবে না।" এ ধরনের রুক্ষ প্রশ্ন শুনেও হুযুর (সাঃ) মোটেও বিরক্তি প্রকাশ না করে বরং হাসিমুখে বক্তব্য পেশ করার অনুমতি দান করতেন।[১]

সবার জন্যে অবারিত দ্বার হলেও হুযুর (সাঃ)-এর মজলিস ছিল এমন এক পূত পবিত্র গাম্ভীর্যময় পরিবেশমণ্ডিত, তা যে কোন উদ্ধত মস্তককে মুহূর্তের মধ্যে নত করে দিত। দ্বীন-ঈমান-আখলাক ও আত্মশুদ্ধির তালীম ছাড়া এ সমস্ত মজলিসে অন্য কোন প্রসঙ্গ বড় একটা উত্থাপিত হত না। এরই মধ্যে হয়ত কোন কোন লঘুচিত্ত লোক নিতান্ত হাল্কা কোন প্রশ্ন করে বসত। যেমন, "বলুন তো, আমার পিতার নাম কি? আমার উট হারিয়ে গেছে, বলুন তো সেটি এখন কোথায়?" হুযুর (সাঃ) এ ধরনের অবান্তর প্রশ্ন অপছন্দ করতেন। অবান্তর আলোচনা কখনও প্রশ্রয় দিতেন না।

একবার মজলিসে এ ধরনেরই কিছু অবান্তর প্রশ্ন উত্থাপিত হলে বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, "তোমরা প্রশ্ন করতে থাক, আজ আমি সব প্রশ্নেরই জবাব দেব।"

হযরত ওমর চেহারার রং দেখে ভয় পেয়ে গেলেন এবং অত্যন্ত মিনতি সহকারে এই বলে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা সন্তুষ্ট।"[২]

দাঁড়ানো অবস্থায় কারও কোন প্রশ্ন করার অনুমতি ছিল না। একবার এক ব্যক্তি এমনি অবস্থায় কোন কিছু জানতে চাইলে হুযুর (সাঃ) অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তার প্রতি তাকালেন।

একজনের প্রশ্নের জবাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্যকে প্রশ্ন করতে দেয়া হত না। কোন কোন সময় হয়ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মধ্যখানেই মরুবাসী কোন

১. বোখারী ঃ প্রথম খণ্ড, ঈমান অধ্যায়।
২. বোখারী ঃ এলেম অধ্যায়।

বেদুঈন এসে কোন প্রশ্ন করে বসত। হুযুর (সাঃ) প্রশ্নকর্তার প্রতি কোন প্রকার ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের বক্তব্য সমাপ্ত করতেন এবং পরে তার প্রশ্নের জবাব দিতেন।

একবার এ ধরনের এক মজলিসে জনৈক বেদুঈন এসে প্রশ্ন করলেন, 'কেয়ামত কবে হবে?'

হুযুর (সাঃ) লোকটির প্রশ্নের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করলেন না। অনেকেরই ধারণা হল, বোধ হয় তিনি বেদুঈনের প্রশ্ন শুনতেই পাননি। কিন্তু প্রসঙ্গ শেষ করার পরই জিজ্ঞেস করলেন, 'কে প্রশ্ন করেছিল'। বেদুঈন দাঁড়িয়ে নিবেদন করল, 'আমি'।

তখন হুযুর (সাঃ) জবাব দিলেন, "মানুষ যখন আমানত খেয়ানত করতে থাকবে, তখনই কেয়ামত উপস্থিত হবে। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করল,-আমানত খেয়ানত হবে কিরূপে? জবাব দিলেন, "অযোগ্যদের হাতে যখন দায়িত্ব অর্পণ করা হবে।"[১]

মজলিসের সময়সুচী ঃ সাধারণ মজলিসের বিশেষ সময় ছিল বাদ ফযর। ফযরের নামায শেষ হওয়ার পরই হুযুর (সাঃ) সবার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসতেন এবং পবিত্র যবান থেকে এলম ও মারেফতের নহর প্রবাহিত হতে শুরু করত। কোন কোন বর্ণনায় অবশ্য দেখা যায়, প্রত্যেক নামাযের পরই কিছুক্ষণের জন্য মজলিস বসত। তবুক যুদ্ধে শরীক না হওয়ার জন্য সাহাবী হযরত কাব ইবনে মালেকের উপর যখন অসন্তুষ্টি নেমে এসেছিল, তখনকার ঘটনা বলতে গিয়ে তিনি বর্ণনা করেছেন, "প্রত্যেক নামাযের পরই আমি মজলিসে এসে আদবের সঙ্গে সালাম পেশ করতাম এবং লক্ষ্য করতাম, আমার সালামের জবাবে হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র ঠোঁট নড়ে উঠল কিনা!"[২]

বাদ ফযরের মজলিসে হুযুর (সাঃ) মাঝে মাঝে গুরুত্বপূর্ণ ওয়ায করতেন। তিরমিযী ও আবু দাউদে হযরত এরবায ইবনে সারিয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"একদা ফযরের নামাযের পর হুযুর (সাঃ) আমাদের সামনে এমনি চিত্তাকর্ষক একটি ওয়ায করলেন যে তা শুনে লোকের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল এবং অন্তর কেঁপে উঠল।[৩]

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর যে সমস্ত মজলিস বসত, সেগুলোতে সাধারণত সাধারণ বিষয়াদির উপর আলোচনা চলত।

১. বোখারী ঃ এলেম অধ্যায়।
২. বোখারী ঃ ২য় খন্ড,কাব ইবনে মালেক প্রসঙ্গ।
৩. তিরমিযী।

খুব গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় আলোচনা করার প্রয়োজন হলে বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হত। এর ধরনের সম্মেলনের উল্লেখ করতে গিয়ে হাদীস শরীফে নিম্নোক্ত বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছে।

"হুযুর (সাঃ) একদিন বিশেষভাবে লোকদের কিছু বলার জন্য তশরীফ আনলেন।"[১]

সাধারণ লোকের উপকারের জন্যই যেহেতু এ সমস্ত মজলিসের আয়োজন হত, তাই কোন লোক মাহফিল থেকে উঠে গেলে হুযুর (সাঃ) অসন্তুষ্ট হতেন। একবার মজলিস চলাকালে তিন ব্যক্তি এসে প্রবেশ করল। এদের একজন একটু চেষ্টা করে মজলিসের ভেতরে স্থান করে নিল, দ্বিতীয় জন স্থান করতে না পেরে এক কিনারায় গিয়ে বসে পড়ল এবং তৃতীয় ব্যক্তি মজলিস থেকে বেরিয়ে গেল।

বক্তব্য শেষে হুযুর (সাঃ) এরশাদ করলেন, "এক ব্যক্তি এসে আল্লাহ্‌র পানাহ চাইল, আল্লাহ্ তাকে পানাহ দিলেন। দ্বিতয়ি ব্যক্তি লজ্জা করল, আল্লাহ্‌ও তার সেই লজ্জার মান রাখলেন। তৃতীয় ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, আল্লাহ্‌ও তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।"[২]

ওয়ায-নসীহত যত উপাদেয় হোক না কেন, একটানা শুনতে শুনতে অতৃপ্তি এসে যেতে পারে। অনেক সময় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে নসীহতে অনেকের পক্ষে শরীক হওয়াও হয়ত সম্ভবপর হয় না। এ জন্য হুযুর (সাঃ) মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে মাহফিল করতেন। বোখারী শরীফে হযরত ইবনে মাসউদ বর্ণিত এ হাদসিটির উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

"হুযুর (সাঃ) মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে আমাদের ওয়ায শোনাতেন, যেন আমাদের মধ্যে কারো বিরক্তি সঞ্চারিত না হয়।"

স্ত্রীলোকদের জন্য বিশেষ মাহফিল ঃ সাধারণ মাহফিলের দ্বারা স্ত্রীলোকদের পক্ষে উপকৃত হওয়ার সুযোগ ছিল না। সাধারণত পুরুষ শ্রোতাতেই তা পূর্ণ থাকত। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রীলোকদের পক্ষ থেকে আবেদন করা হল, যেন তাদের জন্য একটি দিন বিশেষভাবে নির্ধারিত করে দেয়া হয়। এ আবেদনের ভিত্তিতে হুযুর (সাঃ) তাঁদের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিলেন।[৩]

মাহ্‌ফিলগুলোতে শরীয়তের যে কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করার অনুমতি ছিল। এতদসত্ত্বেও কোন লজ্জাজনক প্রশ্ন উত্থাপিত হলে হুযুর (সাঃ) লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিতেন। পুরুষদের মাহফিলেও অনেক সময় লজ্জাকর কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে একই অবস্থার সৃষ্টি হত। একবার আসেম নামক জনৈক আনসারী

১. ইবনে মাজা।
২. বোখারী ঃ প্রথম খন্ড,এলেম অধ্যায়।
৩. বোখারী শরীফঃ এলেম অধ্যায়।

প্রশ্ন করে বসলেন যে কেউ যদি নিজের স্ত্রীকে অন্য কোন পুরুষের বাহুলগ্ন অবস্থায় দেখতে পায়, তবে তার বিধান কি? প্রশ্ন শুনে হুযুর (সাঃ) অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। প্রশ্নকারীকেও এ জন্য শাসিয়ে দিয়েছিলেন।[১]

উপদেশদান পদ্ধতি ঃ কোন কোন সময় শ্রোতাদের মনোযোগ ও একাগ্রতা পরখ করার উদ্দেশ্যে হুযুর (সাঃ) সমবেত লোকদের নানাবিধ প্রশ্ন করতেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের বর্ণনা, একদিন হুযুর (সাঃ) সমবেত লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, কল্যাণকারিতার দিক দিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত কোন্ সে বৃক্ষ, যার পাতা কখনও ঝরে পড়ে না? হযরত আবদুল্লাহ্ বলেন, পশ্ন শুনেই আমার মনে হয়েছিল, সেটি খেজুর গাছই হবে। কিন্তু আমি তখন অল্পবয়স্ক ছিলাম বলে সাহস করে জবাব দিতে পারলাম না। শ্রোতাদের অনেকেই জঙ্গলের নানা গাছপালার নাম করলেন। শেষ পর্যন্ত হুযুর (সাঃ) নিজেই বলে দিলেন, "এটি হল খেজুর বৃক্ষ।" বর্ণনাকারী বলেন, "আমি সারাজীবন এ আক্ষেপই করেছি যে হায়! আমি যদি তখন জবাবটি বলে দিতাম।"[২]

একদিন হুযুর (সাঃ) মসজিদে এসে দেখতে পেলেন, সাহাবীদের একদল কোরআন তেলাওয়াত, যিকির ও এবাদতে মশগুল রয়েছেন। আর অন্য একদল অন্য একদিকে বসে বিভিন্ন জ্ঞানের বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করছেন। এ দৃশ্য দেখে এরশাদ করলেন, "দু'দলই উত্তম কাজে নিয়োজিত, তবে আল্লাহ্ পাক আমাকে শিক্ষকরূপে পাঠিয়েছেন। একথা বলে যে দলটি জ্ঞান আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, নিজে তাদের সঙ্গে গিয়ে বসে পড়লেন।[৩]

সাধারণ আলোচনা সভায় সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনার অবতারণা অপছন্দ করতেন। একদিন সাহাবীরা মসজিদে বসে তকদীর সম্পর্কে বিতর্ক করছিলেন। পরস্পরের কথা কাটাকাটি শুনে তিনি হুজরা থেকে বের হয়ে এলেন। তখন তাঁর চেহারায় ক্রোধ ও বিরক্তির চিহ্ন এমনভাবে ফুটে উঠেছিল যেন মুখমন্ডলে কেউ আনারের দানা নিংড়ানো রস ছিটিয়ে দিয়েছে। এ অবস্থাতেই সাহাবীদের বলতে লাগলেন, "কোরআন নিয়ে পরস্পরের মধ্যে ঠোকাঠুকি করার জন্যই কি তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে? মনে রেখো তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগুলো এমনি অর্থহীন বিতর্কে অবতীর্ণ হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে।"[৪]

কোন মাসআলায় সাহাবীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে বা কোন প্রকার বির্তকের সুত্রপাত হলে সে সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় জেনে নেয়ার জন্য এ মাহফিলগুলো ছিল সর্বোত্তম মওকা। যেমন, একদিন দু'জন সাহাবীর মধ্যে এই

১. বোখারী ঃ এলেম অধ্যায়।
২. ইবনে মাজাহঃ আলেমের মর্যাদা প্রসঙ্গ।
৩. ইবনে মাজাহ্।
৪. ইবনে মাজাহ্ ঃ তকদীর প্রসঙ্গ।

মর্মে আলোচনা শুরু হল যে কাফেরদের সঙ্গে মোকাবিলা করার সময় যদি আমাদের মধ্যে কেউ এমন দম্ভোক্তি করে আক্রমণ শুরু করে যে আমি বীর, গেফার গোত্রের জোয়ান, সাহস থাকে তো এসো আমার তীক্ষ্ম বর্শার আক্রমণ প্রতিহত কর—এ সম্পর্কে তোমার কি অভিমত?" সে ব্যক্তি জবাব দিলেন, আমার মতে সে জেহাদের সওয়াব পাবে না। তৃতীয় ব্যক্তি এদের কথাবর্তা শুনছিলেন, তিনি বললেন, "আমার তো মনে হয় না যে যুদ্ধের ময়দানে এরূপ কথা বলার ব্যাপারে বাধা-নিষেধ আছে। সুতরাং সওয়াবের তারতম্য হওয়ার কি আছে?" এ প্রসঙ্গে দুজনে দীর্ঘ বিতর্ক করে সমাধানের পথ নির্দেশের উদ্দেশ্যে হুযুর (সাঃ) -এর দরবারে হাযির হলেন। উভয়ের বক্তব্য শুনে হুযুর (সাঃ) এরশাদ করলেন, "সওয়াব এবং সুনাম একে অপরের পরিপন্থী নয়।"[১]

সাধারণ ধারণা ছিল যে সবকিছু ভাগ্যের উপর সমর্পণ করে নিস্ক্রিয় জীবন অবলম্বন করার অর্থই হল তকদীরে বিশ্বাস। কেননা, ভাগ্যে যা লেখা আছে তা যখন অখন্ডনীয়, তখন নিরর্থক প্রচেষ্টায় লাভ কি? কোন প্রচেষ্টার দ্বারাই তো ভাগ্যলিপি খন্ডানো সম্ভবপর নয়।

উপরোক্ত ধারণাগুলো সংশোধন করে একদিন এক মাহফিলে হুযুর (সাঃ) এরশাদ করলেন, "মানুষের কর্মই তার বিধিলিপি। আল্লাহ্ মানুষকে যেসব কর্মের তওফীক দান করেন, তাই তার তকদীর সুতরাং কর্মশক্তিকে নিস্ক্রিয় করে রাখার নাম তাওয়াক্কুল নয়।"

সাহাবীরা কোন এক জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য সামবেত হয়েছিলেন। সেখানে হুযুর (সাঃ)-এর আগমন ঘটলে সবাই সমবেত হলেন। মহানবী (সাঃ)-এর হাতে একটি লাঠি ছিল। তদ্বারা মাটি খুঁটতে খুঁটতে তিনি এরশাদ করলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার স্থান জান্নাত বা জাহান্নামের তালিকায় লিখে রাখা হয়নি।" এক ব্যক্তি ওঠে আরয করলেন, "তবে আমাদের আর আমল করে লাভ কি? যার নাম সৌভাগ্যের তালিকায় আছে, সে অবশ্যই সৌভাগ্যবানদের সাতে গিয়ে মিলিত হবে, অপরপক্ষে, যাদের নাম দুর্ভাগ্যের তালিকায় রয়েছে তারা অবশ্যই দুর্ভাগ্যবানদের সঙ্গে মিলিত হবে।" এ প্রশ্নের জবাবে হুযুর (সাঃ) এরশাদ করলেন, "সৌভাগ্যবান সে সমস্ত লোকই, যাদের সৌভাগ্যসূচক আমল করার তওফীক দান করা হয়, আর অপরপক্ষে, ঐসমস্ত লোকই হতভাগ্য, যাদের চারপাশে দুর্ভাগ্যজনক কাজ কর্মের যাবতীয় উপায়-উপকরণ এসে একত্রিত হয়।"[২]

১. আবু দাউঃ ২য় খণ্ড।
২. বোখারী ঃ ২য় খন্ড।

আনন্দ-কৌতুক ঃ হুযুর (সাঃ)-এর মজলিশের প্রধান উপজীব্য ছিল হেদায়েত, আত্মশুদ্ধি, চরিত্র গঠন এবং শরীয়ত-মারেফতের সার্বক্ষণিক চর্চা। এমন এক গাম্ভীর্যময় পরিবেশে সাহাবীরা মজলিসে বসতেন, দেখে মনে হত, প্রতিটি লোকের মাথার উপর যেন পাখি বসে আছে। এতদ্‌সত্ত্বেও কোন কোন সময় সে গম্ভীর পরিবেশের মধ্যেই প্রাণ-প্রাচুর্যময় নির্মল আনন্দরসের প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে যেত। কৌতুককর কোন প্রসঙ্গের অবতারণা হলে হুযুর (সাঃ) নিজেও যেমন হেসে উঠতেন, তেমনি অন্যান্যের সঙ্গে অকপটে প্রাণখোলা হাসিতে যোগ দিতেন।

যেমন, একবার হুযুর (সাঃ) এরশাদ করলেন, "বেহেশতে এক ব্যক্তি ফসল উৎপাদন করার আকাঙ্খা প্রকাশ করবে।" আল্লাহ্‌পাক জিজ্ঞেস করবেন, "তোমার আকাঙ্ক্ষা কি এখনও পূরণ হয়নি?" সে তখন বলবে, "আমার ইচ্ছা, বীজ বপন করার সঙ্গে সঙ্গেই যেন অনতিবিলম্বে তা ফসলে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং আমি তা কেটে আনতে পারি। আল্লাহ্‌পাক তার সে আকাঙ্ক্ষাও পূরণ করে দেবেন।" কথা শুনে জনৈক মরুবাসী বেদুঈন বলতে লাগল, "এ সৌভাগ্য বোধ হয় শুধুমাত্র কোরাইশ ও আনসারদেরই হবে। কারণ, আমরা বেদুঈনেরা তো কৃষিজীবী নই।" হুযুর (সাঃ) বেদুঈনের এহেন সূক্ষ্ম কৌতুক আস্বাদন করে হেসে উঠলেন।[১]

একবার একজন গরীব সাহাবী একটি অপরাধ করে এসে আরজ করলেন, "এর পরিত্রাণের উপায় কি?" বললেন, "রোযা রাখতে হবে।" লোকটি বললেন, "সারাদিন পরিশ্রম করে জীবিকা উপার্জন করতে হয়। আমার পক্ষে তো রোযা রাখা সম্ভব নয়। বললেন, "তবে কিছু খেজুর সদকা করে দাও।" লোকটি বললেন, "আমি খেজুর পাব কোথায়।"

হুযুর (সাঃ) তখন ঘর থেকে কিছু খেজুর এনে তাকে দিলেন। খেজুর হাতে নিয়ে সাহাবী বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্‌! মদীনায় আমার চাইতে গরীব আর কোথায় পাব?

লোকটির এ অকপট সরলতা দেখে হুযুর (সাঃ) হাসি সংবরণ করতে পারলেন না, হাসতে হাসতেই বললেন, "যাও তবে তুমি নিজেই এগুলো খেয়ে ফেলো।"[২]

সাহচর্যের প্রভাব ঃ নবীজীর পবিত্র সাহচর্যের এমনই প্রভাব ছিল যে অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্তর নূরের রোশনীতে ভরে উঠত। হযরত আবু হোরায়রা

১. বোখারী ঃ ২য় খন্ড।
২. বোখারী।

(রাঃ) একবার আরয করলেন, "ইয়া রসুলাল্লাহ (সাঃ)! যতক্ষণ আপনার সাহচর্যে থাকি, ততক্ষণ দুনিয়া যেন তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে হয়। কিন্তু আবার স্ত্রী-পুত্রদের মধ্যে গিয়ে পড়লেই সব কিছু ভুলে যাই।"

জবাব দিলেন "যদি একই অবস্থা বজায় থাকত, তবে আসমানের ফেরেশতারা তোমাদের যিয়ারত করতে নেমে আসত।"[১]

একদিন সাহাবী হযরত হানযালা (রাঃ) খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি বোধহয় মুনাফেক হয়ে গেছি। যখন আপনার সাহচর্যে থাকি এবং আপনি যখন বেহেশত-দোযখের বর্ণনা দেন তখন যেন সে সবকিছু চোখের সামনে দেখতে পাই, কিন্তু এখান থেকে একটু দূরে সরে পরিবার পরিজনের মধ্যে গিয়ে পড়লেই সবকিছু ভুলে যাই।"

জবাব দিলেন, "দেখ, এখান থেকে বাইরে গিয়েও যদি তোমাদের সে অবস্থাই বজায় থাকত তবে আসমানের ফেরেশতারা এসে তোমাদের সঙ্গে মোসাফাহা করে যেত।"[২]

বাগ্মিতা

নবুওতের দায়িত্ব পালন করার জন্য বাগ্মিতা একটি অতি প্রয়োজনীয় গুণ। তাই হযরত মূসা (আঃ) কে নবুওত দিয়ে ফেরাউনের কাছে পাঠাবার সময় তিনি নিম্নোক্ত দোয়া করেছিলেন ঃ

"আয় আল্লাহ! আমার যবানের জড়তা দূর করে দাও, যেন লোকে আমার কথা বুঝতে পারে।"

হুযুর (সাঃ) কে আল্লাহ্র তরফ থেকে অবশ্য বাগ্মিতার শক্তি এবং ভাষার উপর দখল পরিপূর্ণরূপেই দান করা হয়েছিল। আল্লাহ্র এ নেয়ামতের উল্লেখ করতে গিয়ে কখনো কখনো তিনি বলতেন ঃ

"আমি সর্বাপেক্ষা শুদ্ধভাষী আরব। ভাষার সকল মাধুর্য দান করে আমাকে পাঠানো হয়েছে।"[৩]

ভাষার ব্যাপারে আরবের প্রত্যেকটি কবীলাই অত্যন্ত সচেতন ছিল। কিন্তু তার মধ্যে যে দুটি গোত্রের ভাষা ও বাকরীতি শুদ্ধতম বলে সর্বমহলে স্বীকৃত ছিল, তারা হচ্ছে কোরাইশ এবং বুনু হাওয়াযেন । হুযুর (সাঃ) কোরাইশ বংশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আর তাঁর প্রতিপালন হয়েছিল বনু হাওয়াযেন গোত্রে—এ তথ্যের প্রতি ইঙ্গিত করেই তিনি বলতেন ঃ

১. তিরমিযী।
২. মুসলিম শরীফ ঃ যুহদ অধ্যায়
৩. তাবাকাতে ইবনে সাআ'দ।

"আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খাঁটী আরব। আমি কোরাইশ গোত্রীয় এবং আমার ভাষা বনী সা'আদের ভাষা।"[১]

বাকরীতি ঃ হুযুর (সাঃ) অত্যন্ত সহজ-সরল সাবলীল ভাষায় খুত্‌বা দিতেন। খুত্‌বা প্রদানে জন্য যখন হুজরা থেকে বেরে হ্তেন, তখন তাঁর অগ্রবর্তী কোন ঘোষণাকারী নকীব বা রাজকীয় জাঁকজমকের কোন চিহ্নই দেখা যেত না। খুত্‌বার জন্য বিশেষ কোন পোশাকও কোনদিন পরিধান করে আসতেন না। শুধুমাত্র হাতে একটি যষ্টি থাকত, কখনো কখনোবা ধনুকের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করতেন।[২] ইবনে মাজাতে আছে—মসজিদে যখন কোন ভাষণ দিতেন, তখন হাতে ছড়ি থাকত, আর যুদ্ধের ময়দানে কোন ভাষণ দিতে হলে ধনুকের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। জুমা এবং ঈদ ছাড়া খুত্‌বা বা ভাষণের কোন নির্ধারিত সময় বা বিশেষ কোন আয়োজন ছিল না। যখনই প্রয়োজন হ্ত, লোকজন ডেকে তাদের সামনে স্বতঃস্ফূর্ত ভাষণ শুরু করতেন। এ জন্যই মাটিতে দাঁড়িয়ে, মিম্বরে আরোহণ করে, এমন কি, উটের উপর বসে অর্থাৎ যখন যে অবস্থায় প্রয়োজন হ্ত, সে অবস্থাতেই খুত্‌বা প্রদান করতেন। প্রয়োজনের তাগিদে কখনো কখনো অবশ্য সুদীর্ঘ খুত্‌বাও দান করেছেন, কিন্তু সাধারণত হুযুর (সাঃ)-এর খুত্‌বা হ্ত সংক্ষিপ্ত এবং গভীর তত্ত্বপূর্ণ।

উপদেশ দানের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত খুত্‌বাগুলো সাধারণত সম্বোধনাত্মক হ্ত। তবে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ের অবতারণা হলে অথবা শ্রোতাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করতে হলে প্রশ্নোত্তরের বাক্‌ধারাও অবলম্বন করতেন। অর্থাৎ শ্রোতাদের প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করে তার জবাব প্রদান করতে থাকতেন। হুনাইনের যুদ্ধে আনসারদের সমবেত করে যে স্মরণীয় ভাষণ দিয়েছিলেন, তা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তই ছিল প্রশ্নোত্তরের রীতিতে। বিদায় হ্জ সহ্ আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণেও এ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

এমন আবেগের সঙ্গে খুত্‌বা দিতেন যে অনেক সময় তার দুচোখ লাল হয়ে যেত, আওয়াজ উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে পৌছাতে থাকত। হাতের আঙ্গুল উপরের দিকে উঠে যেত। এমন প্রত্যয়দৃঢ় কণ্ঠে সম্বোধন করতেন যেন কোন সৈন্যবাহিনীকে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করছেন।[৩] উত্তেজনায় সমগ্র শরীর শিউরে উঠত।[৪] কথার মাঝেই কখনো কখনো এমনভাবে উভয় হাত নাড়তেন যে রগের আওয়াজ শোনা যেত।[৫] কখনো কখনো মুষ্টিবদ্ধ করতেন আবার কখনোবা হাত খুলে ফেলতেন।

---

১. বনু সাআ'দ হাওয়াযেন গোত্রেরই একটি শাখার নাম
২. আবু দাউদঃ নামায অধ্যায়।
৩. মুসলিম শরীফ।
৪. ইবনে মাজাহ।
৫. আহমদ ইবনে হাম্বল, ২য় খণ্ড।

এমনি উত্তেজনাকর খুত্বায় একটি নিখুত বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "একবার আমি হুযুর (সাঃ) কে মিম্বরের উপর দাড়িয়ে ভাষণ দান করতে দেখলাম। তিনি বলছিলেনঃ "মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন একদিন এ আসমান জমিনকে তাঁর হাতের মুঠোয় তুলে নেবেন। একথা বলতে বলতে হুযুর (সাঃ) কখনো হাত মুষ্টিবদ্ধ করছিলেন আবার কখনো তা খুলে দিচ্ছিলেন। তাঁর শরীর কখনো ডানদিকে আবার কখনো বামদিকে হেলছিল। শরীর হেলনের সঙ্গে সঙ্গে আমি লক্ষ্য করছিলাম, মিম্বরের সর্বনিম্ন সিঁড়িটি পর্যন্ত এমনিভাবে হেলছিল। আমার অন্তরে আশঙ্কা জাগছিল যে শেষ পর্যন্ত মিম্বরটি হুযুর (সাঃ) কে সহ পড়ে না যায়!

বক্তৃতার বিভিন্নধারা ঃ হাদীসের কিতাবসমূহে হুযুর (সাঃ)-এর বক্তৃতা-ভাষণের যে সমস্ত বর্ণনা এবং উদ্ধৃতি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়, তা পর্যালোচনা করলে বিষয়বস্তু, আবেদন, ভাষা এবং সম্বোধনধারার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়। হুযুর (সাঃ) একাধারে যেমন ছিলেন রাষ্ট্রনায়ক, বিজয়ী সেনাপতি, আল্লাহ্র পয়গামবাহী রসূল, এক নতুন জাতির রূপকার এবং মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহ্বানকারী শিক্ষক, তেমনি ছিলেন এলেম ও মারেফাতের অন্তহীন সাগরসদৃশ। তাই বিভিন্ন স্থান ও পরিবেশে দায়িত্বের বিভিন্নতার প্রেক্ষিতেই বক্তৃতার ভাষা ও আবেদনে বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ্র তরফ থেকে মানবসমাজকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহ্বান এবং খোদাদ্রোহীতার জঘন্য পরিণাম সম্পর্কে মানবজাতিকে সতর্ক করার সময় ভাষা ও আবেদন হয়ে উঠত অত্যন্ত আবেগময়। একটি অধঃপতিত মানবজাতির প্রতি অভিভাবকসুলভ প্রত্যয়ই তখন তাঁর আবেগময় কন্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠত। কোরআন যখন নির্দেশ দিল ঃ .

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ -

অর্থাৎ, "আপনি আপনার আপনজন এবং নিকটস্থদের সতর্ক করুন"—তখন থেকেই হুযুর (সাঃ)-এর সতর্কীকরণ অভিযানের সূচনা হয়। আপনজন কোরাইশ-গোত্র ও শহরবাসীদের সমবেত করে প্রথমেই এ দায়িত্ব পালন করার সূচনা করলেন। গোত্রপতি আবু লাহাবের হঠকারিতার জন্য শেষ পর্যন্ত যদিও সর্বপ্রথম এ প্রচেষ্টা পুরোপুরি সফলতা লাভ করতে পারেনি, তথাপি এ ঐতিহাসিক খুত্বার যে কয়টি কথা বর্ণনাকারীদের যবানে বিবৃত হয়েছে তার মধ্যেই সতর্ককারী হিসাবে নবুওতের দায়িত্বের প্রতি তার হৃদয়মনে যে বলিষ্ঠ আস্থা ছিল তাই অকপটে ফুটে উঠেছে।

সাফা পর্বতে আরোহণ করে হুযুর (সাঃ) সর্বপ্রথম ডাক দিলেন, 'ইয়া সাবাহ্,—আহ্বান করার এ বিশেষ শব্দটি ব্যবহৃত হত নাগরিক জীবনের সর্বাপেক্ষা সঙ্কটজনক কোন পরিস্থিতির পূর্বাভাসরূপে। যেমন, প্রত্যুষে যদি কোন লুণ্ঠনকারী-হানাদার দলের অগ্রাভিযানের খবর পাওয়া যেত, তৎক্ষণাৎ কোন লোক যে কোন একটি পাহাড়ের টিলায় চড়ে উচ্চৈঃস্বরে এ শব্দটি উচ্চারণ করতে থাকত। এ ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে কাজকর্ম ফেলে সকল শ্রেণীর মানুষ এসে সমবেত হত। সুতরাং হুযুর (সাঃ)-এর কণ্ঠে এ ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সারা শহরের লোক এসে সাফা পর্বতের পাদদেশে সমবেত হল। হুযুর (সাঃ) সমবেত এ জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"বল! যদি আমি তোমাদের এ সংবাদ দিই যে পাহাড়ের অপর পাশ থেকে একটি হানাদার বাহিনী তোমাদের উপর চড়াও হওয়ার জন্যে এগিয়ে আসছে—তবে কি তোমরা আমার একথা বিশ্বাস করবে?"

সমবেত জনমণ্ডলী এক বাক্যে জবাব দিল, "এ পর্যন্ত তো আপনাকে কোনদিন মিথ্যা বলতে শুনিনি ; সুতরাং অবিশ্বাস করার কি আছে?"

সবার মুখ থেকে স্বীকৃতি আদায় করার পর আবেগজড়িত কণ্ঠে বলতে লাগলেন ঃ

"আমি তোমাদের আজ এক কঠিন আযাব সম্পর্কে সতর্ক করতে চাই ....।"

আবু লাহাব বিষয়টি আঁচ করতে পেরে সমগ্র পরিবেশটিকে হাল্কা করে দেয়ার উদ্দেশ্যে নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সুরে বলে উঠল, "এ সমস্ত কথা শোনানোর জন্যেই কি তুমি আমাদের এখানে সমবেত করেছ?" এতটুকু বলেই সে ফিরে চলল।[১]

হুনাইনের যুদ্ধলব্ধ সমস্ত সম্পদই নওমুসলিমদের অন্তর জয় করার উদ্দেশ্যে বন্টন করে দেয়া হয়েছিল। আনসারগণ সে সম্পদ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়েছিল। ফলে, কিছুসংখ্যক তরলমতি যুবকের মধ্যে কিছুটা অসন্তোষের সৃষ্টি হল। কেউ কেউ এমনও মন্তব্য করে বসল যে "আল্লাহ্, রসূল (সাঃ)-কে ক্ষমা করুন, তিনি কোরাইশদেরই সবকিছু দিয়ে দিলেন, অথচ আমাদের তরবারি থেকে এখনও রক্ত ঝরছে।" খবর পেয়ে হুযুর (সাঃ) আনসারদের একটি তাঁবুতে সমবেত করলেন, এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। নেতৃস্থানীয় লোকেরা আরয করলেন, দু'একটি তরলমতি যুবক হয়ত এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ সমালোচনায় অংশগ্রহণ করেছে, কিন্তু দায়িত্বশীল কোন লোক এহেন ধৃষ্টতায় কখনো অংশগ্রহণ করেননি। এর পর হুযুর (সাঃ) সকলের সামনে এক ভাষণ দান করলেন ঃ

১. বোখারী শরীফ ঃ ২য় খণ্ড, সূরা তাব্বাত-এর তফসীর প্রসঙ্গ।

"হে আনসারগণ! আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট অবস্থায় পাইনি? অতঃপর আল্লাহ্ আমারই মাধ্যমে তোমাদের হেদায়েত দান করেছেন। তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিলে, আল্লাহ্পাক আমারই মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃ-বন্ধনের সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তোমরা ইতিপূর্বে দরিদ্র ছিলে, আল্লাহ্ পাক আমারই মাধ্যমে তোমাদের সম্পদশালী করেছেন।"

প্রত্যেকটি কথার উত্তরে আনসারগণ সমস্বরে বলছিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল পরম আমানতদার, (আমাদের কোন অভিযোগ নেই)। একথা শুনে হুযুর (সাঃ) বললেন, তোমরাও তো বলতে পার যে "হে মোহাম্মদ (সাঃ)! তুমি তো এমন এক সময় আমাদের মধ্যে এসেছিলে, যখন তোমার দেশবাসী তোমাকে মিথ্যা প্রমাণিত করার চেষ্টা করছিল। আমরা তখন তোমাকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলাম। তোমার কোন সাহায্যকারী ছিল না, আমরাই তোমাকে সাহায্য করেছি। তুমি জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছিলে, আমরাই তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি। তুমি নিঃস্ব ছিলে, আমরাই তখন তোমার দুঃখ-কষ্টের সমব্যথী হয়েছি।"

এতটুকু বলার পর অভিযোগের জবাব দিলেন।

"তোমরা কি পছন্দ কর না যে অন্যেরা যখন ছাগল-উটের পাল নিয়ে বাড়ি ফিরবে, তখন তোমরা তোমাদের শহরে ফিরে যাবে আল্লাহ্র নবীকে নিয়ে। আল্লাহ্র কসম করে বলছি। তারা যা নিয়ে যাবে, তার চাইতে অনেক গুণে উত্তম বস্তু সঙ্গে নিয়ে তোমরা ফিরে যাবে।"

এটুকু বলার সঙ্গে সঙ্গেই সমবেত আনসারগণ সমস্বরে চীৎকার করে উঠলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা পরম সন্তুষ্ট।[১]

উপরোক্ত খুত্বার ওজস্বিনী ভাষা, অপূর্ব বাকধারা এবং আলঙ্কারিক শব্দ বিন্যাসের ব্যাখ্যা প্রদান করতে গেলেও নিঃসন্দেহে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনার প্রয়োজন।

বিজয়ী সেনানায়ক হিসাবে হুযুর (সাঃ) শুধুমাত্র মক্কা বিজয়ের পরই একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। সে স্মরণীয় ভাষণটির কিছু কিছু অংশ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে উল্লিখিত রয়েছে।

মক্কা ছিল আবহমানকাল থেকে আরবজাতির জন্য একটি পবিত্র শহর। আর কাবা প্রাঙ্গণ ছিল সবারই নিকট এমন একটি নিরাপদ আশ্রয়, যেখানে রক্তপাত ঘটানো - থা কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারত না। মক্কা বিজয়ের সময়েই কাবার সে নিরাপদ আশ্রয়ে ইতিহাসের সর্বপ্রথম রক্তপাতের ঘটনা সংঘটিত হয়।

১. বোখারী ঃ হুনাইনের যুদ্ধ প্রসঙ্গ।

যেহেতু, একটি নতুন ধর্মমতের অধীনে ইতিহাসের সে ব্যতিক্রমধর্মী কাজের সূত্রপাত, তাই অনেকের মনেই এমন সংশয় সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে বোধ হয় কাবার সে সনাতন মর্যাদা পর্যুদস্ত করা হল। এ জন্যই হুযুর (সাঃ) বিজয়-উত্তর খুত্‌বার মধ্যে বিশেষভাবে এ বিষয়টি সম্পর্কে জোর দিলেন ঃ

নিশ্চিতরূপে জেনো, আল্লাহ্ পাক যেদিন এ আকাশ-যমিন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকেই মক্কাকেও মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র মর্যাদায়ই এ শহর মর্যাদাসম্পন্ন। আমার পূর্বে এ শহর কারও জন্য কখনো হালাল হয়নি। আমার পরও আর কোন দিন কারও জন্যে হালাল হবে না। অবশ্য আমার জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্যই একে হালাল করে দেয়া হয়েছিল। আর কোন দিন কেউ এ হরমের সীমায় শিকারের জন্তুকেও তাড়া করতে পারবে না, এর কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ এমন কি তৃণলতাও কেউ আর কাটতে পারবে না। এতে হারিয়ে যাওয়া কোন বস্তুও কারও পক্ষে তুলে নেয়া আর কোনদিন কারও জন্য হালাল হবে না। তবে যদি কারও নিজের হারিয়ে যাওয়া কোন জিনিস এখানে খুঁজে পাওয়া যায়, তবে স্বতন্ত্র কথা।"

হুযুর (সাঃ)-এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ হচ্ছে বিদায় হজের খুত্‌বা। এ খুত্‌বার বিষয়বস্তু ছিল কতকগুলো জরুরী আদেশ নিষেধ এবং কতিপয় মূলনীতির ব্যাখ্যা। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এটা নীরস কতিপয় শব্দসমষ্টি হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা যায়, শব্দবিন্যাস এবং সাবলীল আবেগপূর্ণ বর্ণনাভঙ্গীর বিচারে এটিও ছিল নিঃসন্দেহে অত্যন্ত রসোত্তীর্ণ ভাষণ। আল্লাহ্‌র প্রশংসাবাণীর পর খুত্‌বাটি এভাবে শুরু হয়েছিল।

"লোকসকল! খুব মনোনিবেশ সহকারে শোন। কেননা, হয়তো এ বছরের পর আজকের এ স্থানে এ মাসে তোমাদের এ শহরে আর কোনদিন তোমরা আমার সাক্ষাৎ পাবে না।"

আটপৌরে সহজ ভাষায় বলতে গেলে বক্তব্য ছিল যে হয়ত এটিই আমার জীবনের শেষ বছর। কিন্তু বর্ণনার ধারা এবং কথার বিন্যাসে এ সহজ বক্তব্যটুকুই এমন হৃদয়গ্রাহী করে তোলা হয়েছিল যে শ্রোতামাত্রই তাতে অভিভূত না হয়ে পারেনি।

পরবর্তী বক্তব্য ছিল, মুসলমানদের ইজ্জত-আবরু, জান-মাল অন্য মুসলমানের পক্ষে হারাম,— আল্লাহ্-প্রদত্ত সীমারেখার দ্বারা সুরক্ষিত। কিন্তু এ বক্তব্যটুকুই নিম্নরূপ ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে।

"তোমরা জান কি, আজ কোন্ দিন? সমবেত কণ্ঠে জবাব এল আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই ভাল জানেন। বললেন, মনে রেখো আজকের দিনটি অত্যন্ত সম্মানিত দিন।

বললেন—জান এটি কোন্ শহর?

জবাব এল—আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন।

বললেন,— এটি অত্যন্ত সম্মানিত শহর।

জিজ্ঞাসা করলেন,—জান এটি কোন মাস?

জবাব এল—আল্লাহ্র রসূলই ভাল জানেন।

বললেন,—এটি মহাসম্মানিত যিলহজ্জ মাস।

এমনি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সে শহর, সে মাস এবং সে দিনটির অনন্য-মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আসল বক্তব্যের অবতারণা করলেন।

"মনে রেখো, আল্লাহ্পাক পরস্পরের জন্য তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের ইজ্জত-আবরু হারাম করে দিয়েছেন, যেমন হারাম আজকের এ দিন এ শহর ও বর্তমান এ মাস।

দেখ! আমার পরে তোমরা ধর্মদ্রোহী হয়ে একে অপরকে হত্যা করতে শুরু করো না।

সাম্যের তালীম দেয়ার জন্য এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করলেন ঃ

ان ربكم واحد وان اباءكم واحد - كلكم من ادم وادم من تراب - ان اكرمكم عند الله اتقاكم -

"তোমরা সবাই একই আল্লাহ্র সৃষ্টি, একই পিতার সন্তান। সবাই তোমরা আদমের আওলাদ আর আদমের সৃষ্টি মাটি থেকে। মনে রেখো, তোমাদের মধ্যে সৎকর্মশীল মুত্তাকী যাঁরা,— তাঁরাই কেবল আল্লাহ্র দৃষ্টিতে মর্যাদার অধিকারী।"

লুণ্ঠন এবং তস্করবৃত্তি ছিল আরবের অধিকাংশ লোকের নিয়মিত পেশা। তবে চারটি সম্মানিত মাসের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে সবাই এ সময়ে সংযত থাকত। কিন্তু দীর্ঘ চারটি মাস বেকার জীবন যাপন করা তাদের পক্ষে অনেক সময় কষ্টকর হত। তাই তারা মর্জিমত সম্মানিত মাসের সময়সীমা বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিত। কোরআন শরীফে এ কুপ্রথার নিন্দা করা হয়েছে। হুযুর (সাঃ) এহেন স্বার্থান্ধ স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিরোধকল্পে কঠোর ভাষায় ঘোষণা করে দিলেন— "সময়ের গতি আজো সে বিন্দুটিতেই রয়েছে, যেবিন্দু থেকে আল্লাহ্পাক আসমান যমিন সৃষ্টি করেছিলেন।" অর্থাৎ এখন থেকে সময়ের ধারা তার স্বাভাবিক গতিতেই চলবে, এর মধ্যে আর কাউকেও অন্যায় হস্তক্ষেপ করতে দেয়া হবে না।

একজন উ !দেশদানকারী শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে হুযুর (সাঃ) যে সমস্ত খুত্‌া এবং উপদেশ দান করেছেন সেগুলোর ভাষা যদিও ছিল নিতান্ত সহজ-সরল, তথাপি অলঙ্কারগুণ এবং আবেগময়তার দিক দিয়ে ছিল অনন্য। মদিনায় পদার্পণ করে সর্বপ্রথম যে ভাষণ দান করছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ ঃ

"লোকসকল! ব্যাপকভাবে সালামের প্রচলন কর। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন থাকে, তখন উঠে নামায পড় ; শান্তির সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।"

মদীনায় অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম জুমআয় যে খুত্‌বা দিয়েছিলেন, ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় তা ছিল নিম্নরূপ ঃ

"আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনার পর, লোকসকল! নিজেদের জন্য পূর্ব থেকেই কিছু করে রাখ। শীঘ্রই জানতে পারবে,—আল্লাহ্‌র কসম! একদিন তোমার বুদ্ধি-বিবেচনা সবকিছুই বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তোমার ছাগলপাল (ধন-সম্পদ) সবকিছুই অরক্ষিত অবস্থায় ছেড়ে যেতে হবে। তখন তোমার পরওয়ারদেগার জিজ্ঞেস করবেন, সে সময় তোমার নিজের কথা বুঝিয়ে বলার মত কোন মুখপাত্র বা সুপারিশকারীর সহায়তা পাওয়া যাবে না। তিনি জানতে চাইবেন,—আমি কি রসূল পাঠিয়ে তোমাদের এ কঠিন দিন সম্পর্কে সতর্ক করিনি? তোমাকে তো আমি ধন-সম্পদ এবং বিস্তর সুযোগ-সুবিধা দান করেছিলাম। তখন শুধু তুমি তোমার ডানে-বামে তাকাতে থাকবে, কিন্তু কোনকিছুই দেখবে না। সামনে জলন্ত জাহান্নাম ছাড়া আর কোন কিছুই দেখতে পাবে না। সুতরাং যার সামর্থ্য আছে, সে যেন এক টুকরা খেজুর আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে হলেও নিজের মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ড থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। যদি কারও সে সামর্থ্য না থাকে, তবে অন্তত সৎকথা উচ্চারণ করে হলেও যেন সে চেষ্টা করে। কেননা, যে কোন একটি সৎকর্মের প্রতিফল দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত প্রদান করা হবে। তোমাদের উপর শান্তি, আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত নাযিল হোক।"

দ্বিতীয় দফায় নিম্নোক্ত খুত্‌বা প্রদান করেন ঃ

"আল্লাহ্‌রই সমস্ত প্রশংসা। আমি তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। সমস্ত অনাচার এবং অন্তরের বিভ্রান্তি থেকে আল্লাহ্‌রই পানাহ্ চাই। যাকে আল্লাহ্‌পাক হেদায়েত করেন তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না। আর যাকে তিনি গোমরাহ্ করেন, তাকে হেদায়েত করার সাধ্য কারও নেই। আমি সাক্ষ্য দিই, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই।

"স্মরণ রেখো, সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহ্‌র কিতাব। যার অন্তরকে আল্লাহ্‌পাক (হেদায়েতের নূর দ্বারা) সুসজ্জিত করে কুফুরী থেকে ইসলামে দাখিল হওয়ার তওফীক দিয়েছেন, আর যে মানুষের মনগড়া জীবন-বিধান পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র কালামকে জীবনপথের দিশা হিসাবে গ্রহণ করেছে, সে প্রকৃত সাফল্য লাভ করেছে। কেননা, আল্লাহ্‌র বাণীই হল শুদ্ধতম বাণী। যা আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন, তোমরা তা ভালবাসতে শেখ। আল্লাহ্‌কে অন্তরের সঙ্গে

ভালবাস। আল্লাহ্র কালাম তেলাওয়াত এবং যিকির থেকে কখনো বিমুখ হয়ো না। তাঁর থেকে যেন তোমাদের অন্তর শক্ত হয়ে না যায়। একমাত্র আল্লাহ্রই এবাদত কর এবং তাঁর সঙ্গে আর কাউকেও শরীক করো না। তাঁকে যথার্থভাবে ভয় করতে শেখ। আল্লাহকে সামনে রেখে যে সমস্ত কথাবার্তা বল, তা সত্যে পরিণত করে দেখাও। আল্লাহ্র মহব্বতেই একে অন্যকে ভালবাস। যারা আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে না, আল্লাহ্ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র তরফ থেকে শান্তি ও কল্যাণ অবতীর্ণ হোক।"

একবারের একটি খুত্বায় শুধুমাত্র নিম্নোক্ত পাঁচটি কথার অবতারণা করলেন ঃ

"স্মরণ রেখো! আল্লাহ্র চোখে কখনো নিদ্রা নামে না, তাঁকে নিদ্রিত বলে কল্পনাও করা যায় না। তিনিই মানুষের ভাগ্যকে সমুন্নত করে দেন। রাতের আমল দিন আসার আগেই এবং দিনের আমল রাত নেমে আসার আগেই তাঁর কাছে পৌঁছে যায়। নূরই হচ্ছে আল্লাহ্র পর্দা।"—(মুসলিম শরীফ)

জুমার খুত্বায় সাধারণত আল্লাহ্র ভয়, উত্তম চতিত্র গঠন, উত্তম আখলাক, কেয়ামতের বর্ণনা, কবর ও হাশরের আযাব, তওহীদ এবং আল্লাহ্র ছেফাত ইত্যাদি প্রসঙ্গ বর্ণনা করতেন। সে সপ্তাহে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উপস্থিত হলে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ না থাকলে অনেক সময় কোরআন শরীফের সূরায়ে ক্বাফ অথবা কবর, হাশর প্রভৃতির বর্ণনা-সংবলিত কোন আয়াত পাঠ করে তার ব্যাখ্যা করে দিতেন।

হুযুর (সঃ) জীবনের অনেক খুত্বাতেই শুধু কোরআন শরীফের বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছেন বলে জানা যায়। ঈদের খুত্বায় আল্লাহ্র ভয়, কবর-হাশর এবং তওহীদ-এর প্রসঙ্গ ছাড়াও দান-খয়রাতের প্রতি বিশেষভাবে জোর দিতেন।

কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অথবা জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় উত্থাপিত হলে বিশেষভাবে সমাবেশের আয়োজন করা হত। সে সমস্ত সমাবেশে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপরই খুত্বা দিতেন। একবার সূর্যগ্রহণ শুরু হল। ঘটনাক্রমে সে দিনই হুযুর (সাঃ)-এর অল্প বয়স্ক সন্তান ইবরাহীম ইহলোল করেছিলেন। কুসংস্কারগ্রস্ত আরবদের অন্তরে এ ঘটনা গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করল। আলোচিত হতে লাগল, রসূল-তনয়ের আকস্মিক মৃত্যুতেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হুযুর (সাঃ) লোকজনকে একত্রিত করে নিম্নোক্ত খুত্বা প্রদান করলেন।

"আল্লাহ্র প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপনের পর ; লোকসকল! চন্দ্র এবং সূর্য আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনগুলোর দুটি নিদর্শন। কোন মানুষের মৃত্যুতে এ দুটির গ্রহণ হয় না।

এখন আমি এখানে দাঁড়িয়ে এমন কিছু রহস্য অবলোকন করতে সক্ষম, যা আগে আমি কখনো দেখতাম না। দেখ! এখন আমি এখানে থেকে জান্নাত-জাহান্নাম পর্যন্ত দেখতে পাই। শোন, আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে কবরে তোমাদের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। এমনিভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে দাজ্জালের মাধ্যমে। একজন আগন্তুক আমাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবে, এ লোকটি সম্পর্কে তুমি কি জান? ঈমানদারগণ বলবে, ইনি মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ)। ইনি হেদায়েত ও সুস্পষ্ট দলীলসহ আগমন করেছিলেন। আমরা তাঁকে মান্য করে তাঁর অনুসরণ করেছি। অপরদিকে, সন্দেহবাদীরা বলবে, আমি এঁকে চিনি না। তবে শুনেছি, লোকেরা এর সম্পর্কে নানা কথা বলাবলি করত, আমরাও বলতাম।

দেখ! মৃত্যুর পর তোমরা যেখানে যেখানে প্রবেশ করবে, আমাকে সে সমস্ত জায়গা প্রত্যক্ষ দেখানো হয়েছে। আমাকে এমনভাবে জান্নাত প্রত্যক্ষ করানো হয়েছে যে যদি ইচ্ছা করতাম, তবে তোমাদের জন্য ফল ছিঁড়ে আনতে পারতাম। অবশ্য আমি হাত নিবৃত করেছি। দোযখও আমাকে প্রত্যক্ষ করানো হয়েছে। আমি সেখানে একটি স্ত্রীলোককে জলতে দেখেছি। তার অপরাধ ছিল, সে একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে কষ্ট দিত। নিজেও কিছু খেতে দিত না, এদিক সেদিক ঘুরে পোকা-মাকড় খেয়ে জীবন রক্ষা করার সুযোগও দিত না। আমি আবু সুমামা আমর ইবনে মালেককেও দোযখে দগ্ধ হতে দেখেছি। কারণ, সে প্রচার করত যে কোন বিরাট ব্যক্তিত্বের মৃত্যু হলেই শুধু চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ লেগে থাকে। অথচ, চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ্র নিদর্শন মাত্র। তোমরা যখন এতে গ্রহণ লাগতে দেখবে, গ্রহণ ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত নামায পড়তে থেকো।"[১]

যাবতীয় বেদআত-কুসংস্কারের মোকাবিলায় হুযুর (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত ভাষণটি অধিকাংশ হাদীসের কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে।

"মনে রেখো, বিষয় দুটি, মৌখিক স্বীকৃতি এবং তা কাজে পরিণত করার পন্থা। আর সর্বোত্তম কালাম হল আল্লাহ্র কালাম এবং সর্বোত্তম তরীকা মোহাম্মদের তরীকা।

সাবধান! নিত্যনতুন যে সমস্ত বিধানের উদ্ভব হবে, সেগুলো থেকে বেঁচে থেকো। এ সময় নতুন নতুন বিধান অত্যন্ত জঘন্য হবে। (আল্লাহ্র কালাম এবং আমার তরিকার বাইরে) যে সমস্ত নতুন ব্যাপার দেখা দেবে, এর প্রত্যেকটিই বেদাআত। মনে রেখো, বেদাআত মানেই গোমরাহী।

১. মুসলিম শরীফ

তোমাদের অন্তরে যেন দীর্ঘ জীবন ভোগের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়ে না যায়। কেননা, এর দ্বারা অন্তর কঠিন হয়ে যায়। মনে রেখো! যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে নিয়তি তোমাদের নিয়ে যাচ্ছে, তা অত্যন্ত নিকটবর্তী। যা দূরবর্তী তা কখনো আসবে না। মনে রেখো, হতভাগ্য ব্যক্তি মায়ের গর্ভেও হতভাগ্যই হয়ে থাকে। আর সৌভাগ্যবানেরা অপরের পরিণাম দেখে উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

মনে রেখো! মুমিন-মুসলমানের সঙ্গে লড়াই করা কুফুরী এবং গালি দেয়া জঘন্যতম গোনাহ্। কোন মুসলমানের পক্ষে অন্য মুসলমান ভাইয়ের উপর তিন দিনের বেশি রাগান্বিত থাকা জায়েয নেই। সাবধান! কখনো মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করো না।"[১]

প্রভাব ঃ হুযুর (সাঃ)-এর অমৃততুল্য ভাষণ শ্রোতাদের মনে যে প্রভাব বিস্তার করত, তাকে এক কথায় নবুওতের মোজেযা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। বক্তৃতা শুনে কঠিন-হৃদয় মানুষের পাথরের মত অন্তরও মুহূর্তের মধ্যে মোমের মত নরম হয়ে যেত। একবার মক্কায় হুযুর (সাঃ) সূরা ওয়ান্নাজম তেলাওয়াত করে শোনালেন। তেলাওয়াত শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি হল যে মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে কঠিন-হৃদয় কাফেররা পর্যন্ত সেজদায় পড়ে গেল।[২]

হুযুর (সাঃ)-এর নবুওতপূর্ব যুগের জনৈক বন্ধু খবর পেয়ে এলেন যে (নাউযুবিল্লাহ্) তিনি পাগল হয়ে গেছেন। লোকটি ঝাড়-ফুঁক এবং টোট্কা চিকিৎসা জানতেন। তিনি সাক্ষাৎ করে ব্যাপার কি জানতে চাইলে হুযুর (সাঃ) সংক্ষিপ্ত এক খুত্বা দিলেন। কয়েকটি বাক্য শুনে সে ব্যক্তি বার বার তা শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। কয়েকবার শোনার পর মন্তব্য করলেন, আমি বহু কবির কবিতা এবং যাদুকরের মন্ত্রতন্ত্র শুনেছি। কিন্তু আপনার এ ভাষা এবং এর প্রত্যেকটি কথা, এক কথায় অনন্য।[৩]

একবার ছিন্নমূল নওমুসলিমদের একটি দল এসে উপনীত হলেন। এঁদের জন্য তাৎক্ষণিক কিছু সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। মসজিদে এসে মুসলিম জনগণকে সমবেত করে হুযুর (সাঃ) প্রথম কোরআনের এ আয়াত পাঠ করলেনঃ

"হে মানবসমাজ! যে পরওয়ারদেগার তোমাদের একই সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে ভয় কর।"

অতঃপর সূরায়ে হাশরের এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ

"প্রত্যেকেরই হিসাব করা উচিত যে সে আগামী দিনের (পরজীবনের) জন্য কি সঞ্চয় করছে।"

---

১. ইবনে মাজাহ্।
২. বোখারী ঃ ওয়ানানাজম প্রসঙ্গ।
৩. সহীহ্ মুসলিম।

সমগ্র মানবজাতি একই পিতার সন্তান এবং তাদের প্রতি কর্তব্য পালন করে মৃত্যুপরবর্তী জীবনের সঞ্চয় সংগ্রহ করার নির্দেশসূচক আয়াত দুটি পাঠ করে নগদ অর্থ-বস্ত্র-খাদ্য-শস্য এমনকি খেজুরের একটি ভগ্নাংশ হলেও তা দিয়ে এ ছিন্নমূল মুসলমানদের সাহায্য করতে উৎসাহিত করলেন।

তখনকার দিনে মদীনার মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল, তা সীরাতের পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। এতদসত্ত্বেও হুযুর (সাঃ)-এর হৃদয়স্পর্শী ভাষণ শুনে প্রত্যেক সাহাবীই যাঁর কাছে যা ছিল তাই এনে পেশ করলেন। অনেকে গায়ের কাপড় খুলে দিয়ে দিলেন। কেউ কেউ বাড়ি গিয়ে খাদ্যশস্য ইত্যাদি যা ছিল তাই এনে পেশ করতে লাগলেন। জনৈক আনসারী বাড়ি গিয়ে স্বর্ণের আশরাফী ভর্তি একটি থলে নিয়ে এলেন। থলেটি এত ভারী ছিল যে তা বয়ে আনতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, "অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই হুযুর (সাঃ)-এর সামনে কাপড়, খাদ্যবস্তু এবং টাকা-পয়সার দুটি স্তূপ হয়ে গেল। এগুলো দেখে তাঁর মোবারক-চেহারা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।"[১]

অত্যন্ত উত্তেজনাকর পরিবেশেও হুযুর (সাঃ)-এর পাক যবানের দু'একটি কথায় একে অপরের রক্তপানোদ্যত জনগণের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের মধুর হাওয়া প্রবাহিত করে দিত। মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের যুগ যুগ পুরাতন শত্রুতা সে অমৃতধারায় স্নাত হয়েই সৌহার্দ্যের চিরস্থায়ী বন্ধনে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।

বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে একবার হুযুর (সাঃ) ঘোড়ায় চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। এক জায়গায় মুসলমানদের সঙ্গে কতিপয় মুনাফেক একত্রে বসেছিল। মুসলমানরা উঠে সালাম করলেন। কিন্তু মুনাফেকরা একটি বে-আদবীপূর্ণ বাক্য উচ্চারণ করে বসল। এ সামান্য একটি ঘটনায় মুহূর্তে রক্তারক্তির উপক্রম হয়ে গেল। কিন্তু হুযুর (সাঃ) সেখানে দাঁড়িয়ে কয়েকটি কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজনার সে প্রজলিত অগ্নিকুণ্ডে যেন পানি পড়ে গেল।[২]

বনী মুস্তালিকের অভিযান থেকে ফেরার পথে একটি তুচ্ছ ব্যাপারকে কেন্দ্র করে মুনাফেকরা মোহাজের ও আনসারদের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে বসল। পরিণামে উভয় দলই একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মত অবস্থার সৃষ্টি হল। খবর পাওয়া-মাত্র হুযুর (সাঃ) ঘটনাস্থলে পৌছে একটি সংক্ষিপ্ত খুত্বা প্রদান করলেন। মুহূর্তের মধ্যে দেখা গেল, মোহাজের এবং আনসাররা পরস্পরে প্রকৃত ভাই-এর মতই মিলে গেল।

---

১. মুসলিম ঃ সদকা অধ্যায়।
২. বোখারী শরীফ ঃ মুসলমান এবং কাফেরদের মিশ্র জামাতে সালাম প্রদান প্রসঙ্গ।

ইফ্‌ক বা অপবাদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে এমন এক অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হল যে মসজিদে নববীর ভেতরেই একে অপরের প্রতি তরবারি উত্তোলন করার মত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে গেল। হুযুর (সাঃ) মিম্বরের উপর বসেছিলেন, উভয় দলকে লক্ষ্য করে এমন এক ভাষণ দান করলেন যে সৌহার্দ্যের টানে আত্মহারা হয়ে সে মজলিসেই একদল অপর দলের গলা জড়িয়ে ধরলেন।[১]

হুনাইনের যুদ্ধ শেষে গনীমতের সম্পদ বণ্টনকে কেন্দ্র করে কতিপয় আনসার যুবকের অভিযোগের প্রেক্ষিতে হুযুর (সাঃ) যে মর্মস্পর্শী ভাষণ দান করেছিলেন সে সম্পর্কে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এ বক্তৃতা শুনে আনসাররা এমনভাবে কেঁদেছিলেন যে অশ্রুধারায় তাঁদের দাড়ি পর্যন্ত সিক্ত হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুর সেই বন্যায় কাওসারের পানির ন্যায় হৃদয়ের সকল ক্লেদ মুহূর্তের মধ্যে ধুয়েমুছে ছাপ করে দিয়েছিল।[২]

মক্কা বিজয়ের সময় হুযুর (সাঃ) আনসারদের ধারণার বাইরেই মক্কার বড় বড় কাফের সরদারদের উপর কোন প্রতিশোধ গ্রহণ না করে সবাইকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এতে আনসারদের একদলের মধ্যে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে গেল। কেউ কেউ মন্তব্য করে বসল, শেষ পর্যন্ত জন্মভূমির আপন লোকদের প্রতি বুঝি হুযুর (সাঃ)-এর আন্তরিক দুর্বলতা প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

এ ধরনের সমালোচনা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আনসারদের সমবেত করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা নাকি এমন ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছ? আনসারগণ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করলেন। এরপর হুযুর (সাঃ) একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করলেন। তিনি বললেন ঃ

"দেখ! জন্মভূমি বা রক্ত সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য করা আমার নীতি নয়। আমি আল্লাহ্‌র দাস এবং তাঁর মনোনীত পথের অনুসারী মাত্র। আল্লাহ্‌র নির্দেশেই আমি হিজরত করেছি এবং আমার জীবনমৃত্যু সব কিছুই তোমাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে গেছে। যতদিন আমি জীবিত থাকব, তোমাদের সঙ্গেই থাকব, আমার মৃত্যুও হবে তোমাদেরই মাঝে।"

এতটুকু, বলার সঙ্গে সঙ্গেই আনসারদের অন্তরে এমন এক আলোড়ন সৃষ্টি হল যে সবাই কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিলেন।

সাধারণ ওয়াজ-নসিহতের ক্ষেত্রেও যে সমস্ত কথা বলতেন, তাতে এমন আবেগ এবং প্রভাব ফুটে উঠত যা কঠিন থেকে কঠিনতর অন্তরকেও মুহূর্তের মধ্যে গলিয়ে দিত। জনৈক সাহাবী এ বিষয়টিই নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ

১. বোখারী শরীফ, তাবাকাতে ইবনে সা'আদ।
২. মুসলিম শরীফ ঃ মক্কা বিজয় প্রসঙ্গ।

"একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ফযরের নামায বাদ আমাদের লক্ষ্য করে এমন এক মর্মস্পর্শী ওয়াজ করলেন যে আমাদের সবার চোখ অশ্রুসিক্ত এবং অন্তর কেঁপে উঠল।"[১]

অন্য এক মজলিসে প্রদত্ত ভাষণের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে গিয়ে হ্যরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ

"একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খুত্বা দিতে দাঁড়িয়ে কবরের বিপদ সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন, যে বিপদে মানুষ অবশ্যম্ভাবীরূপে পতিত হবে। ওয়াজ শুনে শেষ পর্যন্ত মুসলমানগণ উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন।"[২]

হ্যরত আবু হোরাইরা এবং হ্যরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একদিন হুযুর (সাঃ) খুত্বা দিলেন। খুত্বার মাঝেই বলে উঠলেন, "কসম সে সত্তার যাঁর হাতে আমার জীবন!" একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আবেগে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকলেন। দেখা গেল, শ্রোতাদের প্রত্যেকেরই মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং প্রত্যেকটি লোক কাপড়ে মুখ ঢেকে অঝোরে কাঁদছেন। বর্ণনাকারী বলেন, "আমার অবস্থা এমন হল যে আমি নিজেও বুঝতে পারছিলাম না যে হুযুর (সাঃ) কি কথার জন্য শপথ করছেন এবং তার পরে কি বলবেন। অথচ আমার হৃদয়মনও আবেগে উদ্বেলিত হয়ে পড়েছিল!"[৩]

হ্যরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন হুযুর (সাঃ) এমন এক মর্মস্পর্শী খুত্বা দিলেন যে আমি জীবনে এমন ভাষণ আর কোনদিন শুনিনি। খুত্বার মাঝেই বললেন, "লোকসকল! আমি যা জানি, যদি তোমরাও তা জানতে পারতে, তবে হাসতে কম, কাঁদতে বেশি। এটুকু শুনেই উপস্থিত সবাই অঝোরে কাঁদতে শুরু করলেন।[৪]

১. তিরমিযী ঃ আবু দাউদ।
২. বোখারী শরীফ, কবর আযাব প্রসঙ্গ।
৩. নাসায়ী ঃ যাকাৎ অধ্যায়।
৪. বোখারী শরীফ ঃ সূরায়ে মায়েদার তফসীর।

এবাদত-বন্দেগী

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۔

"যখনই আপনি অবকাশ পান তখন আল্লাহ্‌র এবাদতে দাঁড়িয়ে যান এবং আপনার রব-এর প্রতি অন্তর নিবিষ্ট করুন।"

পৃথিবীতে একমাত্র মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছাড়া অন্য এমন কোন পয়গম্বর বা ধর্মপ্রবর্তক নেই, যাঁদের জীবনী পর্যালোচনা করে জানা যায় যে তাঁদের এবাদত-বন্দেগীর তরিকা কি ছিল। এবাদতের জন্য কোন্ কোন্ সময় তাঁরা নির্ধারিত করেছিলেন বা তাঁদের এবাদতের নমুনাইবা কি ছিল। নবী রসূলগণের মধ্যে হযরত নূহ (আঃ), এমন কি হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত মূসা (আঃ) পর্যন্ত যাঁদের কথা তওরাতে উল্লিখিত হয়েছে তাঁদের জীবন-কথায় এবাদত-বন্দেগীর অধ্যায়টি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। ইঞ্জিলে মাঝে মাঝে দেখা যায় যে তাঁরা প্রার্থনা করতেন। কিন্তু কিভাবে করতেন, তার কোন বিরবণ কোথাও লিপিবদ্ধ নেই।

পূর্ববর্তী পয়গম্বর এবং ধর্মপ্রবর্তকদের অনুসারীবৃন্দ যখন স্ব-স্ব নবী-রসূলদের জীবনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি,—যার উপর দ্বীন ও শরীয়তের মূল ভিত্তি নির্ভর করে, সে সম্পর্কে সীমাহীন উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে, তখন তারই পাশাপাশি মুসলমানগণ তাদের পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তের বিবরণের সঙ্গে এবাদত-বন্দেগীর প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় পর্যন্ত অত্যন্ত যত্ন সহকারে সংরক্ষিত করেছেন।

দোয়া ও নামায ঃ নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বেও হুযুর (সাঃ) এবাদত করতেন। হেরা পর্বতগুহায় গিয়ে মাসের পর মাস এবাদত-বন্দেগী এবং গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন।[১] নবুয়তপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই হুযুর (সাঃ)-কে নামাযের তরীকা শিক্ষা দেয়া হয়। তবে কোরাইশদের ভয়ে প্রকাশ্যে নামায পড়তেন না। সময় হলেই কোন পাহাড়ের গুহায় চলে যেতেন এবং নিরিবিলিতে নামায আদায় করতেন। একদিন এক গিরিসংকটে হযরত আলীসহ নামায পড়ার সময়ে হযরত আবু তালেব সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁদের নামাযরত অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ভ্রাতুষ্পুত্র, কি করছিলে? হুযুর (সাঃ) তখন তাঁর সামনে নামায সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করে তাঁকেও ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন।[২]

১. বোখারী শরীফ ঃ ওহী প্রসঙ্গ।
২. মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল ১ম খণ্ড।

চাশ্‌ত-এর নামায হুযুর (সাঃ) প্রকাশ্যভাবে সবার সামনে কাবা শরীফে আদায় করতেন। কারণ, কোরাইশদের ধর্মেও এ সময় অনুরূপ এবাদতের রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, একবার হুযুর (সাঃ) কাবা প্রাঙ্গণে নামায পড়ছিলেন, অনতিদূরে কোরাইশ সরদারেরা বসে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল। কথায় কথায় আবু জাহ্‌ল বলে উঠল, "আচ্ছা! এখন যদি কেউ আস্ত একটা উটের ভূঁড়ি এনে সেজদারত মোহাম্মদের (সাঃ) কাঁধের উপর রেখে দিত!" বলাবাহুল্য, দুরাত্মা ওতবা সঙ্গে সঙ্গেই দলপতির সে পৈশাচিক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করল।[১]

নামাযে উচ্চৈঃস্বরে কেরাআত পাঠ করলেও কাফেররা গালাগালি দিত।[২] একদা হরম শরীফে নামায পড়ার সময় দূরাত্মারা ষড়যন্ত্র করে সেজদা থেকে ওঠার সময় হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র গর্দানে কাপড়ের ফাঁস আটকে দম বন্ধ করে মারার উপক্রম করল।[৩] কিন্তু এতকিছুর পরও পরম আরাধ্য মালিক-মাওলার প্রেমে মত্ত হয়ে এবাদতে মশগুল হওয়ার নিয়মিত অভ্যাসে কোন ব্যতিক্রম সৃষ্টি করতে পারত না।

রাতের বেলায়ও বার বার উঠে নামায আদায় করতেন। রাত্রিকালীন এ এবাদত সম্পর্কে বিভিন্ন সাহাবী বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা দিয়েছেন। একজন বর্ণনাকারীর মতে সারারাত্রি দাঁড়িয়ে এবাদত করতেন। হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) বর্ণনা মতে, হুযুর (সাঃ) রাত্রির একাংশে নিদ্রিত থাকার পর উঠে নামায শুরু করতেন। কতক্ষণ নামায পড়ার পর শুয়ে পড়তেন। পুনরায় উঠে নামায পড়তেন, এভাবে সামান্য সময় বিশ্রাম করার পর সারারাত্রি এবাদত-বন্দেগীতে কাটিয়ে দিতেন।

হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা মতে, হুযুর (সাঃ) অর্ধেক রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর উঠতেন এবং মোট তের রাকাত নামায পড়তেন। হযরত আয়েশার বর্ণনায়, নয় রাকাত নামায পড়তেন।

মোহাদ্দেসগণ এ ধরনের বিভিন্ন বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে হুযুর (সাঃ) গভীর রাত্রে উঠে যে সমস্ত এবাদত-বন্দেগী করতেন, তা যিনি যেভাবে দেখেছেন সেভাবেই বর্ণনা করেছেন। তবে জীবনের শেষ পর্যায়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা মতে, গভীর রাত্রে নয় থেকে তের রাকাত পর্যন্ত নামায নিয়মিত আদায় করতেন।

---

১. ইবনে আসীর।
২. বোখারী শরীফ।
৩. ইবনে হিসাম।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায ছাড়াও হুযুর (সাঃ) দিন-রাত্রির মধ্যে অন্তত ৩৯ রাকাত সুন্নত নামায অবশ্যই আদায় করতেন। তা হচ্ছে ফযরে দু'রাকাত, চাশ্‌ত-এর চার রাকাত, জোহ্‌রে ছয় রাকাত, আসরের ফরযের পূর্বে চার রাকাত এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনানুযায়ী ফরযের পর আরও দু'রাকাত, মাগরেব-এ দু'রাকাত, এশায় ছ'রাকাত, তাহাজ্জুদে তের রাকাত এবং বেতর-এর সঙ্গে দু'রাকাত। এছাড়াও আওয়াবীন এবং তাহিয়্যাতুল মসজিদ-এর নামাযও পড়তেন। সমস্ত সুন্নত নামাযের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন ফযরের দু'রাকাত সুন্নত নামায সম্পর্কে।।[১] কোন ওয়াক্তের সুন্নত যদি কোন কারণে ছুটে যেত তবে তা পরে ক্বাযা পড়ে নিতেন। যদিও উম্মতের জন্য সুন্নতের ক্বাযা পড়া জরুরী নয়, তথাপি, জীবনে একবার একটি বিদেশী প্রতিনিধিদলের মাঝে ব্যস্ত থাকার দরুন জোহ্‌রের ফরয-এর পরবর্তী দু'রাকাত সুন্নত নামায ছুটে গেলে আসরের পর কোন এক বিবির ঘরে গিয়ে দু'রাকাত সুন্নত ক্বাযা পড়ে নেন। এ সময় নামায পড়ার রেওয়াজ না থাকায় বিবিরা কারণ জিজ্ঞেস করলে হুযুর (সাঃ) ঘটনাটি ব্যক্ত করেন। উম্মতের পক্ষে কোন এক ওয়াক্তের নামায ফওত হয়ে গেলে তার ক্বাযা একবার আদায় করে নেয়াই যথেষ্ট। কিন্তু হুযুর (সাঃ)-এর দস্তুর ছিল, কোন এবাদত একবার শুরু করলে, তা আর জীবনে ত্যাগ করতেন না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি হুযুর (সাঃ)-কে অবশিষ্ট সারা জীবনই সে দু'রাকাত সুন্নতের ক্বাযা পড়তে দেখেছি।[২]

রমযান মাস আগমনের সঙ্গে সঙ্গে হুযুর (সাঃ) এবাদত-বন্দেগীতে সম্পূর্ণ ডুবে যেতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন—হুযুর এমনিতেই ছিলেন সদা মুক্তহস্ত, কিন্তু রমযান মাসে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) যখন কোরআন শরীফ শোনাতে আসতেন তখন তাঁর দানশীলতা প্রভাতী সমীরণের গতিকেও যেন ছাড়িয়ে যেত।[৩] শেষ দশদিন একান্তভাবেই এবাদত-বন্দেগীতে কাটিয়ে দিতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রমযানের শেষ দশদিন হুযুর (সাঃ) সারারাত জেগে এবাদত করতেন, বিবিদের সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকতেন, পরিবার-পরিজনের সবাইকে রাত্রে নামায পড়ার জন্য জাগিয়ে দিতেন।[৪] শেষ দশদিন সাধারণত এ'তেকাফ অবস্থায় মসজিদে বসেই সর্বক্ষণ আল্লাহ্ আল্লাহ্ করতেন।[৫]

১. বোখারী শরীফ, নফল ও সুন্নত অধ্যায়।
২. মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, মুসলিম শরীফ ঃ আছরের পর দুই রাকাত নামায প্রসঙ্গ।
৩. বোখারী শরীফ, রমযান অধ্যায়।
৪. আবু দাউদ, রমযান অধ্যায়।
৫. বোখারী শরীফ ঃ এ'তেক্বাফ অধ্যায়।

তেলাওয়াত ঃ প্রতিদিন নিয়মিত কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন। আবু দাউদের এক বর্ণনায় দেখা যায়, প্রতিদিন এশার নামাযের পর তেলাওয়াত করতেন।[১] তেলাওয়াতের জন্য সূরা বিন্যাস করে নিয়েছিলেন, সে নিয়মেই তেলাওয়াত করতেন। রমযান মাসে কোরআন শরীফ আদ্যোপান্ত অন্তত একবার পাঠ করতেন[২] শেষরাত্রে ঘুম থেকে উঠে কোরআনের কোন একটি বা একাধিক পছন্দসই আয়াত তেলাওয়াত করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রাত্রে আমি দেখতে পেলাম, হুযুর (সাঃ) শেষ প্রহরে চোখ কচলাতে কচলাতে উঠলেন। নীরব নিস্তব্ধ আকাশে শেষরাত্রির তারকারাশি মিট্ মিট্ করছিল। আকাশের দিকে চোখ তুলে সে নৈসর্গিক শোভা দেখতে দেখতে সূরা আলে ইমরানের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তেলাওয়াত করলেন।[৩]

إِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ......

রাত্রি শেষ প্রহরের এ আবেগময় মুহূর্তটিতে অনেক সময় কোরআন শরীফের কোন তাৎপর্যপূর্ণ আয়াত তেলাওয়াত করার পর নিম্নোক্ত দোয়াও পাঠ করতেন ঃ

"আয় আল্লাহ্! তোমারই সমস্ত প্রশংসা। তুমিই আসমান-যমিনের জ্যোতি। তোমারই তরে সকল স্তুতিবাদ, তুমিই আসমান-যমিনের রক্ষাকর্তা। তোমারই তরে সকল তারিফ, তুমিই আসমান-যমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবার পালনকর্তা। তুমি সত্য, তোমার ওয়াদা সত্য, তোমার বাণী সত্য, তোমার সান্নিধ্য যথার্থ, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কেয়ামত অবশম্ভাবী সত্য।

"আয় আল্লাহ্! তোমারই তরে আমি আমাকে নিবেদন করেছি, তোমার প্রতি পূর্ণ ঈমান এনেছি, আর তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই প্রতি অনুগত হয়েছি। তোমারই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে সংগ্রাম করেছি। তোমার নিকটই বিচারপ্রার্থী হয়ে থাকি। তুমি আমার অগ্র-পশ্চাৎ, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত গোনাহ মাফ কর। তুমিই তো আমার আরাধ্য, তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই।[৪]

গভীর রাত্রে সবার ঘুমিয়ে পড়ার পর কোন কোন সময় বিছানা থেকে উঠে দোয়া ও মোনাজাতে মগ্ন হয়ে পড়তেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ "এক রাত্রিতে ঘুম ভেঙে গেলে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বিছানায় দেখতে পেলাম না। মনে মনে ভাবলাম, তিনি বোধ হয় আমাকে বিছানায় একাকী রেখে অন্য

১. আবু দাউদ।
২. বোখারী শরীফ ঃ ওহীর বর্ণনা।
৩. বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ ঃ রাত্রিকালীন এবাদত।
৪. মুসলিম শরীফ।

কোন বিবির ঘরে চলে গেছেন। অন্ধকারে এদিক সেদিক হাতড়ে দেখতে পেলাম, হুযুর (সাঃ) সেজদায় পড়ে আত্মগতভাবে মুনাজাত করছেন। এ অবস্থা দেখে আমি অনুতপ্ত হলাম এবং ভাবতে লাগলাম, হুযুর (সাঃ) কোন্ দুনিয়াতে আছেন, আর আমি কিই না ভাবছি।"[১]

কোন কোন সময় গভীর রাত্রিতে উঠে কবরস্তানে চলে যেতেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে দোয়া করতে থাকতেন। একদিন হযরত আয়েশা (রাঃ) পেছনে পেছনে রওয়ানা হলেন। দেখতে পেলেন, হুযুর (সাঃ) কবরস্থান জান্নাতুল বাকিতে গিয়ে রোনা-জারীর সঙ্গে দোয়া করছেন।[২]

গভীর রাতের নামায ও দোয়া সেরে বিছানায় শুয়ে পড়তেন। কোন কোন সময় চোখ বন্ধ হয়ে গেলে নাকের আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যেত। ফযর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়তেন এবং ফযরের দু'রাকাত সুন্নত আদায় করে মসজিদের দিকে রওয়ানা হয়ে যেতেন। যাওয়ার পথে পবিত্র যবান থেকে এ দোয়া উচ্চারিত হতে থাকত ঃ

"আয় আল্লাহ্! আমার অন্তরে নূর দাও, আমার যবানে নূর দাও, আমার কানে, আমার দৃষ্টিতে, আমার আচার-আচরণে, আমার সামনে-পেছনে, আমার উপরে-নিচে নূর দাও। আমাকে আলোকিত কর। আমাকে জ্যোতির্ময় করে তোল।"[৩]

নামাযের বিভিন্ন রুকন আদায় করতে গিয়ে সর্বাপেক্ষা কম সময় ব্যয় করতেন রুকূ থেকে উঠে দাঁড়ানোর মধ্যে। কিন্তু এর মধ্যেও সময় কম ব্যয়িত হত না। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, কোন কোন সময় রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে এত সময় ব্যয় করতেন যে আমার মনে হত, হুযুর (সাঃ) বোধহয় সেজদায় যাওয়ার কথা ভুলেই গিয়েছেন।[৪]

নামাযের মনোযোগে সামান্যতম বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে, এমন বিষয়াদি থেকে সর্বাবস্থায় নিজেকে মুক্ত রাখতেন। একদিন উভয়দিকে পাড়বিশিষ্ট একটি চাদর গায়ে দিয়ে নামায পড়ছিলেন। হঠাৎ পাড়ের প্রতি নজর পড়ে গেল। নামায শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাদরটি খুলে নির্দেশ দিলেন, এটি আবু জায়হামকে দিয়ে এসো এবং তার কাছ থেকে শাদা পাড়শূন্য অন্য একটি চাদর চেয়ে আন। এর নক্শা করা পাড় নামাযের মনোযোগে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে।[৫]

১. নাসায়ী।
২. নাসায়ী ঃ মুমিন মুসলমানগণের জন্য মাগফেরাতের দোয়া।
৩. মুসলিম শরীফ ঃ রাত্রিকালীন নামায অধ্যায়।
৪. মুসনাদে আহমদ ঃ ৩য় খণ্ড।
৫. বোখারী শরীফ, ১ম খণ্ড।

একবার নামায পড়তে পড়তে ঘরের দরজায় টাঙানো নকশাযুক্ত একটি পর্দার উপর নযর পড়ে গেল। নামায শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে ডেকে নির্দেশ দিলেন, এ পর্দা এখনই সরিয়ে ফেল। এর রঙ্গীন নকশা আমার মনোযোগে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে।[১]

রোযা ঃ নবী-রসূল এবং ধর্মপ্রবর্তকদের সবাই আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভের পন্থা হিসাবে আহারাদি ত্যাগ করে কৃচ্ছ্রতাসাধনের পন্থা অবলম্বন করেছেন। প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষি এবং ধর্মবেত্তাগণ এ ব্যাপারে বোধহয় সর্বাধিক কৃচ্ছ্রতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে ইসলামের নবী মোহাম্মদ (সাঃ) এব্যাপারে যে কোন বাড়াবাড়ির পথ পরিহার করে সম্পূর্ণ মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন।

ইসলামের পূর্বে আরবদের মধ্যে আশুরার রোযা রাখার রীতি প্রচলিত ছিল। হুযুর (সাঃ) নিজেও পূর্বতন রেওয়াজ অনুযায়ী এদিনে রোযা রাখতেন। কোন কোন হাদীসে দেখা যায, মক্কার জীবনে হুযুর (সাঃ) কোন কোন সময় একাধারে কয়েক মাস পর্যন্ত রোযা রাখতেন। তবে মদীনায় আসার পর এ অভ্যাসের পরিবর্তন সাধিত হয়। মদীনার ইহুদীরা আশুরার দিন রোযা রাখত। হুযুর (সাঃ) শুধু যে এদিন নিজেই রোযা রাখতেন, তাই নয়। বরং সাহাবীদেরও তা পালন করতে বিশেষভাবে তাগিদ করতেন। তবে, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর আশুরার রোযা নফলে পরিণত হয়।

মদীনার জীবনে মহানবী (সাঃ) রমযান মাস ব্যতীত কখনো পূর্ণ এক মাস রোযা রাখেননি। তবে শা'বান মাসের প্রায় সবটুকুই রোযা রেখে কাটাতেন। ফলে, একাধারে প্রায় দু'মাসের রোযা হয়ে যেত। বছরের অন্যান্য মাসগুলোতে যখন রোযা রাখতে শুরু করতেন তখন মনে হত, বোধহয় আর কখনো রোযা রাখবেন না। শুক্লপক্ষের বেজোড় দিনগুলোতে সাধারণত রোযা রাখতেন। এছাড়া, প্রতিমাসে দু' সোমবার এবং একটি বৃহস্পতিবারেও নিয়মিত রোযা রাখতেন। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় যে জু'মার দিনে রোযা রাখাও ছিল তাঁর সাধারণ অভ্যাস। এতদ্ব্যতীত মোহররমের প্রথম দশদিন এবং শওয়াল মাসের দু'তারিখ থেকে সাত তারিখ পর্যন্ত মোট ছ'দিন নিয়মিত রোযা রাখতেন।[২]

উপরোক্ত নিয়মিত রোযা ছাড়াও মাঝে-মধ্যে রোযা রাখার অভ্যাস ছিল। বর্ণনায় দেখা যায়, হুযুর (সাঃ) হয়ত ঘরে এসে জিজ্ঞেস করতেন, খাবার কিছু আছে কি? অনেক সময় জবাব আসত, কিছুই নেই। তখন বলতেন, তবে আজ আমি রোযা রাখলাম।[৩] কখনো কখনো একাধারে কয়েকদিন এক টানা রোযা

১. বোখারী শরীফ ঃ লেবাস অধ্যায়।
২. রোযা সম্পর্কিত এ সমস্ত বর্ণনা হাদীসের প্রায় সকল কিতাবেই উল্লিখিত হয়েছে।
৩. আবু দাউদ, রোযার নিয়ত অধ্যায়।

রাখতেন। অর্থাৎ, পর পর কয়েক দিনব্যাপী কিছু না খেয়েই রোযা অবস্থায় থাকতেন। কোন কোন সময় হয়তবা একদিন সামান্য একটু এফতার করে নিতেন। কিন্তু যখন জানতে পারতেন যে সাহাবীরা তাঁর এ একটানা রোযার অনুকরণ করতে শুরু করেছেন, তখন হুযুর (সাঃ) তাঁদের রোযা রাখতে নিষেধ করলেন। সাহাবীদের কেউ কেউ মনে করলেন, হয়ত হুযুর (সাঃ) তাঁদের প্রতি মমতা বশত সাওমে বেসাল করতে নিষেধ করেছেন, আসলে কোন নিষেধাজ্ঞা নয়। তাই তাঁরাও বিরতিহীন রোযা রাখতে শুরু করলেন। দু'দিন কেটে যাওয়ার পর নতুন চাঁদ দেখা দিলে হুযুর (সাঃ) এফতার করলেন এবং এরশাদ করলেন, "চাঁদ না উঠলে আমি অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিরতিহীন রোযা রেখে দেখতাম, দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে উৎসাহী লোকগুলো শেষ পর্যন্ত তা পারে কি না! সাহাবীরা আরয করলেন, "বিরতিহীন রোযা রাখা যদি বাড়াবাড়িই হয়, তবে আপনি কেন এভাবে রোযা রাখেন?" তিনি জবাব দিলেন, "তোমাদের মধ্যে কি আমার মত কেউ আছে? আমাকে তো আমার আল্লাহ্ পানাহার করান।" অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, বললেন, "তোমাদের মধ্যে আমার মত কে হতে পারে? আমি রাত্রি অতিক্রম করি, আমাকে আমার আল্লাহ্ পরিতৃপ্ত করে রাখেন।"[১]

নীতিগতভাবে হুযুর (সাঃ) উম্মতের জন্য ধর্মীয় ব্যাপারে কঠিন কৃচ্ছ্রতার পথ সাধারণত অপছন্দ করতেন। নিজেও অস্বাভাবিক কঠোরতা থেকে দূরে থাকতেন।

যাকাৎ ঃ ইসলামের পূর্বেও হুযুর (সাঃ) দান-ছদকা করতেন, এতীম-দরিদ্রের কল্যাণের জন্য মুক্তহস্তে খরচ করতেন। ওহী নাযিল শুরু হওয়ার সময় হযরত খাদীজার সাক্ষ্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।[২] নবুওত প্রাপ্তির পর থেকে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে নগদ অর্থ বা কোন বস্তু কোন সময়ই হাতে রাখতেন না। যা পেতেন সঙ্গে সঙ্গে খরচ করে দিতেন। তবে জীবনে কোন আনুষ্ঠানিক যাকাৎ প্রদান করেছেন, এমন কোন প্রমাণ কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় না। এর দ্বারা কোন কোন ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদ মন্তব্য করেছেন যে নবী-রসূলদের উপর যাকাৎ ফরয ছিল না। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। আমাদের মতে যাকাতের দুটি অর্থ রয়েছে। প্রথমত সাধারণত দান-খয়রাত, এ ব্যাপারে হুযুর (সাঃ)-এর আমল কেমন ছিল, তা কারও অবিদিত নয়। দ্বিতীয়ত আনুষ্ঠানিক যাকাৎ অর্থে সোনা, রুপা, নগদ অর্থ, পশুসম্পদ ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা পূর্ণ এক বছর কারও অধিকারে থাকো তাঁর পক্ষে অবশ্য পরিশোধ্য একটি নির্দিষ্ট হার। এ হিসাবে দেখা যায়, হুযুর (সাঃ)-এর জীবনে কোন সময়ই যাকাৎ ফরয হওয়ার মত সম্পদ একত্রিত হয়নি। পূর্ণ এক বছরকাল যাকাৎ ফরয হওয়ার মত সম্পদ একত্রিত

১. সহীহ্ মুসলিম।
২. বোখারী শরীফ ঃ ওহী নাযিল অধ্যায়।

করে রাখা তো দূরের কথা, হঠাৎ কোনখান থেকে সামান্য কিছু সম্পদ এসে গেলে পূর্ণ একটি রাতও তা ঘরে রাখা পছন্দ করতেন না। একবার কোন এক এলাকা থেকে খেরাজ বাবত প্রচুর সম্পদ হুযুর (সাঃ)-এর হাতে আসে। উক্ত সম্পদ হকদারদের মধ্যে বন্টন করেও সন্ধ্যা পর্যন্ত বেশকিছু পরিমাণ অবশিষ্ট থেকে যায়। সে রাতটি হুযুর (সাঃ) মসজিদেই কাটিয়ে দেন এবং যে পর্যন্ত না হযরত বেলাল (রাঃ) এসে খবর দেন যে "ইয়া রসূলুল্লাহ্! আল্লাহ্ পাক আপনাকে দায়িত্বমুক্ত করেছেন,—সে পর্যন্ত আর অন্তঃপুরে যাননি।"[১]

হজ ঃ নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে হুযুর (সাঃ) কতবার হজ করেছিলেন সে সম্পর্কিত কোন সুনির্দিষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। ইবনুল আসীর অনুমান করেছেন যে হজ যেহেতু মক্কার কোরাইশদের একটি সুপ্রাচীন পবিত্র ধর্মানুষ্ঠান, তাই হুযুর (সাঃ) নিশ্চয়ই বয়ঃপ্রাপ্তির পর থেকেই নিয়মিত হজ পালন করে থাকবেন।[২] তিরমিযীর এক বর্ণনায় আছে যে হুযুর (সাঃ)-এর দুবার এবং ইবনে মাজাহ্ ও হাকেম-এর বর্ণনা অনুযায়ী তিনবার হজ করার কথা বলেছেন। তবে সনদের বিচারে এ সমস্ত বর্ণনা দুর্বল।[৩] মদীনায় হিজরত করার পর সমস্ত বর্ণনাকারীর মতে হিজরী দশ সনে শুধুমাত্র একটি হজ আদায় করেছেন এবং এটিই বিদায় হজ নামে খ্যাত হয়েছে। হজ ছাড়া হুযুর (সাঃ) জীবনে চারবার ওমরাহ্ আদায় করেছেন। এর মধ্যে একটি যিলক্বদ মাসে, একটি হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর, একটি হুনাইনের যুদ্ধের পর আর একটি বিদায় হজের সঙ্গে।[৪]

হযরত আনাস বলেন, একমাত্র বিদায় হজ ছাড়া হুযুর (সাঃ) অন্য সব কয়টি ওমরাহ্ যিলক্বদ মাসে আদায় করেছিলেন।

হুযুর (সাঃ) জীবনে কতবার ওমরা করেছেন, এ সম্পর্কিত কোন এক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছিলেন, চারটি; এর মধ্যে একটি ছিল রজব মাসে। একথা শুনে হযরত আয়েশা (রাঃ) মন্তব্য করেছিলেন, আল্লাহ্পাক আবু আবদুর রহমানের (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের ডাক নাম) উপর রহম করুন, হুযুর (সাঃ) জীবনে এমন কোন ওমরা করেননি যাতে আমি শরীক হইনি, রজব মাসে তিনি কোন ওমরাই করেননি।[৫]

হুদাইবিয়া সন্ধির সময় হুযুর (সাঃ) ওমরাহ্ করার জন্য রওয়ানা হলেন। তখন পবিত্র কাবা জিয়ারত করার আগ্রহাতিশয্যে তিনি এমন আবেগাপ্লুত হয়ে উঠেছিলেন যে দলবল ছেড়ে একাই দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিলেন। সাহাবীরা অবস্থা

১. আবু দাউদ।
২. যারকানী ৮ম খণ্ড, আবু দাউদ হজ অধ্যায়।
৩. যারকানী, ৮ম খণ্ড।
৪. মুসলিম,—আবু দাউদ, তিরমিযী।
৫. বোখারী, মুসলিম, হজ অধ্যায়।

দেখে হযরত আবু কাতাদা আনসারীকে এ নিবেদন করে পাঠালেন যে আমাদের সালাম আরয করে হুযুর (সাঃ)-কে বলুন, এভাবে একা একা এগিয়ে যাওয়া আমাদের বিবেচনায় নিরাপদ নয়। হয়ত পথিমধ্যে কাফেররা চোরা-গুপ্তা আক্রমণ করে বসতে পারে। হুযুর (সাঃ) সাহাবীদের এ আর্জি মনযুর করলেন।[১]

সার্বক্ষণিক যিকির ঃ মোমিনের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কোরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

"যারা আল্লাহ্কে স্মরণ করেন দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে .... — আলে-ইমরান

"ব্যবসা-বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যস্ততাও এঁদের আল্লাহ্র যিকির থেকে অন্যমনস্ক করতে পারে না।"—(সূরা-নূর)

কোরআনে বর্ণিত মুমিন চরিত্রের এ বৈশিষ্ট্যটির সর্বোত্তম নমুনা ছিলেন কোরআনের বাহক নিজেই। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুযুর (সাঃ) জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই আল্লাহ্র যিকিরে মশগুল থাকতেন।[২] রবিয়া ইবনে কা'ব আসলামী (রাঃ) অনেক সময় রাতের বেলায় হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র আস্তানা পাহারা দিতেন। তিনি বর্ণনা করেন, রাতের বেলায় হুযুর (সাঃ)-এর যিকিরে-তসবীহ্র আওয়াজ শুনতে শুনতে আমি অনেক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়তাম, আমার দু'চোখে ঘুম নেমে আসত।[৩]

উঠতে-বসতে, শয়নে-জাগরণে, কোন কিছু খেতে বা পান করতে, কাপড় পরতে, কোথাও রওয়ানা হতে বা সফর থেকে ফিরে আসতে, অজু করতে, মসজিদে প্রবেশ করতে—এক কথায়, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি কাজ বা বিশ্রামের প্রতিটি পল-অনুপলেই হুযুর (সাঃ) মহান মাওলার স্মরণে মগ্ন থাকতেন। হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন কর্ম এবং অভিব্যক্তি সম্পর্কিত যে সমস্ত দোয়া সংকলিত হয়েছে, এগুলো হুযুর (সাঃ)-এর অবিরাম যিকিরের-ই কিছু অংশ মাত্র। শেষ জীবনে তসবীহ্ ও এস্তেগফারের নির্দেশ সংবলিত সূরা ইযা-জা-আ নাযিল হওয়ার পর উম্মুল মো'মেনীনদের বর্ণনা অনুযায়ী হুযুর (সাঃ)-এর মোবারক যবানে সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায় যিকির ও তসবীহ্ জারী থাকত।[৪]

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, একটু একটু বিরতির পর সর্বক্ষণ হযূর (সাঃ)-এর মোবারক যবানে এ দোয়াটি উচ্চারিত হতে শোনা যেতঃ

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ–

অর্থাৎ "পরওয়ারদেগার! আমাকে ক্ষমা কর, আমার তওবা কবুল কর। নিঃসন্দেহে তুমিই তওবা কবুলকারী, গোনাহ্ মাফকারী।"

১. বোখারী শরীফ।
২. আবু দাউদ ঃ পবিত্রতা অধ্যায়।
৩. মুসনাদে আহমদ ৪র্থ খণ্ড।
৪. তাবাকাতে ইবনে সা'আদ ঃ ওফাত অধ্যায়।

তিনি আরও বলেন, এক মজলিসে আমি গুণে দেখলাম, কয়েক শ'বার দোয়াটি যবান মোবারক থেকে উচ্চারিত হল।[১]

কোথাও রওয়ানা হওয়ার তাড়াহুড়ার মধ্যে অথবা সফরের কষ্টকর পরিবেশেও কখনো যিকির এবং নফল এবাদতের বিরাম হত না। সফরের অবস্থায় সোয়ারীর উপর বসেই হুযুর (সাঃ) নফল নামায শুরু করে দিতেন। এ সমস্ত নামাযে ক্বেবলার কোন বাধ্য-বাধকতা ছিল না। সোয়ারী যে দিকে যেত, সে দিকে মুখ করেই নামায আদায় করতে থাকতেন। কোরআনের আয়াত যথা فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ - অর্থাৎ, "যে দিকেই তোমরা ফের না কেন, সে দিকেই আল্লাহকে সামনে পাবে।" (বাকারাহ)-এর মর্মার্থ বাস্তবায়িত হত।[২]

আগ্রহ ঃ সাহাবীদের মজলিস অথবা উম্মুল মো'মেনীনদের কামরা অর্থাৎ যেখানে যে অবস্থাতেই থাকতেন, আযানের শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই হুযুর (সাঃ) নামাযের জন্যে রওয়ানা হয়ে যেতেন।[৩]

নামায ও যিকিরের মাধ্যমেই তাঁর রাতের অধিকাংশ প্রহর কেটে যেত। কখনো শেষ রাতের দিকে চক্ষু বন্ধ হয়ে এলেও আযানের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই বিছানা থেকে উঠে বসে পড়তেন।[৪] রাতের গভীরে যেরূপ আবেদ ও তন্ময়তার সঙ্গে নামায পড়তেন, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন,—"কখনো কখনো হুযুর (সাঃ) সমগ্র রাত্রি নামাযে দাঁড়িয়েই কাটাতেন। সূরা বাকারা, সূরা আলে-ইমরান এবং সূরা নেসার মত কোরআন শরীফের বৃহত্তর সূরাগুলো একটানা পাঠ করতেন। গযব এবং আযাবের কোন আয়াত এলে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে সে আযাব থেকে নাজাত প্রার্থনা করতেন। কোন রহমত বা সুসংবাদের আয়াত এলে তা লাভ করার জন্যে আগ্রহভরে মুনাজাত করতেন।[৫] মাঝে মাঝে এমন জোরে কেরাআত পড়তেন যে লোকেরা বিছানায় শুয়েও সে কেরাআত শুনতে পেত।[৬] কোন কোন আয়াতে এমনভাবে নিমগ্ন হয়ে যেতেন যে বার বার তা পাঠ করতে থাকতেন। হযরত আবু যর (রাঃ) বর্ণনা করেন,—এক রাতে হুযুর (সাঃ) কেরাআত পাঠ করতে করতে এ আয়াতে এলেন ঃ

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ -

---

১. তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ ও দামেমী, দোয়া অধ্যায়।
২. বোখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ।
৩. বোখারী ঃ পরিবার প্রতিপালন সম্পর্কিত আলোচনা।
৪. বোখারী।
৫. মুসনাদে আহমদ, ২য় খণ্ড।
৬. ইবনে মাজাহ্ ঃ রাত্রিকালীন নামাযের বিরবণ।

অর্থাৎ, "যদি তুমি তাদের আযাবে নিক্ষেপ কর, (অবশ্য তা তুমি করতে পার। কেননা,) তারা যে তোমারই বান্দা। আর যদি ক্ষমা কর, (তাও করতে পার, কেননা,) তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"—সাহাবী বলেন, এ আয়াত বার বার এমন তন্ময়তার সঙ্গে পাঠ করতে লাগলেন যে এ অবস্থাতেই রাত শেষ হয়ে ভোর হয়ে গেল।[১]

সাহাবী যায়েদ ইবনে খালেদ বর্ণনা করেন, একবার আমি হুযুর (সাঃ)-এর রাত্রিকালীন নামায প্রত্যক্ষ করার জন্য রাত জেগে বসে রইলাম। (সম্ভবত এটা কোন সফরের ঘটনা) দেখলাম নামাযে দাঁড়িয়ে প্রথম দু'রাকাত সাধারণভাবেই পড়লেন। তারপর দু রাকাত নামায অত্যন্ত লম্বা করলেন। এরপর সাধারণভাবে আরও দু'রাকাত করে আট রাকাত পড়লেন। সবশেষে বেতের-এর নামায আদায় করলেন।[২] সাহাবী ইবনে খোবাব বর্ণনা করেন যে এক রাত্রিতে নামায পড়তে পড়তেই রাত কেটে গেল।[৩]

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলেন—এক রাতে আমি হুযুর (সাঃ)-এর সঙ্গে নামায পড়ার সুযোগ লাভ করি। প্রথম রাকাতে কোরআন শরীফের সর্ববৃহৎ সূরা সূরায়ে বাকারা পাঠ করতে শুরু করলেন। আমার ধারণা হল, অন্তত একশ' আয়াত পাঠ করবেন। কিন্তু শ' আয়াতও যখন পিছনে পড়ে গেল, তখন মনে মনে অনুমান করলাম, বোধ হয়, প্রথম রাকাতেই সূরা বাকারা শেষ করে দেবেন। কিন্তু আমার এ অনুমানও ভুল প্রমাণ করে হুযুর (সাঃ) সূরা বাকারা শেষ করে প্রথম রাকাতেই সূরা আলে-ইমরান এবং সূরায়ে নেসা পাঠ করে ফেললেন। অত্যন্ত ধীরে-সুস্থে, প্রতিটি আয়াতের মর্ম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এমন কি, যেখানে যেখানে দোয়ার আয়াত আছে, সেগুলোতে দোয়া করে তিন সূরার দীর্ঘ সোয়া পাঁচ পারা তেলাওয়াত শেষ হওয়ার পর রুকু করলেন। রুকুর মধ্যেও কেয়াম-এর সময় ব্যয়িত হল। দীর্ঘ রুকু থেকে সোজা হয়েও ততটুকু সময় অপেক্ষা করলেন। তারপর সেজদা করলেন, সেজদার মধ্যেই রুকুর ন্যায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হল।[৪]

যুদ্ধের ময়দানে এবাদত : প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতি আক্রমণে যখন যুদ্ধের ময়দান বিভীষিকাময় হয়ে উঠত, অস্ত্রের ঝনঝনানি, আহতের আর্ত-চীৎকার, প্রতিহিংসার উন্মত্ত হুঙ্কার এবং যথেচ্ছ অস্ত্র ব্যবহারের বিচার-বিবেচনাহীন প্রতিযোগিতার মধ্যেও হুযুর (সাঃ) ধীর-শান্ত-মনে অত্যন্ত নির্বিকার চিত্তে দোয়া-

১. ইবনে মাজাহ্ মুসলিম ও নাসায়ী : রাত্রিকালীন নামাযের বিবরণ।
২. মুসলিম শরীফ : মোয়াত্তা, ইবনে মাজাহ্।
৩. নাসায়ী : রাত্রিজাগরণ প্রসঙ্গ।
৪. মুসলিম ও নাসায়ী : রাত্রিকালীন নামায প্রসঙ্গ।

এবাদতে নিমগ্ন হয়ে যেতেন। রাব্বুল আলামীনের দরবারে দু'হাত তুলে আবেগজড়িত কণ্ঠে অন্তরের আকুতি পেশ করার সময় ভয়-ত্রাস বা কোন প্রকার উদ্বেগের চিহ্নমাত্র চেহারা মোবারকে প্রকাশ পেত না। ইসলামের এক একজন সিপাহী যখন স্ফীত বক্ষে, সীমাহীন সাহসিকতায় শত্রুর অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করে এগিয়ে যেতেন, সে মুহূর্তে খোদ সিপাহসালার মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ) হয়ত বিনয়ে বিগলিত ভূমিতে ললাট স্থাপন করে কাতর কণ্ঠে রাব্বুল আলামীনের দরবারে সাহায্যের মিনতি পেশ করতে থাকতেন। বদর, ওহুদ, খায়বর, তবুক প্রভৃতি প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধেই হুযুর (সাঃ) ভূমিতে ললাট স্থাপন করে একই ভাষায় আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেছেন।

যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতিগণ সাধারণত অধীনস্থ সৈন্যেদের বীরত্ব এবং নিপুণতার উপর ভরসা করে থাকেন। কিন্তু ইসলামের মহান নবী ভরসা করতেন তাঁর পরম মাওলার সাহায্য-সহযোগিতার উপর। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রত্যেকটি যুদ্ধে সুনিপুণভাবে সৈন্য সমাবেশ ও সারি-বিন্যাস করতেন ঠিকই, কিন্তু রণ-কৌশলের উপর আদৌ ভরসা না করে হুযুর (সাঃ) ভরসা রাখতেন সকল পার্থিব শক্তি ও উপকরণের উর্ধ্বে যাঁর শক্তিতে তিনি শক্তিমান ছিলেন, সেই মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের উপর।

বদর যুদ্ধে দুজন সাহাবী এসে নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)! আমরা কাফেরদের হাতে বন্দী হয়ে পড়েছিলাম। এ শর্তে তারা আমাদের মুক্তি দিয়েছে, যেন এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করি। একথা শুনে তিনি জবাব দিলেন, দেখ! আমি শুধু মাত্র আল্লাহর সাহায্য চাই, অন্য কারও সাহায্যে আমার প্রয়োজন নেই।[১]

বদরের ময়দানে যখন তুমুল যুদ্ধ, চারদিকে যখন রক্তের ছড়াছড়ি, সে চরম উত্তেজনাকর মুহূর্তটিতে দেখা গেল, আল্লাহর রসূল (রাঃ) পরম নির্ভরতায় দু'হাত উর্ধ্বে তুলে নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে মুনাজাত করছেন ঃ

"মাওলা! আজ তোমার ওয়াদা পূর্ণ কর।" আত্মমগ্নতা ও আবেগে মস্তক যেন কখনো কখনো কাঁধের উপর ঝুলে পড়ছিল। কখনো ও আবেগাপ্লুত হয়ে সেজদায় যেতেন এবং পরম আকুতিভরা কণ্ঠে বলতে থাকতেন, "আয় আল্লাহ্! আজকের এ মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রাণী যদি ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে যায়, তবে কেয়ামত পর্যন্ত তোমার বন্দেগী করার মত আর কে অবশিষ্ট থাকবে?"[২]

প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) তিন তিনবার খেদমতে হাজির হলেন, কিন্তু তিনবারই দেখলেন, সেজদার অবস্থায় পবিত্র ললাট ভূমি স্পর্শ করে রয়েছে।[৩]

১. মুসলিম শরীফ ঃ প্রতিরক্ষার বর্ণনা।
২. বোখারী ও মুসলিম ঃ বদর প্রসঙ্গ।
৩. সীরাতুন নবী, ১ম খণ্ড।

ওহুদের ময়দানে আংশিক জয়লাভ করে আবু সুফিয়ান যখন আনন্দাতিশয্যে হুবল দেবতার জয়ধ্বনি দিতে শুরু করল, তখনও এ ছিন্নভিন্ন অবস্থার মধ্যেও হুযুর (সাঃ) পরম মাওলার উপরই সকল ভরসার কথা অকপটে ঘোষণা করলেন। হযরত ওমরকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, ঘোষণা কর ঃ

"আল্লাহ্ আমাদের মাওলা, প্রভু, তোমাদের কোন অভিভাবক-প্রভু নেই। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা মর্যাদাশীল।"

খন্দকের যুদ্ধে হুযুর (সাঃ) নিজ হাতে পরিখা খনন করেছিলেন, মাটি কাটার তালে তালে পবিত্র যবান থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল ঃ

اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْاٰخِرَةِ ـ فَبَارِكْ فِي الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ ـ

"আয় আল্লাহ্! আখেরাতের কল্যাণ-ই তো প্রকৃত কল্যাণ।

আনসার এবং মোহাজেরদের তুমি বরকত দাও।"

এ যুদ্ধে শত্রুরা চারদিক থেকে এমন কঠিনভাবে আক্রমণের পর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল যে প্রতিরোধকারী একজন মুসলিম সৈন্যের পক্ষে নিজের স্থান ছেড়ে একপদ এগুনোর উপায় ছিল না। এতদসত্ত্বেও বিশ-বাইশ দিনের এ কঠিন অবরোধের মধ্যে সর্বমোট মাত্র এক থেকে চার ওয়াক্তের বেশি নামায ক্বাযা হতে পারেনি। একদিন আসরের সময় শত্রুরা এমন তীব্র আক্রমণ করে বসল যে মুহূর্তের জন্যও অবসর পাওয়া গেল না। এ বিভীষিকাময় আক্রমণের মধ্যেই আসরের ওয়াক্ত পার হয়ে গেল। নামায ফওত হওয়ার দরুন হুযুর (সাঃ) অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা পেলেন। আক্রমণের তীব্রতা একটু কমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বপ্রথম জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করে নিলেন।[১]

খায়বর অভিযানে শহরের কাছাকাছি এসেই যবান মোবারক থেকে বের হল ঃ "আল্লাহ্ আকবার! খায়বার ধ্বংসপ্রাপ্ত হল।"

শহরের দালান-কোঠা দেখা যাবার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন,

'দাঁড়াও।' তারপর হাত তুলে এ দোয়া করলেন ঃ

"আয় আল্লাহ! এ জনপদ এবং এর অধিবাসীদের সব রকম কল্যাণ তোমার কাছে প্রার্থনা করি। এবং তোমার পানাহ্ চাই, এ শহর-এর অধিবাসী এবং অন্যান্য যা কিছু আছে সে সবের যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে।"—ইবনে হিশাম।

হুনাইনের যুদ্ধে হুযুর (সাঃ)-এর অধীনে ছিল বার হাজার সৈন্য। কিন্তু প্রথম আক্রমণেই এ বিরাট সেনাবাহিনীর পা উপড়ে গেল। এ বিশাল সেনাবাহিনীর

১. বোখারী শরীফ।

সেনাপতি যদি সৈন্যদের ভরসায় যুদ্ধ করতেন, তবে সৈন্যবাহিনীর কাতার ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত তিনি প্রাণ রক্ষার ফিকির করতেন। কিন্তু এ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতেও তিনি সমস্ত শক্তির উৎস একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর তেমনি অকুতোভয়ে ভরসা করে রইলেন, যেমন তাঁর উপর ভরসা করতেন হাজার হাজার সৈন্যবাহিনী পরিবেষ্টিত অবস্থাতেও। দেখা গেল, চারিদিকে বিভীষিকা সৃষ্টি করে তীর-বর্শার বৃষ্টি বর্ষণ করতে করতে দশ হাজার সৈন্য বন্যার বাঁধভাঙা স্রোতের ন্যায় ছুটে আসছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন সঙ্গী ব্যতীত গোটা সৈন্যবাহিনী ইতস্তত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এ ভয়াবহ মৃত্যু-বিভীষিকার মাঝে দাঁড়িয়েও হুযুর (সাঃ)-এর ললাটে সামান্য একটু কুঞ্চনও সৃষ্টি হল না। দ্রুত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লোকজনকে একত্রিত করে প্রতিরোধ রচনায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন না। যে শক্তির তরফ থেকে প্রেরণা লাভ করে যুদ্ধে অবতরণ করতেন, বিপদের মহাসন্ধিক্ষণে তাঁরই সামনে দু'হাত প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। দ্রুত সওয়ারী থেকে নেমে এসে বলতে লাগলেন, আমি আল্লাহ্‌র গোলাম এবং পয়গম্বর। এ বলে দোয়ার জন্যে হাত তুললেন। বলতে লাগলেন, "পরওয়ারদেগার! তোমার প্রতিশ্রুত সাহায্য পাঠাও।" মুহূর্তের মধ্যে পরিবেশ পাল্টে গেল। নিশ্চিত বিপর্যের মুখে জয়ের পতাকা উড়তে শুরু করল।[১] দশ হাজার তীর-বর্শার প্রচন্ড আক্রমণ শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করে মোকাবিলা করার দুঃসাহস পয়গম্বর ব্যতীত আর কার হতে পারে?

সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা বনীমুস্তালিকের যুদ্ধে। সামনে দুশমন কাতারবন্দী হয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ওত পেতে আছে। নামাযের সময় উপস্থিত হলে পরিস্থিতির গুরুত্বের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই হুযুর (সাঃ) ইমামের স্থানে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করলেন। সাহাবীদের অধিকাংশ এসে নামাযে শরীক হয়ে গেলেন। অল্পসংখ্যক সাহাবী মাত্র দুশমনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাহারা দিলেন এবং পরে এসে নামায আদায় করলেন। এ নিশ্চিত আক্রমণের মুখেও হুযুর (সাঃ)-এর এবাদত বন্দেগীতে বিন্দুমাত্র বাধার সৃষ্টি করতে পারল না।

হুদাইবিযার সন্ধির সময় এর চাইতে মারাত্মক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। হুযুর (সাঃ) মক্কায় অদূরবর্তী গাসফান নামক স্থানে এসে তাঁবু ফেলেছেন। নিকটবর্তী পাহাড়ে প্রখ্যাত কোরাইশ সেনাপতি খালেদ একদল দুঃসাহসী সৈন্যসহ ওত পেতে বসে আছে। কোরাইশদের মধ্যে পরামর্শ হল, মুসলমানরা যখন তন্ময়তায় সঙ্গে নামায আদায় করতে শুরু করবেন, ঠিক সে সুযোগে খালেদ অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এমনি বিপদের মুহূর্তে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে

১. বোখারী ও মুসলিম : হুনাইন যুদ্ধ।

নামায কৃছর পড়ার নির্দেশ জারি হল। আসরের সময় উপস্থিত হলে হুযুর (সাঃ) নামাযের জন্য দাঁড়ালেন, ঠিক সামনেই ছিল শত্রু সৈন্যদের অবস্থান। সাবাহীরা তখন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে একভাগ নামাযে শরীক হলেন। অন্য ভাগটি দুশমনের মুখোমুখি অস্ত্র তাক করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রথম জামাতের নামাযে শরীক হলে, তাঁরা এসে স্থান নিলেন এবং দ্বিতীয় জামাত এসে নামাযে দাঁড়ালেন।

মুকতাদিগণ এমনই শৃঙ্খলার সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করলেন, কিন্তু খোদ-সেনাপতি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিরুদ্বিগ্নচিত্তে নামায পড়িয়ে গেলেন। এমন সংকটময় পরিস্থিতিতেও নামাযে তাঁর মনোযোগের মধ্যে সামান্যতম অস্বস্তি বা তাড়াহুড়ার লক্ষণ দেখা গেল না। হুযুর (সাঃ) সম্ভাব্য আক্রমণের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করলেন না। দুশমনের উদ্ধত অস্ত্র নামাযের প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে সামান্যতম আলোড়নও সৃষ্টি করতে পারল না।[১]

উপরোক্ত ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে, হুযুর (সাঃ) আল্লাহর সে নির্দেশের প্রতি কতটুকু নিষ্ঠার আমল করতেন, যে নির্দেশে বলা হয়েছে ঃ

"মুমিনগণ! যখন কোন দুশমনের মোকাবিলা কর, তখন দৃঢ় থাক এবং বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ কর। অবশ্যই তোমরা কামিয়াব হবে।" (সূরা আনফাল)।

বোখারী শরীফের বর্ণনায় আছে, হুযুর (সাঃ) জেহাদের অভিযানে যে কোন উচ্চস্থানে আরোহণ করার সময়েই তিনবার 'আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দিতেন।[২]

আল্লাহর ভয় ঃ হুযুর (সাঃ) ছিলেন খাতামুল আম্বিয়া, সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, আল্লাহর খাস মাহবুব। এতদসত্ত্বেও অন্তরে আল্লাহর ভয় এমনি প্রবল ছিল যে অনেক সময় বলতেন, "আমিও জানি না, আমার কি অবস্থা হবে।" সাহাবি হযরত ওসমান ইবনে মযউন-এর ওফাত হলে দোয়ার জন্য গেলেন। লাশ সামনে নিয়ে একজন স্ত্রীলোক এই বলে বিলাপ করছিলেন, "আল্লাহর কসম তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন।" বিলাপ শুনে হুযুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "ওহে! তুমি কি করে জান যে এঁকে আল্লাহ্ তা'আলা পুরস্কৃত করবেন?" স্ত্রীলোকটি জবাব দিলেন,—"এঁকে যদি পুরস্কৃত করা না হয়, তবে আর কাকে পুরস্কৃত করা হবে?" তখন হুযুর (সাঃ) এরশাদ করলেন, "হ্যাঁ, আমিও এঁর সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করি, তবে আমি পয়গম্বর হওয়া সত্ত্বেও জানি না, খোদ আমার সঙ্গে কি ব্যবহার করা হবে।"[৩]

কখনো ঝড়ো হাওয়া হলেই কাজকর্ম ছেড়ে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং বলতে থাকতেন, "আয় আল্লাহ! তোমার প্রেরিত যাবতীয় বিপদাপদ থেকে

১. আবু দাউদ ,১ম খণ্ড, মুসলিমের নামায প্রসঙ্গ।
২. বোখারী শরীফ ঃ যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহু আকবার ধ্বনি প্রদান প্রসঙ্গ।
৩. বোখারী শরীফ ঃ জানাযা অধ্যায়।

তোমারই আশ্রয় চাই।"[১] ঘন কাল মেঘ কেটে গেলে বা বৃষ্টি হলে আনন্দিত হতেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন। একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রশ্ন করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! মেঘ দেখলেই আপনি এমন অস্থির হয়ে ওঠেন কেন?" জবাব দিলেন, "আয়েশা! তুমি কি বুঝবে? আমার ভয় হয়, হুদ জাতির উপর যে আযাব নাযিল হয়েছিল, তাই না নেমে আসে! অথচ তারা আকাশে মেঘ দেখে বলাবলি করছিল, ভালই তো, বৃষ্টি হলে বরং আমাদের ফসলের জন্য তা উপকারে আসবে! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ছিল আল্লাহর গযব।"[২]

একবার হুযরত আবু বকর (রাঃ) আরয করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ (সাঃ)। আপনার মাথার চুল যে পাকতে শুরু করেছে।" জবাব দিলেন, "আবু বকর, সূরায়ে হুদ, সূরায়ে ওয়াকেয়া, সূরা ওয়াল মুরছালাত এবং সূরায়ে আম্মা ইয়াতাসাআলুনার ভয়াবহ বর্ণনা আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।"[৩] সাহাবী হযরত উবাই ইবনে কা'ব বর্ণনা করেন, রাত দু'প্রহর অতিক্রান্ত হওয়ার পর হুযুর (সাঃ) উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলতেন, "লোক সকল! আল্লাহকে স্মরণ কর। ভূমিকম্প আসছে। পেছনে যার আসার কথা, সে ছুটে আসছে। মৃত্যু তার আনুষঙ্গিক সবকিছু নিয়ে হাযির হচ্ছে! মৃত্যু তার সমস্ত সাজ-সরঞ্জামসহ হাযির হচ্ছে।"[৪]

অনেক সময় বলতেন, "লোক সকল! আমি যা জানি, যদি তোমরা তা জানতে পারতে, তবে কদাচিত হাসতে আর কাঁদতে অধিকাংশ সময়।"[৫]

একদা খুত্বা দিতে গিয়ে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় বলতে লাগলেন, "হে কোরাইশগণ! নিজের নিজের খবর নাও। আমি তোমাদের আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারব না। হে নবী আবদে মানাফ! আমি তোমাদের আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে পারব না। হে আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালেব। তোমাকেও আমি আল্লাহর গেরেফ্‌ত থেকে রক্ষা করতে পারব না। হে রসূলের ফুফী সাফিয়া! আমি তোমাকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারব না। হে রসূল তনয়া ফাতেমা! আমি তোমাকেও আল্লাহর আযাব থেকে উদ্ধার করতে পারব না।"—বোখারী-মুসলিম।

একদিন দূর-দূরান্ত থেকে বেদুঈনেরা এসে মসজিদে এমন ভিড় করল যে প্রচণ্ড ভিড়ের ভারে হুযুর (সাঃ) পর্যন্ত পিষে যাবার উপক্রম হল!। মোহাজেররা এগিয়ে ভিড় পাতলা করে দিলেন। ভীড়ের চাপে ক্লান্ত হয়ে হুযুর (সাঃ) হযরত

১. ইবনে মাজাহ্ ঃ বোখারী, মুসলিম
২. বোখারী, মুসলিম।
৩. শামায়েল তিরমিযী।
৪. মেশকাত ঃ তিরমিযীর হাওলা।
৫. বোখারী, মুসলিম।

আয়েশার হুজরায় চলে গেলেন। বিরক্তি চেপে রাখতে না পেরে যবান মোবারক থেকে বদ-দোয়ার কালাম বের হয়ে পড়ল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কেবলামুখী হয়ে দু'হাত প্রসারিত করে কাতর কণ্ঠে মিনতি জানাতে লাগলেন, "আয় আল্লাহ্! আমিও একজন মানুষ। আমার দ্বারা যদি তোমার কোন বান্দা কষ্ট পায়, তবে তার জন্য আমাকে যেন শাস্তি দিও না।"[১]

আল্লাহ্‌র ভয়ে রোনাজারী ঃ আল্লাহ্‌র ভয়ে অনেক সময় অন্তর আর্দ্র হয়ে দুচোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। একদা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ দরবারে বসে তেলাওয়াত করলেন ঃ

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ - وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

"প্রত্যেক উম্মতের জন্য যখন আমি সাক্ষী উপস্থিত করব এবং এ উম্মতের জন্য আমি উপস্থিত করব আপনাকে,সে দিনের কথা স্মরণ করুন।"

এ আয়াত শোনার সঙ্গে সঙ্গে হুযুর (সঃ)-এর উভয় চোখ থেকে বিগলিত ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।[২]

অনেক সময় নামাযের মধ্যেই দু'চোখে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে শুরু করত। একবার সূর্যগ্রহণের নামায শেষে মুনাজাত করতে করতে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ফরিয়াদ করতে লাগলেন, "আয় আল্লাহ্! তুমি তো ওয়াদা করেছ যে যতদিন আমি আছি, ততদিন আমার সামনে তুমি মানুষের উপর কোন আসমানী গযব নাযিল করবে না।"[৩]

আব্দুল্লাহ্ ইবনে শুখাইর নামক জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেন, একবার আমি হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলাম, হুযুর (সাঃ) নামায পড়ছেন। দু'চোখ বেয়ে দরদর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। কাঁদার প্রবল বেগ সংবরণ করতে গিয়ে যবান মোবারক থেকে এমন এক প্রকার শব্দ বেরিয়ে আসছে, যেন আটার চাক্কি চলছে বা উত্তপ্ত কড়াই-এ কোন কিছু টগবগ করে সিদ্ধ হচ্ছে।[৪]

একবার এক জানাযায় শরীক হলেন। কবর খনন করা হচ্ছিল। কাছে গিয়ে কবরের কিনারায় বসে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ অশ্রু ভরে এল। অশ্রু গড়িয়ে কবরের মাটি ভিজতে লাগল। অতি কষ্টে গলা পরিষ্কার করে বলতে লাগলেন, "ভাইসব! এ দিনের জন্য পূর্ব থেকেই সামান সংগ্রহ্ করে রাখ।"[৫]

---

১. মুসনাদে আহ্মদ ইবনে হাম্বল।
২. বোখারী শরীফ ঃ তফসীর অধ্যায়।
৩. আবু দাউদ ঃ সূর্য গ্রহণের নামায প্রসঙ্গ।
৪. তিরমিযী ঃ আবু দাউদ ঃ রাত্রিকালীন নামাযে ক্রন্দন।
৫. ইবনে মাজাহ্।

একবার কোন এক যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় পথের পাশে একটি তাঁবু দেখতে পেলেন। কিছু লোক তাঁবুর কাছেই বসেছিল। জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কারা?" লোকগুলো জবাব দিলেন, "আমরা মুসলমান।"

তাঁবুর পাশে একজন স্ত্রীলোক চুলা জালাচ্ছিল। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর চুলার আগুন যখন গনগন করে জলে উঠল, স্ত্রীলোকটি কাছেই ক্রীড়ারত তার একটি শিশুকে কোলে নিয়ে হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে এসে প্রশ্ন করলেন, আপনি-ই কি আল্লাহর রসূল? জবাব দিলেন, নিশ্চয়ই! স্ত্রীলোকটি তখন প্রশ্ন করলেন, মা যেমন তার শিশুকে মমতা করেন, আল্লাহ্ পাক কি তার চাইতেও বেশি মমতা করেন না?

জবাব দিলেন, হাঁ, নিশ্চয়ই। এবার স্ত্রীলোকটি বলতে লাগলেন,— দেখুন! আমি মা হয়ে তো কোন অবস্থাতেই আমার এ শিশুটিকে নিজ হাতে জলন্ত আগুনে ফেলতে পারব না, তবে আল্লাহ্ কেমন করে তাঁর বান্দাদের দোযখের আগুনে ফেলবেন?

স্ত্রীলোকটির প্রশ্ন শোনার সঙ্গে সঙ্গে হুযুর (সাঃ)-এর দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। কান্নার বেগ কিছুটা প্রশমিত হলে মাথা তুলে বলতে লাগলেন,— আল্লাহ্পাক শুধুমাত্র সে সমস্ত বান্দাকেই শাস্তি দেবেন যারা অবাধ্য-অহঙ্কারী ও আল্লাহকে এক বলে মানে না।[১]

একবার হুযুর (সাঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দোয়া পাঠ করলেন ঃ

"আয় আল্লাহ! এরা বহু মানুষকে গোমরাহ্ করে দিয়েছে। তবে এর মধ্যে যে সব লোক আমার অনুসরণ করবে, তারাই হবে আমার জামাত।"

তারপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর দোয়া পাঠ করলেন ঃ

"যদি তাদের শাস্তি দাও, তবে এরা তো তোমারই বান্দা, আর যদি ক্ষমা করে দাও, (তোমার তো সে ক্ষমতা আছে) কেননা, তুমি মহাপরাক্রান্ত,—মহাপ্রাজ্ঞ।"

উপরোক্ত দোয়া দুটি পাঠ করেই উপরে হাত তুলে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলতে লাগলেন "আল্লাহুম্মা উম্মাতী। আল্লাহুম্মা উম্মাতী!" বর্ণনাকারী বলেন, এমন আবেগের সঙ্গে এ দোয়া বলতে থাকলেন যে অশ্রুতে দু'গণ্ড ভেসে যেতে লাগল।[২]

আল্লাহর প্রতি মহব্বত ঃ মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রেরিত নবী-রসূলদের মধ্যে সাধারণত দুটি শ্রেণী দেখা যায়। এক শ্রেণীর নবী-রসূলেরা ছিলেন যাঁদের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জালালীরূপই মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এ জন্য তাঁদের তালীমের মধ্যে আল্লাহর ভয় এবং নিয়মের কঠোরতাই মুখ্যভাবে প্রকাশিত হয়েছে। হযরত নূহ (আঃ) এবং হযরত মূসার (আঃ) তালীমে এ ধরনের জালালী শিক্ষার আভাস পাওয়া যায়।

---

১. ইবনে মাজাহ ঃ আল্লাহর রহমতের আশা।
২. মুসলিম শরীফ ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রোনাজারী প্রসঙ্গ।

অন্য একশ্রেণী ছিলেন, যাঁরা আল্লাহর মহব্বতে নিমগ্ন ছিলেন। ফলে, তাঁদের তালীমে কঠোরতার পরিবর্তে প্রেমের দিকটাই প্রধানত মুখ্য হয়ে উঠেছিল। হযরত ইয়াহ্ইয়া এবং হযরত ঈসার জীবনই হল এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিচার করলে দেখা যাবে, শুধু কঠোরতা যেমন মানব আত্মাকে মাধুর্যমণ্ডিত করতে পারে না, তেমনি শুধুমাত্র প্রেমের শিক্ষায় মানবজাতির মধ্যে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সুতরাং যাঁরা রাব্বুল আলামীনের জালালী প্রকৃতির মধ্যে আত্মলীন হয়েছেন তাঁদের মত যাঁরা শুধুমাত্র জামাল বা প্রেমে ডুবে গিয়েছেন, তাঁরাও অনিবার্যভাবেই পরিপূর্ণতার সুষমা থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছেন। মানবজাতির ক্রমবিকাশের যে স্তরে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছিল, হয়তবা সে স্তরে রাব্বুল আলামীনের সে বিশেষ রূপ প্রকাশ করাই প্রয়োজন ছিল। এজন্যই মানবীয় অগ্রগতির পরিপূর্ণতা লাভের সূচনালগ্নে মানবজাতিকে উপলব্ধি করানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহর যে সমস্ত নবী শুধু জালালের শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তাঁদের অনুসারীরা, নিষ্ঠার শেষ মনযিলে পৌঁছেও প্রেমের সুষমা থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছেন। অপরপক্ষে যাঁরা শুধুমাত্র আল্লাহর প্রেমময় রূপের মাঝেই ডুবে যান, তাঁদের অনুসারীরা যথার্থ বন্দেগীর আদব-কায়দা থেকেও দূরে সরে যান। বর্তমান বাইবেলের শিক্ষাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

হুযুর (সাঃ)-এর শিক্ষায় জালাল এবং জামাল তথা প্রেম ও কঠোরতা একই সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কোরআন শরীফে পরিপূর্ণ ঈমানের স্বরূপ প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে ঃ

"যারা ঈমান এনেছে, তারা সর্বাপেক্ষা গভীর মহব্বত পোষণ করে আল্লাহর সঙ্গে।" (আল-বাকারা)।

বিভিন্ন বিশ্বস্ত বর্ণনায় দেখা যায় যে হুযুর (সাঃ) রাতের বেলায় এত দীর্ঘ সময় নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন যে অনেক সময় তাঁর পা ফুলে যেত। সাহাবীরা আরয করতেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ (সাঃ)! আল্লাপাক তো আপনার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন, তবে আর রাত্রি জেগে এত কষ্ট করেন কেন?" জবাব দিলেন, "আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?"

কোন কোন লোকের হয়ত ধারণা ছিল যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর ভয়ে রাতের পর রাত জেগে এবাদতে মশগুল থাকেন। সুতরাং আল্লাহ্পাক যখন তাঁকে গোনাহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দিয়েছেন, তখন আর রাত্রি জাগরণের কোন প্রয়োজনই অবশিষ্ট ছিল না। উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে হুযুর (সাঃ) সে ভুল ধারণাটুকুই অপনোদন করে দিয়েছিলেন যে তা শুধু আল্লাহর প্রতি ভয়ের জন্যই ছিল না, ছিল মহব্বতেরই ফলশ্রুতি মাত্র। আর এ মনোভঙ্গিরই প্রকাশ ঘটত যবান মৌবারক থেকে নির্গত একটি কথা ঃ

"আর নামাযের মধ্যেই আমার দু'চোখের শীতলতা দেয়া হয়েছে।" রাতের নিস্তব্ধতায় উঠে অশ্রুপাত এবং দোয়া শুরু করতেন। মাঝে মাঝে কবরস্তানেও চলে যেতেন এবং বলতেন, মধ্য রাতের নিস্তব্ধতায় আল্লাহ্র রহমতের তাজাল্লী নিকটতম আসমানে নেমে আসে।[১] শেষ রাতের প্রাত্যহিক এবাদতের সমাপ্তি হত ভোরে। দু'রাকাত নামাযের মাধ্যমে। বলতেন, "এ দু রাকাত নামাযের মোকাবিলায় সমগ্র দুনিয়ার সম্পদরাশিও আমার কাছে তুচ্ছ।"[২] একবার এক যুদ্ধে এক মহিলা বন্দী হয়ে আসে। যুদ্ধ চলাকালেই তার একটি সন্তান হারিয়ে যায়। হারানো সন্তানের শোকে সে স্ত্রীলোকটি এমন উন্মাদপ্রায় হয়ে পড়ে যে সামনে কোন শিশু দেখতে পেলেই সে তাকে বুকে জড়িয়ে দুধ খাওয়াতে শুরু করত। হুযুর (সাঃ) স্নেহপ্রবণ এ মাতাকে দেখিয়ে সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, "এ মাতা কি নিজহাতে তার সন্তানকে জলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে?" সাহাবিগণ জবাব দিলেন, "তা কখনো সম্ভব নয়!" তারপর বললেন, "দেখ, এ মাতা তার সন্তানকে যতটুকু ভালবাসে, আল্লাহ্পাক তাঁর বান্দাদের এর চাইতেও বহুগুণ বেশি মহব্বত করেন।"[৩]

প্রায় একই ধরনের আর একটি ঘটনার কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে মাতা যেমন নিজ হাতে সন্তানকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে পারেন না, তেমনি আল্লাহ্ও তাঁর অনুগত বান্দাদের দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করবেন না। তিনি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন, "শুধু তারাই দোযখের শাস্তি ভোগ করবে, যারা আল্লাহ্কে এক বলে মানে না, অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তাঁর প্রতি অবাধ্যতা প্রকাশ করে।"[৪]

হুযুর (সাঃ) একবার সাহাবিগণসহ দরবারে বসে আছেন। এমন সময় এক ব্যক্তি একটি পাখি ও তার কয়েকটি ছানা কাপড়ে জড়িয়ে খেদমতে হাজির করলেন, এবং বলতে লাগলেন, "হুযুর! আশ্চর্যের ব্যাপার, আমি যখন বাসা থেকে ছানা কয়টি ধরে কাপড়ে জড়িয়ে ফেললাম, তখন পাখিটি চক্রাকারে আমার মাথায় উপর ঘুরতে লাগল। আমি যেই কাপড় একটু ফাঁক করলাম, অমনি পাখিটি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ছানাগুলো উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি সে সুযোগে কাপড় জড়িয়ে সেটিকেও ধরে ফেলেছি।" এরশাদ করলেন, "ছানাগুলোর প্রতি এ পক্ষীমাতার মমতা দেখে কি তোমরা বিস্মিত হচ্ছ? শুনে রাখ, যিনি আমাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর বান্দাদের কসম করে বলছি, এ বাচ্চাগুলোর সঙ্গে তাদের মায়ের যে স্নেহ-মমতা, আল্লাহ্পাক তাঁর বান্দাদের এর চাইতেও বহুগুণ বেশি মহব্বত করে থাকেন।[৫]

১. বোখারী শরীফ।
২. মুসলিম শরীফ ঃ নামায অধ্যায়।
৩. বোখারী শরীফ ঃ সন্তানের প্রতি স্নেহ।
৪. ইবনে মাজাহ।
৫. মেশকাত ঃ আবু দাউদের হাওয়ালা।

হুযুর (সাঃ) আল্লাহর মহব্বতের মোকাবিলায় দুনিয়ার সকল মায়া-মহব্বতকে অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। ওফাতের পাঁচদিন পূর্বে সাহাবীদের প্রতি খুত্‌বা দিতে গিয়ে এরশাদ করেছিলেন, "আমি আল্লাহর সামনে সাফাই হিসাবে প্রকাশ করছি যে তোমাদের মধ্যে কোন মানুষকে আমি দোস্ত হিসাবে গ্রহণ করিনি। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ্‌পাক আমাকে দোস্ত হিসাবে গ্রহণ করেছেন, যেমন তিনি দোস্ত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন হযরত ইবরাহীমকে। যদি আমি আমার উম্মতের কাউকেও দোস্ত হিসাবে গ্রহণ করতে পারতাম, তবে তিনি হতেন আবু বকর।"

ঠিক ওফাতের সময় যবান মোবারক থেকে যে কথাটি বার বার উচ্চারিত হচ্ছিল, তা ছিল ঃ "আয় আল্লাহ! শ্রেষ্ঠ বন্ধু!"

এ শব্দগুলো শুনে হযরত আয়েশা (রাঃ) আরয করলেন, "তবে কি আপনি আমাদের ত্যাগ করছেন?"[১]

একমাত্র আল্লাহকে শ্রেষ্ঠ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করার তাৎপর্য সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহঃ) লিখেছেন, দাওয়াতের কাজ সমাপ্ত করার পর আল্লাহর নবিগণ আলমে বা চিরস্থায়ী জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যান। সৃষ্টজীবের প্রতি লক্ষ্য করার প্রয়োজনীয়তা তখন শেষ হয়ে যায়। তখন তাঁদের অন্তর থেকে পূর্ণ আবেগের সঙ্গে 'রফীকে আলা' বা শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সান্নিধ্য কামনার ডাক বেরিয়ে আসে এবং তাঁদের সমস্ত আকর্ষণ সঙ্কুচিত হয়ে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের প্রতি ধাবিত হতে থাকেন। এ অবস্থাতেই তাঁরা মাওলার পরম সান্নিধ্যে গিয়ে উপনীত হন।[২]

আল্লাহর উপর ভরসা ঃ তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর ভরসা কথার মর্মার্থ হল মানুষের সকল চেষ্টা-সাধনাএবং পারিপার্শ্বিকতার শেষ ফলশ্রুতি একান্তভাবে আল্লাহর উপর ন্যস্ত করা। সর্বপ্রকার উপায়-উপকরণ, কার্যকারণ ও কর্ম পরম্পরার উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে সব কিছুর শেষ পরিণতির মধ্যে একমাত্র আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের কুদরতের হস্তকে সক্রিয় বলে উপলব্ধি করা। অপরপক্ষে, যে কোন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে এ মর্মে অন্তরে অবিচল আস্থা পোষণ করা যে পরিস্থিতি বা পরিবেশের প্রতিকূলতা কোন কাজের জন্যে বাধা হতে পারে না। কেননা, সাফল্য অসাফল্য একান্তভাবেই এমন এক শক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল, মাননবীয় চেষ্টা-সাধনার যেখানে বিন্দুমাত্রও হাত নেই। প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের সমস্ত প্রেরণা, অবিচল আস্থা, কর্তব্যে দৃঢ়তা এবং প্রত্যয়ের মূল উৎসই হচ্ছে অদৃশ্য শক্তির উপর সেই অবিচল বিশ্বাস। যে কোন বিপজ্জনক ভীতি বা কাপুরুষতা তার অন্তরকে মুহূর্তের জন্যও স্পর্শ করতে সে সক্ষম হয়। যে কোন বিপজ্জনক ভীতি বা কাপুরুষতা তার অন্তরকে মুহূর্তের জন্যও স্পর্শ করতে সমর্থ হয় না। যে কোন প্রতিকূলতার মাঝেও তার অন্তরে নৈরাশ্যের কালো মেঘ ছায়া বিস্তার করতে পারে না।

---

১. বোখারী শরীফ ঃ ওফাত অধ্যায়।
২. ইমামে রাব্বানী মোজাদ্দিদে আলফেসানীর মাকতুবাত, প্রথম খন্ড মকতুব নম্বর ২৭২।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র জীবন বৃত্তান্তের একেকটি হরফ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, আকাশের নিচে ভয়-ভীতি, বিপদ-আপদ এবং প্রতিকূলতার এমন কোন নযীর নেই, যা তাঁর জীবন-পথের পদে পদে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। কিন্তু সে সমস্ত বাধা-বিপত্তি এবং প্রতিকূলতার মধ্যে মুহূর্তের জন্যও তাঁর যাত্রাপথ বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে, ভয়-ভীতি, নৈরাশ্য বা উদ্বেগে ক্লিষ্ট হয়েছে, এমন কোন নযীরও কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। মক্কী-জীবনের অসহায় দিনগুলো থেকে শুরু করে অগণিত হিংস্র শত্রুর সদা উদ্যত কৃপাণের মুখে বা ওহুদ-হুনায়নের মৃত্যু-বিভীষিকার সামনেও তাওয়াক্কুল এবং আল্লাহর উপর ভরসার সে একই দৃশ্য ফুটে উঠেছে। পিতৃব্য হযরত আবু তালেব বুঝিয়েছেন, "বৎস! এ সর্বনাশা কাজ থেকে বিরত হও।" স্নেহময় পিতৃব্যের সে উদ্বেগাকুল অনুরোধের জবাবে বলছেন, "মাননীয় চাচাজান! আমার আজকের এ অসহায় একাকিত্বের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হবেন না। সত্য খুব বেশি দিন নিসঙ্গ থাকবে না। একদিন আরব-আযম এসে এ সত্যের সঙ্গী হবে।" এমনিভাবে আরেক হিতাকাঙ্ক্ষীর উদ্বেগের জবাবে বলেছিলেন "আল্লাহ্‌পাক কখনই আমাকে এমন নিঃসঙ্গ রাখবেন না।"[১] মক্কার সে কঠিন বিপদের দিনে জনৈক নির্যাতিত সাহাবীকে এই বলে সান্ত্বনা দেন "আল্লাহর কসম! খুব শীঘ্রই এমন এক সময় আসবে, যখন এ দ্বীন পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে এবং একমাত্র আল্লাহর ভয় ছাড়া আর কোথাও কোন ভয়-ভীতির অস্তিত্ব থাকবে না।[২]

একদিন কাফেররা কাবা প্রাঙ্গণে বসে পরামর্শ করল, আজ হুযুর (সাঃ) হরম শরীফে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ধরে টুকরো টুকরো করে ফেলা হবে। হযরত ফাতেমা (রাঃ) দুর্বৃত্তদের পরামর্শ শুনে কাঁদতে কাঁদতে খেদমতে হাযির হলেন এবং এ দুঃসংবাদ দান করলেন! হুযুর (সাঃ) প্রাণপ্রিয় কন্যাকে সান্ত্বনা দিলেন, পানি আনিয়ে অযু করলেন এবং সোজা হরম শরীফে চলে গেলেন। কাবা প্রাঙ্গণে পৌঁছাবার পর কাফেরদের সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গে সবার দৃষ্টি নত হয়ে গেল।[৩]

হিজরতের রাত্রিতে মক্কার হিংস্র শত্রুরা সম্মিলিতভাবে এসে তাঁর বাসগৃহ অবরোধ করে ফেলল। রক্ত-পিপাসু শত্রুবাহিনীর সমস্ত বদ-মতলব অবগত হওয়া সত্ত্বেও হুযুর (সাঃ) তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় সহচর আলীকে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে অকুতোভয়ে বের হয়ে গেলেন। জানতেন যে নিজের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হযরত আলীকে যে বিছানায় শোয়াচ্ছেন, মুহূর্তের ব্যবধানেই হয়ত তা তাঁর মৃত্যু শয্যায়

১. দুটি ঘটনাই ইবনে হিশামে বর্ণিত হয়েছে।
২. বোখারী শরীফ ঃ ১ম খণ্ড।
৩. মুসনাদে আহমদ, ১ম খণ্ড।

পরিণত হতে পারে, কিন্তু যে মহাশক্তির সামান্যতম ইশারায় এ মৃত্যুশয্যা নিরাপদ আশ্রয়ে রূপান্তরিত হতে পারে, তাঁরই উপর পূর্ণ ভরসা রেখে হযরত আলীকে বলে গেলেন, কোন শক্তিই তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[১] যে ক্ষিপ্ত শত্রুবাহিনী বাসস্থানের চারদিকে ঘেরাও করে রেখেছে, তাদের অনুচরেরা শহরের প্রতিটি গলিপথে সজাগ দৃষ্টি রাখেনি, এমন কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু হুযুর (সাঃ) নিরুদ্বিগ্নচিত্তে সূরায়ে ইয়াসীন তেলাওয়াত করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। বাইরে পা রাখার সময় তেলাওয়াত করতে করতে এ আয়াতে এসে পৌছেছিলেন ঃ

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

"এবং আমি তাদের সামনে ও পেছনে আড়াল সৃষ্টি করে দিলাম, আর তাদের দৃষ্টি এমনভাবে আচ্ছন্ন করে দিলাম, যে তারা আর দেখতে পেল না।"

কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, আল্লাহর এ কালাম সম্পূর্ণরূপে সত্যে পরিণত হয়েছে।

মক্কা থেকে বের হয়ে হযরত আবু বকরসহ সাওর গিরি-গুহায় আশ্রয় নিলেন। রক্তলোলুপ শত্রুরা তখন ব্যর্থতাজনিত প্রতিহিংসায় তাড়িত হয়ে ক্ষিপ্ত হায়েনার মত চারদিক তোলপাড় করে বেড়াতে লাগল। চারদিকে মন্থন করতে করতে শেষ পর্যন্ত সাওর গুহার কাছে এসে পৌছে গেল। এমন সংকটজনক পরিস্থিতিতে চিত্তের দৃঢ়তা অক্ষুণ্ন রাখার মত মনোবল সঞ্চয় করে রাখা কতটা কঠিন ব্যাপার তা শুধুমাত্র অনুমান করা যায়, বাস্তবে তার নযীর খুঁজে পাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। হযরত আবু বকর (রাঃ) উদ্বিগ্ন কণ্ঠে আরজ করতে লাগলেন, -ইয়া রসূলাল্লাহ। (সাঃ) শত্রুরা নিচের দিকে নজর করলেই আমরা তাদের চোখে পড়ে যাব! হুযুর (সাঃ) তখন অত্যন্ত শান্ত-স্নিগ্ধকণ্ঠে জবাব দিলেন, "আবু বকর! এমন দু ব্যক্তির ভয় কি, যাদের তৃতীয় সঙ্গী আল্লাহ।"[২] কোরআন শরীফেও এ বিষয়টির প্রতি ইশারা করে বলা হয়েছে ঃ

"চিন্তিত হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।"

নবুয়তের নূরে উদ্ভাসিত অন্তর ছাড়া এমন প্রশান্ত নির্ভরশীলতাপূর্ণ বরাভয় আর কার যবান হতে নির্গত হতে পারে?

নিরাশ হয়ে কোরাইশরা ঘোষণা করল, যে ব্যক্তি হুযুর (সাঃ)-কে জীবিতাবস্থায় ধরে আনতে পারবে অথবা তাঁর মাথা কেটে এনে হাজির করতে পারবে, তাকে একশ উট পুরস্কার দেয়া হবে। পুরস্কারের লোভে দুর্ধর্ষ সূরাকা

১. ইবনে হিশাম ঃ তাবারী।
২. বোখারী ও মুসলিম শরীফ ঃ হিজরত অধ্যায়।

ইবনে জা'শাম তীরবেগে পিছন দিক থেকে ধাওয়া করতে করতে অতি নিকটে এসে উপনীত। হযরত আবুবকর (রাঃ) এ ভয়ঙ্কর দুশমনকে বার বার ফিরে ফিরে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু ঠিক মাথার উপর এসে আপতিত হওয়ার জন্য উদ্যত শত্রুর প্রতি ভ্রুক্ষেপমাত্র না করে আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করতে করতে স্থিরচিত্তে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন।[১]

সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে মদীনায় হিজরত করার পর হুযুর (সাঃ) সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে গিয়েছিলেন। আসল ব্যাপার কিন্তু তা ছিল না। মদীনায় অবশ্য ইসলামের সাহায্যকারী মোটামুটি সংঘবদ্ধ একটি দল পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এমন একদল ভয়ঙ্কর শত্রুর সম্মুখীন হতে হয়েছিল যারা মক্কার শত্রুদের চাইতেও বহুগুণে ভয়ঙ্কর ছিল। মক্কার যে কোরাইশরা শত্রুতা করত তাদের সঙ্গে হুযুর (সাঃ)-এর রক্তের সম্পর্ক ছিল। শত্রুতার সমস্ত কুটিল চক্র ভেদ করে কোন কোন সময় রক্ত সম্পর্কের এক আধটুকু মাধুর্যও উঁকি মারত। নানা বন্ধনের কারণে কোন কোন লোকের ভেতরে কিছুটা চক্ষু-লজ্জার আবরণও দেখা দিত। কিন্তু মদীনার মুনাফেক এবং ইহুদী শত্রুদের মধ্যে সমবেদনা বা চক্ষুলজ্জার কোন আবরণ ছিল না। তাছাড়া হুযুর (সাঃ)-কে হত্যা করে অথবা মদীনা থেকে বের করে দিয়ে ইসলামের এ আলোটুকু দুনিয়ার বুক থেকে চিরতরে মুছে ফেলার জন্য মদীনার ইহুদী, মুনাফেক ও মক্কার কুরাইশ কাফেররা ব্যাপক ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করে রেখেছিল।[২] তাই আত্মনিবেদিত সাহাবিরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পর্যায়ক্রমে রাতের বেলা হুযুর (সাঃ)-এর বাসস্থান পাহারার ব্যবস্থা করেছিলেন। এক রাত্রিতে কয়েকজন সাহাবী মিলে তাঁবু পাহারা দিচ্ছিলেন, ঠিক এমনি সময়ে কুরআনের আয়াত নাযিল, হল ঃ

"মানুষের শত্রুতা থেকে আল্লাহ্ পাক আপনাকে হেফাযত করবেন।"

— সূরায়ে মায়েদা।

আয়াত নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুযুর (সাঃ) তার ভেতর থেকে বের হয়ে এলেন এবং এরশাদ করলেন ঃ

আজকের পর আর আমার পাহারার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন নেই।

নজদ অভিযান থেকে ফেরার পথে রাস্তায় একস্থানে তাঁবু ফেলা হল। দুপুরের গরমে সাহাবীরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্ন গাছের ছায়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। খোদ হুযুর (সাঃ)-ও একটি গাছের ছায়ায় এসে আরাম করছিলেন। তরবারিখানা অদূরেই একটি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। ঠিক এ অবস্থায় সম্ভবত এমনি কোন সুযোগের প্রতীক্ষারত এক হিংস্র প্রকৃতির বেদুঈন

১. বোখারী শরীফ ঃ হিজরত অধ্যায়।
২. সীরাতুন নবী ১ম খণ্ড, যুদ্ধের বর্ণনা।

সন্তর্পণে তরবারিটি হাতের তুলে নিল এবং কোষমুক্ত করে সামনে এসে দাঁড়াল। হুযুর (সাঃ)-এর চোখ খুলে গেল। দেখতে পেলেন সাক্ষাৎ মৃত্যু-দূতের মত কোষমুক্ত তরবারি হাতে আক্রমণোদ্যত শত্রু দাঁড়িয়ে আছে। এহেন অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করে বেদুঈন জিজ্ঞেস করল ঃ মোহাম্মদ! এখন আমার কবল থেকে আপনাকে কে রক্ষা করবে? এমন একটি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও নেহায়েত শান্তকণ্ঠে জবাব এল—"আমার আল্লাহ্।"[১]

হুযুর (সাঃ)-কে হত্যা করার অপচেষ্টায় লিপ্ত এক ব্যক্তি ধরা পড়ে খেদমতে পেশ হল। সবকিছু শুনে নির্দেশ দিলেন,—একে ছেড়ে দাও। সে হাজার চেষ্টা করেও আমাকে হত্যা করতে পারত না।[২] একথা দ্বারা অকপটে সে সত্যের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে যে আমাকে রক্ষার দায়িত্ব যিনি গ্রহণ করেছেন, তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টিতে ফাঁকি দেয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। খায়বরের যে ইহুদী রমণীটি হুযুর (সাঃ)-কে খাদ্যের সঙ্গে বিষ দিয়েছিল, তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি একাজ কেন করতে গেলে?" সে জবাব দিয়েছিল, "আপনাকে হত্যা করার জন্য।" জবাব শুনে হুযুর (সাঃ) বললেন, "আল্লাহ্ তা'আ'লা কখনও তোমাকে এ জন্য নিয়োগ করতেন না।[৩] ওহুদ এবং হুনাইনের ময়দানে যখন সাময়িকভাবে সাহাবায়ে কেরামের কাতার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভীষিকাময় এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তখনও হুযুর (সাঃ)-এর অবিচল দৃঢ়তা আল্লাহ্র উপর ভরসা এবং অন্তরের প্রশান্তি মুহূর্তের জন্যও বিঘ্নিত হতে দেখা যায়নি। আল্লাহ্র উপর কতটুকু তাওয়াক্কুল রেখে হুযুর (সাঃ) যাবতীয় পরিস্থিতির মোকাবিলা করতেন, এসব ঘটনা তারই প্রকৃষ্টতম নজীর বৈ আর কিছু নয়।

যে কোন বিপদের বিভীষিকায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করে যেমন প্রশান্ত অন্তরে তার মোকাবিলা করতেন, তেমনি কঠিন দারিদ্র্যের কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ জীবনেও একমাত্র আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করে জীবন যাপনের নজিরও কম চমকপ্রদ নয়। জীবনের বিভিন্ন স্তর হুযুর (সাঃ) যুগপৎ কঠিন দারিদ্র্য এবং প্রাচুর্যের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন। কোন কোন দিন হয়ত অর্থ-সম্পদে মসজিদের প্রাঙ্গণ ভরে উঠত, আবার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত উপর্যুপরি কয়েকদিন এমন কঠিন দারিদ্র্যের মাঝে অতিবাহিত হত যে ক্ষুধার জালা দমন করার জন্য পেটে পাথর বাঁধার প্রয়োজন দেখা দিত। অথচ প্রাচুর্যের সময় কিছু কিছু সম্পদ সঞ্চয় করে রাখলেই হয়ত এহেন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার প্রশ্নই উঠত না। কিন্তু হুযুর (সাঃ) সারাটি জীবন এর বিপরীতই করে গিয়েছেন। একদিনের আমদানী কোন অবস্থাতেই পরবর্তী দিনের জন্য সঞ্চয় করে রাখতেন না। দিনের জরুরী খরচ

১. বোখারী শরীফ ঃ জেহাদ অধ্যায়।
২. মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল ৩য় খণ্ড।
৩. মুসলিম মুসলিন শরীফ ঃ বিষ প্রয়োগ প্রসঙ্গ।

শেষে যা কিছু বেঁচে যেত, সন্ধ্যা পর্যন্ত সে সমস্তই অভাবগ্রস্তদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হত। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাসের নিম্নোক্ত বর্ণনাটি উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

"রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন অবস্থাতেই পর দিনের জন্য কোন কিছু সঞ্চয় করে রাখতেন না।"

ঘটনাচক্রে বা ভুলক্রমে কোন বস্তু সামগ্রী ঘরে থেকে গেলে হুযুর (সাঃ) আন্তরিকভাবে কষ্ট পেতেন।[১] একমাত্র আল্লাহর রহমত ছাড়া ঘরে পার্থিব কোন সম্পদ সঞ্চিত করে রাখা হয়নি,—এ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে তিনি অন্দরে প্রবেশ করতেন না।[২] এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা বর্ণিত রয়েছে।

মৃত্যুশয্যায় মানুষ যখন সবকিছু ভুলে যায়, ঠিক সে সময়টিতেও তাঁর মনে হল, হযরত আয়েশার নিকট কয়েকটি মুদ্রা রক্ষিত ছিল। হয়ত সেগুলো তখনও রয়ে গেছে। এ সামান্য একটু ভুলকেও তাওয়াক্কুল-এর খেলাফ মনে করে সে নাযুক অবস্থাতেই নির্দেশ দিলেন—আয়েশা! মোহাম্মদ কি আল্লাহর সঙ্গে একটি ভুল ধারণা নিয়ে মিলিত হবে? যাও, এখনই মুদ্রা কয়টি খয়রাত করে এসো।[৩]

সবর ও শুকুর ঃ সুখ-দুঃখ, কামিয়াবী এবং ব্যর্থতা মানবজীবনের একটি সার্বজনীন সত্য। তবে সাফল্যের আনন্দে আত্মহারা না হওয়া বা সাময়িক হতাশা ও ব্যর্থতায় ভেঙে না পড়ে অবিচল অথবা নিষ্ঠার সঙ্গে লক্ষ্যপথে এগিয়ে যাওয়াই আত্মিক বলিষ্ঠতার পরিচায়ক। জীবনপথের সব রকম তিক্ততার মধ্যেও স্থির বিশ্বাস রাখতে হবে, মানুষের দায়িত্ব হল শুধুমাত্র কর্তব্যে অবিচল থাকা. সাফল্য বা ব্যর্থতা একমাত্র তাঁরই হাতে, সবার অলক্ষ্যে থেকে যিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। এ সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করেই কোরআন ঘোষণা করেছে ঃ

"এ দুনিয়ার বুকে ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের নিজেদেরও উপরে যে সমস্ত আপদ-বিপদ অবতীর্ণ হয়, তার মধ্যে কোন একটিও এমন নেই, যা পূর্ব থেকেই লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়নি। নিশ্চয়ই এমন করা আল্লাহর পক্ষে কোন কঠিন কাজ নয়। যেন যা তোমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যায়, তার জন্য আক্ষেপ করে তোমরা কাতর না হও, অথবা কোন কিছু প্রাপ্তির আনন্দে তোমরা আত্মহারাও হয়ে না পড়। মনে রেখো, আল্লাহ্ কোন অহঙ্কারী দাম্ভিককে পছন্দ করেন না।" —(সূরা হাদীদ)

১. বোখারী শরীফ ঃ মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল।
২. আবু দাউদ, হাদিয়া গ্রহণ অধ্যায়।
৩. মুসনাদে আহমদ ও তাবাকাতে ইবনে সা'আদ, ওফাত অধ্যায়।

হুযুর (সাঃ)-এর যিন্দেগীতে অনেক অবিশ্বাস্য ও অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ হয়েছে। কিন্তু কোন সাফল্যের মুহূর্তেই পবিত্র হৃদয়-মুকুরে অহঙ্কার বা আত্ম-প্রসাদের সামান্যতম ছায়াপাত করতেও দেখা যায়নি। এরশাদ হয়েছে, "আমি আদম সন্তানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তবে এতে আমার কোন অহঙ্কার নেই।"

আদী ইবনে হাতেম ছিলেন একজন প্রতাপশালী খৃষ্টান গোত্রপতি। তাঁর ধারণা ছিল, হুযুর (সাঃ) রসূল হওয়ার দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও একজন দোর্দণ্ড প্রতাপ নরপতি, সর্বোপরি, শক্তির অহঙ্কারই হয়ত তাঁর জীবনে সর্বাপেক্ষা বড় সত্য। এ ধরনের মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই তিনি নিজ গোত্রের তরফ থেকে মদীনার নব-উত্থিত কেন্দ্রীয় শক্তির সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন করার উদ্দেশ্যে মদীনায় এসে উপনীত হন। দেখতে পেলেন, অসংখ্য ভক্ত পরিবেষ্টিত আল্লাহর রসূল (সাঃ) দরবারে বসে আছেন। এমন সময় একজন অতি দীনবসনা স্ত্রীলোক এসে আরয করল, হুযুর (সাঃ) যেন দরবার থেকে উঠে এসে তার দুটি কথা শোনেন। আবেদন শোনার সঙ্গে সঙ্গে হুযুর (সাঃ) দরবার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং যে পর্যন্ত না স্ত্রীলোকটি অনতিদূরে পথের ধারে দাঁড়িয়ে তার কথাবার্তা শেষ করে চলে না গেল, সে পর্যন্তই পরম ধৈর্যের সঙ্গে তার প্রত্যেকটি কথা শুনতে থাকলেন। আদী ইবনে হাতেম বলেন, এমন নিরহঙ্কার বিনয় দেখে আমার অন্তরে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে মোহাম্মদ (সাঃ) বাদশাহ নন, অবশ্যই আল্লাহর রসূল।[১]

কোন যোদ্ধা-সেনাপতি যখন বিজিত কোন শহর বা জনপদে প্রবেশ করে, তখন সাফল্যের গর্বে তার মস্তক উন্নত থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু খায়বার এবং মক্কার সে মহান বিজয়ী যখন সদ্য পদানত সে জনপদে প্রবেশ করেন, তখন মহান মাওলার উদ্দেশ্যে একান্ত অবনত মস্তকে এগিয়ে যেতে দেখা যায়। ইবনে ইস্হাক বর্ণনা করেন, "মক্কা অভিযানে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যি-তোয়া নামক স্থানে পৌঁছে সংবাদ পেলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মহাবিজয়ের মর্যাদা দান করেছেন। সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার জন্য সওয়ারী থামিয়ে দিলেন। কৃতজ্ঞতায় তাঁর মস্তক এমনভাবে অবনত হয়ে গেল, যে থুতনী উটের হাওদার সঙ্গে মিশে যাওয়ার উপক্রম হল।[২]

হুযুর (সাঃ) অধিকাংশ সময়ই এবাদত, যিকির ও তসবীহতে মগ্ন থাকতেন! দিন-রাতের বিশ্রামের প্রতিও লক্ষ্য করতেন না। এ অবস্থা দেখে কোন কোন সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাঃ), আল্লাহ্ তা'আলা তো আপনাকে মাসুম (বে-গোনাহ) করেছেন, তারপরও আপনি এত কষ্ট করেন কেন?

১. সীরাতে ইবনে হিশাম।
২. সীরাতে ইবনে গিশাম মক্কা বিজয় প্রসঙ্গ।

জবাব দিলেন, "আমি কি আল্লাহ্‌র একজন শুকর-গোযার বান্দা হব না?"[১] অর্থাৎ, যে মর্যাদা লাভ করার জন্য এতদিনের এ কঠোর সাধনা, উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার পর এখন তো তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রয়োজন।

দুনিয়ার যে কোন বিরাট ব্যক্তিত্ব, অন্তত আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যাদের কোন সম্পর্ক ছিল না, তাঁদের প্রত্যেকেই জীবনের যেকোন সাফল্যকে নিজের প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব, সাহসিকতা ও নিষ্ঠার ফলশ্রুতি বলে মনে করেন এবং কথায় ও আচরণে তা প্রকাশও করে থাকেন। কিন্তু যে সমস্ত বান্দা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে ধন্য হয়েছেন, তাঁরা মানব-জীবনের যে কোন কামিয়াবীর পেছনেই একমাত্র সে করুণাময়, সর্বশক্তিমানের হাতকেই সক্রিয় দেখতে পান। ব্যক্তিগত সাফল্যের পেছনে নিজের পক্ষ থেকে যে কোন প্রকার কৃতিত্বের দাবি করা তাঁদের বিবেচনায় কুফুরীর সমতুল্য। হাদীস শরীফে উক্ত হয়েছে ঃ

"হুযুর (সাঃ)-এর কাছে কোন সাফল্যের সুসংবাদ আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে সেজদায় পড়ে যেতেন।[২]

আরবের প্রখ্যাত গোত্র হামদানের ইসলাম কবুল করার সংবাদ পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে হুযুর (সাঃ) শুকরিয়ার সেজদায় পড়ে গিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে অন্য আর একটি সুসংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সেজদায় পতিত হয়ে শুকরিয়া আদায় করেছিলেন বলে জানা যায়।[৩]

ওহীর মাধ্যমে যখন হুযুর (সাঃ)-কে জানানো হয়েছিল, যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি দরুদ প্রেরণ করবেন, খোদ আল্লাহ্ তা'আলাও সে ব্যক্তির প্রতি দরুদ প্রেরণ করবেন—তখন এ-অনন্য মর্যাদা-প্রাপ্তির আনন্দেও শুকরিয়ার সেজদা আদায় করেছিলেন।[৪]

সাহাবী হযরত সা'আদ বর্ণনা করেন, "আমরা হুযুর (সাঃ)-এর সঙ্গে মক্কা থেকে মদীনায় রওয়ানা হলাম। যুআরা নামক স্থানে কাছে পৌছে হুযুর (সাঃ) সওয়ারী থেকে নেমে দীর্ঘক্ষণ আল্লাহ্‌র দরবারে হাত তুলে মুনাজাত করলেন। তারপর সেজদায় চলে গেলেন এবং দীর্ঘ সময় সেজদায় পড়ে রইলেন। সেজদা থেকে উঠে পুনরায় দীর্ঘ সময় দোয়া ও পরে সেজদায় চলে গেলেন, দীর্ঘ সেজদা শেষে উঠে আবারও রোনাযারী করে সুদীর্ঘ দোয়ায় নিমগ্ন হয়ে পড়লেন এবং পুনরায় ভূমিতে ললাট স্থাপন করে সুদীর্ঘ সেজদা আদায় করলেন। এ পৌনঃপুনিক দোয়া ও সেজদা থেকে ফারেগ হয়ে সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে এরশাদ করলেন, "আমি আমার উম্মতের মাগফেরাতের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে

১. বুখারী শরীফ ঃ রাত্রিকালীন এবাদত প্রসঙ্গ।
২. আবু দাউদ ঃ জেহাদ অধ্যায়, শুকরিয়ার ছেজদা প্রসঙ্গ।
৩. যদুল মাআ'দ।
৪. মুসনাদে আহমদ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে আউফের বর্ণনা।

হাত তুলেছিলাম। এর মধ্যেই যখন খবর দেয়া হল যে আমার দোয়া আংশিক কবুল হয়েছে। তখন শুকরিয়ার সেজদা করলাম। তারপর আবার দোয়া করতে লাগলাম। এবারও যখন দোয়ার আর এক অংশ কবুল হওয়ার সুসংবাদ এল তখন পুনরায় শুকরিয়ার সেজদা করলাম এবং আবারও দোয়া করতে লাগলাম। দোয়ার এ অংশও কবুল হওয়ার সুসংবাদ পাওয়ার পর আবারও শুকরিয়া আদায় করার জন্য সেজ্‌দা করলাম।[১]

কোরআনের সূরা ওয়াদ-দোহায় রাব্বুল আলামীন হুযুর (সাঃ)-এর রূপটি বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন ঃ

"দিবসের প্রথমভাগ এবং অন্ধকার ঘনিয়ে আসা রাতের কসম, হে রসূল! আপনার পরওদেগার আপনাকে ত্যাগ করেননি, অসন্তুষ্টও হননি। পরবর্তী জীবন আপনার জন্য পূর্ববর্তী জীবনের চাইতে অনেক উত্তম হবে। সত্বরই আপনার পালনকর্তা আপনাকে এমন কিছু দেবেন যে আপনি তাতে সন্তুষ্ট হবেন। তিনি কি আপনাকে এতীম হিসাবে পাননি,—তারপর আশ্রয় দিলেন, আপনাকে সত্যপথের অনুসন্ধানকারী হিসাবে পেয়েছিলেন। অতঃপর আপনাকে হেদায়েতের পথ প্রদান করলেন। আপনাকে অভাবগ্রস্ত পেয়েছিলেন। অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। সুতরাং এতীমের প্রতি যেন কঠোরতা করবেন না, আর ভিক্ষুককে ধমকিয়ে তাড়াবেন না। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ করতে থাকুন।"

জীবনেতিহাসের একেকটি পাতা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, হুযুর (সাঃ) সারাটি যিন্দেগী কোরআন পাকের উপরোক্ত সূরার প্রতিটি নির্দেশ কি নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করে গেছেন।

সবর এবং শুকুর অনেকটা বিরপীতার্থক শব্দ। একটির সম্পর্ক প্রাপ্তির সঙ্গে, অপরটির না-পাওয়ার সঙ্গে। হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পাক যিন্দেগী একই সঙ্গে দু'টি গুণের পরিপূর্ণ সমাবেশ ঘটেছিল। আর বাস্তব জীবনে এ দু'টি গুণই পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করার সুযোগ হয়েছিল। হাদীস শরীফে আছে, এক সাহাবী জিজ্ঞেস করছিলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুনিয়ার বুকে সর্বাপেক্ষা বেশি বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছেন কারা? জবাব দিলেন, নবিগণ এবং যারা তাঁদের আদর্শের যত নিকটবর্তী পর্যায়ক্রমে তাঁরা।[২] বাস্তবেও এ রেওয়ায়েতের সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। হুযুর (সাঃ) ছিলেন নবী-রসূলগণের সরদার। ফলে নবী-রসূলগণের পবিত্র জামাতে বিপদাপদের মোকাবিলাও তাঁকেই করতে হয়েছে সর্বাপেক্ষা বেশি। এ জন্যই কোরআন পাক হুযুর (সাঃ)-কে বার বার সবর করার উপদেশ দিয়েছে। সূরায়ে আহক্বাফে বলা হয়েছে ঃ

—"আপনি ধৈর্য ধরুন, যেভাবে ধৈর্য ধরেছিলেন আপনার পূর্ববর্তী দৃঢ়চিত্ত নবী-রসূলগণের অনেকেই।"

---

১. আবু দাউদ ঃ সেজদা প্রসঙ্গ।
২. ইবনে মাজাহ ঃ বিপদে ধৈর্যধারণ প্রসঙ্গ।

দুনিয়াতে ভূমিষ্ট হওয়ার আগেই পিতার ইন্তেকাল হল, শৈশব কাটিয়ে ওঠার পূর্বেই মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হলেন, যে দাদার স্নেহ-নীড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে মাতৃ-পিতৃহীন এতীমাবস্থার শোকের আগুন কিছুটা প্রশমিত করার জন্য এগিয়ে গেলেন, মাত্র দু' বছরের মধ্যেই তাঁরও ছায়া মাথার উপর থেকে উঠে গেল। নবুয়ত প্রাপ্তির পর হিংস্র কোরাইশকুলের সরাসরি হামলার মুখে যে চাচা আবু তালেব ছিলেন প্রধান বাধা, পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করার মুহূর্তে তিনিও চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। শোকে-তাপে সাময়িক নৈরাশ্যের কালো আঁধারে যে পতিগতপ্রাণা সাধ্বী স্ত্রী ছিলেন একমাত্র ছায়া-নীড়, উত্তেজনার চরম সন্ধিক্ষণে মৃত্যুর কঠিন হাত তাঁর সাহচর্য থেকেও বঞ্চিত করে দিল। পিতা-মাতা এবং স্ত্রীর পরই মানুষের আশা-ভরসা কেন্দ্রীভূত হয় সন্তানের মধ্যে। এহেন সন্তানের বিয়োগ-ব্যথা মানুষ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও ভুলতে পারে না। হুযুর (সাঃ)-এর চারজন পুত্রসন্তান এবং চারজন কন্যার মধ্যে একমাত্র হযরত ফাতেমা ছাড়া অন্য সবাই শৈশবে বা যৌবনে তাঁরই সামনে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। একে একে এতগুলো সন্তানের মৃত্যু-শোক প্রত্যক্ষ করে হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র নয়ন অশ্রুসিক্ত হল সত্য, কিন্তু মুহূর্তের জন্য অন্তরে এমন কোন ভাবের উদয় হয়নি, অথবা যবানে এমন কোন কথা উচ্চারিতও হয়নি, যাতে বিশ্বনিয়ন্তার প্রতি সামান্যতম অভিযোগের গন্ধও আবিষ্কৃত হতে পারে।

জো কন্যা হযরত যয়নাব অষ্টম হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। হুযুর (সাঃ) দাফন-কাফনের সমস্ত নিয়মকানুন নিজ মুখে বাতলে দিলেন। জানাযা কবরের পার্শ্বে স্থাপন করার পর পবিত্র দু'নয়ন অশ্রুপ্লাবিত হয়ে উঠল, কিন্তু যবান মোবারক থেকে শোকের একটি কথাও উচ্চারিত হয়নি।

পালক-পুত্র হযরত যায়েদ এবং চাচাতো ভাই হযরত জাফর মহানবী (সাঃ)-এর বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন। মুতার যুদ্ধে এ দুই প্রিয়জনই শহীদ হলেন। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। হযরত জাফরের ঘর থেকে বিলাপের ধ্বনি শুনতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ তা বন্ধ করার জন্য খবর পাঠালেন।

হুযুর (সাঃ) এক দৌহিত্রীকে বিশেষ মহব্বত করতেন। তার অন্তিম সময় উপস্থিত হলে স্নেহভাজন কন্যা তাকে খবর পাঠালেন। হুযুর (সাঃ) তখন কন্যাকে বলে পাঠালেন ঃ

"আল্লাহ্ পাক তাঁর নিজের দেয়া জিনিসই নিয়ে নিয়েছেন। যা দিয়েছেন, এসবও তাঁরই। তাঁর প্রত্যেক কাজই নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং সবর কর এবং তাঁর কাছে উত্তম বদলা চেয়ে নাও।"

কন্যার তরফ থেকে পুনরায় খবর এল। এবার কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছালেন। শিশুটির তখন শেষ অবস্থা। মা তাকে হুযুর (সাঃ)-এর কোলে তুলে দিলেন। শিশুটির প্রাণ নির্গত হওয়ার মুহূর্তে হুযুর (সাঃ)-এর দু'চোখ ভিজে উঠল। জনৈক সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাঃ)! আপনিও কাঁদেন? জবাব দিলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বান্দার অন্তরে যে স্নেহ-মমতা দান করেছে এটা তারই প্রভাব। কোমল অন্তর-বিশিষ্ট বান্দারাই আল্লাহ্র রহমত পেয়ে থাকে।"

গুরুতর অসুস্থ হযরত সা'আদ ইবনে ওবাদাকে দেখতে গেলেন। অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, মারা গিয়েছে কি? সাহাবিগণ আরয করলেন, না, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ)। কিন্তু ততক্ষণে তাঁর কান্নার আওয়ায ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সাহাবিগণও কাঁদতে লাগলেন। হুযুর (সাঃ) কান্নাভেজা কণ্ঠেই এরশাদ করলেন, "আল্লাহ্ পাক চোখের পানি এবং অন্তরের শোক সম্পর্কে বারণ করেননি; যবানের দিকে ইশারা করে বললেন, এর কারণে আযাব হয়ে থাকে।"

পুত্র হযরত ইবরাহীমের মৃত্যুর সময় হুযুর (সাঃ) কাঁদতে থাকলে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাঃ)! এ-কি? জবাব দিলেন, এটা অন্তরের স্নেহ। পুনরায় জিজ্ঞেস করলে আরও স্পষ্ট করে বললেন ঃ

"চোখ অবশ্যই অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে, অন্তরও ব্যথায় ভরে গেছে। তবে আমার পরওয়ারদেগারের মর্জির বাইরে কোন কথাই আমি বলতে পারি না। হে ইবরাহীম! তোমার বিরহে আমরা আজ মর্মাহত।"[১]

মানুষের জীবনে বিপদাপদ আসে, কিছুদিন তার প্রভাব থাকে, আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা দূরও হয়ে যায়। তবে একাদিক্রমে বিপদাপদের অবিরাম স্রোতে ধীরস্থির চিত্তে এমন অম্লান বদনে তা বরদাশত করা এবং কোন অবস্থাতেই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে না পড়া সত্যই বড় কঠিন ব্যাপার। হিজরতের পূর্বেই তেরটি বছর মক্কা এবং তায়েফের কঠিন-হৃদয় লোকেরা সত্যের এ আহ্বানের জবাবে যে ঘৃণ্য পন্থায় নির্যাতন, ঠাট্টা এবং অপমানকর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল, তার নযীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। মদীনার জীবনেও প্রথম আটটি বছর শত্রুর বিরামহীন ষড়যন্ত্রজাল এবং একের পর এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সর্বোপরি ইসলামের এ নতুন আশ্রয়কেন্দ্রটি থেকে হুযুর (সাঃ)-কে উৎখাত এমন কি হত্যা করারও এক বিরামহীন অভিযান চলতে থাকে। এতসব শ্বাসরুদ্ধকর বিপদাপদের তুফান হুযুর (সাঃ) একমাত্র সবরের মাধ্যমেই তো মোকাবিলা করেছিলেন।

---

১. সবগুলো ঘটনা বোখারী শরীফের কিতাবুল জানায়েয অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে।

এর চাইতেও কঠিন পরীক্ষা ছিল, ব্যক্তিগত জীবনের কৃচ্ছ্রতায়। ইসলামী-রাষ্ট্র সুসংহত হওয়ার পর একেকটি বিজয়-অভিযানে অনিবার্যভাবেই বিপুল সম্পদ হস্তগত হত। কিন্তু হুযুর (সাঃ) সে সমস্ত সম্পদ-রাশি নিঃশেষে অভাবীদের মধ্যে বিতরণ না করে শান্ত হতেন না। ব্যক্তিগত জীবনের কৃচ্ছ্রতায় এ সম্পদের স্তূপও কোন পরিবর্তন আনতে পারত না। পরিবার-পরিজনসহ বিরামহীন জীবনের উপবাস করে এবং একজোড়া কাপড়ের আচ্ছাদন থেকে সবরের যে অনাবিল আনন্দ লাভ করতেন, সম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যেও তা কোন প্রকার বিঘ্নের সৃষ্টি করতে পারে না। শত্রুর তরফ থেকে যে নির্যাতন আসে, তার চাইতেও কঠিন মনে হয় আপনজনদের সামান্যতম আঘাত। শত্রুর অবিরাম আঘাতেও যেখানে সামান্যতম ফাটল সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় না, সেখানে আপনজনদের সামান্য কটাক্ষই ধৈর্যের সে বাঁধ ভেঙে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে। হুযুর (সাঃ) জীবনের একাধিক ক্ষেত্রে একশ্রেণীর অতি-উৎসাহী আপনজনদের দ্বারা এই ধরনের কিছু কিছু আঘাতের সম্মুখীন হয়েছেন। হুনাইনের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনকে কেন্দ্র করে দু'একজন তরুণ আনসার সমালোচনামুখর হয়েছেন। কিন্তু সবরের সে মহাসমুদ্রে এ সমস্ত ঘটনাও সামান্যতম আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। একবার যবান মোবারক থেকে এতটুকুই শুধু প্রকাশ পেয়েছিল ঃ

"মূসার উপর আল্লাহর রহমত হোক, তিনি নিজের লোকদের দ্বারা এর চাইতেও বেশি নির্যাতিত হয়েছেন, কিন্তু ধৈর্যধারণ করেছেন।"

পবিত্র আখলাক

إِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ -

"নিশ্চয়ই আপনি এক মহত্তম চরিত্রের অধিকারী।"

মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনের এ অধ্যায়টি এমনই এক অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, যা তাঁকে দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মপ্রবর্তক ও সংস্কারকদের মধ্যে অন্তহীন স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর করে রেখেছে।

যে মহাপুরুষদের স্মৃতি বুকে ধারণ করে ইতিহাস ধন্য হয়েছে, যাঁদের সংস্কারমূলক শিক্ষার আলোকে মানবজীবনের জমাট বাঁধা অন্ধকারে আলোর ইশারা জেগেছে, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে পুংখানুপুংখ বিচার-বিশ্লেষণ করলে অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের জীবনে এমন সব উপদেশামৃতের বাস্তব নমুনা বড় একটা খুঁজে পাওয়া যায় না।

মানব-চরিত্র সংশোধন করার জন্য যাঁরা জীবনপাত করে গেছেন তাঁদের মধ্যে প্রাচীন ভারতের গৌতম বুদ্ধ এবং যয়তুন পর্বতের মহামানব হযরত ঈসার নাম সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু কেউ কি বলতে পারেন, মহান গৌতম বুদ্ধের দৈনন্দিন জীবন কেমন ছিল? জিহুন পর্বতের মহান সংস্কারক হযরত ঈসা মসীহ বিশ্ববাসীকে চরিত্রের মহত্তম শিক্ষা দিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর সে সমস্ত উপদেশামৃতের যেকোন একটি ঘটনা তাঁর জীবনে কিভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল, তার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ কি কেউ উপস্থিত করতে পারেন? কিন্তু মক্কায় সে মহান চরিত-শিক্ষক বজ্রকঠোর কণ্ঠে কোরআনের সে বাণীটি প্রচার করছেন ঃ

"এমন কথা বল কেন, যা তোমরা কর না।"—(ছফ)

তাঁর শিক্ষার সর্বপ্রথম নমুনা ছিলেন তিনি নিজেই। তিনি বাইরে জনসমাবেশে যা বলতেন, ঘরের নিভৃত কোণেও ঠিক তেমনি আদর্শের বাস্তব নমুনা হিসাবেই বিরাজ করতেন। আখলাক এবং আমলের যে সমস্ত কথা তিনি অন্যকে বলতেন, সর্বপ্রথম তা নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে তা অন্যের সামনে পেশ করতেন। মানুষের বাস্তব চরিত্র সম্পর্কে ঘরের স্ত্রীর চাইতে বেশি ওয়াকিফহাল আর কে হতে পারেন? একবার কিছু লোক হযরত আয়েশার খেদমতে হুযুর (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু বলার জন্য আরয করলেন। জবাবে মা আয়েশা তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি কোরআন পড় না"?

"রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চরিত্র ছিল জীবন্ত কোরআন।"[১] যতগুলো ধর্মগ্রন্থ দেখা যায়, তা সংশ্লিষ্ট ধর্মপ্রবর্তকদের বাণীসমূহেরই সমষ্টি মাত্র। কিন্তু সে সমস্ত গ্রন্থের

১. আবু দাউদ, রাত্রিকালীন নামায প্রসঙ্গ

কোন একটি হরফও কি স্ব-স্ব প্রচারকদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কোন প্রকার ইশারা প্রদান করতে সক্ষম? অথচ লক্ষকোটি বিরুদ্ধবাদীর মুখের উপরেই পবিত্র কোরআন ঘোষণা করছে ঃ

"নিঃসন্দেহে আপনি মহত্তম চরিত্রের অধিকারী।"

একশ্রেণীর বিবেকহীন সমালোচক আজ চৌদ্দ'শ বছর পরও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কঠিন-হৃদয় বলে সমালোচনা করার দুঃসাহস দেখায়। কিন্তু যখন আরবের অধিকাংশ মানুষই কোরআন-বহনকারীর বিরুদ্ধে সর্বশক্তিতে সমালো-চনামুখর ছিল, তখনও কোরআন শত্রুদের সামনেই তাঁর সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করেছে ঃ

"আল্লাহ্র অনুগ্রহেই আপনি তাদের প্রতি নম্র ব্যবহার করে থাকেন। যদি আপনি বক্র স্বভাবের ও কঠিন-হৃদয়ের হতেন, তাহলে এরা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।"

অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে ঃ

"তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে একজন পয়গম্বর আগমন করেছেন। তোমাদের কষ্ট তাঁর কাছে বড় বেদনায়ক। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী ও বিশ্বাসিদের প্রতি অত্যন্ত বিনয়ী ও দয়ালু।—(সূরা তওবা)

চরিত্রের বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে এক বিরাট ভুল হল এই যে শুধু দয়া, অনুগ্রহ, নম্রতা ও দীনতা প্রকাশকে পয়গম্বরী চরিত্রের নিদর্শন সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ চরিত্র এমন এক বিষয় যা জীবনের প্রতিটি স্তরে এবং ঘটনাপ্রবাহের প্রতিক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়ে থাকে। শত্রু-মিত্র, আপন-পর, ছোট-বড়, ধনী গরীব, শান্তি-যুদ্ধ, গোপন-প্রকাশ্য মোটকথা প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি জন পর্যন্ত চরিত্রের সীমানা বিস্তৃত। হুযুর (সাঃ)-এর চরিত্রের অধ্যায়ে এ দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রতিফলন হওয়া উচিত।

নবী-চরিত্রের সম্যক বর্ণনা ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনের বিক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত ঘটনাসমূহ লেখার শুরুতে যারা তাঁর পবিত্র খেদমতে বছরের পর বছর এবং দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছেন এবং যাঁরা তাঁর আচার-আচরণের এক-একটি অক্ষর সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন, সে সব মহান মনীষীবৃন্দের বর্ণনাসমূহ লিপিবদ্ধ করা কর্তব্য। মানুষের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে স্ত্রীর চেয়ে অধিক অভিজ্ঞতা দুনিয়ার আর কারও থাকতে পারে কি? হযরত খাদিজাতুল কোব্রা যিনি নবুয়তের পূর্বে ও পরে দীর্ঘ পঁচিশটি বছর পর্যন্ত পতি-সেবায় নিয়োজিত ছিলেন; তিনি ওহী প্রাপ্তির প্রাথমিক পর্যায়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এ বলে সান্ত্বনা দান করতেন যে "কখনও নয়; খোদার কসম! আল্লাহ্ আপনাকে কখনও দুশ্চিন্তায় ফেলবেন না। আপনি আপনজনের প্রতি সদ্ব্যবহার করে থাকেন, ঋণগ্রস্তদের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন,

দরিদ্রজনদের সাহায্য করে থাকেন, অতিথি-সেবা করে থাকেন, সত্যের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে থাকেন, বিপদে মানুষকে সাহায্য করেন।"[১]

উম্মাহাতুল মোমেনীনদের মধ্যে হযরত আয়েশার চেয়ে আর কেউ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গুণাবলী বিস্তারিত বর্ণনা দান করতে পারেননি। তিনি বলেছেন, কখনও কাউকে মন্দ বলার স্বভাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ছিল না। মন্দের পরিবর্তে কখনও মন্দ ব্যবহার করতেন না বরং তা পরিত্যাগ অথবা ক্ষমা করে দিতেন।[২] তাঁকে দু'টি বিষয়ের যেকোন একটি গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হলে যা সহজ হত তাই গ্রহণ করতেন, অবশ্য তা যদি কোন পাপকার্য না হত। নতুবা তা থেকে দূরে থাকতেন। কখনও নিজের কোন ব্যাপারে কারও কাছ থেকে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু যদি কেউ আল্লাহ্‌র আদেশের বিরোধিতা করত তাহলে স্বয়ং আল্লাহ্ তার প্রতিশোধ নিতেন।[৩] অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌রই নির্দেশানুযায়ী তিনি তাদের প্রতি শাস্তির বিধান করতেন। তিনি কখনও চিহ্নিত করে কোন মুসলমানকে অভিশাপ দেননি। কখনও কোন দাস-দাসীকে, কোন নারী এমন কি, পশুকেও নিজের হাতে মারধর করেননি। কারও কোন আবেদন কখনও প্রত্যাখ্যান করেননি। তবে তা যদি নাজায়েয কিছু না হত।[৪] যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় মুচকি হেসে হেসে প্রবেশ করতেন। বন্ধুজনের মধ্যে কখনও পা ছড়িয়ে বাসতেন না।[৫] কথাবার্তা ধীরে ধীরে এমনভাবে বলতেন যে যদি কেউ মনে রাখতে চাইত তবে সহজেই তা করতে পারত।[৬]

হযরত আলী (রাঃ) যিনি মহানবী(সাঃ)-এর কাছে দীক্ষা লাভ করছিলেন এবং নবুয়তের প্রথম থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অন্ততপক্ষে তেইশ বছর তাঁর খেদমতে ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) একদিন তাঁর কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চরিত্র ও স্বভাব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জবাবে বললেন, তিনি হাসিমুখ, নম্র স্বভাব ও দয়ালু প্রকৃতির লোক ছিলেন; কঠোর স্বভাব ও সংকীর্ণ-হৃদয়ের ছিলেন না। কথায় কথায় কলহ করতেন না, কোন প্রকারের মন্দ বাক্য কখনও উচ্চারণ করতেন না। ছিদ্রান্বেষী ও ক্ষুদ্রমনা ছিলেন না। কোন কথা তাঁর পছন্দ না হলে, তা থেকে বিরত থাকতেন। তাঁর কাছে কেহ কোন কিছুর আবদার করলে তাকে নিরাশ করতেন না। নামঞ্জুরীর কথাও প্রকাশ করতেন না। অর্থাৎ, প্রকাশ্যভাবে নিষেধ বা প্রত্যাখ্যান করতেন না। বরং তা পূরণ করা সম্ভব না হলে

১. বোখারী বাদউল ওহী অধ্যায়।
২. তিরমিযী ও শামায়েলে তিরমিযী।
৩. সহীহ্ বোখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ ঃ কিতাবুল আদব।
৪. হাকেম।
৫. ইবনে সা'আদ।
৬. সহীহ্ বোখারী, মুসলিম ও আবুদ দাউদ।

নীরব থাকতেন। ফলে, বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সে নীরবতার মধ্যেই উদ্দেশ্য বুঝে নিতে পারত। তিনি নিজের জীবন থেকে তিনটি বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে দূর করে দিয়েছিলেন। যেমন, পরস্পরে কূটতর্ক করা, প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা বলা এবং লক্ষ্যহীন কোন কিছুর পেছনে লেগে থাকা। অপর লোকদের ক্ষেত্রেও তিনি তিনটি বিষয়ে সংযমী ছিলেন। কাউকেও মন্দ বলতেন না, কাউকেও দোষারোপ করতেন না এবং কারও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকতেন না। যেকথা মানুষের কল্যাণকর তাই বলতেন। কথোপকথনের সময় সাহাবিগণ এমন নীরব ও নতশিরে তা শুনতেন, যাতে মনে হত যেন তাঁদের মাথায় পাখি বসে আছে। যখন তাঁর কথা বলা শেষ হত তখন সাহাবিগণ পরস্পরে কথাবার্তা বলতেন। কেউ কোন কথা বলা আরম্ভ করলে তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত, তিনি নীরবে শুনতে থাকতেন। যে কথায় মানুষ হাসত, তিনিও সে কথায় মুচকি হাসতেন। যাতে মানুষ বিস্মিত হত, তিনিও তাতে বিস্মিত হতেন। বহিরাগত কোন ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে কথা বললে তা তিনি সহ্য করে নিতেন। লোকমুখে নিজের প্রশংসা শোনা পছন্দ করতেন না। কিন্তু যদি কেউ তাঁর অনুগ্রহ ও দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত, তা গ্রহণ করতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি তার কথা শেষ না করত, ততক্ষণ তা মাঝে ছেদ টানতেন না।[১] তিনি অত্যন্ত উদার, সত্যবাদী ও অতিশয় নম্র স্বভাবী ছিলেন। তাঁর সাহচর্য ছিল মহত্তম। তাঁর এমন চেহারা ছিল যে অকস্মাৎ দেখলে অন্তর কেঁপে উঠত। কিন্তু যতই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে থাকত, ততই ভালবাসা দৃঢ়তর হত।'[২] রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কোলে লালিত হিন্দ ইবনে আবীহালা বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নম্র স্বভাবী ছিলেন,—কঠোর প্রকৃতির ছিলেন না। কারও প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা ভাল মনে করতেন না। সামান্য বিষয়েও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। কোন বস্তুকেই খারাপ বলতেন না। যেকোন খাদ্যদ্রব্য সামনে হাযির করা হলে তা গ্রহণ করতেন এবং ভালমন্দ কিছুই বলতেন না। যদি কেউ সত্যের বিরোধিতা করত, তাহলে রাগান্বিত হয়ে যেতেন, কিন্তু ব্যক্তিগত কাজে তার পূর্ণ সহযোগিতা করতেন। ব্যক্তিগত বাপারে কখনও তাঁর ক্রোধের উদয় হতে দেখা যায়নি এবং কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি।"

সংকল্পে দৃঢ়তা ঃ চরিত্রের সর্বপ্রথম ও অত্যধিক প্রয়োজনীয় দিক হল, মানুষ যে বিষয়ই অবলম্বন করবে তাতে এমন দৃঢ় থাকবে যেন তা দ্বিতীয় প্রকৃতিতে পরিণত হয়ে যায়। একমাত্র মানুষ ব্যতীত জগতের সমস্ত সৃষ্ট জীবই শুধু একরকম কাজ করতে সক্ষম এবং সে প্রকৃতিগত কারণেই তা করতে বাধ্য

১. বিস্তারিত বিবরণ শামায়েল তিরমিযীর আখলাকের বর্ণনায় রয়েছে।
২. এ অংশে শামায়েলে তিরমিযীর হুলিয়া মোবারকের বর্ণনায় দেয়া হয়েছে।

থাকে। সূর্য শুধু আলো দান করে, তা থেকে আঁধার প্রকাশ পেতে পারে না। রাত্রি অন্ধকারই বিস্তার করতে পারে, সে আলোকরশ্মির আধার নয়। বৃক্ষ মওসুমেই শুধু ফল দেয় এবং ফুল বসন্তকালেই সৌরভ দান করে। প্রাণিজগতের এক-এক অংশ তার স্বীয় কার্যাবলী ও চরিত্রের দিক থেকে চুল পরিমাণও সরে আসতে পারে না। কিন্তু মানুষ আল্লাহ্‌র তরফ থেকেই স্বাধিকার নিয়ে জন্মলাভ করেছে। তাই সে একাধারে দিনের সূর্য এবং রাত্রের অন্ধকারও বটে। তার সত্তা-বৃক্ষ প্রত্যেক মওসুমেই ফল দান করতে পারে এবং তার চরিত্রের ফুল বসন্তের ধরাবাঁধা নিয়মের অনুসারী নয়। সে প্রাণিজগতের মত কোন বিশেষ ধরনের কার্যাদি ও চরিত্রের উপর বাঁধা নেই। তাকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং 'ক্ষমতাই' তাঁর শরীয়তের বোঝা বহন করার ও জিম্মাদার হওয়ার মূল কারণ। কিন্তু চরিত্রের এক সূক্ষ্মতত্ত্ব হল এই যে মানুষ চরিত্রের সুন্দর যে দিকটি নিজের জন্য বেছে নেবে, কঠোরভাবে তা অনুসরণ করে চলতে থাকবে এবং এমন স্থায়ী ও অলঙ্ঘনীয় নিয়মে কাজ করে যাবে যেভার পূর্ণ অধিকার থাকা সত্ত্বেও সে অন্য কোন কাজ না করে সে কাজই করতে থাকবে। তখন দেখতে দেখতে মানুষ এ বিশ্বাস স্থাপন করে নেবে যে সেটি ছাড়া অন্য কোন কাজ তার কাছ থেকে প্রকাশ পেতেই পারে না। এসব কাজ তার কাছ থেকে এমনভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, যেমন, সূর্য থেকে আলো, বৃক্ষ থেকে ফল এবং ফুল থেকে সুগন্ধ। কেননা, এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য বস্তু থেকে কোন অবস্থাতেই পৃথক হতে পারে না। এরই নাম অবস্থায় দৃঢ়তা ও কর্মে স্থিরতা।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যাবতীয় কাজেই এ নিয়মের অনুসরণ করতেন। যে কাজ যে পদ্ধতিতে, যে সময় আরম্ভ করতেন, তার উপর সব সময় দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত থাকতেন। শরীয়তের এ মূল নিয়ম থেকেই সুন্নত শব্দের উৎপত্তি। সুন্নত সেই কাজ, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সর্বদা দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করতেন। এবং কোন কঠিন ব্যতিক্রম তা পরিহার করতেন না। এ কারণে যত প্রকার সুন্নত রয়েছে তা মূলতঃ তাঁর অবস্থার দৃঢ়তা এবং কার্যের স্থিরতার এক অনস্বীকার্য দৃষ্টান্ত। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কার্যাবলীর পর্যালোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। ফলে, অবগত হওয়া গেছে যে তাঁর যাবতীয় কার্যাদি ও আচার-আচরণ এত পরিপক্ব ও মজবুত ছিল যে সমগ্র জীবনে কখনও তার এতটুকু ব্যত্যয় ঘটেনি। একবার কোন একব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এবাদত ও কার্যাবলী সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি কি কোন বিশেষ দিনে এসব কাজ করতেন? তিনি উত্তরে বললেন, "না, তাঁর কাজ মেঘের বৃষ্টিপাতের ন্যায় হত।" অর্থাৎ, যেভাবে মেঘ থেকে বৃষ্টি অবিরাম বর্ষিত হতে থাকে, তেমনি তাঁর আমলও ছিল বিরামহীন। তিনি একবার যে কাজ গ্রহণ করেছেন সব সময় তার

অনুসরণ করে চলেছেন। অতঃপর বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যা করতে সমর্থ হতেন, তোমাদের মধ্যে কে তা করতে সমর্থ হবে?[১] অপর এক বর্ণনায় আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যদি কোন কাজ শুরু করতেন, তবে সব সময় তাতে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত থাকতেন।[২] তিনি এরশাদ করেছেন "আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় কাজ হল তার উপর স্থির থাকা"[৩] তিনি রাত জেগে এবাদত করতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কখনও রাতে এবাদত পরিহার করেননি। যদি কখনো অসুস্থ অথবা দুর্বল হয়ে পড়তেন, তখন বসে বসে হলেও নির্ধারিত সেই আমলগুলো করতে থাকতেন।[৪]

যে কাজের যে সময় নির্দিষ্ট করে নিতেন, কখনও তার ব্যতিক্রম করতেন না। নামায, তসবীহ্ ও তাহ্লীলের সময়সমূহে, নফল নামাযের সংখ্যাসমূহে, নিদ্রা ও জাগরণের নির্ধারিত সময়ে লোকের সঙ্গে সাক্ষাতের পদ্ধতিতে কোনদিন পরিবর্তন দেখা যায়নি। ফলে, এ কঠোর নিয়মানুবর্তিতাও মুসলমানদের জীবনে মূলনীতি হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

সুন্দর স্বভাব ঃ হযরত আলী (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত আনাস (রাঃ), হযরত হিন্দ ইবনে আবু হালা প্রমুখ প্রখ্যাত সাহাবিগণ, যাঁরা দীর্ঘকাল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে ছিলেন, তাঁদের সবার সর্বসম্মত বর্ণনা হল এই যে তিনি নম্র স্বভাবের, সুন্দর চরিত্রের এবং সৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর মুখমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল থাকত বা গুরুগম্ভীরভাবে কথাবার্তা বলতেন। কারও মন ভেঙে যেতে পারে এমন কোন কথা বলতেন না।

কারও সঙ্গে সাক্ষাতের সময় প্রথমে সালাম ও মুছাফাহা করতেন। কোন ব্যক্তি তাঁর কানের কাছে ঝুঁকে কথা বলতে চাইলে যতক্ষণ সে তার মুখ না সরাত, ততক্ষণ তার দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন না। মুছাফাহারও একই নিয়ম ছিল। অর্থাৎ, যদি কারও সঙ্গে হাত মেলাতেন যতক্ষণ না সে হাত ছাড়িয়ে নিত ততক্ষণ তিনি হাত ছেড়ে দিতেন না। মজলিসে বসা অবস্থায় তাঁর হাঁটু কখনও অন্যান্যদের সমানে প্রসারিত থাকত না।[৫] অনেক দরিদ্রশ্রেণীর অশিক্ষিত লোক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে পানি নিয়ে হাযির হত। তাদের বিশ্বাস ছিল, এ পানিতে পবিত্র হাতে স্পর্শ পড়লেই তা বরকতময় হয়ে যাবে। শীতের দিন এবং সকাল বেলায়ও যদি কেউ পানি নিয়ে আসত, তবু তিনি কাউকেও নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে দিতেন না।[৬]

---

১. বোখারী শরীফ ঃ কিতাবুর রিকাক।
২. আবু দাউদঃ কিতাবুস সালাত।
৩. ঐ।
৪. আবু দাউদ ঃ কিয়ামুল্লাইল।
৫. আবু দাউদ ও তিরমিযী।
৬. মুসলিম শরীফ ঃ কুরবাতুন্নবী মিনান্নাস অধ্যায়।

একবার সা'আদ ইবনে উবাদার (রাঃ) সঙ্গে হযরত নবী করীম (সাঃ) দেখা করতে গেলেন। প্রত্যাবর্তনের সময় সহযাত্রী হিসাবে সা'আদ তাঁর পুত্র কায়েসকে সঙ্গে দিয়ে দিলেন। হুযুর (সাঃ) কায়েসকে বললেন, "তুমি আমার উটে উঠে বস।" বেআদবি হবে ভেবে কায়েস চুপ করে রইল। কিন্তু হুযুর (সাঃ) বললেন, হয় এতে আরোহণ কর, নাহয় বাড়ি ফিরে যাও। কায়েস বাড়ি ফিরে এলেন, তবু তাঁর উটে আরোহণ করলেন না।[১]

বাদশাহ্ নাজ্জাশীর পক্ষ থেকে একবার এক দূত এলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ তাঁকে নিজে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করলেন এবং নিজহাতে আতিথেয়তার যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করলেন। সাহাবিগণ মেহমানদারী সম্পাদনের জন্যে আরয জানালেন। জবাবে বললেন, "এরা আমার বন্ধুদের সেবা করেছেন ; সুতরাং আমি এদের সেবা করতে চাই।"[২]

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী আতবান ইবনে মালেকের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল, তিনি হযরত নবী করীমের (সাঃ) খেদমতে হাযির হয়ে আবেদন করলেন যে আমি নিজ মহল্লার মসজিদে নামায পড়ে থাকি। কিন্তু যখন বৃষ্টি হতে থাকে, তখন আমার পক্ষে মসজিদ পর্যন্ত যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং আপনি যদি আমার বাড়ি এসে নামায পড়তেন তাহলে আমি সে স্থানটিই নামাযের জন্য নির্ধারিত করে নিতাম। পরের দিন হুযুর (সাঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাড়ি গেলেন এবং বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইলেন। ভেতর থেকে প্রবেশের অনুমতি এল। তারপর ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় নামায পড়ব?" স্থান বলে দেয়া হল। হুযুর (সাঃ) তাক্‌বীর বলে সেখানে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। নামায শেষে লোকেরা খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করল, "খাজিরা" নামক একপ্রকার খাদ্য যা কিমার মধ্যে আটা ছিটিয়ে তৈরি করা হয়, তা সামনে হাযির করা হল। মহল্লার সকল লোক খাওয়ায় অংশগ্রহণ করল। উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে কেউ বলে উঠল, মালেক ইবনে দাহ্‌শিকে তো দেখা যায় না। এক ব্যক্তি বললেন, সে তো মুনাফেক। এরশাদ হল ঃ এমন কথা কখনো বলো না। সে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলেছে। লোকেরা বলল হাঁ, তবে তার ঝোঁক মুনাফেকদের দিকে। মহানবী (সাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি জন্য "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেছে, আল্লাহ্ তার প্রতি দোযখের আগুন হারাম করে দিয়েছেন।[৩]

---

১. সুনানে আবু দাউদ কিতাবুল আদব।
২. শরহে শেফায়ে, কাযী আয়াজ।
৩. বোখারী, ১ম খণ্ড, কিতবুস্‌সালাত, ৬১ পৃঃ।

হিজরতের প্রাথমিক অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বয়ং এবং অন্য সকল মোহাজেরই আনসারদের বাড়িতে অতিথি হিসাবে ছিলেন। দশ দশ ব্যক্তির এক একটি দলকে এক এক বাড়িতে অতিথি হিসাবে দেয়া হয়েছিল। মিক্‌দাদ্ ইবনে আসওয়াদ বর্ণনা করেছেন যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে দলে ছিলেন আমিও সে দলভুক্ত ছিলাম। আমরা যে বাড়িতে ছিলাম তাতে কয়েকটি বকরী ছিল। সে বকরীর দুধ দ্বারা আমাদের কালাতিপাত হত। দুধদোহন করে সবাই নিজ নিজ অংশের দুধ পান করে নিত এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্য দুধ পেয়ালায় রেখে দেয়া হত। এক রাতের ঘটনা, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আগমনে বিলম্ব হয়ে গেলে সবাই দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এসে দেখলেন তাঁর দুধের পেয়ালাখানা শূন্য পড়ে আছে। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, "আয় আল্লাহ্! আমাকে যে আজ খাওয়াবে তুমি তাকে খাবার ব্যবস্থা করো।" কথা শুনে হযরত মিক্‌দাদ্ (রাঃ) ছুরি হাতে বকরী জবাই করে গোশত রান্না করার উপক্রম করলেন। কিন্তু হুযুর (সাঃ) এতে বাধা দিলেন। দ্বিতীয়বার বকরীদোহন করে যাকিছু দুধ পাওয়া গেল তা খেয়েই তিনি শুয়ে পড়লেন।[১] কিন্তু সে জন্য কাউকেও দোষারোপ করলেন না।

আবু শোয়ায়েব নামীয় এক আনসারী ছিলেন। বাজারে তাঁর গোলামের একটি গোশতের দোকান ছিল। একদিন তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলেন। তখন তিনি সহাবিগণের দরবারে অবস্থান করছিলেন। আবু শোয়ায়েব এসে গোলামকে বললেন, পাঁচ ব্যক্তির পরিমাণ খাবার তৈরি কর। খাবার তৈরি হবার পর তিনি এসে আবেদন করলেন যে অনুগ্রহপূর্ব্বক সাহাবিগণসহ আগমন করুন। তাঁরা সর্বমোট পাঁচজনই ছিলেন। পথে অন্য একজনও সঙ্গী হলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবু শোয়ায়েবকে বললেন, এ লোকটি না বলেই আমাদের সঙ্গী হয়ে গেছে। তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলেই লোকটি আসতে পারে তা নাহলে বিদায় করে দেয়া হবে। আনসারী বললেন, আপনি তাকেও সঙ্গে নিয়ে নিন।[২]

ওকবা ইবনে আমের নামে একজন সাহাবী ছিলেন। একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) গিরিপথে উটের উপর আরোহণ করে কোথাও যাচ্ছিলেন। উক্ত সাহাবীও সঙ্গে ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে বললেন, "আস, তুমি আরোহণ কর।" কিন্তু সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নামিয়ে নিজে উটে আরোহণ করাকে কঠিন বে-আদবি মনে করলেন।

১. মুসনাদে ইবনে হাম্বল ঃ ৬ । খণ্ড।
২. বোখারী, ৮২১ পৃঃ।

দ্বিতীয়বার আরোহণ করার জন্য যখন বললেন, তখন কথা অমান্য করার অপরাধ হবে ভয়ে অগত্যা তিনি উটে আরোহণ করলেন এবং হুযুর (সাঃ) নিচে নেমে গেলেন।[১]

সঙ্গীদের মসলিসে অপছন্দনীয় ব্যবহারও সহ্য করতেন, কিন্তু তা প্রকাশ করতেন না। হযরত যয়নব (রাঃ)-এর সঙ্গে বিয়ের সময়ে সাহাবিদের ওলীমার দাওয়াত করা হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়ার পরেও কিছু লোক হযরত যয়নবের ঘরে বসে গল্প-গুজব করতে লাগলেন! তখনও পর্দা ফরয হয়নি। ফলে, হযরত যয়নব এক অস্বস্তিকর অবস্থায় বসে থাকতে বাধ্য হলেন। হুযুর (সাঃ) এ পরিস্থিতিতে মনে মনে কামনা করছিলেন যে লোকগুলো উঠে চলে যাক, কিন্তু চক্ষুলজ্জার খাতিরে মুখ বন্ধ ছিল। অস্বস্তির মধ্যে একবার উঠে হযরত আয়েশার ঘরে চলে গেলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দেখলেন, মজলিস তেমনই চলছে। এ অবস্থা দেখে ফিরে গেলেন এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর আবার ফিরে আসলেন। পর্দার আয়াত এ সময়ই নাযিল হয়।[২]

হুনাইনের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এক জায়গায় নামাযের জন্য কাফেলা থামল। মোয়ায্যিন আযান দিলেন। আবু মাহজুরা নামক একজন অ-মুসলমান (পরে ইসলাম গ্রহণ করছিলেন) কয়েকজন সঙ্গীসহ সেখানে ঘোরাফেরা করছিলেন। আযান শুনে এরা সবাই বিদ্রূপাত্মকভাবে আযানের অনুকরণ করতে লাগলেন। আযান শেষ হওয়ার পর হুযুর (সাঃ) এদের ডেকে এনে প্রত্যেকের দ্বারা আযানের শব্দগুলো উচ্চারণ করালেন। এদের মধ্যে আবু মাহজুরার কণ্ঠ চমৎকার ছিল। তার আওয়ায পছন্দ হল। তাকে সামনে বসিয়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে দোয়া করলেন এবং বললেন,"যাও এমনি সুমধুর কণ্ঠে হরম শরীফে আযান দিও।"[৩]

এক সাহাবীর বর্ণনা, ছেলেবেলায় আমি আনসারদের খেজুর বাঁগানে চলে যেতাম এবং ঢিল ছুঁড়ে খেজুর পেড়ে খেতাম। একদিন তাঁরা আমাকে ধরে হুযুর (সাঃ)-এর দরবারে হাযির করেন। অভিযোগ শুনে হুযুর (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "খেজুর গাছে ঢিল মার কেন?" আমি জবাব দিলাম, খেজুরের জন্য। বললেন, "গাছে ঢিল মারা ভাল নয়, নিচে যে সমস্ত খেজুর ঝরে পড়ে, সেগুলো কুড়িয়ে খেয়ো।" তারপর আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন।[৪]

১. নাসাঈ, ৮০ পৃঃ।
২. বোখারী শরীফ : পর্দা প্রসঙ্গ।
৩. দারে কুতনী, নামায অধ্যায়।
৪. আবু দাউদ : জেহাদ অধ্যায়।

মদীনায় তখন দুর্ভিক্ষ। আবাদ ইবনে শোরাহবিল নামক একব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে এক খেজুর বাগানে ঢুকে এক কাঁদি খেজুর কেটে নেন; কিছু খেলেন এবং অবশিষ্ট কিছু কোচড়ে বেঁধে নিলেন। তখন বাগানের মালিক এসে তাঁকে ধরে ফেললেন এবং গায়ের কাপড় খুলে নিয়ে হুযুর (সাঃ)-এর দরবারে হাযির করলেন। হুযুর (সাঃ) পূর্বাপর ঘটনা শুনে এরশাদ করলেন, লোকটি নির্বোধ। আইনকানুন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়, তাকে প্রথমে এ সম্পর্কে অবগত করানো উচিত ছিল। সে ক্ষুধার্ত ছিল তাকে তৎক্ষণাৎ কিছু খাবারও দেয়া দরকার ছিল। এ বলে তার কাপড় ফেরত দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং নিজের পক্ষে থেকে ষাট ছা' খেজুর দিয়ে বিদায় করলেন।[১]

স্ত্রীলোকদের ঋতুকালীন সময়ে ইহুদীরা তাদের ঘর থেকে বের করে দিত। তাদের হাতের ছোঁয়া পর্যন্ত খেত না। হিজরতের পর মদীনাবাসিগণ হুযুর (সাঃ)-এর নিকট এ সম্পর্কিত বিধান জানতে চাইলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনের আয়াত নাযিল হল যে "ঋতুবর্তী হওয়া নারীদের একটি সাধারণ প্রকৃতিগত ব্যাপার মাত্র।" তবে ঋতুকালীন সময়ে তোমরা তাদের সঙ্গে সহবাস করো না।" কোরআনের এ আয়াতের ভিত্তিতেই হুযুর (সাঃ) বিধান দিলেন,—একমাত্র সহবাস ছাড়া স্বাভাবিক মেলামেশায় কোন বাধা নেই। ইহুদীরা এ নির্দেশ জানতে পেরে বলাবলি শুরু করল, "এ লোকটি প্রত্যেক ব্যাপারেই আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে।" ইহুদীদের এ ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার খবর পেয়ে দুজন সাহাবী মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলেন। কথায় কথায় উৎসাহিত হয়ে এক পর্যায়ে তাঁরা বলে ফেললেন, "এরা যখন এতই চটেছে, তখন আমাদের পক্ষে আরও একটু এগিয়ে সহবাসও করা উচিত।" এঁদের এ মন্তব্য ছিল কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশের খেলাফ। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই হুযুর (সাঃ) বিরক্ত হলেন। তাঁর চেহারা রক্তবর্ণ হয়ে গেল। সাহাবীদ্বয় এ অবস্থা দেখে ভয়ে ভয়ে সরে পড়লেন। হুযুর (সাঃ) পরে ভয় ভাঙানোর জন্য তাঁদের বাড়িতে কিছু খাদ্যদ্রব্য পাঠিয়ে দিলেন।[২]

কারও কোন আচরণ অপছন্দ হলেও মুখের উপর তাকে লজ্জা দিতেন না। অন্যের দ্বারা সাবধান করে দিতেন। একবার এক ব্যক্তি আরবের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী জাফরান মেখে দরবারে হাযির হলেন। হুযুর (সাঃ)-এর তা অপছন্দ হলেও তার সামনে কিছুই বললেন না, বরং লোকটি চলে যাওয়ার পর অন্য একজনকে ডেকে বললেন, তাকে এ রং ধুয়ে ফেলতে বল।"[৩]

---

১. আবু দাউদ ঃ জেহাদ অধ্যায়।
২. আবু দাউদ ঃ হায়েয অধ্যায়।
৩. আবু দাউদ ঃ শিষ্টাচারের বর্ণনা।

আরেকবার এক ব্যক্তি সাক্ষাৎপ্রার্থী হল। মন্তব্য করলেন, "লোকটি ভাল নয়। আচ্ছা আসতে দাও।" লোকটি যখন এল, তখন তার সঙ্গে অত্যন্ত চমৎকার ব্যবহার করলেন, বিশেষ সহৃদয়তার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। ধৈর্যের সঙ্গে তার কথাবার্তা শুনে সন্তুষ্ট করে বিদায় দিলেন। লোকটি চলে যাওয়ার পর হযরত আয়েশা (রাঃ) বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি তো বলেছিলেন, "লোকটি ভাল নয়, এ পরও তার সঙ্গে এমন ভাল ব্যবহার করলেন কেন?" হুযুর (সাঃ) জবাব দিলেন, "আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সর্বাপেক্ষ ঘৃণ্য সে ব্যক্তি যার দুর্ব্যবহারে লোকজন তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।"[১]

ইহুদীরা কেমন পাষণ্ড এবং ইসলামের কত বড় দুশমন ছিল, তা সীরাতের পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। এতদসত্ত্বেও হুযুর (সাঃ) এ সমস্ত পাষণ্ডের সঙ্গে সব সময়ই সদ্ব্যবহার করতেন, সামাজিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। কখনও এদের আচরণ ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করলে শুধু এতটুকই বলতেন, "এদের কপালে ছাই পড়ুক।"[২]

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী বর্ণনা করেন, মদীনার এক ইহুদীর কাছ থেকে আমি মাঝে-মধ্যে ঋণ গ্রহণ করতাম। এক বছর খেজুরের ফলন না হওয়ায় ঋণ পরিশোধ করতে পারলাম না। বছর ঘুরে আবার বসন্তকাল এল। এবারও খেজুরের ফলন ভাল হল না। আমি পরবর্তী ফসল পর্যন্ত সময় চাইলে, ইহুদী কিছুতেই রাজী হল না, সে উপর্যুপরি তাগিদ দিতে লাগল। আমি বিষয়টি হুযুর (সাঃ)-এর কাছে জানালাম। পূর্বাপর ঘটনা শুনে হুযুর (সাঃ) কয়েকজন সাহাবীসহ সে ইহুদীর বাড়িতে চলে গেলেন। তাকে বার বার বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইহুদী কোন অবস্থাতেই সময় দিতে রাজী হল না। সে বলতে লাগল "আবুল কাসেম! আপনি যত অনুরোধই করুন না কেন, আমি কিছুতেই সময় দেব না।" হুযুর (সাঃ) উঠে খেজুর বাগানের দিকে চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে ফিরে এসে পুনরায় তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ইহুদীর মন নরম হল না। ফিরে এসে আমাকে হুকুম দিলেন, বারান্দায় বিছানা কর। বিছানা করা হলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেন। তারপর পুনরায় ইহুদীকে গিয়ে বোঝাতে চেষ্টা কররেন। কিন্তু কিছুতেই যখন কিছু হল না, তখন বাগানে এসে ছায়ার নিচে দাঁড়ালেন এবং খেজুর তুলতে নির্দেশ দিলেন। হুযুর (সাঃ)-এর বরকতে সবগুলো কাঁদি কেটে নামানোর পর দেখা গেল,—এত বেশি খেজুর নেমেছে যে ইহুদীর ঋণ পরিশোধ করেও যথেষ্ট খেজুর রয়ে গেছে।[৩]

১. বোখারী, আবু দাউদ ঃ সদ্ব্যবহার ও শিষ্টাচার অধ্যায়।
২. বোখারী
৩. বোখারী।

অনেক সময় মজলিসে স্থান সংকুলান হত না। প্রথমে যাঁরা আসতেন, তাঁদের দ্বারাই স্থান পূর্ণ হয়ে যেত। পরে যাঁরা আসতেন, তাঁদের বসার জন্য কোন কোন দিন পাক বদনের চাদর খুলে পর্যন্ত বিছিয়ে দিতেন। এক সাহাবী বর্ণনা করেন ঃ একবাবর ঝিইররানা নামক স্থানে হুযুর (সাঃ) সঙ্গীগণের মাধ্যমে গোশ্‌ত বন্টন করছিলেন। এমন সময় এক স্ত্রীলোক এসে হাযির হলেন। তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই হুযুর (সাঃ) অত্যন্ত সম্মান করলেন, গায়ের চার খুলে তাঁর সামনে বিছিয়ে দিলেন। সাহাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম,—"এ মহিলাটি কে?" লোকেরা পরিচয় বললেন যে ইনি হুযুর (সাঃ)-এর দুধমাতা হযরত হালীমা।[১]

অনুরূপ আরেকদিন দুধ-পিতা এলে তাঁকে চাদরের এক অংশ বিছিয়ে বসতে দিলেন, কিছুক্ষণ পর দুধ-মাতা এলে তাঁর জন্য অন্য অংশটিও বিছিয়ে দিলেন। পর পরই দুধভাই এলে হুযুর (সাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁকে সামনে এনে বসালেন।[২]

মহানবী (সাঃ) প্রখ্যাত সাহাবী আবু যরকে একদিন ডেকে পাঠালেন। ঘটনাক্রমে তিনি তখন ঘরে ছিলেন না। কিছুক্ষণ পর খবর পেয়ে ছুটে এলেন। এ সময় হুযুর (সাঃ) শুয়েছিলেন। আবু যরকে দেখামাত্র তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।[৩]

হযরত জাফর (রাঃ) হাবশা থেকে ফিরে আসার পর তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে ললাটে চুম্বন করেছিলেন।[৪]

সব সময় অন্যকে আগে সালাম দিতেন। রাস্তায় চলার সময় নারী-পুরুষ এমন কি, শিশুদেরও সালাম দিতেন।[৫] একদিন রাস্তা চলার সময় দেখতে পেলেন, এক জায়গায় কিছু লোক বসে আছে। তাঁদের মধ্যে মুশরিক, কাফের সকল শ্রেণীর লোকই ছিল। কাছে পৌছে হুযুর (সাঃ) সকলকেই সালাম দিলেন।[৬]

কারও কোন আচরণ অপছন্দ হলে মজলিসে তাঁর নাম নিয়ে তার উল্লেখ করতেন না, বরং সাধারণভাবে বলে দিতেন যে,"লোকেরা এমন কাজ করে, কিছু কিছু লোকের এমন অভ্যাস আছে।" কারও নাম এজন্য নিতেন না যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেন লজ্জিত না হয়, তার আত্মসম্মানে যেন কোনরূপ আঘাত না আসে।

১. আবু দাউদ ঃ আদাব অধ্যায়।
২. আবু দাউদ ঃ পিতা-মাতার সম্মান প্রদর্শন অধ্যায়।
৩. আবু দাউদ ঃ মোয়ানাক্কাহ্ অধ্যায়।
৪. আবু দাউদ।
৫. বোখারী।
৬. বোখারী শরীফঃ সালাম অধ্যায়।

লেনদেনে সততা ঃ অপরের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে গিয়ে হুযুর (সাঃ) অনেক সময় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। এমন কি, ওফাতের সময় পর্যন্ত একটি বর্ম জনৈক ইহুদীর কাছে এক মণ গমের বদলায় বন্ধক ছিল। কিন্তু সর্বাবস্থাতেই লেন-দেনের ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধান থাকতেন,—সর্বতোভাবে সততা বজায় রাখতেন। মদীনায় ইহুদীরাই ছিল সম্পদশালী,—অনেক সময় এদের কাছ থেকেই হুযুর (সাঃ) ঋণ গ্রহণ করতেন। ইহুদী মহাজনরা সাধারণত নিতান্ত হীন প্রকৃতির এবং রুক্ষ স্বভাবের হয়ে থাকে। হুযুর (সাঃ) এদের সকল প্রকার নীচ ব্যবহার এবং রুক্ষতা অম্লানবদনে বরদাশ্‌ত করতেন। কোন সময়ই শক্ত কথা বলতেন না।

নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও যে সমস্ত লোকের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল, তারা সবাই তাঁর সততা এবং পরিচ্ছন্ন লেনদেন-এর তারিফ করতেন। এমন কি, কোরাইশরা একবাক্যে তাঁকে "আমীন" (বিশ্বাসী) বলে সম্বোধন করত। নবুয়ত প্রাপ্তির পর কোরাইশরা যদিও বিদ্বেষ-বিষে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল, তথাপি ধন-সম্পদ আমানত রাখার জন্য সর্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান হুযুর (সাঃ)-এর ঘরকেই তারা মনে করত। আরবে সায়েব নামক এক ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। মুসলমান হওয়ার পর সাহাবিরা তাঁকে খেদমতে এনে হাজির করলেন এবং অনেক প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করে তাঁর পরিচয় করাতে লাগলেন। হুযুর (সাঃ) এরশাদ করলেন, "আরে, একে আমি তোমাদের সবার চাইতে ভাল জানি।" সায়েব তখন করজোড়ে নিবেদন করলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)! আপনি এক সময় আমার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন, আমার পিতা-মাতা কোরবান হোন, আপনার সততা ও আচার-ব্যবহার ছিল তুলনাবিহীন।"[১]

এক সময় এক ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু খেজুর ধার করেছিলেন। লোকটি তাগাদায় এলে জনৈক আনসারীকে সে ধার পরিশোধ করে দিতে বললেন। আনসারী খেজুর নিয়ে এলে সে ব্যক্তি সে খেজুর নিতে অস্বীকার করে বলল, আমার খেজুর এর চাইতে ভাল ছিল। আনসারী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি হুযুর (সাঃ)-এর দেয়া খেজুর নিতে অস্বীকার করছ? লোকটি জবাব দিল, হুযুর (সাঃ)-এর কাছ থেকেই যদি ইনসাফ না পাই তবে আর কোথায় গিয়ে পাব? লোকটির কথা কানে যাওয়া মাত্রই হুযুর (সাঃ)-এর দু'চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে এল, বলতে লাগলেন, লোকটি ঠিকই বলছে।[২]

মহানবী (সাঃ)-এর কাছে এক বেদুঈনের কিছু পাওনা ছিল। সে এসে তার স্বভাবসিদ্ধ মেজাযে শক্ত শক্ত কথা বলতে শুরু করল। সাহাবিগণ লোকটিকে

---

১. আবু দাউদ, ২য় খণ্ড।
২. তরগীব ও তরহীব।

ধমক দিয়ে বললেন, জান, তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ? বেদুঈন জবাব দিল, আমার তা জানার দরকার কি? আমি তো আমার হক পাওনা আদায় করতে এসেছি। হুযুর (সাঃ) তখন সাহাবিদের বললেন, "সে পাওনাদার, শক্ত কথা বলার তার অধিকার আছে। তোমাদের উচিত ছিল, তার পক্ষ সমর্থন করা।" এর পর নির্দেশ দিলেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ এর পাওনা পরিশোধ করে তাকে সন্তুষ্ট করে দিও।[১]

এক যুদ্ধে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী মহানবী (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন। তাঁর উটটি ছিল দুর্বল, দীর্ঘ পথ চলে এটি আরও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। হুযুর (সাঃ) জাবেরের কাছ থেকে উটটি খরিদ করে নিলেন এবং মূল্য পরিশোধ করার পর উটটি তাকেই দিয়ে দিলেন।[২]

ঘটনাটি অন্যত্র এভাবে বর্ণিত হয়েছে— হযরত জাবের এর কাছ থেকে উটটি এ শর্তে নিয়েছিলেন যে মদীনা পর্যন্ত সেটির উপর হুযুর (সাঃ) স্বয়ং সফর করবেন এবং চার আশরাফী মূল্য দেবেন। তারপর উট হাঁকানোর সঙ্গে সঙ্গে সেটি এমন দ্রুত ছুটতে শুরু করল যে সবাইকে ছেড়ে চলে গেল। মদীনায় পৌঁছানোর পর হযরত জাবের মূল্য গ্রহণ করতে এলেন। হুযুর (সাঃ) হযরত বেলালকে ডেকে বললেন, জাবেরকে চার আশরাফী অপেক্ষা কিছু বেশি দিয়ে দাও। হযরত বেলাল তাঁকে চার আশরাফী এবং অতিরিক্ত আরও এক কীরাত স্বর্ণ প্রদান করলেন।[৩]

নিয়ম ছিল, কোন জানাযা উপস্থিত হলে হুযুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করতেন, এ মৃতের উপর কোন ঋণের বোঝা নেই তো? যদি জানা যেত যে মৃতব্যক্তি ঋণগ্রস্ত, তবে সাহাবিদের মধ্যে কাউকেও ডেকে বলে দিতেন যেন জানাযা পড়িয়ে দেয়া হয়, নিজে তার জানাযা পড়াতেন না, শরীকও হতেন না।[৪]

কোন এক সময় এক ব্যক্তির কাছ থেকে ধারে একটি উট নিয়েছিলেন। ফেরত দেয়ার সময় তার চাইতেও উত্তম আর একটি উট দিয়ে দিলেন এবং এরশাদ করলেন, "সবচাইতে ভাল লোক তারাই, যারা উত্তম আচরণের সঙ্গে ঋণ পরিশোধ করে।"[৫]

একবার কোন এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি পেয়ালা ধার নিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে সেটি হারিয়ে গেলে মালিককে তার ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে দিলেন।[৬]

---

১. ইবনে মাজাহ্ ঃ পাওনাদারের অধিকার অধ্যায়।
২. বোখারী শরীফ।
৩. বোখারী শরীফ।
৪. বোখারী শরীফ।
৫. তিরমিযী ঃ ধারে উট গ্রহন প্রসঙ্গ।
৬. তিরমিযী শরীফ।

একবার এক বেদুঈনকে উটের গোশত বিক্রি করতে দেখে এক ওয়াসকে শুকনো খেজুরের বদলায় কিছু গোশত নিয়ে এলেন। ধারণা ছিল, ঘরে খেজুর রয়েছে। কিন্তু বাড়ি ফিরে দেখলেন, খেজুর ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। বাইরে এসে বেদুঈন কসাইকে বিষয়টি বুঝিয়ে বললেন। কিন্তু বেদুঈন না বুঝে হৈ চৈ শুরু করে দিল। সে বলতে লাগল, হায় হায়, এত প্রবঞ্চনা! সাহাবিগণ বেদুঈনকে এহেন ধৃষ্টতা থেকে নিবৃত্ত করতে এগিয়ে এলেন, বললেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনও কারও সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেন না। হুযুর (সাঃ) সাহাবিগণকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, একে বলতে দাও, এমনটি বলার তার অধিকার রয়েছে। বেদুঈন বার বার একথা বলে গেল এবং হুযুর (সাঃ) ও একই কথা বলে সাহাবিদের নিবৃত্ত করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত বেদুঈনকে এক আনসারীর কাছ থেকে মূল্য বাবত দেয় খেজুর নিয়ে যেতে পাঠিয়ে দিলেন। আনসারীর কাছ থেকে খেজুর পাওয়ার পর বেদুঈন তার ভুল বুঝতে পেরে কিছুটা লজ্জিত হল। তদুপরি হুযুর (সাঃ) তার দুর্ব্যবহারে যেরূপ ধৈর্যের পরিচয় দিলেন, তাতেও সে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ল। দাম নিয়ে ফেরার পথে সে দেখতে পেল, হুযুর (সাঃ) সাহাবী পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন। সে এগিয়ে গিয়ে বলে উঠল, মোহাম্মদ (সাঃ)! আপনি মূল্য পরিশোধ করেছেন, বরং ভাল দিয়েছেন।[১]

একবার মদীনার উপকণ্ঠে একটি ছোট কাফেলা এসে তাঁবু ফেলল। তাদের সঙ্গে একটি লোহিত বর্ণের চমৎকার উট ছিল। এ পথে যাবার সময় হুযুর (সাঃ) উটটি দেখে এর মূল্য জিজ্ঞেস করলেন। উটের মালিক যে দাম চাইল কোন দরাদরি না করে সে দামেই সম্মত হয়ে গেলেন এবং উটের লাগাম ধরে শহরের দিকে রওয়ানা হলেন। কিছুক্ষণ পর কাফেলার লোকদের খেয়াল হল, অপরিচিত একটি লোককে মূল্য না নিয়েই এভাবে উট দিয়ে দেয়া ভুল হয়েছে। বিষয়টি আলোচনা করে কাফেলার সবাই উদ্বেগ প্রকাশ করতে শুরু করল। কাফেলায় একজন স্ত্রীলোকও ছিল। সে বলতে লাগল, তোমরা ভেবো না। আমি আমার জীবনে এমন জ্যোতির্ময় চেহারার কোন লোক আর দেখিনি। অর্থাৎ, এমন লোক কখনও ধোঁকাবাজ হতে পারে না। দেখতে দেখতে রাত ঘনিয়ে এল। এমন সময় দেখা গেল, হুযুর (সাঃ) কাফেলার সবার জন্য খাবার এবং মূল্য বাবত খেজুর পাঠিয়ে দিয়েছেন।[২]

সাফওয়ান নামক মদীনার জনৈক অমুসলমানের কাছে বহু অস্ত্র ছিল। হুনাইনের যুদ্ধযাত্রার সময় হুযুর (সাঃ) তার কাছে কিছু বর্ম ধার চাইলেন। সে বলতে লাগল, "মোহাম্মদ (সাঃ)! এগুলো কি ছিনিয়ে নিতে চান?" জবাব দিলেন,

১. মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল।
২. দারে কুতনী ঃ ২য় খণ্ড; ক্রয়-বিক্রয় প্রসঙ্গ।

'কখনও না। ধার দাও, যদি কিছু নষ্ট হয়, তবে তার ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।" এ শর্তে চল্লিশটি বর্ম নেয়া হল। যুদ্ধ থেকে ফেরত আসার পর অস্ত্রশস্ত্র গুণে দেখা গেল, কয়েকটি বর্ম খোয়া গেছে। হুযুর (সাঃ) সাফওয়ানকে ডেকে বললেন, কয়েকটি বর্ম খোয়া গেছে, তুমি সেগুলোর ক্ষতিপূরণ নিয়ে নাও। সাফওয়ান জবাব দিলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)! আমার মনের অবস্থা আর পূর্বের মত নেই। আমি ইসলাম কবুল করেছি। সুতরাং ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করার আর কোন প্রশ্নই ওঠে না।"[১]

সুবিচার ঃ সংসারের দায়-দায়িত্ব এবং সর্বপ্রকার ঝামেলামুক্ত জীবনযাপন করলে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা বজায় রেখে চলা সহজ। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরবের এমন শত শত গোত্রের সমন্বয়ে একটি মহাজাতির ভিত্তি স্থাপন করতে প্রয়াসী ছিলেন। যারা আবহমানকাল থেকেই পরস্পরের রক্তপিপাসু ছিল। এদের কোন এক গোত্রের পক্ষে রায় দান করলে প্রতিপক্ষীয় গোত্র সম্পূর্ণ দুশমন হয়ে যেত। ইসলাম প্রচারের সময় হুযুর (সাঃ)-কে সর্বাবস্থাতেই সকল মহলের মন রক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হত। এতসব জটিলতার মধ্যেও কখনো ইনসাফের পাল্লা কোন একদিকে সামান্যও ঝুঁকতে পারেনি।

মক্কা বিজয়ের পর সমগ্র আরবে একমাত্র তায়েফই ছিল বিরুদ্ধবাদীদের শেষ আস্তানা। মক্কার পরে তায়েফ অবরোধ করা হল, কিন্তু পনের-বিশ দিন পর সে অবরোধ প্রত্যাহার করে পেছনে সরে আসতে হল। শেষ পর্যন্ত সাখার নামক এক গোত্রপতি তাঁর লোকজনসহ তায়েফ পুনরায় অবরোধ করলেন। সুনিপুণ যোদ্ধা সাখার-এর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে তায়েফবাসীরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। এ সুসংবাদসহ সাখার হুযুর (সাঃ)-এর দরবারে হাযির হলেন। এ সময় মুগীরা ইবনে শো'বা সাকাফী এসে অভিযোগ করলেন যে সাখার তাঁর ফুফুকে আটকে রেখেছেন। হুযুর (সাঃ) সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলেন, "মুগীরার ফুফুকে এ মুহূর্তে বাড়ি পৌঁছে দাও।" সাখার সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করলেন।

পেছনে পেছনে বনী সলীম গোত্রের লোকেরা এসে অভিযোগ পেশ করল যে আমরা যখন অমুসলমান ছিলাম, তখন গোত্রপতি সাখার আমাদের পানির ঝরণা দখল করে নিয়েছিল। এখন আমরা ইসলাম কবুল করেছি, সুতরাং আমারে ঝরণা ফেরত দেয়া হোক। হুযুর (সাঃ) পুনরায় সাখারকে ডেকে এরশাদ করলেন, "কোন গোত্র যখন ইসলাম কবুল করে, তখন তাদের জান-মাল নিরাপদ হয়ে যায়। সুতরাং বনী সলীম-এর ঝরণা ছেড়ে দাও।" সাখার এ নির্দেশও মেনে নিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, যে সাখার সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে এতবড় একটি বিজয়লাভ করে এলেন, তাঁর বিরুদ্ধে পর পর দু'টি রায় প্রদান করতে গিয়ে হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র চেহারা লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ইনসাফ করতে গিয়ে তিনি বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করলেন না।[২]

---

১. আবু দাউদ ঃ ধার পরিশোধ প্রসঙ্গ।
২. আবু দাউদ ২য় খণ্ড।

সম্ভ্রান্ত মখযুম গোত্রের জনৈকা স্ত্রীলোক চুরির অভিযোগে ধরা পড়লেন ঃ বনী মখযুম ছিল কোরাইশদেরই একটি শাখাগোত্র। সুতরাং চুরির শাস্তি হাত কাটার মত অপমানকর দণ্ড থেকে এ সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলাটিকে রক্ষা করার জন্য কোরাইশ নেতৃবর্গ তদবীর শুরু করলেন। হুযুর (সাঃ)-এর নিতান্ত প্রিয়পাত্র হযরত ওসামাকে সুপারিশ ধরা হল। তিনি খেদমতে হাযির হয়ে স্ত্রীলোকটিকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য আবেদন করলেন। সুপারিশ শুনে হুযুর (সাঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন, "বনী ঈসরাঈল এ অপরাধেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের কোন গরীব লোক অপরাধ করলে তাকে গুরুদণ্ড দেয়া হত এবং কোন বড়লোক গুরুতর অপরাধ করলেও তারা তাকে ক্ষমা করে দিত।[১]

খায়বর দুর্গ বিজয়ের পর সন্ধির শর্ত অনুযায়ী সেখানকার সমস্ত সম্পত্তি মোজাহেদদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়। মোজাহেদগণ এ সমস্ত সম্পত্তি ইহুদী কৃষকদের সঙ্গে ভাগ চাষের বন্দোবস্ত করেন। সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সহল তাঁর চাচাতো ভাই মাহিসাসহ্ ফসলের ভাগ আনার জন্য খায়বরে গেলে এক অসতর্ক মুহূর্তে কে বা কারা তাঁকে হত্যা করে একটি গর্তে ফেলে দেয়। মাহিসা ভাই-এর হত্যার সংবাদ সহ্ ফরিয়াদ নিয়ে দরবারে হাযির হলেন। হুযুর (সাঃ) মাহিসাকে জিজ্ঞেস করলেন, আবদুল্লাহ্কে ইহুদীরাই হত্যা করেছে এ মর্মে তুমি কসম করতে পার? মাহিসা বললেন, আমি স্বচক্ষে দেখিনি। বললেন, তবে ইহুদীদের ডেকে কসম দেয়া হোক? মাহিসা জবাব দিলেন, হুযুর এরা তো একশ' বার মিথ্যা কসমও খেতে পারে। খায়বরে ইহুদী ছাড়া অন্য কোন জাতি বাস করত না। সুতরাং ইহুদীরাই যে আবদুল্লাহ্কে হত্যা করেছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশই ছিল না। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী কোন সাক্ষী না থাকায় হুযুর (সাঃ) ইহুদীদের উপর হত্যার দায়িত্ব না চাপিয়ে বরং আবদুল্লাহ্ ইবনে সাহ্লের পরিবারকে হত্যার ক্ষতিপূরণস্বরূপ বাইতুলমাল থেকে একশ' উট দিয়ে দিলেন।[২]

তারেক মোহারেবী বর্ণনা করেন, চারদিকে যখন ইসলামের ব্যাপক বিস্তার হয়ে গেল, তখন আমরা কিছু সংখ্যক লোক 'রাবযা' থেকে রওয়ানা হয়ে মদীনার উপকণ্ঠে উপনীত হলাম। আমাদের সঙ্গে এক মহিলাও ছিলেন। দেখতে পেলাম, একজন সাদা পোশাক পরিহিত সুদর্শন লোক আমাদের তাঁবুর কাছে এসে সালাম দিলেন। আমরা সালামের উত্তর দিলাম। আমাদের কাছে একটি লোহিত বর্ণের উট ছিল। আগন্তুক উটটির দাম জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা দাম বলার পর তিনি মোটেও দামদস্তুর না করে উটের লাগাম দরে শহরের দিকে চলে গেলেন। উটসহ্ লোকটি দৃষ্টির আড়াল হওয়ার পর আমাদের খেয়াল হল, দাম পরিশোধ

---

১. বোখারী।
২. বোখারী ও নাসায়ী।

না করে একজন অপরিচিত লোকের হাতে উটটি ছেড়ে দেয়া সঙ্গত হয়নি—এ খেয়াল হওয়ার পর আমরা একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগলাম। আমাদের এ দুশ্চিন্তার কথা শুনে সঙ্গের এক মহিলা বললেন, তোমরা অনর্থক দুশ্চিন্তা করো না, আমি জীবনে কোনদিন এমন জ্যোতির্ময় চেহারার লোক দেখিনি। এমন চেহারার লোক কখনও প্রতারক হতে পারে না। এমনি জল্পনা-কল্পনার মধ্যে রাত ঘনিয়ে এল। এমন সময় একজন লোক এসে বলতে লাগলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তোমাদের উটের মূল্য বাবত প্রতিশ্রুত খেজুর এবং উপরন্তু তোমাদের সবার জন্য খানা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় দিন সকাল বেলায় আমরা মদীনায় এসে উপস্থিত হলাম। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তখন মসজিদে ভাষণ দিচ্ছিলেন। আমাদের দেখে জনৈক আনসারী উঠে দাঁড়ালেন এবং নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)! এরা বনূ সা'লাবার লোক। এদের পূর্বপুরুষেরা আমাদের একজন লোককে হত্যা করেছিল। আজ এদের একজনকে ধরে আমাদের সে খুনের বদলা নেয়ার হুকুম দিন।

হুযুর (সাঃ) জবাব দিলেন, "পিতার অপরাধে পুত্রের শাস্তি হতে পারে না।"[১]

সোরাকা নামক জনৈক সাহাবী এক বেদুঈনের কাছ থেকে উট ক্রয় করে তার মূল্য পরিশোধ করলেন না। বেদুঈন তাকে ধরে হুযুর (সাঃ)-এর দরবারে হাযির করল। ঘটনা শুনে হুযুর (সাঃ) উটের মূল্য পরিশোধ করে দিতে বললেন। সাহাবী নিবেদন করলেন, মূল্য পরিশোধ করার মত সামর্থ্য আমার নেই। হুযুর (সাঃ) তখন সে অপরিচিত বেদুঈনকে নির্দেশ দিলেন, তোমার বিবাদীকে বাজারে নিয়ে বিক্রি করে তোমার পাওনা উসুল করে নাও। বেদুঈন তাঁকে নিয়ে বাজারে গেল এবং সত্য সত্যই বিক্রি করে তার পাওনা আদায় করে নিল। অবশ্য সোরাকাকে একজন মহৎপ্রাণ মুসলমান খরিদ করে আযাদ করে দিলেন।[২]

সাহাবী আবু হাদরাদ সলমীর কাছে জনৈক ইহুদীর কিছু পাওনা ছিল। ইহুদী তাঁকে ধরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দরবারে এনে উপস্থিত করল। রায় হল,—এ মুহূর্তেই ইহুদীর ঋণ পরিশোধ করে দিতে হবে। সাহাবী তাঁর অপারগতার কথা নিবেদন করলেন, কিন্তু বার বার তাঁকে একই নির্দেশ দেয়া হল। এ সময় খায়বর অভিযানের আয়োজন চলছিল। সাহাবী আরয করলেন,— হয়ত আসন্ন খায়বর অভিযান থেকে ফিরে এসেই এর কর্জ পরিশোধ করার মত সঙ্গতি হবে। হুযুর (সাঃ) আর হাদরাদের কোন ওযর-আপত্তিতেই কর্ণপাত করলেন না। তার পরিধানের কাপড় খুলে ইহুদীকে দিয়ে দিলেন। এভাবে ঋণ পরিশোধ হওয়ার পর আবু হাদরাদ মাথার পাগড়ি পরে বাড়ি ফিরলেন।[৩]

১. দারে কুতনীঃ ২য় খণ্ড।
২. মুসনাদে আহমদ ঃ ৩য় খণ্ড।
৩. আবু দাউদ ঃ ২য় খণ্ড।

ন্যায়বিচারের নযীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করার ফলেই মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে চিরশত্রু ইহুদীরাও তাদের সকল মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করার জন্য হুযুর (সাঃ)-এর দরবারে হাযির হত। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থের বিধান অনুযায়ী তাদের মামলা-মোকদ্দমার বিচার করা হত।[১] কোরআন শরীফেও ইহুদীদের বিচার নিষ্পত্তি সম্পর্কে উল্লেখ দেখা যায়। ইসলামপূর্ব যুগে মদীনার প্রখ্যাত দু'টি ইহুদী গোত্র বনী নযীর ও বনূ কোরাইযার মধ্যে মান-মর্যাদার এক অদ্ভূত সীমারেখা বিদ্যমান ছিল। বনূ কোরাইযার কোন ব্যক্তি যদি বনী নযীরের কাউকে হত্যা করত, তবে বিচারে তার প্রাণদণ্ড হত। কিন্তু বনী নযীরের কেউ যদি বনূ কোরাইযার কোন লোককে হত্যা করত, তবে একশ' উটের বোঝা পরিমাণ খেজুর নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশানকে দণ্ড বাবত প্রদান করতে হত। মদীনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর এ ধরনের একটি হত্যাকাণ্ডের বিচার পেশ হলে হুযুর (সাঃ) তওরাতের নির্দেশ মোতাবেক, "জানের বদলায় জান" অর্থাৎ দু' গোত্রের মধ্যেই হত্যার সমান দণ্ড প্রযোজ্য বলে ঘোষণা করে দিলেন।[২]

ন্যায়বিচারের সর্বাপেক্ষা নাযুক স্তর হল আপনজন এমন কি, নিজের উপর পর্যন্ত বিনা দ্বিধায় ইনসাফের দণ্ড প্রয়োগ করা। একদিন হুযুর (সাঃ) প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে গনীমতের মাল বন্টন করছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। লোকটিকে সরানোর জন্য হাতের ছড়ি দ্বারা সামান্য খোঁচা দিলেন। ঘটনাক্রমে ছড়ির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের আঘাতে তার মুখমণ্ডলের একস্থানে সামান্য চামড়া উঠে রক্ত বেরিয়ে পড়ল। হুযুর (সাঃ) তৎক্ষণাৎ লোকটিকে তুলে তার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এরশাদ করলেন, "এ আঘাতের প্রতিশোধ গ্রহণ কর। আমি হাজির।" কিন্তু লোকটি লজ্জিত হয়ে নিবেদন করলেন, "ইয়া রসুলাল্লাহ (সাঃ) আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম।"[৩]

শেষ রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায়ও হুযুর (সাঃ) সাহাবিদের একত্রিত করে ঘোষণা করেছিলেন, -যদি আমার কাছে কারও পাওনা থাকে অথবা আমার দ্বারা যদি কখনও কারও জান-মাল, মান-সম্মানে কোন আঘাত এসে থাকে, তবে এ সময় তোমরা তার বদলা নিয়ে নাও। কাল হাশরে যেন কেউ এ দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়ো না। বিরাট জনতার মধ্যে শুধু এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নিবেদন করলেন, তাঁর কয়েকটি দেরহাম পাওনা আছে। সঙ্গে সঙ্গেই তা পরিশোধ করে দেয়া হল। কিন্তু এ ছাড়া আর কেউ কোনরূপ দাবি উত্থাপন করতে এলো না।[৪]

১. আবু দাউদ ঃ দণ্ডবিধি।
২. আবু দাউদ।
৩. ইবনে ইসহাক, হিশাম।
৪. বোখারী শরীফ ঃ ওহী নাযিল প্রসঙ্গ।

দানশীলতা ঃ দানশীলতা ছিল হুযুর (সাঃ)-এর প্রকৃতিগত অভ্যাস। হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা, "রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ছিলেন সর্বাপেক্ষা অধিক দানশীল এবং রমযান মাসে তাঁর দানশীলতা প্রভাত সমীরণের ব্যাপকতাকেও ছাড়িয়ে যেত।[১] "না" বলে কোন প্রার্থীর প্রসারিত হাত ফিরিয়ে দিয়েছেন—সারা জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি।[২]

যবান মোবারকে উচ্চারিত হত ঃ

"আমি শুধুমাত্র রক্ষণাবেক্ষণ ও বন্টন করে থাকি,— দেন আল্লাহ্।"[৩]

একবার জনৈক বেদুঈন এসে দেখতে পেল, হুযুর (সাঃ)-এর সামনে একটি বৃহৎ ছাগলের পাল রয়েছে। সে তার অভাবের কথা নিবেদন করার সঙ্গে সঙ্গে গোটা ছাগল পালটিই তাকে দিয়ে দিলেন। বেদুঈন তার গোত্রে ফিরে গিয়ে প্রচার করতে লাগল, "তোমরা সকলে ইসলাম গ্রহণ কর। মুহাম্মদ (সাঃ) এমন একজন উদার লোক যে নিজে দরিদ্র হয়ে যাবেন এরূপ ভয় না করেই মুক্তহস্তে দান করতে থাকেন।"[৪]

একবার এক ব্যক্তি এসে কিছু প্রার্থনা করল। এ সময় হাতে কিছুই ছিল না। বললেন, আমার হাতে তো কিছু নেই, তবে তুমি আমার সঙ্গে আসতে থাক। হযরত ওমর সঙ্গে ছিলেন, বললেন, আপনার হাতে যখন কিছুই নেই, সুতরাং এ লোকের কোন দায়-দায়িত্ব তো আপনার উপর বর্তায় না!" সঙ্গে অন্য একজন সাহাবী ছিলেন, তিনি নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাঃ),! আপনি নিঃসঙ্কচিত্তে দিয়ে যেতে থাকুন। আরশের মালিক আল্লাহ্ কখনও আপনাকে পর-মুখাপেক্ষী করবেন না।" একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র চেহারা-মোবারক আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠল।[৫]

মহানবী (সাঃ) এমন উদার ছিলেন যে কেউ কিছু সওয়াল করলে তাকে কিছু না কিছু অবশ্যই দিতেন। হাতের কাছে কিছু না থাকলে পরে দেয়ার জন্য অঙ্গীকার করতেন। এর ফলে লোকজন এমন ভয়লেশ শূন্য হয়ে পড়েছিল যে একবার নামাযে দাঁড়ানোর সময় জনৈক বেদুঈন এসে চাদর জড়িয়ে ধরল। সে বলতে লাগল, "আমার আরও একটা প্রয়োজন রয়ে গেছে। পরে হয়ত ভুলে যাব, তাই এক্ষণই এসে তা পূরণ করে দিয়ে যান।" হুযুর (সাঃ) বিনা বাক্য ব্যয়ে তার সঙ্গেই চলে গেলেন এবং তার প্রয়োজন মিটিয়ে এসে নামায পড়লেন।[৬]

১. ইবনে ইসহাক ও ইবনে হিশাম।
২. বোখারী শরীফ ঃ আদব অধ্যায়।
৩. বোখারী শরীফ।
৪. মুসলিম শরীফ ঃ ২য় খণ্ড।
৫. আদাবুল মুফরাদ, বোখারী।
৬. বোখারী শরীফ ঃ প্রথম খণ্ড।

কোন কোন সময় কারো কাছ থেকে কোন কিছু খরিদ করে আবার তাকেই তা দিয়ে দিতেন। এক সময় হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছ থেকে একটি উট খরিদ করে সঙ্গে সঙ্গেই তা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরকে দিয়ে দিলেন। হযরত জাবের-এর সঙ্গেও এমন এক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।[১]

নিতান্ত সাধারণ খাদ্যবস্তুও একা খেতেন না; উপস্থিত সকল সাহাবীকে নিয়ে তা খেতেন। কোন এক যুদ্ধে একশ ত্রিশজন সাহাবী হযরত নবী করীমের (সাঃ) সঙ্গে ছিলেন। একদিন একটি ছাগল জবেহ্ করে কলিজাটি ভুনা করালেন। এ একটি মাত্র কলিজার ভুনা একেক টুকরা করে সকলের মধ্যে বণ্টন করলেন, এমন কি, যাঁরা তখন অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁদের জন্যে তার ভাগ সযত্নে রেখে দিলেন।[২]

কোন সামগ্রী হাতে এলে তা সম্পূর্ণরূপে বণ্টন না করা পর্যন্ত হুযুর (সাঃ) স্বস্তি লাভ করতেন না; ক্রমাগত অস্বস্তি অনুভব করতেন। উম্মুল মো'মেনীন হযরত উম্মে সালমা বর্ণনা করেন, একদিন হুযুর (সাঃ) ঘরে এলে আমি তাঁর পবিত্র চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ লক্ষ্য করে কারণ জানতে চাইলাম। জবাব দিলেন, গতকাল সাতটি স্বর্ণমুদ্রা হাতে এসেছিল আজও সেগুলো রয়ে গেছে।[৩]

হযরত আবু যর (রাঃ) বর্ণনা করেন, কোন এক রাতে আমি হুযুর (সাঃ)-এর সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিলাম। এক সময় এরশাদ করলেন, "আবু যর! সামনের ওহুদ পর্বতটিও যদি সোনা হয়ে আমার হাতে আসে, তবুও আমি ঋণ পরিশোধের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড়া তিন দিনের বেশি এক কানাকড়িও হাতে রাখব না।"[৪]

অনেক সময় এমন হত যে নগদ কোন কিছু হাতে এলে তা সম্পূর্ণরূপে খয়রাত না করা পর্যন্ত আরামে শুতেন না। একবার ফেদাকের গোত্রপতি চারটি উট বোঝাই খাদ্যশস্য উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন। হযরত বেলাল সে শস্য বিক্রি করে জনৈক ইহুদীর পাওনা ঋণ পরিশোধ করে দিলেন। বাজার থেকে ফিরে তিনি এ সংবাদ নিবেদন করলেন। হুযুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ঋণ পরিশোধ করার পর কি কিছু অবশিষ্ট নেই? বেলাল (রাঃ) জবাব দিলেন, অল্প কিছু বেঁচে গেছে। নির্দেশ দিলেন, খয়রাত করে দাও। যতক্ষণ কিছু অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ আমি ঘরে গিয়ে আরাম করতে পারব না। বেলাল (রাঃ) নিবেদন করলেন, কোন সায়েল যে পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং সে রাত্রে হুযুর (সাঃ) মসজিদেই কাটিয়ে দিলেন। পরদিন ভোরে হযরত বেলাল যখন খবর দিলেন যে আল্লাহ্ আপনাকে দায়মুক্ত করেছেন, তখন আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে বাড়ির ভেতর তশরীফ নিয়ে গেলেন।[৫]

---

১. বোখারী শরীফ।
২. মুসলিম ২য় খণ্ড, মুসনাদে আহমদ।
৩. বোখারী শরীফ।
৪. বোখারী শরীফ।
৫. বোখারী শরীফ।

একদিন আসরের নামায পড়ার পর দ্রুত বাড়ির ভেতর গিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই পুনরায় মসজিদে ফিরে এলেন। সাধারণ নিয়মের বিপরীত এ আচরণ লক্ষ্য করে সাহাবিগণ কারণ জানতে চাইলে জবাব দিলেন, নামায পড়ার সময় খেয়াল হল, ঘরে কিছু সোনা রয়ে গেছে। রাত পর্যন্ত তা পড়ে থাকতে পারে, তাই তাড়াতাড়ি গিয়ে বলে এলাম, যেন যথাসম্ভব শীঘ্র তা খয়রাত করে দেয়া হয়।[১]

হুনাইনের যুদ্ধে যা কিছু পাওয়া যায় তা নিঃশেষে খয়রাত করে দিয়েছিলেন। পথের পাশের বেদুঈনরা খবর পেল যে আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) এ পথেই প্রত্যাবর্তন করছেন। কিছু পাওয়ার আশায় তারা এক স্থানে এসে ভিড় করল। তাদের দেয়ার মত কোন কিছুই তখন হাতে ছিল না। কিন্তু নাছোড়বান্দারা পিছ ছাড়ল না। শেষ পর্যন্ত হযরত নবী করীম (সাঃ) তাদের হাত থেকে নিস্তার লাভ করার জন্যে একটি গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন। বেদুঈনের কয়েকজন চাদর ধরে তাঁকে এমনভাবে টানল যে গায়ের পবিত্র চাদরখানা তাদের হাতেই চলে গেল। হুযুর (সাঃ) তখন তাদের ডেকে বলতে লাগলেন, আমার চাদর ফিরিয়ে দাও, আল্লাহ্‌র কসম, আজ যদি এ বনের যতগুলো গাছ আছে, ততগুলো উটও আমার সঙ্গে থাকত তবুও সবগুলোই আমি তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দিতাম। আমাকে তোমরা কৃপণ বা কাপুরুষ দেখতে না।[২]

হুযুর (সাঃ) সাধারণভাবে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে কোন মুসলমান যদি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায়, তবে আমাকে খবর দিও, আমি নিজের তরফ থেকে তার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দেব। সে যা কিছু রেখে যায়, সে সবকিছুই তার ওয়ারিশানের প্রাপ্য হবে, এ সবের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না।[৩]

একদা হুযুর (সাঃ) সাহাবিগণসহ বসে আছেন, এমন সময় জনৈক বেদুঈন এসে চাদর টেনে ধরল এবং তার স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষ ভাষায় বলতে লাগল, মোহাম্মদ (সাঃ)! এ মাল যা কিছু আছে তা আপনারও নয় আপনার পিতৃপুরুষেরও নয়। সুতরাং আমাকে এর মধ্য থেকে একটি উট বোঝাই করে দিন। হুযুর (সাঃ) তৎক্ষণাৎ খাদ্যশস্য দিয়ে তার একটি উট বোঝাই করে বিদায় করলেন।[৪]

একবার বাহ্‌রাইন থেকে রাজস্ব এসে পৌছাল। এত অধিক পরিমাণ অর্থ ইতিপূর্বে আর কখনও বাইতুলমালে এসে জমা হয়নি। হুকুম দিলেন, সমস্ত সম্পদ এনে মসজিদের বারান্দায় স্তূপীকৃত করে রাখ। তা করা হল। নামাযের

১. বোখারী শরীফ।
২. বোখারী শরীফ।
৩. বোখারী শরীফ।
৪. আবু দাউদ আদব অধ্যায়।

সময় হুযুর (সাঃ) এলেন, কিন্তু বারান্দায় স্তূপীকৃত টাকাকড়ির দিকে ফিরেও তাকালেন না। নামায শেষে সোজা এসে সে সমস্ত টাকা-পয়সা দু' হাতে বণ্টন করতে লাগলেন। সামনে যাকে পেলেন তাকেই দিতে থাকলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) বদর যুদ্ধের পর নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে এত দিলেন যে হযরত আব্বাসের পক্ষে সে গাঁটরী বয়ে নেয়া কষ্টকর মনে হল। এমনিভাবে অন্যান্যদেরও দিতে দিতে যখন সব শেষ হয়ে গেল, তখন কাপড় ঝেড়ে সেস্থান ত্যাগ করলেন।[১]

ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের বিধানমতে মুক্তিপ্রাপ্ত কোন গোলাম মারা গেলে তার কোন ওয়ারিশ না থাকলে সমস্ত সম্পত্তি তার মুক্তিদানকারী মালিকের প্রাপ্য হয়। হুযুর (সাঃ) কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত এমনি এক গোলামের মৃত্যু হলে তাঁর সমস্ত সম্পদ এনে হাজির করা হল। হুযুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, মৃতের জন্মভূমির কোন লোকও কি পাওয়া গেল না? লোকেরা জবাব দিল, হাঁ অমুকস্থানে তার একই গ্রামের একজন লোক বাস করে বলে জানা গেছে। তখন নির্দেশ দিলেন, "যাও, এ সমস্ত মাল-সামান সে লোকটিকে দিয়ে দাও।"[২]

একবার আনসারদের কিছু লোক এসে সাহায্য চাইলেন। হুযুর (সাঃ) তাদের কিছু দিলেন। তারা তারপরও কিছু চাইলেন এবং হুযুর (সাঃ)-ও দিয়ে যেতে থাকলেন। শেষবার বললেন, মনে রেখো, আমার কাছে যা কিছু আসে, তা তোমাদের চোখের আড়ালে আমি জমা করি না।[৩]

ত্যাগ ঃ হুযুর (সাঃ)-এর চরিত্রে যে গুণটি সর্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠত, তা ছিল অপূর্ব ত্যাগ-তিতিক্ষা। সন্তানদের প্রতি তাঁর মমতা ছিল সীমাহীন। তন্মধ্যে হযরত ফাতেমার স্থান ছিল সর্বোচ্চে। তিনি কখনও খেদমতে হাজির হলে হুযুর (সাঃ)-এর চেহারা মোবারক আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। আনন্দাতিশয্যে উঠে দাঁড়াতেন, তাঁর ললাট চুম্বন করতেন এবং পাশে বসাতেন। অথচ হযরত ফাতেমা (রাঃ) এমন কঠিন দারিদ্রের মধ্যে জীবনযাপন করতেন যে তাঁর ঘরে কোন চাকরানী ছিল না। তিনি নিজেই আটার চাক্কি পিষতেন, মশক ভরে পানি তুলে আনতেন। চাক্কি পিষতে পিষতে দু হাতে 'কড়া' পড়ে গিয়েছিল। মশক তুলতে তুলতে বুকে নীল দাগ পড়ে গিয়েছিল। একদিন পিতার খেদমতে এসে একটি কাজের লোক প্রার্থনা করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু লজ্জা-সংকোচ কাটিয়ে কথাটি তিনি পেশ করতে পারলেন না। হযরত আলীই (রাঃ) কথাটা তুললেন। মাত্র কয়েকদিন আগেই কোন এক যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সঙ্গে কয়েকটি

---

১. বোখারী শরীফ ঃ ২য় খণ্ড।
২. বোখারী শরীফ।
৩. বোখারী শরীফ সদকা অধ্যায়।

দাসীও এসেছিল, তারই মধ্য থেকে একটি দাসীর জন্যে আবেদন করলেন। হুযুর (সাঃ) জবাব দিলেন, দেখ! এখনও আসহাবে-সুফ্‌ফার ছিন্নমূল লোকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়নি। যে পর্যন্ত এদের কোন সুব্যবস্থা করা না যাবে, সে পর্যন্ত তোমাদের জন্যে আমি কিছুই করতে পারব না।[১]

অন্য এক বর্ণনায় আছে,— কোন যুদ্ধের পর হযরত ফাতেমা (রাঃ) এবং হযরত যুবাইরের কন্যাগণ হাযির হয়ে তাঁদের অভাব ও দারিদ্রের কথা নিবেদন করে যুদ্ধলব্ধ বাঁদীদের মধ্য থেকে দু'একটি তাদের দেয়ার জন্যে আবেদন করলেন। হুযুর (সাঃ) এই বলে তাদের নিবৃত করলেন যে বদরের এতীমগণ তোমাদের আগেই আবেদন করে রেখেছে। তাদের দাবি তোমাদের তুলনায় অগ্রগণ্য।

এক সময় হযরত আলী (রাঃ) কোন কিছুর জন্যে আবেদন করলে এরশাদ করেছিলেন, "তোমাকে কিছু দেব আর সুফফার ছিন্নমূল লোকেরা ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করে বেড়াবে, তা কখনও হতে পারে না।[২]

একবার এক মহিলা একটি চাদর এনে খেদমতে পেশ করল। প্রয়োজন ছিল, তাই তা গ্রহণ করে গায়ে দিলেন। কাছেই একটি লোক বসেছিলেন, তিনি বলতে লাগলেন, "চাদরটি সত্যই ভারি চমৎকার!" সঙ্গে সঙ্গে সেটি খুলে তাকে দিয়ে দিলেন। হুযুর (সাঃ) মজলিস থেকে উঠে চলে যাওয়ার পর লোকেরা ভর্ৎসনা করে বলতে শুরু করলেন, হুযুর (সাঃ)-এরই চাদরের প্রয়োজন ছিল, আর তুমি জান যে তিনি কোন প্রার্থীকেই ফেরান না, সুতরাং তোমার পক্ষে কি এ সময় মুখ খোলা উচিত হল? লোকটি জবাব দিলেন, "আমি সব জানি, তবুও শুধু বরকত হাছিলের আশায় আমি এ কাজ করেছি। আমার আকাঙ্ক্ষা যেন এ চাদর দ্বারাই আমাকে কাফন দেয়া হয়।"

কত কষ্টেই না হুযুর (সাঃ)-এর জীবনযাত্রা চলত! তৃতীয় হিজরীর পর থেকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদপ্রাপ্তি শুরু হওয়ার পর প্রচুর সম্পদ হাতে আসত, কিন্তু এত কিছুর পরও নিজের প্রয়োজনের কথা মোটেও স্মরণ না করে অপরের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়ার ফলেই জীবনযাত্রায় কোন পরিবর্তন আসেনি।

আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিল ফলবান বাগ-বাগিচা। তৃতীয় হিজরীতে মুখাইরাক নামক বনী নযীর গোত্রীয় এক ইহুদী মৃত্যুর সময় অত্যন্ত উৎকৃষ্ট সাতটি বাগান হুযুর (সাঃ)-এর জন্যে ওয়াক্‌ফ করে যান। বাগান কয়টির নাম ছিল— মুশাইয়াব, সানেকা, দাল্লাল, জেসাইনী, বারকা, আওয়াফ মাশরাবায়ে ও

---

১. আবু দাউদ ঃ অন্য এক বর্ণনায় আছে, হুযুর (সাঃ) এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ফাতেমাকে একটি দোয়া শিখিয়ে বলেছিলেন, এ দোয়া পড়তে থেকো। দাসী-বাঁদীর চাইতেও তা বহুগুণে উত্তম।

২. মুসনাদে আহমদ।

উম্মে ইবরাহীম। কিন্তু, এ কষ্টের জীবনেও হুযুর (সাঃ) বাগানগুলোর একটিও নিজের জন্যে না রেখে ছিন্নমূল দরিদ্রদের কল্যাণে ওয়াকফ করে দেন। শেষ পর্যন্ত বাগানগুলোর আয় গরীব-মিছকীনদের মধ্যেই বণ্টিত হত।[১]

জনৈক সাহাবী ওলীমার খানার জন্যে কিছু সাহায্য চাইতে এলেন। হুযুর (সাঃ) তাঁকে বলে দিলেন "আয়েশার ঘরে এক টুকরী আটা আছে, তাই চেয়ে নাও। সাহাবী কথামত আটা নিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু খোদ হুযুর (সাঃ)-এর ঘরে এ আটাটুকু ছাড়া খাবার আর কিছুই ছিল না।[২]

একরাত্রে গেফার গোত্রের এক ব্যক্তি মেহমান হলেন। ঘরে সামান্য বকরির দুধ ছিল, হুযুর (সাঃ) তাই এনে মেহমানকে খাওয়ালেন। সে রাতে পরিবারের সবাইকে উপবাসে কাটাতে হল। শুধু তাই নয়, এর পূর্ব রাতেও ঘরের সবাই উপবাসে ছিলেন।[৩]

আতিথেয়তা ঃ আরবের প্রতিটি এলাকা থেকে দলে দলে লোক এসে হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে সমবেত হত। মহিলা সাহাবী হযরত রমলার ঘরে অধিকাংশ অতিথির থাকার ব্যবস্থা হত। উম্মে সোরাইক নাম্নী জনৈকা বিত্তবান আনসার মহিলাও অত্যন্ত উদারতার সঙ্গে হুযুর (সাঃ)-এর মেহমানদের খেদমত করতেন। বিশিষ্ট লোকেরা এসে মসজিদে নববীতে অবস্থান করতেন। সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদল মসজিদে নববীতেই উঠলেন। এ সমস্ত মেহমানকে হুযুর (সাঃ) নিজে আপ্যায়ন করতেন, এমন কি, তাঁদের সেবা যত্নও নিজহাতেই করতেন। এমনিতেও যারাই খেদমতে হাজির হতেন তাদের সবাইকে কিছু না কিছু না খাইয়ে ছাড়তেন না।[৪]

আতিথেয়তার ক্ষেত্রে কাফের মুশরেক বা মুসলমানের কোন পার্থক্য করা হত না। অনেক অ-মুসলমান এসেও নিঃসঙ্কোচে মেহমান হত। হুযুর (সাঃ) সবাইকে সমভাবে গ্রহণ করতেন এবং আন্তরিকভাবে আপ্যায়ন করতেন। হাবশার প্রতিনিধি দলকে নিজের কাছে রেখে হুযুর (সাঃ) অত্যন্ত উদারচিত্তে তাঁদের সেবা-যত্ন করেছিলেন।[৫]

একবার এক কাফের এসে মেহমান হল। হুযুর (সাঃ) একটি ছাগল দোহন করে তাকে খেতে দিলেন। সে এক চুমুকেই সবটুকু দুধ খেয়ে ফেলল। তারপর আর একটি ছাগল দোহন করে আনা হল এবং একইভাবে পর্যায়ক্রমে সাতটি ছাগলের দুধ খাওয়ানোর পরও সে তৃপ্ত হল না। কিন্তু হুযুর (সাঃ) অম্লান বদনে তাকে দুধ পান করাতে থাকলেন।[৬]

১. এসাবা মুখ[illegible]রাক প্রসঙ্গ।
২. মুসনাদে আ[illegible]মদ, ৪র্থ খণ্ড।
৩. মুসনাদে আ[illegible]দ, ২য় খণ্ড।
৪. আহমদ [illegible] ক্রুকদের সম্পর্কিত আলোচনা।
৫. শেফা-ক[illegible]া আয়ায।
৬. মুসলিম শরীফ।

কোন কোন দিন মেহমানদারী করতে গিয়ে ঘরের সমস্ত খাবার শেষ হয়ে যেত এবং খোদ হুযুর (সাঃ) রাতে উঠে মেহমানদের খোঁজ-খবর নিতেন।[১]

সাহাবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অভাবগ্রস্ত এবং অসহায় ছিলেন আসহাবে সুফ্ফার দল। এঁরা সবাই মুসলমানদের সাধারণ মেহমান ছিলেন। তবে অধিকাংশ সময়ই খোদ হুযুর (সাঃ)-এর মেহমান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতেন। একদিন ঘোষণা করলেন— যার ঘরে দুজনকে খাওয়ানোর মত সঙ্গতি আছে তিনি তিনজন এবং যার তিন জনের সঙ্গতি আছে তিনি চারজন এবং যার চারজনের সঙ্গতি আছে, তিনি যেন পাঁচজন মেহমান সঙ্গে নিয়ে যান। হযরত আবু বকর (রাঃ) তিনজন সঙ্গে নিলেন এবং খোদ হুযুর (সাঃ) দশজন মেহমান নিয়ে বাড়ি গেলেন।[২]

আসহাবে সুফফার অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) তাঁর সে কৃচ্ছ্রতার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বর্ণনা করেন, একদিন ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে রাস্তার একপাশে বসে পড়লাম। এমন সময় হযরত আবু বকরকে যেতে দেখে আমার অবস্থার কথা পরোক্ষভাবে বুঝাবার জন্যে আমি তার নিকট কোরআন শরীফের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু তিনি আমার অবস্থা বুঝতে পারলেন না, সোজা চলে গেলেন। তারপর হযরত ওমরকে দেখলাম। তাঁর সঙ্গেও ঠিক একই ব্যাপার হল। এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আসতে দেখলাম। তিনি আমাকে দেখেই মুচকি হেসে বললেন, আমার সঙ্গে আস। বাড়ি পৌঁছেই দুধ ভর্তি একটি পাত্র দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করে জানা গেল, কে যেন এ দুধ হাদিয়াস্বরূপ রেখে গেছেন। আমাকে নির্দেশ দিলেন— আসহাবে-সুফফার সবাইকে ডেকে আন। আমরা সবাই সমবেত হলে দুধের পাত্রটি আমার হাতে দিয়ে এরশাদ করলেন, সবার মধ্যে বণ্টন করে দাও।[৩]

হুযুর (সাঃ)-এর ঘরে এমন বড় একটি পাত্র ছিল যে তা তুলতে চারজন লোকের প্রয়োজন হত। দুপুর বেলা সে পাত্রটি ভরে বাইরে সুফ্ফার লোকজনের জন্যে খানা আসত। সে খানার মাঝে মাঝে এত ভিড় হত যে খোদ হুযুর (সাঃ)-কে পর্যন্ত উপড়ি পায়ে বসে অন্যের জন্যে স্থান করে দিতে হত।[৪]

সাহাবী হযরত মেকদাদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি এবং আমার অন্য দুজন সঙ্গী এত দরিদ্র ছিলাম যে অভুক্ত থাকতে থাকতে শেষ পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেল। আমাদের প্রতিপালনের জন্যে অনেকের নিকট আবেদন করে

১. আবু দাউদঃ আদব অধ্যায়।
২. মুসলিম শরীফ।
৩. তিরমিযী।
৪. আবু দাউদঃ খানা অধ্যায়।

ব্যর্থ হওয়ার পর আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আবেদন পেশ করলাম। হুযুর (সাঃ) আমাদের দূরবস্থা দেখে আমাদেরকে বাড়ি নিয়ে গেলেন এবং তিনটি বকরী দেখিয়ে এরশাদ করলেন, এ তিনটি বকরী দোহন করে তিনজনে পান করতে থাক। এ তিনটি ছাগলের দুধ পান করেই আমাদের তিনজনের দিন কেটে যেতে লাগল।[১]

একদিন আসহাবে-সুফ্ফার সবাইকে নিয়ে হযরত আয়েশার ঘরে তশরিফ নিলেন এবং সবার জন্যে খানা পরিবেশন করার নির্দেশ দিলেন। ভেতর থেকে সদ্য পাকানো কিছু খানা আসল। তারপর আরও কিছু আনার জন্যে হুকুম হলে শুকনো খেজুরের 'হারীরা' এনে হাজির করা হল। সবশেষে বড় পাত্রে করে সবার জন্যে দুধ আনা হল। সর্বসাকুল্যে এ তিন রকম খাদ্যবস্তু দ্বারাই হুযুর (সাঃ) সবার জন্যে তৃপ্তিজনক মেহমানদারীর এন্তেজাম করলেন।[২]

ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি ঘৃণাঃ সর্বদা সর্বত্রই হুযুর (সাঃ)-এর অনুগ্রহবারি অবিরাম বর্ষিত হতে থাকত বটে, তবে সামান্য বিপদে বা অকারণে হাত পাতা অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। এরশাদ করতেন, মানুষের কাছে হাত পেতে খাওয়ার চাইতে কাঠ কুড়িয়ে তার বিক্রয়লব্ধ অর্থে ইজ্জত-আবরু রক্ষা করা কতই না উত্তম কর্ম![৩]

একবার এক আনসারী এসে কিছু সওয়াল করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি কিছু নেই? তিনি বললেন, শুধুমাত্র একটি কম্বল আছে, যার এক অংশ বিছিয়ে এবং অন্য অংশ গায়ে দিয়ে রাত কাটাতে হয়। আর পানি খাওয়ার একটি পেয়ালা আছে। হুযুর (সাঃ) তাঁর এ দু'টি সম্বলই আনালেন এবং বলতে লাগলেন, কে এগুলো খরিদ করবে? একজন দু'দেরহাম দাম করলেন। হুযুর (সাঃ) পুনরায় ডেকে বললেন, কেউ কি এর চাইতে বেশি দাম দিতে রাজী আছ? অন্য একজন দ্বিগুণ দাম বললে তাকেই ডেকে দিলেন এবং দেরহাম কয়টি আনসারীর হাতে দিয়ে বললেন, এর দ্বারা কিছু খাদ্য এবং দড়ি খরিদ কর। দড়ি নিয়ে শহরের বাইরে যাও ও লাক্ড়ী সংগ্রহ্ করে এনে বাজারে বিক্রি করতে থাক। পনের দিন পর সে সাহাবী পুনরায় খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন, খরচপত্র বাদেও তাঁর হাতে এখন দশ দেরহাম সঞ্চয় হয়েছে। সেগুলোর দ্বারা তিনি কিছু প্রয়োজনীয় শস্য এবং কাপড় খরিদ করে আনলেন। হুযুর (সাঃ) তাকে সম্বোধন করে এরশাদ করলেন, হাশরের ময়দানে ভিক্ষাবৃত্তিজনিত গ্লানির চিহ্ন মুখে নিয়ে ওঠার চাইতে তোমার এ পেশা অনেক গুণে উত্তম নয় কি?[৪]

১. মুসলিম শরীফ।
২. আবু দাউদ।
৩. বোখারী শরীফ ঃ সদকা অধ্যায়।
৪. আবু দাউদ ঃ তিরমিযী সদকা অধ্যায়।

একবার কয়েকজন দরিদ্র আনসারী এসে কিছু সওয়াল করলে হুযুর (সাঃ) তাদের কিছু দিলেন। তারা বার বার সওয়াল করতে থাকলেন। যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ এ সওয়ালকারীদের দিতে থাকলেন। কিন্তু যখন সব শেষ হয়ে গেল, তখন বললেন, "দেখ! আমার হাতে যতক্ষণ কিছু থাকবে, আমি কখনও তা তোমাদের না দিয়ে সঞ্চয় করতে চেষ্টা করব না। তবে মনে রেখো, যদি কেউ ভিক্ষার ন্যায় লাঞ্ছনাকর কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে, তবে আল্লাহ্ পাক তাকে তা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। যে ব্যক্তি আত্মনির্ভরশীলতার জন্যে দোয়া করতে থাকে, আল্লাহ্ তাকে আত্মনির্ভরশীল করে দেন এবং যে কষ্টে পড়েও সবর করে, আল্লাহ্ তাকে সাবের বানিয়ে দেন। সবরের চাইতে উত্তম এবং ব্যাপক কোন সম্পদ আর কিছু হতে পারে না।[১]

হাকীম ইবনে হাযাম মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। একবার তিনি এসে কিছু সওয়াল করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে কিছু দিলেন। কিছুদিন পর পুনরায় এসে সওয়াল করলেন। এবারও কিছু দেয়া হল। কিছুদিন পর পুনরায় এসে হাজির হলে এবারও তাঁকে কিছু দিলেন এবং বললেন, দেখ হাকীম, টাকা-পয়সা সবুজ মিষ্ট জিনিস। যারা আত্মনির্ভরতার জন্যে তা গ্রহণ করে তারা তাতে বরকত পায়। আর যারা লোভের বশবর্তী হয়ে সম্পদ আহরণে লেগে যায়, তারা বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। তার মিছাল হল সে ব্যক্তির মত, যে খেতে থাকে, কিন্তু তৃপ্ত হয় না। মনে রেখো, উপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম। হুযুর (সাঃ)-এর এ নসীহত সাহাবী হাকীমের উপর এমন আসর করল যে অবশিষ্ট জীবনে কোনদিন তিনি কারো কাছে কোন মামুলি বস্তুর জন্যেও হাত বাড়াননি।[২]

বিদায় হজের সময় হুযুর (সাঃ) সদকার মালামাল বণ্টন করছিলেন। এর মধ্যে দুজন সুস্থ-সবল প্রার্থী এসে দাঁড়াল। এদের দেখে বললেন, যদি তোমরা চাও আমি দিতে পারি, তবে কর্মক্ষম সুস্থ-সবল লোকদের জন্যে এ সদকার মাল নয়।[৩]

কাবীসা নামক জনৈক সাহাবী ঋণের ভারে জর্জরিত হয়ে খেদমতে হাজির হলেন এবং কিছু সাহায্য চাইলেন। হুযুর (সাঃ) তাঁকে ঋণমুক্ত করার আশ্বাস দিলে বললেন,"দেখ কাবীসা! সওয়াল করা বা মানুষের সামনে হাত-পাতা শুধু মাত্র তিন রকম লোকের জন্যেই জায়েয। যদি কেউ ঋণের ভারে জর্জরিত নিরুপায় হয়ে পড়ে, তবে সে ঋণ পরিশোধ করার জন্যে অন্যের কাছে হাত

১. বোখারী ঃ সদকা অধ্যায়।
২. বোখারী ঃ সদকা অধ্যায়।
৩. আবু দাউদ ঃ যাকাৎ অধ্যায়।

পাততে পারে। কিন্তু ঋণের দায় থেকে মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিরত হতে হবে। দ্বিতীয়ত, যদি কেউ হঠাৎ কোন বিপদে পড়ে তার সমস্ত সহায়-সম্পদ হারিয়ে ফেলে তবে এ আকস্মিক বিপদ থেকে কিছুটা সোজা হওয়ার জন্যে তার পক্ষে সওয়াল করা জায়েয। তৃতীয়ত, যদি কোন লোক উপবাসী হয় এবং মহল্লার অন্তত তিনজন সাক্ষী দেয় যে সত্য সত্যই সে উপবাসী,—তবে তার পক্ষে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে সওয়াল করা জায়েয হতে পারে। এ তিন ধরনের লোক ছাড়া যদি কেউ অন্যের নিকট হাত পেতে কিছু গ্রহণ করে, তবে সে হারাম খায়।"[১]

সদকা সম্পর্কে সাবধানতা ঃ হুযুর (সাঃ) নিজের বা পরিবারের কারও জন্যে সদকার মাল গ্রহণ করা অত্যন্ত গ্লানিকর বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন, "অনেক সময় আমি ঘরে এসে দেখি, বিছানায় পাকা খেজুর পড়ে আছে। ইচ্ছা করে তা তুলে নিয়ে মুখে দেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যখন মনে হয়, এগুলো সদকার খেজুর নয় তো? তাই সে সমস্ত খেজুর হাতে নিয়েও রেখে দেই।"[২]

একবার রাস্তায় চলার সময় একটি খেজুর পেয়ে হাতে তুলে নিলেন এবং বলতে লাগলেন, এটি সদকার খেজুর হতে পারে, এমন সন্দেহ না থাকলে আমি একটি খেয়ে ফেলতাম।[৩]

একবার বালক হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) সদকার খেজুর থেকে একটি খেজুর তুলে মুখে দিলে হুযুর (সাঃ) তাঁকে ভর্ৎসনা করে বললেন, তুমি জান না যে আমাদের খান্দানের কারও পক্ষে সদকার কোন কিছু খেতে নেই? অতঃপর সে খেজুরটি উদ্গিরণ করে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।"

কেউ কোন জিনিস নিয়ে হাজির হলে হুযুর (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করতেন, সেটি সদকা না তোহ্ফা? তোহ্ফা হলে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতেন আর সদকা হলে তা যথার্থ হকদারদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন।

হাদিয়া-তোহ্ফা ঃ বন্ধু-বান্ধব এবং ভক্তজনদের হাদিয়া-তোহ্ফা হুযুর (সাঃ) হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করতেন। এমন কি, পরস্পর উপহার বিনিময়ে হৃদ্যতা বৃদ্ধির জন্যে নির্দেশও দিতেন। এরশাদ করতেন ঃ تَهَادُوْا تَحَابُّوْا—

"পরস্পরের মধ্যে উপহার বিনিময় করতে থেকো, এতে হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়"।

সাহাবিগণ মহব্বতের নিদর্শনস্বরূপ প্রতিদিনই কিছু না কিছু হুযুর (সাঃ)-এর দরবারে পাঠাতেন। বিশেষত যে দিন হযরত আয়েশার ঘরে অবস্থান করতেন, সে দিন সর্বাপেক্ষা বেশি তোহ্ফা-হাদিয়া আসত। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে কোন

---

১. আবূ দাউদ ঃ যাকাৎ অধ্যায়।
২. বোখারী, ১ম খণ্ড, পড়ে থাকা জিনিসের বিবরণ।
৩. বোখারী, ১ম খণ্ড।

বস্তু সামনে পেশ করা হলে জিজ্ঞেস করতেন, তা সদকা না হাদিয়া? হাদিয়া হলে তা গ্রহণ করতেন, আর সদকা হলে নিজের জন্যে গ্রহণ করতেন না।[১]

একবার এক স্ত্রীলোক একটি সুন্দর চাদর এনে পেশ করলে হুযুর (সাঃ) তা গ্রহণ করলেন, কিন্তু পাশে বসা এক ব্যক্তি তা চাওয়া মাত্র দিয়ে দিলেন।[২]

পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের রাজা-বাদশাগণও হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে উপহারসামগ্রী পাঠাতেন। সিরিয়ার সীমান্তবর্তী কোন এক গোত্রপতি একটি শাদা রং-এর খচ্চর উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। মিশরের বাদশাহ্ একটি খচ্চর এবং অন্য একজন নরপতি মোজা পাঠিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

একবার রুম সম্রাটের তরফ থেকে রেশমের কাজ করা একটি সুদৃশ্য জুব্বা উপহার স্বরূপ পাঠানো হয়েছিল। হুযুর (সাঃ) তা কবুল করার নিদর্শনস্বরূপ কিছুক্ষণের জন্যে পরার পর সেটি হযরত আলীর ভাই হযরত জাফরের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। হযরত জাফর জুব্বাটি পরে দরবারে হাজির হলে বললেন, "এ জুব্বা তোমাকে পরতে দেইনি—এটি তোমার ভাই নাজ্জাশীকে পাঠিয়ে দাও।" হযরত জাফর খায়বর বিজিত হওয়ার সময় পর্যন্ত হাবশাতেই অবস্থান করছিলেন এবং সম্রাট নাজ্জাশী তাঁরই নিকট ইসলাম সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত হয়েছিলেন।

অন্যকে হাদিয়া দেয়া : হুযুর (সাঃ) যাদের তোহ্ফা-হাদিয়া গ্রহণ করতেন, প্রতিদানে তাদের কাছেও কিছু না কিছু পাঠিয়ে দিতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন,—রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাদিয়া কবুল করতেন, তবে অতি অবশ্যই তার প্রতিদান দিতেন।

ইয়ামনের রাজা যি-ইয়াযন হাবশার আধিপত্য উৎখাত করে সেখানে ইরানের প্রভাবাধীন আরব শাসন কায়েম করে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি একবার হুযুর (সাঃ)-এর জন্যে এমন একটি রঙ্গীন শাল পাঠালেন যা বিশটি উটের বিনিময়ে ক্রয় করা হয়েছিল। হুযুর (সাঃ) তার প্রতিদানে যি-ইয়াযনকে যে শালটি পাঠিয়েছিলেন সেটি বাইশটি উটের বিনিময়ে কেনা হয়েছিল।[৩]

একবার বনী ফুযারা গোত্রের এক ব্যক্তি হাদিয়া স্বরূপ একটি উট দান করলে হুযুর (সাঃ) তার প্রতিদান দেয়ায় সে নিজেকে অপমানিত বোধ করে ক্রুদ্ধ হল। হুযুর (সাঃ) এ পরিপ্রেক্ষিতে মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে "তোমরা আমাকে উপহার হিসাবে নানা জিনিস দিয়ে থাক। আমিও সাধ্যানুযায়ী তার প্রতিদান দিতে চেষ্টা করলে অসন্তুষ্ট হও। তাই আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে

---

১. বোখারী : আয়েশার বর্ণনা।
২. বোখারী : জানাযার বর্ণনা।
৩. আবু দাউদ : ২য় খণ্ড।

কোরাইশ, আনসার, সাকীফ গোত্র এবং দাওস গোত্র ব্যতীত অন্য কারও কোন উপহার গ্রহণ করব না।"[১]

হিজরতের পর ছ'মাস পর্যন্ত হুযুর (সাঃ) হযরত আবু আইউব আনসারীর (রাঃ) ঘরে অবস্থান করেছিলেন। তারপর থেকে প্রায়ই সেখানে খানা পাঠাতেন। পড়শীদের ঘরেও মাঝে-মধ্যেই হাদিয়া-তোহফা পাঠাতেন। আসহাবে সুফফার সদস্যগণ সব সময়ই হুযুর (সাঃ)-এর তোহফায় ধন্য হতেন।

কারও অনুগ্রহ ঃ হুযুর (সাঃ) কারও অনুগ্রহভাজন হওয়া মোটেই পছন্দ করতেন না। হযরত আবু বকরের চাইতে বেশি আপনজন আর কে ছিলেন? এতদসত্ত্বেও হিজরতের সময় যখন তিনি একটি দ্রুতগামী উটনী পেশ করলেন তখন মূল্য পরিশোধ না করে তা গ্রহণ করেননি।[২] মদীনায় মসজিদ তৈরি করার জন্যে যখন জমির প্রয়োজন হল, তখন জমির মালিকেরা তা বিনামূল্যে দান করতে চাইলেও হুযুর (সাঃ) মূল্য পরিশোধ না করে তা গ্রহণ করলেন না।

একবার এক সফরে হযরত ওমর এবং আবদুল্লাহ ইবনে ওমর সহযাত্রী ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের উটটি বেয়াড়া প্রকৃতির ছিল, সেটি বার বার ছুটে হুযুর (সাঃ)-এর সামনে চলে আসছিল। হযরত ওমর (রাঃ) পুত্রকে কয়েকবার শাসানো সত্ত্বেও তিনি উটটিকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছিলেন না। তখন হুযুর (সাঃ) বললেন, এ উটটি আমার কাছে বিক্রি করে ফেল। হযরত ওমর আরয করলেন, এমনিতেই গ্রহণ করুন। কিন্তু বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও হুযুর (সাঃ) মূল্য পরিশোধ না করে সেটি গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। শেষ পর্যন্ত মূল্য পরিশোধ করেই তা গ্রহণ করলেন এবং পরে তা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকেই উপহার হিসাবে দান করলেন।[৩]

সহজ পন্থা অবলম্বন ঃ মহানবী (সাঃ) অন্যের ব্যাপারে সব সময়ই সহজ পন্থা অবলম্বন করার পক্ষপাতী ছিলেন। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মা'আয ইবনে জাবাল কোন এক মহল্লায় ইমামতি করতেন। একব্যক্তি এসে অভিযোগ করল যে হযরত মা'আয এত লম্বা নামায পড়েন যে আমি তাঁর পেছনে নামায পড়তে অসমর্থ হয়ে পড়ি। হযরত আবু মাসউদ আনসারী বর্ণনা করেন, এ অভিযোগ শুনে হুযুর (সাঃ) যেমন রাগান্বিত হয়েছিলেন, আমি তাঁকে আর কখনও এমন রাগান্বিত হতে দেখিনি। উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য করে ভাষণ দিলেন, "কোন কোন লোক নিজেদের আচরণ দ্বারা অন্যকে বিরক্ত করে ফেলে। তোমাদের যারা নামায পড়াও, তারা সংক্ষিপ্ত নামায পড়াবে। কেননা, নামাযিদের মধ্যে বৃদ্ধ, দুর্বল এবং কাজকর্মে ব্যস্ত লোকজনও থাকে।"[৪]

---

১. ইমাম বোখারী রচিত আদাবুল মুফরাদ।
২. বোখারী শরীফ।
৩. বোখারী শরীফ।
৪. বোখারী শরীফ ঃ নামায অধ্যায়।

কোন অপরাধের দণ্ড প্রদান করার সময় নেহায়েত সাবধানতা অবলম্বন করতেন, যেন কোন নিরপরাধ ব্যক্তির শাস্তি না হয়—অথবা অল্প অপরাধে গুরুদণ্ড দেয়া না হয়। বরং চেষ্টা করতেন যেন যথাসম্ভব লঘুদণ্ড অথবা ক্ষমা করে দেয়ার মত কোন দিক খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।

মায়েয আসলামী নামক এক ব্যক্তি ঘটনাক্রমে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মসজিদে এসে নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)! আমি ব্যভিচার করে ফেলেছি। একথা শুনে হুযুর (সাঃ) মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে হুযুর (সাঃ) বার বার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন আর সে ব্যক্তি সামনে এসে ব্যভিচার সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করছিল। শেষ পর্যন্ত বললেন, তোমাকে কি পাগলামীতে পেয়েছে? জবাব দিলেন, না। পুনরায় প্রশ্ন করলেন, তুমি কি বিয়ে করেছ? সাহাবী জবাব দিলেন, হাঁ। বললেন, তুমি বোধহয় শুধুমাত্র হাত লাগিয়েছিলে! সাহাবী বললেন, না, বরং সব কিছুই হয়েছে। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে প্রস্তারাধাতে হত্যার নির্দেশ দিলেন।[১]

একবার এক ব্যক্তি এসে নিবেদন করলেন, আমার দ্বারা গোনাহ্ হয়ে গেছে, দণ্ডবিধান করুন! হুযুর (সাঃ) চুপ হয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হয়ে গেল। নামাযের পর সে ব্যক্তি পুনরায় দণ্ড গ্রহণ করার জন্যে আবেদন করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি নামায পড়নি? আল্লাহ্ তা'আলা তোমার গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন।[২]

একবার গামেয গোত্রের এক স্ত্রীলোক এসে নিবেদন করল, আমি ব্যভিচার করে ফেলেছি। হুযুর (সাঃ) বললেন, যাও, বাড়ি যাও। কিন্তু দ্বিতীয় দিন এসে সে বলতে লাগল, আপনি কি আমাকে মায়েয-এর ন্যায় ক্ষমা করে দিতে চান? আল্লাহ্র কসম আমি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে গেছি। হুযুর (সাঃ) পুনরায় বললেন, 'যাও, বাড়ি যাও।' কিন্তু তৃতীয় দিনও সে এসে একই আবেদন পেশ করল। এবার নির্দেশ দিলেন, "সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।" সন্তান প্রসবের পর বাচ্চা কোলে নিয়ে সে পুনরায় এসে নিবেদন করল। বললেন, "বাচ্চা যতদিন দুধ খাবে, ততদিন অপেক্ষা কর।" দুধ খাওয়ার সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর যখন সে আবার এল সে একই নিবেদন পেশ করল, তখন নিরুপায় হয়ে তাকে প্রস্তরাধাতে হত্যার দণ্ড প্রদান করলেন। লোকেরা সে স্ত্রীলোকের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ শুরু করলে একটি পাথর তার মুখমণ্ডলে লাগল এবং রক্ত ফিনকি দিয়ে একজনের চেহারায় এসে পড়লে সে স্ত্রীলোকটিকে গাল দিল। হুযুর (সাঃ) বলতে লাগলেন, "মুখ শামলাও! সে এমন তওবা করেছে যে যদি কোন জালেম লুণ্ঠনকারীও এমন তওবা করত, সে মুক্তিলাভ করতে পারত।"[৩]

---

১. বোখারী শরীফ।
২. বোখারী শরীফ।
৩. আবু দাউদ, দণ্ডবিধি অধ্যায়।

একবার এক ব্যক্তি এসে নিবেদন করলেন যে আমরা ইহুদী-খৃষ্টানদের দেশে বাস করি, তাদের বরতনে কি খানা খাওয়া চলবে? জবাব দিলেন অন্য বরতন থাকলে খেও না, যদি অন্য পাত্র না পাও, তবে সেগুলো ধুয়ে ব্যবহার করো।[১]

এক সময় জনৈক সাহাবী রমযান মাস পর্যন্ত বিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ না করার কসম করে বসলেন। কিন্তু কসমের সময়-সীমা অতিক্রান্ত না হতেই সহবাস করে ফেললেন এবং সঙ্গী-সঙ্গীদের নিকট ঘটনা বিবৃত করে নিবেদন করলেন, আমাকে হুযুর (সাঃ)-এর দরবারে নিয়ে চল। কিন্তু ঘটনা গুরুতর মনে করে কেউ যেতে রাজী হল না। শেষ পর্যন্ত সে নিজেই দরবারে হাজির হয়ে ঘটনা বিবৃত করল। হুযুর (সাঃ) ঘটনা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং কাফ্ফারা বাবদ একটি গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দিলেন। সে তখন তার অসামর্থ্যের কথা প্রকাশ করল। পুনরায় নির্দেশ দিলেন, তবে ক্রমাগত দু'মাস রোযা রাখ। সে বলল, হুযুর! রোযার কারণেই তো এ বিপত্তি! বললেন, তবে ষাটজন মিসকীনকে খানা খাইয়ে দাও। সে বলল, আমি নিজেই উপোস করছি। শেষ পর্যন্ত হুযুর (সাঃ) নির্দেশ দিলেন, বাইতুলমালের খাজাঞ্চীর কাছ থেকে এক ওয়াসাক খেজুর নিয়ে মিছকীন খাওয়াও এবং নিজের পরিবার-পরিজনের জন্যেও কিছু নিয়ে যাও। এর পর লোকটি নিজের কবিলায় ফিরে গিয়ে অন্যান্যদের ডেকে বলল, তোমরা তো আমার অপরাধের কোন প্রতিকারই খুঁজে পাচ্ছিলে না, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কি চমৎকার ব্যবস্থা এবং সহজভাবেই না আমার সমস্যার সমাধান করে দিলেন![২]

একদিন জনৈক সাহাবী মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)! আমি বরবাদ হয়ে গেছি। রমযানের রোযার মধ্যেই স্ত্রী-সহবাস করে ফেলেছি।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, একটি গোলাম আযাদ করতে পারবে? সে জবাব দিল, না। জিজ্ঞেস করলেন, একটানা দুমাস রোযা? এবারও সে তার অক্ষমতা প্রকাশ করল। আবার জিজ্ঞেস করলেন, তবে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পার? এবারও সে তার অক্ষমতার কথা প্রকাশ করল। হুযুর (সাঃ) কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। এর মধ্যেই এক ব্যক্তি এক বস্তা খেজুর এনে হাজির করলেন। হুযুর (সাঃ) তখন লোকটিকে বললেন, যাও, এ খেজুরগুলো নিয়ে মিসকীনদের মধ্যে বিলি করে দাও। সে লোক তখন বলতে শুরু করল, "ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ), মদীনায় আমার চাইতে গরীব আমি কোথায় খুঁজে পাব? এ কথা শুনে হুযুর (সাঃ) আর হাসি সংবরণ করতে পারলেন না,— হাসতে হাসতেই বললেন, "যাও, এবং তোমার পরিবারের লোকদেরই গিয়ে খাইয়ে দাও।"[৩]

১. বোখারী, ২য় খণ্ড।
২. বোখারী, ২য় খণ্ড।
৩. বোখারী শরীফ ঃ রমযান অধ্যায়।

বৈরাগ্যের প্রতি অনীহা ঃ মহানবী (সাঃ) সন্ন্যাস জীবন বা বৈরাগ্য পছন্দ করতেন না। সাহাবিদের মধ্যে কেউ কেউ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস-জীবন যাপন করার আগ্রহ প্রকাশ করলে তাঁদেরকে কঠোরভাবে এ পথ থেকে বিরত রাখেন। কোন কোন দরিদ্র সাহাবী বিয়ে করতে অসমর্থ হয়ে অঙ্গচ্ছেদনের মাধ্যমে প্রবৃত্তি দমনে উদ্যোগী হলেও তাদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কুদামা ইবনে মাযউন নামক জনৈক সাহাবী একজন সঙ্গীসহ এসে আরয করলেন, আমাদের একজন বিবাহ না করার এবং অন্যজন পশুর বাহন বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। জবাবে হুযুর (সাঃ) এরশাদ করলেন, "আমি তো উভয়টিরই স্বাদ গ্রহণ করেছি।" হুযুর (সাঃ)-এর সম্মতি না পেয়ে দুজনেই স্ব স্ব ইচ্ছা পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করলেন।

প্রাচীন আরবের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে একাদিক্রমে কয়েকদিন পর্যন্ত রোযা রাখার প্রচলন ছিল। সাহাবীদের মধ্যে কেউ কেউ এ ধরনের রোযা রাখার আগ্রহ প্রকাশ করলে হুযুর (সাঃ) কঠোরভাবে তাঁদের নিবৃত্ত করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) অত্যন্ত সাধক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি একাদিক্রমে দিনে রোজা রেখে সারারাত্রি জেগে এবাদত করতে শুরু করলেন। খবর পেয়ে তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি সত্য? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) জবাব দিলেন, জী-হাঁ। তখন হুযুর (সাঃ) এরশাদ করলেন, "দেখ! তোমার উপর তোমার শরীরের, তোমার চোখের এবং তোমার স্ত্রীরও হক রয়েছে। মাসে তিন দিন রোযা রাখাই তোমাদের জন্যে যথেষ্ট।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আরয করলেন, "এর অনেক বেশি করার মত ক্ষমতা আমার রয়েছে।" বললেন, "তবে প্রতি তৃতীয় দিনে রোযা রাখ।" আবদুল্লাহ বললেন, "আমার এর চাইতেও বেশি শক্তি আছে।" তারপর নির্দেশ দিলেন, "তবে মধ্যে একদিন বিরতি দিয়ে একদিন রোযা রাখ।" হযরত দাউদ (আঃ) এভাবে রোযা রাখতেন। রোযার এ নিয়মই সর্বোত্তম। হযরত আবদুল্লাহ আরয করলেন, "আমার এর চাইতেও বেশি করার ক্ষমতা আছে।" বললেন, "না, এর বেশি করা ভাল নয়।"[১]

অন্য এক বর্ণনায় আছে,— হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের বিরামহীন রোযা রাখার বিষয়টি আলোচিত হতে শুরু করলে একদিন হুযুর (সাঃ) স্বয়ং তাঁর বাড়িতে চলে গেলেন। হযরত আবদুল্লাহ তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসার জন্যে একটি চামড়ার গদি এগিয়ে দিলেন। কিন্তু হুযুর (সাঃ) গদিতে না বসে মেঝের উপরই বসে পড়লেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি মাসে তিনটি রোযা রেখে বিরত হও না কেন?" নিবেদন করলেন, "জী-না।" বললেন, "তবে পাঁচটি

১. বোখারী শরীফ ঃ রমযান অধ্যায়।

কর।" নিবেদন করলেন, "জী-না।" এভাবে হুযুর (সাঃ) বাড়িয়ে যেতে লাগলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) আপত্তি করতে থাকলেন। সবশেষে বললেন, "তোমার জন্যে সর্বশেষ সীমারেখা হল, একদিন অন্তর অন্তর একদিন রোযা রাখবে।[১]

একবার হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) এসে নিবেদন করলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)! আমি যুবক, বিবাহ্ করার সঙ্গতি নাই। প্রবৃত্তির তাড়নায় কখন কি হয় বলা যায় না, আমার কি উপায় হবে?" তিন তিনবার এ কথা বলবার পরও হুযুর (সাঃ) নীরব রইলেন। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর এরশাদ করলেন, "আল্লাহ্র হুকুম কখনও রদ হতে পারে না।"[২]

বাহেলা গোত্রের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে চলে গেলেন এবং এক বছর পর সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে এসে খেদমতে হাজির হলেন। কিন্তু এ এক বছরেই তাঁর চেহারা এমন পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল যে হুযুর (সাঃ) তাঁকে চিনতে পারলেন না। আগন্তুক নিজের নাম বলে যখন পরিচয় দিলেন, তখন হুযুর (সাঃ) কিছুটা আশ্চার্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি তো অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলে, এ এক বছরেই এমন পরিবর্তিত হয়ে গেলে কেমন করে?" জবাব দিলেন, "আমি গত এক বছর রোযা রেখে কাটিয়েছি।" বললেন,"তোমার জন্যে মাসে একদিন রোযা রাখাই যথেষ্ট।" আগন্তুক আরয করলেন, "এর বেশি করার সাধ্য আমার আছে।" তখন দু'দিনের অনুমতি হল, কিন্তু আগন্তুক যখন আরও বৃদ্ধির আরয করলেন, তখন তিন দিনের কথা বললেন। কিন্তু এতেও যখন তৃপ্তি হল না, তখন এরশাদ করলেন, "বৎসরে সম্মানিত চার মাস রোযা রেখো।"[৩]

একবার সাহাবীদের একদল উম্মুল মো'মেনীনদের খেদমতে হাজির হয়ে হুযুর (সাঃ)-এর নফল এবাদত সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তাঁদের ধারণা ছিল, হুযুর (সাঃ) বোধহয় দিনরাত শুধু এবাদতের মধ্যেই অতিবাহিত করেন। তাই উম্মুল মো'মেনীনদের জবাব তাঁদের ধারণা মাফিক হল না। তাঁরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন, "রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে কি আমাদের তুলনা হয়। আল্লাহ্ পাক তো তাঁর সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন।" তাঁদের একজন বললেন, "আমি সারা রাত জেগে নামায পড়তে থাকব।" অন্য একজন বললেন, এখন থেকে আমি সারা জীবন রোযা রেখে কাটাব;" তৃতীয় ব্যক্তি বললেন, "আমি কখনও বিয়ে করব না।" হুযুর (সাঃ) সকলের কথোপকথনই শুনছিলেন। তিনি বললেন, "আল্লাহ্র কসম! আমার অন্তরে আল্লাহ্র ভয় তোমাদের সবার চাইতে অনেক বেশি,—তথাপি আমি রোযা করি, বিরতিও দিই, বিবাহ্ও করি। যে

১. বোখারী শরীফ ঃ বিবাহ্ প্রসঙ্গ।
২. বোখারী শরীফ ঃ বিবাহ্ অধ্যায়।
৩. আবু দাউদ।

ব্যক্তি আমার তরিকা মোতাবেক চলবে না, সে আমার জামাতের অন্তর্ভুক্ত হ্তে পারবে না।"[১]

কোন এক যুদ্ধ-অভিযানে জনৈক সাহাবী পানি এবং কিছু তৃণ-লতা শোভিত একটি পর্বত গুহা দেখতে পেয়ে হুযুর (সাঃ)-এর নিকট এসে আরয করলেন, যেন এখানে বসেই 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' করার অনুমতি প্রদান করা হয়। জবাবে এরশাদ করলেন, "আমি ইহুদী বা খৃষ্টধর্ম নিয়ে দুনিয়ায় আগমন করিনি, আমি সহজ-সরল ইবরাহিমী ধর্ম নিয়ে এসেছি।"[২]

ছিদ্রান্বেষণ এবং অতিরিক্ত প্রশংসা ঃ মুখের উপর অতিরিক্ত প্রশংসাবাণী আন্তরিক হলেও মহানবী (সাঃ) তা অপছন্দ করতেন। একবার মজলিসে কোন এক লোকের সম্পর্কে আলোচনা উঠল। জনৈক সাহাবী পঞ্চমুখে তাঁর প্রশংসা শুরু করলেন। সাহাবীর এ উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রশংসাবাদ শুনে হুযুর (সাঃ) এরশাদ করলেন, "তুমি তো তোমার বন্ধুর শিরশ্ছেদ করে বসলে! "কথাটি তিনবার উচ্চারণ করলেন। তারপর এরশাদ করলেন, যদি কারো প্রশংসা করতে হয়, তবে এতটুকু বলো যে আমার ধারণায় সে এরূপ।[৩]

একবার এক ব্যক্তি কোন এক শাসনকর্তা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুরু করলে সাহাবী হযরত মেকদাদ হাতে কিছু ধুলি নিয়ে তার মুখের উপর নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, "রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, অতিরিক্ত প্রশংসাকারীর মুখের উপর এভাবে মাটি ছিটিয়ে দিও।"

একবার হুযুর (সাঃ) মসজিদে এসে দেখলেন, এক ব্যক্তি নামায পড়ছে। মাহ্জান সাকাফী নামক জনৈক সাহাবীকে লোকটির পরিচয় জিজ্ঞেস করলে তিনি নাম বলে তার সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রশংসা করতে শুরু করলেন। অতিরিক্ত প্রশংসা শুনে হুযুর (সাঃ) এরশাদ করলেন,"দেখ, এ ব্যক্তি যেন শুনতে না পায়। অন্যথায় সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।" অর্থাৎ প্রশংসাবাণী শুনে তার অন্তরে অহঙ্কার জন্মলাভ করবে এবং তা-ই তার ধ্বংসের কারণ হবে।[৪]

এক সময় আসওয়াদ ইবনে সুরাই নামক এক কবি খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন, "আমি আল্লাহ্র প্রশংসা এবং হুযুরের প্রশস্তি-মূলক কিছু কবিতা রচনা করেছি, অনুমতি হলে পেশ করতে পারি।" জবাব দিলেন, "আল্লাহ্র প্রশংসা যথার্থ।" অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে আসওয়াদ কবিতা পাঠ করতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে এক লোক এসে হাজির হলে, আসওয়াদকে থামিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। সে লোক চলে গেলে আসওয়াদ পুনরায় কবিতা

১. বোখারী শরীফ ঃ বিবাহ অধ্যায়।
২. মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ৫ম খণ্ড।
৩. ইমাম বোখারী রচিত আদাবুল মুফরাদ।
৪. ঐ।

পাঠ শুরু করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে লোক পুনরায় এসে হাজির হলেন। আবারও আসওয়াদকে থামিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। বেশ কয়েকবারই এমন হল। আসওয়াদ আরয করলেন, "লোকটি কে, যার জন্যে আপনি বার বার আমাকে থামিয়ে দিচ্ছেন?" জবাব দিলেন, "সে এমন লোক যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাক্যালাপ মোটেও পছন্দ করে না।"[১]

এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে যে হুযুর (সাঃ) তো কবি হযরত হাসসানকে মিম্বরে বসিয়ে নিজে তাঁর কবিতা শুনতেন এবং এ বলে দোয়া করতেন যে "আয় আল্লাহ্! তাকে পবিত্রাত্মা জিব্রাঈলের মাধ্যমে সাহায্য কর।" অথচ এ সমস্ত কবিতা হুযুর (সাঃ)-এর প্রশংসায়ই রচিত হত।

কারণ ছিল, হাসসান যে সমস্ত কবিতা পাঠ করতেন, তা হত দুর্মুখ কাফের কবিরা হুযুর (সাঃ) সম্পর্কে ভিত্তিহীন নিন্দাবাদ করে যে সমস্ত কবিতা লিখত, তারই দাঁতভাঙ্গা জবাব। আরবের কবিরা আকর্ষণীয় কবিতার মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা অতুলনীয় সম্মানের অধিকারী করতে পারত, আবার নিন্দাবাদে অমর্যাদার চরমেও নিয়ে পৌঁছাতে পারত। ইহুদী কবি কা'ব ইবনে আশরাফ এবং ইবনুয্ যা'বারা হুযুর (সাঃ) সম্পর্কে জঘন্য নিন্দাবাদমূলক কবিতা লিখে জনসমক্ষে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করতে সদা সচেষ্ট থাকত। হযরত হাসসানের কাব্যপ্রতিভা সে দু'দুরাচারদের কাব্যগাথার বিরুদ্ধে সাধারণ্যে হুযুর (সাঃ)-এর মর্যাদা বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হত। সে জন্যে হযরত হাসসানের এ প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা হত।

সরলতা ঃ হুযুর (সাঃ) জীবনে কখনো আড়ম্বর পছন্দ করতেন না; সরলতাই ছিল তাঁর জীবনের ভূষণ বিশেষ। অনেক সময় মসলিস থেকে উঠে খালি পায়েই বাড়ির ভেতরে চলে যেতেন। জুতা মসজিদের দরজাতেই পড়ে থাকত। এর দ্বারা অবশ্য সাহাবিগণ অনুমান করতেন যে খুব শীঘ্রই পুনরায় তিনি মজলিসে ফিরে আসবেন।

প্রতিদিন চুল আঁচড়ানোও পছন্দ করতেন না। বলতেন, "একদিন অন্তর একদিন চিরুনি ব্যবহার করাই উত্তম।"

খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা প্রভৃতি কোন কিছুতেই লৌকিকতা পছন্দ করতেন না। খাওয়ার সময় সামনে যা-ই পরিবেশন করা হত, বিনা দ্বিধায় তাই আহার করতেন। পরিধানের জন্যে সাদাসিধে যে কোন মোটা কাপড় পাওয়া যেত, তাই পরতেন। যমিন, ফরাস বা চাটাই যেখানেই সুবিধা হত বিনা দ্বিধায় বসে পড়তেন। কখনও তাঁর জন্যে আটার ভূষি ছাড়িয়ে রুটি তৈরি করা হত না। জামার বুক অধিকাংশ সময় খোলা থাকত। পোশাকে আড়ম্বর অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। প্রকৃতিগতভাবেই সাজ-সজ্জার বিরোধী ছিলেন। সর্ব বিষয়ে সহজ-সরলতা ছিল হুযুর (সাঃ)-এর প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

১. ইমাম বোখারী রচিত আদাবুল মুফরাদ।

জাঁকজমকের প্রতি অসন্তোষ ঃ ইসলাম সন্ন্যাসের ধর্ম নয়। বৈরাগ্যপূর্ণ জীবনযাপন ইসলাম অনুমোদন করেনি। বলা হয়েছে, "ইসলামে বৈরাগ্য নেই।"

এজন্যে হুযুর (সাঃ) সর্বপ্রকার বৈধ বস্তুর স্বাদ গ্রহণ অনুমোদন করেছেন এবং সময় সময় নিজেও ব্যবহার করে নযীর স্থাপন করে গেছেন। কিন্তু তাই বলে বিলাসিতা বা আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের স্পর্শ কোন অবস্থাতেই তাঁকে স্পর্শ করতে দেননি। জাঁকজমক থেকে শুধু যে নিজেই দূরে থাকতেন, তাই নয়, অন্যকেও তা থেকে দূরে থাকতে উদ্বুদ্ধ করতেন।

একদিন কোন এক ব্যক্তি হযরত আলীকে দাওয়াত করে বাড়িতে খানা পাঠিয়ে দেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বললেন,"এমন উত্তম খানায় হুযুর (সাঃ)-কে শরীক করে নিলে ভাল হত।" কথামত হযরত আলী খবর দিলেন। হুযুর (সাঃ) এসে দেখলেন, সুদৃশ্য পর্দা দ্বারা সমস্ত ঘরখানি সাজানো। সাজগোজ দেখে দরজা থেকেই ফিরে চলে গেলেন। হযরত আলী ব্যস্তসমস্ত হয়ে ফিরে যাবার কারণ জিজ্ঞেস করতে এলে এরশাদ করলেন, "আড়ম্বরপূর্ণ ঘরে প্রবেশ করা পয়গম্বরী শানের সম্পূর্ণ খেলাফ।"[১]

তিনি বলতেন, "ঘরে একটি বিছানা নিজের জন্যে, একটি স্ত্রীর জন্যে এবং আর একটি মেহ্‌মানের জন্যে থাকতে পারে। চতুর্থটি থাকলে তা হবে শয়তানের ভোগ।"[২]

একবার কোন এক যুদ্ধ অভিযান থেকে ফিরে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে গিয়ে দেখলেন, কামরার ভেতর শামিয়ানা টাঙানো রয়েছে। হুযুর (সাঃ) তৎক্ষণাৎ সেটি এই বলে ছিঁড়ে ফেললেন যে "ইট-পাথরকে পোশাক পরানোর জন্যে আল্লাহ্ পাক আমাদের টাকা-পয়সা দেন না।"[৩]

জনৈক আনসারী একটি নতুন বাড়ি তৈরি করে তাতে একটি সু-উচ্চ গম্বুজ নির্মাণ করেন। হুযুর (সাঃ) তা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "এ বাড়ি কে তৈরি করেছে?" লোকেরা আনসারীর নাম বললেন। হুযুর (সাঃ) কোন মন্তব্য না করে নিশ্চুপ রইলেন। নিয়ম অনুযায়ী উক্ত আনসারী খেদমতে হাজির হয়ে সালাম করলেন, কিন্তু হুযুর (সাঃ) জবাব না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আনসারী পুনরায় মুখোমুখি হয়ে সালাম দিলেন, কিন্তু এবারও সালামের জবাব না দিয়ে মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। আনসারী অসন্তুষ্টির কারণ বুঝতে পেরে বাড়ির গম্বুজ ভেঙে ফেললেন। পরে একদিন বাজারে যাওয়ার পথে উক্ত আনসারীর বাড়িতে গম্বুজ না দেখে হুযুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করে যখন জানতে পারলেন যে

১. আবু দাউদ, ২য় খণ্ড।
২. আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, লেবাছ অধ্যায়।
৩. আবু দাউদ, ২য় খণ্ড।

গম্বুজটি ভেঙে ফেলা হয়েছে, তখন মন্তব্য করলেন, "প্রয়োজনীয় বাড়িঘর ছাড়া আড়ম্বরপূর্ণ ইমারতাদি মানুষের জন্যে দুর্ভোগের কারণ হয়ে থাকে।"[১]

একবার কোন এক ব্যক্তি কিংখাবের একটি 'আ'বা হুযুর (সাঃ)-কে উপহার পাঠালেন। হুযুর (সাঃ) সেটি একবার পরেই খুলে ফেললেন এবং হযরত ওমরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই হযরত ওমর(রাঃ) খেদমতে হাজির হয়ে কেঁদে ফেললেন এবং বলতে লাগলেন, "যে জিনিস আপনি স্বয়ং পছন্দ করেননি, তা-ই আমাকে পরতে দিয়েছেন?" জবাবে হুযুর (সাঃ) এরশাদ করলেন, "তোমাকে সেটি পরতে দেয়া হয়নি, বিক্রয় করতে দেয়া হয়েছে।" হযরত ওমর (রাঃ) সে আ'বা এক হাজার দেরহাম মূল্যে বিক্রি করে দেন।[২]

এক সময় কোন এক ব্যক্তি ডুরিদার কাপড়ের পোশাক উপহার দিলে সেটি হযরত আলীকে দিয়ে দেন। হযরত আলী সে পোশাক পরে খেদমতে হাজির হলে হুযুর (সাঃ)-এর চেহারায় ক্রোধের চিহ্ন ফুটে ওঠে। তিনি বলতে লাগলেন, "আমি তোমাকে এ জমকালো পোশাক পরার জন্যে পাঠাইনি, এটি কেটে মেয়েদের কাপড় তৈরি করার জন্যে পাঠিয়েছিলাম।"[৩]

সীলমোহর করার প্রয়োজনে প্রথমে সোনার আংটি তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু যখন সাহাবীদের মধ্যে কেউ কেউ দেখাদেখি সোনার আংটি তৈরি করিয়ে পরতে শুরু করলেন, তখন একদিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, "দেখ, এখন থেকে আমি আর সোনার আংটি ব্যবহার করব না। এ বলে আংটি খুলে ফেলে দিলেন। হুযুর (সাঃ)-এর কথা শুনে সাহাবীরাও সঙ্গে সঙ্গে আংটি খুলে ফেললেন।[৪]

হুযুর (সাঃ) নিজে যেমন সহজ-সরল জীবন পছন্দ করতেন, তেমনি পরিবার-পরিজনকেও অনাড়ম্বর সরল জীবনে অভ্যস্ত করার জন্যে যত্নবান থাকতেন। ভোগ-বিলাসের জীবন থেকে দূরে থাকার জন্যে সর্বদা তাদের তাগিদ দিতেন।

সোনার অলঙ্কার ব্যবহার করা স্ত্রীলোকদের জন্যে মোবাহ্। কিন্তু হুযুর (সাঃ) তাঁর পরিবারের লোকদের জন্যেও অলঙ্কারের ব্যবহার অনুচিত মনে করতেন। একবার হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর গলায় সোনার হার দেখে বলেছিলেন, "বৎস! লোকে যদি বলে যে পয়গম্বরের কন্যা গলায় আগুনের ফাঁস পরেছেন, তবে তা শুনে তুমি কি অসন্তুষ্ট হবে না?"[৫]

একবার হযরত আয়েশার হাতে সোনার কঙ্কন দেখে মন্তব্য করলেন, "এগুলো খুলে যদি হাড়ের কাঁকন জাফরানে রং করে পরতে, তবে ভাল হত।"[৬]

---

১. আবু দাউদ।
২. আবু দাউদ ঃ লেবাছ অধ্যায়।
৩. আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, লেবাছ অধ্যায়।
৪. নাসায়ী, ২য় খণ্ড।
৫. নাসায়ী, ২য় খণ্ড।
৬. নাসায়ী, ২য় খণ্ড।

বাদশাহ্ নাজ্জাশী একবার কিছু মূল্যবান অলঙ্কার উপহার হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। তাতে হাবশার মূল্যবান পাথর বসানো একটি সুদৃশ্য আংটিও ছিল। হুযুর (সাঃ)-এর সামনে সেগুলো পেশ করা হলে চেহারা ঘৃণায় কুঁকড়ে এল। হাতে কাঠি নিয়ে সেগুলো নাড়াচাড়া করে দেখলেন, হাতও লাগালেন না।[১]

একবার কেউ রেশমের কাজ করা একটি মূল্যবান শাল উপহার দিলে সেটি পরে নামায পড়লেন। কিন্তু নামায থেকে ফারেগ হয়েই অত্যন্ত ঘৃণাভরে সেটি খুলে ফেললেন এবং মন্তব্য করলেন, "কোন পরহেজগার ব্যক্তির পক্ষে এধরনের কাপড় পরা সমীচীন নয়।"

বিনয়বশত হুযুর (সাঃ) অধিকাংশ সময়ই অত্যন্ত সাধারণ পোশাক পরতেন। হযরত ওমরের (রাঃ) খেয়াল হল, অন্তত জুমার দিনে এবং বিদেশী দূতদের সাক্ষাৎদান করার সময় ভাল পোশাক পরা দরকার। একবার রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে একটি রেশমী আবা বিক্রি হতে দেখে তিনি আরয করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)! অন্তত জুমা ও বিদেশী দূতদের সামনে যাওয়ার জন্যে এরূপ একটি আবা খরিদ করা উচিত বলে মনে করি। জবাব দিলেন, "ওমর! এ পোশাক তারাই শুধু পরতে পারে, আখেরাতে যাদের কোন অংশ নেই।"

হুযুর (সাঃ) অধিকাংশ সময় অত্যন্ত মামুলী ভেড়ার লোমে নির্মিত মোটা কাপড় পরতেন। এধরনের পোশাক পরেই আখেরাতের ডাকে সাড়া দিয়েছেন।[২]

বিছানা হতে কম্বলের, কখনও কখনও চামড়ার খোলে খেজুর পাতা বা আঁশ ভরে গদি তৈরি করেই বিছানা করা হত। কখনও কখনওবা সাধারণ কাপড় দুভাঁজ করেই বিছানা করা হত। হযরত হাফছা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক রাতে আমি কাপড় চার ভাঁজ করে বিছানা করেছিলাম যেন একটু নরম হয়। ভোরে উঠে হুযুর (সাঃ) এ নরম বিছানার জন্যেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।[৩]

৯ম হিজরীতে যখন ইয়ামন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূ-ভাগ ইসলামী হুকুমতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন ইসলামের মহান নবীর ঘরে একটি দড়ির চার-পায়া এবং শুকনো চামড়ার একটি মশক ছাড়া আর কোন আসবাব ছিল না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, ইন্তেকালের সময় হুযুর (সাঃ)-এর ঘরে সামান্য কয়েক মুঠো যব ছাড়া খাওয়ার মত আর কিছুই ছিল না।[৪] সব সময় সাহাবীদের বলতেন, "দুনিয়াতে একজন মানুষের জন্যে ততটুকু সম্পদই যথেষ্ট, যতটুকু একজন মুসাফিরের পাথেয় হিসাবে সঙ্গে থাকা দরকার।"[৫]

১. মুসনাদে আহমদ, ২য় খণ্ড।
২. বোখারী ঃ লেবাছ অধ্যায়।
৩. শামায়েল তিরমিযী।
৪. মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ২য় খণ্ড।
৫. ইবনে মাজাহ, জেহাদ অধ্যায়।

একবার চটের বিছানায় আরাম করার ফলে শরীরে চটের দাগ পড়ে যেতে দেখে সাহাবীরা আরয করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)! অনুমতি দিলে আমরা অন্তত একটি গদি তৈরি করে দিই! জবাব দিলেন, "দেখ! দুনিয়ার আরাম-আয়েশে আমার কি প্রয়োজন? দুনিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ততটুকুই যতটুকু একজন পথচারী ঘোড়-সওয়ারের হয়ে থাকে। সে যেমন ক্লান্ত হয়ে কোন গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে এবং ক্লান্তি দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে চলে যায়।"

'মশরাবাহ' বা হুযুর (সাঃ)-এর আরাম করার এবং মূল্যবান ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রাখার জন্যে নির্মিত বিশেষ কামরাটিতে একদিন হযরত ওমর (রাঃ) প্রবেশ করে দেখলেন, দড়ির একটি চারপায়ায় একটি অতি সাধারণ চাদর বিছানো রয়েছে, শিয়রে খেজুরের ছাল ভর্তি একটি চামড়ার শক্ত বালিশ, একপাশে কয়েক মুঠো যব এবং কয়েকটি চামড়ার মশক খুঁটির সঙ্গে বাঁধা এবং পায়ের দিকে একটি পশুর চামড়া লটকানো। শাহানশাহে-মদীনার খাস কামরায় এ ধরনের আসবাবপত্র দেখে হযরত ওমরের চোখে অশ্রুর ধারা নেমে এল। হুযুর (সাঃ) ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি নিবেদন করলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)! আপনার পবিত্র অঙ্গে চারপায়ার দড়ির প্রত্যেকটি গিরার দাগ পড়ে গেছে। এটি আপনার আসবাবপত্র রাখার কামরা। এর মধ্যে যে সমস্ত জিনিসপত্র আছে তা তো নিজের চোখেই দেখছি। রোম ও পারস্য-সম্রাটগণ এ দুনিয়ায় কত বিলাসপূর্ণ জীবনই না যাপন করছে, আর আপনি আল্লাহ্র মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল হওয়া সত্ত্বেও আপনার এই আসবাবপত্র!" ওমর বলেন, আমার এ আক্ষেপবাণী শুনে হুযুর (সাঃ) এরশাদ করলেন, "খাত্তাবতনয়! তুমি কি ভাল মনে কর না যে তারা দুনিয়া ভোগ করুক, আর আমরা আখেরাত?[১]

সাম্য ঃ হুযুর (সাঃ)-এর দৃষ্টিতে আমীর-ফকীর, ছোট-বড়, দাস-মালিকের কোন পার্থক্য ছিল না। সকলকেই একই নজরে দেখতেন। সুকৃতির ভিত্তিতে যাঁর যে মর্যাদা প্রাপ্য তাঁকে সে মর্যাদাই প্রদান করতেন। অনুরূপ, অপরাধের শাস্তি-বিধান করার বেলায়ও কারও প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতি মোটেও ভ্রূক্ষেপ করা হত না।

হযরত সালমান, হযরত সোহাইব এবং হযরত বেলাল (রাঃ) পূর্ববর্তী জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। কিন্তু হুযুর (সাঃ)-এর দরবারে তাঁদের মর্যাদা সম্ভ্রান্ত কোরাইশ-সর্দারদের তুলনায় একটুও কম ছিল না।

একদা হযরত সালমান ও হযরত বেলাল একস্থানে বসেছিলেন। এমন সময় কোরাইশ-নেতা আবু সুফিয়ানের উপর তাঁদের নজর পড়ল। বলাবলি করতে

---

১. মুসলিম শরীফ।

লাগলেন, এখনও সত্যের তরবারি আল্লাহ্‌র এ দুশমনদের গর্দান নাগাল পেল না। হযরত আবু বকর এ কথা শুনে বলে উঠলেন, কোরাইশ সর্দার সম্পর্কে তোমরা এত বড় কথা বলছ? হুযুর (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তিনি এ ঘটনা বিবৃত করলেন। হুযুর (সাঃ) ঘটনা শুনে বলে উঠলেন, "আবু বকর! আপনি এদের নারাজ করেননি তো? এরা যদি নারাজ হন, তবে আল্লাহ্ তা'আলাও নারাজ হবেন।" এ কথা শুনে হযরত আবু বকর তৎক্ষণাৎ বেলাল ও সালমানের কাছে ফিরে গেলেন এবং কাতর স্বরে নিবেদন করলেন, "ভাইসব! আপনারা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হননি তো?" তাঁরা জবাব দিলেন, "না, আমরা আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম।"[১]

চুরির অপরাধে অভিযুক্ত মাখযুম গোত্রের সে সম্মানিতা মহিলার ঘটনা ইতিপূর্বেও একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। হুযুর (সাঃ) কোরাইশ সরদারদের সকল অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করেই তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন, গোত্রীয় মর্যাদার দোহাই তাঁর সংকল্পকে কোন অবস্থাতেই টলাতে পারেনি।[২]

বদরের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে হুযুর (সাঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাসও বন্দী হয়ে এসেছিলেন। মুক্তিপণ আদায় করে একে একে বন্দীদের মুক্ত করা হচ্ছিল। আনসারগণের কেউ কেউ আরয করলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)! অনুমতি দিলে আমরা মুক্তিপণ ছাড়াই হযরত আব্বাসকে মুক্ত করে দিই।" জবাব দিলেন, "কক্ষনো নয়—এক দেরহামও মাফ করা চলবে না।"[৩]

মজলিসে কোন কিছু বণ্টন করতে হলে ডানদিক থেকে শুরু করা হত। এর মধ্যে ধনী-দরিদ্র ছোট-বড় কোন পার্থক্য করা হত না। সবার ক্ষেত্রেই সমতাপূর্ণ ব্যবহার করা হত।

একবার সাহাবীদের মজলিসে সবার ডানে সর্বকনিষ্ঠ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বসেছিলেন। বামদিকে ছিলেন বয়স্ক এবং সম্মানিত সাহাবিগণ। এমন সময় কোনখান থেকে কিছু দুধ এল। হুযুর (সাঃ) সামান্য পান করে ডানদিকে উপবিষ্ট হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে লক্ষ্য করে বললেন, "তুমি যদি অনুমতি দাও, তবে প্রথমে বাম দিককার এঁদের থেকে পরিবেশন শুরু করতে পারি।" হযরত ইবনে আব্বাস বললেন, "এ সম্মান আমি ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাঃ)।" অগত্যা পেয়ালা হযরত ইবনে আব্বাসের হাতেই দিতে হল।[৪]

১. বোখারী ও মুসলিম, দণ্ডবিধি অধ্যায়।
২. বোখারী কেন্দইয়া অধ্যায়।
৩. বোখারী শরীফ।
৪. বোখারী শরীফ।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার হুযুর (সাঃ) আমার বাড়িতে তশরীফ আনলেন। খাবার পানি চাইলে আমি দুধ এনে পেশ করলাম। মজলিসে বামে হযরত আবু বকর, মধ্যস্থলে হযরত ওমর এবং ডানদিকে জনৈক বেদুঈন বসে ছিলেন। হুযুর (সাঃ) দুধ পান শেষ করলে হযরত ওমর (রাঃ) ইশারা করলেন, যেন অবশিষ্টটুকু হযরত আবু বকরের হাতে দেয়া হয়। কিন্তু দুধের পেয়ালা ডানদিকে উপবিষ্ট বেদুঈনের হাতেই দেয়া হল।[১]

কোরাইশরা নিজেদের সর্বাপেক্ষা মানী গোত্র বলে মনে করত। হজের সময়ও তারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশত না। এজন্যে তারা আরাফাতে না গিয়ে মুজদালেফাতে অবস্থান করত। হুযুর (সাঃ) নবুয়তের আগে-পরে সব সময়ই সাধারণ মানুষের সঙ্গে আরাফাত পর্যন্ত গমন করতেন। বিদায় হজের সময় আরাফাতের ময়দানে তাঁর জন্যে বিশেষ কোন স্থানও নির্ধারিত করতে দেননি। ছায়ার জন্যে কোন প্রকার ব্যবস্থাও করা হয়নি। সাহাবিগণ আরাফাতে একটি স্থান নির্দিষ্ট করে রাখার জন্যে অনুমতি চাইলে এরশাদ করলেন, "না, তা হতে পারে না। যারা আগে আসবেন, সুবিধাজনক স্থানে তাঁরাই বসবেন।"[২]

সাহাবীরা যখন সম্মিলিতভাবে কোন কাজ করতেন, তখন হুযুর (সাঃ)-ও তাঁদের সঙ্গে সে কাজে শরীক হতেন এবং সাধারণ শ্রমিকের মত গায়ে খেটে পরিশ্রম করতেন। মদীনায় পদার্পণ করে মসজিদ নির্মাণই ছিল সাহাবিদের সর্বপ্রথম সম্মিলিত কাজ। এ কাজে হুযুর (সাঃ)-ও সাধারণ মজদুরদের মত ইট-পাথর বহন করেন। সাহাবীদের কেউ কেউ আরয করলেন "ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)! আমরা থাকতে আপনি কেন এত কষ্ট করছেন? কিন্তু কোন অনুরোধই তাঁকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারল না।"[৩]

আহযাবের যুদ্ধের সময় মদীনার চারদিকে গভীর পরিখা খনন করে দুশমনের আক্রমণ প্রতিহত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরিখা খনন করার কাজেও হুযুর (সাঃ) একজন সাধারণ মজদুরের মতই মাটি কাটার কাজে যোগদান করেন। মাটি কাটতে কাটতে পেটে-পিঠে পর্যন্ত মাটির আস্তরণ লেগে যায়।[৪]

কোন এক সফরে সাহাবিরা সম্মিলিতভাবে খানা তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। প্রত্যেকেই এক-একটি দায়িত্ব বণ্টন করে নিলেন। জঙ্গল থেকে জ্বালানি কাঠ কুড়িয়ে আনার দায়িত্ব হুযুর (সাঃ) নিজে গ্রহণ করলেন। সাহাবিগণ আরয করলেন, আমরা সেবকরাই এ কাজ করতে পারব। জবাব দিলেন, "তা

---

১. মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল ৬ষ্ঠ খণ্ড।
২. বোখারী শরীফ হিজরত প্রসঙ্গ।
৩. বোখারী শরীফ ঃ আহযাব যুদ্ধের বর্ণনা।
৪. যারকানী, ৪র্থ খণ্ড, তাবারী।

তোমরা পার, তবে আমি নিজেকে তোমাদের মধ্যে বিশিষ্ট করে রাখতে চাই না। যে ব্যক্তি সহযাত্রীদের মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে থাকতে চায়, আল্লাহ্ তাকে পছন্দ করেন না।"[১]

বদর যুদ্ধে সোয়ারী ছিল সীমিত সংখ্যক। তিন তিনজনের ভাগে একটি করে উট পড়েছিল। সৈন্যগণ পালাক্রমে সে উটে আরোহণ করছিলেন। খোদ হুযুর (সাঃ)-ও সাধারণ সৈনিকদের মত অন্য দুজনের সঙ্গে একটি উটের সওয়ারীতে শরীক ছিলেন। সঙ্গী সাহাবীদ্বয় অনুনয় করে বলতেন "ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা পায়ে হেঁটে চলতে পারব। আপনি উটে আরোহণ করে চলুন।" জবাব দিতেন, "তোমরা আমার চাইতে বেশি হাঁটতে পারবে না, আর তোমাদের চেয়ে আমি সওয়াবের জন্যে কম লালায়িত নই।"[২]

বিনয় ঃ ঘরের সমস্ত কাজকর্ম ছেঁড়া কাপড়ে তালি লাগানো, ঘর ঝাড় দেয়া, দুধ দোহন, জুতা সেলাই, বাজার থেকে সওদাপত্র বয়ে আনা প্রভৃতি সব কিছুই হুযুর (সাঃ) নিজ হাতে করতেন। গাধার পিঠে আরোহণ করে কোথাও যাওয়া বা ক্রীতদাস এবং মিসকীনদের সঙ্গে বসে আহার করাতেও হুযুর (সাঃ) বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করতেন না।[৩]

একবার ঘর থেকে বের হয়ে এলে সাহাবিরা সম্মানের জন্যে উঠে দাঁড়ালে সবাইকে বারণ করে এরশাদ করলেন, অনারবদের মত সম্মান প্রদর্শনের জন্যে উঠে দাঁড়াবে না।[৪]

নিতান্ত কোন দরিদ্র লোকেরও অসুস্থতার সংবাদ পেলে বাড়িতে গিয়ে তাকে দেখে আসতেন। ফকীর-মিসকীন এবং দরিদ্র লোকদের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে বসতেন। সাহাবীদের মজলিসে বসে থাকলে কোন অপরিচিত লোক সহজে তাঁকে চিনতে পারত না। কোন মাহফিলে গেলে যেখানে জায়গা পেতেন সেখানেই বসে পড়তেন, বিশেষ কোন স্থানের জন্যে অপেক্ষা করতেন না।[৫]

একবার একজন নবাগত ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দরবারে হাজির হলে হুযুর (সাঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "ভয় পেয়ো না। আমি এমন একজন সাধারণ কোরাইশী নারীর সন্তান, যিনি শুকনা গোশত পাক করে খেতেন।"[৬]

১. যারকানী, ৪র্থ খণ্ড, তাবারী।
২. মুসাদে আহ্মদ, ১ম খণ্ড। আবু দাউদ তায়ালেসী।
৩. শামায়েলে তিরমিযী।
৪. আবু দাউদ ঃ ইবনে মাজাহ্।
৫. শামায়েলে তিরমিযী।
৬. মুসতাদরাক ঃ ৩য় খণ্ড।

বিনয়ে বিগলিত হয়ে অনেক সময় পায়ের উপরে বসে আহার করতেন এবং বলতেন আমি একজন দাস বই তো নই। দাসের মত আহার করি এবং দাসের মত বসে থাকি। একবার খানার মজলিসে লোক বেশি হওয়ায় পায়ের উপর বসে গেলেন। জনৈক বেদুঈন জিজ্ঞেস করল, "মোহাম্মদ (সাঃ)! এ আবার কোন নিয়মের বসা?" জবাব দিলেন, "আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাকে একজন বিনয়ী বান্দা হিসাবে তৈরি করেছেন। আমি দাম্ভিক অহঙ্কারী নই।"[১]

হুযুর (সাঃ) এত বিনয়ী ছিলেন যে নিজের সম্পর্কে নিতান্ত সঙ্গত প্রশংসাসূচক শব্দও পছন্দ করতেন না। একবার জনৈক সাহাবী সম্বোধন করলেন যে "হে আমাদের মালিক ও মালিকের সন্তান।" এধরনের সম্বোধন শুনে বলতে লাগলেন, "লোক সকল! পরহেজগারী এখতিয়ার কর। আমার ভয় হয়, শয়তান তোমাদের কাবু করে না ফেলে! আমি আবদুল্লাহ্র পুত্র মোহাম্মদ (সাঃ), আল্লাহ্র একজন বান্দা এবং রসূল। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যে মরতবা দান করেছেন, আমি চাই না যে তোমরা আমার সম্পর্কে এর চাইতে বাড়িয়ে কিছু বল।"[২]

এক ব্যক্তি তাঁকে "হে মানবশ্রেষ্ঠ" বলে সম্বোধন করলে তিনি বলেছিলেন, "এ কথাটি হযরত ইবরাহীম সম্পর্কে প্রযোজ্য।"[৩]

আবদুল্লাহ ইবনে সুখাইর বর্ণনা করেন, আমরা যখন বনী আমের গোত্রের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হয়েছিলাম, আমরা তখন বলেছিলাম 'আপনি আমাদের মালিক' আমাদের এ কথার প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, "মালিক একমাত্র আল্লাহ্।" আমরা বললাম "আপনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।" জবাবে বললেন, "কথা বলার সময় লক্ষ্য রেখো, শয়তান তোমাদের পরিচালিত করছে কিনা?"[৪]

মদীনায় এক পাগল ধরনের বৃদ্ধা বাস করত। একদিন সে দরবারে এসে বলল, "মোহাম্মদ (সাঃ)! আমার একটি কাজ করে দিতে হবে।" বললেন,— "চল, তোমার কাজ করে দেব।" বৃদ্ধা চলতে লাগল, হুযুর (সাঃ) তার পেছনে পেছনে চললেন। বেশ কিছুদূর গিয়ে সে একটি গলিমুখে বসে পড়ল। হুযুর (সাঃ)-ও তার সামনে বসে পড়লেন এবং বিনাদ্বিধায় তার কাজ করে দিয়ে এলেন।[৫]

১. আবু দাউদ ঃ খাদ্য গ্রহণ প্রসঙ্গ।
২. মুসনাদে আহমদ, ৩য় খণ্ড।
৩. মুসলিম শরীফ, হযরত ইবরাহীমের বর্ণনা।
৪. আবু দাউদ ঃ আদব অধ্যায়।
৫. আবু দাউদ আদব অধ্যায়।

মাখরামা নামক একজন সাহাবী ছিলেন। হুযুর (সাঃ) চাদর বণ্টন করছেন শুনে তিনি তাঁর পুত্র মেসওয়ারকে সঙ্গে নিয়ে দরবারে এসে হাজির হলেন। হুযুর (সাঃ) তখন কাজ সেরে বাড়ির ভেতরে চলে গিয়েছিলেন। মাখরামা ছেলেকে বললেন, "ডাক দাও, এসে পড়বেন।" ছেলে বলল, "আমরা সাহায্যপ্রার্থী, হুযুর (সাঃ)-কে ডেকে বাড়ির বাইরে আনার মত লোক কি আমরা?" পিতা পুত্রকে বললেন, "বৎস! মোহাম্মদ (সাঃ) পরাক্রম প্রদর্শনকারী লোক নন।" পিতার কথায় পুত্র সাহস করে ডাকলেন। ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গেই হুযুর (সাঃ) বাড়ি থেকে বাইরে চলে এলেন এবং পিতা-পুত্রকে রেশমের কাজ করা আ'বা দিয়ে বিদায় করলেন।[১]

একবার জনৈক আনসারীর সামনে এক ইহুদী কসম করতে গিয়ে বলেছিল, সে আল্লাহ্র কসম যিনি মুসাকে সমগ্র মানবজাতির উপরে মর্যাদা দান করেছেন। এ কথা শুনে আনসারী মনে করলেন, এ কথার দ্বারা বোধ হয় হুযুর (সাঃ)-কে ছোট করা হল। তাই রাগান্বিত হয়ে ইহুদীর মুখে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করে বসলেন। ইহুদী ফরিয়াদ নিয়ে দরবারে হাজির হল। হুযুর (সাঃ) সব কথা শুনে সাহাবীকে ডেকে বললেন, " অন্যান্য নবিদের চেয়ে তোমরা আমাকে বেশি সম্মান দিও না।"[২]

কোন ব্যক্তির পক্ষে তখনই অহঙ্কারী হয়ে ওঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক, যখন তার একটি অঙ্গুলির ইশারায় অগণিত বীরযোদ্ধা জীবনের পরওয়া না করে নির্দেশের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে। বিশেষত, এমন একটি দুর্ধর্ষ বাহিনীর নেতৃত্ব দান করে কোন বিজয়ী বীর যখন সদ্য পদানত কোন জনপদে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর পক্ষে বীরের আত্মশ্লাঘা প্রকাশ নিতান্তই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন বিজয়ী বীরের আত্মশ্লাঘা প্রকাশ নিতান্তই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন বিজয়ী বীরের বেশে মক্কা শহরে প্রবেশ করেন, তখন বিনয়ে তাঁর মস্তক নীচু হয়ে হাওদার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। খায়বর বিজয়ের পর বিজয়ী সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে যখন নগরে প্রবেশ করেন তখন সোয়ারী ছিল একটি গাধা, তাও ছিল লাগামহীন, একটি খেজুর ছালের দড়ি দিয়ে লাগামের কাজ চালানো হচ্ছিল। বিদায় হজের সে মহাসম্মেলনে ভাষণ দেয়ার সময় যে হাওদাটিতে বসে মহানবী (সাঃ) বিশ্বমানবের মুক্তির মহাসনদ ঘোষণা করেছিলেন, তার গুরুত্ব কত ছিল, তা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. বোখারী শরীফ।
২. বোখারী শরীফ ঃ হযরত মুছা প্রসঙ্গ।

অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করতে বারণ করতেন ঃ শেরেকীর প্রথম সোপান হচ্ছে নবী-রসূল এবং পীর-আওলিয়াদের প্রতি সীমা-বহির্ভূত সম্মান প্রদর্শন। হুযুর (সাঃ) এ বিষয়টি সম্পর্কে অত্যধিক সাবধানতা অবলম্বন করতেন। হযরত ঈসার (আঃ) অনুসারী হিসাবে যারা পরিচয় দিত, তাদের নজীর সামনেই ছিল। বলতেন, " তোমরা আমার এমন সীমাতিরিক্ত প্রশংসা করো না, যেমন খৃষ্টানরা মরিয়মতনয় সম্পর্কে করে থাকে। আমি শুধু আল্লাহ্র একজন বান্দা এবং মনোনীত পয়গম্বর মাত্র।"[১]

কায়স ইবনে সা'আদ বর্ণনা করেন, আমি হীরা শহরে গিয়ে দেখলাম, লোকেরা নগর অধিপতির দরবারে সেজদার মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন করছে। হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে এসে সেখানকার বর্ণনা দিলাম এবং নিবেদন করলাম, "আমরাও কেন আপনাকে সেজদা করি না? আপনি তো তাদের তুলনায় অনেক বেশি মর্যাদার অধিকারী!" জবাব দিলেন, "তোমরা কি আমার কবরের পাশে গিয়ে সেজদা করবে?" আমি বললাম "না।" বললেন, "তবে জীবিতাবস্থায়ও সেজদা করা উচিত নয়।"[২]

সাহাবী মোয়াববয ইবনে আফরার কন্যা রবীর বিয়ে উপলক্ষ্যে হুযুর (সাঃ) তাঁর বাড়িতে গেলেন এবং নববধূর জন্যে পাতা বিছানার এককোণে বসে পড়লেন। ছোট ছোট মেয়েরা এসে চারদিকে সমবেত হল। তারা দফ বাজাতে বাজাতে বদরের শহীদানের উদ্দেশ্যে রচিত শোকগাথা গাইছিল। একটি কবিতাংশে তারা বলছিল ঃ

"আমাদের মধ্যে এমন এক নবী আছেন, যিনি আগামী দিনের খবরও অবগত আছেন।"

মেয়েদের বললেন, "এ কথা কয়টি বাদ দিয়ে প্রথমে যা বলছিলে তাই বল।"[৩]

পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুদিবসে সূর্যগ্রহণকে কেন্দ্র করে সাধারণ্যে যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল, একজন মর্যাদাপ্রত্যাশী লোকের পক্ষে সে ধারণার সদ্ব্যবহার করা ছিল মোক্ষম মওকা'। কিন্তু নবুয়তের শান যে কত বড় তা প্রমাণ করার জন্যে হুযুর (সাঃ) তৎক্ষণাৎ লোকজনকে মসজিদে সমবেত করে সে ভুল ধারণার নিরসন করলেন। দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন— চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ্র নিদর্শন, পৃথিবীর কোন মানুষের জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক নেই।[৪]

---

১. বোখারী প্রথম খণ্ড।
২. আবু দাউদ।
৩. মুসলিম শরীফ ঃ বিবাহে দফ বাজানের বিবরণ।
৪. বোখারী-মুসলিম ঃ সূর্য গ্রহণের নামায প্রসঙ্গ।

একদিন অজু করার সময় হাত থেকে ঝরে পড়া ব্যবহৃত পানি হাত বাড়িয়ে সংগ্রহ করে কতিপয় ভক্ত তা বরকতের আশায় শরীরে মাখছিলেন। হুযুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এমন করছ কেন? সাহাবিরা জবাব দিলেন, আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসূলের মহব্বতে। বললেন, "যদি কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে মহব্বত করে আনন্দ লাভ করতে চায়, তাহলে যেন সে সদা সত্য কথা বলে, কোন আমানত সোপর্দ করা হলে যথার্থভাবে যেন সে আমানত আদায় করে এবং পড়শীদের হক যেন পূর্ণমাত্রায় আদায় করতে সচেষ্ট থাকে।"[১]

এক ব্যক্তি খেদমতে হাজির হয়ে কথায় কথায় বলে ফেললেন, "আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন এবং আপনি যা ইচ্ছা করেন।" বললেন, "দেখ, তুমি আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করে ফেলেছ। এভাবে বল যে "একমাত্র আল্লাহ্ যা চান।"[২]

লজ্জাশীলতা ঃ সহীহ্ হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে হুযুর (সাঃ) কুমারী মেয়েদের চাইতেও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। প্রতিটি অভিব্যক্তিতেই লজ্জাশীলতার প্রভাব ধরা পড়ত। তিনি জীবনে কখনো মুখে খারাপ কথা উচ্চারণ করেননি। বাজারে গিয়ে চুপচাপ এক পাশ দিয়ে চলে যেতেন। মৃদুহাস্য ছাড়া কোন সময় মুখে অট্টহাস্য শোনা যায়নি। মজলিসে উপবিষ্ট অবস্থায় কোন কথা অপছন্দ হলেও মুখে কিছু বলতেন না, চেহারার অভিব্যক্তি দেখে সাহাবিরা সাবধান হয়ে যেতেন।

অন্যান্য দেশের মত তৎকালীন আরবসমাজেও লজ্জা-শরমের বালাই খুব কমই ছিল। উলঙ্গ হয়ে গোছল করা ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার। উলঙ্গ হয়ে কাবা তওয়াফ করা ছিল সাধারণ রেওয়াজ। হুযুর (সাঃ) এ সমস্ত নির্লজ্জতা প্রকৃতিগতভাবেই অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। এক সময় এরশাদ করেছিলেন ঃ "তোমরা হাম্মামে গোছল করতে যেয়ো না।" সাহাবিরা আরয করলেন, হাম্মামে গোছল করলে শরীর পরিষ্কার হয়, রোগ-বিমারী থেকে মুক্ত থাকা যায়। বললেন, "হাম্মামে গোছল করলেও পর্দার প্রতি খেয়াল রেখো।" আরবে সাধারণত হাম্মামের প্রচলন ছিল না। সিরিয়া ও ইরাকের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতেই এর প্রচলন ছিল বেশি। তাই নির্দেশ দিয়েছিলেন, "আরব সীমান্তবহির্ভূত দেশ জয় করার পর তোমরা সে সমস্ত এলাকায় প্রচুর হাম্মাম পাবে। সেগুলোতে প্রবেশ করার সময় চাদর পরে প্রবেশ করো।"

একবার কয়েকজন বিদেশী স্ত্রীলোক হযরত উম্মে সালমার কাছে এলে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, এরা সিরিয়ার অন্তর্গত হেম্‌স-এর অধিবাসী।

---

১. শোয়াবুল-ঈমান ঃ বায়হাকী।
২. ইমাম বোখারী রচিত আদাবুল মুফরাদ।

বললেন, "হাম্মাম কি কোন খারাপ জিনিস?" হযরত উম্মে-সালমা বললেন, আমি হুযুর (সাঃ)-এর মুখে শুনেছি, "যে সমস্ত স্ত্রীলোক নিজের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও কাপড় খোলে, আল্লাহ্ পাক তাদের আবরু নষ্ট করে দেন।"[১]

আবু দাউদে বর্ণিত আছে ঃ হুযুর (সাঃ) প্রথম প্রথম হাম্মামে গোছল করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। পরে পুরুষদের কাপড় পরে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হয়, কিন্তু স্ত্রীলোকদের জন্যে সর্বাবস্থাতেই তা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়।

আরবে শৌচাগারের কোন রেওয়াজ ছিল না। লোকেরা মাঠে-ময়দানে মল-মূত্র ত্যাগ করতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু এর মধ্যেও আড়াল করার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করত না, বরং মুখোমুখি বসে মল-মূত্র ত্যাগ করতে করতেও কথাবার্তা বলতে থাকত। হুযুর (সাঃ) এ ধরনের নির্লজ্জতা প্রদর্শন করতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন, "আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের লজ্জাহীনতায় নারাজ হন।"[২] হুযুর (সাঃ) প্রস্রাব-পায়খানার জন্যে এত দূরে চলে যেতেন যে লোকচক্ষু হতে সম্পূর্ণরূপে আড়াল হয়ে পড়তেন। মক্কায় অবস্থানকালে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার প্রয়োজনে হরম শরীফের সীমা ছেড়ে সম্পূর্ণ বাইরে চলে যেতেন, যা কা'বা শরীফ থেকে অন্তত তিন মাইল দূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

নিজের হাতে শ্রম ঃ সাহাবিদের সবাই সর্বক্ষণ সেবার জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষারত থাকা সত্ত্বেও হুযুর (সাঃ) সর্বাবস্থাতেই নিজের কাজকর্ম নিজহাতে করাই পছন্দ করতেন। হযরত আয়েশা, হযরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হযরত হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে

كَانَ يَخْدِمُ نَفْسَهُ "তিনি সবসময়ই নিজের কাজকর্ম নিজেই করতেন।"[৩]

এক ব্যক্তি হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘরে অবস্থানকালে কি ভাবে সময় অতিবাহিত করতেন? জবাব দিলেন, "গৃহস্থালী কাজকর্মে লিপ্ত থাকতেন। নিজের হাতে কাপড়ে তালি লাগাতেন, ঘর ঝাড় দিতেন, দুধ দোহন করতেন, বাজার থেকে সওদা খরিদ করে আনতেন, জুতা ছিঁড়ে গেলে নিজ হাতে সেলাই করে নিতেন, বালতিতে রশি বাঁধতেন, উট বাঁধতেন, নিজের হাতে ঘাস-পানি দিতেন, অন্যান্যদের সঙ্গে মিলে আটা গুলতেন।"[৪]

১. তরগীব ও তরহীব।
২. আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্।
৩. শরহে শেফা ঃ কাজী আয়ায।
৪. বোখারী, কাজী আয়ায, যারকানী, ইবনে মাজাহ.

হযরত আনাস ইবনে মালেকের বর্ণনা, একবার খেদমতে হাজির হয়ে দেখতে পেলাম, হুযুর (সাঃ) নিজের হাতে উটের শরীরে তেল মালিশ করছেন। দ্বিতীয় এক বর্ণনায় আছে ঃ তিনি যাকাৎ বাবত উসুল করা উটের গায়ে চিহ্ন এঁকে দিচ্ছিলেন, তৃতীয় এক বর্ণনায় আছে ঃ যাকাতের ছাগল-পালের গায়ে চিহ্ন আঁকছিলেন। একবার মসজিদে গিয়ে দেখতে পেলেন, কে যেন নাক পরিষ্কার করতে গিয়ে দেয়াল নষ্ট করে রেখেছে। একটি প্রস্তরখণ্ড নিয়ে নিজহাতে তা পরিষ্কার করার পর লোকজনকে ভবিষ্যতে এমন কাজ করতে নিষেধ করে দিলেন।[১]

হুযুর (সাঃ) বাল্যকালে কাবাশরীফ মেরামত করার সময় পাথর বয়ে নির্মাণকার্যে সাহায্য করেছিলেন।[২] কুবার মসজিদ এবং মসজিদে নববীর নির্মাণকার্যে, আহ্যাবের লড়াইয়ে পরিখা খননে যেভাবে সাধারণ শ্রমিকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রস্তর বহন থেকে শুরু করে মাটি খননের কাজ করেছেন, তার বিস্তারিত বর্ণনা ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এক সফরে বকরী যবাই করে পাক করার উদ্যোগ-আয়োজন হলে সাহাবিরা কাজ বণ্টন করে নিলেন। খোদ হুযুর (সাঃ) জঙ্গল থেকে জ্বালানি কাঠ কুড়িয়ে আনার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করলেন। সাহাবিরা আপত্তি করলে বললেন, "আমি বিশিষ্ট একজন হয়ে থাকা পছন্দ করি না।"[৩]

এক সফরে জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে নিজ হাতে তা সেলাই করতে বসলে জনৈক সাহাবী নিবেদন করলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)! আমাকে দিন, ঠিক করে দিই।" জবাব দিলেন, "এটাও এক রকম আত্মম্ভরিতা, যা আমি পছন্দ করি না।"[৪]

'জন সাহাবী বর্ণনা করেন, একবার আমরা খেদমতে হাজির হয়ে দেখতে পেলাম, নিজের হাতে ঘর মেরামত করছেন। আমরাও কাজে শামিল হয়ে গেলাম। কাজ শেষে হুযুর (সাঃ) আমাদের মঙ্গলের জন্যে দোয়া করলেন।[৫]

অন্যের কাজে সাহায্য ঃ খাববাব ইবনে আরত নামক জনৈক সাহাবী যুদ্ধে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর বাড়িতে অন্য কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মানুষ ছিলেন না। মেয়েরা দুধ দোহন করতে জানতেন না। এজন্য হুযুর (সাঃ) প্রতিদিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে দুধ দোহন করে দিয়ে আসতেন।[৬] হাবশা থেকে আগত প্রতিনিধি

১. নাসায়ী ঃ মসজিদের বর্ণনা।
২. বোখারী ঃ ইসলাম পূর্ব জীবন প্রসঙ্গ।
৩. যারকানী ৪র্থ খণ্ড, তাবারী।
৪. ইবনে আসাকের।
৫. মুসনাদে আহমদ ৩য় খণ্ড।
৬. ইবনে সাআ'দ ৬ষ্ঠ খণ্ড।

দলের লোকজনকে নিজহাতে সেবা-যত্ন করেছিলেন। সাহাবীরা আপত্তি করলে বলেছিলেন, "এরা আমার বন্ধুদের সেবা করেছেন, আমাকে নিজহাতে এদের সেবা-যত্ন করতে দাও।"

তায়েফের সকীফ গোত্রীয় যে কাফেররা একসময় সত্য প্রচারে আগত মহানবী (সাঃ)-এর উপর নির্যাতন করে সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত করে দিয়েছিল, ৯ম হিজরীতে মদীনায় তাদের প্রতিনিধিদল আগমন করলে মসজিদে নববীতে স্থান দিয়ে নিজের হাতে তাদের মেহমানদারীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

মদীনার দাসী-বাঁদীরা পর্যন্ত এসে বলত, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ)! আমার অমুক কাজটি করে দিন। তিনি বিনাদ্বিধায় তাদের কাজ করে দিতেন। একদিন এক আধপাগলা বাঁদী এসে হাত ধরে বলল, আমার একটি কাজ করে দিতে হবে। বললেন, শহরের যেখানেই তোমার কাজ থাকুক না কেন, আমি তা করে দেব। পাগলী হুযুর (সাঃ)-কে সঙ্গে করে বহু দূরবর্তী এক গলিতে নিয়ে গেল এবং হুযুর (সাঃ) তার কাজ করে দিয়ে ফিরে এলেন।[১]

সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফা বর্ণনা করেন ঃ "বিধবা মিসকীনদের সঙ্গে গিয়ে তাদের কাজ-কর্ম করে দিতে হুযুর (সাঃ) কখনও দ্বিধা-বোধ করতেন না।"[২]

একবার ঠিক নামায শুরু হওয়ার মুহূর্তে জনৈক বেদুঈন এসে আবদার করল, তার একটি কাজ করে দিতে হবে, তার পক্ষে দেরী করা সম্ভব নয়। হুযুর (সাঃ) নামায স্থগিত রেখে তার সঙ্গে গেলেন এবং কাজ সম্পন্ন করে এসে নামাযে দাঁড়ালেন।[৩]

সংকল্পে দৃঢ়তা ঃ কোরআন পাকে "اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ" "রসূলদের মধ্যে যাঁরা সংকল্পে অটল" এ শব্দ ব্যবহার করে নবী-রসূলদের প্রশংসা করা হয়েছে। হুযুর (সাঃ) যেহেতু ছিলেন শেষ রসূল, তাই আল্লাহ্ পাক তাঁর ব্যক্তিত্বে দৃঢ়-চিত্ততাও পরিপূর্ণ মাত্রায় দান করেছিলেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইসলামের এক-একটি অক্ষয় কীর্তি হুযুর (সাঃ)-এর সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব এবং অটল মনোবলেরই এক-একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। আরব কুফরিস্তানের বিয়াবানে দাঁড়িয়ে একটি মাত্র মানুষ নিঃসঙ্গ অবস্থায় সত্যের আওয়াজ বুলন্দ করলেন। মরুভূমির প্রতিটি বালুকণা পর্যন্ত শত্রুতার পাহাড় হয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু নবুয়তের অনমনীয় ব্যক্তিত্ব এবং খোদাপ্রদত্ত মনোবলের সামনে আঘাত খেয়ে পিছু হটতে

১. মুসলিম ঃ আবু দাউদ ঃ আখলাক অধ্যায়।
২. নাসায়ী, -আবু দাউদ।
৩. আবু দাউদ ঃ আদব অধ্যায়।

বাধ্য হল। বাধার সকল পাহাড় সে অনমনীয়তার সামনে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। দীর্ঘ তেরটি বছর ক্রমাগত প্রতিরোধের মধ্যেও তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্ব ভীতি বা নৈরাশ্যের সঙ্গে আপস করতে পারল না। এমনই অনমনীয় সাধনার মধ্যেই সে একক ব্যক্তিত্ব কয়েক লক্ষ জীবন উৎসর্গকারী অনুসারী রেখে পরপারের ডাকে সাড়া দিলেন।

হিজরতের পূর্বে কাফেরদের বিরামহীন অত্যাচারে জর্জরিত সাহাবিরা একদিন নিবেদন করলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)! আমাদের জন্য আপনি দোয়া করছেন না কেন?" আবদার শুনে চেহারা মোবারক রক্তবর্ণ হয়ে গেল। বলতে লাগলেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী সত্যানুসারীদের করাত দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে, লোহার আচড়া দ্বারা আঁচড়ে হাড় থেকে গোশত পৃথক করা হয়েছে, কিন্তু এহেন কঠিন পরীক্ষাও তাঁদের আল্লাহ্র দ্বীন থেকে বিমুখ করতে পারেনি। আল্লাহ্র কসম, ইসলাম তার পরিপূর্ণ মর্যাদায় অবশ্যই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, সে দিন সাফা-পর্বতের পাদদেশ থেকে হাজরামাওত পর্যন্ত একজন নিঃসঙ্গ যাত্রী নির্ভয়ে সফর করবে, তার অন্তরে একমাত্র আল্লাহ্র ভয় ছাড়া অন্য কোন ভয়-ভীতির চিহ্নমাত্র থাকবে না।"[১]

মক্কার কোরাইশ নেতৃবৃন্দ সর্বপ্রকারে বাধা সৃষ্টি করেও যখন ব্যর্থ হল, তখন তাঁকে রাজ সিংহাসন, ধন-সম্পদ এবং সুন্দরী নারীর প্রলোভনে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টার করল। এর যে কোন একটি প্রলোভন যে কোন বীর হৃদয়কে টলটলায়মান করে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এ সমস্ত আকর্ষণীয় প্রস্তাবই ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত একমাত্র হীতাকাঙ্ক্ষী আশ্রয়দাতা আবু তালেবও যখন পৃষ্ঠপোষকতা ত্যাগ করার কথা উচ্চারণ করলেন, তখন বোধহয় সে অনমনীয় সংকল্পের শেষ পরীক্ষা ঘনিয়ে এল। সে নাযুক পরিস্থিতিতে তাঁর প্রত্যয়দৃঢ় কণ্ঠ থেকে যে কথা কয়টি উচ্চারিত হয়েছিল, মানব ইতিহাসে এ অনমনীয় দৃঢ়তার দ্বিতীয় নযীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে? অকম্পিত কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, "চাচাজান! কোরাইশরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বামহাতে চন্দ্রও তুলে দেয় তবুও আমি সত্য প্রচার থেকে বিরত হব না।"[২]

বদরের ময়দানে সর্বপ্রথম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সহস্রাধিক দুর্ধর্ষ যোদ্ধার মোকাবিলায় মাত্র তিন শ' তের জন প্রায় নিরস্ত্র সঙ্গীসহ যখন কাতারবন্দী হলেন এবং কাফের বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে বাত্যাতাড়িত তৃণখণ্ডের ন্যায় মুসলিম বাহিনীর রক্ষাব্যূহ যখন ক্রমেই তাঁর চার পাশে সংকুচিত হয়ে আসছিল, তখনও ব্যক্তিত্বের সে অটল পাহাড় সম্পূর্ণ অচঞ্চল অবস্থায়ই দাঁড়িয়েছিলেন।[৩]

---

১. বোখারী শরীফ ঃ ১ম খণ্ড।
২. ইবনে হিশাম।
৩. বোখারী ২য় খণ্ড।

ওহুদ যুদ্ধের পূর্বে সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ হল। সবাই এগিয়ে গিয়ে মোকাবিলা করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করলেন। কিন্তু যুদ্ধসাজ পরিধান করে যখন যাত্রার উদ্যোগ করলেন, তখন আবার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে বলা হল। বললেন, "তা হতে পারে না, আল্লাহ্‌র নবী বর্ম পরিধান করে তা খুলে রাখতে পারে না।"[১]

হুনাইনের যুদ্ধে দুর্ধর্ষ শত্রুবাহিনীর অবিরাম তীরবৃষ্টির সামনে অধিকাংশ সাহাবী যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেন, তখনও হুযুর (সাঃ) এ মৃত্যু-বিভীষিকার মাঝেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন সঙ্গী-সঙ্গী অবিচল চিত্তে দাঁড়িয়ে রইলেন। যবান মোবারকে তখন এ বীর-রসাত্মক গাথাটি উচ্চারিত হচ্ছিল ঃ

"আমি নবী, তা মিথ্যা নয়, আমি বীর আবদুল মোত্তালেবের বংশধর।"

এক যুদ্ধ যাত্রায় পথিমধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় এক দুশমন কোষমুক্ত তরবারি নিয়ে আক্রমনোদ্যত হলে চোখ খুলে গেল। মৃত্যু-দূতের মত কোষমুক্ত তরবারি হাতে মাথার উপর দাঁড়ানো শত্রু যখন জিজ্ঞেস করল, "মোহাম্মদ (সাঃ)! এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে?" তখন যবান থেকে গুরুগম্ভীর স্বরে উচ্চারিত হয়েছিল, "আমার আল্লাহ্‌!" এই একটি মাত্র কথা শুনে হিংস্র শত্রুর অন্তরে এমন এক ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল যে তৎক্ষণাৎ সে তরবারি কোষবদ্ধ করে সামনে এসে বসে পড়তে বাধ্য হয়েছিল।

বীরত্ব ঃ উন্নততর মানবীয় চরিত্রের মূলভিত্তি হল বীরত্ব, সংকল্পে দৃঢ়তা, লক্ষ্যে স্থিরতা, অকপটে সত্য প্রকাশের প্রেরণা। এ সবকিছুই অন্তরের দুর্জয় সাহস থেকে জন্মলাভ করে। হুযুর (সাঃ) জীবনের শুরু থেকেই সীমাহীন দুর্যোগের মাঝে এগিয়ে গেছেন, বহু যুদ্ধের বিভীষিকার মোকাবিলা করেছেন, বিপদের পর বিপদের কালোমেঘে চারদিক অন্ধকার করে দিয়েছে, কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও তাঁর বীর হৃদয়ে সামান্যতম ভয়-ভীতি ছায়াপাতও করতে পারেনি। সিংহ-হৃদয় হযরত আলীর বর্ণনা, "বদরের সে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে শত্রু বাহিনীর ক্রমবর্ধমান চাপে পর্যুদস্ত হয়ে আমরা হুযুর (সাঃ)-এর আড়ালে এসে আশ্রয় গ্রহণ করতাম। তিনি ছিলেন সবার চাইতে বড় বীর, সেদিন তাঁর চাইতে শত্রু-ব্যূহের বেশি কাছে আর কেউ ছিল না।"[২]

হুনাইনের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যবাহিনীর ব্যূহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরও মুষ্টিমেয় কয়েকজন সঙ্গীসহ হুযুর (সাঃ) ময়দানে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন শত্রুর সম্মিলিত আক্রমণের একমাত্র লক্ষ্য। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হযরত বারা

১. বোখারী ২য় খণ্ড।
২. মুসনাদে আহমদ।

নামক জনৈক সাহাবীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হুনাইনের যুদ্ধে নাকি আপনারা ময়দান ছেড়ে পালাতে শুরু করেছিলেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, হ্যাঁ, একথা সত্য। তবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে হুযুর (সাঃ) তাঁর স্থান থেকে এক পাও পিছনে হটেননি। আল্লাহর কসম! আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে আমরা হুযুর (সাঃ)-এর পাশে এসেই আশ্রয় নিতাম। আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরগণও তাঁরই পাশে দণ্ডায়মান থাকতেন।[১]

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুযুর (সাঃ) সবার চাইতে বড় বীর ছিলেন। একবার মদীনায় গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে শত্রুরা শহর আক্রমণ করে বসেছে। লোকেরা অস্ত্রসহ মোকাবিলা করতে বেরিয়ে পড়লেন। সর্বাগ্রে যাকে বের হতে দেখা গেল, তিনি ছিলেন খোদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)। তাড়াহুড়ার মধ্যে ঘোড়ার পিঠে জীন বাঁধার জন্যও অপেক্ষা করলেন না, খালি পিঠে লাফিয়ে উঠেই তীরবেগে সারা শহর প্রদক্ষিণ করে এসে লোকজনকে এ বলে সান্ত্বনা দিলেন যে "ভয়ের কোন কারণ নেই, শত্রুর চিহ্নও কোথাও দেখা যায়নি।"[২]

হুযুর (সাঃ) সারা জীবনে নিজ হাতে কাউকেও হত্যা করেননি। উবাই ইবনে খালফ ছিল তাঁর জঘন্যতম দুশমনদের অন্যতম। বদর যুদ্ধের পর মুক্তিপণের মাধ্যমে ছাড়া পাওয়ার সময়ও সে এ কথা বলতে বলতেই যাচ্ছিল যে "আমার একটি ঘোড়া রয়েছে, প্রতিদিন আমি সেটিকে ভুট্টার দানা খাইয়ে থাকি। সেটির পিঠে আরোহণ করে মোহাম্মদ (সাঃ)-কে হত্যা করতে আসব।" ওহুদ যুদ্ধে সে সত্য-সত্যই সে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এসেছিল। মুসলিম বাহিনীর রক্ষণভাগ একটু দুর্বল হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সে তীব্রবেগে হুযুর (সাঃ)-এর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। সাহাবিরা বাধা দিতে চেষ্টা করলে হুযুর (সাঃ) ইশারায় মানা করলেন। দুশমন কাছে এসে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতে একটি তীরের ফলা নিয়ে তার ঘাড়ে আঘাত করলেন। সে একটিমাত্র আঘাত খেয়ে এমন বিকট চিৎকার করতে করতে ছুটে পালাল যে পেছন ফিরে আর দেখারও অবসর পেল না। তার ভয়ার্ত চিৎকার শুনে সঙ্গীরা সান্ত্বনা দিতে লাগল, "সামান্যই লেগেছে এতে এত ভয় পাওয়ার কি আছে?" সে জবাব দিল, "সত্য বটে, তবে এটা যে মোহাম্মদের (সাঃ) হাতের আঘাত।"[৩]

সত্যবাদিতা ঃ সত্যবাদিতা নবী-রসূলগণের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় একটি গুণ। এ গুণ ব্যতীত নবুয়তের কথা কল্পনাও করা যায় না। সে মতে হুযুর (সাঃ)-এর আখলাক বর্ণনা প্রসঙ্গে এ গুণটি বিস্তারিতভাবে আলোচনার অপেক্ষা

---

১. মুসলিম শরীফ ঃ হুনাইনের যুদ্ধ।
২. বোখারী ঃ যুদ্ধে বীরত্ব।
৩. শেফা— কাযী আয়ায ঃ ২য় খণ্ড এবং বায়হাকী ও আবদুর রাজ্জাক।

রাখে না। তবে এ প্রসঙ্গে শত্রুপক্ষ থেকে যে সমস্ত দ্ব্যর্থহীন স্বীকারোক্তি করা হয়েছে, সেগুলো লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা।

নবুয়তের ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পর ব্যক্তিগতভাবে যারা হুযুর (সাঃ)-কে চিনত তাদের অন্তরে কখনও এমন ধারণার সৃষ্টি হয়নি যে তিনি একটা মিথ্যা দাবি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন; বরং এ শ্রেণীর অবিশ্বাসীরাও মনে করত, (নাউযুবিল্লাহ) বোধহয় তাঁর মাথায় গোলমাল দেখা গিয়েছে, অথবা কবি-সুলভ কোন অলীক কল্পনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। সে জন্যেই তারা হুযুর (সাঃ)-কে পাগল বলেছে, যাদুগ্রস্ত অথবা কবি বলে আখ্যায়িত করেছে,—কিন্তু কখনও মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করেনি।

একদিন কোরাইশ সরদারদের এক মজলিসে হুযুর (সাঃ) সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ কোরাইশ নেতা নযর ইবনে হারেস মন্তব্য করল, হে কোরাইশ দলপতিগণ, তোমাদের উপর যে বিপদ নেমে এসেছে, আজ পর্যন্ত তোমরা তার কোন সুরাহা করতে পারলে না। মোহাম্মদ (সাঃ) তোমাদেরই সামনে শৈশব থেকে যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি তখন তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়, সত্যভাষী ও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি ছিলেন। এতদিনে যখন তাঁর চুলে পাক ধরেছে এবং তোমাদের সামনে তিনি এ সমস্ত কথা পেশ করতে শুরু করেছেন, তখন তোমরা তাঁকে যাদুকর, গণক, কবি ও পাগল বলে অভিহিত করছ। আল্লাহ্র কসম আমি তাঁর কথাবার্তা শুনেছি; মোহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে তোমাদের উল্লিখিত কোন ধারণাই ঠিক নয়। আসলে তাঁর কথাবার্তা তোমাদের জন্য কোন সমস্যাই নয়।"[১]

আবু জহল বলত, "মোহাম্মদ (সাঃ), আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করি না, তবে তুমি যা বল, এসব কথা ঠিক নয়।" এ প্রসঙ্গেই কোরআনের আয়াত নাযিল হয়,[২] তাতে বলা হয়েছে ঃ

"হে রসূল! আমি জানি, কাফেরদের এ অবান্তর কথা আপনাকে বিচলিত করে তোলে। কেননা, তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না, কিন্তু জালেমরা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে।" (আল্ আনআম-৪)।

মানুষের মাঝে নবুয়ত সম্পর্কে ঘোষণা প্রদান করার নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়ার পর যখন হুযুর (সাঃ) মক্কাবাসীকে একটি পাহাড়ের পাদদেশে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে "আমি যদি বলি, পাহাড়ের অপর পাশে একটি শত্রুদল

১. ইবনে হিশাম।
২. তিরমিযী ঃ সূরা আল্ আনআমের তফসীর প্রসঙ্গ।

তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ওত পেতে আছে, তবে কি তোমরা তা বিশ্বাস করবে?" জবাবে তখন সবাই সমস্বরে বলেছিল যে "আমরা তো কোনদিন আপনাকে মিথ্যা বলতে দেখিনি!"(২)

রোম সম্রাটের দরবারে আবু সুফিয়ানকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে নবুয়ত দাবি করার পূর্বে কখনও কি তোমরা তাঁকে মিথ্যা বলতে শুনেছ? তখন তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জবাব দিয়েছিলেন, "না; কখনো না।" অতঃপর সম্রাট তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছিলেন, "তোমরাই বলছ, জীবনে তিনি কখনও মিথ্যা বলেননি। আজ যদি তিনি আল্লাহ্ সম্পর্কে এত বড় একটি মিথ্যা বলতে শুরু করে থাকেন, তবে ইতিপূর্বে মানুষের মধ্যে মিথ্যা বলা তো তাঁর পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার হত।"[১]

অঙ্গীকার পালন ঃ অঙ্গীকার পূরণ হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র আখলাকের এমন একটি ভূষণ ছিল যে শত্রুরাও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। রোম সম্রাটের দরবারে আবু সুফিয়ানকে অন্যান্য প্রশ্নের সঙ্গে এ প্রশ্নও করা হয়েছিল যে কখনও তিনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছেন? এ প্রশ্নের জবাবেও আব সুফিয়ান বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে না কোনদিন তেমন শুনিনি।[২]

শহীদ শ্রেষ্ঠ হযরত হামযার আততায়ী ওয়াহ্শী যখন প্রাণভয়ে এদিক সেদিক পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, তখন তায়েফবাসীদের তরফ থেকে প্রেরিত এক প্রতিনিধিদলের মাঝে তাকেও মদীনায় পাঠানোর প্রস্তাব করা হয়। তার ভয় ছিল, হাতের কাছে পেলে হয়ত তার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। কিন্তু শত্রু পক্ষের তরফ থেকেই তাকে আশ্বাস দেয়া হল, ''তুমি নির্ভয়ে যেতে পার, মোহাম্মদ (সাঃ) কখনও কোন দূতকে হত্যা করেন না।" এ আশ্বাসের উপর আস্থা স্থাপন করেই তিনি দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম কবুল করেছিলেন।[৩]

সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হুযুর (সাঃ)-এর জঘন্যতম দুশমনদের অন্যতম ছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর প্রাণভয়ে ইয়ামনে আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে জিদ্দা পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। ওমাইর ইবনে ওয়াহাব হুযুর (সাঃ)- এর খেদমতে হাজির হয়ে ঘটনা বিবৃত করলে হুযুর (সাঃ) পবিত্র পাগড়ী খুলে দিয়ে বললেন, "যাও, এটি সাফওয়ানের নিরাপত্তার প্রতীক।" ওমাইর পবিত্র পাগড়ী সঙ্গে করে জেদ্দায় পৌঁছালেন এবং সাফওয়ানকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "পালানোর আর প্রয়োজন নেই, তোমাকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে।" ওমাইরের সঙ্গেই তিনি খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন,"ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ), আমাকে কি আপনি নিরাপত্তা দিয়েছেন?" জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, এ কথা সত্য।[৪]

---

১. বোখারী শরীফ ঃ সূরা তাব্বাত-এর তফসীর প্রসঙ্গ।
২. বোখারী ওহী নাযিল অধ্যায়।
৩. বোখারী ঃ ওহী নাযিল অধ্যায়।
৪. বোখারী শরীফ ঃ ওহুদের যুদ্ধ।

আবু রাফে' ছিলেন একজন ক্রীতদাস। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মক্কার কোরাইশদের পক্ষ থেকে দৌত্যকার্যে নিযুক্ত হয়ে মদীনায় এসেছিলেন। হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করার সঙ্গে সঙ্গেই তার অন্তরে ইসলামের সত্যতা বদ্ধমূল হয়ে গেল। নিবেদন করলেন,"ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)! আমি আর কাফেরদের মাঝে ফিরে যেতে চাই না।" জওয়াব দিলেন, "আমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে কোন দূতকে আটকে রাখতে পারব না। তুমি মক্কায় ফিরে যাও, সেখানে গিয়েও যদি তোমার মনের এ অবস্থা অবশিষ্ট থাকে, তবে ফিরে এসো। "সে মতে আবু রাফে' মক্কায় গেলেন এবং পুনরায় এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন।"[১]

হুদাইবিয়া সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল, মক্কা থেকে যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় চলে যায়, তবে মক্কাবাসীরা দাবি করলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। সন্ধির শর্তাদি লিপিবদ্ধ হওয়ার সময়ই আবু জন্দল পায়ে শিকল পরা অবস্থায় মক্কাবাসীদের বন্দী দশা থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। মুসলিম শিবিরের সবাই এ লোমহর্ষক নির্যাতনের দৃশ্য দেখে বিচলিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু হুযুর (সাঃ) তাঁকে লক্ষ্য করে অবিচলকণ্ঠে শুধু উচ্চারণ করলেন, "আবু জন্দল! আমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারি না! আল্লাহ্ তা'আলা খুব শীঘ্রই তোমার জন্য কোন রাস্তা বের করে দেবেন।"[২]

নবুয়ত-পূর্ব যুগের ঘটনা; আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু আসমা নামক এক ব্যক্তি ব্যবসায়িক লেন-দেন উপলক্ষে হুযুর (সাঃ)-কে এক জায়গায় অপেক্ষা করতে বলে ফিরে আসতে ভুলে গেল। তিনদিন পর সে এসে দেখতে পেল, হুযুর (সাঃ) কথা রক্ষার খাতিরে সেখানেই বসে আছেন। তাকে দেখে তিনি শুধু এতটুকুই বললেন যে "তিন দিন যাবৎ আমি আমার কথা রক্ষার জন্য এখানে বসে অপেক্ষা করছি।[৩]

বদর যুদ্ধে কাফেরদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল এক-তৃতীয়াংশেরও কম। এ সময় হুযুর (সাঃ)-এর কাছে একেক জন শক্ত-সমর্থ লোকের মূল্য যে কত বেশি ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। ঠিক তখনই হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান এবং আবু হাসান নামক দুজন সাহাবী মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এসে পৌঁছান। পালিয়ে আসার সময় পথিমধ্যে তাঁরা কাফেরদের হাতে ধরা পড়েন এবং অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার পর এ মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে মুক্তিলাভ করেন যে আসন্ন যুদ্ধে তাঁরা মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন না।

---

১. ইবনে হিশাম।
২. আবু দাউদ ঃ অঙ্গীকার পালন।
৩. বোখারী শরীফ ঃ শর্ত পূরণ, ইবনে হিশাম।

মদীনায় পৌঁছে তাঁরা হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রার্থনা করলে তিনি এরশাদ করলেন, "তোমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে যাও। আমরা সর্বাবস্থাতেই অঙ্গীকার পূর্ণ করব। শুধুমাত্র আল্লাহ্র সাহায্য আমাদের প্রয়োজন।"[১]

কৃচ্ছ্রতা ও অল্পে তুষ্টি ঃ ইউরোপীয় (খৃষ্টান) লেখকদের ধারণা, হুযুর (সাঃ) মক্কায় অবস্থান কাল পর্যন্ত নবী-সুলভ জীবনযাপন করতেন, তবে মদীনায় আসার পর তাঁর জীবন একজন নরপতির জীবনে রূপান্তরিত হয়। এদের উপরোক্ত ধারণা যে কত বড় মিথ্যা, তা নতুন করে প্রমাণ করার অপেক্ষা রাখে না। সমগ্র আরবে একচ্ছত্র শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও হুযুর (সাঃ)-কে উপবাস করতে হয়েছে। এমন কি, বোখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী ওফাতের সময় ব্যক্তিগত ব্যবহারের একটি বর্ম পর্যন্ত এক ইহুদীর ঘরে মাত্র তিন ছা' যবের বিনিময়ে দায়বদ্ধ ছিল! যে কাপড় পরা অবস্থায় তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, তার আগাগোড়ায় অনেকগুলো তালি লাগানো ছিল। এটা সে সময়কার ঘটনা যখন সিরিয়া সীমান্ত থেকে 'আদন' পর্যন্ত বিজিত হয়ে গিয়েছিল। আর স্বাভাবিকভাবেই সম্পদের স্রোতধারাও চারদিক থেকে মদীনার দিকে দ্রুত প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল।

ইসলামে বৈরাগ্যের প্রশ্রয় দেয়া হয়নি, বরং বৈরাগ্যের নামে ধর্মের যে উদ্ভট মূর্তি পূর্ব থেকে গড়ে তোলা হয়েছিল, ইসলামের প্রবর্তন তার উৎখাত সাধন করে ভারসাম্যপূর্ণ স্বাভাবিক মানবজীবন প্রতিষ্ঠার সাধনা করে গেছেন। ধর্মের নামে যে বৈরাগ্য মানুষকে অর্থহীন আত্মনির্যাতনে নিক্ষেপ করে, কোরআনে তার নিন্দা করেই বলা হয়েছে ঃ

"বৈরাগ্য, যা তারা নিজেরা সৃষ্টি করে নিয়েছে ....।"

বৈরাগ্য উৎখাতের জন্য স্বাভাবিক গৃহী-জীবনের সরল-সহজ আদর্শ স্থাপন করার লক্ষ্যেই হুযুর (সাঃ) কখনও কখনও উত্তম খাদ্য এবং মূল্যবান পোশাকও ব্যবহার করেছেন, কিন্তু ভোগের প্রতি সামান্যতম আকর্ষণও তাঁকে কখনও স্পর্শ করতে পারেনি। জীবনযাত্রার দর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে এরশাদ করতেন, "মানবসন্তানের জন্য বাস করার মত একটি ঘর, লজ্জা নিবারণ করার মত পোশাক, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য শুকনো রুটি ও পানি ছাড়া অন্য কোন সম্পদে কোনই অধিকার নেই।"[২]

---

১. আবু দাউদ ঃ আদব অধ্যায়।
২. মুসলিম শরীফ, ২য় খণ্ড, অঙ্গীকার পূরণের বিবরণ।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ

"কোন দিন তাঁর কোন কাপড় ভাঁজ করা হয়নি।" অর্থাৎ, এক জোড়ার অতিরিক্ত কোন কাপড়ই কোন দিন রাখতেন না, যা ভাঁজ করে রাখার প্রয়োজন হতে পারে।

একবার হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) ঘরের দেয়াল মেরামত করছিলেন। এমন সময় হুযুর (সাঃ) এসে উপনীত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কি হচ্ছে?" আবদুল্লাহ্ বললেন, ঘরের দেয়াল মেরামত করছিলাম। এরশাদ করলেন, "এত সময় কোথায়?"[১]

অনেক সময়ই ঘরে খাবার থাকত না, উপবাসে কাটাতে হত। বিশেষত তিনি জীবনের অধিকাংশ রাত্রিই না খেয়ে কাটিয়ে গেছেন।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

"রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং তাঁর পরিবারের লোকজন উপর্যুপরি কয়েক রাত্রিও না খেয়ে শুয়েছেন। কেননা, রাতে খাওয়ার মত কোন কিছুই জুটত না।"

কোন কোন সময় একাধারে দু'মাস পর্যন্ত ঘরের চুলায় আগুন জলেনি। একবার এ ঘটনা বর্ণনা করার সময় ওরওয়া ইবনে যুবাইর জিজ্ঞেস করেছিলেন, তখন আপনাদের চলত কি করে? জবাব দিয়েছিলেন, শুধু খেজুর এবং পানি খেয়ে আমরা জীবন ধারণ করতাম, অবশ্য মাঝে-মধ্যে পড়শীরা ছাগলের দুধ পাঠিয়ে দিলে তাও পান করতাম।[২]

মসৃণ চাপাতি রুটির চেহারাও হুযুর (সাঃ) দেখেননি।[৩] ময়দা যাকে আরবীতে 'হেওয়ারী' বা নকী বলা হয়, তার সঙ্গে কখনও তাঁর পরিচয় ঘটেনি। বর্ণনাকারী সাহল ইবনে সাআ'দকে জিজ্ঞেস করা হল, সে যুগে কি চালনী ছিল না? জবাব দিলেন, না। লোকেরা আটা চেলে ব্যবহার করতেন না। ভাংগা আটাতে মুখে ফুঁ দিয়ে যে পর্যন্ত ভূষি পৃথক করা সম্ভব হত, ততটুকুই করা হত এবং অবশিষ্ট ভূষি আটার সঙ্গেই গুলে রুটি তৈরি করা হত।[৪]

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে "মদীনার জীবনে হুযুর (সাঃ) কোনদিন দু'বেলা তৃপ্তি সহকারে রুটি খাননি।"[৫]

ফাদাক এবং খায়বরের আলোচনায় মোহাদ্দেস এবং সীরাতবেত্তাগণ উল্লেখ করেছেন যে হুযুর (সাঃ) এ দুটি খামার থেকে সারা বছরের খোরাক পরিমাণ

---

১. তিরমিযী ঃ কৃচ্ছ্রতার বর্ণনা।
২. ইবনে।
৩. বোখারী শরীফ ঃ রেক্কাক।
৪. বোখারী ঃ রেক্কাক।
৫. শামায়েল তিরমিযী।

শষ্য রেখে অবশিষ্ট গরীব-মিসকীন এবং অভাবগ্রস্তদের বিলিয়ে দিতেন। এ বর্ণনা এবং মাসাধিককাল পর্যন্ত চুলায় আগুন না জ্বলা অথবা অধিকাংশ রাত্রি উপবাসে কাটানোর বর্ণনা বাহ্যত পরস্পর বিরোধী মনে হতে পারে। প্রকৃত ব্যাপার হল, সম্বৎসরের খোরাক পরিমাণ শস্য অবশ্যই আসত, কিন্তু অভাবগ্রস্তদের মাঝে ক্রমাগত বণ্টন করে এবং মেহ্মান-মুসাফিরদের আপ্যায়ন করেই তা নিঃশেষ হয়ে যেত, সারা বছর চলার মত খোরাক ঘরে থাকতে পারত না।

হাদীস শরীফে হুযুর (সাঃ)-এর উপবাস-অনাহারী জীবনের অনেক আলেখ্যই বর্ণিত রয়েছে। প্রসঙ্গত, এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

একবার একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি এসে খেদমতে হাজির হলে কোন এক বিবির ঘরে খবর পাঠানো হল, খাওয়ার মত কিছু থাকলে যেন মেহ্মানের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়। অন্তঃপুর থেকে খবর এল, একমাত্র পানি ছাড়া মুখে দেয়ার মত কোন কিছুই ঘরে নেই। পরে দ্বিতীয় বিবির ঘরে খবর পাঠানো হল, এবং এভাবে একে একে নয়টি কুটির থেকেই খবর এল, মেহ্মানদের সামনে রাখার মত একটি দানাও কোন ঘরে নেই।[১]

হযরত আনাস বর্ণনা করেন, একদিন খেদমতে হাজির হয়ে দেখতে পেলাম, হুযুর (সাঃ) কাপড় দ্বারা কষে পেটের উপর গিরা লাগাচ্ছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ক্ষুধার তীব্রতা কিছুটা প্রশমিত করার জন্যই এমন করা হয়েছে।[২]

সাহাবী আবু তালহা বলেন, একদিন হুযুর (সাঃ)-কে আমি মসজিদে শুয়ে ক্ষুধায় কাতর হয়ে এপাশ-ওপাশ করতে দেখেছি।[৩]

একদিন কয়েকজন সাহাবী ক্ষুধার কষ্টের কথা বলতে বলতে জামা খুলে খুলে দেখাচ্ছিলেন যে প্রত্যেকেই তাঁরা উপবাসে কাতর হয়ে পেটে পাথর বেঁধে রেখেছেন। হুযুর (সাঃ) নিজের পেট খুলে উন্মুক্ত করে দেখালেন। আমরা দেখলাম, সেখানে দুটি পাথর বাঁধা রয়েছে।

ক্ষুধার কারণে অনেক সময় আওয়াজ এত ক্ষীণ হয়ে পড়ত যে সাহাবিরাও তা অনুভব করতে পারতেন। একদিন সাহাবী হযরত তালহা বাড়ি এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, "খাবার কিছু আছে? হুযুর (সাঃ)-কে এখনই দেখে এলাম, ক্ষুধায় তাঁর আওয়াজ দুর্বল হয়ে গেছে।"[৪]

---

১. মুসলিম শরীফ ২য় খণ্ড।
২. মুসলিম শরীফ।
৩. মুসলিম শরীফ।
৪. মুসলিম শরীফ।

একদিন ক্ষুধায় কাতর হয়ে ঠিক দুপুর বেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। পথে হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তাঁরাও ক্ষুধায় কাতর ছিলেন। সবাইকে নিয়ে হযরত আবু আইউব আনসারীর বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন। হযরত আবু আইউব হুযুর (সাঃ)-এর জন্য দুধ রেখে দিতেন। এদিন অসময় হয়ে যাওয়ায় ছেলেমেয়েরা সে দুধ খেয়ে ফেলেছিল। হযরত আব আইউব তখন খেজুর বাগানে চলে গিয়েছিলেন। খবর পেয়ে তাঁর স্ত্রী বের হয়ে এলেন এবং বলতে লাগলেন, "হযরতের আগমন শুভ হোক।" হুযুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে আবু আইউব খেজুর বাগানে চলে গেছেন। বাগান কাছেই ছিল, আওয়াজ শুনে তিনি ছুটে এলেন। আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা করলেন। হুযুর (সাঃ) কারণ প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গিয়ে বাগান থেকে এক কাঁদি খেজুর এনে সামনে পেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি বকরী জবেহ্ করে অর্ধেক গোশ্তের কাবাব এবং বাকি অর্ধেকের তরকারি পাক করা হল। খানা পরিবেশন করা হলে হুযুর (সাঃ) একটি রুটিতে কিছুটা গোশত রেখে এরশাদ করলেনঃ এটুকু ফাতেমাকে পাঠিয়ে দাও, কয়েকদিন যাবৎ সে অনাহারে আছে। অতঃপর সাহাবিদের সঙ্গে নিয়ে খানা খেতে শুরু করলেন। বিভিন্ন ধরনের খাদ্যবস্তু দেখে দু চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। বলতে লাগলেন, "আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন যে সমস্ত নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন তা এ সবই।"[১]

অনেক সময় সকাল বেলায় বিবিদের ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, খাবার কিছু আছে কিনা। যদি বলতেন যে কিছু নেই তবে এই বলে বেরিয়ে আসতেন যে "তবে আজ আমি রোযা রাখলাম।"[২]

ধৈর্য ও ক্ষমা ঃ সীরাতের সমস্ত লেখক এবং বর্ণনাকারী দ্বিধাহীন চিত্তে এ কথা স্বীকার করেছেন যে হুযুর (সাঃ) জীবনে কখনও কারও উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। বোখারী ও মুসলিমে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে হুযুর (সাঃ) জীবনে কোন দিন ব্যক্তিগত কারণে কারও উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, একমাত্র দ্বীনের ব্যাপারে কেউ সীমা লঙ্ঘন করলেই তাকে প্রতিশোধের সম্মুখীন হতে হত।

ওহুদের পরাজয়ের চাইতে তায়েফবাসীদের সে অত্যাচার হুযুর (সাঃ)-এর অন্তরে বেশি দাগ কেটেছিল।[৩] এতদসত্ত্বেও সে নির্যাতনের দশ বছর পর তায়েফ অবরোধের সময় একদিকে যখন শহরবাসীরা 'মেনজানিক' দ্বারা মুসলিম

১. তরগীব ও তরহীব, ২য় খণ্ড।
২. আহমাদ, ২য় খণ্ড।
৩. বোখারী শরীফ।

বাহিনীর প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করছিল, ঠিক সে মুহূর্তে ধৈর্য ও ক্ষমতার প্রতীক হুযুর (সাঃ) হাত তুলে পরম করুণাময়ের দরবারে দোয়া করছিলেন,"আয় আল্লাহ্! এদের সুমতি দান করুন এবং এদের সবাইকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করা তওফীক দান করুন।" শেষপর্যন্ত এ দোয়ার বরকতেই হিজরী ৯ম সনে যখন তায়েফবাসীদের প্রতিনিধিরা মদীনায় এসে উপনীত হল, তখন তাদের বিশেষ যত্ন সহকারে গ্রহণ করলেন এবং মসজিদ প্রাঙ্গণেই পরম আদরে আপ্যায়ন করার ব্যবস্থা করলেন।

কোরাইশরা অশ্লীল গালি দিয়েছে, হত্যার চেষ্টা করেছে, পবিত্র বদনে ময়লা নিক্ষেপ করেছে, গলায় ফাঁস লাগিয়ে কষ্ট দিয়েছে, পদে পদেই নানাভাবে অপদস্থ করার চেষ্টা করেছে, কখনও যাদুকর, কখনও পাগল বা ব্যর্থ কবি বলে বিদ্রূপ করেছে, কিন্তু কোন সময়ই হুযুর (সাঃ) তাদের প্রতি রাগান্বিত হননি।

একজন নিতান্ত তুচ্ছ মানুষকেও যদি কেউ জনসমক্ষে মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন করতে চায়, তবে তার পক্ষে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। জনৈক বর্ণনাকারী বলেন, আমি 'যিলমাজায'-এর বাইরে দেখেছি, রসূলুল্লাহ (সাঃ) দ্বীনের প্রচার করছেন, "লোক সকল! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বল, মুক্তি পাবে।" তখন আবু জহল পেছনে পেছনে তাঁর প্রতি ধূলি নিক্ষেপ করতে করতে বলে যাচ্ছে "লোক সকল! এ ব্যক্তি সম্পর্কে সাবধান হও! এর কথা শুনে তোমরা পৈতৃক-ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে যাবে? এ ব্যক্তি তোমাদের উপাস্য দেব-দেবী লাত-উযযা থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে।" বর্ণনাকারী বলেন, "এ অবস্থায় হুযুর (সাঃ) সে দুরাত্মার প্রতি ফিরেও তাকাননি।[১]

সর্বাপেক্ষা নাযুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল হযরত আয়েশার প্রতি মুনাফেকদের অপবাদ আরোপের ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে। হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন স্ত্রীগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষ প্রিয়তমা, সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু হযরত আবু বকরের কন্যা। মুনাফেকরা মুহূর্তের মধ্যেই ঘৃণ্য অপবাদ সারা জনপদে ছড়িয়ে দিয়েছিল। দেখতে দেখতে মদীনার অলিগলিতে চর্চা শুরু হল। শত্রুদের এ ঘৃণ্য কারসাজি, পারিবারিক আবরুর প্রতি এহেন জঘন্য হামলা এবং আবু বকরের মত অকৃত্রিম বন্ধুজনের এ অপমান যে কোন মানুষের ধৈর্যের বাঁধ সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু রহমতে আলম (সাঃ) এ অসহনীয় পরিস্থিতির কিভাবে মোকাবিলা করেছিলেন? মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-ই ছিল এ অপপ্রচারের প্রধান উদ্যোক্তা। হুযুর (সাঃ) ভালভাবেই তা জানতেন। এতদসত্ত্বেও শুধুমাত্র জনসমক্ষে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন,

১. মুসনাদে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড।

"মুসলমানগণ! আমার পারিবারিক ইজ্জত-আবরুকে কেন্দ্র করে যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিচ্ছে তার কি প্রতিশোধ কর্তব্য নয়?" হযরত সা'আদ ইবনে মা'আয রাগে অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, "আমি তৈরি আছি, আপনি নাম বলুন, তার মস্তক উড়িয়ে দেব।" মুনাফেক আবদুল্লাহ্‌র স্বগোত্রীয় সা'আদ ইবনে উবাদা তাঁর বিরোধিতা করলেন। উভয়পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা সৃষ্টি হয়ে শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষের উপক্রম হল। হুযুর (সাঃ) পরম ধৈর্যের সঙ্গে এ পরিস্থিতিও আয়ত্তে আনলেন। পরে অপবাদ মিথ্যা প্রমাণিত করে যখন ওহী নাযিল হল, তখন অপবাদ আরোপকারীকে শরীয়তের আইন অনুযায়ী সাজা প্রদান করা হল। তবে মুনাফেক নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে ক্ষমা করে উদারতার আর একটি নতুন নযীর স্থাপন করা হল। কেননা, তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোন সাক্ষী পাওয়া গেল না। সে নিজেও কিছুতেই সে কথা স্বীকার করল না।

অপবাদ আরোপকারীদের অন্যতম ছিল মেসতাহ্ ইবনে আসাসা নামক জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি। হযরত আবু বকর তার ভরণ-পোষণ করতেন। এ দুঃখজনক ঘটনার পর তিনি তার ভরপোষণ বন্ধ করে দিলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনের আয়াত নাযিল হল। তাতে বলা হয়েছে ঃ

'তোমাদের মধ্যে মর্যাদাসম্পন্ন সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের পক্ষে নিকটাত্মীয়, মিসকীন, মোহাজের প্রমুখের সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া সমীচীন নয়। এদের অপরাধ ক্ষমা কর। কেননা, তোমরা কি পছন্দ কর না যে আল্লাহ্ পাক তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিও ক্ষমা করেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"—(সূরা নূর)

অপবাদ সংক্রান্ত আচরণে হযরত হাসসানও জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর এ আচরণে হযরত আয়েশা (রাঃ) যে মনোকষ্ট পেয়েছিলেন, তা ছিল ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু হুযুর (সাঃ)-এর সাহচর্য ও ক্ষমাগুণে প্রভাবিত হওয়ার ফল হয়েছিল এই যে একদিন হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর এ ব্যাপারে দোষারোপ করে হযরত হাসসান সম্পর্কে মন্দ বলতে শুরু করলে হযরত আয়েশা (রাঃ) এ বলে থামিয়ে দেন যে হাসসান হুযুর (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে কাফেরদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন।[১]

মদীনার বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদের অন্যতম লবীদ ইবনে আসাম হুযুর (সাঃ)-এর প্রতি যাদু করে। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি কোন উচ্চবাচ্যও করলেন না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বিষয়টি সম্পর্কে ভালরূপে খোঁজ খবর নেয়ার কথা বললে জবাব দিলেন,"আমি লোকজনের মধ্যে একটা হৈ-চৈ সৃষ্টি করতে চাই না।"[২]

১. বোখারী শরীফ ঃ অপবাদের বর্ণনা।
২. বোখারী শরীফ।

যায়েদ ইবনে সা'আদ ইহুদী থাকা অবস্থায় অর্থ-লগ্নি ব্যবসা করতেন। একবার হুযুর (সাঃ) তাঁর কাছ থেকে কিছু ঋণ নিয়েছিলেন। পরিশোধের সময়-সীমা কিছুটা অবশিষ্ট থাকতেই তাগাদা করতে এলেন। পবিত্র চাদর টেনে ধরে নানা রকম কটু কথা শোনাতে শোনাতে বলে ফেললেন, আবদুল মোত্তালেবের গোষ্ঠীরা, তোমরা সব সময়ই এমন করে থাক। হযরত ওমর (রাঃ) নিজেকে সামলাতে পারলেন না, রাগে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে বলতে লাগলেন, "রে আল্লাহ্র দুশমন! দুই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে ধৃষ্টতা দেখাচ্ছিস!" হুযুর (সাঃ) তখন মুচকি হেসে বলতে লাগলেন, "ওমর! তোমার কাছ থেকে আমি অন্য কিছু আশা করছিলাম। তাকে বুঝিয়ে দেয়া উচিত ছিল, যেন নম্র-ভদ্রভাবে তাগাদা করে এবং আমাকে বলা উচিত ছিল, যেন আমি যথাসম্ভব শীঘ্র তার ঋণ পরিশোধ করে দিই। এ কথা বলে হযরত ওমরের প্রতি ইশারা করে নির্দেশ দিলেন, "এখনই তার ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং বিশ সা' খেজুর ঋণের অতিরিক্ত দিয়ে দাও।"[১]

এক সময় পরার মত শুধুমাত্র একজোড়া কাপড় ছিল, তাও ছিল এত মোটা যে ঘামে ভিজে উঠলে ভারী হয়ে যেত। ঘটনাক্রমে তখন এক ইহুদী বণিকের কাছে সিরিয়া থেকে কাপড়ের চালান এল। হযরত আয়েশা (রাঃ) সে ইহুদীর কাছ থেকে ধারে একজোড়া কাপড় এনে কাজ চালানোর জন্য অনুরোধ করলেন। কথা মত হুযুর (সাঃ) তার কাছে একজন লোক পাঠালেন। কিন্তু সে দুর্মুখ ধৃষ্ট এই বলে তাঁকে ফিরিয়ে দিল যে "মতলবটা তো বুঝতেই পারছি, কোনমতে একবার নিতে পারলেই আর দেয়ার প্রয়োজন মনে করবে না।" হুযুর (সাঃ) তার এ কথা শুনে শুধু এতটুকুই মন্তব্য করলেন যে "সে খুব ভাল করেই জানে যে আমি ঋণের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা সাবধান এবং আমানত আদায়কারী।"[২]

একবার হুযুর (সাঃ) কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে দেখতে পেলেন, জনৈকা স্ত্রীলোক একটি কবরের পাশে বসে কাঁদছে। একটু থেমে স্ত্রীলোকটিকে ডেকে বললেন, "সবর কর।" স্ত্রীলোকটি হুযুর (সাঃ)-কে চিনত না। সে মুখ খিস্তি করে বলে উঠল, সর এখান থেকে, আমার কি দুঃখ, তা তুমি কি বুঝবে? বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি সরে গেলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর লোকেরা স্ত্রীলোকটিকে বলল, তুমি কার সঙ্গে এমনভাবে কথা বললে? তুমি জান না, ইনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)! একথা শুনে স্ত্রীলোকটি ছুটতে শুরু করল। কাছে এসে কাতর কণ্ঠে নিবেদন করল, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ), আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। এরশাদ হল, "ঠিক বিপদের মুহূর্তে ধৈর্য ধারণ করলে তাই সব চাইতে বেশি কবুল হয়ে থাকে।"[৩]

১. বায়হাকী, ইবনে হাব্বান, তাবারী।
২. তিরমিযী ঃ ক্রয়-বিক্রয়।
৩. বোখারী ঃ মৃতের সৎকার।

আরেকবার সাহাবী হযরত সা'আদ ইবনে উবাদার অসুস্থতার সংবাদ শুনে হুযুর (সাঃ) তাঁকে দেখতে চললেন। পথে এক জায়গায় বেশ ভিড় দেখে একটু থামলেন। মুনাফেক-শ্রেষ্ঠ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই সে সভার মধ্যমণি হয়ে বসেছিল। সওয়ারীর পায়ে সামান্য ধুলা উড়তেই সে মুনাফেক নাকে চাদর দিয়ে বলতে লাগল, এভাবে ধুলো ওড়াবেন না। আরও একটু নিকটবর্তী হলে বলে উঠল, গাধা সরান, আপনার গাধার দুর্গন্ধে আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে। হুযুর (সাঃ) সওয়ারী থেকে নেমে সবাইকে সালাম দিলেন এবং ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। মুনাফেক আবদুল্লাহ্ আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বলতে লাগল, বাড়ি এসে এভাবে আমাদের জ্বালাতন করবেন না, কেউ যদি আপনার কাছে গিয়ে হাজির হয় তখন তাকে তালীম দেবেন। বিখ্যাত কবি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ), আপনি অবশ্যই আমাদের কাছে তশরীফ আনবেন। উভয় পক্ষের কথা কাটাকাটিতে শেষ পর্যন্ত তরবারী কোষমুক্ত হতে শুরু করল। হুযুর (সাঃ) বুঝিয়ে দু'দলকেই শান্ত করলেন। সভা থেকে উঠে এসে হযরত সা'আদ ইবনে উবাদার কাছে গেলেন এবং তাঁকে বললেন, তুমি কি আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইর কথাবার্তা শুনেছ? হযরত সা'আদ আরয করলেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ্ (সাঃ), আপনি তার কথা শুনে ভগ্নোৎসাহ হবেন না। এই সে ব্যক্তি, আপনার আসার আগে মদীনাবাসীরা সম্মিলিতভাবে তাকে রাজা হিসাবে বরণ করে নেয়ার জন্য মুকুট পর্যন্ত তৈরি করে ফেলেছিল।"[১]

হুনাইন যুদ্ধের গনীমত বিতরণ করার পর জনৈক তরুণ আনসার মন্তব্য করে বসল, "এ বন্টন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের প্রতি লক্ষ্য রেখে করা হয়নি।" এ কথা হুযুর (সাঃ)-এর কানে গেলে শুধু এতটুকু মন্তব্য করলেন যে "আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসার প্রতি রহম করুন, তাঁকে লোকেরা এর চাইতেও অধিক কষ্ট দিয়েছে, কিন্তু সে সবই তিনি সহ্য করেছেন।"

একবার মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে এক বেদুঈন এসে হাজির হল। মূর্খ বেদুঈন মসজিদের মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল না। প্রস্রাবের প্রয়োজন দেখা দিলে মসজিদের ভিতরে দাঁড়িয়েই সে প্রস্রাব করতে শুরু করল। সাহাবীগণ তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য চারদিক থেকে ছুটে এলেন। হুযুর (সাঃ) এরশাদ করলেন, "ওকে কিছু বলো না। এক বালতি পানি এনে প্রস্রাবটুকু ধুয়ে ফেললেই পাক হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পাঠিয়েছেন লোকজনের সঙ্গে সহজ-সরল ব্যবহার করতে, কঠিন হতে নয়।[২]

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমার বাল্যকালের ঘটনা। একদিন হুযুর (সাঃ) আমাকে ডেকে একটি কাজে যেতে বললেন। বালকসুলভ চপলতার বশবর্তী হয়ে আমি বলে বসলাম, "এখন যেতে পারব না।" এই বলে আমি বাইরে গিয়ে খেলা করতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর হুযুর (সাঃ) পেছন দিক

---

১. বোখারী, ২য় খণ্ড, ঘটনাটি হিজরত পরবর্তী অল্প কিছুদিনের মধ্যে সংঘটিত।
২. বোখারী শরীফ।

থেকে এসে আমার ঘাড়ে হাত রাখলেন। ফিরে দেখলাম, তিনি হাসছেন। বললেন, এখন যেতে পারবে তো? এবার আমি বিনাদ্বিধায় কাজে চলে গেলাম। হযরত আনাস (রাঃ) আরো বলেন, "বাল্যকালে আমি দীর্ঘ সাত বছর হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে ছিলাম। এ দীর্ঘ সময়ের মাঝে একদিনও আমাকে শাসাননি বা এ কথা বলেননি যে অমুক কাজটি কেন করলে না, বা এরূপ কেন করলে?"[১]

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুযুর (সাঃ) যতক্ষণ মসজিদে থাকতেন, আমরা সঙ্গে বসে থাকতাম, তিনি উঠে গেলে আমরাও চলে যেতাম। একদিন ঠিক উঠে যাওয়ার মুহূর্তে জনৈক মূর্খ বেদুঈন এসে উপস্থিত হল। হুযুর (সাঃ)-এর চাদর ধরে এমন জোরে টান দিল যে হুযুর (সাঃ)-এর গর্দান মোবারকের কিছুটা জায়গা লাল হয়ে গেল। বেদুঈনের দিকে ফিরে চাইলে সে বলতে লাগল, "আমার উট দু'টি খাদ্য দিয়ে বোঝাই করে দাও। তোমার নিকট যে সমস্ত মাল-দওলত রয়েছে, তা তোমারও নয়, তোমার বাবারও নয়।" হুযুর (সাঃ) এ একরোখা সরল মানুষটির এহেন অমার্জিত কথাবার্তায় মোটেও বিরক্ত হলেন না, বরং তা উপভোগ করার জন্য বলতে লাগলেন, "তুমি আমার গর্দান ছিলে ফেলেছে। প্রথমে তার বদলা দাও, পরে শস্য। বেদুঈন এ কথা শুনে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল, চীৎকার করে বলতে লাগল,

"আল্লাহ্‌র কসম, আমি কিছুতেই বদলা দেব না!" হুযুর (সাঃ) মৃদু হেসে তার দু'টি উটে খেজুর ও যব বোঝাই করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।[২]

কোরাইশেরা (নাউযুবিল্লাহ) তাঁকে অশালীন গালি-গালাজ করত, নানাভাবে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করত। 'মোহাম্মদ' শব্দের অর্থ যেখানে প্রশংসিত, সেখানে ওরা নাম বিকৃত করে 'মোযাম্মাম' অর্থাৎ, ধিককৃত বলে ডাকত। ওদের এ ধরনের ইতরপনার মোকাবিলায় সঙ্গী-সাথীদের এ বলে সান্ত্বনা দিতেন যে "দেখ কোরাইশদের অভিশাপ ও গালি-গালাজ থেকে আল্লাহ্‌পাক আমাকে কি চমৎকার ভাবেই বাঁচিয়ে দেন। ওরা 'মোযাম্মাম' নামক কোন এক ব্যক্তির প্রতি গালমন্দ বর্ষণ করে। কিন্তু আমি তো 'মোহাম্মদ'।"[৩]

মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি খুবই সন্তর্পণে হচ্ছিল। মক্কাবাসীরা যাতে এ সংবাদ জানতে না পারে, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হচ্ছিল। হাতেব ইবনে বালতাআ নামক জনৈক সাহাবীর পরিবার-পরিজন তখনও মক্কায় ছিল। তাই তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে অভিযানের সংবাদসহ জনৈক স্ত্রীলোকের হাতে মক্কায় একটি পত্র পাঠালেন। হুযুর (সাঃ) বিষয়টি জেনে গেলেন এবং হযরত আলী ও হযরত যুবাইরকে দ্রুত পাঠিয়ে পত্রসহ স্ত্রীলোকটিকে ধরিয়ে আনালেন। হাতেবকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে তিনি সরলভাবে অপরাধ স্বীকার করলেন। যে কোন শাসন

১. আবু দাউদ, মুসলিম ঃ কেতাবুল আদাব।
২. আবুদ দাউদ ঃ আদাব অধ্যায়।
৩. মেশকাত শরীফ ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নাম প্রসঙ্গ।

ব্যবস্থায় এ অপরাধের জন্য তাঁর কঠিন শাস্তি হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু যেহেতু হাতেব ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন প্রবীণ সাহাবী, তাই তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। পত্রবাহক স্ত্রীলোকটিকেও কোন শাস্তি দেয়া হল না।[১] অথচ এ পত্রটি মক্কায় পৌছে গেলে মুসলমানদের কঠিন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত।

ফুরাত ইবনে হায়ান নামক এক ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের পক্ষ থেকে গুপ্তচর হিসাবে নিযুক্ত ছিল। সে হুযুর (সাঃ)-এর নিন্দা করে কবিতাও রচনা করত। একবার সে ধরা পড়লে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হল। লোকেরা তাকে বেঁধে নিয়ে চলল। আনসারদের এক মহল্লায় পৌছালে সে বলতে লাগল, "আমি মুসলমান হয়ে গেছি।" লোকেরা এসে হুযুর (সাঃ)-এর কাছে বিষয়টি জানালে তিনি এরশাদ করলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক লোক আছে, যাদের ঈমানের সত্যাসত্য তাদের উপরই আমি ছেড়ে দিয়েছি। তন্মধ্যে ফুরাত ইবনে হায়ানও একজন।"[২] ইতিহাসবিদগণ উল্লেখ করেছেন যে ক্ষমা করে দেয়ার পর ফুরাত অত্যন্ত নিষ্ঠাবান মুসলমানে পরিণত হয়েছিলেন এবং তাঁকে ইয়ামামায় বিপুল আয়ের একটি ভূমিও প্রদান করা হয়েছিল।[৩]

শত্রুর প্রতি সদ্ব্যবহার' ও ক্ষমা ঃ মানুষের চরিত্র-ভাণ্ডারে সর্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য বিষয়টি হল শত্রুর প্রতি অযাচিত অনুগ্রহ এবং উদার ক্ষমা প্রদর্শন। কিন্তু ওহী ও নবুয়তের বাহক মহানবী (সাঃ)-এর চরিত-ইতিহাসে ক্ষমা ও অনুগ্রহের বাস্তব দৃষ্টান্ত সীমাহীন। শত্রুর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা একটি আইনগত অধিকার। কিন্তু হুযুর (সাঃ)-এর উদার চরিত্রের আওতায় এসে তা বিলীন হয়ে যায়। তাঁর মহান চরিত্র সম্পর্কে যত ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে একটি বিষয়ে সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত যে জীবনে কখনো তিনি ব্যক্তিগত কারণে কারো উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি।

শত্রুর উপর প্রতিশোধ গ্রহণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উত্তম সুযোগ ছিল মক্কা বিজয়ের দিন। যে জঘন্য শত্রুরা দীর্ঘ বিশটি বছর এমন কোন অত্যাচার নেই যার মাধ্যমে আল্লাহর রসূল (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের জীবন ওষ্ঠাগত করে রাখেনি। তারাই যখন অবনতমস্তকে সামনে নীত হল, তখন উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ

"তোমাদের প্রতি আজ আমার আর কোন ভর্ৎসনা নেই। যাও, আজ তোমরা সবাই মুক্ত।"

যে ওয়াহ্শী ইসলামের সর্বাপেক্ষা দৃঢ়বাহু সাইয়্যেদুশ্ শুহাদা হযরত হামযাকে (রাঃ) হত্যা করেছিল, মক্কা বিজয়ের পর সে পালিয়ে তায়েফে আশ্রয় গ্রহণ করে।

১. বোখারী ঃ মক্কা বিজয়।
২. আবু দাউদ ঃ জেহাদ অধ্যায়, গুপ্তচরবৃত্তির বিবরণ।
৩. আল এসাবা, ফুরাতের বর্ণনা।

কিন্তু তায়েফও যখন পদানত হল, তখন আর তার কোন আশ্রয় রইল না। সে শুনেছিল, আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) কোন দূতের সঙ্গে কঠোরতা করেন না। তখন সেও তায়েফের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে। হুযুর (সাঃ) সেদিন নিজের প্রিয়তম চাচার এ হত্যাকারীকেও সাদরে আশ্রয় দান করেছিলেন, তবে শুধু এতটুকু বলে দিয়েছিলেন যে সচরাচর আমার সামনে এসো না, তোমাকে দেখলেই চাচার কথা মনে পড়ে যায়।[১]

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা ওহুদের ময়দানে হযরত হামযার কলিজা চিবোতে চিবোতে নৃত্য করেছিল। মক্কা বিজয়ের দিন নেকাবে মুখ ঢেকে খেদমতে হাজির হল এবং ইসলাম গ্রহণ করে কৌশলে নিরাপত্তার সনদ হাসিল করে নিল। কিন্তু এ নাযুক সময়েও বেআদবি করতে পিছপা হল না। হুযুর (সাঃ) তাকে চিনে ফেললেন, কিন্তু কিছুই বললেন না। এ আশ্চর্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে সে কঠিন-হৃদয় নারীর অন্তর এমনভাবে বিগলিত হয়ে গেল যে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠল, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাঃ)! কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত আমার চোখে আপনার তাঁবুর চাইতে ঘৃণ্য আর কোন তাঁবু ছিল না, কিন্তু এখন আপনার সে তাঁবুর চাইতে প্রিয়তম কোন তাঁবু আমার চোখে আর একটিও নেই।"[২]

আবু জাহলের পুত্র ইকরিমা ছিলেন হুযুর (সাঃ)-এর জঘন্যতম দুশমনদের অন্যতম। পিতার মৃত্যুর পর থেকে তিনিই ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে কোরাইশদের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি পালিয়ে ইয়ামনে চলে যান। তাঁর স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করলেন। ইয়ামনে স্বামীর নিকট গিয়ে তাঁকেও ইসলামে দীক্ষিত করলেন এবং সঙ্গে করে নিয়ে এসে দরবারে হাজির করলেন। হুযুর (সাঃ) ইকরিমাকে দেখে আনন্দে এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে এলেন যে শরীর থেকে চাদর খসে পড়ল ঃ যবান মোবারক থেকে উচ্চারিত হতে লাগল ঃ

"স্বাগত ঃ হে মোহাজের সওয়ার।'

সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া ছিলেন দুশমন কোরাইশদের অন্যতম প্রধান নেতা। সেই ওমাইর ইবনে ওয়াহাবকে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে হুযুর (সাঃ)-কে হত্যা করার জন্য নিযুক্ত করেছিল। মক্কা বিজয়ের পর তিনি পালিয়ে সমুদ্রপথে ইয়ামন চলে যাওয়ার জন্য জিদ্দায় গিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। ওমাইর ইবনে ওয়াহাব খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন, "আমাদের গোত্রের সরদার সাফওয়ান পালিয়ে সমুদ্রপথে পাড়ি জমাতে যাচ্ছে।" এরশাদ হল, "তাঁকে আমি নিরাপত্তা দিলাম। উমাইর পুনরায় নিবেদন করলেন, নিরাপত্তার কোন নিদর্শন দিলে বোধ হয় তাঁর মনে আস্থার সৃষ্টি হত। এ আবেদনের প্রেক্ষিতে পাগড়ি খুলে তাঁর হাতে

১. বোখারী ঃ হযরত হামযার হত্যা।
২. বোখারী ঃ হিন্দার বিবরণ।

দূরাত্মাদের সঙ্গে রহমতে আলম কি ব্যবহার করেছিলেন, ইতিহাস পাঠকগণ তাও একবার ভেবে দেখতে পারেন।

সুমামার ইসলাম গ্রহণের পর যখন মক্কায় ওমরা পালন করতে গেলেন, তখন জানতে পেরে মক্কাবাসীরা তাঁর সঙ্গে নানা অপমানজনক ব্যবহার করতে শুরু করল। মক্কায় খাদ্য সরবরাহের প্রধান উৎস ছিল ইয়ামামা। কোরাইশদের উপর্যুপরি দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হয়ে গোত্রপতি সুমামা ঘোষণা করলেন, "এর পর থেকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুমতি ছাড়া ইয়ামামা থেকে মক্কায় খাদ্যশস্যের একটি কণাও আর যাবে না।" এ ঘোষণা কার্যকর হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই মক্কায় হাহাকার পড়ে গেল। উপায়ান্তর না দেখে মক্কাবাসীরা সে করুণার দুয়ারে হাত পাততে বাধ্য হল, যেখান থেকে কোন করুণাপ্রার্থী কোনদিনই ফিরে যায়নি। মক্কায় তীব্র খাদ্যাভাবের কথা শুনে হুযুর (সাঃ) সুমামার প্রতি আদেশ পাঠালেন, যেন অবিলম্বে খাদ্য অবরোধ তুলে নেয়া হয়। ফলে, সরবরাহ পুনরায় শুরু হয়ে তীব্র খাদ্যসংকটের অবসান ঘটল।[১]

কাফের ও মুশরেকদের প্রতি আচরণ ঃ কাফের-মুশরেকদের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ ও নম্র ব্যবহারের অসংখ্য ঘটনা সীরাত গ্রন্থের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদগণের মতে অবশ্য সদ্ব্যবহারের এসব ঘটনা সে সময়কার, যখন ইসলামী শক্তি অত্যন্ত দুর্বল ছিল এবং সদ্ব্যবহার ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। কিন্তু শক্তি অর্জন করার পর ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে আর কোন প্রকার নম্র ব্যবহারই নাকি মহানবী (সাঃ) করেননি। সে সমস্ত জ্ঞান-পাপীদের এহেন বিভ্রান্তিকর উক্তির পাশাপাশি এ অধ্যায়ে এমন কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরা সমীচীন মনে করি, যেগুলো আরবের বুকে কুফরী শক্তি সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হওয়ার পর সংঘটিত হয়েছিল।

আবু বুশ্‌রা গেফারী বর্ণনা করেন, ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে আমি এক রাত্রে নবী করীমের (সাঃ) মেহমান হই। ঘরে যে কয়টি বকরী ছিল, সব কয়টির দুধ আমি একাই নিঃশেষে পান করে ফেলি। ফলে, সে রাত্রি হুযুর (সাঃ) পরিবার-পরিজনসহ অভুক্ত অবস্থায় যাপন করতে বাধ্য হন। কিন্তু তথাপি তিনি আমার প্রতি বিন্দুমাত্রও বিরক্ত হননি।[২]

এ ধরনের আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বলেন,—এক রাত্রে এক কাফের এসে হুযুর (সাঃ)-এর মেহমান হল। তাকে একটি ছাগল দোহন করে দিলে এক নিশ্বাসে তা পান করে ফেলল। এভাবে পর পর সাতটি বকরীর দুধ সে একাই সাবাড় করল। কিন্তু হুযুর (সাঃ) এ

---

১. বোখারী শরীফ,-সীরাতে ইবনে হিশাম।
২. -মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড।

অতিভোজী নির্লজ্জ লোকটির প্রতি মোটেও বিরক্তি প্রকাশ করলেন না, বরং পরম যত্নে শেষ পর্যন্ত তাকে দুধ পরিবেশ করতে থাকলেন। এ অনুপম আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে ভোর হওয়ার পূর্বে সে মুসলমান হয়ে গেল এবং তখন দেখা গেল, একটি ছাগলের দুধেই সে পরিতৃপ্ত হয়ে গেছে।[১]

হযরত আসমা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুদাইবিয়ার সন্ধির পর তার অ-মুসলিম মা সাহায্য প্রার্থিনী হয়ে মীনায় তাঁর কাছে আসেন। অ-মুসলিম মায়ের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে, সে সম্পর্কে জানবার উদ্দেশ্যে তিনি হুযুর (সাঃ)-এর শরণাপন্ন হলে তাঁকে নির্দেশ দেয়া হল, "মা যে-ই হোন না কেন, তাঁর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে।"[২]

হযরত আবু হোরাইরার মা ছিলেন কাফের। তিনি পুত্রের সঙ্গে মদীনায় বসবাস করতেন। জেহালতের কারণে মাঝে মাঝে হুযুর (সাঃ)-কে তিনি গালিও দিতেন। হযরত আবু হোরাইরা এ খবর নিবেদন করলে হুযুর (সাঃ) মোটেও বিরক্ত না হয়ে বরং তার জন্য হাত তুলে দোয়া করলেন।[৩]

হুযুর (সাঃ)-এর পারিবারিক কাজকর্মের সমস্ত দায়িত্ব ছিল হযরত বেলালের উপর। অর্থকড়ি যা কিছু আসত, তাঁর হাতে জমা থাকত, আবার অনটনের সময় তিনিই নিজ দায়িত্বে ধারকর্জ করে কাজকর্ম চালাতেন। একদিন বাজারের পথে এক মুশরিকের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। সে বলতে লাগল, "আপনি যখন ধারে জিনিসপত্র নেন, তখন আমার কাছ থেকেই তা গ্রহণ করবেন।" হযরত বেলাল সম্মত হয়ে ধারে কিছু সওদা নিয়ে এলেন। একদিন বেলাল (রাঃ) আযান দেয়ার জন্য তৈরি হয়েছেন, ঠিক এমন সময় সে মুশরিক অন্য কয়েকজন ব্যবসায়ীসহ এসে উপস্থিত হল এবং নিতান্ত রুক্ষস্বরে ডাক দিল, রে হাবশী! হযরত বেলাল এ ধৃষ্টতায় বিরক্ত না হয়ে বরং লাব্বাইক (আমি হাজির) বলে ফিরে দাঁড়ালেন। ব্যবসায়ী তখন বলতে লাগল, "আমার দেয়া সময়-সীমার মাত্র চারদিন বাকি। এর মধ্যে যদি তুমি আমার পাওনা পরিশোধ না কর, তবে তোমাকে দিয়ে ছাগল চরিয়ে ছাড়ব!" হযরত বেলাল (রাঃ) এশার নামাযের পর হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে ঘটনাটি বিবৃত করলেন এবং বললেন, "তহবিলে ঋণ পরিশোধ করার মত কোন অর্থ নেই। দু'দিন পর সে মুশরেক এসে আবারও আমাকে লাঞ্ছিত করবে। সুতরাং অনুমতি দিন, ঋণ পরিশোধ করার মত ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আমি কয়েকদিন অন্য কোথাও গিয়ে কাটিয়ে আসি।" এতে হুযুর (সাঃ) কোন মন্তব্য করলেন না। রাতে হযরত বেলাল যৎসামান্য সামান পুঁটলী বেঁধে ভোরের অপেক্ষায় শুয়ে রইলেন। সকাল বেলায় রওয়ানা হওয়ার মুহূর্তেই খবর এল, হুযুর (সাঃ) তাঁকে স্মরণ করেছেন। ছুটে গিয়ে দেখলেন, শস্য বোঝাই চারটি উট

১. তিরমিযী ঃ মুমিন ও কাফিরদের আহার প্রসঙ্গ।
২. বোখারী ঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ।
৩. বোখারী।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। হুযুর (সাঃ) বললেন, "মোবারক হোক! ফাদাক-এর সরদার এ চারটি উট বোঝাই শস্য পাঠিয়েছেন, এগুলো বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করে দাও।" হযরত বেলাল (রাঃ) শস্য বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করে এলেন এবং মসজিদে এসে হুযুর (সাঃ)-এর কাছে খবর পৌছালেন যে সমস্ত ঋণ পরিশোধ হয়ে গেছে।[১]

ঘটনাটি হিজরী সপ্তম সনে ফাদাক অধিকৃত হওয়ার পরবর্তী সময়ের। হযরত বেলাল হুযুর (সাঃ)-এর খাজাঞ্চী এবং সম্মানিত মোয়াযযিন ছিলেন। তাঁকে মদীনার বুকে মসজিদে-নববীর সামনে দাঁড়িয়ে এক কাফের মুশরেক দোকানদার, "রে হাবশী! তোকে দিয়ে বকরী চড়িয়ে ছাড়ব।" ইত্যাকার ইতরোচিত গালি-গালাজ করতে সাহস পায়, এমন কি, আর অধিকতর অপমানের ভয়ে হযরত বেলাল শহর ছেড়ে সাময়িকভাবে পালিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হন, অথচ শাহানশাহে-মদীনা এ সব কিছু শুনেও ধৃষ্ট মুশরেককে শায়েস্তা করার কথা চিন্তা করেন না, বা হযরত বেলালকে কোন অভয় প্রদান করেন না। ঘটনাক্রমে উট বোঝাই শস্য এসে যাওয়ায় ইসলামী রাষ্ট্রের বিশিষ্ট একজন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি তুচ্ছ কাফেরের ইতর প্রকৃতির হামলা থেকে রেহাই পান। এধরনের ঘটনা যে কতবড় ধৈর্য ও সহনশীলতার সাক্ষ্য বহন করে, তা বিশ্ব-ইতিহাসের পাঠকগণ অতি সহজেই অনুধাবন করতে সমর্থ হবেন।

তবে সবচাইতে অসুবিধাজনক ছিল মুনাফেকদের ব্যাপারটি। আসলে এরা ছিল ছদ্মবেশী কাফেরদের একটি দল। এদের নেতা ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। হিজরতের কিছুকাল পূর্বেই মদীনাবাসীরা সম্মিলিতভাবে এ চতুর লোকটিকে নিজেদের শাসকরূপে বরণ করে নিতে তৈরি হয়েছিল। বদর যুদ্ধের পর সে মুখে মুখে ইসলাম গ্রহণ করলেও অন্তরে কাফেরই রয়ে গিয়েছিল। তার অনুসারীরাও মৌখিকভাবে ইসলাম কবুল করার কথা ঘোষণা করল! ফলে, মুনাফেকদের পৃথক একটি দল সৃষ্টি হয়ে গেল। এরা মুসলমানদের মধ্যে ঢুকে পঞ্চম বাহিনীর কাজ করত। মক্কার কোরাইশ ও আরবের অন্যান্য বৈরী গোত্রগুলোর সঙ্গে গোপন আঁতাত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বদা গুপ্তচরবৃত্তিতে লিপ্ত থাকত। পারস্পরিক বিবাদ বাধিয়ে ভিতর থেকে ইসলামী শক্তিকে বিপর্যস্ত করার মত কোন সুযোগই এরা হাতছাড়া করত না। এতসব কিছুর পরেও এরা ইসলামের যাবতীয় অনুষ্ঠান এবং জুমা-জামাত প্রভৃতিতে নিয়মিতভাবেই শরীক হত। জেহাদের অভিযানেও সঙ্গে সঙ্গে যেত। হুযুর (সাঃ) এদের প্রত্যেকের সম্পর্কেই সম্যক অবগত ছিলেন। কিন্তু ইসলামের আইন-কানুন মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণের স. র সম্পর্কিত বিধায় এদের উপর কুফরীর বিধান প্রয়োগ করতেন না। আইন ও শরীয়তের বিধান প্রয়োগ স্থগিত রাখাই নয়, হুযুর (সাঃ) এদের প্রতি উদার অনু'াহ বিতরণ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না।

১. আবু দাউদ, ২য় খণ্ড।

একবার কোন এক যুদ্ধ-অভিযান থেকে ফেরার পথে জনৈক মুহাজের এক আনসারকে চপেটাঘাত করে বসলেন। আনসার রাগান্বিত হয়ে আনসারের দোহাই দিতে শুরু করলে দলে দলে তাঁরা সমবেত হয়ে গেলেন। অনন্যোপায় হয়ে মুহাজেরও তাঁর সঙ্গীদের ডাক দিলেন। এভাবে উভয় দলকে ভর্ৎসনা করলে সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর কানে এ খবর পৌঁছালে সে বলে উঠল, "মদীনায় গিয়ে এ হাভাতে মুসলমানগুলো বের করে দেব।" সঙ্গী-সাথীদের বলল, "এদের কাবু করার সর্বাপেক্ষা সহজ পন্থা হল, তোমরা এদের থেকে সাহায্য-সহযোগিতার হাত গুটিয়ে নাও, এমনিতে এরা ধ্বংস হয়ে যাবে।"

কোরআনে এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উদঘাটন করে আয়াত নাযিল হল। বলা হয়েছে "এরা সে সমস্ত লোক, যারা বলে, রসূল্লাহ্র সঙ্গে যারা আছে, তাদের খরচপত্র বন্ধ করে দাও। এতেই এরা কাবু হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।" (মুনাফেকুন)

"এরা বলে, মদীনায় ফিরে সম্মানিত (স্থানীয়) লোকেরা এ হীন (বিদেশী) গুলোকে বের করে দেব। (মুনাফেকুন)

কোরআনে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর হুযুর (সাঃ) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এমন কথা বলেছ? আব্দুল্লাহ্ এ কথা সোজা অস্বীকার করে বসল। হযরত ওমর (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন, আরয করলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)! অনুমতি দিন, এ মুনাফেকের গর্দান উড়িয়ে দিই। এরশাদ হল, "না, তা হয় না। লোকেরা বলে বেড়াবে, মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করেন।"[১]

উহুদ যুদ্ধে সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তিন শ' সঙ্গীসহ ময়দান ছেড়ে চলে আসে। এ অন্তর্ঘাতমূলক কাজের ফলে মুসলিম বাহিনীর অপূরণীয় ক্ষতি হয়। হুযুর (সাঃ) তার এহেন জঘন্য অপরাধও ক্ষমা করে দেন। শুধু তাই নয়, সে একবার হযরত আব্বাসকে একটি কামিস দান করেছিল। এ অনুগ্রহের বদলায় তার মৃত্যু হলে হুযুর (সাঃ) সাহাবীদের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও কাফনের জন্য গায়ের জামা খুলে দিয়েছিলেন, যেন এ পবিত্র কামিস পরিয়েই তাকে দাফন করা হয়।[২]

ইহুদী-নাসারাদের সঙ্গে ব্যবহার ঃ হুযুর (সাঃ)-এর মহান চারিত্র-মাধুর্যের সামনে শত্রু-মিত্র,-কাফের-মুসলিম, আপদ-পর, ছোট-বড় সবার মর্যাদাই সমান ছিল। রহমতের বারিধারা সবুজ কাননের মত মরুভূমির তপ্ত বালকারাশিতেও সমানভাবেই বর্ষিত হত।

১. বোখারী ঃ সূরা মুনাফেকুনের তফসীর।
২. বোখারী শরীফ।

হযরত নবী করীমের (সাঃ) সঙ্গে ইহুদীদের শত্রুতার কথা সর্বজনবিদিত। খায়বর বিজিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এরা কি রকম হিংস্রতার পরিচয় দিয়েছে, তাও অজানা নয়। এতদসত্ত্বেও কোরআন শরীফে কোন বিষয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশ নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সে বিষয়ে ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থের অনুসরণ করতেন। তাদের কোনরূপ বিদ্বেষই হুযুর (সাঃ)-এর আচরণকে স্পর্শ করতে পারত না।

একবার এক ইহুদী বাজারে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, সে সত্তার কসম, যিনি হযরত মূসাকে সমস্ত নবিগণের উপর ফযীলত দান করেছেন। জনৈক সাহাবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এতে তাঁর ঈমানী জযবা আহত হল, জিজ্ঞেস করলেন, মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উপরও কি? ইহুদী জবাব দিল, নিশ্চয়ই! সাহাবী বরদাশত করতে পারলেন না, সজোরে ইহুদীর মুখে চপেটাঘাত করে বসলেন। আহত ইহুদী সোজা মসজিদে-নববীতে ফরিয়াদ নিয়ে হাজির হল। হুযুর (সাঃ) অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সাহাবীকে ডেকে ভর্ৎসনা করলেন।[১]

জনৈক ইহুদীর ছেলে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে হুযুর (সাঃ) তাকে দেখতে গেলেন। ছেলেটিকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। ছেলে অনুমতির অপেক্ষায় পিতার মুখপানে চেয়ে রইল। পিতা বললেন, ইনি যা বলছেন, মান্য কর। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল।[২]

একদিন রাস্তা দিয়ে এক ইহুদীর জানাযা যেতে দেখে হুযুর (সাঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন।[৩]

একবার কয়েকজন ইহুদী দরবারে এসে সালামকে বিকৃত করে আসসামু আলাইকুম, অর্থাৎ, তোমাদের মৃত্যু হোক বলে সম্ভাষণ জানাল। হযরত আয়েশা (রাঃ) সহ্য করতে না পেরে কঠোর ভাষায় তাদের ভর্ৎসনা করলেন। কিন্তু হুযুর (সাঃ) হযরত আয়েশাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আয়েশা, মুখ খারাপ করো না; নরম ব্যবহার কর, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক ব্যাপারে কোমলতা পছন্দ করেন।"[৪]

ইহুদীদের সঙ্গে লেনদেন হত। অনেক সময় তাদের কটু তাগাদা সহ্য করতে হত। ইহুদী এবং মুসলমানদের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হলে মুসলমানদের প্রতি কখনও পক্ষপাতিত্ব করতেন না; নিরপেক্ষ বিচার করতেন। এ সম্পর্কিত অনেক ঘটনা ইতিপূর্বে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। একদিন এক ইহুদী এসে নালিশ করল যে অমুক মুসলমান চপেটাঘাত করেছে। হুযুর (সাঃ) তাকে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়ে এনে বিচার করলেন।

নাজরানের খৃষ্টানদের যে প্রতিনিধিদল মদীনায় এসেছিল, তাদের মসজিদে নববীতে অবস্থান করার ব্যবস্থা করে দেন, নিজে তাদের মেহমানদারীর দায়িত্ব

১. বোখারী।
২. বোখারী ঃ কিতাবুল জানায়েয।
৩. বোখারী ঃ কিতাবুল জানায়েয।
৪. মুসলিম শরীফ ঃ আদাব অধ্যায়।

পালন করেন। এমন কি, তাদের উপাসনাদিও মসজিদেই সমাধা করার ব্যবস্থা করে দেন। সাধারণ মুসলমানগণ তাদের উপাসনায় বাধা দান করতে চাইলে হুযুর (সাঃ) তাদের থামিয়ে দিলেন।[১]

হুযুর (সাঃ) ইহুদী-নাসারাদের সঙ্গে খানা-পিনা, বিয়ে-শাদী ও সামাজিকতার সম্পর্ক গড়ে তোলার অনুমতি প্রদান করেন এবং এ সম্পর্কিত শরিয়তের বিশেষ বিধান জারি করেন।

দরিদ্রদের সঙ্গে মহব্বত ঃ মুসলমানদের মধ্যে ধনী, দরিদ্র, বড়, ছোট, অগাধ সম্পদের মালিক এবং নিত্য উপবাসী মিসকীনও ছিলেন। কিন্তু হুযুর (সাঃ) সবার সঙ্গে সমান ব্যবহার করতেন। বরং দরিদ্র শ্রেণীর সঙ্গে এমন মহব্বতের সঙ্গে ব্যবহার করতেন যে সম্পদহীনতার দুঃখ তাঁরা ভুলে যেতেন। একবার মাত্র সামান্য একটু অসাবধানতাবশত এ নীতির খেলাফ একটি ঘটনা ঘটে যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে এ জন্য সংশোধনী অবতীর্ণ হয়। ঘটনাটি হল, "হুযুর (সাঃ) কতিপয় কোরাইশ সরদারের সঙ্গে বসে ইসলামের দাওয়াত সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। এ সময় অন্ধ ও দরিদ্র সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মকতুম এসে মজলিসে বসে হুযুর (সাঃ)-এর সঙ্গে কোন একটি দ্বীনী বিষয়ে আলোচনা শুরু করলেন। কোরাইশরা ছিল অত্যন্ত অহঙ্কারী, তাদের সামনে একজন দরিদ্র অন্ধ ব্যক্তি এসে একসঙ্গে বসে পড়াতে তাদের অহমিকা-বোধ আহত হল। হুযুর (সাঃ) অহঙ্কারী কোরাইশ সরদারদের মন রক্ষার্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মকতুমের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। কিন্তু আল্লাহ্র কাছে এ ব্যবহার পছন্দ হল না। সঙ্গে সঙ্গেই আয়াত নাযিল হল। তাতে বলা হল ঃ

"রসূল তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কেননা, তাঁর সমীপে একজন অন্ধ ব্যক্তি এসেছেন। আপনি কি করে জানবেন যে হয়ত সে ব্যক্তি আপনার কথায় পবিত্রতা অর্জন করতেন, অথবা নসিহত গ্রহণ করতেন এবং সে নসিহত তাঁকে উপকৃত করত। কিন্তু যারা অমনোযোগী তাদের প্রতিই আপনি আগ্রহশীল হবেন। এরা যদি পবিত্রতা অর্জন না করে, তবে আপনার কি ক্ষতি? আর যে ব্যক্তি আপনার কাছে ছুটে আসে আল্লাহ্র ভয় অন্তরে পোষণ করে, আপনি তার প্রতি অমনোযোগী হলেন! না, কখনই তা হতে পারেন। এটা সাধারণ উপদেশ, যার ইচ্ছা সে তা গ্রহণ করতে পারে।"—(সূরা আবাসা)

ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম গরীব সর্বহারা জনগণই জান-মাল উৎসর্গ করতে এগিয়ে আসেন। হযরত নবী করীম (সাঃ) এ সমস্ত লোককে সঙ্গে নিয়ে কা'বা প্রাঙ্গণে নামায পড়তে গেলে কোরাইশ সরদাররা এদের দুরবস্থা দেখে হাসি-ঠাট্টা করত। তারা বলত ঃ

১. যাদুল মাআদ।

"আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ছেড়ে এ সমস্ত লোকের প্রতিই না কি বিশেষ অনুগ্রহ করে ফেললেন!"

কিন্তু হুযুর (সাঃ) এ সমস্ত হাসি-ঠাট্টা হাসিমুখেই বরদাশ্ত করতেন।

হযরত সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের মেজাযে কিছুটা স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ছিল। তিনি গরীব মুসলিম জনগণের সঙ্গে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলার চেষ্টা করতেন। তাঁকে লক্ষ্য করেই একদিন হুযুর (সাঃ) এরশাদ করেন, "তোমরা যে জীবিকা লাভ করেছ, তা এ গরীব জনগণেরই দৌলতে এসে থাকে।"[১]

হযরত উসামা ইবনে আমর ইবনুল আস (সাঃ) বর্ণনা করেন, "আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখেছি সেখানে দরিদ্র সর্বহারা লোকদেরই আধিক্য।"[২]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেন, "একদিন আমি মসজিদে নববীতে বসেছিলাম। একপাশে দরিদ্র মুহাজেরগণ গোল হয়ে বসেছিলেন। এমন সময় হুযুর (সাঃ) তশরিফ আনলেন এবং গরীব মুহাজেরদের দলের ভিতরে গিয়ে বসে পড়লেন। আমি উঠে কাছে গিয়ে বসলাম। হুযুর (সাঃ) এরশাদ করলেন, "গরীব মুহাজেরদের জন্য সুসংবাদ। তারা ধনবান লোকদের চাইতে চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর বলেন, আমি দেখলাম, এ কথা শুনে সে গরীব লোকগুলোর চেহারা খুশীতে ডগমগ করে উঠল। অপরদিকে আমার আক্ষেপ হল যে হায় আমিও যদি এদের একজন হতাম।[৩]

একদিন হুযুর (সাঃ) এক মজলিসে ছিলেন। সামনে দিয়ে এক ব্যক্তিকে যেতে দেখে পাশের একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? সাহাবী জবাব দিলেন, "সম্ভ্রান্ত আমীর শ্রেণীর লোক বলে মনে হয়। আল্লাহ্র কসম এর এতটুকু যোগ্যতা আছে যে যদি কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দেয় তবে তা সাদরে গ্রহণযোগ্য হবে, যদি কোন সুপারিশ করে, তবে তা কবুল হবে।" জবাব শুনে হুযুর (সাঃ) কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আর একজন লোককে যেতে দেখা গেল। হুযুর (সাঃ) সে লোককে জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? সাহাবী জবাব দিলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ)! একজন দরিদ্র মোহাজের বলে মনে হয়। কোন ভাল ঘরে বিবাহ প্রার্থী হলে বিমুখ হবে, কোথাও সুপারিশ করলে কেউ তার কথা শুনবে না এবং কোন ফরিয়াদ করলে কেউ তার কথায় কান দেবে না।" এরশাদ করলেন, "তোমার সে আমীর লোকটির মত মানুষ দ্বারা যদি সারা দুনিয়া ভরে যায়, তবুও তাদের সবার চাইতে এ গরীব লোকটি অনেক ভাল।"[৪]

---

১. মেশকাত ঃ দরিদ্রের মর্যাদা।
২. বোখারী ও মুসলিম।
৩. বোখারী শরীফ।
৪. বুখারী শরীফ।

হুযুর (সাঃ) অনেক সময় দোয়া করতেন, "আয় আল্লাহ্! আমাকে মিসকীন হিসাবে বাঁচিয়ে রাখ, মিসকীন হিসাবে মৃত্যু দিও এবং মিসকীনদের সঙ্গে হাশরে আমাকে উঠিয়ো।" একদিন হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনার এ আকাঙ্ক্ষা কেন? জবাব দিলেন, "এ জন্য যে এরা ধনবানদের অনেক আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" তারপর বললেন, "হে আয়েশা! কোন মিসকীনকে দরজা থেকে বিমুখ করে ফিরিয়ে দিও না। শুকনো খেজুরের একটি টুকরো হলেও তাদের হাতে তুলে দিও। আয়েশা! গরীবদের সঙ্গে মহব্বত রেখো, তাদেরকে কাছে ডেকে নিও, আল্লাহ্ তা'আলাও তোমাকে কাছে টেনে নেবেন।"[১]

একবার কয়েকজন গরীব মুসলমান এসে আরয করলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ! ধনবান লোকেরা আখেরাতের ব্যাপারেও আমাদের আগে চলে যাচ্ছে। নামায-রোযা আমরা যেভাবে করি, তারাও সেভাবেই করে, কিন্তু সদকা-খয়রাতের মাধ্যমে যে নেকী তারা সঞ্চয় করছে তা থেকে আমরা বঞ্চিত থেকে যাচ্ছি।" এরশাদ করলেন, "এমন পন্থা কি আমি তোমাদের বলে দেব, যদ্দারা তোমরা আগে চলে যাবে এবং পরেও কেউ আর তোমাদের মোকাবিলা করতে সমর্থ হবে না?" সাহাবিরা আরয করলেন, নিশ্চয়ই, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাঃ)! অবশ্যই বলুন. এরশাদ করলেন, "প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার করে ছুবাহানাল্লাহ, আলহামদুল্লিাহ ও আল্লাহু আকবার পড়ে নিও।"

কিছুদিন পর পুনরায় এরা হাজির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ, (সাঃ)! আমাদের সম্পদশালী ভাইয়েরাও এ দোয়া শিখে আমল করতে শুরু করেছে, এখন কি হবে? জবাব দিলেন, এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি দিয়ে থাকেন।[২]

মুসলমানদের কাছ থেকে যাকাতের যে অর্থ সংগৃহীত হত, সে সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশ ছিল ঃ

"এ সমস্ত ধনবানদের কাছ থেকে সংগ্রহ্ করে সে এলাকার দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হবে।" সাহাবায়ে কেরাম কঠোরভাবে এ নীতির উপর আমল করতেন এবং এক এলাকার যাকাৎ সচরাচর অন্য এলাকায় পাঠাতেন না।

সমতা অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) গরীব মোহাজের হযরত বেলালকে কোন ব্যাপারে শক্ত কথা বললে হুযুর (সাঃ) শুনে হযরত আবু বকরকে ডেকে বলেছিলেন, তুমি তাদের কোন ব্যাপারে মনোকষ্ট দাওনি তো? এ কথা শোনামাত্র হযরত আবু বকর এঁদের কাছে এসে কাতর ভাবে তাদের কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিলেন।

১. তিরমিযী-বায়হাকী, ইবনে মাজাহ্।
২. বোখারী-মুসলিম।

মদীনার উপকণ্ঠে এক দরিদ্র স্ত্রীলোক বাস করতেন। একবার তিনি মারাত্মক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাঁচার যখন আর কোন আশাই রইল না, তখন হুযুর (সাঃ) নির্দেশ দিলেন, "ইন্তেকাল হলে আমাকে খবর দিও, আমি নিজে এর জানাযা পড়াব।" ঘটনাক্রমে সেদিন রাত্রেই তাঁর ইন্তেকাল হল। জানাযা তৈরি হয়ে এলে দেখা গেল, হুযুর (সাঃ) ঘুমিয়ে পড়েছেন। সাহাবিরা আর তাঁকে কষ্ট দেয়া সমীচীন মনে না করে নিজেরাই জানাযা পড়ে রাত্রে দাফন করে ফেললেন। পরদিন ভোরে যখন জানতে পারলেন যে তাকে কবর দিয়ে দেয়া হয়েছে, তখন হুযুর (সাঃ) সাহাবিদেরসহ সে কবরের পাশে গিয়ে দ্বিতীয়বার জানাযা পড়ালেন।[১]

হযরত জারীর বর্ণনা করেন, একদিন আমরা হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে বসেছিলাম। এমন সময় একটি ছিন্নমূল কবিলা এসে উপস্থিত হল। তাদের অবস্থা এতই শোচনীয় ছিল যে শিশু, যুবক, বৃদ্ধ কারো গায়েই কাপড় ছিল না। খালি পা, ছিন্নবসন, গলায় একেকটি তরবারি ঝুলানো এবং কেউ কেউ পশুচর্মের দ্বারা লজ্জা নিবারণ করার চেষ্টা করছেন। হুযুর (সাঃ) এদের দূরাবস্থা দেখে এমন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন যে চেহারার রং পাল্টে গেল। অধীর হয়ে একবার ভিতরে ও একবার বাইরে আসা-যাওয়া করতে লাগলেন। নামাযের সময় ঘনিয়ে এলে হযরত বেলালকে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। নামাযের পর মর্মস্পর্শি ভাষায় খুত্‌বা দিয়ে সমস্ত মুসলমানকে এ ছিন্নমূলদের সাহায্য করার জন্যে উৎসাহিত করলেন।[২]

জানের শত্রুর প্রতি ক্ষমা ঃ জানের শত্রু কিংবা জীবন নাশে উদ্যত আততায়ীকেও অম্লান বদনে ক্ষমা করার নজীর নবুয়তী আখলাক ব্যতীত আর কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে? যে রাত্রে হুযুর (সাঃ) হিজরত করেন, তার পরদিন প্রত্যুষে তাঁকে সম্মিলিতভাবে হত্যা করা ছিল মক্কাবাসীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। তাই সারা রাত ঘরের চারদিকে কঠোর পাহারা বসিয়ে দেয়া হয়; যাতে হুযুর (সাঃ) কোন ফাঁকে পালিয়ে যেতে না পারেন। সে অসহায় অবস্থার মধ্যে এ সব হিংস্র আততায়ীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করার মত শক্তি হুযুর (সাঃ)-এর ছিল না, কিন্তু আট বছর পরই এমন এক সময় এল, যখন এ জাতশত্রুদের প্রত্যেকেরই মস্তক ইসলামের তরবারির নিচে চলে আসে এবং তাদের বাঁচা-মরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুগ্রহের উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু সবাই জানেন, এ সমস্ত দুশমনের কাউকেও সে অপরাধের জন্য সামান্যতম শাস্তিও দেয়া হয়নি। হিজরতের দিন কোরাইশ সরদাররা ঘোষণা করেছিল, মোহাম্মদ (সাঃ)-কে যে লোক জীবিত অবস্থায় অথবা তাঁর মাথা কেটে এনে হাজির করতে পারবে, তাকে একশ' উট এনাম দেয়া হবে। সুরাকা ইবনুল জা'শাম নামক এক ব্যক্তি একটি ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন ঘোড়ায় চড়ে বল্লম হাতে হুযুর (সাঃ)-এর সন্ধান পায়, কিন্তু একে একে তিন বার অলৌকিক দুর্ঘটনায় পড়ে শেষ পর্যন্ত সে ভীত হয়ে পড়ল

১. বোখারী ঃ নাসায়ী।
২. মুসলিম শরীফ ঃ সাদাকাত।

এবং নিবেদন করল, "আমাকে একটি নিরাপত্তাপত্র লিখে দিন।" তার সে ইচ্ছা পূরণ করা হল।[১] এ ঘটনার আট বছর পর মক্কা বিজয়ের সময় সুরাকা ইসলাম গ্রহণ করেন, কিন্তু সে স্মরণীয় ঘটনাটি হুযুর (সাঃ) উল্লেখও করলেন না।[২]

উমাইর ইবনে ওয়াহাব ছিলেন মত দুশমনদের অন্যতম। বদরে নিহত আপনজনদের প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য যখন মক্কার লোক ক্ষিপ্ত—প্রায়, তখন সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া তাকে বিরাট অঙ্কের পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে (নাউযুবিল্লাহ) হুযুর (সাঃ)-কে হত্যা করার জন্যে মদীনায় পাঠাল। উমাইর তরবারির মধ্যে বিষ মিশিয়ে মদীনায় উপনীত হল। কিন্তু সাহাবীদের নজরে তার গতিবিধি ধরা পড়ে গেলে তাকে পাকড়াও করে হুযুর (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত করলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তার সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করতে উদ্যত হলে হুযুর (সাঃ) তাঁকে বিরত করলেন এবং উমাইরকে সামনে বসিয়ে কথাবার্তা শুরু করলেন। কথায় কথায় সে তার বদ-মতলবের কথা প্রকাশ করে দিল, কিন্তু তারপরও কোন প্রকার কটু কথা বললেন না। উমাইর এ আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অপ্রত্যাশিত উদারতার স্পর্শে স্তম্ভিত হয়ে গেল ও কালবিলম্ব না করে ইসলাম গ্রহণ করল। তারপর মক্কায় ফিরে গিয়ে ইনিই মক্কাবাসীকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন।[৩]

এ প্রসঙ্গে কোন এক মরূদ্যানে অতর্কিত অবস্থায় জনৈক বেদুঈনের হিংস্র আক্রমণ এবং হুযুর (সাঃ)-এর গুরুগম্ভীর আওয়ায শুনে তরবারি কোষবদ্ধ করে ফেলার ঘটনাটিও উল্লেখ করা যেতে পারে। পরে যখন সাহাবিরা এসে সমবেত হয়েছিলেন, তখনও হুযুর (সাঃ) সে নিঃসঙ্গ বেদুঈনকে এজন্য আর কোন কথাই বলেননি। ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

একবার এক ব্যক্তি হুযুর (সাঃ)-কে কতল করার মতলবে উপস্থিত হলে সাহাবিরা তাকে ধরে ফেললেন। বন্দী অবস্থায় তাকে খেদমতে হাজির করা হলে ভয়ে সে কাঁপতে লাগল। হুযুর (সাঃ) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "ভয় পেও না, তুমি আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হলেও তা করতে পারতে না।" এ বলে তাকে ছেড়ে দিলেন।[৪]

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় এক রাত্রে হুযুর (সাঃ)-কে হত্যা করার দুঃসাহসিক মতলবে আশি জন আততায়ীর একটি দল অন্ধকারে আত্মগোপন করে তানয়ীমের পার্বত্য এলাকা থেকে বেরিয়ে এল। সাহাবীরা তাদের সব কয়টিকেই ধরে এনে খেদমতে হাজির করলে হুযুর (সাঃ) তাদেরকে কিছু না বলেই ছেড়ে দিলেন। এ প্রসঙ্গে কোরআনের আয়াত নাযিল হয়। তাতে বলা হল ঃ

"তিনিই সে আল্লাহ্,—যিনি আপনার উপর থেকে তাদের হাতকে এবং তাদের থেকে আপনার হাতকে বিরত রেখেছেন।"(সূরা ফাতাহ্)[৫]

---

১. আল ইস্তিয়াব ও এসাবা।
২. এসাবা।
৩. তাবারী ঃ ওরওয়া ইবনে যুবাইরের বর্ণনা।
৪. মুসনাদে আহমদ ৩য় খণ্ড।
৫. তিরমিযী ঃ সূরা ফাত্হের তফসীর।

খায়বরের জনৈকা ইহুদী রমণী হুযুর (সাঃ)-কে খাদ্যের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। আহার গ্রহণ করার পর বিষের প্রভাব অনুভব করলেন। ইহুদীকে ডেকে এ কথা জিজ্ঞেস করা হলে শেষ পর্যন্ত তারা বিষের কথা স্বীকারও করল। কিন্তু এ জন্য হুযুর (সাঃ) কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করলেন না। কিন্তু যখন এ বিষের প্রভাবে জনৈক সাহাবীর ইন্তেকাল হল, তখন তার শাস্তিস্বরূপ বিষ প্রয়োগকারিণী রমণীকে শাস্তি প্রদান করা হয়। ওফাতের সময় পর্যন্ত হুযুর (সাঃ) ইহুদীর প্রদত্ত সে বিষক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া অনুভব করতেন।[১]

শত্রুদের প্রতি নেক দোয়া ঃ শত্রুর প্রতি অভিশাপ বর্ষণ মানুষের একটি সাধারণ প্রবণতা। কিন্তু আল্লাহ্র নবী-রসূলগণ চারিত্রিক দিক দিয়ে সাধারণ মানবীয় প্রবণতার বহু ঊর্ধ্বে ছিলেন। যে সমস্ত লোক তাদের তিরস্কার করে, তাঁরা তাদের প্রতি নেক দোয়া করে তার প্রতিদান দিতেন, যারা এদের রক্ত পান করতে উদ্যত হয়, তাঁরা তাদের প্রীতির সঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরতে দ্বিধাবোধ করতেন না। হিজরতের পূর্বে মক্কা জীবনে খোদ হযরত নবী করীম (সাঃ) এবং সাহাবীদের প্রতি যে অমানুষিক নির্যাতন অনুষ্ঠিত হত, তা বর্ণনা করতেও অন্তর কেঁপে ওঠে! এ দুঃসহ দিনগুলোতেই হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত নামক সাহাবী একদিন আরয করেছিলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)! দুশমনদের প্রতি বদদোয়া করুন। একথা শুনে পবিত্র চেহারা রক্তবর্ণ হয়ে গিয়েছিল।[২] একবার কিছু সংখ্যক সাহাবী সম্মিলিতভাবে এ ধরনের আবদার পেশ করলে এরশাদ হয়েছিল "আমি দুনিয়াবাসীর প্রতি অভিশাপ নয়, রহমত হিসাবে প্রেরিত হয়েছি।"[৩]

শেয়াবে আবু তালেবে দীর্ঘ তিন বছর কোরাইশরা তাঁকে পরিবার পরিজনসহ বন্দী করে রেখেছিল। তাদের সদা সচেতন চোখকে ফাঁকি দিয়ে শস্যের একটি দানাও সেখানে পৌঁছানো সম্ভব হত না। এহেন পাষণ্ডতার ফল স্বরূপ পরবর্তীতে মক্কায় এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যে সাধারণ মানুষ হাড় এবং মৃত জানোয়ারের গোশত খেতে শুরু করল।

আবু সুফিয়ান তখন খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন, "ইয়া মোহাম্মদ (সাঃ)! তোমার জাতি আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে, আল্লাহ্র দরবারে দোয়া কর, যেন এ দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে যায়।" হুযুর (সাঃ) বিনাদ্বিধায় হাত তুললেন। এ নেক দোয়ার বরকতে অল্পদিনের মধ্যেই মক্কাবাসী দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস থেকে মুক্তিলাভ করল।[৪]

ওহুদের যুদ্ধে দুশমনেরা হুযুর (সাঃ)-এর প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করেছে, তীর নিক্ষেপ করেছে, তরবারির আঘাতে দান্দান মোবারক শহীদ করেছে, শিরস্ত্রাণের আংটা ঢুকে ললাট রক্তাক্ত হয়েছে, কিন্তু এ হিংস্র আক্রমণের মুখেও হুযুর (সাঃ) শুধু আবেগ আপ্লুতকণ্ঠে এ দোয়াই উচ্চারণ করেছেন ঃ

---

১. বোখারী ওফাত অধ্যায়।
২. বোখারী।
৩. মেশকাত, আখলাক অধ্যায়।
৪. বোখারী-সূরা দোখানের তফসীর।

"আয় আল্লাহ্! আমার জাতিকে তুমি হেদায়েত কর; কেননা, তারা এখনও বুঝতে পারছে না।"

যে তায়েফবাসীরা ইসলামের দাওয়াত বিদ্রূপের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করল, যে তায়েফবাসী পাষণ্ডরা ইসলামের নবীকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করল, যে তায়েফের নরপশুরা সারা শরীর রক্তাক্ত করে আল্লাহ্র নবীকে শহর থেকে বের করে দিল, তাদের সে পাষণ্ডতার পরিপ্রেক্ষিতে আযাবের ফেরেশতা এসে যখন আরয করলেন, নির্দেশ হলে এদের উপর এ পাহাড় উল্টে দিই, তখন রহমতের নবী জবাব দিয়েছিলেন, তা হয় না, এরা না মানুক, হয়ত এদের ভবিষ্যৎ বংশরদের মধ্যে আল্লাহ্র অনুগত বান্দা সৃষ্টি হবে![1]

এ তায়েফবাসীই আট-দশ বছর পরও ইসলামের দাওয়াত তীর-তরবারি ও মিনজানিকের সাহায্যে প্রস্তর বর্ষণের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করল। সাহাবীগণ আরয করলেন,—"ইয়া রসূলুল্লাহ্! এ জালেমদের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করুন।" এদের আক্রমণে নিহত অসংখ্য প্রিয় সাহাবীর লাশ সামনে নিয়েই হুযুর (সাঃ) হাত তুললেন, সাহাবীরা মনে করলেন, এবার আর তায়েফবাসীরা আল্লাহ্র গযব থেকে রক্ষা পাবে না। কিন্তু শোনা গেল, মোবারক যবান থেকে উচ্চারিত হচ্ছেঃ" আয় আল্লাহ্! সাক্বীফ (তায়েফবাসী) গোত্রকে ইসলামে দীক্ষিত কর এবং বন্ধুবেশে মদীনায় হাজির কর।" যুদ্ধের ময়দান থেকে নিক্ষিপ্ত তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও মসজিদে-নববীর সে হেন থেকে নিক্ষিপ্ত পবিত্র যবানের সে তীর সঠিকভাবেই লক্ষ্যভেদ করল। দেখা গেল, অল্প দিনের মধ্যেই সাক্বীফ গোত্র মদীনায় হাজির হয়ে আতিথ্য গ্রহণ করল এবং ইসলামে দীক্ষিত হয়ে হুযুর (সাঃ)-এর পদতলে লুটিয়ে পড়ল।[2]

দাওস গোত্র ছিল ইয়ামনের অধিবাসী। তোফাইল ইবনে আমর দাওসী ছিলেন এ গোত্রের একজন বিশিষ্ট নেতা। প্রাথমিক যুগেই তিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন। ক্বিবিলায় ফিরে গিয়ে তিনি দীর্ঘদিন ধরে অন্যান্যদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু একটি লোকও তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল না। বিরক্ত হয়ে তিনি মদীনায় হাজির হলেন এবং খেদমতে উপনীত হয়ে আরয করলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)! আমার গোত্র ইসলাম গ্রহণ করল না, এদের বদ দোয়া করুন। সবকিছু শুনে হুযুর (সাঃ) বললেন, "দাওসের দিন শেষ হয়ে এসেছে।" দোয়া করলেন ঃ

"আয় আল্লাহ্! দাওস ক্বিবিলাকে হেদায়েত কর এবং তাদের হাজির কর।"[3]

হযরত আবু হোরাইরার মাতা মুশরেকা ছিলেন। আবু হোরাইরা (রাঃ) হাজার বোঝালেন, কিন্তু বৃদ্ধার অন্তর নরম হল না। একদিন বিরক্ত হয়ে খোদ হুযুর

১. বোখারী শরীফ।
২. ইবনে সাআ'দ তায়েফের যুদ্ধ।
৩. মুসলিম শরীফ ঃ দাওসের ঘটনা।

(সাঃ)-কে পর্যন্ত গালিগালাজ করতে শুরু করলেন। হযরত আবু হোরাইরার অন্তরে এমন দুঃখ হল যে তিনি কেঁদে ফেললেন। ক্রন্দনরত অবস্থাতেই তিনি দরবারে হাজির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)! আমার মা আপনার শানে বেআদবি করতে শুরু করেছেন—তার প্রতি বদদোয়া করুন। জবাবে হুযুর (সাঃ) হাত তুলে দোয়া করলেন, "আয় মাওলা! আবু হোরাইরার মাতাকে হেদায়েত কর।" হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বাড়ি ফিরে দেখলেন, ঘরের দরজা বন্ধ! কিছুক্ষণ পর দরজা খুললে দেখা গেল, তাঁর মাতা গোছল করে পাক-সাফ কাপড় পরে আছেন এবং যবানে ইসলামের কলেমা উচ্চারণ করছেন।[১]

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সলুল ছিল আজীবন মুনাফেক। হুযুর (সাঃ)-এর প্রতি শত্রুতা সাধন করার কোন সুযোগই সে কোন দিন হাতছাড়া করেনি। গোপনে ষড়যন্ত্র করা, গুপ্তচরবৃত্তি, পদে পদে ইসলাম ও মুসলমানদের হাস্যাস্পদ করার প্রচেষ্টাতেই সে সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকত। মক্কার কোরাইশদের সঙ্গে সে নিয়মিত পত্র-যোগাযোগের মাধ্যমে যাবতীয় খবরা-খবর আদান-প্রদান করত। ওহুদের যুদ্ধের ময়দান থেকে সে তার অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে ইসলামী সৈন্যবাহিনীর অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করে। হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপের ব্যাপারে সে-ই ছিল সর্বাগ্রগণ্য। এতকিছু সত্ত্বেও হুযুর (সাঃ) সব সময়ই তার সব অপরাধ রহমতের দরিয়ায় ধুয়ে দিতেন। মৃত্যুর পর তার পুত্রের অনুরোধে তার জানাযাও তিনি পড়েছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) আপত্তি করলে বললেন, "ওমর! যদি আমি জানতাম যে সত্তর বার জানাযা পড়লেও সে মুক্তি পাবে, তবে আমি তার চাইতেও অধিকবার জানাযা পড়তে দ্বিধা করতাম না।[২]

শিশুদের প্রতি স্নেহ ঃ হুযুর (সাঃ) শিশুদের অত্যধিক স্নেহ করতেন। সফর থেকে ফিরে এলে পথে শিশুদের সাক্ষাৎ পেলে তাদের সওয়ারীর অগ্র-পশ্চাতে তুলে নিতেন। পথে দেখা হলে শিশুদেরকে সালাম দিতেন।[৩]

একবার সাহাবী হযরত খালেদ ইবনে সায়ীদ দরবারে হাযির হলেন। সঙ্গে তাঁর একটি শিশুকন্যা ছিল। তার পরনে লাল রংয়ের জামা দেখে তার তারিফ করলেন। তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। এ শিশুটির জন্ম হয়েছিল হাবশাতে। হাবশা দেশে সুন্দর অর্থে আরবী "হুস্না" শব্দটি 'সান্না' উচ্চারিত হয়। হুযুর (সাঃ) কৌতুক করে তাকে "সান্না" বলে সম্বোধন করলেন। কথাবার্তার মধ্যে এক সময় মেয়েটি তাঁর শিশুসুলভ কৌতূহলবশে হুযুর (সাঃ)-এর পৃষ্ঠদেশস্থ মোহরে-নবুয়তে হাত রেখে খেলা করতে শুরু করল। খালেদ তা দেখে কন্যাকে ধমক দিলেন। কিন্তু হুযুর (সাঃ) খালেদকে বারণ করে বললেন, "আহা! ওকে খেলতে দাও।"[৪]

১. মুসলিম-আবু হোরাইরার মাহাত্ম্য।
২. বোখারী ঃ জানাযা অধ্যায়।
৩. আবু দাউদ ঃ আদব অধ্যায়।
৪. বোখারী, ২য় খণ্ড।

মেয়েটির নাম ছিল উম্মে খালেদ। আর একবার কাপড় বণ্টন করার সময় দু'দিকে সুন্দর আঁচলযুক্ত একটি কালো রঙের ছোট চাদর পাওয়া গেল। জিজ্ঞেস করলেন, এ চাদরটি কাকে দেয়া যায়! সবাই চুপ করে রইলেন।—তখন হুযুর (সাঃ) বললেন, উম্মে খালেদকে নিয়ে এসো। উম্মে খালেদকে আনার পর তাকে নিজহাতে সে চাদর পরিয়ে দিলেন। বার বার বলে দিলেন, "বড় মানিয়েছে, পুরাতন না হওয়া পর্যন্ত পরবে। এটি 'সান্না'(সুন্দর) না।"[১] এসাবাতে উল্লিখিত আছে যে উম্মে খালেদ তখন এত ছোট ছিল যে তাকে কোলে করে এনে হাজির করা হয়। হাবশায় জন্মগ্রহণ এবং কয়েক মাস বয়স পর্যন্ত সেখানে প্রতিপালিত হওয়ায় হুযুর (সাঃ) তার সঙ্গে কৌতুক করে হাবশী ভাষায় কথা বলতেন।

জনৈক সাহাবীর বর্ণনা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে তিনি আনসারদের খেজুর বাগানে ঢিল ছুঁড়ে খেজুর সংগ্রহ করার অপরাধে ধরা পড়ে দরবারে নীত হলে হুযুর (সাঃ) আদর করে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে গাছে ঢিল ছুঁড়ো না, স্বাভাবিক ভাবে যা ঝড়ে পড়ে তাই কুড়িয়ে খেয়ো। তারপর তার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করে দিলেন।

সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহ প্রকাশজনিত যে কোন ঘটনা হুযুর (সাঃ)-এর হৃদয়-মন স্পর্শ করত। একবার নিতান্ত দরিদ্র এক মাতা ছোট ছোট দুটি কন্যাসহ হযরত আয়েশার কাছে এসে সাহায্যপ্রার্থিনী হল। ঘরে কিছুই ছিল না। হযরত আয়েশা একটিমাত্র খেজুর এনে স্ত্রীলোকটির হাতে দিলেন। সে তা সমান দু'টুকরো করে দুটি মেয়েকে খেতে দিল। হুযুর (সঃ) বাইরে থেকে আসার পর হযরত আয়েশা (রাঃ) ঘটনাটি বর্ণনা করলে এরশাদ করলেন ঃ আল্লাহ্পাক যদি কাউকেও সন্তান দিয়ে পরীক্ষায় নিপতিত করেন, আর সে তার হক যথাযথ পালন করে যায়, তবে সে দোজখের আগুন থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে।[২]

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুযুর (সাঃ) এরশাদ করতেন,—"অনেক সময় আমার ইচ্ছা হয় যে নামায লম্বা করে পড়ি, কিন্তু হঠাৎ পেছন দিকে শিশুর কান্না শুনে মনে হয়, হয়ত তার মায়ের কষ্ট হবে, তাই নামায তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলি।[৩]

শুধু মুসলমানের শিশুদের প্রতিই যে হুযুর (সাঃ) এমন স্নেহ-মমতা পোষণ করতেন, তাই নয়। কাফের-মুশরেকদের শিশুদের প্রতিও একইরূপ মমতা প্রকাশ করতেন। কোন এক যুদ্ধে আক্রমণের মুখে প্রতিপক্ষের কয়েকটি শিশু নিহত হল। হুযুর (সাঃ) তা দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। লোকেরা নিবেদন করল, এরা যে মুশকেরদের সন্তান ছিল। জবাব দিলেন, "মুশরেকদের শিশুরাও তোমাদের চেয়ে উত্তম। খবরদার, কখনও শিশুদের হত্যা করো না। মনে রেখো, প্রত্যেক শিশুই আল্লাহ্র স্বভাবধর্মের উপর জন্ম গ্রহণ করে থাকে।"[৪]

---

১. বোখারীতে উল্লিখিত হয়েছে, মেয়েটি হাবশায় জন্মগ্রহণ করেছিল এবং সেখানকার ভাষায় আরবী হুসনাকে ছান্না বলা হত।
২. বোখারী শরীফ।
৩. বোখারী শরীফ ঃ নামায় অধ্যায়।
৪. মুসনাদে আহমদ, ৩য় খণ্ড।

নতুন ফসল ওঠার সময় কেউ কোন সময় ফল-মূল এনে পেশ করলে ছোট ছোট শিশুকে তা বেঁটে দিতেন। বাচ্চাদের আদর-সোহাগ করতেন, কোলে তুলে চুমো খেতেন। একবার জনৈক বেদুঈন খেদমতে হাজির হয়ে দেখল, হুযুর (সাঃ) একটি শিশুকে কোলে তুলে চুমু খাচ্ছেন। সে বলতে লাগল, আপনারা বাচ্চাদের চুমু খান অথচ আমার দশ দশটি বাচ্চা রয়েছে, কিন্তু কোনদিন আমি তাদের এমনভাবে আদর করিনি। হুযুর (সাঃ) জবাব দিলেন, আল্লাহ্ পাক যদি তোমার অন্তর থেকে স্নেহ-মমতা তুলে নিয়ে থাকেন, তবে আমার কি করার আছে?[১]

সাহাবী হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, শিশুকালে একদিন আমি হুযুর (সাঃ)-এর পেছনে নামায পড়েছিলাম। নামায শেষ হওয়ার পর বাড়ি ফেরার পথে তাঁর পেছনে পেছনে যেতে লাগলাম। অন্যদিক থেকেও কয়েকটি শিশু এসে শামিল হল। হুযুর (সাঃ) আমাদের সবাইকে ডেকে আদর করলেন।[২]

হিজরতের সময় হুযুর (সাঃ) যখন মদীনায় প্রবেশ করছিলেন, তখন আনসারদের ছোট ছোট মেয়েরা পথের পাশে গান গেয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানাচ্ছিল। হুযুর (সাঃ) তাদের ডেকে জিজ্ঞস করলেন, ওগো, তোমরা কি আমাকে ভালবাস? সবাই সমবেত কণ্ঠে যখন জবাব দিল, নিশ্চয়। নিশ্চয়, তখন এরশাদ করলেন, আমিও তোমাদের ভালবাসি।[৩]

হযরত আয়েশা (রাঃ) অল্প বয়সে স্বামীর ঘরে এসেছিলেন। মহল্লার অন্যান্য মেয়েরা এসে তাঁর সঙ্গে খেলা করত। কোন সময় হুযুর (সাঃ) এসে গেলে সবাই ছুটে পালাতে চেষ্টা করত। কিন্তু হুযুর (সাঃ) তাদেরকে অভয় দিয়ে বলতেন, তোমরা খেলা কর।[৪]

দাসদের প্রতি মমতা ঃ হুযুর (সাঃ) দাস-দাসীদের প্রতি বিশেষভাবে মমতা প্রকাশ করতেন। সাহাবীদের উপদেশ দিতেন—দেখ, এরা তোমার ভাই, নিজেরা যা খাবে, এদেরও তাই খেতে দেবে, নিজেরা যা পরবে তাদেরও তাই পরতে দেবে। হুযুর (সাঃ)-এর মালিকানায় কোন দাস-দাসী এলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে মুক্ত করে দিতেন। কিন্তু তারা হুযুর (সাঃ)-এর স্নেহ-মমতার বন্ধন থেকে কোন কালেই আর মুক্ত হতে পারতেন না। মাতা-পিতার স্নেহ এবং কৃবিলা-রেশতার মায়া কাটিয়ে তাঁরা চিরজীবন এ মহান দরবারের গোলামি করেই জীবন কাটিয়ে দিতেন। হযরত যায়েদ ইবনে হারেস ক্রীতদাস ছিলেন। হুযুর (সাঃ) তাঁকে মুক্ত করে দেয়ার পর তাঁর পিতা তাকে নিতে এলেন। কিন্তু দরবারে রেসালাতের মমতার বন্ধনের কাছে পিতৃ-স্নেহের দাবি হার মানল। যায়েদ বাকি জীবন এ দরবারেই থেকে গেলেন। যায়েদের পুত্র উসামাকে এত স্নেহ করতেন যে নিজ হাতে তাঁর নাক পর্যন্ত পরিষ্কার করে দিতেন। এরশাদ করতেন, উসামা যদি মেয়ে হত তবে আমি তাকে অলঙ্কার তৈরি করে দিতাম।

---

১. জামে, সগীর, তিরমিযী, বোখারী।
২. মুসলিম শরীফ।
৩. সীরাত, ১ম খণ্ড, হিজরত অধ্যায়।
৪. আবু দাউদ, আদব অধ্যায়।

দাস-দাসীকে গোলাম বা বাঁদী বলে সম্বোধন করলে তাদের অন্তরে যে আঘাত লাগে, হুযুর (সাঃ) নিজের দরদী অন্তর দিয়ে তা অনুভব করতেন। বলতেন, তাদের গোলাম-বাঁদী বলে সম্বোধন করো না, বরং ছেলেমেয়ের ন্যায় ডেকো। দাস-দাসীরাও যেন মালিকদের প্রভু বলে সম্বোধন না করে। কেননা, মানুষের মালিক বা প্রভু আল্লাহ্। দাসদের তিনি কতটুকু ভালবাসতেন, তার প্রমাণ রয়েছে জীবনের শেষ মুহূর্তে পবিত্র যবান থেকে উচ্চারিত কয়েকটি কথায়। সর্বশেষ বলেছিলেন, তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করো।

সর্বপ্রথম যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হযরত আবু যর গেফারী ছিলেন তাঁদের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর সাহসিকতা এবং স্পষ্টবাদিতা সম্পর্কে খোদ হুযুর (সাঃ)-ও প্রশংসা করতেন। কিন্তু কোন কারণে রাগান্বিত হয়ে এহেন হযরত আবু যর একবার কোন একজন অনারব কৃতদাসকে মন্দ বলাতে হুযুর (সাঃ)-এর দরবারে অভিযোগ এল। তাঁকে তৎক্ষণাৎ ডেকে এনে ভর্ৎসনা করলেন এবং বললেন, তোমার মধ্যে এখনও পর্যন্ত জাহেলিয়াত যুগের প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। এ সমস্ত দাস-দাসী তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ পাক তোমাদের তাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন, যদি তাদের কেউ তোমাদের পছন্দমাফিক না হয়, তবে তাকে বিক্রি করে দাও; আল্লাহ্র সৃষ্টিকে নির্যাতন করো না। যা নিজে খাবে, তাদেরও তাই খেতে দেবে, যা পরবে, তাদেরও তাই পরাবে। তাদেরকে সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ দেবে না। কোন কঠিন কাজে নিয়োগ করলে নিজেও তার সাহায্য করবে।[১]

একবার হযরত আবু মাসউদ আনসারী তাঁর একটি গোলামকে প্রহার করছিলেন। পেছন দিক থেকে আওয়াজ এল ঃ "আবু মাসউদ! এ গোলামের উপর তোমার যতটুকু ক্ষমতা, তোমার উপর আল্লাহ্ তা'আলার এর চাইতে অনেক বেশি ক্ষমতা রয়েছে।" আবু মাসউদ ফিরে দেখলেন, স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাঁড়িয়ে আছেন। আবু মাসউদ লজ্জিত হয়ে নিবেদন করলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)! আমি একে আল্লাহ্র ওয়াস্তে মুক্ত করে দিলাম।" এরশাদ করলেন, "যদি তুমি এমন না করতে, তবে দোযখের আগুন তোমাকে স্পর্শ করত।"

আরেকবার এক ব্যক্তি এসে আরয করল, ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)! দৈনিক কতবার দাস-দাসীদের অপরাধ ক্ষমা করা দরকার? প্রশ্ন শুনে হুযুর (সাঃ) কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। প্রশ্নকারী পুনরায় একই প্রশ্ন করলেন কিন্তু এবারও কোন জবাব দিলেন না। তৃতীয়বার সে একই প্রশ্ন করলে এরশাদ করলেন, "অন্তত সত্তর বার ক্ষমা করে দিও।"

সাহাবীদের কোন এক পরিবারে সাতজন লোকের মধ্যে একটি মাত্র বাঁদী ছিল। বেচারী একাই সাতজনের সেবা-যত্ন করত। একবার পরিবারের কোন

১. বোখারী-মুসলিম।

একজন সদস্য রাগান্বিত হয়ে তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করেছিল। হুযুর (সাঃ) শুনে এরশাদ করলেন, একে মুক্ত করে দাও। তারা নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)! আমাদের সাতজন লোকের মধ্যে এ একটি মাত্র পরিচারিকা, আমাদের খুবই অসুবিধা হবে। তখন হুকুম দিলেন, "কোন একটি বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত সে কাজ করতে থাকুক, কিন্তু ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ছেড়ে দেবে।"[১]

জনৈক সাহাবীর দু'টি কৃতদাস ছিল। এরা কাজকর্মে অবাধ্যতা প্রকাশ করত। সাহাবী সব সময় বিরক্ত হতে থাকতেন। কখনও কখনও এদের মারপিট করতেন। একদিন তিনি হুযুর (সাঃ) সমীপে বিষয়টি বর্ণনা করে পরামর্শ চাইলেন। জবাব দেয়া হল, "তুমি ওদের যে শাস্তি দিয়ে থাক, তা যদি ওদের অপরাধ পরিমাণ হয়, তবে অবশ্য কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু শাস্তির মাত্রা যদি অপরাধের চাইতেও সামান্য বেশি হয়ে যায়, তবে সে অতিরিক্ত শাস্তিটুকুর জন্য আল্লাহ্‌পাক তোমাকে শাস্তি দেবেন।" এ কথা শুনে সাহাবী অস্থির হয়ে উঠলেন। ভয়ে তাঁর দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরতে শুরু করল। হুযুর (সাঃ) বললেন, "এ লোকটি কি কোরআন পড়ে না? কোরআনে তো সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে যে ন্যায়ের দণ্ড অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করে রাখা হয়েছে।" এটুকু শোনার পর সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)! আমি বরং এ দু'টিকে বিদায় করে দিই! আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি এখনই ওদের মুক্ত করে দিলাম।[২]

তখনকার যুগে বাঁদী-গোলামদের মধ্যে পরস্পর বিয়ে দেয়া হত এবং মালিকদের ইচ্ছামত এ সমস্ত বিয়ে ছাড়ানোও যেত। এমনি এক দাস-দম্পতির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য মালিক পীড়াপীড়ি শুরু করলে, সে এসে হুযুর (সাঃ)-এর নিকট অভিযোগ দায়ের করল। এ পরিপ্রেক্ষিতেই মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুত্‌বা দিলেন, লোকের বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ করার পর দাস-দম্পত্তির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য কেন পীড়াপীড়ি করে? বিয়ে এবং তালাকের অধিকার একান্তভাবেই স্বামীর।[৩]

দাসদের প্রতি এহেন সহানুভূতি এবং কোমল ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে বহু কৃতদাস কাফের মালিকদের কবল থেকে পালিয়ে এসে হুযুর (সাঃ)-এর নিরাপদ সান্নিধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করত। তিনি তাদেরকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করতেন। যুদ্ধ-লব্ধ গনীমতের মাল থেকে দাসদেরকেও অংশ দেয়া হত। বিশেষত, সদ্যমুক্ত নিঃস্ব দাস-দাসীদের পুনর্বাসনের জন্য গনীমতের একটি বিশেষ অংশই বরাদ্দ রাখা হত। বণ্টনের সময় সর্বপ্রথম এদেরই দেয়া হত।

১. এই সমস্ত ঘটনা আবু দাউদে 'দাসদের অধিকার' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।
২. মুসনাদে আহমদ ২য় খণ্ড।
৩. ইবনে মা[illegible], [illegible]লাক অধ্যায়।

নারীদের প্রতি ব্যবহার ঃ যুগে যুগেই নারী জাতি ছিল উপেক্ষিতা ও নির্যাতিতা। এদের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার কোন প্রয়োজনীয়তার কথা কেউ কোনদিন অনুভব করেছে বলেও বড় একটা জানা যায় না। হুযুর (সাঃ)-এর পূর্বে কোন ধর্ম প্রবর্তক বা সংস্কারক নারী জাতির প্রতি কোনরূপ মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন বলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। নারীদের সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত আচার-আচরণ কেমন ছিল, তাও কোথাও উল্লিখিত নেই। ইসলামই সর্বপ্রথম নারী জাতিকে পুরুষের সমান মর্যাদা দান করেছে। উপেক্ষার অন্ধকার থেকে টেনে এনে সম-অধিকারের আলোকে উজ্জ্বল জীবন পথে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সুতরাং ইসলামের নবী ব্যক্তিগতভাবে নারী জাতির প্রতি কতটুকু শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, সে সম্পর্কে সামান্য তথ্য অবগত হওয়া প্রয়োজন।

বোখারী শরীফে হুযুর (সাঃ)-এর 'ঈলা' বা স্ত্রীদের থেকে সাময়িক ভাবে দূরে থাকার ঘটনার উল্লেখ প্রসঙ্গে হযরত ওমরের মন্তব্যটি এ সম্পর্কিত একটি উল্লেখযোগ্য দলীল। তিনি বলেছিলেন, "মক্কার জীবনে আমরা স্ত্রীজাতিকে বিন্দুমাত্রও গুরুত্ব দান করতাম না। মদীনার সমাজে অবশ্য তাদের কিছুটা স্থান ছিল, কিন্তু ততটুকু ছিল না, শরীয়ত যতটুকু অধিকার দিয়েছে।"

ইসলাম নারী জাতিকে অধিকার দিয়েছে। শরীয়তে তাদের অধিকার সম্পর্কে বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। এতদসঙ্গে হুযুর (সাঃ)-এর কওল এবং ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহার নারী জাতির মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজ দ্রুততর করেছে। স্ত্রীদের সঙ্গে হুযুর (সাঃ)-এর মর্যাদাপূর্ণ আচরণের বিবরণ পৃথকভাবে বর্ণিত হবে। এ প্রসঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হল।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে সব সময়ই লোকের ভিড় থাকত। এ ভিড় ঠেলে স্ত্রীলোকদের পক্ষে উপদেশ শোনা কষ্টকর হয়ে উঠত। তাঁরা এসে সপ্তাহে একটি দিন স্ত্রীলোকদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়ার আবেদন করলে তা মঞ্জুর করা হল এবং তার পর থেকে নির্ধারিত সে দিনটিতে স্ত্রীলোকদের প্রতি উপদেশ দান এবং তাঁদের নানা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য নিয়মিতভাবে বৈঠক বসতে শুরু করে।

প্রাথমিক যুগে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মজলুম মুসলমানদের মধ্যে আসমা বিন্‌তে উমাইস নাম্নী জনৈকা মহিলা সাহাবী ছিলেন অন্যতমা। খায়বর বিজিত হওয়ার সময় এরা হাবশা থেকে মদীনায় আসেন। একদিন তিনি হযরত হাফসার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। ঘটনাক্রমে তখন হযরত ওমর (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে দেখে হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? হযরত হাফসা (রাঃ) নাম বললে হযরত ওমর (রাঃ) বলতে লাগলেন, "যে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে হাবশায় গিয়েছিল, সে নাকি?" আসমা জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, আমি সে-ই!" কথাচ্ছলে হযরত ওমর বললেন, "আমরা তোমাদের আগে হিজরত করে মদীনায় এসেছি। সুতরাং হুযুর (সাঃ)-এর প্রতি আমাদের হক বেশি।" এ

কথা শুনে আসমা অসন্তুষ্ট হলেন, বলতে লাগলেন, "কক্ষনো নয়, তোমরা হুযুর (সাঃ)-এর আশ্রয়ে ছিলে। তিনি নিজে না খেয়েও ক্ষুধার্তদের খাওয়াতেন। আর আমরা স্বদেশ ও আপনজন থেকে বহুদূরে অপরিচিত হাবশীদের মধ্যে থাকতাম। যে-সে লোক আমাদের উপর অত্যাচার করত। সব সময়ই আমাদের অন্তরে প্রাণের ভয় লেগেই থাকত।"

কথাবার্তার মধ্যেই হুযুর (সাঃ)-ও সেখানে তশরিফ আনলেন। আসমা সব কথা নিবেদন করে বললেন, "ওমর এসব কথা বলে।" হুযুর (সাঃ) আসমার কথা শুনে বললেন, "আমার প্রতি ওমরের হক তোমাদের চেয়ে বেশি নয়। ওমর এবং তাঁর সঙ্গীরা শুধু একটি হিজরত করেছেন, আর তোমরা দুটি হিজরত করেছ।"

এ কথা প্রচারিত হলে আবিসিনিয়ার মোহাজেরগণ দলে দলে এসে আসমার ঘরে সমবেত হতেন এবং বার বার তাঁরা হুবহু যে ভাষায় হুযুর (সাঃ) কথা কয়টি বলেছিলেন, সেভাবেই কথা কয়টি আসমার মুখে শুনতেন। আসমা বলেন, "আবিসিনিয়ার মোহাজেরগণের কাছে হুযুর (সাঃ)-এর এ কথা কয়টির চেয়ে আনন্দদায়ক আর কোন কিছুই এ দুনিয়ার বুকে ছিল না।[১]

আনাস ইবনে মালেকের খালা উম্মে হারাম দুধমাতার দিক দিয়ে হুযুর (সাঃ)-এর খালা হতেন। কোবার দিকে কখনও গেলে এঁর বাড়িতেও অবশ্যই যেতেন। উম্মে হারাম প্রিয় নবীজীকে (সাঃ) নিজ হাতে খাওয়াতেন, প্রাঙ্গণে বিছানা পেতে দিতেন। মাথার উকুন বেছে দিতেন।[২]

হযরত আনাসের মাতা উম্মে সুলাইমের সঙ্গে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। হুযুর (সাঃ) মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ি যেতেন। উম্মে সুলাইম বিছানা করে দিলে সেখানে আরাম করতেন, ঘুমের মধ্যে শরীর থেকে যে ঘাম নির্গত হত, আনাসের মাতা তা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে একটি শিশিতে সংগ্রহ করে রাখতেন। মৃত্যুর সময় তিনি অসিয়ত করেছিলেন, "কাফনের মধ্যে সুগন্ধি দ্রব্য ছিটানোর সময় এ পবিত্র ঘর্মবিন্দুটুকুও যেন ছিটিয়ে দেয়া হয়।"[৩]

একবার হযরত আনাসের দাদী মালিকা দাওয়াত করে হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। খাওয়ার পর বললেন, এসো, তোমাদের নামায পড়াই। ঘরে একটি ভাঙ্গা পুরোনো চাটাই ছাড়া আর কোন বিছানাই ছিল না। হযরত আনাস (রাঃ) তাড়াতাড়ি সেটিকেই ধুয়ে আনলেন। হুযুর (সাঃ) নামাযে দাঁড়ালেন। হযরত আনাস, তাঁর দাদী এবং এতীম নামক তাঁদের একটি গোলাম, একসঙ্গে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলেন। হুযুর (সাঃ) সবাইকে নিয়ে দু'রাকাত নামায পড়ে বাড়ি ফিরে এলেন।[৪]

---

১. বোখারী ঃ খ যবরের যুদ্ধ।
২. বোখারী ঃ ে হ্যদ অধ্যায়।
৩. বোখারী
৪. বোখারী ঃ চাটাইয়ের উপর দাঁড়িয়ে নামায।

হযরত আয়েশার বৈমাত্রেয় বড় ভগ্নী হযরত আসমা ছিলেন হযরত যুবায়েরের স্ত্রী। হিজরতের সময় তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে মদীনায় এসেছিলেন। একটি ঘোড়া ছাড়া যুবায়ের-এর আর কোন কিছুই ছিল না। হযরত আসমা স্বয়ং ঘোড়াটির ঘাস-পানির ব্যবস্থা করতেন। অনেক সময় ঘোড়ার ঘাস সংগ্রহ করার জন্যে তিনি মাঠে চলে যেতেন। হযরত যুবায়েরকে হুযুর (সাঃ) মদীনা থেকে দু'মাইল দূরে কিছু জমি দান করেছিলেন। হযরত আসমা সেখান থেকে নিজের মাথায় করে খেজুরের বোঝা বয়ে আনতেন। একদিন হুযুর (সাঃ) উটে করে কোথা থেকে আসছিলেন। পথে খেজুরের বোঝা মাথায় হযরত আস্‌মাকে দেখে নেমে পড়লেন এবং তাঁকে উটে আরোহণ করে বাড়ি যেতে আহ্বান করলেন। হযরত আসমা (রাঃ) লজ্জিত হয়ে সরে গেলেন। তাঁকে লজ্জিত হতে দেখে হুযুর (সাঃ) চলে গেলেন। আসমা বলেন, এর পর থেকে ঘোড়ার রক্ষণাবেক্ষণ এবং গৃহস্থালী কাজকর্মের জন্য হযরত আবু বকর (রাঃ) একজন চাকর পাঠিয়ে দিলেন। আমি তখন এমন স্বস্তি অনুভব করলাম যে মনে হচ্ছিল, যেন গোলামি থেকে মুক্তি লাভ করেছি।[১]

একদিন আত্মীয়-পরিজনের কয়েকজন স্ত্রীলোক বসে হুযুর (সাঃ)-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। এমন সময় হযরত ওমর (রাঃ) এসে উপস্থিত হলেন। ওমরকে দেখেই স্ত্রীলোকেরা আড়ালে চলে গেলেন। ব্যাপার দেখে হুযুর (সাঃ) হাসতে লাগলেন। ওমর স্ত্রীলোকদের ডেকে বললেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে তো তোমরা খুব কথাবার্তা বলছিলে, আর আমাকে দেখেই ভয়ে পালাতে শুরু করলে? তাদের একজন জবাব দিলেন. আপনি যে হুযুর (সাঃ)-এর তুলনায় কঠোর প্রকৃতির লোক।[২]

এক ঈদের দিনে হুযুর (সাঃ) হযরত আয়েশার ঘরে চাদরে মুখ ঢেকে শুয়েছিলেন। ছোট ছোট কয়েকটি মেয়ে দফ বাজিয়ে গান গাইছিল। এমন সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) এসে তাদেরকে ধমক দিলেন। শুনে হুযুর (সাঃ) বললেন, "আবু বকর! এদের গাইতে দাও। আজ ঈদের দিন, এরা আনন্দ করুক।"[৩]

স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত নিঃসংকোচে এসে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। অনেক সময় এঁদের সাহস দেখে সাহাবীরা বিস্মিত হতেন। কিন্তু হুযুর (সাঃ) কোন সময়ই তাঁদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। স্ত্রীলোকেরা যেহেতু অত্যন্ত কোমল স্বভাব এবং অভিমানী প্রকৃতির হয়ে থাকে, তাই তাদের অনুভূতির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হত।

আনজাশা নামক এক হাবশী গোলাম অত্যন্ত আকর্ষণীয় সুরে হুদীগান গাইতে জানতেন। এক সফরে আন্‌জাশা উষ্ট্রপালের আগে আগে হুদী গেয়ে যাচ্ছিলেন,

১. বোখারী।
২. বোখারী শরীফ ঃ ওমর প্রসঙ্গ।
৩. মুসলিম শরীফ ঃ ঈদ প্রসঙ্গ।

গানের সুরে আকৃষ্ট হয়ে উটগুলো দ্রুত ছুটছিল। হুযুর (সাঃ) কাফেলার স্ত্রীলোকদের প্রতি ইঙ্গিত করে মন্তব্য করলেন, "আনজাশা! তোমার হুদী গানের করুণ সুরে কাচের অন্তরগুলো না ফেটে যায়।"

জীবজন্তুর প্রতি দয়া ঃ জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন ছিল হুযুর (সাঃ)–এর অন্যতম চরিত্রর বৈশিষ্ট্য। মানুষ যুগের পর যুগ ধরে বোবা জীব-জানোয়ারের প্রতি যে অত্যাচার করে এসেছে, হুযুর (সাঃ) সে হৃদয়হীন আচরণ সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। উটের গলায় বেড়ী পরানোর রীতি রহিত করা হয়।[১] কোন পশুর লেজ কাটা বা কেশরের পশম কেটে নেয়াও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এরশাদ করেন, লেজ হল পশুর ব্যজনী এবং কেশর তার ভূষণ। এগুলো কর্তন করো না। পিঠে গদি এঁটে দীর্ঘ সময় কোন সওয়ারীর পশুকে দাঁড় করিয়ে রাখতেও নিষেধ করতেন। বলতেন, "জীব-জানোয়ারকে তোমরা বিছানা কুরছি মনে করো না। এগুলোরও আরামের প্রয়োজন হয়।" দুম্বার শরীর থেকে বর্ধিত গোশতের টুকরো কেটে নিয়ে তা খাওয়া হত। জীবন্ত জীব-জানোয়ারের কোন অংশ কেটে খাওয়ার প্রাচীন প্রথাও নিষিদ্ধ করা হয়। একটি বিশেষ প্রথা অনুযায়ী কোন জীবন্ত জানোয়ারকে বেঁধে তার গায়ে তীর নিক্ষেপের অনুশীলন করা হত। এ নিষ্ঠুর প্রথাও সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দিলেন। অনুরূপ জীব-জানোয়ারের লড়াই লাগানোর সুপ্রাচীন প্রথাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন।

একদিন পথে একটি গাধা দেখতে পেলেন। সেটির মুখে লোহা পুড়িয়ে অনেকগুলো দাগ দেয়া হয়েছিল। বলে উঠলেন, "যে এ নিরীহ জীবটিকে এমন নিষ্ঠুরভাবে দাগ দিয়েছে তার উপর আল্লাহ্র লানত।" পরিচয় চিহ্ন দেয়া এবং অন্যান্য কারণে উট-বকরীর দেহে দাগ দেয়ার প্রয়োজন হত। কিন্তু এমতাবস্থায় হুযুর (সাঃ) শরীরের কোন কোমল অংশে দাগ দিতে নিষেধ করতেন। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার আমি হুযুর (সাঃ)-কে বকরীর পালে গিয়ে সেগুলোর কানে চিহ্ন আঁকতে দেখেছি।[২]

কোন এক সফরে এক জায়গায় কাফেলা থামল। কাছেই গাছের ডালে একটি পাখি বাসা বেঁধে ডিম পেড়েছিল। জনৈক সাহাবী পাখির সে ডিম তুলে আনলেন। পাখিটি তার অপহৃত ডিমের জন্য মহাকলরবে ছটফট করে পাখা ঝাপটাতে শুরু করল। হুযুর (সাঃ) এ দৃশ্য দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "ডিম ছিনিয়ে এনে কে এ পাখিটিকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছে?" সাহাবী নিবেদন করলেন, "আমি, ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)।" হুকুম দিলেন, "এক্ষুনিই ডিমগুলো যথাস্থানে রেখে এসো।"[৩]

এক সাহাবী কয়েকটি পাখির ছানা চাদরে লুকিয়ে দরবারে হাজির হলেন। হুযুর (সাঃ)-এর জিজ্ঞাসার জবাবে নিবেদন করলেন, "আসার পথে একটি

১. মুসলিম শরীফ।
২. উপরোক্ত হাদীসগুলো তিরমিযী ও আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে।
৩. আদাবুল মুফরাদ, বোখারী।

ঝোপের মধ্যে চিঁ চিঁ শব্দে আকৃষ্ট হয়ে দেখতে পেলাম একটি পাখির বাসায় একটি ছানা। যখন এগুলো ধরে আনি তখন ছানাগুলোর মা অধীর হয়ে আমার মাথার উপর চক্রাকারে ঘুরছিল।" সব কথা শুনে হুযুর (সাঃ) নির্দেশ দিলেন, "এ মুহূর্তেই ছানাগুলো যথাস্থানে রেখে এসো।"[১]

একবার পথিমধ্যে এমন কৃশ একটি উট চোখে পড়ল, ঘাস-পানি না পেয়ে তার পেট-পিঠ এক হয়ে গিয়েছিল। মন্তব্য করলেন, "এ সমস্ত নিরীহ জন্তু সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় করো।"[২]

আরেকবার একটি বাগানে গিয়ে দেখলেন, ক্ষুধার্ত একটি উট বেঁধে রাখা হয়েছে। হুযুর (সাঃ)-কে দেখামাত্র উটটি ডেকে উঠল। তিনি কাছে গিয়ে তার মুখে-শরীরে হাত বুলিয়ে দিলেন, জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, উটটি জনৈক আনসারীর। তৎক্ষণাৎ তাঁকে ডেকে ভর্ৎসনার স্বরে বললেন, "এ সমস্ত নিরীহ্ বোবা জীব-জন্তু সম্পর্কে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর না?"[৩]

সকলের প্রতি ভালবাসা ঃ হুযুর (সাঃ) দুনিয়ার প্রতি রহমত হিসাবে আগমন করেছিলেন। হযরত মুসা বলেছিলেন, আমি শান্তির রাজপুত্র। কিন্তু শান্তির এ রাজকুমারের জীবনালেখ্যের মধ্যে শান্তির কোন বাস্তব নমুনা খুঁজে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ তাঁর অনুসারী হওয়ার দাবিদাররা তা সংরক্ষণ করতে পারেনি। অপর দিকে শান্তির শাহানশাহ্ মোহাম্মদ (সাঃ)-কে খোদ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ডেকে বলেছেন ঃ

"সমগ্র বিশ্ব-জাহানের জন্য আপনাকে রহমতস্বরূপ পাঠানো হয়েছে।" ইতিপূর্বে হযরত নবী করীমের (সাঃ) ধৈর্য, ক্ষমা ও মহব্বতের বহু ঘটনাই আলোচিত হয়েছে। এ সমস্ত ঘটনার দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে রহমতের এ ছায়া দোস্ত-দুশমন, কাফের-মুসলিম, শিশু-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ এমন কি, হিংস্র জীব-জন্তুর উপর পর্যন্ত সমভাবে বিস্তৃত ছিল। এক কথায়, দুনিয়ার সব কিছুই তাঁর সে রহমতের ছায়ার অংশীদার ছিল।

এক ব্যক্তি এসে কোন দুশমনের প্রতি অভিশাপ করার আবেদন জানালে ক্রোধান্বিত হয়ে এরশাদ করলেন, "আমি কারো প্রতি অভিশাপ করার জন্য আগমন করিনি, আমাকে দুনিয়ার সবার প্রতি রহমতস্বরূপ পাঠানো হয়েছে।" দুনিয়াবাসীকে তিনি পয়গাম দিয়েছেন ঃ

"তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না। একের দিক থেকে অন্যে মুখ ফিরিয়ে রেখো না, আল্লাহ্র সমস্ত বান্দা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।"

১. মেশকাত, আবু দাউদ।
২. আবু দাউদ।
৩. আবু দাউদ।

"তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ কর, অন্য সব মানুষের জন্যও তাই পছন্দ করো, পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারবে।"[১]

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ

"তোমাদের মধ্যে কেউ সে পর্যন্ত পরিপূর্ণ মোমেন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য সবার জন্য তা পছন্দ না করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে থাকে। আর যে পর্যন্ত না কোন ব্যক্তি তার অপর ভাইকে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে ভালবাসতে না শেখে।" (মুসনাদে আহ্‌মদ—৩য় খণ্ড)

এক ব্যক্তি মসজিদে এসে দোয়া করছিল, "আয় আল্লাহ্! আমাকে এবং মোহাম্মদ (সাঃ)-কে ক্ষমা কর।" হুযুর (সাঃ) তা শুনে এরশাদ করলেন, "তুমি আল্লাহ্‌র ব্যাপক অনুগ্রহকে সংকুচিত করে দিয়েছ।"[২]

এক বেদুঈন মসজিদে এসে নামায আদায় করল। ফেরার পথে উটে আরোহণ করে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগল, 'আয় আল্লাহ্! আমার প্রতি এবং মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি রহ্‌মত বর্ষণ কর এবং এ রহ্‌মতের মধ্যে আর কাউকেও শরীক করো না।"

বেদুঈনের এরূপ দোয়া শুনে হুযুর (সাঃ) সাহাবীদের সম্বোধন করে বললেন, "বলতো, এ লোকটি বেশি পথ হারা, না তার উটটি।' অর্থাৎ, এ ধরনের দোয়া তিনি অপছন্দ করলেন।

অন্তরের কোমলতা ঃ হুযুর (সাঃ) ছিলেন অত্যন্ত দয়ার্দ্র এবং কোমল অন্তর বিশিষ্ট। মালেক ইবনে হোয়াইরিস নামক এক ব্যক্তি কোন একটি প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে এসে একাধারে বিশ দিন খেদমতে অবস্থান করার সুযোগ লাভ করেছিলেন তিনি মন্তব্য করেছেন ঃ

"রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ছিলেন কোমল অন্তর বিশিষ্ট, অত্যন্ত দয়ালু।"[৩]

কন্যা হযরত যয়নাবের একটি শিশুপুত্রের মৃত্যুর সময় তিনি পিতাকে বিশেষভাবে খবর দিয়ে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সঙ্গে ছিলেন হযরত সা'আদ ইবনে উবাদা, মাআয ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'আব এবং যায়েদ ইবনে সাবেত প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবিগণ। শিশুটির তখন শেষ সময়। লোকেরা তাকে তুলে এনে হুযুর (সাঃ)-এর সামনে রাখল। মৃত্যুপথযাত্রীর চেহারায় দৃষ্টি নিপতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দু' চোখে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। সাহাবীরা নিবেদন করলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)! এ কি?" জবাব দিলেন, "যে সব লোক অন্যের প্রতি স্নেহ-বিগলিত হয়, আল্লাহ্ পাক তাঁদের প্রতিই রহম করেন।"[৪]

---

১. তিরমিযী।
২. বোখারী ঃ কিতাবুল আদাব।
৩. বোখারী।
৪. বোখারী ঃ রোগী দেখা।

ওহুদ যুদ্ধ থেকে ফিরে মদীনায় এসে দেখতে পেলেন, ঘরে ঘরে মাতমের রোল উঠেছে। শহীদানের আত্মীয়-পরিজন তাঁদের আপনজনদের কথা স্মরণ করে বিলাপ করছেন। এ মর্মবিদারী দৃশ্য দেখে হুযুর (সাঃ)-এর কোমল অন্তর বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। কান্নাভেজা কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "আজ হযরত হামযার জন্য ক্রন্দন করার কেউ এখানে নেই।"[১]

একবার জনৈক সাহাবী তাঁর জাহেলিয়াত যুগের কাহিনী বর্ণনা প্রসংগে বলছিলেন "আরবের কোন কোন এলাকার দস্তুর মোতাবেক আমি আমার একটি কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দিচ্ছিলাম। গর্তে ফেলে আমি তাঁর উপর মাটি ও পাথর চাপা দিচ্ছিলাম আর হতভাগী আব্বা আব্বা বলে আর্তনাদ করছিল। এমনি ভাবেই আমি আমার সে সন্তানটিকে জীবন্ত পুঁতে ফেললাম।" হুযুর (সাঃ)-এ হৃদয়বিদারক কাহিনী শুনে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। সাহাবীকে ডেকে বললেন, তোমার কাহিনীটি আবার বল। তিনি আবারও বর্ণনা করলেন। শুনে কাঁদতে কাঁদতে হুযুর (সাঃ)-এর চেহারা মোবারক ভিজে গিয়েছিল।[২]

হযরত আব্বাস (রাঃ) বদর যুদ্ধে গেরেফতার হয়ে মদীনায় আনীত হয়েছিলেন। তখন হাত-পা শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছিল। যন্ত্রণায় তিনি আর্তনাদ করছিলেন। শুনে ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠলেও অন্যান্য বন্দীদের তুলনায় আত্মীয়ের প্রতি বেশি অনুগ্রহ বর্ষিত হবে এই অভিযোগের আশঙ্কায় কিছু করছিলেন না। কিন্তু রাতভর আর চোখে ঘুম এল না। বিছানায় পড়ে শুধু এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন। সাহাবীরা হুযুর (সাঃ)-এর এহেন অস্থিরতা লক্ষ্য করে হযরত আব্বাসের হাত-পায়ের বাঁধন ঢিলা করে দিলেন। এর পর আর্তনাদের শব্দ থেমে গেলে হুযুর (সাঃ) আরাম করলেন।

সাহাবী হযরত মুসআব ইবনে ওমাইর ছিলেন খুব ধনী পিতা-মাতার নিতান্ত আদরের সন্তান। বাল্যকাল থেকে পিতা-মাতা তাঁকে অত্যন্ত যত্নে লালন-পালন করতেন। বহু মূল্যবান পোশাক পরাতেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে স্নেহ-মমতা কঠোরতায় রূপান্তরিত হল। একদিন তিনি পিতা-মাতা কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়ে উলঙ্গপ্রায় অবস্থায় এসে দরবারে হাজির হলেন। বিলাস-ব্যসনের প্রাচুর্যে লালিত মুসআবের এ দূরাবস্থা দেখে হুযুর (সাঃ)-এর অন্তর কেঁপে উঠল। দুচোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

বিপদে সমবেদনা ঃ রোগ-শোকে সান্ত্বনা প্রদান এবং বিপদে সমবেদনা প্রকাশ করার ব্যাপারে মুসলমান-অমুসলমান শত্রু-মিত্রের কোন পার্থক্য করতেন না। আবু দাউদে বর্ণিত আছে যে হুযুর (সাঃ) রোগ-শোকে সমবেদনা প্রকাশ

১. সীরাতুন্নবী, প্রথম খণ্ড, ওহুদ অধ্যায়।
২. দারেমী, ১ম খণ্ড।

করার ব্যাপারে অত্যন্ত বেশি খেয়াল রাখতেন। বোখারী ও আবু দাউদে উল্লিখিত আছে যে হুযুর (সাঃ) একবার জনৈক ইহুদী ক্রীতদাসকে রোগশয্যায় দেখতে গিয়েছিলেন।[১]

সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাবেতকে মৃত্যুশয্যায় দেখতে গেলেন। ততক্ষণে হযরত আবদুল্লাহর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তাঁকে নাম ধরে ডাক দিলেন, কিন্তু কোন জবাব এল না। আক্ষেপ করে বললেন, "আবু রাফে'র উপর এ মুহূর্তে আমার আর কোন জোর চলবে না।" এ কথা শুনে স্ত্রীলোকেরা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে শুরু করলেন। লোকেরা কাঁদতে বারণ করলে, এরশাদ করলেন, "কাঁদতে দাও, তবে মৃত্যুর পর যেন আর কেউ না কাঁদে।" আবদুল্লাহ ইবনে সাবেতের কন্যা কান্নাভেজা কণ্ঠে নিবেদন করলেন, "আমাদের আশা ছিল, তিনি শহীদের মৃত্যুবরণ করবেন। কেননা, জেহাদে যাওয়ার সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম তিনি তৈরি করেই রেখেছিলেন।" হুযুর (সাঃ) জবাব দিলেন, "হার নিয়তের সওয়াব সে অবশ্যই পেয়ে গেছে।"[২]

হযরত জাবের অসুস্থ হয়ে পড়লে হুযুর (সাঃ) নিয়মিতভাবে পায়ে হেঁটে তাঁর বাড়িতে যেতেন, যদিও তাঁর বাড়ি মসজিদে নববী থেকে অনেক দূরে ছিল।[৩]

একবার হযরত জাবের গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে হুযুর (সাঃ) হযরত আবু বকরসহ পায়ে হেঁটে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। তখন জাবের (রাঃ) বেঁহুশ হয়ে পড়েছিলেন, হুযুর (সাঃ) পানি আনিয়ে অজু করলেন এবং অবশিষ্ট পানি তাঁর চোখেমুখে ছিটিয়ে দিলেন। পানির ছিটার সঙ্গে সঙ্গে জাবেরের হুশ ফিরে এল। তিনি আরয করলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)! পরিত্যক্ত সম্পত্তি কাকে দিয়ে যাব?" এ পরিপ্রেক্ষিতেই কোরআনের আয়াত নাযিল হল। বলা হল ঃ

"আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে তোমাদের আওলাদ সম্পর্কে নির্দেশ দান করছেন।"

জনৈক সাহাবী অসুস্থ হয়ে পড়লে হুযুর (সাঃ) কয়েকবারই তাঁকে দেখতে যান। শেষ পর্যন্ত তাঁর ইন্তেকাল হলে অন্ধকার রাত দেখে লোকেরা আর হুযুর (সাঃ)-কে খবর না দিয়েই তাঁকে দাফন করে ফেলেন। পরদিন খবর পেয়ে সাহাবীরাসহ তার কবরের পাশে গিয়ে জানাযা আদায় করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তাঁর হাত-পা পর্যন্ত কাফেররা কেটে ফেলেছিল। লাশ এনে রাখা হলে একটি চাদর দিয়ে তা ঢেকে দেয়া হল। পুত্র হযরত জাবের এসে চাদর উন্মুক্ত করতে

১. মুশরেকের ইবাদাত অধ্যায়।
২. আবু দাউদ ঃ জানায়েয অধ্যায়।
৩. আবু দাউদ।

চাইলেন, কিন্তু লোকেরা তাঁকে বারণ করলেন। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করার পরও এ দৃশ্য পুত্রের জন্য অসহনীয় হতে পারে মনে করে, তাঁকে নিবৃত্ত করলেন। কিন্তু তৃতীয়বার জাবের এগিয়ে এলে হুযুর (সাঃ) অনুমতি দিলেন। চাদর উঠানোর সঙ্গে সঙ্গে হযরত আবদুল্লাহর ভগ্নী উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠলেন। হুযুর (সাঃ) আবদুল্লাহর শোকসন্তপ্ত ভগ্নীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কেঁদো না এখন রহমতের ফেরেশতারা তাকে ঘিরে রেখেছে।"[১]

হযরত সাআ'দ ইবনে উবাদা অসুস্থ হয়ে পড়লে হুযুর (সাঃ) তাঁকে দেখতে গেলেন। অবস্থা শোচনীয় দেখে তাঁর দু'চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। হুযুর (সাঃ)-কে কাঁদতে দেখে উপস্থিত সবাই কেঁদে ফেললেন।[২]

জনৈক হাবশী মসজিদে ঝাড়ু দিতেন। হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হলে সাহাবীরা হুযুর (সাঃ)-কে কিছু না জানিয়েই তাঁকে দাফন করে ফেললেন। কয়েকদিন তাঁকে না দেখে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। অভিযোগ করলেন, "আমাকে তোমরা খবর দিলে না কেন?" সাহাবীরা জবাব দিলেন, "এর জানাযার জন্য আবার আপনাকে কষ্ট দেয়া সমীচীন মনে করিনি।" কিন্তু হুযুর (সাঃ) লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করে সে লোকটির কবরের পাশে গিয়ে তাঁর জানাযা পড়ে এলেন।[৩]

জানাযা যেতে দেখলে হুযুর (সাঃ) দাঁড়িয়ে পড়তেন। বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, এরশাদ করতেন, "জানাযা যেতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে যেয়ো। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে অন্তত যতক্ষণ তা চলে না যায়, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকো।"[৪]

হুযুর (সাঃ)-এর অন্তর ছিল যেমন কোমল, তেমনি স্পর্শকাতর। বিশেষত কোন আপনজনের মৃত্যুসংবাদ তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত করে তুলত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিলাপ করার অনুমতি দিতেন না। হযরত আলীর ভাই হযরত জাফর ছিলেন হুযুর (সাঃ)-এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। তাঁর শহীদ হওয়ার সংবাদ এলে সবাইকে নিয়ে শোকের মজলিসে বসলেন। এমন সময় হযরত জাফরের বাড়ি থেকে স্ত্রীলোকদের বিলাপ ধ্বনি ভেসে আসতে লাগল। হুযুর (সাঃ)-এর কানে গেলে একজন লোক পাঠিয়ে বিলাপ বন্ধ করতে বললেন। কিন্তু পর পর তিন বার খবর পাঠানোর পরও যখন বিলাপ বন্ধ হল না, তখন এরশাদ করলেন, "যাও, এদের মুখে মাটি ছিটিয়ে দাও।"[৫]

---

১. বোখারী।
২. বোখারী জানায়েয।
৩. ঐ।
৪. ঐ।
৫. বোখারী জানায়েয।

খোশমেজাযী ঃ কোন কোন সময় সঙ্গীদের সঙ্গে খোশমেজাযীর কথা-বার্তাও বলতেন। হযরত আনাস অত্যন্ত অনুগত সেবক ছিলেন। সর্বক্ষণ নির্দেশের অপেক্ষায় কান পেতে থাকতেন। একদিন হুযুর (সাঃ) খোশমেজাযীতে "হে দোকানদার" বলে ডেকেছিলেন।

আনাসের ছোট ভাই আবু উমাইর তখন খুব অল্পবয়স্ক ছিল। সে একটি পাখির ছানা পুষত। ছানাটি হঠাৎ মরে গেলে সে অত্যন্ত দুঃখ পেল। হুযুর (সাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে হেসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"আবু উমাইর! তোমার শাবক এ কি কাজ করল।"

একদিন এক বৃদ্ধা এসে নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ), আমাকে সোয়ারীর জন্য একটি উট দান করুন। জবাব দিলেন, "যাও তোমাকে একটি উটের বাচ্চা দেব।" বৃদ্ধা আরয করলেন, উটের বাচ্চা দিয়ে আমি কি করব? হেসে বললেন, "দুনিয়াতে এমন কোন উট আছে কি যা অন্য কোন উটের বাচ্চা নয়?"

এক বৃদ্ধা এসে আরয করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)! দোয়া করুন, আমি যেন বেহেশতে যেতে পারি। হুযুর (সাঃ) বললেন, "কোন বৃদ্ধা তো বেহেশতে প্রবেশ করবে না।" এ কথা শুনে বৃদ্ধার অন্তর ভেঙে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে ফিরে চললেন। তখন হুযুর (সাঃ) সাহাবায়ে-কেরামকে বলে দিলেন, "ওকে ডেকে বলে দাও, সত্য সত্যই বৃদ্ধা অবস্থায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যখন যাবে যুবতী হয়েই যাবে।"[১]

জাহের নামক এক বেদুঈন সাহাবী ছিলেন। তিনি ধাতুর জিনিসপত্র তৈরি করে বিক্রি করতেন। মাঝে মাঝে তিনি সে সমস্ত জিনিসপত্র হুযুর (সাঃ)-কে উপঢৌকন হিসাবে পাঠাতেন।

একদিন বাজারের পথে যেতে যেত দেখলেন, জাহের জিনিসপত্র বিক্রি করছে। রসিকতা করে তাঁকে পেছনদিক থেকে জড়িয়ে ধরেন। জাহের বলতে লাগলেন, " কে এমন রসিকতা শুরু করল; ছেড়ে দাও।" কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে যখন দেখলেন খোদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তখন পিঠ আরও চেপে ধরলেন। হুযুর (সাঃ) তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, "কেউ কি এ গোলামটি খরিদ করবে?" জাহের বললেন, "আমার মত গোলাম খরিদ করে কে আবার পয়সা নষ্ট করতে যাবে?" জবাব দিলেন, "তা নয়, আল্লাহ্‌র নিকট তোমার মূল্য অনেক।"[২]

১. শামায়েলে তিরমিযী।
২. শামায়েলে তিরমিযী।

জনৈক সাহাবী এসে জানালেন, তার ভাইয়ের পেটে পীড়া দেখা দিয়েছে। বললেন, মধু খাইয়ে দাও। মধু খাওয়ানোর পর দাস্ত শুরু হল। সাহাবী ছুটে এসে জানালে পুনরায় মধু খাওয়াতে বললেন। কিন্তু মধু খাওয়ানোর পর যখন দাস্ত আরও বাড়ল, তখন সাহাবী ছুটে এসে জানালেন, তিন বার এরূপ হওয়ার পর এরশাদ করলেন, "আল্লাহর কিতাব মিথ্যা হতে পারে না, তোমার ভাইয়ের পেটই মিথ্যা, যাও আবারও তাকে মধু খাইয়ে দাও।" এবার মধু খাওয়ানোর পর পেটের সমস্ত বদ্ধ মল বেরিয়ে গিয়ে রোগী সুস্থ হয়ে উঠল।[১]

সন্তানের প্রতি স্নেহ ঃ সন্তানের প্রতি হুযুর (সাঃ)-এর সীমাহীন মমতা ছিল। কোথাও সফরে বের হলে সর্বশেষ ফাতেমার কাছে তশরীফ নিতেন এবং বাইরে থেকে এসেও সর্বপ্রথম হযরত ফাতেমাকে কাছে ডাকতেন। কোন এক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে দেখলেন, হযরত ফাতেমা (রাঃ) তাঁর দু' শিশু সন্তান হযরত হাসান ও হযরত হোসাইনের হাতে রুপোর বালা পরিয়েছেন এবং ঘরের দরজায় রঙ্গিন পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছেন। হুযুর (সাঃ) তা দেখে এবার আর প্রথমে হযরত ফাতেমার ঘরে প্রবেশ করলেন না। চিরাচরিত অভ্যাসের ব্যতিক্রম করে দরজা থেকেই ফিরে গেলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বিষয়টি আঁচ করতে পেরে বাচ্চাদের হাত থেকে কঙ্কন খুলে ফেললেন এবং কাঁদতে কাঁদতে খেদমতে গিয়ে হাজির হলেন। হুযুর (সাঃ) কঙ্কন বাজারে পাঠিয়ে দিয়ে বলে দিলেন, "এগুলো বিক্রি করে হাতির দাঁতের কঙ্কন আনিয়ে দাও।"

হযরত ফাতেমা (রাঃ) কখনও এসে হাজির হলে হুযুর (সাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে যেতেন। তাঁর কপালে চুমু খেতেন। আসন থেকে সরে নিজের জায়গায় বসাতেন।

সাহাবী হযরত আবু কাতাদা বর্ণনা করেন, একদিন আমরা মসজিদে বসেছিলাম, দেখলাম, উমামা নাম্নী এক নাতনীকে কাঁধে বসিয়ে হুযুর (সাঃ) মসজিদে তশরিফ আনলেন। উমামাকে কাঁধে নিয়েই তিনি নামায পড়লেন, রুকু-সেজদার সময় তাকে একহাতে নামিয়ে রাখতেন এবং দাঁড়াবার সময় পুনরায় তাকে কাঁধে বসিয়ে নিতেন। এ অবস্থায়ই নামায সমাপ্ত করলেন।[২]

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হুযুর (সাঃ)-এর চাইতে অধিক আর কাউকেও সন্তানের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করতে দেখিনি। পুত্র ইবরাহীম শহর থেকে তিন-চার মাইল দূরে শহরের উপকণ্ঠে লালিত-পালিত হচ্ছিলেন। হুযুর (সাঃ) পায়ে হেঁটে প্রায়ই সেখানে যেতেন। দাই-এর ঘরে গিয়ে শিশুকে কোলে তুলে নিতেন, তাঁর মুখে চুমু খেতেন এবং পায়ে হেঁটে ফিরে আসতেন।[৩]

---

১. বোখারী শরীফ ঃ ঔষধ প্রসঙ্গ।
২. নাসায়ী ঃ শিশুদেরকে মসজিদে প্রবেশ করানোর বিবরণ।
৩. মুসলিম, ২য় খণ্ড।

একবার আকরা ইবনে হাবেস নামক এক গোত্রপতি দরবারে হাজির হলেন। হুযুর (সাঃ) তখন হযরত ইমাম হোসাইনের মুখে চুমু খাচ্ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে আকরা বললেন, "আমার দশটি সন্তান রয়েছে, কিন্তু আমি কখনো তাদের কারো মুখে চুমু খাইনি।" জবাব দিলেন, "যে ব্যক্তি অন্যদের প্রতি রহম করে না, আল্লাহ্ পাক তার উপর রহম করেন না।"

হযরত হাসান-হোসাইনকে সীমাহীন স্নেহ করতেন। বলতেন, "এ দুটি আমার বাগানের দু'টি ফুল।" হযরত ফাতেমার ঘরে গিয়ে বলতেন, "আমার দাদুরা কোথায়?" তারা সামনে এলেই জড়িয়ে ধরতেন, চুমু খেতেন।

একবার মসজিদে খুত্বা দেয়ার সময় হযরত হাসান-হোসাইন লাল জামা পরে কম্পিত পায়ে মসজিদে এসে উঠলেন। হুযুর (সাঃ) থাকতে পারলেন না। খুত্বা স্থগিত রেখে মিম্বর থেকে নেমে এসে কোলে তুলে সামনে এনে বসালেন। তার পর পুনরায় খুত্বা শুরু করতে গিয়ে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঠিকই বলেছেন ঃ

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

"তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি একটি পরীক্ষার বস্তু।"

এরশাদ করতেন, "হোসাইন আমার এবং আমি হোসাইনের। যে ব্যক্তি হোসাইনের সঙ্গে মহব্বত রাখবে, আল্লাহ্ যেন তাকে মহব্বত করেন।"

একবার হুযুর (সাঃ) হযরত হাসান অথবা হোসাইনকে কাঁধে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে কেউ রসিকতা করে বললেন, "আহা! কি বাহন-ই না পেয়েছে। হুযুর (সাঃ) জবাব দিলেন, আরোহীটি কে তাও তো দেখবে!"[১]

একদিন শিশু হাসান অথবা হোসাইন হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র পায়ের উপর পা রেখে দাঁড়ালেন, বললেন, "উপরে উঠে এসো।" হযরত হাসান পবিত্র সিনায় পা রেখে উপরের দিকে উঠলেন। হুযুর (সাঃ) তাঁকে জড়িয়ে ধরে মুখমণ্ডল চুম্বন করলেন এবং বললেন, "আয় আল্লাহ্, আমি একে মহব্বত করি, তুমিও একে মহব্বত করো।"[২]

একদিন হুযুর (সাঃ) কোথাও দাওয়াতে রওয়ানা হয়ে পথে হযরত হোসাইনকে খেলা করতে দেখলেন। হাত বাড়িয়ে তাঁকে কাছে ডাকলেন। কিন্তু শিশু হযরত হোসাইন লুকোচুরি খেলার মত কাছে এসে আবার ছুটে পালাতে লাগলেন। হঠাৎ হুযুর (সাঃ) হাত বাড়িয়ে তাঁকে কাঁধে এবং চিবুকে ধরে ফেললেন। দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মুখে বলতে লাগলেন, "হোসাইন আমার এবং আমি হোসাইনের।"

---

১. এ সমস্ত বর্ণনা শামায়েলে তিরমিযী থেকে গৃহীত।
২. আদাবুল মুফরাদ।

অনেক সময় হযরত হোসাইনের কচি মুখ পবিত্র মুখের সঙ্গে লাগিয়ে আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলতেন, "আয় আল্লাহ্! আমি একে ভালবাসি এবং যারা তাকে ভালবাসে তাদেরকেও ভালবাসি।"

কন্যা হযরত যয়নবের জামাতা বদর যুদ্ধে গ্রেফতার হয়ে আসলেন। মুক্তিপণ দেয়ার মত কোন সম্বল তার ছিল না। অনন্যোপায় হয়ে স্ত্রী হযরত যয়নবের কাছে খবর পাঠালেন। হযরত যয়নব তাঁর গলার হার খুলে পাঠিয়ে দিলেন। এ হারটি হযরত খাদীজা (রাঃ) কন্যাকে বিয়ের সময় দিয়েছিলেন। প্রিয়তমা পত্নী হযরত খাদীজার স্মৃতিবিজড়িত হারের উপর দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। আর্দ্রকণ্ঠে সাহাবীদেরকে বললেন, "যদি তোমরা হারটি যয়নবকে ফিরিয়ে দাও, তবে ভাল হয়।" সাহাবিরা অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে হারটি ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

ইবনে কাইয়্যেম লিখেছেন—হযরত যয়নবের শিশু কন্যা হযরত উমামাকে হুযুর (সাঃ) অত্যধিক স্নেহ করতেন। অনেক সময় সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। নামাযের সময়ও মসজিদে নিয়ে আসতেন। কোন কোন সময় রুকু-সেজদার সময় তিনি হুযুর (সাঃ)-এর কাঁধে চড়ে বসতেন, কিন্তু তাকে মানা করতেন না।

এক নাতনীর মৃত্যুর সময় গিয়ে উপস্থিত হলেন। শিশুকে এনে কোলে তুলে দেয়া হল। এ অবস্থাতেই তার রূহ বের হয়ে গেল। হুযুর (সাঃ)-এর দু'চোখ অশ্রুতে ভরে উঠল। সাহাবী হযরত সা'আদ (রাঃ) আরয করলেন, "এ কি করছেন!" জবাব দিলেন, "এটা অপত্য স্নেহ, আল্লাহ্ পাক বান্দার অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন।"[১]

পুত্র হযরত ইবরাহীমের মৃত্যুর সময় হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র চোখ অশ্রুপ্লাবিত হয়ে উঠেছিল। কান্নাভেজা কণ্ঠেই বলেছিলেন, "চোখ অশ্রু বর্ষণ করছে, অন্তর শোকে অভিভূত, কিন্তু মুখে আমি সে কথাই উচ্চারণ করব, আল্লাহ্ পাক যা পছন্দ করেন।"[২]

নিজ পরিবারের শিশুদের মাঝেই হুযুর (সাঃ)-এর এ স্নেহ-মমতা সীমাবদ্ধ ছিল না, সাধারণভাবে সব শিশুর প্রতিই তাঁর অন্তরে স্নেহের ফল্গুধারা সদা প্রবাহিত থাকত।

১. বোখারী ঃ কিতাবুল মারযা।
২. বোখারী ঃ কিতাবুল জানায়েয।

আযওয়াজে মোতাহ্‌হারাত
(পবিত্রা স্ত্রীগণ)

হযরত খাদিজাতুল কোব্‌রা ঃ হযরত খাদীজার বংশপরিচয় হল, কোসাই ইবনে আবদুল উজ্জা, ইবনে আসআ, ইবনে খোয়াইলিদ, হযরত খাদীজা খোয়াইলিদেরই কন্যা। কোসাই পর্যন্ত পৌঁছে এ বংশ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বংশের সঙ্গে মিলে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রেসালাত প্রাপ্তির পূর্বযুগে হযরত খাদীজা (রাঃ) "তাহেরা" নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল ফাতেমা বিনতে জায়েদা। ফাতেমার পিতা নিজ গোত্রের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। মক্কায় এসে বসবাস করছিলেন এবং বনু আদদুদদার গোত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন।[১] আমের ইবনে খুয়াই বংশের কন্যা ফাতেমা বিনতে জায়েদার সঙ্গে মক্কার সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবক খোয়াইলিদের বিয়ে হয়। তাঁর ঔরসে হযরত খাদীজা (রাঃ) জন্মলাভ করেন। তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল তামীম গোত্রের জরারাহর পুত্র আবু হালার সঙ্গে। সে পক্ষে দু'পুত্রের জন্ম হয়। একজনের নাম ছিল হিন্দ এবং অপর জনের নাম হারেস। আবু হালার মৃত্যুর পর মাখজুমী গোত্রীয় আয়েজের পুত্র আতিকের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। সেদিকে এক কন্যা জন্মলাভ করেন। তাঁর নামও ছিল হিন্দ।[২] এ কারণেই হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে হিন্দের মা বলে ডাকা হত। পুত্র হিন্দ প্রথম অবস্থাতেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কিত বিবরণসমূহ প্রধানত তাঁর বর্ণনা থেকেই গৃহীত হয়েছে। তিনি অত্যন্ত সুসাহিত্যিক ও ভাষাবিদ্ ছিলেন। জামাল যুদ্ধে হযরত আলীর পক্ষে যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেছিলেন।[৩]

আতিকের মৃত্যুর পর হযরত খাদীজা (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন। এ পক্ষে তাঁর ছয় সন্তান জন্মলাভ করেন। দু'পুত্র শিশু অবস্থাতেই মারা যান। অবশিষ্ট চারজন ছিলেন কন্যা। এরা হচ্ছেন ঃ

হযরত ফাতেমা, হযরত যয়নব, হযরত রোকাইয়া ও হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ)।

হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর হালা নাম্নী এক ভগ্নী ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং হযরত খাদীজার মৃত্যুর পরেও জীবিত ছিলেন।

হযরত খাদীজার সঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সীমাহীন ভালবাসা ছিল। যখন তিনি বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হন, তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বয়স ছিল পঁচিশ বছর। বিয়ের পর তিনি পঁচিশ বছর জীবিত ছিলেন।

১. তাবাকাতে ইবনে সা'আদ যিকরে খাদীজা, কিতাবুন নিসা।
২. তাবাকাতে ইবনে সা'আদ।
৩. এসাবা যিকরে হিন্দ।

তাঁর জীবদ্দশায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আর দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। হ্যরত খাদীজার মৃত্যুর পর বাড়িতে যখন কোন পশু জবেহ্ করা হত, তখন হুযুর (সাঃ) খুঁজে খুঁজে তাঁর বন্ধু শ্রেণীর মহিলাদের ঘরে গোশত পাঠিয়ে দিতেন। হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন যে যদিও আমি খাদীজা (রাঃ)-কে দেখিনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার তাঁর প্রতি যতটুকু হিংসা হত, আর কারও প্রতি তা হত না। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সর্বক্ষণ তাঁর কথা আলোচনা করতেন। একবার আমি হ্যরত খাদীজার প্রসঙ্গে হুযুর (সাঃ)-এর মনে কষ্ট দিয়েছিলাম। হুযুর (সাঃ) বলেছিলেন, "আল্লাহ্ পাকই আমার অন্তরে তার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।"[১]

হ্যরত খাদীজার মৃত্যুর পর একবার তাঁর বোন হালা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। নিয়মানুযায়ী তিনি ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে হ্যরত খাদীজার কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য মিল ছিল। তাঁর কানে সে স্বর পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরে হ্যরত খাদীজার স্মৃতি জেগে উঠল। ব্যগ্রতার সঙ্গে উঠে বললেন, হয়ত 'হালা' হবে। হ্যরত আয়েশাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর অত্যন্ত হিংসা হল। তিনি বললেন, আপনার কি হয়েছে যে এক বৃদ্ধা তাও মারা গেছে; তার কথা সব সময় মনে পড়ে। খোদা তা'আলা আপনাকে তাঁর চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করেছেন। সহীহ্ বোখারীতে এ পর্যন্তই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু 'ইস্তিয়াব'-এ আছে যে উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, "কখনও নয়, হে আয়েশা! যখন মানুষ আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, তখন তিনি আমাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। যখন মানুষ কাফের ছিল, তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যখন আমার কোন সাহায্যকারী ছিল না, তখন তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন।"

হ্যরত সাওদা বিনতে জোমআ ঃ হ্যরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্র বিবিগণের মধ্যে একমাত্র হ্যরত সওদা-ই এ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী যে তিনিই হ্যরত খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি নবুয়তের শুরুতেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এ হিসাবে প্রাথমিক যুগের মুসলিম হওয়ার সৌভাগও তাঁর লাভ হয়েছিল। তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল সাফওয়ান ইবনে ওমাইয়ের সঙ্গে। হ্যরত সাওদা তাঁরই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গেই আবিসিনিয়ায় (দ্বিতীয়) হিজরত করেছিলেন। আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার কিছুদিন পর সাফওয়ান মৃত্যুবরণ করেন এবং স্মৃতিস্বরূপ এক পুত্র সন্তান রেখে যান। তাঁর নাম ছিল আবদুর রহমান। তিনি জালোলার যুদ্ধে শাহাদত লাভ করেন।

হ্যরত খাদীজার মৃত্যুতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অত্যন্ত পেরেশান ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। এ অবস্থা দেখে খাওলা বিনতে হাকিম আরয করলেন যে আপনার

১. সহীহ্ মুসলিম ঃ ফাযায়েলে খাদীজা (রাঃ)।

একজন সান্ত্বনা দানকারিণী ও সঙ্গীর প্রয়োজন। তিনি (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্ততির দেখা শোনার ব্যবস্থাপনা সকলই খাদীজা করত। সম্মতিসূচক এ ইংগিত অনুযায়ী তিনি হযরত সাওদার পিতার কাছে গেলেন এবং বর্বর যুগের প্রথা অনুযায়ী সালাম করলেন (أَنْعِمْ صَبَاحًا -সুপ্রভাত) এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের পয়গাম পেশ করলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, মোহাম্মদ (সাঃ) শরীফ বংশীয় বটে, কিন্তু সওদার কাছেও তো জানা দরকার। মোটকথা, সব স্তর পাড়ি দেয়া হল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে সেখানে গেলেন এবং সওদার পিতা বিয়ে পড়ালেন।[১] চার শ' দেরহাম মোহরানা ধার্য হল। বিয়ের পর হযরত সাওদার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জোময়া (যিনি তখনও কাফের ছিলেন) এসে যখন সব অবস্থা জানতে পারলেন, তখন তার মাথায় যেন পাহাড় ভেঙে পড়ল যে হায় এ কি হল! কিন্তু ইসলামধর্ম গ্রহণের পর সর্বদা সে নির্বুদ্ধিতার দরুন তাঁর আফসোস হত।

হযরত আয়েশা এবং সওদার বিয়ের প্রস্তাব ও বিয়ে যেহেতু একই সময় অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাই ঐতিহাসিকদের মধ্যে কার বিয়ে প্রথমে হয়েছিল এ বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় হযরত সওদার বিয়ে আগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে উল্লিখিত হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আকীলের মতে হযরত আয়েশার বিয়ের পর সাওদার বিয়ে হয়েছিল বলা হয়।

গঠনপ্রকৃতি ঃ হযরত সাওদা ছিলেন দীর্ঘদেহী, বলিষ্ঠ গঠন ও স্থূল উদর বিশিষ্ট। এজন্য তিনি দ্রুত চলতে পারতেন না। বিদায় হজের সময় মোজদালেফা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় হলে তিনি সে কারণেই সবার আগে রওয়ানা হওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন। কেননা, ভিড়ের মধ্যে তাঁর চলতে কষ্ট হত।

পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে পুরানো নিয়ম অনুযায়ী পবিত্র স্ত্রীগণও প্রাকৃতিক কাজকর্ম সারার উদ্দেশ্যে ময়দানে চলে যেতেন।

হযরত ওমর (রাঃ) তা পছন্দ করতেন না। তাই তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি পর্দার দাবি করতেন। তখনও পর্দার প্রবর্তন হয়নি। এমতাবস্থায়, একদিন হযরত সাওদা রাত্রিবেলা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য বের হলেন, যেহেতু তাঁর গঠন লম্বা ছিল, হযরত ওমর (রাঃ) দেখতে পেয়ে বললেন, সাওদা, আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি। এ ঘটনার পরেই পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়।[২]

১. তাবাকাতের মধ্যে আছে যে, নবুয়তের দশম বর্ষে রমযান মাসে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। যারকানী ৮ম নববী লিখেছেন। এই মতবিরোধ হযরত খাদিজার মৃত্যুর তারিখের মতবিরোধ থেকেও উদ্ভূত।

২. বোখারী ১ম খণ্ড ১২৬ পৃঃ পর্দার আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললেন যে, আপনার নিকট ভাল-মন্দ সবরকমের লোকের যাতায়াত হয়, সুতরাং ভাল হতো, যদি উম্মত জননীগণকে পর্দার নির্দেশ দিতেন। ইবনে জারির তার তফসীর -এ মুজাহেদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবিদের সঙ্গে বসে আহার করছিলেন, হযরত আয়েশাও খাওয়াতে শামিল ছিলেন। এক ব্যক্তির হাত হযরত আয়েশার হাত স্পর্শ করে। এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খুব খারাপ মনে হল। তখন পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন)

উদারতা ও দানশীলতা ছিল হুযুর (সাঃ)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হুযুর (সাঃ)-এর সঙ্গে আন্তরিক নৈকট্যের ভিত্তিতে স্ত্রীগণই স্বভাব ও চরিত্রের এবং সংসর্গের বরকত থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ সবার চেয়ে বেশি লাভ করেছিলেন। সুতরাং এসব গুণাবলী তাঁদের মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হত। হযরত সাওদা (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) ব্যতীত অন্য সবার উপর এ গুণে শ্রেষ্ঠস্থানীয়া ছিলেন। একবার তাঁর কাছে হযরত ওমর (রাঃ) একটি থলে পাঠালেন। তিনি বাহককে জিজ্ঞেস করলেন, এতে কি আছে? সে উত্তর দিল, দেরহাম। তিনি বললেন, খেজুরের থলিতে কি দেরহাম পাঠানো হয়? এ বলে তখনই সমস্ত অর্থ বণ্টন করে দিলেন।

আনুগত্য ও নির্দেশ পালন তাঁর বিশেষ গুণ ছিল এবং এ গুণে তিনি সমস্ত স্ত্রীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানীয়া ছিলেন।

হাদীস বর্ণনা ঃ তাঁর মাধ্যমে পাঁচটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে বোখারী শরীফে মাত্র একটি হাদীসের উল্লেখ আছে। সাহাবিদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আস'আদ ইবনে জারারা তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মৃত্যু ঃ হযরত সাওদা (রাঃ)-এর মৃত্যুর সন-তারিখ সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। ওয়াকেদীর মতে তিনি আমীর মোয়াবিয়ার খেলাফতের যুগে হিজরী ৫৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। হাফেয ইবনে হাজার তাঁর ওফাতের সাল হিজরী ৫৫ উল্লেখ করেছেন। ইমাম বোখারী বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন যে তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতের সময় মৃত্যুবরণ করেছেন। 'যাহাবী' তারিখে কবীর-এ উক্ত হাদীসের সঙ্গে এটুকু জুড়ে দিয়েছেন যে হযরত ওমরের খেলাফতের শেষ সময়ে ইন্তেকাল করেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) হিজরী তেইশ সনে শাহাদতবরণ করেন। এজন্য তাঁর খেলাফতের আয়ুষ্কাল দ্বাবিংশতম হিজরী সাল হবে। খামিস-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে এ বর্ণনাই সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ।[১]

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

সাধারণভাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত যয়নাবের ওলিমার দাওয়াতের সময় পর্দার আয়াত নাযেল হয়। বস্তুত, এ ঘটনা বিস্তারিত ভাবে বিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার এ সকল বর্ণনার এভাবে সমন্বয় সাধন করেছেন যে, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কতিপয় কারণ ছিল। তন্মধ্যে শেষ কারণ হযরত যয়নাবের ঘটনাও একটি এবং এটাই আয়াতের শানে-নুযুল। কেননা, আয়াতের মধ্যেই এ ঘটনার প্রতি ইংগিত পাওয়া যায়। ফতহুল বারী, ১ম খণ্ড, ২১৯ পৃঃ।

১. জারকানী ৩য় খণ্ড ২৬২ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বর্ণিত আছে। তবকাতে ইবনে সাআ'দে প্রথম ঘটনা শুধু বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ)

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কোন সন্তান ছিল না, তবুও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ্ ইবনে জোবায়েরের সম্পর্কে তাঁকে উম্মে আবদুল্লাহ্ বলা হত। মাতার নাম ছিল যয়নাব এবং ডাকনাম উম্মে রুম্মান। নবুয়তের চার বছর পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

নবুয়তের দশম বর্ষে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে বিয়ে হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র ছিল ছ'বছর। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে বিয়ের পূর্বে জোবায়ের ইবনে মুতএম-এর পুত্রের সঙ্গে তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ নির্ধারিত ছিল। হযরত খাদীজার (রাঃ) মৃত্যুর পর খাওলা বিন্তে হাকিম রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিয়ের জন্য কথা তুললেন। তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। খাওলা উম্মে রুম্মানকে বিয়ের কথা বললেন, উম্মে রুম্মান হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন যে আমি জোবায়ের ইবনে মুতএমের সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ রয়েছি। এ পর্যন্ত আমি কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করিনি। কিন্তু স্বয়ং মুতএমই হযরত আয়েশা তাঁর ঘরে পদার্পণ করলে ইসলামেরও পদার্পণ হবে ভেবে এ বিয়েতে অসম্মতি জ্ঞাপন করল। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) খাওলার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। চার শ' দেরহাম মোহর নির্ধারিত হল। কিন্তু মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত আছে যে পবিত্র স্ত্রীগণের মোহরানা পাঁচ শ' দেরহাম করে হত।

বিয়ের পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কায় তিন বছর কাল অবস্থান করেছিলেন। নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে হিজরতের সময় হযরত আবু বকরও সঙ্গে ছিলেন, পরিবার-পরিজনকে মক্কায় ছেড়ে এসেছিলেন। যখন মদীনায় মোহাজেরগণের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কিছুটা স্থিতি এল তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনে আরিকতকে মক্কায় উম্মে রুম্মান, ও আয়েশা (রাঃ)-কে আনতে পাঠালেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জায়েদ ইবনে হারেস এবং আবু রাফে'কে হযরত ফাতেমা, উম্মে কুলসুম এবং হযরত সাওদা (রাঃ) প্রমুখকে আনার জন্য রওয়ানা করে দিলেন। মদীনায় এসে হযরত আয়েশা (রাঃ) দারুণ অসুখে আক্রান্ত হলেন। রোগের প্রকোপে তাঁর মাথার চুল উঠে গেল। সুস্থ হলে উম্মে রুম্মান কন্যাকে স্বামীর বাড়িতে পাঠানোর কথা চিন্তা করলেন। তখন হযরত আয়েশার বয়স ছিল নয় বছর। সখীদের সঙ্গে দোলনায় খেলাধুলা করছিলেন। এমন সময় উম্মে রুম্মান হযরত আয়েশাকে ডাকলেন। তিনি এসব ঘটনার কিছুই জানতেন না, ডাক শুনে মায়ের কাছে গেলেন। তিনি তাঁর মুখ ধুইয়ে দিলেন, মাথার চুল আঁচড়ে দিলেন, অতঃপর ঘরে নিয়ে গেলেন। পূর্ব থেকেই আনসার মহিলারা তাঁর অপেক্ষায় বসেছিলেন।

আয়েশা এ অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সবাই মোবারকবাদ জানালেন। চাশতের সময় (মধ্যাহ্নের পূর্ব সময়) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আগমন

করলেন, অতঃপর কন্যা প্রদানের কার্য সুসম্পন্ন হল। শওয়াল মাসে বিয়ে হয়েছিল এবং শওয়াল মাসেই এ অনুষ্ঠান হল। প্রাচীন আরবে কোন এক সময় এ মাসে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল বিধায় আরবরা এ মাসে কন্যার রুখসতী দূষণীয় মনে করত। সম্ভবত সে কুসংস্কারের অবসানের জন্যই এ মাসটি বিয়ের জন্য বেছে নেয়া হয়েছিল।

ওফাত ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে নয় বছর দাম্পত্য-জীবন যাপন করেন। তিনি নয় বছর বয়সে স্বামীর ঘরে এসেছিলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল আঠারো বছর। এর পর হযরত আয়েশা অন্তত আট চল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন। হিজরী ৫৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৬ বছর। অসীয়ত মোতাবেক জান্নাতুল বাকিতে রাতের বেলা দাফন করা হয়। কাসেম ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি আতিক এবং উরওয়া ইবনে যোবায়ের লাশ কবরে নামিয়েছেলেন। তখন সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) মারওয়ান ইবনে মাকামের পক্ষ থেকে মদীনায় শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। তিনিই জানাযার নামায পড়ান।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আয়েশাকে অত্যধিক ভালবাসতেন। এ ভালবাসার দরুনই অন্তিম সময়ে সকল স্ত্রীগণের কাছ থেকে সম্মতি নিয়ে হযরত আয়েশার ঘরে বাস করতেন। সে ভালবাসার অভিব্যক্তি যে সকল পন্থায় হতে পারত সে সম্পর্কে সকল হাদীসের কিতাবে এবং জীবনচরিতসমূহে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এলম এর খেদমত ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) এলমে হাদীস এবং ফেকার যে খেদমদ করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত উসমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে তিনি ফতওয়া দান করতেন। প্রখ্যাত সাহাবীদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কেও তিনি যে সমস্ত সূক্ষ্ম আপত্তি উত্থাপন করেছেন সেগুলো আল্লামা সুয়ুতী গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন।

২২১০টি হাদীস তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১৭৪টি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম ঐকমত্যে পৌছেছেন। ইমাম বোখারী তাঁর কাছ থেকে এককভাবে ৫৪টি হাদীসে বর্ণনা করেছেন। ৫৮টি হাদীস ইমাম মুসলিমও এককভাবে বর্ণনা করেছেন। কারও মতে শরীয়তের এক-চতুর্থাংশ নির্দেশাবলী হযরত আয়েশা থেকেই বর্ণিত। তিরমিযী শরীফে আছে যে সাহাবীদের সামনে যখন কোন কঠিন প্রশ্ন উত্থাপিত হত, তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) তার মীমাংসা করে দিতেন। তাঁর শিষ্যগণের বর্ণনা এই যে শরীয়তের সূক্ষ্যাতিসূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে এমন সাবলীল ব্যাখ্যা আর কারও কাছ থেকে শুনতে পাইনি। তফসীর, হাদীস, শরীয়তের গুঢ় রহস্য, বক্তৃতা এবং সাহিত্য ও বংশ-পরিচয় বিদ্যায় (নছবনামা) তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। অনেক

প্রখ্যাত কবির সুদীর্ঘ কসিদা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। মোহাদ্দেস হাকেম তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ মুস্তাদরাকে এবং ইবনে সা'আদ তবকাতে বিস্তারিতভাবে এসব ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন এবং মুসনাদে ইবনে হাম্বল নামক বিখ্যাত গ্রন্থেও খণ্ডভাবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও পাণ্ডিত্যের নিদর্শন ও প্রমাণাদি পাওয়া যায়।

হযরত হাফসা (রাঃ)

হযরত হাফসা (রাঃ) ছিলেন হযরত ওমর (রাঃ)-এর কন্যা। তাঁর মায়ের নাম ছিল যয়নাব বিনতে মাজউন। নবুয়তের পাঁচ বছর পূর্বে যে বছর কোরাইশরা কাবাঘরের পুনর্নির্মাণ করেছিলেন, হাফসা (রাঃ) সে বছরেই জন্মলাভ করেন। তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল খোনাইস ইবনে হোযাইফার সঙ্গে। এ স্বামীর সঙ্গেই তিনি মদীনায় হিজরত করেছিলেন। খোনাইস বদরের যুদ্ধে আহত হয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং সে জখমেই তাঁকে শাহাদতবরণ করতে হয়।[১] মৃত্যুর সময় তাঁর কোন সন্তান ছিল না।[২] হযরত হাফসা (রাঃ) বিধবা হওয়ার পর তাঁকে বিবাহ দেয়ার চিন্তা হল। তখন হযরত ওসমানের স্ত্রী রোকাইয়াও ইন্তেকাল করেন। তাই হযরত ওমর উপযাচক হয়ে হযরত ওসমানের কাছে হাফসার বিয়ের প্রস্তাব করেন। হযরত ওসমান কোন উৎসাহ প্রকাশ না করায় বিষয়টি হযরত আবু বকরকে বলা হয়, কিন্তু তিনিও নীরব থাকেন। দু'দু'বার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান হওয়ায় হযরত ওমর মনে মনে ক্ষুণ্ন হলেন। এর পরই স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত হাফসার সঙ্গে তাঁর বিয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অতঃপর বিয়ে হয়ে গেলে তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, যখন তুমি আমার কাছে হাফসার বিয়ের কথা উত্থাপন করেছিলে, তখন আমার নীরবতা তোমার খুব খারাপ লেগেছিল। কিন্তু আমি তোমাকে কিছু বলিনি যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। আর আমি তাঁর গোপন কথা প্রকাশ করতে চাইছিলাম না। যদি রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বিয়ে না করতেন, তাহলে আমি তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলাম।[৩]

হযরত হাফসা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর কন্যা ছিলেন বলে মেজাযও তাঁর একটু কড়া ছিল। সহীহ বোখারীতে 'ঈলা'র ঘটনা সম্পর্কে স্বয়ং হযরত

---

১. যারকানী ২য় খণ্ড ২৭০ পৃঃ সাধারণত এটাই প্রসিদ্ধ। কিন্তু এছাবাতে আছে যে, ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। হাফেজ ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে লিখেছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) রোকাইয়ার মৃত্যুর পর হযরত উসমানের (রাঃ) নিকট তার বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, হযরত রোকাইয়ার মৃত্যু বদরের যুদ্ধের পর হয়েছে এজন্য হযরত উসমান (রাঃ) বদরের যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে, খুনাইস বদরের যুদ্ধের পর মারা গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে যে, হযরত উসমান (রাঃ) চিন্তিত মনে বসেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) ঐ পথে যাবার সময় জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, হাফসার সাথে বিবাহ করছ? তার ইদ্দৎ পার হয়েছে। যদি খুনাইস ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হতেন তাহলে তার ইদ্দতের কাল হিজরী ৪র্থ সাল হত। অথচ তাঁর বিবাহ হিজরী তৃতীয় সনে হয়েছিল।— ফতহুল বারী, নবম খণ্ড, ১৫২ পৃঃ।

২. তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, ১৭৭১ পৃঃ।

৩. বোখারী, ২য় খণ্ড, ৬৮ পৃঃ।

ওমরের বর্ণনা হল যে আমরা অন্ধকার যুগে মেয়েদের কোন বস্তুই মনে করতাম না। একদিন আমি কোন বিষয় চিন্তা করছিলাম। হঠাৎ আমার স্ত্রী আমাকে পরামর্শ দিল, আমি বললাম, তোমার এসব ব্যাপারে কি অধিকার আছে? তিনি বললেন, তুমি আমার কথা পছন্দ কর না, অথচ তোমার মেয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সমানে সমান উত্তর দিয়ে থাকে। আমি তখনই হাফসার কাছে চলে এলাম, বললাম, "মা, তুমি নাকি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে সমানে সমানে কথার উত্তর দাও, যে জন্য তিনি মনে মনে কষ্ট অনুভব করেন?" তিনি বললেন, "হাঁ, আমি এমন করে থাকি।" আমি বললাম, "খবরদার! আমি তোমাকে খোদার শাস্তির ভয় দেখাচ্ছি, তুমি অহঙ্কারে পড়ো না যে যাঁর রূপ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে মুগ্ধ করেছে।[১] তুমিও তার মত আচরণ করবে।"

তিরমিযী শরীফে আছে যে একবার হযরত সাফিয়্যা কাঁদছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এসে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন যে "আমাকে হাফসা (রাঃ) বলেছেন যে তুমি ইহুদীর মেয়ে।" রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "তুমি নবী বংশের মেয়ে (বনী-ইসরাঈল), তোমার পূর্বপুরুষগণের মধ্যে অনেকেই নবী ছিলেন, আর এখন তুমি পয়গম্বরের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে গাঁথা, সুতরাং হাফসা তোমার উপর কোন্ বিষয়ে গর্ব করতে পারে?"[২]

একবার হযরত আয়েশা ও হাফসা (রাঃ) হযরত সাফিয়্যাকে বললেন, "আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট তোমার চাইতে অধিক সম্মানিতা, আমরা তাঁর স্ত্রী এবং একই রক্তধারার অধিকারীও।" হযরত সাফিয়্যা (রাঃ) একথা শুনে ক্ষুণ্ন হলেন এবং হুযুর (সাঃ)-এর কাছে অভিযোগ করলেন। জবাবে হুযুর (সাঃ) বললেন, "তুমি একথা কেন বলনি যে তোমরা আমার চেয়ে বেশি সম্মানী কি করে হতে পারবে? আমার স্বামী মোহাম্মদ (সাঃ), আমার পিতা হারুন (আঃ) এবং আমার চাচা মূসা(আঃ)।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত হাফসা (রাঃ) হুযুর (সাঃ)-এর নিকটতম সাহাবী হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরের কন্যা ছিলেন। তাই আয়েশা ও হাফসার মধ্যেও হৃদ্যতা সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মাঝে মাঝে স্বপত্নী-সুলভ বিরোধের সৃষ্টি হত।

একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত হাফসা (রাঃ) উভয়েই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে সফরে ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রাত্রে হযরত আয়েশার (রাঃ) উটে করে চলতেন ও তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। একদিন হযরত হাফসা (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন যে আজ রাতে তুমি আমার উটে আরোহণ কর, আর আমি তোমার উটে আরোহণ করি যাতে বিভিন্ন দৃশ্য তোমার দৃষ্টিগোচর হবে। হযরত আয়েশা এ প্রস্তাবে সম্মতি দান করলেন। রসূলুল্লাহ্

১. সহীহ্ বোখারী, ১ম খণ্ড, ৭৩০ পৃঃ।
২. তিরমিযী, ৪৭৮ পৃঃ, কিতাবুল মানাকেব।

(সাঃ) হযরত আয়েশার উটে এলেন যেখানে হযরত হাফসা (রাঃ) অবস্থান করছিলেন। পরে ব্যাপার বুঝতে পেরে হযরত আয়েশা ক্ষুব্ধ হলেন। মনজিলে পৌছে তিনি অভিমানভরে ঘন ঘাসের ঝোপে বসে পড়লেন এবং অভিমানের স্বরে বলতে লাগলেন, "আয় আল্লাহ্! কোন সাপ বা বিচ্ছু পাঠিয়ে দাও যেন এখনই আমাকে দংশন করে যায়।"[১]

ওফাত ঃ হিজরী ৪৫ সনে আমীর মোয়াবিয়ার খেলাফত আমলে হযরত হাফসা (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। হযরত ওমর (রাঃ) মৃত্যুকালে তাঁকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছিলেন, তিনিও শেষ সময় ভ্রাতা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরকে ডেকে সে সমস্ত উপদেশের পুনরাবৃত্তি করেন। যৎসামান্য আসবাবপত্র যা ছিল, তা গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। মারওয়ান ইবনে হাকাম তখন মদীনার শাসনকর্তা। তিনিই জানাযার নামায পড়ান। বনী জুযামের জনপদ থেকে হযরত মুগীরা ইবনে শো'বার বাড়ি পর্যন্ত লাশ তিনিই বয়ে নিয়ে যান। সেখান থেকে কবর পর্যন্ত সাহাবী হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) অনুগমন করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, হযরত আসেম, হযরত সালেম, হামযা এবং হযরত ইবনে ওমরের পুত্রগণ লাশ কবরস্থ করেন।

হযরত যয়নব-উম্মুল মাসাকীন ঃ তিনি ছিলেন ফকীর-মিসকীনদের আশ্রয়স্থল— অতীব দয়ালু। এজন্য তাঁকে উম্মুল মাসাকীন—অর্থাৎ আর্ত মিসকীনদের জননী বলে অভিহিত করা হত। এ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তিনি।

প্রথমে আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহশের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। হিজরী ৩য় সনে ওহুদের যুদ্ধে আবদুল্লাহ্ শহীদ হন। বৈধব্যদশায় হুযুর (সাঃ) তাঁকে পত্নীত্বে বরণ করেন। মাত্র তিন কি চার মাস তিনি হুযুর (সাঃ)-এর সঙ্গে দাম্পত্যজীবন যাপন করার সুযোগ লাভ করেছিলেন। হযরত খাদীজার পর একমাত্র তিনিই হুযুর (সাঃ)-এর জীবিতাবস্থায় ইন্তেকাল করেন এবং জানাযা লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩০ বছর।

হযরত উম্মে সালমা ঃ তাঁর প্রকৃত নাম ছিল হিন্দ। ডাক নাম উম্মে সালমা। পিতার নাম সোহাইল এবং মাতার নাম আতেকা। প্রথম বিয়ে হয়েছিল আবদুল্লাহ্ ইবনে আবুল আসাদের সঙ্গে। আবু সালমা নামেই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। সম্পর্কে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দুধভাই ছিলেন। উম্মে সালমা প্রাথমিক অবস্থাতেই স্বামীর সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে হাবশাতে হিজরত করেন।

---

১. এ কথা বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে যে, পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে এ ধরনের বর্ণনা শুধু হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসার সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ তালাশ করা দরকার। হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরের সাথে মুনাফেকদের যে শত্রুতা ছিল তা প্রণিধানযোগ্য।

আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় আসেন এবং সেখান থেকে পুনরায় মদীনায় হিজরত করেন। মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন। তাঁর এ বৈশিষ্ট্যের কথাও জীবন-চরিত লেখকগণ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। স্বামী আবু সালমা আবদুল্লাহ ছিলেন একজন দক্ষ ঘোড় সওয়ার। বদর ও ওহুদ যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দান করেন। কিন্তু ওহুদ যুদ্ধে এমন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন যে এ আঘাতেই হিজরী ৪র্থ সনের জমাদিউস্‌সানী মাসে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাযা এবং দাফন-কাফনের আনুষ্ঠানিকতা অত্যন্ত সুব্যবস্থার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়। হুযুর (সাঃ) মন্তব্য করেন, এর জানাযায় হাজার তকবীর উচ্চারণ করলেও তা অতিরিক্ত হত না।

আবদুল্লাহর ইন্তেকালের সময় উম্মে সালমা গর্ভবতী ছিলেন। সন্তান প্রসবের পর ইদ্দত শেষ হলে হুযুর (সাঃ) তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠান। উম্মে সালমা নিবেদন করলেন, "আমার একটি সন্তান রয়েছে আমার বয়সও বেশি হয়ে গেছে, তদুপরি আমার মিজায একটু কড়া, সুতরাং শেষ পর্যন্ত হঠাৎ কোন বেআদবি না হয়ে যায়।"

হুযুর (সাঃ) তাঁর সব কয়টি ওযর স্বীকার করে তাঁকে পত্নীত্বে বরণ করে নিলেন।

মৃত্যু ঃ উম্মুল মোমেনীনদের মধ্যে হযরত উম্মে সালমাই সবার শেষে ইন্তেকাল করেছিলেন। তবে মৃত্যু সন সম্পর্কে চরিত লেখকগণের মধ্যে দারুণ মতভেদ দেখা যায়। ওয়াকেদীর বর্ণনা মতে, তিনি ৫৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবরাহীম হারবী হিজরী ৬২ সন বলে উল্লেখ করেছেন এবং তকরীবে এ মতকে শুদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম বোখারীর মতে হিজরী ৬১ সনে হযরত ইমাম হোসাইনের শহীদ হওয়ার সংবাদ শোনার পর মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত উম্মে সালমার মৃত্যু তারিখ সম্পর্কিত এ মতবিরোধ বিদ্যমান থাকায় প্রকৃত তারিখ খুঁজে বের করা কঠিন ব্যাপার। তবে অনেকগুলো নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে হুররার ঘটনা পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। মুসলিম শরীফে উল্লিখিত আছে যে হুযুর (সাঃ) যে সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তারা ভূমিতে প্রোথিত হয়ে যাবে, দামেশ্‌ক থেকে যখন এজীদ মদীনায় সৈন্য প্রেরণ করে, তখন তাবেয়ী আবদুল্লাহ ইবনে আবু রবিয়া এবং আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান হযরত উম্মে সালমার খেদমতে হাজির হয়ে সে ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। এটা হিজরী ৬০ সনের ঘটনা। সুতরাং হিজরী ৬০ সনের পূর্বে হযরত উম্মে সালমার মৃত্যু সম্পর্কিত বর্ণনা শুদ্ধ নয়।

মোহাদ্দেস ইবনে আবদুল বার উল্লেখ করেছেন যে অসিয়ত অনুযায়ী সাঈদ ইবনে যায়েদ হযরত উম্মে সালমার জানাযার নামায পড়ান। কোন কোন বর্ণনায় হযরত আবু হোরাইরা জানাযা পড়িয়েছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। "এদের

মতে হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ ৫১ সন থেকে ৫৫ সনের মধ্যে ইন্তেকাল করেছেন। তবে সমস্ত বর্ণনাকারীই এ মর্মে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে উম্মুল মোমেনীনদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষ ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

পাণ্ডিত্য ঃ হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্রাত্মা স্ত্রীগণের মধ্যে পাণ্ডিত্যে ও মেধায় হযরত আয়েশার পরই তাঁর স্থান। ইবনে সাআ'দ তবকাত গ্রন্থে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। ইসলামী আইন-কানুন সম্পর্কেও হযরত আয়েশার পরই তাঁর মতামতের গুরুত্ব দেয়া হত। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় সাহাবীরা যখন মক্কার পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে শহরের বাইরে মস্তক মুণ্ডন এবং কুরবানীর আনুষ্ঠানিকতা পালন সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তখন উম্মে সালমার প্রজ্ঞা ও ইজতেহাদই কার্যকরী হয়েছিল। শরীয়ত সম্পর্কিত তাঁর এ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি সবার প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল। বোখারী শরীফে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বর্ণনা উল্লিখিত রয়েছে।

হযরত যয়নাব ঃ মুসলিম জননীগণের মধ্যে সর্ববিষয়ে যারা হযরত আয়েশার সমকক্ষতার দাবি করতে পারতেন, তাঁদের মধ্যে হযরত যয়নাব ছিলেন অন্যতমা। হযরত আয়েশা স্বীকার করেছেন যে তিনি আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। সর্ববিষয়ে তিনি এ প্রতিযোগিতার অধিকারও রাখতেন। কেননা, বংশের দিক দিয়ে তিনি হুযুর (সাঃ)-এর ফুফাতো বোন। রূপে-গুণেও তিনি ছিলেন অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারিনী। এ জন্য হুযুর (সাঃ) তাঁকে অত্যধিক ভালবাসতেন। সংযম ও আত্মমর্যাদাবোধ ছিল তাঁর অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য। হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপ করার ঘটনায় অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে তাঁর ভগ্নী হামনাও উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু হুযুর (সাঃ) যখন সমকক্ষ সপত্নী যয়নাবের কাছে হযরত আয়েশার প্রতি প্রদত্ত অপবাদ সম্পর্কে মতামত জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি জবাব দিলেন, "আমি আমার বোন আয়েশার চরিত্রে পুণ্য ও সততা ব্যতীত কখনও অন্য কোন কিছু লক্ষ্য করিনি।" অপবাদ সম্পর্কিত সে নাজুক মুহূর্তে তাঁর এ জবাব হযরত আয়েশাকেও অভিভূত করেছিল।

এবাদত-বন্দেগীতে তিনি ছিলেন একাগ্রচিত্ত এবং বিশেষ মনোযোগী। হুযুর (সাঃ) তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব পেশ করলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, এস্তেখারা ব্যতীত এ ব্যাপারে আমি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি না।

একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) দরিদ্র মুহাজিরদের মধ্যে কোন কিছু বণ্টন করছিলেন। হযরত যয়নাব কোন ব্যাপারে প্রতিবাদ জানালে হযরত ওমর তাঁকে ধমক দেন। হুযুর (সাঃ) তখন হযরত ওমরকে নিরস্ত করে বলেছিলেন, "ওমর! একে কিছু বলো না। সে অত্যন্ত খোদাভীরু এবং এবাদতকালে অত্যধিক ক্রন্দসী।"

তিনি ছিলেন অত্যন্ত মিতব্যয়ী এবং উদারচিত্ত। নিজহাতে রোজগার করতেন এবং নিজে কষ্টে জীবনযাপন করেও সবকিছু আল্লাহ্র রাহে ব্যয় করে দিতেন।

একবার হ্যরত ওমর (রাঃ) বাইতুলমাল থেকে তাঁর জন্য এক বছরের খরচপত্র একত্রে পাঠিয়ে দেন। তিনি জিনিসপত্রের একটি অংশ কাপড়ে ঢেকে রেখে নির্দেশ দিলেন, আর এগুলো আমার গোত্রীয় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দাও। দাসী বোজরা নিবেদন করলেন, এর মধ্যে তো আমারও কিছু দাবি আছে। বললেন, কাপড়ে ঢাকা জিনিসপত্রগুলো তোমার জন্যে রইল। অবশিষ্টগুলো বন্টন কর। সমস্ত জিনিস বন্টিত হয়ে গেলে হাত তুলে মুনাজাত করলেন,— "আয় আল্লাহ্! আমাকে যেন পুনরায় আর বায়তুল মালের দান গ্রহণ করতে না হয়।" তাঁর সেই দোয়া কবুল হয়েছিল এবং সে বছরই তিনি ইন্তেকাল করেন।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার পবিত্র স্ত্রীগণকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,— "তোমাদের মধ্যে আমার সঙ্গে সে-ই সর্বপ্রথম মিলিত হবে, যার হাত সর্বাপেক্ষা লম্বা হবে।" উম্মুল মোমেনীনদের মধ্যে কেউ কেউ হাত লম্বা হওয়া অর্থে হাতের দৈর্ঘ্য বুঝলেন। কিন্তু আসলে অর্থ ছিল, দান-উদারতায় হাত লম্বা হওয়া। হ্যরত যয়নাব দানে উদারতায় সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়ে এ ভবিষ্যদ্বাণীর লক্ষ্যে উপনীত হয়েছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম ইন্তেকাল করেন।

কাফনের সরঞ্জাম তিনি নিজের তরফ থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তখন হ্যরত ওমরের খেলাফত-কাল। অসিয়ত করেছিলেন, "যদি খলিফার তরফ থেকেও কাফন পাঠানো হয়, তবে এটি যেন সদকা করে দেয়া হয়।

হ্যরত ওমর তাঁর জানাযা পড়িয়ে উম্মুল মোমেনীনদের কাছে জিজ্ঞেস করালেন, এর পবিত্র লাশ কবরে কে নামাবে? তাঁরা জবাবে বলে পাঠালেন, জীবিতকালে যে সমস্ত নিকটাত্মীয়ের সামনে তিনি পর্দা করতেন না, লাশ কবরে নামানোর অধিকারী তাঁরাই। সে মতে হ্যরত উসামা, মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ, আবদুল্লাহ্ ইবনে আহ্মদ ইবনে জাহাশ প্রমুখ লাশ কবরে নামিয়েছিলেন।

৫৩ বছর বয়সে হিজরী ২০ সনে তাঁর ইন্তেকাল হয়। ওয়াকেদীর বর্ণনা অনুযায়ী ৩৫ বছর বয়সে হুযুর (সাঃ)-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল।

হজরত জোয়াইরিয়াঃ হ্যরত জোয়াইরিয়া বনী মুস্তালেক গোত্রপতি হারেজ ইবনে যরারার কন্যা ছিলেন। মোনাফে' ইবনে সাফওয়ানের সঙ্গে তার প্রথমে বিয়ে হয়েছিল। মোনাফে মোরাইসীর যুদ্ধে নিহত হলে যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে হ্যরত জোয়াইরিয়াও বন্দী হয়ে মদীনায় এসেছিলেন। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করার সময় তিনি সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস আনসারীর ভাগে পড়েছিলেন।

গোত্রপতির বুদ্ধিমতী কন্যা জোয়াইরিয়া আইন মোতাবেক মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত হওয়ার শর্ত করে রাখলেন। সাবেত ইবনে কায়েস তাঁর মুক্তিপণ করলেন উনিশ উকিয়া সোনা।

চুক্তি সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে জোয়াইরিয়া সোজা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খেদমতে হাজির হলেন এবং কাতরস্বরে নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্,! আমি একজন কলেমা পাঠকারিণী মুসলিম নারী। আমার নাম জোয়াইরিয়া। গোত্রপতি হারেস আমার পিতা। আমি যে ভাগ্যবিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছি, তা আপনার অজানা নয়। সাবেত ইবনে কায়সের ভাগে আমাকে দেয়া হয়েছে। আমি তার সঙ্গে উনিশ উকিয়া সোনার বিনিময়ে মুক্ত হওয়ার শর্ত করে নিয়েছি । কিন্তু এ অর্থ প্রদান করার কোন সামর্থ্যই আমার নেই। সম্পূর্ণরূপে আপনার উপর র্নিভর করেই আমি এ বন্দোবস্ত করে এসেছি। আপনার কাছে এখন সে প্রার্থনা নিয়ে এসেছি।

হুযুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি তবে আরও উত্তম কিছু আকাঙ্ক্ষা কর?" জোয়াইরিয়া জানতে চাইলেন, "সে উত্তম ব্যবস্থা কি হতে পারে?"

হুযুর (সাঃ) বললেন, "তোমার মুক্তিপণ আমি পরিশোধ করে দিচ্ছি। মুক্ত হয়ে তুমি ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হতে পার।"

জোয়াইরিয়া পরম আনন্দে এ প্রস্তাবে সায় দিলেন। হুযুর (সাঃ) কর্তৃক জোয়াইরিয়াকে পত্নীত্বে বরণ করার খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবীরা বনী-মুস্তালিকের সকল বন্দীকে মুক্ত করে দিলেন। হযরত আয়েশার বর্ণনা মতে, জোয়াইরিয়ার সঙ্গে হুযুর (সাঃ)-এর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার বরকতেই বনী-মোস্তালিক গোত্রের সাত শতাধিক দাস-দাসী মুক্ত হতে পেরেছিল। এ সম্পর্কের শুভ প্রতিক্রিয়া আরও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।

কোন কোন বর্ণনা মতে, হযরত জোয়াইরিয়ার অনুরোধেই হুযুর (সাঃ) বনী মোস্তালিকের সকল বন্দীকে বিনাশর্তে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

হযরত জোয়াইরিয়া হিজরী পঞ্চাশ সনে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

হযরত উম্মে হাবীবা ঃ নাম রামলা এবং ডাকনাম ছিল উম্মে হাবীবা। নবুয়ত প্রাপ্তির সতের বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে উবায়দুল্লাহ্ ইবনে জাহাশের সঙ্গে বিয়ে হয়। নবুয়তের পর স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ইসলাম গ্রহণের গৌরব লাভ করেন। হাবশার হিজরতে উভয়েই শরীক ছিলেন। হাবশাতেই তাঁদের এক কন্যা হাবীবা জন্মগ্রহণ করেন।

আবিসিনিয়ায় গিয়ে উবায়দুল্লাহ্ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও উম্মে হাবীবা ইসলাম-ধর্মেই অটল ছিলেন। স্বামী ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে তাঁদের বিবাহ্ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। বিপন্ন উম্মে হাবীবার করুণ অবস্থা এবং ঈমানের দৃঢ়তার কথা অবগত হয়ে হুযুর (সাঃ) ওমর ইবনে উমাইয়া মুযরীকে নাজ্জাশীর কাছে পাঠিয়ে উম্মে হাবীবাকে স্বীয় পত্নীত্বে বরণ করার প্রস্তাব পাঠালেন। নাজ্জাশী বাঁদী আবরাহার মাধ্যমে এই প্রস্তাব উম্মে হাবীবার কাছে পৌছালেন। উম্মে হাবীবা প্রস্তাব শুনে আনন্দাতিশয্যে হাতের কঙ্কন এবং আংটি খুলে বাঁদীকে দিয়ে দিলেন। নাজ্জাশী

হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব সহ মুহাজের মুসলমানদের সমবেত করে বিয়ে পড়িয়ে দিলেন। উম্মে হাবীবা খালেদ ইবনে উমুবীকে উকীল নিযুক্ত করেছিলেন। নাজ্জাশী নিজের তরফ থেকেই হযরত উম্মে হাবীবাকে মোহ্রানা হিসাবে চার শ' স্বর্ণমুদ্রা পরিশোধ করে দেন।[১] বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্বয়ং বাদশাহ্র তরফ থেকে ওলীমার দাওয়াত পরিবেশন করা হয়।

মোহ্রানার অর্থ হাতে পেয়ে হযরত উম্মে হাববীবা আরও পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা দাসী আবরাহার হাতে দিয়ে দেন। কিন্তু বাদশাহ্ হযরত উম্মে হাবীবার কঙ্কন, আংটি ও এ অর্থ ফেরত করিয়ে দেন।

বিয়ের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্ত হওয়ার পর নাজ্জাশী তাঁকে কিছু উপহার সামগ্রীসহ্ সাহাবী হযরত শোরাহ্বীল ইবনে হাসনাকে সঙ্গে দিয়ে মদীনায় হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দেন। ঈমানের দৃঢ়তাই স্বামী-পরিত্যক্তা বর্ষীয়সী হযরত উম্মে হাবীবাকে উম্মুল মো'মেনীন হওয়ার দুর্লভ মর্যাদা দান করেছিল। হিজরী ৪৪ সনে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

হযরত মাইমুনা ঃ নাম মাইমুনা, পিতার নাম হারেস এবং মাতার নাম ছিল হিন্দা। প্রথমে মাসউদ ইবনে ওমাইরী সাকাফীর সঙ্গে বিয়ে হয়। মাসউদ তাঁকে তালাক দিয়ে দিলে আবু রহ্ম ইবনে আবদুল উজ্জার সঙ্গে বিয়ে হয়। আবু রহ্মের মৃত্যুর পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে বিয়ে করেন।

হযরত মাইমুনার এ বিয়ে সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে দ্বিতীয় বার স্বামী ছাড়া হয়ে মাইমুনা নিজেকে হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে উৎসর্গ করেন এবং জীবনের অবশিষ্ট সময়টুকু অতিবাহিত করে দেয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করলে হযরত আব্বাস (রাঃ) বিয়ে পড়িয়ে মাইমুনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার পথ সুগম করেন।

সরফ নামক স্থানে তাঁর বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এবং দীর্ঘদিন পর সে স্থানেই মৃত্যু হয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) জানাযা পড়িয়ে নিজেই পবিত্র লাশ কবরে নামিয়েছিলেন।

বর্ণিত আছে যে জানাযা বহ্ন করার সময় হযরত ইবনে আব্বাস বলেছিলেন, এটি হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র বিবির লাশ। অত্যন্ত আদবের সঙ্গে বহ্ন করো। সাবধান! যেন একটু নাড়া না লাগে।

মৃত্যুর সময় সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশ বর্ণনামতে হিজরী ৫১ সনে তাঁর মৃত্যু হয়।

হযরত সাফিয়া ঃ সাফিয়া প্রকৃত নাম ছিল না। যারকানী লিখেছেন, আরবে যুদ্ধলব্ধ মাল বণ্টন করার সময় দলপতির জন্য সর্বোৎকৃষ্ট যে আংটিটি রাখা হত, তাকে পরিভাষায় সাফিয়া বলা হত। খয়বর যুদ্ধে বন্দী এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ

১. এ বিয়ে স্থান কাল সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। তবে শুদ্ধতম অভিমত হল, হিজরী সাত সনে আবিসিনিয়ায় বাদশাহ্ নাজ্জাশী এ বিয়ে পড়িয়েছিলেন।

হিসাবে তাঁর আগমন ঘটেছিল এবং এ উপলক্ষেই হুযুর (সাঃ)-এর সঙ্গে তাঁর বৈবাহিক যোগাযোগ ঘটেছিল বলে তাঁকে সাফিয়্যা নামে অভিহিত করা হত। আসল নাম ছিল যয়নব, ইনি ছিলেন খয়বর অধিপতি হুওয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা। হুওয়াই ছিলেন বনূ নযীর গোত্রের প্রধান এবং মাতা বনূ কুরাইযা সর্দারের কন্যা।

প্রথমে তাঁর বিয়ে হয়েছিল সালাম ইবনে মাশ্‌কামুল কাবশীর সঙ্গে। তালাকপ্রাপ্তা হয়ে কানানা ইবনে আবুল হাফীফ-এর সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিয়ে হয়। কানানা খয়বর যুদ্ধে নিহত হয় এবং যয়নব বন্দিনী হন।

আনসারদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বনূ নযীর এবং বনূ কোরাইযা গোত্রের রক্তধারার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এ উভয় গোত্রের দলপতির সঙ্গে রক্ত সম্পর্কযুক্ত যয়নবকে যখন সাহাবী হযরত দাহিয়া কালবীর ভাগে দেয়ার প্রস্তাব হল, তখন অনেকের মধ্যেই আপত্তি দেখা দিল। ফলে, হুযুর (সাঃ) তাঁকে মুক্ত করে দিলেন এবং তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী নিজেই তাঁকে বিয়ে করে নিলেন। খয়বর থেকে ফেরার পথে 'সহবা' নামক স্থানে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। সঙ্গীসাথীদের কাছে যা কিছু ছিল তাই সংগ্রহ করে ওলীমা করা হল।

সেখান থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় তাঁকে হুযুর (সাঃ) নিজের উটে তুলে নিলেন এবং আবা দ্বারা পর্দা করে দিলেন— যেন উম্মুল মোমেনীন হিসাবে তাঁর মর্যাদা সাধারণ্যে প্রতিফলিত হয়ে যায়।

হযরত সাফিয়াকে হুযুর (সাঃ) বিশেষ মহব্বত করতেন। সর্বক্ষেত্রেই তাঁর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন।

একবার এক সফরে পবিত্র স্ত্রীগণ সঙ্গে ছিলেন। পথে হযরত সাফিয়ার উট অসুস্থ হয়ে পড়ে। হযরত যয়নবের একটি অতিরিক্ত উট ছিল। হুযুর (সাঃ) উটটি সাফিয়াকে দিয়ে দিতে বললে হযরত যয়নব বলেছিলেন, এ ইহুদীর মেয়েকে আমি উট দেব না। এতে হুযুর (সাঃ) এত অসন্তুষ্ট হন যে দীর্ঘ দু'মাস পর্যন্ত হযরত যয়নবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন রাখেন।

একবার হুযুর (সাঃ) হযরত সাফিয়ার ঘরে গিয়ে দেখলেন, তিনি কাঁদছেন। কারণ জানতে চাইলে বললেন, আয়েশা এবং যয়নব বলেন যে আমরা আল্লাহ্‌র রসূলের স্ত্রী এবং বংশ গৌরবের দিক দিয়ে একই রক্তধারার অধিকারিণী। সুতরাং আমরাই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, "তুমি বললে না কেন যে আমি আল্লাহ্‌র নবী হযরত হারুণের বংশধর, হযরত মূসা (আঃ) আমার চাচা এবং আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) আমার স্বামী, সুতরাং কোন্ বিচারে তোমরা আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পার?"

হযরত সাফিয়া হিজরী পঞ্চাশ সনে ইন্তেকাল করেন এবং জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত হন।

আওলাদ

হুযুর (সাঃ)-এর ক'য়জন সন্তান ছিল, সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। সর্ববাদীসম্মত অভিমত হল, তাঁর সন্তানের সংখ্যা ছিল ছ'জন। তন্মধ্যে পুত্র সন্তান ছিলেন হযরত ইবরাহীম ও হযরত কাসেম এবং কন্যা সন্তান ছিলেন হযরত ফাতেমা, হযরত যয়নব, হযরত রুকাইয়া ও হযরত উম্মে কুলছুম। ইবনে ইসহাকের মতে, তৈয়ব ও তাহের নামে আরও দুটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করেছিলেন। এ হিসাবে পুত্রের সংখ্যা ছিল চার এবং কন্যার সংখ্যাও চার, সর্বমোট আটজন। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়; পুত্র সন্তান ছিল চারজন এবং কন্যার সংখ্যা আটজন, মোট সন্তানের সংখ্যা ছিল বারজন। তবে সমস্ত বর্ণনাকারীই একমত যে কন্যার সংখ্যা ছিল মোট চারজন। এর মধ্যে কাসেম ও কন্যা চারজন হযরত খাদীজার গর্ভে এবং হযরত ইবরাহীম মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে জন্মলাভ করেছিলেন।

হযরত কাসেম ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সন্তানগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত কাসেম জন্মগ্রহণ করেন। মোজাহেদ-এর মতে ইনি মাত্র সাতদিন জীবিত ছিলেন। ইবনে সা'দের মতে দু'বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইবনে ফারেছ লিখেছেন যে হযরত কাসেম জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার মত বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

সন্তানগণের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম জন্মগ্রহণ করেন এবং নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। তাই রসূলে মকবুলকে (সাঃ) আবুল কাসেম বলে ডাকা হত। হুযুর (সাঃ) নিজেও এ ডাক পছন্দ করতেন। সাহাবিগণ কখনও তাঁকে নাম ধরে ডাকার প্রয়োজন হলে এ নামেই ডাকতেন। একদিন বাজারের পথে যেতে শুনতে পেলেন, কে যেন আবুল কাসেম নামে ডাকছে। হুযুর (সাঃ) ফিরে দাঁড়ালে লোকটি লজ্জিত হয়ে নিবেদন করলেন, "আমি আপনাকে ডাকিনি, এ নামে অন্য এক লোককে ডেকেছি।" এর পর থেকে অন্যদের পক্ষে এ ডাক নাম ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়।

হযরত যয়নব ঃ জীবনচরিত লেখকগণের সর্বসম্মত অভিমত হল, কন্যাদের মধ্যে হযরত যয়নবই সবার বড় ছিলেন। যুবাইর ইবনে বাকারের মতে হযরত যয়নব হযরত কাসেমের আগে জন্মগ্রহণ করেন। এদিক দিয়ে তিনিই ছিলেন হুযুর (সাঃ)-এর প্রথম সন্তান। ইবনে কালবীও এ মতই ব্যক্ত করেছেন। নবুয়ত প্রাপ্তির দশ বছর পূর্বে হুযুর (সাঃ)-এর বয়স যখন ত্রিশ তখন যয়নবের জন্ম হয়। যয়নবের বিয়ে হয়েছিল তাঁর খালাতো ভাই আবুল আস ইবনে রবীর সঙ্গে। হিজরতের সময় হুযুর (সাঃ) পরিবার-পরিজনকে মক্কাতেই রেখে যান। বদর যুদ্ধে আবুল আস বন্দী হয়েছিল। মুক্তিদানের সময় অঙ্গীকার মত আবুল আস মক্কায় পৌছে ভাই কেনানার সঙ্গে হযরত যয়নবকে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। রাস্তায় তোয়া নামক স্থানে কিছুসংখ্যক দুষ্কৃতকারী তাঁদের পথ রোধ করে এবং হেবার ইবনে আসওয়াদ বর্শা নিক্ষেপ করে হযরত যয়নবকে উটের উপর থেকে

মাটিতে ফেলে দেয়। তখন যয়নব গর্ভবতী ছিলেন। এ আঘাতেই তাঁর গর্ভপাত ঘটে। কেনানা তীর-ধনুক হাতে হেঁকে উঠল, খবরদার, যদি কেউ আর এক পা অগ্রসর হও তবে আমার তীর তোমাদের বক্ষ ভেদ করবে। পেছন থেকে আবু সুফিয়ানের আবির্ভাব হল। তিনি কেনানাকে লক্ষ্য করে বললেন, "কেনানা নিরস্ত হও, আমাদের কিছু বক্তব্য আছে, শোন!" কেনানা নিরস্ত হলে বললেন, "মোহাম্মদের মাধ্যমে আমাদের যে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে সে সম্পর্কে তুমি সম্যক অবগত আছ। এখন তাঁরই কন্যাকে যদি এভাবে আমাদের মুঠোর ভিতর থেকে নিয়ে গিয়ে তাঁর নিকট পৌছে দাও, তবে লোকেরা একে আমাদের দুর্বলতা মনে করবে। যয়নবকে আটকে রাখার ইচ্ছে আমাদের নেই। তুমি বরং আজকে ফিরে যাও এবং উত্তেজনা কিছু প্রশমিত হলে চুপচাপ তাঁকে মদীনায় পৌছে দিও।" কেনানা আবু সুফিয়ানের যুক্তি মেনে নিয়ে তখনকার মত ফিরে গেল এবং কয়েকদিন পর রাতের বেলায় হযরত যয়নবকে নিয়ে পুনরায় মদীনা অভিমুখে যাত্রা করল। হুযুর (সাঃ) যায়েদ ইবনে হারেসাকে ইতিমধ্যে মক্কা অভিমুখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বতনে ইয়াজেয নামক স্থানে তাঁর সঙ্গে হযরত যয়নবের সাক্ষাৎ হল এবং কেনানা এখানেই তাঁর হাতে যয়নবকে তুলে দিয়ে মক্কায় ফিরে গেল।

হযরত যয়নব স্বামী আবুল আসকে মুশরেক অবস্থাতেই মক্কায় ছেড়ে এসেছিলেন। তারপর আবুল আস যুদ্ধে দু' দু'বার ধরা পড়ে এলে দু'বারই হযরত যয়নব তাঁকে মুক্ত করিয়ে দেন। ফলে, তাঁর মনের পরিবর্তন ঘটল, মক্কায় গিয়ে তিনি সকল লেন-দেন এবং আমানত চুকিয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে মদীনায় চলে এলেন। মুশরেক অবস্থায় ছাড়াছাড়ি হওয়ার কারণে যেহেতু বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তাই তাঁদের বিয়ে নতুন করে পড়িয়ে দেয়া হল।[১]

আবুল আস হযরত যয়নবের সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করতেন। খোদ হুযুর (সাঃ) তাঁদের মধুর দাম্পত্য জীবন এবং আবুল আসের সৌজন্যবোধের ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

দাম্পত্য জীবন পুনরারম্ভ হওয়ার পর হযরত যয়নব আর বেশি দিন জীবিত ছিলেন না। ৬ বা ৭ হিজরীতে আবুল আসের সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন হয় এবং আট হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। উম্মে আয়মান, হযরত সাওদা বিনতে জামআ এবং হযরত উম্মে সালমা গোসল দেন, হুযুর (সাঃ) জানাযা পড়ান এবং হযরত আবুল আস ও খোদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) লাশ কবরে নামান। হযরত যয়নব দুটি

১. এসাবাতে বর্ণিত আছে যে, হিজরী ৬ সনের শওয়াল মাসে আবুল আস কোরাইশদের এক বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে রওয়ানা হয়েছিলেন। হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা ১৭০ জন অশ্বারোহী সহ এক অভিযান চালিয়ে কাফেলা আক্রমণ করেন। কিছু সংখ্যক লোক ধরা পড়ে। অবশিষ্ট সবাই পালিয়ে যায়। তদের সঙ্গে আবুল আসও ছিলেন। হযরত যয়নাবের সুপারিশক্রমে মালামাল সহ আবুল আসকে মুক্তি দেয়া হয়।

সন্তান রেখে যান; কন্যা উমামা ও পুত্র আলী। আলী সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। কোন কোন বর্ণনা মতে, তিনি শৈশবেই ইন্তেকাল করেন। অধিকাংশ বর্ণনাকারীর মতে যথেষ্ঠ জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার পর তাঁর মৃত্যু হয়। ইবনে আসাকির লিখেছেন যে ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

উমামাকে হুযুর (সাঃ) অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সব সময় সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। এমন কি, নামাযের সময়ও দূরে সরাতেন না। হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে কোন কোন সময় শিশু হযরত উমামা নামায রত অবস্থায়ও হুযুর (সাঃ)-এর কাঁদে উঠে বসে পড়তেন।

একবার হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে কিছু উপঢৌকন এল। এর মধ্যে সোনার একটি হারও ছিল। হারটি হাতে নিয়ে হুযুর (সাঃ) বললেন, "এটি আমি আমার অতীব প্রিয়জনকে দেব। স্ত্রীগণ ধারণা করলেন, হয়ত সেটি হযরত আয়েশার ভাগ্যে জুটবে। উমামা এক কোণে বসে আপন মনে খেলা করছিলেন। হুযুর (সাঃ) তাঁকে ডেকে এনে সে হার তাঁর গলায় পরিয়ে দিলেন।

আবুল আস মৃত্যুর সময় হযরত যোবায়র ইবনে আওয়ামকে তাঁর অভিভাবক নিযুক্ত করে যান। হযরত ফাতেমার ইন্তেকালের পর যুবায়র উমামাকে হযরত আলীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেন। হযরত আলী (রাঃ) শাহাদত বরণ করার সময় হযরত মুগীরাকে অসিয়ত করে যান যেন তিনি উমামাকে বিয়ে করেন। মুগীরার ঔরসে তাঁর ইয়াহ্ইয়া নামক একটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করেছিল। কোন কোন বর্ণনা মতে, উমামা অবশ্য নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান।

হযরত রোকাইয়া (রাঃ) ঃ চরিতকার জুরজানী লিখেছেন যে হযরত রোকাইয়া ছিলেন হুযুর (সাঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। কিন্তু অধিকাংশ বর্ণনা অনুযায়ী নবুয়তের পূর্বে হুযুর (সাঃ)-এর ৩৩ বছর বয়সে তাঁর জন্ম হয়। ইবনে সাআ'দের মতে নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে আবু লাহাবের পুত্র উতবার সঙ্গে তাঁর প্রথম বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। হুযুর (সাঃ)-এর অপর এক কন্যা হযরত উম্মে কুলছুমের বিয়েও আবু লাহাবের আর এক পুত্র উতাইবার সঙ্গে হয়েছিল।

নবুয়তপ্রাপ্তির পর ইসলাম প্রচার শুরু হলে আবু লাহাব তার দু' পুত্রকে ডেকে হুযুর (সাঃ)-এর দু'কন্যাকেই তালাক দেয়ার নির্দেশ দেয়। পুত্রদ্বয় অনন্যোপায় হয়ে একসঙ্গে দুজনকেই তালাক দিয়ে দেয়। হুযুর (সাঃ) তখন রোকাইয়াকে হযরত উসমানের সঙ্গে বিয়ে দেন।

দওলবী লিখেছেন যে হযরত রোকাইয়ার সঙ্গে হযরত উসমানের বিয়ে হয়েছিল জাহেলিয়াত যুগে। কিন্তু স্বয়ং হযরত উসমান বর্ণিত এক সুদীর্ঘ রেওয়ায়েত দ্বারাই এ ভ্রান্তির নিরসন হয়। সে রেওয়ায়েতে বিয়ে ইসলামী যুগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে উল্লিখিত হয়েছে।

বিয়ের পর হযরত উসমান রোকাইয়াকে সঙ্গে নিয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। দীর্ঘদিন তাঁদের আর কোন খবর পাওয়া গেল না। বেশ কিছুদিন পর জনৈক স্ত্রীলোক এসে এ মর্মে খবর দিল যে সে তাঁদের দু'জনকেই আবিসিনিয়ায় দেখে এসেছে। তখন হুযুর (সাঃ) তাঁদের কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন, "হযরত ইবরাহীম এবং হযরত লুতের পর উসমানই প্রথম ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র দ্বীনের জন্য সপরিবারে হিজরত করল।"

আবিসিনিয়াতেই হযরত রোকাইয়ার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তার নাম ছিল আবদুল্লাহ্ কিন্তু মাত্র ছয় বছর বয়সে তার ইন্তেকাল হয়।

হিজরতে পর হযরত উসমান (রাঃ) আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় ফিরে আসেন এবং সেখান থেকে মদীনায় দ্বিতীয়বার হিজরত করেন। মদীনায় এসে হযরত রোকাইয়া মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন বদর যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল। রোকাইয়ার অসুস্থতার দরুনই হযরত ওসমান এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। যায়েদ ইবনে হারেসা বিজয় সংবাদসহ যেদিন মদীনায় আগমন করলেন সেদিনই হযরত রোকাইয়া ইন্তেকাল করেন। যুদ্ধ থেকে তখনও না ফেরার কারণে হুযুর(সাঃ)-এর পক্ষে আর প্রিয় কন্যার জানাযায় শরীক হওয়ার সুযোগ হয়নি।

হযরত উম্মে কুলসুম ঃ বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই হযরত রোকাইয়ার ইন্তেকালের পর রবিউল আউয়াল মাসে হুযুর (সাঃ) তাঁকে হযরত উসমানের সঙ্গে বিয়ে দেন।

বোখারী শরীফে উল্লিখিত রয়েছে যে হযরত হাফসা (রাঃ) বিধবা হওয়ার পর হযরত ওমর (রাঃ) উপযাচক হয়ে তাঁকে হযরত উসমানের সঙ্গে বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবে হযরত উসমানের পক্ষ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে হযরত ওমর মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। হুযুর (সাঃ) তখন হযরত ওমরকে ডেকে এনে বসিয়েছিলেন, হাফসার জন্য আমি উসমানের চাইতে উত্তম বর এবং ওসমানের জন্য হাফসার চাইতে উত্তম কন্যার ব্যবস্থা করেছি। হাফসাকে আমি বিয়ে করব এবং উসমানের সঙ্গে উম্মে কুলসুমের বিয়ে দেব।

হযরত উম্মে কুলসুম ছয় বছর কাল হযরত উসমানের সঙ্গে দাম্পত্যজীবন যাপন করেন। হিজরী নবম সনের শাবান মাসে তাঁর ইন্তেকাল হয়। খোদ হুযুর (সাঃ) জানাযার নামায পড়ান এবং হযরত আলী, হযরত উসামা ইবনে যায়েদ এবং হযরত ফযল ইবনে আব্বাস লাশ কবরে নামান।

হযরত ফাতেমা যাহ্রা (রাঃ) ঃ এক বর্ণনায় হযরত ফাতেমা (রাঃ) নবুয়তের প্রথম বর্ষে জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে ইসহাকের মতে একমাত্র ইবরাহীম ছাড়া হুযুর (সাঃ)-এর আর সব কয়টি সন্তানই নবুয়ত লাভের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। কারো কারো মতে যে বছর নবুয়ত লাভ হয়, সে বছরই ওহী প্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্বে সম্ভবত হযরত ফাতেমার জন্ম হয়ে থাকবে। ইবনুল জওযীর মতে

নবুয়ত লাভের পাঁচ বছর পূর্বে যখন কাবার সংস্কার করা হচ্ছিল তখন হযরত ফাতেমার জন্ম হয়। তবে অধিকাংশ বর্ণনা অনুযায়ী নবুয়তের এক বছর পূর্বে হযরত ফাতেমা (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

হিজরী ২য় সনে তাঁকে হযরত আলীর সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়। তখন হযরত আলীর বয়স ছিল একুশ বছর পাঁচ মাস, মতান্তরে চব্বিশ বছর।[১]

বিয়ের প্রস্তাব আসার পর হুযুর (সাঃ) হযরত আলীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, মোহ্‌রানা আদায় করার মত কোন কিছু তাঁর আছে কিনা? হযরত আলী জবাব দিলেন, "একটি মাত্র বর্ম ও একটি ঘোড়া রয়েছে।" এরশাদ করলেন, "জেহাদের জন্য ঘোড়ার প্রয়োজন বেশি। তুমি বরং বর্মটি বিক্রি করে খরচ সংগ্রহ কর।" হযরত আলী সেটি ৪৮০ দেরহামে হযরত উসমানের কাছে বিক্রি করলেন এবং সাকুল্য অর্থ এনে হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে পেশ করলেন। হুযুর (সাঃ) হযরত বেলালকে দিয়ে বাজার থেকে সুগন্ধি আনিয়ে বিয়ে পড়িয়ে দিলেন। এসাবায় উল্লিখিত রয়েছে যে কন্যা বিদায়ের সময় হুযুর (সাঃ)-একটি খাটিয়া-বিছানা, আটা পেষার চাক্কি ও পানি তোলার একটি মশক উপঢৌকন হিসাবে দিয়েছিলেন। শেষোক্ত জিনিস দু'টি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হযরত ফাতেমার (রাঃ) সঙ্গে ছিল। বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত হযরত আলীর কোন বাড়িঘর ছিল না। হযরত ফাতেমাকে নিয়ে বসবাস করার জন্য যখন বাড়ির প্রশ্ন দেখা দিল, তখন হারেস ইবনে নোমান তাদের বসবাস করার মত একটি বাড়ি দিলেন। হযরত ফাতেমাকে নিয়ে হযরত আলী (রাঃ) সে বাড়িতে এসেই বসবাস করতে থাকেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) সব সময়ই জামাতা হযরত আলী (রাঃ) এবং কন্যা হযরত ফাতেমার (রাঃ) মধ্যে মধুর সম্পর্ক বজায় রাখার মত পরিবেশ গড়ে তুলতে যত্নবান হতেন। সাংসারিক ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে কখনও কোন মনোমালিন্য দেখা দিলে উভয়ের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করে দিতেন। একবার এমনই একটি দাম্পত্য কলহ মিটিয়ে দিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ফাতেমার ঘর থেকে হাসিমুখে ফিরে আসছিলেন। জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)! কিছুক্ষণ আগেও আপনাকে বড় উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল, এখন যে বড় হাসি-খুশী দেখছি?" জবাব দিলেন, "আমি এইমাত্র এমন দুজনের মধ্যে মীমাংসা করে এসেছি, যে দুজনই আমার বড় প্রিয়।"

একবার হযরত আলী হযরত ফাতেমার প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করলে হযরত ফাতেমা (রাঃ) হুযুর (সাঃ)-এর দরবারে অভিযোগ নিয়ে হাজির হলেন। পেছনে পেছনে হযরত আলীও উপস্থিত হলেন।

---

১. হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি আট বৎসর বয়সে ইসলাম কবুল করেন, সে হিসাবে বিবাহের সময় তাঁর বয়স হওয়ার কথা একুশ বছর পাঁচ মাস। কিন্তু শুদ্ধতম মত হল, তিনি দশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, এ হিসাবে বিবাহের সময় বয়স হয়েছিল ২৪ বছর।

অভিযোগের উত্তরে হুযুর (সাঃ) ফাতেমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "মা! তোমার বোঝা উচিত যে কেমন হৃদয়বান স্বামী এমন পরিস্থিতিতেও নীরবে তার স্ত্রীর কাছে চলে আসে!" কথাটি হযরত আলীর অন্তরেও এমন প্রভাব বিস্তার করল যে তিনি হযরত ফাতেমার সামনে এসে বলতে লাগলেন, "এখন থেকে আর কোন দিন আমি তোমার রুচি বিরুদ্ধ কোন কথা মুখে উচ্চারণ করব না।"

একবার হযরত আলী (রাঃ) দ্বিতীয় একটি বিয়ে করতে মনস্থ করলে হুযুর (সাঃ) দারুণ মর্মাহত হন। মসজিদে বক্তৃতা দেয়ার সময়ও সে ক্ষোভ প্রকাশ পেল। বললেন, "ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা, তাকে কষ্ট দিলে সে কষ্ট আমাকেই দেয়া হবে।" একথা শুনে হযরত আলী তাঁর সংকল্প ত্যাগ করলেন।[১]

হযরত ফাতেমার পাঁচটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। হযরত হাসান, হযরত হুসাইন ও হযরত মুহসিন। মুহসিন শৈশবেই ইন্তেকাল করেন। দু'কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম ও হযরত যয়নব। নানা ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এঁরা প্রত্যেকেই ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ) হিজরী এগার সনের রমযান মাসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের ছয় মাস পর ইন্তেকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ২৯ বছর। কেউ কেউ অবশ্য ২৪-২৫ এবং ৩০ বছরও লিখেছেন। তবে যারকানীর মতে ২৯ বছরই ঠিক।

হযরত ইবরাহীম (রাঃ) ঃ হুযুর (সাঃ)-এর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান হযরত ইবরাহীম হিজরী ৮ সনে আলিয়া নামক স্থানে হযরত মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মারিয়া এখানেই বসবাস করতেন। ইবরাহীমের জন্মস্থান হিসাবে লোকেরা তখন থেকে একে "মাশরাবা-এ-ইবরাহীম" নামে অভিহিত করে। হযরত আবু রাখে'র স্ত্রী সালমা এ শিশুর ধাত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। আবু রাফে' পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করার সুসংবাদসহ হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হলে তাঁকে তিনি একটি গোলাম দান করেছিলেন।

সপ্তম দিবসে শিশুর আকীকা দেয়া হয় এবং মাথা মুণ্ডন করার পর চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য খয়রাত করা হয়। আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নামেই তাঁর নামকরণ করা হয়। এ শিশুকে দুধ পান করানোর জন্য আনসারদের অনেকেই প্রার্থী হলেন। শেষ পর্যন্ত হুযুর (সাঃ) তাকে খাওলা বিনতে যায়দুল আনসারীর হাতে সমর্পণ করেন এবং প্রতিদান স্বরূপ তাঁকে কয়েকটি ফলবান খেজুর বৃক্ষ দান করেন। বোখারী শরীফে হযরত ইবরাহীমকে দুধ পান করানোর জন্য উম্মে রাফে' নামক যে মহিলার কথা উল্লিখিত হয়েছে, কাজী আয়াজের বর্ণনা অনুযায়ী সে উম্মে রাখে' ও খাওলা একজনেরই দুটি নাম। অবশ্য তাঁর স্বামীর নাম বারা ইবনে আউস বলা হয়েছে। তাঁর ডাক নাম ছিল

১. বোখারী [illegible] অধ্যায়ে নবীগণের প্রসঙ্গ।

আবু সাইফ। এজন্য তাঁর স্ত্রীকে উম্মে সাইফও বলা হত। এরা মদীনার উপকণ্ঠে থাকতেন। স্বামী কর্মকারের কাজ করতেন বলে তাঁদের ঘর সব সময় ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে থাকত। এতদসত্ত্বেও হুযুর (সাঃ) পুত্রস্নেহের টানে প্রায়ই সেখানে যেতেন।

হযরত ইবরাহীম (রাঃ) ধাত্রীর ঘরেই মারা যান। খবর পেয়ে হুযুর (সাঃ) সাহাবী হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ সহ সেখানে যান। ইবরাহীমের তখন অন্তিম অবস্থা। হাত বাড়িয়ে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। দু' চোখ প্লাবিত হয়ে অশ্রুধারা নেমে এল। আবদুর রহমান আরয করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)! আপনার এ অবস্থা! জবাব দিলেন, "এটা অপত্য স্নেহ, অশ্রুর ধারায় বিগলিত হয়ে নেমে এসেছে।"

ইবরাহীম (রাঃ) যেদিন মারা যান, সে দিন সূর্য গ্রহণ হল। আরববাসীদের প্রাচীন কুসংস্কার অনুযায়ী চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রিয় সন্তানের মৃত্যুতেই সূর্য গ্রহণের মাধ্যমে আকাশ শোকাভিভূত হয়ে পড়েছে। খবর শুনে হুযুর (সাঃ) ঘোষণা করে দিলেন, "চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ্র নিদর্শন, কারও জীবন-মরণের সঙ্গে এগুলোর গ্রহণ লাগা না লাগার কোনই সম্পর্ক নেই।

ছোট একটি খাটিয়াতে করে লাশ আনা হল। হুযুর (সাঃ) জানাযার নামায পড়ালেন। সাহাবী উসমান ইবনে মযউনের সমাধি পাশে কবর খনন করা হয়। হযরত ফযল ইবনে আব্বাস এবং উসামা লাশ কবরে স্থাপন করেন। দাফন কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত হুযুর (সাঃ) কবরপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। কবরের কাজ শেষ হলে তার উপর সামান্য পানি ছিটিয়ে দেয়া হয়, একটি স্বতন্ত্র চিহ্ন দ্বারা সেটি চিহ্নিত করে রাখা হয়।

আবু দাউদ এবং বায়হাকীর বর্ণনাতে মৃত্যুকালে ইবরাহীমের বয়স হয়েছিল মাত্র দু'মাস দশদিন। তিনি অষ্টম হিজরীর যিলহজ মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯ম হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ওয়াকেদীর মতে দশম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে ইন্তেকাল করেন। এ বর্ণনা অনুযায়ী মৃত্যুকালে তাঁর বয়স অন্তত পনের মাস হয়েছিল। কোন কোন বর্ণনাকারী বয়স এক বছর দশ মাস ছয়দিনও লিখেছেন। তবে সহীহ হাদীসসমূহে বিশুদ্ধ বর্ণনার মাধ্যমে উল্লিখিত হয়েছে যে ইবরাহীম (রাঃ) সতের থেকে আঠারো মাস জীবিত ছিলেন।

দাম্পত্যজীবন

পবিত্রা স্ত্রীগণের সংখ্যা ন'য়ে পৌঁছেছিল। তন্মধ্যে প্রকৃতির সাধারণ নিয়মানুযায়ী স্বভাব ও রুচির বিস্তর পার্থক্য ছিল। পরস্পরের মধ্যে মানবসুলভ হিংসা-বিদ্বেষ এবং মান-অভিমানও ছিল।

অভাব-অনটন এবং কঠিন দারিদ্র্যই ছিল হুযুর (সাঃ)-এর জীবনের চিরসঙ্গী। ফলে, স্ত্রীগণের যোগ্য ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হত না। তাই তাঁদের অভিযোগেরও সুযোগ হত। কিন্তু এ অবস্থায় দিনাতিপাত করেও সদা প্রফুল্ল চেহারা মোবারকে কখনো কোন বিরক্তির ছাপ প্রকাশ পেত না।

হযরত খাদীজার সঙ্গে ছিল তাঁর সীমাহীন ভালবাসা। খাদীজার সঙ্গে যখন বিয়ে হয়, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছিলেন নবীন যুবক এবং খাদীজা ছিলেন মধ্য বয়সী প্রৌঢ়া। তা সত্ত্বেও তাঁর জীবৎকাল পর্যন্ত হুযুর (সাঃ) আর কোন বিয়ে করেননি। মৃত্যুর পরও খাদীজার কথা কখনো তিনি ভুলতে পারেননি। খাদীজার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে উঠতেন।

হযরত খাদীজার পর সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন হযরত আয়েশা (রাঃ)। তবে এ ভালবাসার ভিত্তি রূপ বা যৌবন ছিল না। কেননা, রূপে-যৌবনে হযরত সাফিয়া ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠা। অন্যান্য স্ত্রীগণও কোনদিক দিয়েই খাটো ছিলেন না। হযরত আয়েশার প্রাধান্য লাভের কারণ ছিল তাঁর ধীশক্তি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, গভীর প্রজ্ঞা এবং শরীয়তের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর অপূর্ব পর্যবেক্ষণ শক্তি।

একবার অন্যান্য বিবিগণ হযরত ফাতেমাকে মধ্যস্থ করে অভিযোগ উত্থাপন করলেন, "হুযুর (সাঃ) অন্যান্য সবার তুলনায় আবু বকরতনয়াকে কেন বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন?" অভিযোগের জবাবে হুযুর (সাঃ) কন্যাকেই জিজ্ঞেস করলেন, "বৎস! আমি যাকে পছন্দ করি, তুমি কি তাকে পছন্দ কর না?" কন্যা হযরত ফাতেমার পক্ষে এতটুকুই যথেষ্ট ছিল, তিনি ফিরে এসে সৎ-মাতাগণকে বললেন, "আমি এ ব্যাপারে আর কোন দিন অংশ গ্রহণ করতে পারব না।"

এরপর হযরত যয়নবকে এ প্রশ্ন উত্থাপন করার জন্য ধরা হল। রূপে-গুণে তিনিও হযরত আয়েশার চাইতে কোন অংশেই খাটো ছিলেন না। একদিন তিনি বিবিগণের উপস্থিতিতেই এ প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে প্রশ্নটি উত্থাপন করে যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে হযরত আয়েশাকে যে প্রাধান্য দেয়া হয়, তিনি তার মোটেও উপযুক্তা নন। হযরত আয়েশাও মনোযোগের সঙ্গে যয়নবের বক্তব্য শুনছিলেন এবং বার বার হুযুর (সাঃ)-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করে চেহারা মোবারকের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন।

হযরত যয়নাবের বক্তব্য শেষ হলে হুযুর (সাঃ) হযরত আয়েশাকে জবাব দেয়ার অনুমতি প্রদান করলেন। তিনি এমন হৃদয়গ্রাহী যুক্তি পেশ করলেন, যা শুনে হযরত যয়নবেরও মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে পড়ল। হুযুর (সাঃ) শুধু মন্তব্য করলেন, "হবে না কেন, সে যে আবু বকরের কন্যা।[১]

হুযুর (সাঃ)-এর এরশাদ হল, বিয়ের সময় চারটি দিক দেখা হয়— বংশ, ধন, রূপ এবং ধর্ম। তবে তোমরা সর্বাবস্থায় ধার্মিকতাকে অগ্রাধিকার দিও।[২]

১. বোখারী শরীফ।
২. বোখারী ঃ নিকাহ্ অধ্যায়।

হুযুর (সাঃ) স্বীয় স্ত্রীগণের মধ্যে তাঁকেই বেশি পছন্দ করতেন, যাঁর দ্বারা দ্বীনের খেদমত বেশি হত। স্ত্রীগণ একান্ত সান্নিধ্যের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। জীবনে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত দিক সম্পর্কেই তাঁরা বেশি ওয়াকিফহাল ছিলেন। ব্যবহারিক জীবনের অপ্রকাশ্য দিক সম্পর্কে তাঁদের বর্ণনাই উম্মতের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হত। স্ব স্ব যোগ্যতা অনুসারে তাঁরা এ বিষয়ে পূর্ণ খেদমত করে গেছেন।

শরীয়তের বিভিন্ন দিক গভীরভাবে অনুধাবন করা এবং স্ব স্ব রুচি ও মেধা অনুযায়ী তা প্রকাশ করার মধ্যে যে তারতম্য হত বিবিগণের প্যারস্পরিক মর্যাদার তারতম্য নির্ধারিত হওয়ার এটাই ছিল প্রধান ভিত্তি।

অসাধারণ ধী-শক্তি এবং শরীয়তের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার যে পরিচয় হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রদান করেছেন, অনেক বিশিষ্ট সাহাবীর তুলনায়ও তা বেশি ওজনী বলে মনে হত। শরীয়তের অনেক সূক্ষ্ম প্রশ্নে হযরত আয়েশার অভিমতকে অগ্রাধিকার দেয়া হত। একই ভিত্তিতে হযরত আয়েশা উম্মতের মধ্যেও এক অনন্য মর্যাদার আসন লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন।

হুযুর (সাঃ)-এর সাধারণ অভ্যাস ছিল, প্রতিদিনই একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিবিগণের ঘরে যেতেন এবং কিছু সময় তাঁদের মাঝে অবস্থান করতেন। যাঁর ঘরে যে দিন রাত্রি যাপন করার পালা হত, শেষ পর্যন্ত সে ঘরেই থেকে যেতেন। এটি আবু দাউদের বর্ণনা। যারকানীতে হযরত উম্মে সালমার বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে যে প্রথম হযরত উম্মে সালমার ঘরে যেতেন। তারপর একে একে প্রত্যেক বিবির ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলতেন। কোন কোন বর্ণনায় এমনও দেখা যায় যে যে দিন যে ঘরে অবস্থানের পালা আসত, সে ঘরেই চলে যেতেন এবং অন্যান্য বিবিগণ সে ঘরে এসেই সমবেত হতেন এবং নানা আলোচনার মাধ্যমে দীর্ঘ সময় কাটাতেন। রাত্রি গভীর হলে সবাই যার যার ঘরে চলে যেতেন।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বিবিগণের মধ্যে সাময়িক হিংসা-বিদ্বেষ দেখা দিলেও কোন বিরোধই স্থায়ী হত না। বরং সবাই একত্রিত হয়ে প্রতিদিনই একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র সান্নিধ্য উপভোগ করতেন।

হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র সংসর্গে থেকে তাঁদের অন্তর যে কতটা আয়নার মত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপের ঘটনায় উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মুনাফেকদের আরোপিত এ অপবাদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সপত্নীসুলভ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল। হুযুর (সাঃ) হযরত আয়েশাকে বেশি মহব্বত করতেন বলে অন্যাদের অন্তরে স্বভাবতই কিছুটা ক্ষোভ ছিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে অপবাদের সে ঘটনার সঙ্গে অনেক সরল প্রাণ মুসলমান পর্যন্ত জড়িত হয়ে পড়লেও উম্মুল

মোমেনীনগণের কাউকেও এতে জড়িত হতে দেখা যায়নি। হযরত আয়েশার সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিলেন হযরত যয়নব। হুযুর (সাঃ) এ ব্যাপারে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করলে তিনি কানে আঙ্গুল দিয়ে বলে উঠেছিলেন, "কখনো নয়, এটা মিথ্যা অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।" পরবর্তীকালে হযরত আয়েশা (রাঃ) সে দুঃখজনক ঘটনাটির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে হযরত যয়নবের প্রতি ভক্তি গদগদ হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। বোখারী শরীফে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

বিবিগণের পারস্পরিক সম্পর্কে যে সমস্ত নাযুক পরিস্থিতির উদ্ভব হত, হুযুর (সাঃ) অত্যন্ত ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সঙ্গে তার মোকাবিলা করতেন। প্রত্যেকেরই মেজাজ রক্ষা করে চলতেন। এ সম্পর্কিত কয়েকটি বর্ণনা উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ

হযরত সাফিয়া (রাঃ) ভাল রান্না করতে পারতেন। একদিন তিনি কিছু খাবার রান্না করে হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে পাঠালেন। হুযুর (সাঃ) তখন হযরত আয়েশার ঘরে অবস্থান করছিলেন। আয়েশা (রাঃ) রাগান্বিত হয়ে খাবার শুদ্ধ পেয়ালাটি মাটিতে ছুঁড়ে মারলেন! পেয়ালা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। হযরত সাফিয়া বিষয়টি জানতে পারলে দুঃখ পাবেন ভেবে হুযুর (সাঃ) পেয়ালার ভাঙা টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিলেন এবং অন্য একটি পেয়ালা আনিয়ে হযরত সাফিয়ার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।[১]

একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) কোন কারণে রাগান্বিত হয়ে হুযুর (সাঃ)-এর সঙ্গে চড়া স্বরে কথা বলছিলেন। এমন সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) এসে উপনীত হলেন। আয়েশার আচরণে তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, "তুমি হুযুর (সাঃ)-এর সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলার সাহস কর!" একথা বলে তাঁকে চপেটাঘাত করতে উদ্যত হলেন। হুযুর (সাঃ) অবস্থা বেগতিক দেখে দুজনের মাঝখানে এসে আয়েশাকে আড়াল করে দাঁড়ালেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) লজ্জিত হয়ে রাগান্বিত অবস্থাতেই ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। হুযুর (সাঃ) তখন আয়েশাকে লক্ষ্য করে বললেন, "দেখ! আজ আমি কেমন করে তোমাকে বাঁচিয়ে দিলাম।"

কয়েকদিন পর হযরত আবু বকর (রাঃ) পুনরায় এলেন। ততদিনে সব রাগ পানি হয়ে গেছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) হেসে বললেন, "সে দিন আমি লড়াই-এর মাঝে এসে অংশ নিয়েছিলাম—আজ এ শান্তির মাঝেও শামিল থাকতে চাই।" হুযুর (সাঃ) হেসে জবাব দিলেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।"

একদিন হুযুর (সাঃ) হযরত আয়েশার সঙ্গে কথা বলতে বলতে মন্তব্য করলেন, "তুমি কখন খুশী থাক আর কখন রাগান্বিত হও, তা আমি অনুভব করতে পারি।" জিজ্ঞেস করলেন, "তা কিভাবে?" জবাব দিলেন, "যখন তুমি খোশমেজাজে থাক, তখন কসম করতে গিয়ে বল, মোহাম্মদের আল্লাহর কসম!

১. বোখারী শরীফ।

আর যখন তোমার মেজাজ খারাপ হয়, তখন বল যে ইবরাহীমের আল্লাহুর কসম!" হযরত আয়েশা (রাঃ) হেসে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)। আমি তখন আপনার নাম ছেড়ে দেই।"[১]

হযরত আয়েশা (রাঃ) খুব অল্প বয়সে স্বামীর ঘরে এসেছিলেন। অনেক সময় তিনি অন্যান্য বালিকাদের সঙ্গে খেলায় মেতে থাকতেন। হঠাৎ হুযুর (সাঃ) এসে পড়লে খেলার সঙ্গীরা ছুটে পালাত। কিন্তু হুযুর (সাঃ) তাদের ডেকে এনে পুনরায় হযরত আয়েশার কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

এক ঈদের দিনে হাবশীরা বর্শার কলাকৌশল দেখাচ্ছিল। হুযুর (সাঃ) হযরত আয়েশাকে ডেকে সে তামাসা দেখালেন। আয়েশা (রাঃ) তাঁর কাঁধে ভর দিয়ে দীর্ঘক্ষণ সে তামাশা দেখলেন এবং ক্লান্ত হয়ে ঘরের ভেতরে ফিরে গেলেন।

একদিন হযরত আয়েশা (রাঃ) পুতুল নিয়ে খেলা করছিলেন। পুতুলগুলোর মধ্যে ডানাওয়ালা একটি ঘোড়া ছিল। হুযুর (সাঃ) বাইরে থেকে এসে জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কি? আয়েশা (রাঃ) জবাব দিলেন, "আমার পুতুল।" ঘোড়াটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ঘোড়ার আবার ডানা হয় নাকি?" আয়েশা (রাঃ) বললেন, "কেন, হযরত সুলায়মানের (আঃ) ঘোড়ার তো ডানা ছিল।" প্রবাদ আছে যে প্রাচীনকালে ঘোড়ার পাখা হত, হযরত সুলায়মান (আঃ) সে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আকাশে উড়ে বেড়াতেন। একদিন এক ভ্রমণের সময় তাঁর নামায কাযা হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি সে ডানা কাটিয়ে দিয়েছিলেন। তার পর থেকে আর ঘোড়ার ডানা হয় না। হযরত আয়েশা (রাঃ) জবাব দিতে গিয়ে সে কথার দিকেই ইঙ্গিত করলেন।

একদিন হুযুর (সাঃ) কৌতূকাচ্ছলে আয়েশার সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করলেন। আয়েশা (রাঃ) তখন অত্যন্ত হালকা-পাতলা ছিলেন। তিনি আগে চলে গেলেন। কিছুকাল পর তাঁর শরীর যখন একটু ভারী হয়ে এল, তখন পুনরায় প্রতিযোগিতা হল। এবার হুযুর (সাঃ) জিতলেন। বললেন, "এটা ঐদিনের প্রতিশোধ!"

পারিবারিক পরিবেশ

বিশেষ কোন ব্যক্তি হয়ত নিজে কৃচ্ছ্র সাধনা করতে পারেন, কঠিনতর কষ্ট সহ্য করতে পারেন, দুনিয়ার সমস্ত বাহুল্য সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে পারেন, কিন্তু পরিবার-পরিজন, বিশেষত প্রিয়তম সন্তান-সন্ততিকেও অনুরূপ কঠোর কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ জীবনে সমভাবে অভ্যস্ত করা সম্ভবপর হয় না। তাই দেখা যায় যে যারা বৈরাগ্যপূর্ণ জীবনের সাধনা করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই স্ত্রী-পুত্র পরিজনের

---

১. মুসলিম শরীফ।

সংস্রব বর্জন করেই তা করেছেন। অনেকে হয়ত পারিবারিক জীবনের ঝামেলা থেকেই মুক্ত থেকেছেন। সাধনা-জগতের ইতিহাসে একমাত্র মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ই এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি এ নিয়মের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম করে দুনিয়াবাসীর সামনে একটি অনন্য নযীর স্থাপন করে গেছেন।

তাঁর নয়জন স্ত্রীর সংসার ছিল। এদের অধিকাংশই ছিলেন ঐশ্বর্যের মাঝে লালিতা-পালিতা বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই উত্তম খাদ্য এবং জাঁকজমকপূর্ণ গহনা পোশাকের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়া ছিল স্বাভাবিক। এঁদের মধ্যে কয়েকজন কোমলমতি অল্প বয়স্কাও ছিলেন, যাদের উত্তম আহার ও জমকালো পোশাকের হাতছানি সহজেই আকৃষ্ট করতে পারত। স্ত্রী এবং সন্তানগণের প্রতি হুযুর (সাঃ)-এর স্নেহ-মমতাও ছিল সীমাহীন। ধর্মের নামে তথাকথিত বৈরাগ্য সাধনারও তিনি মূলোৎপাটন করেছিলেন। অধিকন্তু বিজয় অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে ধনৈশ্বর্যেরও কোন অভাব ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও হুযুর (সাঃ) যেমন কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ জীবনের অনুশীলন করতেন, স্ত্রী-পরিবার-পরিজনের প্রত্যেককেই সেরূপ কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ জীবনে অভ্যস্ত করে তুলেছিলেন। নিজে যেমন কোনদিন পার্থিব কোন ভোগ-বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হননি, তেমনি পরিবারের কোন সদস্যকেও সেদিকে আকৃষ্ট হওয়ার সুযোগ দেননি। বরং অবিরাম সাধনার ফলে পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই তাঁর কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ চরিত্রের সর্বোত্তম বিকাশ সম্ভবপর হয়েছিল।

হযরত ফাতেমা (রাঃ) ছিলেন হুযুর (সাঃ)-এর প্রিয়তমা সন্তান! এ দুনিয়ায় ফাতেমার চেয়ে অধিক স্নেহ-মমতা আর কেউ লাভ করতে সমর্থ হয়নি! এতদসত্ত্বেও এ মমতার মাধ্যমে হযরত ফাতেমা (রাঃ) পিতার কাছ থেকে পার্থিব কোন উপকার পাননি। শাহানশাহে-মদীনার প্রিয়তমা কন্যার সাংসারিক জীবনের সাধারণ আলেখ্য ছিল এরূপ যে, আটার চাক্কি পিষতে পিষতে হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিল। মশক বয়ে পানি তুলতে তুলতে বুকে কোমরে দাগ পড়ে গিয়েছিল। ঘর ঝাড়ু দেয়া, কাপড় কাচা থেকে শুরু করে গৃহস্থালীর প্রত্যেকটি কাজই নিজের হাতে করতে হত। চুলা ফুঁকতে ফুঁকতে সোনার বদন ধোঁয়ায় কালো হয়ে যেত।[১] এ অবস্থায়ও স্নেহময় পিতার কাছে কড়া পড়া হাত দেখিয়ে একটি দাসী চাইলে পরিষ্কার জবাব এলো, "মা! বাইতুল-মালের সকল সম্পদ গরীব মুসলমানদের হক, এর মধ্য থেকে তোমাকে আমি কিছুই দিতে পারব না।"

প্রাণাধিক কন্যাকে একদিন দেখতে এলেন। তখন তাঁর পরনে এমন জীর্ণ একটা চাদর ছিল যে মাথা ঢাকলে শরীরের অন্যান্য অংশ উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছিল।[২]

---

১. আবু দাউদ।
২. আবু দাউদ।

কন্যাকে আরাম-আয়েশের যে কোন স্পর্শ থেকে এমনভাবে দূরে রাখতেন যে নিজে তো দিতেনই না, সামান্য ভোগ-বিলাসের স্পর্শযুক্ত কোন কিছু তাঁরা নিজেরা সংগ্রহ ক[illegible] সন্তুষ্ট হতেন। হযরত আলী (রাঃ) একবার তাঁকে একটি সোনার হার [illegible]য়েছিলেন। দেখতে পেয়ে বললেন, "ফাতেমা! লোকে যদি বলে যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কন্যা গলায় আগুনের বেড়ী পরেছে, তবে কি তা তোমার জন্য কষ্টদায়ক হবে না?" এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হযরত ফাতেমা (রাঃ) সে হার বিক্রি করে তদ্দ্বারা একটি গোলাম খরিদ করে এনেছিলেন।

কোন এক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সর্বপ্রথম আদরের কন্যাকে দেখতে গেলেন। যুদ্ধজয়ী পিতার অভ্যর্থনার জন্য হযরত ফাতেমা (রাঃ) ঘরের দেয়ালে পর্দা টাঙিয়েছিলেন, শিশু হযরত হাসান-হোসাইনের হাতে রৌপ্যের কাঁকন পরিয়েছিলেন। আত্মজের এতটুকু বিলাসও পছন্দ হল না। দরজা থেকে ফিরে এলেন। কন্যা দু' পুত্রের হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হলে বললেন, "এরা আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। পার্থিব ভোগ-বিলাসের সামান্যতম স্পর্শও এদের গায়ে লাগুক, আমি তা চাই না।"

স্ত্রীগণের প্রতি কতটুকু ভালবাসা ছিল, তা অসংখ্য বর্ণনার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু মদীনার শাহানশাহের প্রেমময়ী ভার্যাগণ পার্থিব কোন বস্তুর মাধ্যমে সে প্রেম-প্রীতির স্পর্শ লাভ করেননি। কোন সময় ভোগের প্রতি সামান্য আকর্ষণ দেখা দিলে বিশেষ যত্নের সঙ্গে তার মূলোৎপাটনে তৎপর হতেন।

স্ত্রীগণের মধ্যে সবার চাইতে আদরিণী ছিলেন হযরত আয়েশা, এ কথা ইতিপূর্বে একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সে আদর-সোহাগ কোন দিনই রঙ্গিন পোশাক বা সুন্দর অলঙ্কারের আকারে প্রকাশ লাভ করেনি। হযরত আয়েশার নিজের বর্ণনা, ما كانت لاحد انا الا ثوب واحد "আমাদের প্রত্যেকেরই এক জোড়া কাপড়ের অতিরিক্ত কোন পোশাক ছিল না।" — বোখারী, ১ম খণ্ড।

এত ভালবাসার মধ্যেও ভোগ-বিলাসের সামান্যতম প্রবণতা লক্ষ্য করলেই তা বারণ করতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) একবার হাতে সোনার কাঁকন পরেছিলেন। তা দেখে বললেন, "হাতির দাঁতের চুড়ি, জাফরানে রাঙ্গিয়ে পরলে উত্তম হত।"

পরিবার-পরিজনের সবার জন্যই সোনার অলঙ্কার এবং জৌলুসপূর্ণ রেশমী বস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল! তাঁদের প্রতি লক্ষ্য করে বলতেন, "বেহেশতে গিয়ে যদি এ সমস্ত বস্তু লাভ করার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে দুনিয়াতে এগুলো পরিহার করে চলো।"

পারিবারিক ব্যবস্থা ঃ সার্বক্ষণিক ব্যস্ততার জন্য হুযুর (সাঃ) সাংসারিক ব্যবস্থাপনায় মনোনিবেশ করতে পারতেন না। গৃহস্থালী সকল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব

ছিল হযরত বেলালের উপর। তিনিই পরিবার-পরিজনের এবং মেহমানগণের জন্য আহারের ব্যবস্থা করতেন। জিনিসপত্র যা আসত, তা তিনিই হাতে রাখতেন। হুযুর (সাঃ)-এর হাতে যা আসত তার সম্পূর্ণ অংশটি ব্যয়িত হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি শান্তি পেতেন না। অনেক সময় মেহমান এবং দরিদ্র প্রার্থীদের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে হযরত বেলালকে (রাঃ) ধার-কর্জ করতে হত।[১]

বনী নযীরের খেজুর বাগানে উম্মুল মুমেনীনগণের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংশ ধার্য করে রাখা হয়েছিল। এর আয় থেকেই প্রত্যেকের সারা বছরের যৎসামান্য খরচপত্র চলে যেত।

খয়বর বিজয়ের পর সেখান থেকে জনপ্রতি বার্ষিক ৮০ ওয়াসাক খেজুর এবং ২০ ওয়াসাক যব বরাদ্দ করে দেয়া হয়েছিল।[২]

হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত আমল পর্যন্ত উম্মুল মুমেনীনগণের জন্য এ বরাদ্দ ঠিক রাখা হয়েছিল। এ সময় অবশ্য হযরত আয়েশা (রাঃ)-সহ কোন কোন মুসলিম-জননী ফসলের পরিবর্তে বাগানের ব্যবস্থাপনা নিজেদের হাতে গ্রহণ করেছিলেন।[৩]

এভাবেই অতিবাহিত হয়েছিল উম্মত-মাতাগণের সাংসারিক জীবন। প্রিয় নবীজীর (সাঃ) ওফাতের পরও উম্মত-মাতাগণের মধ্যে কয়েকজন প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল পর্যন্ত সমগ্র উম্মতের ছায়া বিস্তার করে জীবিত ছিলেন। মুসলিম উম্মাহর পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে শরীয়তের বিভিন্ন দিক নির্দেশনায় তাঁদের যে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল, হাদীস, তফসীর ও ফেকাহর বিরাট ভাণ্ডার তার জীবন্ত সাক্ষী হয়ে রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে।

আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মুহম্মাদিও ওয়া আলা আলিহী ও আস্হাবিহী ওয়া আহলে বাইতিহী আজমাঈন!!

১. বোখারী, দ্বিতীয় খণ্ড।
২. তিন সের চৌদ্দ ছটাকে এক ছা'। এবং ৬০ ছা'তে এক ওয়াছাক হয়।
৩. বোখারী ১ম খণ্ড।